রামেন্দ্র-রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

রামেন্দ্র-রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

সম্পাদক
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা-৬

ভূমিকা*

'রামেন্দ্র-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের 'নানা কথা,' 'জগৎ-কথা' ও 'পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা' স্থান পাইয়াছে। তৎসম্পাদিত ও অনূদিত 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' ব্যতীত যাবতীয় মুদ্রিত গ্রন্থের প্রকাশ এই খণ্ডে সমাপ্ত হইল। রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' ও ষষ্ঠ খণ্ডে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের সাময়িক-পত্রাদিতে বিক্ষিপ্ত ও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত নিবন্ধগুলি স্থান পাইবে। এই খণ্ডে প্রকাশিত পুস্তকগুলি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে দেওয়া হইল।

নানা কথা ঃ

ইহা গ্রন্থকারের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। ইহাতে মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রামেন্দ্রসুন্দরের বারোটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সংগ্রহকার (আচার্য্যদেবের জামাতা) 'নানা কথা'য় পুনর্মুদ্রণকালে প্রবন্ধগুলির কোন কোন স্থল বর্জন করিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থাবলীতে মাসিকপত্রের মূল পাঠই গ্রহণ করিয়াছি এবং প্রত্যেক প্রবন্ধের শেষে পত্রিকা ও প্রকাশ-কালের নির্দ্দেশ দিয়াছি।

'নানা কথা' পুস্তকের "নিবেদনে" সংগ্রহকার আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, "এই গ্রন্থের জন্য লেখকের নির্ব্বাচিত প্রবন্ধসমূহের মধ্যে বোধ হয় পুরাতন 'ভারতী' পত্রে প্রকাশিত 'ব্রাহ্মণ কি খ্রীষ্ট্?' নামক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের আজও পর্য্যন্ত কোন সন্ধান করিতে পারি নাই।" সুখের বিষয়, আমাদের অনুসন্ধান ব্যর্থ হয় নাই। প্রবন্ধটি ১৩০৮ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধে লেখকের নাম ছিল না ; প্রবন্ধ-শেষে পাদটীকায় 'ভারতী'-সম্পাদিকা মন্তব্য করিয়াছেন :—

> "লেখক সাহিত্যসমাজে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। আপাততঃ বাদপ্রতিবাদের আকাঙ্ক্ষায় ও আশঙ্কায় নাম প্রচ্ছন্ন রাখিতে ইচ্ছুক। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নাম অপ্রকাশ রাখিবেন না এরূপ আশা দিয়াছেন।"

'নানা কথা' গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইয়া যাইবার পর 'ব্রাহ্মণ কি খৃষ্ট্?' প্রবন্ধটির সন্ধান মিলিয়াছে, এই কারণে উহা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে নাই ; উহা বর্ত্তমান খণ্ড গ্রন্থাবলীর শেষে পরিশিষ্ট-রূপে মুদ্রিত হইল।

জগৎ-কথা ঃ

এই গ্রন্থের কতকাংশ—"মূল ও যৌগিক পদার্থ" অধ্যায় পর্য্যন্ত (পৃ. ২১১-৮৩) ১৩১৭ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ ও আশ্বিন এবং ১৩১৮ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'সাহিত্যে' প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা ঃ

রামেন্দ্রসুন্দর যে বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, ইহা সেই পুণ্ডরীক-বংশের সংস্কৃত কাব্যে গ্রথিত ইতিবৃত্ত, অপরের রচনা। এই গৃহস্থবংশের তিন শত বৎসরের ধারাবাহিক ইতিহাস—যাহা রামেন্দ্রসুন্দর পুস্তকের পরিশিষ্ট-স্বরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার প্রায় সবটুকুই পুনর্মুদ্রিত করিলাম; পঞ্জিকার মূল অংশ বা তাহার বঙ্গানুবাদ বর্জন করিয়াছি।

সূচী

নানা কথা ঃ — ১—২০৮

আনি বেসাণ্ট — ৩
ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম — ১৩
সাহিত্য-কথা — ২৬
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম — ৪০
পরাধীনতা — ৫০
শিক্ষাপ্রণালী — ৭৪
রাষ্ট্র ও নেশন্ — ৮৮
সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার — ৯৯
অরণ্যে রোদন — ১৩৮
মহাকাব্যের লক্ষণ — ১৬৬
আমিষ ভোজন — ১৮০
মাতৃমন্দির — ১৯১
ব্রাহ্মণ কি পৃষ্ট্? — ৫৪৫

জগৎ-কথা ঃ — ২০৯—৪৯৯

জড় জগৎ — ২১১
জড় কাহাকে বলে ? — ২১২
জড়ের তিন অবস্থা — ২১৩
কঠিন পদার্থ — ২১৫
আয়তন ও আকৃতি — ২১৭
পরিমাণ-সমস্যা — ২১৮
স্থিতিস্থাপকতা — ২২২
তরল পদার্থ — ২২৪
তরল পদার্থের চাপ — ২২৭
প্রাকৃতিক নিয়ম — ২২৮
অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ — ২৩০
অনিল — ২৩৭

অনিলের চাপ	২৩৮
ভার	২৪৪
প্রাকৃতিক নিয়ম	২৪৬
বল	২৫০
মাধ্যাকর্ষণ	২৫২
বস্তু	২৫৫
বস্তুর পরিমাণ	২৫৯
মাধ্যাকর্ষণ	২৬৩
মাধ্যাকর্ষণের জগদ্ব্যাপ্তিতা	২৬৪
মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম	২৬৮
ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া	২৭৩
মিশ্র পদার্থ	২৭৬
দ্রবণ	২৭৭
অর্ক	২৭৮
শ্রেণীবিভাগ	২৭৯
মূল ও যৌগিক পদার্থ	২৮০
ধাতুভস্ম	২৮৩
দহনক্রিয়া	২৮৫
জড়ের নিত্যতা	২৮৮
কয়লাপোড়া অনিল	২৯২
মূল পদার্থ	২৯৫
ধাতু ও অপধাতু	২৯৬
পৃথিবী	২৯৯
রাসায়নিক সম্মিলন	৩০১
পরমাণুবাদ	৩০৯
প্রত্যক্ষ, অনুমান ও কল্পনা	৩১১
প্রাচীন ও আধুনিক পরমাণুবাদ	৩১৩
পরমাণু ও অণু	৩১৫
ক্ষার, অম্ল, লবণ	৩২৩
দহনক্রিয়া	৩২৬

উত্তাপ ৩৩০
উষ্ণতা ৩৩১
ঘর্ম্মমান ৩৩২
তাপমান ৩৩৪
তাপের ধর্ম্ম ৩৩৬
বাষ্প ৩৩৮
বাষ্প ও অনিল ৩৪০
জলের অবস্থাবিকার ৩৪১
তাপের পরিচালন ৩৪২
তাপের স্বরূপ ৩৪৬
শক্তি ও তাপ ৩৪৮
শক্তির রূপভেদ ও অবিনাশিতা ৩৫০
সমানতা ও তুল্যতা ৩৫১
জড়ের গঠনপ্রণালী ৩৫৫
কম্প-গতি ৩৭২
উপায় কি? ৩৭৫
জোয়ার-ভাঁটা ৩৮০
তরঙ্গ ৩৮৫
শব্দতরঙ্গ ৩৮৮
শব্দজ্ঞান ৩৯১
বাদ্যযন্ত্র ৩৯৪
প্রত্যক্ষ, না অনুমান ৪০০
আলোক ৪০৬
আলোকের স্বরূপ ৪২৪
আকাশ ৪৩৪
অদৃশ্য আলোক ৪৩৮
জড় পদার্থের গঠন-প্রণালী ৪৪৫
গণা ও মাপা ৪৫৪
তড়িৎ ৪৫৯
তড়িৎপ্রবাহ ৪৭৭

চুম্বক ৪৯০
তড়িৎপ্রবাহের চুম্বকত্ব ৪৯৫
তড়িৎপ্রবাহের চৌম্বক ধর্ম্ম ৪৯৬

পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা ৫০১—৫৪৪

নানা কথা

[১৯২৪ সনে প্রকাশিত]

নিবেদন

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়-প্রণীত 'নানা কথা' পুস্তক এত দিনে প্রকাশিত হইল। লেখক স্বয়ং এই পুস্তকের প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে উপর্য্যুপরি শোক এবং রোগে তাঁহাকে এত অবসন্ন করিয়াছিল যে, আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও এই পুস্তক প্রকাশের অবসর আর তাঁহার ঘটে নাই। এই সকল প্রবন্ধ আমাকে বহু পুরাতন ও লুপ্ত মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠা হইতে বহু অনুসন্ধানে ও পরিশ্রমে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, তজ্জন্য প্রকাশ করিতে এত অযথা বিলম্ব ঘটিয়া গেল। তথাপি এই গ্রন্থের জন্য লেখকের নির্ব্বাচিত প্রবন্ধসমূহের মধ্যে বোধ হয় পুরাতন 'ভারতী' পত্রে প্রকাশিত "ব্রাহ্মণ কি খ্রীষ্ট ?" নামক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের আজও পর্য্যন্ত কোন সন্ধান করিতে পারি নাই। অগত্যা ঐ প্রবন্ধটিকে আপাততঃ ত্যাগ করিয়াই "নানা কথা" এক্ষণে প্রকাশ করা হইল। ঐ প্রবন্ধটি কোন্ মাসিকপত্রে কোন্ সময় প্রকাশিত হইয়াছে, লেখকের অনুরক্ত পাঠকদিগের মধ্যে যদি তাহা কাহারও জানা থাকে, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা জানাইলে, পরম উপকৃত হইব।

১ হলওয়েল লেন,
কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৩১

শ্রীশীতলচন্দ্র রায়

আনি বেসাণ্ট

বৈরাগ্যপ্রবণ আর কর্ম্মপ্রবণ বলিলে, প্রাচ্য জীবন ও প্রতীচ্য জীবনের মূলগত পার্থক্য কতক বুঝা যায়। প্রতীচ্য জীবনের অপেক্ষা প্রাচ্য জীবন উৎকৃষ্ট, এই ভাবের একটা হাওয়া কিছু দিন হইতে বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি আনি বেসাণ্ট আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া, হাওয়ার গতিটা আর একটু প্রবল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা অসাময়িক না হইতে পারে।

বৈরাগ্য অর্থে জীবনে অনাসক্তি, এবং এই অর্থে বৈরাগ্য আধুনিক হিন্দুর মজ্জাগত, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে সম্পূর্ণ ভুল না হইতে পারে। কর্ম্ম এদেশে নাই, এমন নহে ; কেন না, কর্ম্মই জীবন। কর্ম্মলোপে জীবনের অস্তিত্ব টিকে না। তবে বৈরাগ্য-ধর্ম্মের এতটা প্রাতুর্ভাব, অন্য কোনও জাতির মধ্যে দেখা যায় না।

তবে চিরকাল এমন ছিল না। বৈদিক সময়ে আর্য্য মানবের জীবন সংসারে বীতস্পৃহ হয় নাই। তখন কর্ম্মই জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। নতুবা আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যনিবাস ও আর্য্যধর্ম্মের অভ্যুদয় হইত না। যখন চারি দিকে শত্রুপরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতে হয়, তখন জীবনে সহসা অনাসক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলে জীবনযাত্রা বড়ই সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। বৈরাগ্য ছিল না, তৎপরিবর্ত্তে ছিল আশা আর উদ্যম, অধ্যবসায় আর পরিশ্রম, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থময়তা।

আজি কালি যাহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সুরে সুর মিলাইয়া বৈদিক ধর্ম্মের স্তুতিগান ও পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাবাদ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা 'ধর্ম্ম' শব্দটার কিরূপ অর্থবিপর্য্যয় করিয়া ফেলেন,— দেখিয়া একটু ব্যথিত হইতে হয়। ইংরাজী ভাষায় রিলিজন (religion) শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, আমাদের পুরাতন ধর্ম্ম শব্দটার সে অর্থে ব্যবহার করিতে আমরা বড়ই নারাজ। রিলিজনের প্রতিশব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ঠিক পাওয়া যায় না ; কেন না, ভারতবর্ষে, সুতরাং বঙ্গদেশে রিলিজন নামক একটা কিছু গত চারি হাজার বৎসরের মধ্যে ছিল না। খ্রীষ্টানের রিলিজন কতকটা খ্রীষ্টানের জুতা, টুপি প্রভৃতি পরিচ্ছদের স্থলীয় একটা কিছু ; কতকটা

শোভার জন্য, কতকটা লোক দেখানর জন্য এবং হয়ত শরীরটা একটু গরম রাখিবার জন্য উহার আবশ্যকতা।

কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম আমাদের জীবনের সহিত সর্ব্বতোভাবে সহবর্ত্তী ও সহব্যাপী; জীবনের প্রধান লক্ষণ ও বিশেষণ। মনুষ্যের সম্পাদিত ক্রিয়ার সমষ্টিকে যদি জীবন বলা যায়, মনুষ্যের সম্পাদ্য কর্ত্তব্যের সমষ্টিকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। ইংরাজীতে এক ডিউটি (duty) ভিন্ন ইহার সমার্থসূচক সমকক্ষ প্রতিশব্দ আর পাওয়া যায় না।

মানুষের কর্ত্তব্য-সমষ্টিকে স্থূলতর তিন ভাগ করিতে পারা যায়; নিজের প্রতি কর্ত্তব্য, আপনার লোকের প্রতি কর্ত্তব্য, এবং পরের প্রতি কর্ত্তব্য। এই তিন কর্ত্তব্যের সমষ্টিতে ধর্ম্ম। ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের ইতিহাস মনুষ্যজাতির ইতিহাসের সহিত আলোচনা করিলে দেখা যায়, নিজের প্রতি কর্ত্তব্য-জ্ঞানটারই উৎপত্তি সকলের আগে। মানুষকে প্রাণী হিসাবে দেখিলে দেখা যায়, আত্মপ্রীতিই তাহার স্বভাবগত ধর্ম্ম। সমাজবন্ধনের সহকারে পরপ্রীতি আত্মপ্রীতির অনুকূল হয়, তাই ক্রমশঃই প্রীতিটা আপনার সঙ্কীর্ণ পরিধি ছাড়িয়া বাহিরের অপরের অভিমুখে প্রসার লাভ করে। পরপ্রীতি কতকটা আত্মপ্রীতির প্রতিকূল, কিন্তু সামাজিক মানুষের নিকট সর্ব্বতোভাবে প্রতিকূল নহে, কতকটা অনুকূল। পরকে ক্রমশঃ আপনার করিয়া না নিলে সমাজবন্ধন চলে না। তাই পরপ্রীতি ক্রমশঃ ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, কোনও কোনও বিচক্ষণ শাস্ত্রকারের মতে পরার্থ-পরতাই ধর্ম্ম; এবং স্বার্থপরতাই অধর্ম্ম। প্রকৃত পক্ষে উভয়ের সামঞ্জস্যে ধর্ম্মের স্থিতি।

আপনার প্রতি কর্ত্তব্য ও পরের প্রতি কর্ত্তব্য ছাড়িয়া দিয়া আর একটা কর্ত্তব্য মনুষ্যজাতি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ জগতের খানিকটা বুঝে, খানিকটা বুঝে না। খানিকটা তাহার জ্ঞানের পরিধির অন্তর্গত; খানিকটা সেই পরিধির বাহিরে। এই সীমাবিভাগ চিরকালই ছিল, এবং চিরকালই থাকিবে। মানুষ যেটুকু বুঝে, তাহার আবার কতকটাকে ভালবাসে; কতকটা ভালবাসে না; অথবা অগত্যা ভালবাসে। আর যেটুকু বুঝে না, সেইটুকুকে ভালবাসিতেও পারে না, না বাসিতেও সাহস করে না; সেইটুকুকে ভয় করে। জগতের এই জ্ঞানাতীত অংশটুকু মানুষের চক্ষে বিভীষিকাময়। অকস্মাৎ, অতর্কিতে,

এমন ভাবে মানুষের জীবনের উপর ইহা প্রভাব বিস্তার করে যে, মানুষের জীবন-শৃঙ্খল সহসা ছিঁড়িয়া যায়। ইহা মানুষের শক্তির অধীন নয়। মানুষের ক্ষমতার আয়ত্ত নহে, তাই মানুষ বড়ই সাবধানে, অসহায়ভাবে, কাতরনেত্রে জগতের এই জ্ঞানাতীত অংশের প্রতি চাহিয়া থাকে; স্তুতি করে, তোষামোদ করে, এবং সময়ে সময়ে নিতান্ত ক্ষীণপ্রাণ দুর্ব্বল অসহায়ের মত উৎকোচ দিয়া বশ করিতে চায়। এই স্তুতিবাদ, এই তোষামোদ দুর্ব্বলের একমাত্র গতি, অসহায়ের একমাত্র বল, আত্মরক্ষার উদ্দেশে এই একমাত্র অবলম্বন। অসহায় মানুষ জগতের সেই জ্ঞানাতীত পরাক্রান্ত শক্তি হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত এই হীন উপায় অবলম্বন করিয়াছে, ইহাকে আপনার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য করিয়াছে। উপায়টাকে হীন বল, কাপুরুষোচিত বল, আর যাহাই বল, রুদ্ধশ্বাসে ভয়ে ভয়ে বলিও। মুক্তকণ্ঠে বলিলে মনুষ্যসমাজের সমবেত শক্তি বজ্রের ন্যায় তোমার উপর আপতিত হইবে।

সুতরাং স্বার্থ ও পরার্থ ছাড়িয়া মনুষ্যজীবনের আর একটা অর্থ আছে, আর একটা কর্ত্তব্য আছে; সেইটা মানুষের রিলিজন। জগতের অজ্ঞেয় শক্তিকে যেন তেন সন্তুষ্ট রাখিতে পার, তোমারই মঙ্গল; তবে কিসে সন্তুষ্ট রাখিতে পারা যাইবে, তাহাতে মতভেদ রহিয়াছে। বোধ করি— যত মানুষ, তত মত। সন্তুষ্ট রাখা বড় সহজ নহে! ইহজীবনে সকল সময়ে ফললাভ হয় না। না হউক, পরলোক আছে। সেখানে ফল পাইবে। দুর্ব্বলের এইরূপ সান্ত্বনা, অথবা আত্মপ্রবঞ্চনা।

বৈদিক সময়ে মানুষের জীবনের প্রতি প্রবল আসক্তি ও অনুরাগ ছিল; আপনার শ্রীবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যবৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রভূত চেষ্টা ছিল, এবং আত্মরক্ষণের কামনায়, শত্রু নিপাতের কামনায়, ইন্দ্রের প্রতি, বরুণের প্রতি, রুদ্রের প্রতি স্তুতি প্রয়োগ ও উৎকোচ প্রয়োগেরও অভাব ছিল না। পরার্থে আত্মোৎসর্গ বৈদিক সময়ে ধর্ম্মের অন্তর্গত হয় নাই। হয় নাই— তাই ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ হইয়াছে, আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যাবর্ত্ত হইয়াছে। জাতি মাত্রেরই অভ্যুদয়ের এই ইতিহাস। বেদের পর উপনিষদ্ ও দর্শন। এখন আর শত্রুভয় নাই, জীবন-সংগ্রামে কঠোরতা নাই, বসুন্ধরা সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা; অন্নকষ্ট নাই। প্রচুর অবকাশ, আর্য্যজাতির ধীশক্তি জীবনের রহস্যের, জগতের রহস্যের তন্ন তন্ন বিশ্লেষণে নিযুক্ত। বিশ্লেষণে

স্থির হইল, জীবন দুঃখময়, এত সুখেরও পরিণাম দুঃখ, দুঃখময়তাই জীবন। নিরপেক্ষ সুখ অসম্ভব; দুঃখনিবৃত্তিই সুখ; দুঃখনিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। দুঃখনিবৃত্তির উপায় শুদ্ধ জ্ঞানে। তত্ত্বজ্ঞানে মোক্ষ ও সত্যজ্ঞানে মোক্ষ। সত্যজ্ঞান কি? না জগৎ কল্পনা; আমি মাত্র আছি; জগৎ আমার কল্পনা, আমার সৃষ্টি, আমার অংশ। এই জ্ঞান লাভ হইলে বুঝিতে পারিবে, দুঃখ জীবনের সহচারী হইলেও আমারই কল্পিত পদার্থ। সুতরাং দুঃখ আর দুঃখ থাকিবে না। ফল হইল সংসারে বিরক্তি—বৈরাগ্য। সকলেই যে বিরাগী হইয়া অরণ্য আশ্রয় করিয়াছিল, তাহা নহে; তবে সেই অবধি হিন্দুর অস্থি মজ্জা শোণিতের সহিত একটা সংসারে বিরক্তি, কর্ম্মে অনাসক্তির রস মিশিয়া গিয়াছে, তাহা আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান।

তাহার পর বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেব জগতে দুঃখ ভিন্ন সুখ দেখিতে পাইলেন না। কর্ম্মবশে জীব কেবল দুঃখের চক্রে ভ্রমণ করিতেছে, ইহাই দেখিলেন। বুদ্ধদেব আদেশ দিলেন, এই দুঃখ নিবৃত্তির আর কোনও উপায় নাই। স্বার্থ বিসর্জ্জন কর, পরের জন্য জীবন উৎসর্গ কর। ভোগবিলাস, সুখ ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিয়া সর্ব্বজীবে প্রীতি বিতরণ কর। ইহাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য, ইহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম, ইহাই মনুষ্যের কর্ম্ম। এমন মহতী বাণী ইতিপূর্ব্বে নরকণ্ঠ হইতে কখনও নির্গত হয় নাই; পরেও হইয়াছে কি না সন্দেহ। বৈরাগ্য হইতে কর্ম্ম প্রসূত হইল; কর্ম্ম 'ধর্ম্ম' আখ্যা প্রাপ্ত হইল; শত্রু মিত্র হইল, পর আপনার হইল। আর্য্য অনার্য্যের সহিত মিশিয়া গেল। ব্রাহ্মণ-শূদ্রের বৈষম্য দূরে গেল। বৌদ্ধ প্রচারক এই অপূর্ব্ব উপদেশ লইয়া দেশে বিদেশে বাহির হইল। হিমাচল লঙ্ঘন করিয়া ভারতসাগর পার হইয়া বুদ্ধ-প্রচারিত প্রীতিধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইতে চলিল। ভারতবাসী ঐশ্বর্য্যপিপাসায় বা শোণিততৃষ্ণায় কখনও স্বদেশের সীমা পার হয় নাই, ধর্ম্ম প্রচারের নামে জীবরক্তে ধরাতল অভিষিক্ত করে নাই। ধর্ম্মপ্রচার ভাণ করিয়া পরস্বাপহরণ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে নাই। ভারতবর্ষের চতুঃসীমার ভিতরেই তাহার অধ্যবসায় চিরকাল আবদ্ধ আছে। একবার মাত্র সেই চতুঃসীমা পার হইয়াছিল; কটিতে তরবারি ও করপুটে ধর্ম্মপুস্তক তাহার সঙ্গে যায় নাই। সঙ্গে ছিল কেবল মনুষ্যত্ব—ললাটে জ্ঞানের প্রতিভা ও কণ্ঠে প্রীতির অমৃতময়ী বাণী।

প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তে জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা ছিল না ; তথাপি জীবন দুঃখদুর্ভর হইয়া পড়িয়াছিল ' কেন, ঠিক বলা যায় না। বোধ করি, ইহাই প্রাকৃত নিয়ম। অন্য দেশে এমন নয়। ইউরোপে জীবন-সমরের কঠোরতার মাত্রা পূর্ণ। অথচ জীবনে সেখানে আসক্তি প্রবল। যে কারণেই হউক, আর্য্যাবর্ত্তে জীবন দুঃখদুর্ভর হইয়া পড়ে। দুঃখমুক্তি পরমপুরুষার্থ বলিয়া গণ্য হয়। ফলে দাঁড়ায় বৈরাগ্য। বৈরাগ্য দুই মূর্ত্তি গ্রহণ করে ; দুই পথে চালিত হয়। কেহ বলেন—মুক্তি জ্ঞানে ; কেহ বলেন —মুক্তি কর্ম্মে। জ্ঞানের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান ও সত্যজ্ঞান, কর্ম্মের অর্থ প্রীতি ও মৈত্রী। বৈরাগ্যের স্রোত দুই মুখে প্রবাহিত হইয়াছিল। এখনও বোধ করি, দুই মুখেই দুই প্রবাহ চলিতেছে। দুই স্রোত মিলিবে কি না, জানি না। যে দিন মিলিবে, মানবজাতির ইতিহাসে সেই দিন পুণ্য দিন। যে স্থানে মিলিবে, ধরাতলে সেই পুণ্যক্ষেত্র প্রয়াগসঙ্গম।

তবে ভারতবাসী বুদ্ধের উপদেশ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নাই। অন্য জাতি যে মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে, এই পর্য্যন্ত। চীনে, তিব্বতে, অসভ্য জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমান, বুদ্ধের জন্মভূমিতে বৌদ্ধধর্ম্মের সমাদর নাই, এই বলিয়া একটা হাহাকার আজি কালি প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই হাহারবের ভিত্তির ঠাহর পাওয়া যায় না। ভিন্ন দেশে বৌদ্ধ রিলিজন নামে একটা কিছু প্রচলিত থাকিতে পারে ; কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মোপদেশ ভারতবর্ষে যে রূপে যে ভাবে গৃহীত হইয়াছে, তাহা কুত্রাপি হয় নাই, ইহা অকুতোভয়ে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই নিরীহ, দান্ত, শান্ত, ধীর, ক্ষমাশীল, নিষ্ঠাবান্ প্রকাণ্ড হিন্দুজাতিই ইহার প্রমাণ।

ভালর মন্দ আছে। আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের ফল যে সর্ব্বতোভাবে সুন্দর হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। বুদ্ধদেব পরার্থপরতা শিখাইয়াছিলেন। বৌদ্ধ মাত্রই পরার্থপর হইয়াছিল, বলা যায় না। মনুষ্য-চরিত্র এইরূপ। শুনা যায়, যীশুখ্রীষ্ট উপদেশ দিয়াছিলেন—এক গণ্ডে চপেটাঘাত পাইলে অপর গণ্ড পাতিয়া দিবে। কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে চপেটাঘাত-সহিষ্ণুতা খ্রীষ্টানের লক্ষণ বলিয়া কোন কালে গণ্য হইয়াছে, ইতিহাসে এরূপ কথা লেখে না। বিনা বাক্য ব্যয়ে নিরীহের গণ্ডে চপেটাঘাত দ্বারা পরম সুখের অনুভবলিপ্সু, যদি কেহ থাকেন, তিনি খ্রীষ্টান।

যাহাই হউক, ভারতবাসী মাত্রই বুদ্ধপ্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করে নাই। তবে মিলিয়া মিশিয়া বুদ্ধের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিল। মন্দির গড়িয়া বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ধূপ ধূনা আরতি দ্বারা প্রসাদ লাভের চেষ্টা করিয়াছিল। যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্রের সৃষ্টির দ্বারা নানা কৌশলে অতিপ্রাকৃত অনুগ্রহ লাভ করিয়া স্বার্থরক্ষণের চেষ্টা পাইয়াছিল। বড় বড় রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। জ্ঞানচর্চ্চার খর স্রোত প্রতিহত হইয়াছিল। শূদ্র ও অন্ত্যজ সমাজ-সোপানে উঠিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের অধোগতি হইয়াছিল। আর্য্য অনার্য্য মিশ্রিত হইয়া বর্ত্তমান হিন্দুজাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু আর্য্য শোণিতের বিশুদ্ধতার সহিত আর্য্যপ্রতিভার খর জ্যোতি মলিনত্ব পাইয়াছিল। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের নূতন ভাবে পুনরভ্যুদয়ের সময়, ব্রাহ্মণ-মহিমার পুনঃস্থাপনের সময়, দুই একবার সেই প্রতিভা, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত, বৃষ্টিশেষে তড়িল্লতার মত দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা রীতিমত স্থায়ী হয় নাই, সুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসে নাই ; মলিন প্রতিভা পূর্ব্বের মত উজ্জ্বল হয় নাই।

বৈদিক কালের অতিপ্রাকৃতের নিকট অসহায় স্তুতিবাদের সহিত দর্শনোপনিষৎ-প্রচারিত জ্ঞান ও বুদ্ধ-প্রচারিত প্রীতি ও বৌদ্ধগণ-প্রচারিত যন্ত্র মন্ত্র উপাসনা সম্মিলিত করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের উৎপত্তি। আধুনিক হিন্দু সংসার মিথ্যা ও স্বপ্ন বলিয়া জানে, আপনাকে কর্ম্মবশে দুঃখবর্ত্মে ভ্রাম্যমাণ বলিয়া স্বীকার করে, এবং জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই, সর্ব্বদা মুখে কহিয়া থাকে। হিন্দু পরোপকারে কুণ্ঠিত নহে, সহিষ্ণুতায় ধরিত্রীকে পরাভব করে, সংযম ব্রতোপবাস একমাত্র কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে। হিন্দু রাজার নিকট দণ্ডসহিষ্ণু প্রজা, গুরুর নিকট বিনীত শিষ্য, পরিবারের নিকট কর্ত্তব্যপরায়ণ ভৃত্য। অত্যাচারী রাজপুরুষের নিকটে হিন্দুর বাক্‌স্ফূর্ত্তির ক্ষমতা নাই, উপদেষ্টা গুরুর নিকট হিন্দুর স্বাধীন চিন্তার অবসর নাই। জীবন ধারণের উপযোগী অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হইলেই সে পরিতুষ্ট ; কঠোর জীবন-সমরে লিপ্ত হইতে পরাঙ্মুখ, শ্রমসাধ্য জ্ঞানার্জ্জনে কাতর। সংসার মায়াময়, জীবন মোহময়, সুত-পরিবার ভববন্ধনের শিকল ; এমন কি, স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা এই মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত নহেন। বাহির হইতে কি একটা অনির্দ্দেশ্য শক্তি তাহাকে কাজ করায়, তাই সে কাজ করে ; তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাকেও সেই অনির্দ্দেশ্য শক্তি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, তাই সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি করেন।

মানুষও যেমন পরাধীন, মানুষের দেবতাও তেমনই পরাধীন। তথাপি হিন্দু বিরাগী হইয়াও গৃহী; এবং সংসার মিথ্যা জানিয়াও, কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও, হিন্দু পুত্রকামনায় দেবতার নিকট বলি মানস করে, পরকালে সুখের কামনায় গঙ্গাস্নান করে, ইহকালে স্বাস্থ্যকামনায় গাছতলে মাথা ঠুকে, এবং সময়ে সময়ে শত্রুনিপাত কামনায় গুপ্তভাবে আগুনে ঘি ঢালে।

মোটের উপর ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। অন্য জাতির তুলনায় ভারতবাসী দুঃখী বলা যায় না। অন্যের তুলনায় ভারতবাসী দরিদ্র; কিন্তু সন্তুষ্টস্য সদা সুখম্। ভারতবাসী পরপীড়িত, কিন্তু পর কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে তাহার প্রতিবাদ যে একান্ত আবশ্যক, তাহা ভারতবাসী ঠিক বুঝে না। তাহাতে ভারতবাসী নিতান্ত অসন্তুষ্ট নহে; কেন না, সে ত বিধিলিপি, তাহা নিবারণের বোধ করি কোন উপায় নাই। ভারতভূমির শস্যসম্পত্তি কখনই অপ্রচুর নহে; সুতরাং জঠরজ্বালা কখন বেশী তীব্র হয় নাই। অথবা কোনও বৎসর ফসল না জন্মিলে ভারতবাসী দল বাঁধিয়া মরিয়া যাইতে কোনও মতে পশ্চাৎপদ নহে। ভারতবাসীকে এ বিষয়ে কখনও কাপুরুষ বলিও না। জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই, তাহা ভারতবাসী ঋষিমুখে শুনিয়াছে; কিন্তু পরিশ্রম করিয়া জ্ঞান আহরণের দরকার নাই; তাহা তাহার পূর্ব্বপুরুষের ভাণ্ডার খুলিলেই যথেষ্ট পরিমাণে মিলিবে। কর্ম্মে মোক্ষলাভ হয়, তাহাও সে জানে, তাই সন্ধ্যা বন্দনা তাহার নিকট ফাঁক যায় না, এবং মাসের মধ্যে উনত্রিশটা একাদশীর ব্যবস্থা হইলেও তাহার লোমহর্ষের সম্ভাবনা নাই। এর চেয়ে মহত্তর কর্ম্ম আর কি হইতে পারে? আর সংসারে অনাসক্তি তাহার শাস্ত্রের উপদেশ। যদিও গৃহিরূপে অবস্থানকালে এই উপদেশটার সম্যক্ প্রতিপালন সহজ হয় না; তবে একটু গোলযোগ উপস্থিত হইলেই দারা সুত পরিবার বিধাতার মর্জ্জিতে সমর্পণ করিয়া গৃহাশ্রম-হইতে দূরে পলায়ন করিয়া কুম্ভক রেচক অভ্যাস করিয়া হাঁপ ছাড়িবার পথ পায়।

ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির ইতিহাস এইরূপ। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমেই হউক, আর দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক, যে প্রতীচ্য জাতিদের সহিত ভারতবর্ষের সম্প্রতি পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের ইতিহাস মূলতঃ বিভিন্ন। হিন্দুস্থানের ইতিবৃত্তে মূলকথা—তৃপ্তি আর তৃপ্তি। পাশ্চাত্য দেশের ইতিবৃত্তে মূলকথা—অন্ন আর অন্ন। ইউরোপে যত দিন

লোক-সংখ্যা অন্নসংস্থানের সীমা ছাড়াইয়া উঠে নাই, তত দিন ইউরোপের লোকে পরস্পর রক্তারক্তি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু চিরদিন এমন চলে নাই। স্থান অল্প, ভূমি অনুর্ব্বর, লোকসংখ্যা বর্দ্ধমান, সকলের অন্ন জোটে না; জঠরজ্বালার তীব্র উত্তেজনায় ইউরোপের লোক স্বদেশ ছাড়িয়া বাহির হইল। প্রথমে বাহির হয় স্পানিয়ার্ড। দেখাদেখি পর্টুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরাজ ক্রমশঃ বাহির হইতে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে সেই এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। ইউরোপ হইতে লোক দলে দলে বাহির হইল; সঙ্গে ছিল জঠরজ্বালা ও তজ্জনিত অমানুষিক উত্তেজনা, অর্থ-তৃষা ও রক্তপিপাসা। আর তার সঙ্গে ছিল ধর্ম্মপ্রচারের ভান। এই ভান ও এই পিপাসা লইয়া দস্যুর দল লোকোপপ্লবের জন্য পূর্ব্বে পশ্চিমে যেখানে সেখানে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হইতে লাগিল। কিন্তু হায়, ধূমকেতুর আবির্ভাব অচিরস্থায়ী; আর এই নৃশংস দস্যুর দল যেখানে একবার প্রবেশ করিল, সেখান হইতে আর বাহির হইল না। প্রাচীন রাজ্য ছারখারে গেল, প্রাচীন সভ্যতা লুপ্ত হইল; প্রাচীন মানববংশ ভবিষ্য কালের ভূতত্ত্ববিদের জন্য ভূপঞ্জরে অস্থিকঙ্কাল রাখিয়া ধরাধাম হইতে অপসৃত হইতে লাগিল। একমাত্র ভারতবর্ষে এই ধ্বংস-দাবানল সম্যক্‌ভাবে জ্বলিতে পায় নাই; অন্ততঃ ভারতবাসী ধরাতল হইতে উচ্ছিন্ন হয় নাই।- সে ভারতবাসীর পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত পুণ্যফলে বলিতে হইবে।

যাহা হউক, ইউরোপ পরস্বাপহরণ ও পরের সর্ব্বনাশ চারি শত বৎসর ধরিয়া করিতেছেন বটে, কিন্তু ইউরোপের জঠরজ্বালার তীব্রতা তাহাতে কমে নাই। জীবনের কঠোরতা, অতৃপ্তির তীব্রতা দিন দিন বাড়িতেছে। ইংরাজের, রুশের, ফরাসীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া জার্ম্মাণী, ইটালি প্রভৃতিও বহিঃ-সাম্রাজ্য-স্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছেন। অন্নচেষ্টার অধ্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি, ধন-বৃদ্ধি, জ্ঞান-বৃদ্ধি বিপুল বেগে ঘটিয়াছে। যশোগৌরবে, জ্ঞানগৌরবে পাশ্চাত্য সভ্যতা মহিমাময়ী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই।

কিন্তু হইলে কি হয়। ধরাপৃষ্ঠ অসীম নহে; খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণেরও সীমা আছে। লোকসংখ্যা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, পৃথিবীব এখানে ওখানে, সেখানে যে একটু আধটু খালি জায়গা আছে, তাহা কিছু দিনেই জনপূর্ণ হইবে। তখন আর ইউরোপ সেখান হইতে

অন্ন পাইবে না। তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিণাম কি হইবে? এই এখন প্রধান সমস্যা।

ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নহে। বর্ত্তমানের চাকচিক্য শোভার অন্তরেও গোলযোগ দেখা যায়। ইউরোপে যেন একটা মহাকুরুক্ষেত্র ব্যাপারের আয়োজন হইতেছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদয় জাতিই তাহাব উদ্যোগপর্ব্বে ব্যতিব্যস্ত ও উৎকণ্ঠায় নিমগ্ন। হয়ত সেই মহাকুরুক্ষেত্রে ইউরোপীয় সভ্যতার বিপুল সৌধ চূর্ণীকৃত হইয়া ধূলিস্তূপে পরিণত হইবে। সমাজের অভ্যন্তর হইতেও একটা অতৃপ্তির ও অশান্তির ও যাতনার তীব্র নিনাদ উঠিতেছে। সমাজ প্রতি ক্ষণেই বিপ্লবোন্মুখ। দরিদ্রের প্রতি ধনীর দৃষ্টি নাই। দরিদ্র ধনীর কণ্ঠশোণিত পানে ক্ষুৎযন্ত্রণা মিটাইতে প্রস্তুত। উপরে জ্ঞান বিজ্ঞান শোভা সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য লোকনয়ন ঝলসিতেছে। অভ্যন্তরে মূর্ত্তিমতী দরিদ্রতা ক্ষীণ চর্ম্মে কঙ্কাল আচ্ছাদন করিয়া ত্রাহিস্বরে ডাকিতে ডাকিতে পৈশাচিক বদন ব্যাদান করিয়া সমাজ-শরীর গ্রাস করিতে উদ্যত রহিয়াছে। রাজপুরুষগণ রাক্ষসীকে শাসনে রাখিবার চেষ্টায় আছেন; কিন্তু শাসন আর মানে না।

ইউরোপের রাজনীতি, ধর্ম্ম-নীতি, সমাজ-নীতি, এই জীবন-মরণ সমস্যা লইয়া বিব্রত। কিন্তু মীমাংসা খুঁজিয়া মিলিতেছে না। আনি বেসাণ্টের বিচিত্র জীবনের বিবিধ বিপর্য্যয়ের মধ্যে একটা ধারাবাহিক শৃঙ্খলাসূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত সমস্যা পূরণের জন্যই এই অসামান্যা নারীর জীবনের প্রধান ভাগ অতিবাহিত হইয়াছে। লণ্ডনের দরিদ্রতার সহিত বহু দিন ধরিয়া তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্তা ছিলেন। অবশেষে নিরাশ হইয়া ক্লান্ত-শরীরে তিনি এই শান্তরসাস্পদ পুরাতন পুণ্যতপোবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। এই বৃদ্ধ স্থির ক্ষমাশীল সহিষ্ণু সংযত জাতির প্রতি চাহিয়াছেন, আর বলিয়াছেন, এমন আর হয় না; ইহার আর তুলনা নাই।

ইউরোপ কর্ম্মপ্রবণ, আর ভারতবর্ষ বৈরাগ্যপ্রবণ। কর্ম্ম হইতে ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, গৌরব ইউরোপ লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। আর বৈরাগ্য হইতে ভারতবর্ষ তৃপ্তি, শান্তি, অনাসক্তি লাভ করিয়া ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, গৌরব বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে। তাই হিন্দুজাতির তৃপ্তি ও শান্তি স্থিতিশীলতায় হিমাচলের স্পর্দ্ধা করে। অক্ষুব্ধতায় প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনীয় হয়। আর ইউরোপের জ্ঞান গৌরব পরাক্রম হয়ত আকাশবাহী উল্কার মত,

অগ্নিগিরির উদ্গীরিত বহ্নির মত ক্ষণস্থায়ী শোভা বিস্তার করিয়া নির্ব্বাণ হইতে পারে।

আমাদের সম্মুখে ভিন্নমুখবর্ত্তী দুই পথ বর্ত্তমান। কোন্ পথ অবলম্বনীয়, ইহাই হিন্দুসন্তানের প্রধান বিচার্য্য। ('সাহিত্য,' আষাঢ় ১৩০১)

ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম

পুরাণ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, সেকালের তেজীয়ান্ মুনি-ঋষিগণের সন্তান-সন্ততি সকল সময়ে জন্মগ্রহণের জন্য প্রচলিত নিয়মানুসারে দশ মাস কাল গর্ভাবস্থানরূপ যাতনা ভোগের অপেক্ষা রাখিতেন না। দেশ কাল পাত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়াই যত্র তত্র অকস্মাৎ এক এক ঋষিবংশধরের আবির্ভাব হইত, এবং তিনিও প্রায় ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র সাঙ্গোপাঙ্গ বেদশাস্ত্রের উচ্চারণ আরম্ভ করিয়া একটা ভাবী বিপ্লবের সূচনা করিয়া ফেলিতেন।

ষাটি বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে সাব্যস্ত হইয়াছিল, ইংরাজী বিদ্যা না শিখিলে আমাদের মনুষ্যত্ব জন্মিবে না। সাব্যস্ত হইবা মাত্র বিলাতী সরস্বতী দশ মাসের অপেক্ষা না রাখিয়া একেবারে কতকগুলি শ্মশ্রুগুম্ফধারী সুপক্ক সন্তান প্রসব করিলেন ; এবং অকস্মাৎ দেশমধ্যে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। কেহ আশা করিলেন, ভারতমাতা অচিরেই হিমাচলের উচ্চতম শিখরে উন্নীতা হইবেন ; কেহ আশঙ্কা করিলেন, এইবার ইহারা বুড়ীকে ভারতসাগরে ডুবাইয়া মারিল।

তার পর ষাটি বৎসর অতীত হইয়াছে কিন্তু ইহার মধ্যে ভারতের বিশেষ উন্নতির বা অধোগতির লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে আর এক তান উঠিয়াছে, ইংরাজী বিদ্যা এ দেশের ক্ষেত্রে ফলিল না ; বাঙ্গালার মাটিতে কি বিলাতী ওক্ গাছের বৃদ্ধি হয় ? এ দেশের মাটিতে বরং দেশী প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যার চাষ আবাদ করিলে কিছু ফল পাওয়া যাইতে পারে। চেষ্টা করিলে মন্দ হয় না।

বিজ্ঞের দল স্মিতমুখে বলিতেছেন—আমরা পূর্ব্বেই জানিতাম, বিলাতি মাল মাত্রই ভুয়া ; কেবল বাহিরের চাক্চিক্য দেখিয়া তোমরা আহ্লাদে আটখানা হইয়া একটা প্রকাণ্ড গণ্ডগোল আরম্ভ করিয়াছিলে ; এখন ঠেকিয়া শেখ ও পথে এস।

সুতরাং নব্য প্রাচীন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, স্বদেশী বিদেশী, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটা অতৃপ্তি ও আকাঙ্ক্ষার চিহ্ন দেখা যাইতেছে ; একটা নূতন পন্থার আবিষ্কার ও অনুসরণ না করিলে ভারতবাসীর মানসিক

উন্নতির আর উপায় নাই; সর্ব্বত্র এইরূপ একটা ভাব অন্তরে অন্তরে খেলিয়া বেড়াইতেছে।

নানা জনে নানা কথা বলিতেছে। ত্রিশ বৎসরের বেশী হইল, ইংরাজী বিদ্যার বহুল প্রচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; বড় বড় অধ্যাপক বড় বড় জটিল শাস্ত্রের শিক্ষা দিয়া বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীর মরিচা-ধরা মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া দিতেছেন; তথাপি এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে একটা নিউটন জন্মিল না, একটা ফ্যারাডে জন্মিল না। কি পরিতাপ! ভারতবাসীর মস্তিষ্কটারই বোধ হয় দোষ আছে। ডারউইনের মতানুসারে বানর ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী পর্য্যায়ভুক্ত জীবের কিছু দিন হইতে অনুসন্ধান হইতেছে। বোধ হয়, ভারতবর্ষের লোক সেই জীব।

যাহাই হউক, সরস্বতী এ দেশে পদার্পণ করিয়া বন্ধ্যা হইলেন, অথবা কেবল অকালপ্রসূত দুর্ব্বল জীবের সংখ্যা বাড়াইতে লাগিলেন, এ দেশের পক্ষে এ বড় দুর্ণাম ও কলঙ্কের বিষয়। সুতরাং, এই কলঙ্করটনার ভিত্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক হইতেছে।

ফলে, কথাটা কত দূর সত্য, দেখা যাউক। বিলাতের মাটিতে নিউটন ফ্যারাডের মত লোক দুই দশটা করিয়া প্রতি বৎসর জন্মায়, এমন নহে; সুতরাং সে কথা বলিয়া হা-হুতাশ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। জাতীয় জীবনের পক্ষে ত্রিশ বৎসর, কি ষাটি বৎসর এত অধিক সময় নহে যে, তাহার মধ্যে একটা প্রচণ্ড উন্নতি পরিলক্ষিত হইল না বলিয়া হাল ছাড়িয়া বসিতে হইবে।

যাঁহারা এরূপ আশা করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহারা অন্য নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত হইতে পারেন; কিন্তু বুদ্ধি নামক গুণের জন্য তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে পারি না। যাঁহারা পঞ্চাশ ষাটি বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আমদানির সময়ে একটা কুরুক্ষেত্র ব্যাপার ঘটাইয়া আঠার দিনের মধ্যে ধর্ম্মের রাজ্য সংস্থাপন করিয়া দিব স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আস্ফালনেও কোনরূপ অধীর বা বিচলিত হইবার কারণ ছিল না। ফলে ইংরাজী শিক্ষার প্রচারে আমাদের প্রভূত উন্নতি হয় নাই বলিয়া শোক তাপের কোনও কারণ নাই।

কেহ কেহ হয়ত এই সময়ে চোক রাঙাইয়া বলিবেন, বাতুলের মত এ কি কথা বলিতেছ, ইংরাজী শিক্ষায় আমাদের কোন বিষয়ে প্রচণ্ড উন্নতি হয়

নাই? যখন আমরা ইংরাজী বিদ্যার প্রভাবে স্পষ্টতঃ অন্ধকার হইতে আলোকে উপনীত হইয়াছি, তখন এখনও আঁধার গেল না বলিয়া চীৎকার করা, এবং কেন আঁধার গেল না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বসা, কেবল অন্ধত্বেরই লক্ষণ। দেখ না, আমরা রেলওয়ে খুলিতেছি, সাহেবে কান মলিয়া দিবা মাত্র বিলাতে টেলিগ্রাফ্ পাঠাইতেছি, এমন কি, মদ্যপানের বিষয়ে ইংরাজের অনুকরণ অন্যায়, ইহাও বলিতে আরম্ভ করিয়া স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিতেছি। পুনশ্চ দেখ, সেকালের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে, আমরা এখন পৃথিবীর গোলত্বের প্রতিপাদনার্থ জাহাজের মাস্তুলঘটিত প্রমাণ এক নিশ্বাসে আওড়াইতে পারি; দধি, ক্ষীর অথবা এলকোহলের সমুদ্রের কথা মানি না; কুশ, শাক, প্লক্ষ, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌নামীয় দ্বীপের অস্তিত্ব শুনিলে হাস্য করি; বিকটাকার তেত্রিশ কোটি দেবতার স্থলে এক ঈশ্বরের অনুভব করি; এবং ইংরাজী শিক্ষা সহকারে ইংরাজের রাজনৈতিক ধাত লাভ করিয়া বড় চাকরির সহিত নির্ব্বাচন প্রথাদিও চাহিয়া থাকি।

আমরাও বলি, ঠিক কথা। ইংরাজের প্রদত্ত শিক্ষা হইতে আমরা যে কিছুই লাভ করি নাই, এ একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা কথা। যে ব্যক্তি ইংরাজী শিক্ষা একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে বলিতে চাহেন, আমরা তাঁহার সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত নহি। এবং আশা করি, ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে এইরূপ দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে কখনও পরাঙ্মুখ হইব না। কিন্তু তথাপি—

অর্থাৎ কি না, আমরা শিখিয়াছি অনেক ও পাইয়াছি অনেক; কিন্তু তাহাতে আমাদের বাহ্য ব্যতীত আভ্যন্তরিক উন্নতি বিশেষ কিছু হয় নাই। আমাদের মজ্জা বা শোণিত শোধিত হয় নাই; আমাদের শরীরে বল জন্মায় নাই; আমাদের আত্মার পুষ্টি হয় নাই। এ যেন অস্থিচর্ম্মসার চিররোগীকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখা হইয়াছে। অথবা গলিতনখদন্ত বৃদ্ধকে পরচুলা, রঙ ও কৃত্রিম দন্তের সাহায্যে যুবা সাজাইয়া রঙ্গমঞ্চে নামান হইয়াছে। জীর্ণ, কণ্ঠাগতপ্রাণ রোগীকে কৌটাকতক ব্রাণ্ডি খাওয়াইয়া কিয়ৎকাল তাহার শরীরে অস্বাভাবিক বল সঞ্চয় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে বা তাহার হৃৎস্পন্দন পুনরানয়ন করিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য হিম অঙ্গে উষ্ণতার সঞ্চার করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে স্থায়ী

লাভ কিছুই হয় না। আমাদের পক্ষে এ কতকটা সেইরূপ। আজ যদি ইংরাজেরা চলিয়া যায়, আমরা বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হইয়া বেড়াইব, ছুঁচের অভাবে নরুন বা কাঁটা ব্যবহার করিব, এবং পুনরায় শাকদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপ আওড়াইতে থাকিব। এ সমুদয় সম্পূর্ণ সত্য কথা; সত্য কথা ও পুরাণ কথা; সবিস্তার উল্লেখের প্রয়োজনাভাব।

আমরা জানিয়াছি অনেক ও শিখিয়াছি অনেক; কিন্তু কিরূপে জানিতে হয় ও কিরূপে শিখিতে হয়, তাহা শেখা আবশ্যক বোধ করি নাই। মনুষ্যজাতির জ্ঞানের রাজ্য আমাদের কর্তৃক এক কাঠা, কি এক ছটাক পরিমাণেও বিস্তার লাভ করে নাই।

রাজ্য বিস্তার দূরের কথা; কিরূপে নিজের পরিচিত সীমানা পার হইয়া পা ফেলিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, আমাদের সাহসেও কুলায় না। রাজ্য অধিকারার্থ কি কি অস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়, তাহার কতকগুলার নাম কণ্ঠস্থ করিয়াছি বটে; কিন্তু কখনও তাহা চক্ষে দেখি নাই। আমাদিগকে না চালাইলে আমরা চলিতে পারি না, আমাদিগকে পথ না দেখাইয়া দিলে আমরা পথ চিনিয়া লইতে পারি না; আমাদের নিজের হাত পায়ের উপর নিজের কর্তৃত্ব নাই; আমাদের জীবনীশক্তির মাত্রা শূন্য। আমরা সোলার সিপাই; তার টানিলে আমাদের হাতের ঢাল তলোয়ার নড়িতে থাকে; আমরা ছেলেদের খেলানার ব্যাঙ্‌; পেট টিপিলে আমরা কক্‌ কক্‌ করি।

অবশ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা এক হিসাবে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি; কিন্তু একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিলে সেই বা কতটুকু? কতকটা আমরা একত্ব লাভ করিয়াছি, সন্দেহ নাই; কিছু দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালী ও মান্দ্রাজী, মার্হাট্টা ও শিখ, এক কার্য্যের জন্য একাসনে বসিবে, ইহা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এখন সম্ভব হইয়াছে, ইহা কতকটা ইংরাজী শিক্ষার গুণে সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেকটা আবার ইংরাজী শাসনের গুণে ও অন্য পাঁচটা কারণে। এবং এই একত্ব সাধনেও আমাদের চরিত্রের দুর্ব্বলতা, লঘুতা, ও তত্ত্বহীনতা অনেকটা অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার গুণে আমরা এই জাতীয় চরিত্রের এই হীনতাটা দেখিতে শিখিয়াছি, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি; কিরূপে হীনতা শোধন করিতে হইবে, তাহা শিখি নাই। তবে ভবিষ্যতে ইংরাজী শিক্ষা, ইংরাজের পায়ের বুট ও আমাদের

রুগ্ন প্লীহা, এতদুভয়ের সাহায্য লাভ করিয়া কতকটা চরিত্র শোধনের পথ দেখাইয়া দিতেও পারে।

আর জ্ঞানার্জ্জনের কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা শিখিয়াছি অনেক। টিটিকাকা টিম্বক্‌টুর ভৌগোলিক বৃত্তান্ত হইতে অক্সিজেন, ক্লোরীন, আর ইলেক্‌ট্রিসিটি ও ঈথর, অনেক কথা শিখিয়াছি, যাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। আমরা বড় বড় আঁক কষিতে পারি, যাহা ভাস্করাচার্য্যের মাথায় কখনও আসে নাই; বায়ুমধ্যে শব্দের বেগ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া নিউটন কিরূপে ভুল করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা অক্লেশে বলিয়া দিতে পারি। এমন কি, বোতলের ভিতর হাইড্রোজেন পুরিয়া নির্ভয়ে আওয়াজ করিতেও সমর্থ হইয়াছি।

সুতরাং আমরা ইংরাজের প্রসাদে শিখিয়াছি যথেষ্ট; এমন কি, আমাদের শিখিবার শক্তি কত গভীর, এ পর্য্যন্ত তাহা কেহ মানরজ্জু ফেলিয়া নির্ণয় করিতে পারিল না। কিন্তু হায়! আমাদের গড়িবার শক্তি কই, আমাদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় কোথায়! আমরা শোনা কথা ও শেখা কথা ভিন্ন জগতে নূতন কথা কি বলিলাম! উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় ত কিছুই দেখি না, এবং আরও কিছু দিনের মধ্যে যে পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহারও কোন শুভ লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না। ইংরাজী শিক্ষার কি এই পরিণাম?

আমরা গুরু উপদেশ গ্রহণে অতিশয় মজবুত; সে বিষয়ে আমাদের তুলনীয় কে আছে, জানি না। আমরা বালকের হাতে কর্দ্দম; কাঠিন্য মাত্র বর্জ্জিত। আমাদিগকে লইয়া যাহা গড়িবে, আমরা তাহাতেই পরিণত হইব। আমরা এক দিনের মধ্যে তেত্রিশ কোটি দেবতা ভাঙ্গিয়া একেশ্বরবাদী বা নাস্তিবাদী হইয়া দাঁড়াই, আবার এক বক্তৃতায় আমাদিগকে থিয়সফিষ্ট করিয়া তুলে। আমরা হাতচালা ও ভূত নামান গল্প শুনিয়া উৎকট হাস্যে গৃহপ্রাকার ধ্বনিত করি, আবার পরমুহূর্ত্তে টেলিপ্যাথি বা সাইকিক ফোর্স শুনিলেই আত্মহারা হইয়া গলিয়া যাই।

আমরা বিজ্ঞান শিখিতেছি সত্য; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের ধাতু আমাদের শোণিতে এখনও আসে নাই। বিজ্ঞানের নামে আমরা আটখানা হই; কিন্তু আমরা যাহা শিখি, তাহা মোটের উপর উপবিজ্ঞান বা অপবিজ্ঞান। মানুষের চুল তাড়িতের পরিচালক নহে শুনিবা মাত্র আমরা লম্বা লম্বা টিকি

রাখিতে আরম্ভ করি; এবং চন্দ্রের অবস্থানভেদে জোয়ার ভাটা হয়, পাঠ করিবা মাত্র কোষ্ঠী গণাইতে বসি। এমন শোচনীয় অবস্থা কি হয়!

বস্তুতঃ, বিজ্ঞানের পদ্ধতি যে কি, তাহা আমরা জানি না ও জানা আবশ্যক বোধ করি না। মস্তিষ্কে কতকগুলা মশলা পুরিতে পারি, কিন্তু তাহা সাজাইয়া গোছাইয়া যথাবিন্যস্ত করিবার ক্ষমতা রাখি না। সমগ্রটা একবারে নিরীক্ষণ করিতে না পারিয়া কেবল এক প্রদেশই দেখিতে থাকি ও তাহা হইতে লম্বা চৌড়া সিদ্ধান্তের আবিষ্কার করি। খাইতে পারি, কিন্তু হজম করিবার শক্তি নাই। প্রাকৃতিক নিয়মের অন্বেষণ করিতে গেলে আগে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া চোখের সমক্ষে দাঁড় করাইতে হয় ও পরে সহস্র উপায়ে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, ছেদ করিয়া, জোড়া লাগাইয়া, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া, বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা এক লম্ফে সাগর পার হইতে চাই, সেতু-বন্ধনের অপেক্ষা করিতে পারি না। ডিম হইতে বাহিরিবা মাত্র উড়িতে চাই, পক্ষোদ্ভবের দেরী সহে না। উদ্যমও নাই, অধ্যবসায়ও নাই; ইন্দ্রিয়-গুলিকে সংযত করিয়া বহির্জগতে প্রেরণ করিবার দরকার বোধ করি না; কেবল একবার চকিতের মত দৃষ্টিপাত করিয়া, পরে ধ্যানযোগে বিশাল বিশ্বের কার্য্যপ্রণালীর সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করি। পাদরি সাহেব জাতিভেদের নিন্দা করিলেই আমরা পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলি, আবার রিস্‌লি সাহেব নাক মাপিয়া জাতিভেদের মূল আবিষ্কার করিয়াছেন শুনিলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নেত্র বিস্ফারিত করিয়া থাকি। এমন স্নায়ুহীন পেশীহীন জীব কি আর আছে? ইংরাজী শিক্ষায় আমাদের শতধা উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকতা জন্মিয়াছে স্বীকার করিতে পারি না। দেশী হউক আর বিলাতী হউক, গুরুবাক্য যত দিন আমরা দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করিব, তত দিন আমাদের বৈজ্ঞানিকতার উৎপত্তি সম্ভাবনা নাই।

বিজ্ঞান ছাড়িয়া সাহিত্যক্ষেত্রে, অন্যত্রই বা আমরা কি করিয়াছি? কিছু দিন ইংরাজী ভাষায় চটকদার গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লিখিয়া বাহাদুরী লইবার তৃষ্ণা আমাদের শিক্ষিতদিগকে অভিভূত রাখিয়াছিল। সম্প্রতি সে ভ্রান্তি কতকটা গিয়াছে বলিতে হইবে। তবে আজিও অকারণে ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি জাহির করিতে গেলে হাস্যাস্পদ ও অবজ্ঞাস্পদ হইতে হয় না।

বাঙ্গালা সাহিত্য আমাদের সমাজ কতকটা সরগরম করিয়া রাখিতেছে সত্য। সুখের বিষয় ও আশার বিষয়। কিন্তু সম্প্রতি বাঙ্গালা সাহিত্যে আছে কি? উপন্যাস ও কাব্য? তাই বা কয়খানা? কাব্যরস আস্বাদনের শক্তি আমাদের কতকটা আছে স্বীকার করি। সৌন্দর্য্যবোধ আমাদের পুরাতন জাতীয় সম্পত্তি। প্রকৃতিতে ও মানবচরিত্রে সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার ক্ষমতায় আমরা কোন কালে বঞ্চিত নহি। পূর্ব্বেও ছিলাম না, এখনও নহি। ইংরাজী শিক্ষা যে এই অনুভূতির মাত্রা বা সূক্ষ্মতা বাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা প্রমাণসাপেক্ষ। তবে ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরাজের চরিত্র এবং পাশ্চাত্যগণের জাতীয় জীবনের ঘটনাবহুল বিচিত্র অদ্ভুত ইতিহাস অনেক অপরিচিত সুন্দর প্রদেশ আমাদের সম্মুখে আনিয়া দিয়াছে; আমরা এখন সেই নূতন ফুলের মধু আহরণে অধিকারী হইয়া কতকটা সৌভাগ্যবান্ হইয়াছি, এই পর্য্যন্ত।

ষাটি বৎসরের ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা ভাঙ্গিতে শিখিয়াছি, গড়িতে শিখি নাই; আমাদের আহারের দ্রব্য বাড়িয়াছে, কিন্তু পরিপাকের শক্তি বাড়ে নাই; আমরা পরের কথার আবৃত্তি করিতে পারি, কিন্তু স্বয়ং বাক্য রচনা করিতে জানি না। আমাদের রাজনৈতিক পরাধীনতা হীন; আমাদের জ্ঞানজীবনে পরাধীনতা শোকাবহ। জ্ঞানালোচনায় আমাদের স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা নাই; আমরা আত্মনির্ভর ও আত্মমর্য্যাদা জানি না।

চিরদিনই কি এমনই ছিল? প্রকৃতই কি আমরা পিতৃপরম্পরাক্রমে পিতৃপিতামহ হইতে এই অস্থিহীন মাংসপিণ্ডবৎ কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছি? বস্তুতই কি আমাদের হীনতা ধাতুগত ও মস্তিষ্কগত? বস্তুতই কি আমরা মানুষ ও বানরের মধ্যগত পর্য্যায়ভুক্ত জীব?

অতীতের ইতিহাস স্মরণ করিয়া নীরবে অশ্রুমোচন যাঁহার অভ্যাস আছে, তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন—না। চিরদিন ত এমন ছিল না। গুরুবাক্যে ভারতবাসীর অমেয় শ্রদ্ধা বিশ্বাস আছে সত্য; এবং সেই আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা কখন কখন জ্ঞানবৃদ্ধির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাও সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন ভারতে জ্ঞানান্বেষণ ছিল না, এমন কথা বলিও না; তাহারা জ্ঞানের রাজ্য প্রসারিত করিতে জানিত না, অথবা পুরাতন পরিচিত পরিধির বাহিরে পদক্ষেপ করিতে সেকালের ভারতবাসী সাহস করিত না, এ কথা বলিও না। কিরূপে প্রাচীনকে ধ্বংস করিয়া নূতনের

প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, কিরূপে জীর্ণ কুটীর ভূমিসাৎ করিয়া অট্টালিকা গাঁথিতে হয়, কিরূপে সাহসের সহিত বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত করিয়া জ্ঞানবর্ত্তিকা হস্তে করিয়া অজ্ঞানের তিমিররাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়, সেকালের লোকে জানিত। সাক্ষী—উপনিষদ্, সাংখ্য, বেদান্ত, দশমিক লিপি, চিকিৎসা ও জ্যোতিষ, লীলাবতী, বীজগণিত ও গোলাধ্যায়; সাক্ষী—বুদ্ধ ও শঙ্কর, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্কর, গদাধর ও রঘুনাথ। কত নাম করিব? চক্ষে কি জল আইসে না? লেখনী কি সরে?

দধিসমুদ্র ও ইক্ষুসমুদ্রের কথা তুলিয়া হাসিও না; 'তৈলে পাত্র, কি পাত্রে তৈল' বিতর্কের কথা তুলিয়া বিদ্রূপ করিও না; ঊনবিংশ শতাব্দীর উপার্জ্জিত জ্ঞানের সহিত, সেকালের জ্ঞানের তুলনা করিয়া তাচ্ছিল্য দেখাইও না। মনে রাখিও, সে কোন্ কালের কথা; মনে রাখিও, তখন পৃথিবীর অবস্থা কি ছিল, তখন এ দেশেরই অবস্থা কিরূপ ছিল। নিউটন্ যাহা জানিতেন না, এখন তুমি জান; তথাপি তুমি নিউটনের চরণরেণুর যোগ্য নও, এ কথাও স্মরণ রাখিও। তবে সেকালের মাহাত্ম্য বুঝিবে। অর্জ্জিত জ্ঞানের পরিমাণ লইয়া কথা নহে; জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা ও জ্ঞানার্জ্জন-ক্ষমতা লইয়া কথা। আমরা ইংরাজের নিকট শিখিতেছি; সেকালেও তাহারা পরের কাছে না শিখিত, এমন নহে। গ্রীকের নিকট জ্যোতিষ-শিক্ষা প্রমাণ। তবে বিদেশ হইতে বীজ আমদানি করিয়া তাহার চাষ করিতে জানিত, তাহা ফলাইতে পারিত, আমরা তাহা পারি না। আর যে জ্ঞান স্বাবলম্বনে নিজের চেষ্টায় উপার্জ্জিত হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ ও মাত্রাই কি সামান্য? সে কথা উত্থাপনের প্রয়োজন নাই। সেকালের সহিত এ কালের তুলনা করিও না।

পুরাকালের কাহিনী দূরের কথা, সে দিন মুসলমানী আমলে আমাদের যা ছিল, এখনও তাই আছে কি? মুসলমান রাজার সময়ে আমাদের অবস্থা অতি নিকৃষ্ট ছিল, এখন বড় উন্নত হইয়াছে, এইরূপ একটা কথা গম্ভীরভাবে অনেকে যখন তখন বলিয়া থাকেন। ছি ছি! লোকে যখন কুর্নিশ করিয়া সাত পা পিছাইয়া কাজি সাহেবের সম্মুখে যাইত, যখন ভট্টাচার্য্য লম্বিত শিখা সহ টোলে বসিয়া ন্যায়শাস্ত্রের কচকচি লইয়া কাল কাটাইতেন ও গৃহস্থ ভদ্র পারসীর বয়েদ আবৃত্তি করিয়া মুন্সিয়ানা জানাইত, এবং পাঠশালার গুরু মহাশয় পোড়োদের দ্বারা তামাক সাজাইয়া লইতেন ও উকুন তোলাইতেন,

সেকালের অবস্থা মনে করিতেও আমাদের ঘৃণা আইসে। ছি, ছি, সে-কালের প্রসঙ্গ মুখে আনিও না।

আমরা লজ্জার মাথা খাইয়া তখনকার প্রসঙ্গও উত্থাপিত করিতে চাই, এবং তখনকার ইতিবৃত্ত স্মরণ করিয়া সময়ে সময়ে চোখে হাত দিয়া থাকি। ভট্টাচার্য্যের টোলঘরের পার্শ্বস্থ গোশালা ও ইজার-পরিহিত কাজি সাহেবের মুখে পলাণ্ডুর গন্ধ ভুলিয়া যাই। প্রতাপ ও শিবজী, নানক ও কবির, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও ধর্ম্মক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান দেখিতে পাই। চতুষ্পাঠী-মধ্যে গণিত ও জ্যোতিষ, বেদান্ত ও ন্যায়, কাব্য ও অলঙ্কারের স্বাধীন আলোচনা মনে পড়ে। এ সকল সত্য কথা; ইতিহাসের অপলাপ করিও না। সেকালে যত দুর্দ্দশাই থাক, সজীবতার লক্ষণ ছিল; শত্রুতেও আমাদের মর্য্যাদা করিত, ভয় করিত। এখন কি ?

সুতরাং জ্ঞানার্জ্জনে স্পৃহা ও ক্ষমতা আমাদের কোনও কালে ছিল না, এ কথা বলা সাজিবে না। ইংরাজী বিদ্যার কেহ দোষ দিবে না; সে কথা যে বলিবে, তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেল। তবে সম্প্রতি এ দুরবস্থার কারণ কি ? কারণ অনুসন্ধেয়।

অদৃষ্টদোষেই হউক আর শিক্ষাপ্রণালীর দোষেই হউক, ইংরাজী শিক্ষা ষাটি বৎসরে আমাদের দেশে ফলে নাই। বৎসর বৎসর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদানকালে প্রতিনিধি চ্যান্সেলারের মুখে এই আক্ষেপই শুনা যায়। আমাদের জ্ঞানার্জ্জনে মতিরতি হইল না, জ্ঞান-রসের প্রতি আমাদের তৃষ্ণা জন্মিল না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বৎসর বৎসর হাজার দরুনে গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করিতেছেন, কিন্তু একজনও একখান লাঙ্গল আনিয়া জ্ঞানরাজ্যের এক ছটাক জমিতে চাষ দিল না।

দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ততোধিক দুঃখের বিষয় আর একটা আছে। সরস্বতী যত্নের সহিত কোলে লইয়া তাঁহার বীণা পুস্তক তাঁহার সন্তানগণের হাতে দেন; কিন্তু কৃতী সন্তানেরা মায়ের কোল হইতে নামিবা মাত্র বীণাটি ভাঙ্গিয়া ও পুস্তকখানি বেচিয়া মায়ের সপত্নী লক্ষ্মীদেবীর দাসত্বে নিযুক্ত হয়েন।

জ্ঞানার্জ্জনে শক্তি নাই, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু অর্থোপার্জ্জন জ্ঞানচর্য্যার এক মাত্র উদ্দেশ্য, এ বড় ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষণ বাক্য। এবং সত্য বল দেখি,

ইংরাজী শিক্ষা কি আমাদের সমাজে অর্থোপার্জ্জনের ও জীবিকার্জ্জনের সুগম উপায় মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে ?

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আবির্ভাবকালে যে সকল মহারত্ন সহসা আবির্ভূত হইয়া সমাজকে উল্টাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ের উৎসাহ-বহ্নি শেষ পর্য্যন্ত হাকিমী, উকীলী, কেরাণীগিরি প্রভৃতিতে কথঞ্চিৎ উপশমিত হয়। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত শিক্ষার বলে হাকিম ও উকীল ও কেরাণীতে দেশটা প্লাবিত হইয়া গেল। ফলতঃ মূষিক অতিবৃষ্টি প্রভৃতির ন্যায় গ্রাজুয়েটের অতিসৃষ্টি রাষ্ট্রের পক্ষে একটা ঈতিস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইতেছে। রাজা ব্যস্ত ; ইহাদিগকে লইয়া কি করিবেন ? সমাজ ব্যস্ত, কিরূপে ইহাদের খোরাক যোগাইবে ; বিশ্ববিদ্যালয়-জননীও প্রসূত অপোগণ্ডগুলির সংখ্যাধিক্যে লজ্জিতা ও কাতরা। আমাদের মত যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়-মাতার অকৃতী সন্তান, তাহারাও ভ্রাতৃসংখ্যাধিক্যে ভীত হইয়া সম্বোধন করিয়া ডাকিতেছে,—'সম্বর ! সুভগে, দিনকতক ক্ষান্তি দাও ; এ যদুকুল আর বাড়াইয়া ফল কি ! আমাদের খোরাকের কিছু আধার হউন ! শেষে ভূভার হরণের জন্য অবতারের প্রয়োজন যেন না হয় ! জননি, উকীল-প্রসবিনি, উকীলের আর স্থান নাই মা।'

অন্য দেশে কি অবস্থা, জানি না ; কিন্তু সম্প্রতি ভারতবর্ষে লোকে জীবিকার্জ্জনের পন্থা শিখিবার জন্য বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ লাভ করে। এবং ইহাও একটা লোমহর্ষণ সত্য কথা, যে ব্যক্তি বিদ্যামন্দির হইতে বাহির হইয়া অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ না হইল, তাহার জীবন নিরর্থক বলিয়া বিবেচিত হয়। সমাজ তাহাকে অবজ্ঞা করে, তাহার আত্মীয় স্বজন তাহাকে টিট্‌কারি দেয় ; সে দুষ্কৃতকারীর মত মুখ ঢাকিয়া লোকসমাজে বেড়ায় ; তাহার জীবনে ভারবোধ হয়। সে অক্ষম ও ভাগ্যহীন, সংসারমধ্যে সে দয়ার পাত্র।

বিদ্যার এইরূপ লাঞ্ছনা দেখিয়া গাত্রে লোমাঞ্চ জন্মে : ভবিষ্যতের জন্য কোন আশা থাকে না, সমাজের অধঃপতন দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইংরাজ অনেক আশায় ভারতবাসীর মূর্খত্ব অপনোদনের জন্য বিদ্যা বিতরণ করিতেছেন ; কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত অমূল্য রত্নের কি এই মূল্য ? বানরের গলায় মুক্তার হার শোভা পায় না ; ভারতবর্ষের বিদ্যা-মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেল।

ভারতবর্ষের, অর্থাৎ যে দেশের মধ্যে এক সুবৃহৎ মানবসম্প্রদায় অতি প্রাচীন কাল হইতে কেবল জ্ঞানার্জ্জনের জন্য ধনলালসা ও ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া চিরজীবন পর্ণকুটীর ও শাকান্ন লইয়া তৃপ্ত থাকিত। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ভারতের ব্রাহ্মণের জীবনের ব্রত ছিল। তাহার কোষে অর্থ ছিল না, তাহার হস্তে তরবারি ছিল না; অধ্যয়ন ও অধ্যাপন মাত্র ব্রত করিয়া সে জীবনের সমুদয় ভোগাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়াছিল; এবং এই গরীয়ান্ স্বার্থ-সংহারের জন্য সমাজ তাহাকে শীর্ষ স্থানে বসাইয়া পূজা করিত। অদ্যাপি চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণ অধ্যাপক হিন্দুসমাজের শীর্ষ স্থানে দণ্ডায়মান আছেন; কোটিপতির মুকুট-মণ্ডিত মস্তক তাঁহার চরণরেণু স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হয়।

এখনও সেই প্রাচীন কালের পদ্ধতির বিশুদ্ধ ধারা ক্ষীণ স্রোতে এদেশে বহিয়া আসিতেছে। এখনও না কি সিন্ধুতীর ও কৃষ্ণাতীর হইতে শিক্ষার্থী নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীতে ভক্তি মাত্র দক্ষিণা ও উপহার লইয়া শিক্ষকসমীপে উপস্থিত হয়। তাহারা কি শেখে, কি না শেখে, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। কি তাহাদের উদ্দেশ্য, কি তাহাদের আকাঙ্ক্ষা, কিসে তাহাদের তৃপ্তি, কেবল তাহাই দেখিয়া নয়ন সার্থক কর।

ভারতবর্ষের অন্য জাতির কথা জানি না; কিন্তু হিন্দুজাতি জ্ঞানের মর্য্যাদা বুঝে না, ইহা তাহাদের জাতীয় অপকর্ষের পরিচয়, এ কথা বলিতে পারি না। তবে কেন এমন হয়?

কুক্ষণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট শিক্ষিতগণকে বড় চাকরিতে নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; এবং কুক্ষণে অর্থাগমের জন্য ইংরাজী জ্ঞানের দরকার হইয়াছিল। দরিদ্র অন্নার্থী ভারতবাসী অন্নাহরণের এমন সুগম পথ পাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে সেই পথে ছুটিবে, বিচিত্র কি? তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। অন্নচিন্তা মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ; সে জন্য যে দোষ, তাহা দরিদ্র হিন্দু যুবকের নহে; বিশেষতঃ মাসী পিসী ও পিসীত ভগিনীর বিধবা পুত্রবধূর অপোগণ্ড সন্তানগুলির সমবায়ভূত সুবৃহৎ ক্ষুধার্ত্ত হিন্দু-পরিবার যখন সতৃষ্ণ ও সোৎকণ্ঠভাবে কলেজ-যাতায়াতশীল যুবকের আগামী পরীক্ষায় পাশের জন্য উর্দ্ধমুখে তাকাইয়া থাকে। দেশ শুদ্ধ সমুদয় লোককে যে অন্নচিন্তা ও বস্ত্রচিন্তা ত্যাগ করিয়া বাগ্‌দেবীর আরাধনায় নিরত হইতে হইবে, এমন অসঙ্গত প্রার্থনা করিতে পার না, এবং কলেজ হইতে বাহির হইবা মাত্র

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হিন্দু যুবকের চক্ষের সম্মুখে অকস্মাৎ বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধা মাতার শুষ্ক অক্ষম ও কঙ্কালাবশেষ শরীর শুশ্রূষার্থী হইয়া উপস্থিত হয়, ও বাল্যে বিবাহিতা পত্নী তিন চারিটি শিশু সন্তান সহ অন্নার্থিনী হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিতে থাকে, এই ব্যাপারের জন্য মনুষ্যচরিত্র ও সমাজ-চরিত্রকে দায়ী করিতে পার ; হিন্দু যুবককে দায়ী করিতে গেলে বড় নিষ্ঠুরতা হইবে।

বিলাতী শিক্ষার সহকারে বিলাতী সভ্যতার নিয়ম এদেশে উপস্থিত হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংসার খরচের মাত্রাটা অযথা পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছে; সেটাও বিবেচনা করা উচিত। চটি জুতা ও তালপাতের ছাতা মাত্র সম্বল করিয়া, এমন কি, সেনেট হাউসে পদার্পণ করাও বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নহে ; এবং উত্তরীয় মাত্র স্কন্ধে করিয়া সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে বেত্রাঘাতের আশঙ্কা থাকিয়া যায়। জলের গেলাস মুখে তুলিবার সময় ফিল্‌টার-করা না থাকিলে ব্যাসিলাসের অবস্থিতির শঙ্কা জন্মে, এবং দেহে ব্যাধি ঘটিলে কবিরাজ মহাশয়ের প্রাচীন কফপিত্তঘটিত প্যাথলজির আশ্রয় লইতে সাহস হয় না। সুতরাং জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী থাকিলেও কিঞ্চিৎ অর্থাগমের উপায় না দেখিলে চলে না ; এবং ভিক্ষা ও চাকরি ভিন্ন অর্থাগমের তৃতীয় পন্থা এদেশে বর্ত্তমান নাই।

একটা কথা উঠিয়াছে, ভাল ছেলেদের জন্য বড়লোকে যদি বৃত্তি সংস্থাপন করিয়া দেন, তাহা হইলে ভাল ভাল মাথা হাইকোর্টের গ্রানিট দেওয়ালের আশ্রয় লইতে না যাইতে পারে। উত্তম প্রস্তাব সন্দেহ নাই, কিন্তু যে পর্য্যন্ত লাটবাহাদুরগণের শুভ বিদায় উপলক্ষ্যে প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপন দ্বারা পুণ্য সঞ্চয়ের সম্ভাবনা থাকিবে, তত দিন এ প্রস্তাব অরণ্যে রোদন মাত্র !

গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিভাগে দেশীয়দিগকে মোটা বেতনে চাকরি দেন না, এই একটা আক্ষেপ আছে। কথাটা ঠিক আমাদের মত ভিক্ষোপজীবীর উপযুক্ত, সুতরাং প্রথমে উপস্থিত করিতে লজ্জা হয়। কিন্তু অদৃষ্টবশে যখন ভিক্ষাবৃত্তি আমাদের উপজীব্য এবং ইংরাজী বিদ্যাটাই আমরা পরের কাছে ভিক্ষাস্বরূপ গ্রহণ করিতেছি, তখন আর লজ্জা করিয়া কোন লাভ নাই। গবর্ণমেণ্টের উপর কতকটা দাবীও আছে। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিভাগে নিয়োগার্থ বিলাত হইতে যে সকল মূর্ত্তি আমদানি করেন, অনেক স্থলে তাঁহাদের দ্বিপদত্বে সন্দেহ জন্মে। কৃষিকার্য্যের জন্য এদেশে গরু ও বিলাতে

ঘোড়া ব্যবহৃত হয়। বিলাত হইতে ঘোড়া আমদানি করিয়া চাষে লাগাইলে হয়ত এখানে লাভ ঘটিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া বিলাতী গাধা কি হিসাবে দেশী গরুকে পদচ্যুত করিবে, বুঝিতে পারি না।

আমাদের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত শিক্ষাপ্রণালীর মূলে দোষ বর্ত্তমান আছে। এই মূলস্থ দোষের সংস্কার সাধন না হইলে কোনরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত শিক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভ না দেখিয়া প্রাচীনের দল পুনরায় টোলে প্রবেশ করিয়া অমরকোষ মুখস্থ করিতে উপদেশ দিতেছেন; এবং আমাদের ইংরাজ মনিবেরা আমাদের জাতিগত হীনতাকেই কারণ স্থির করিয়া আমাদের মনুষ্যজাতীয়ত্বে কিছু সন্দিহান হইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় আমাদের জাতির মনুষ্যধর্ম্মে সংশয় স্থাপনের সম্যক্ কারণ এখনও উপস্থিত হয় নাই; এবং দেশী পুঁথি-গুলির বহুল প্রচারের জন্য ইংরাজী গ্রন্থগুলির উপর আমদানি মাশুল বসাইবার প্রস্তাবনা করিলেও ভবিষ্যতের আশা আছে। দোষ ইংরাজী বিদ্যার ত কখনই নহে; এবং আমাদের জাতীয় চরিত্রেরও সম্পূর্ণ পরিমাণে নহে; বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহাতে বিদ্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সেই প্রণালীর সংস্কারের একবার চেষ্টা করা উচিত। কোন্ দিকে সংস্কার চলিতে পারে, এ প্রবন্ধে উত্থাপন করিতে সাহসী হইলাম না। যদি কোন পাঠক নিতান্ত করুণাপরবশ হইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের এত দূর পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহার সহিষ্ণুতাকে ধন্যবাদ দিয়া এই প্রবন্ধের এই স্থলে উপসংহার করিলাম। ('সাহিত্য,' শ্রাবণ ১৩০২)

সাহিত্য-কথা

কৃষ্ণকান্তের উইল যখন প্রথমে পড়িয়াছিলাম, তখন ঐ কাব্যের সহিত ম্যাক্‌বেথের একটা সাদৃশ্যবোধ মনের মধ্যে আসিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই সাদৃশ্যের অনুভবটা মনের মধ্য হইতে লুপ্ত হয় নাই, বরং আস্তে আস্তে কাটিয়া বসিয়াছে। আমার সেই অনুভূতির পক্ষে বিশেষ কিছু যুক্তি আছে কি না জানি না; এবং কাব্য-সমালোচকের ও সাহিত্য-সমালোচকের বিশ্লেষণী দৃষ্টির নিকট উত্তীর্ণ হইয়া তাহা উপহাস্য হইবে না, এরূপ সাহসও আমার নাই। অধিকন্তু ব্যক্তিবিশেষের মনের একটা ভাব সাধারণ পাঠকের উপর নিক্ষেপ-চেষ্টা কতকটা আবদার বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। তথাপি পাঠক ও সমালোচক উভয়ের নিকট সভয়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া কথাটা ফুটিয়া বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

কিন্তু বলিতে প্রবৃত্ত হইলেই একটা প্রকাণ্ড তত্ত্বকথা আসিয়া প্রথমে উপস্থিত হয়। সাহিত্য-সমালোচনায় তত্ত্বকথা অনেকে ভালবাসেন না, ও কিঞ্চিৎ শঙ্কা ও বিরাগ ও সন্দেহের সহিত তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করেন। কাব্যমধ্যে তত্ত্বকথার আবিষ্কার দ্বারা আবিষ্কারক মহাশয় সূক্ষ্মদৃষ্টির জন্য হয়ত অনেক জায়গায় প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে এইরূপ তত্ত্বকথার আবিষ্কার সাধারণ পাঠকের প্রতি অত্যাচার ও কাব্য-প্রণেতার প্রতি ঘোরতর নিগ্রহের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। 'কাব্য মাত্রেই একটা তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইবে, এরূপ কোন আইন থাকা উচিত নহে; এবং কাব্য মাত্রেরই অভ্যন্তরে একটা নিগূঢ় তত্ত্ব রাখিতে হইবে, কবিগণও এরূপ কঠিন নিয়মে বাধ্য নহেন।'

একটা উদাহরণ দিয়া এই ভূমিকাটা বিশদ করা যাইতে পারে। একটা বড় গোছেরই উদাহরণ লওয়া যাক। মনে কর মহাকবি কালিদাস। কালিদাস-প্রণীত কাব্যমধ্যে কোন গূঢ় দুর্ভেদ্য দার্শনিক তত্ত্ব গুপ্ত আছে কি না জানি না। কেহ কেহ এইরূপ তত্ত্ব আবিষ্কারে যত্ন করিয়াছেন শুনিয়াছি; কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে পারি না। আমার স্থূল বিবেচনায় কালিদাসের কালিদাসত্ব এরূপ দার্শনিক তত্ত্বের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। সম্পূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টির অভাব সত্ত্বেও কেবল খানিকটা

অনুভূতি মাত্র লইয়া কালিদাসের নিকট উপস্থিত হইলে তৎপ্রদত্ত কাব্যরসের আস্বাদন পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যাইতে পারে। রসপিপাসুর পক্ষে আশাতে বঞ্চিত হইবার কোন কারণ উপস্থিত হয় না ; কেন না, সেখানে তিনি যে রস আস্বাদন করিতে পান, অন্য কোথাও তাহার তুলনা মিলে না। মহাকবির মহিমা দূর হইতে যেমন শুনা যাইত, নিকটে আসিয়া দৃষ্টি করিলেও ঠিক তেমনই অক্ষুণ্ণ থাকে, অথবা আরও বাড়িয়া যায়। 'অন্য কবি হইতে কালিদাসের বিভেদ, তাঁহার সৌন্দর্য্য দৃষ্টিশক্তি বিষয়ে ; তাঁহার সৌন্দর্য্য অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় ও তীব্রতায়, তাঁহার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি সামর্থ্যে। এই বিষয়ে কালিদাস বোধ করি পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়।' পৃথিবীতে যেখানে যে কিছু সৌন্দর্য্য আছে, তাহা তিনি একত্র আনিয়াছেন, এ কথা বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। বিধাতা তৎসৃষ্ট জগতের যেখানে যাহা কিছু সুন্দর, তৎসমুদয়ের অংশ একত্র করিয়া দেখিলে কেমন দেখায়, তাহা দেখিবার লালসায় কালিদাসের উমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; কালিদাসও সেইরূপ জগতের অসীম সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারের মধ্যে যা কিছু সুন্দর, সমস্ত একত্র করিয়া তাহার সমাবেশে কিরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহারই নমুনা আমাদিগের চোখের উপর রাখিয়াছেন। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিলে কালিদাসের ক্ষমতার পরিমাণ হইল না। আর একটা কথা এখানে বলিতে হইবে।

পৃথিবীতে যে স্বভাবতঃই কতকগুলা সুন্দর জিনিস আছে, আর কতকগুলা কুৎসিত জিনিস আছে, এইরূপ নির্দ্দেশ সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত নহে। 'সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব অনেক সময়ে সৌন্দর্য্যভোগীর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে।' অনেক সময়ে কেন, বোধ হয় সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা সৌন্দর্য্যভোগী নিজের ব্যবহারের জন্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া লয়। মনুষ্যবিশেষে এইরূপ একটা ধর্ম্ম বা ক্ষমতা বিদ্যমান আছে ; সেই ধর্ম্মের বা ক্ষমতার এক কথায় অনুরাগ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই অনুরাগের পরিমাণ সকল ব্যক্তিতে সমান পরিমাণে বর্ত্তমান নাই। যাহাতে যে পরিমাণে বর্ত্তমান আছে, সে বাহ্য জগৎকে সেই পরিমাণে সুন্দর দেখে ; বাহ্য জগতে সেই পরিমাণে অনুরক্ত হয়। প্রাচীন দার্শনিকগণের ব্যবহৃত একটি উপমা প্রয়োগ করিলে বলা যাইতে পারে যে, কাচ যেমন স্বভাবতঃ স্বচ্ছ ও বর্ণহীন, কিন্তু জবাফুল তাহার সন্নিধানে আসিয়া তাহাকে আপন আভায় আভাযুক্ত করে ; সেইরূপ বাহ্য জগৎ সর্ব্বতোভাবে ও সম্পূর্ণরূপে স্বভাবতঃ বর্ণহীন ও

রূপবর্জ্জিত; অনুরাগীর চোখে তাহা বিবিধ বর্ণ ও বিচিত্র রূপ প্রকাশ করে। সংসারে সম্পূর্ণ বিরাগী কেহ আছে কি না, জানি না; তবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ও দর্শনশাস্ত্রে সেরূপ বিরাগীর উল্লেখ দেখা যায়। যদি সেরূপ বিরাগী কেহ থাকেন, তবে তাঁহার চক্ষে সুন্দরও কিছু নাই ও কুৎসিতও কিছু নাই। আমাদের মত সাধারণ মনুষ্য সে পর্য্যায়ভুক্ত নহে; আমরা সদাসর্ব্বদা কোন-না-কোন রঙের চশমা পরিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ বিশাল জগতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকি; এবং যখন চশমাখানি যে রঙের থাকে, বাহ্য জগৎটাকেও যেন সেই রঙে রঞ্জিত হইতে দেখি। আমাদের অবস্থা সুখের হইতে পারে, অথবা দুঃখের হইতে পারে, সে কথা স্বতন্ত্র; যেটা প্রকৃত ঘটনা ও প্রকৃত অবস্থা, তাহারই নির্দ্দেশ করিলাম মাত্র। সেই জন্য আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত অনুরাগের প্রভাবে জগতের কতকটা সুন্দর দেখিয়া থাকি ও কতকটা কুৎসিত দেখিতে পাই। বাহ্য জগৎটা সম্পূর্ণ আমারই আত্মগত বটে কি না, সে বিষয়ে বিচার উপস্থিত করা এ প্রবন্ধে বাঞ্ছনীয় নহে; তবে এ অনুরাগটা সম্পূর্ণভাবে আমারই নিজস্ব, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। এবং এই অনুরাগের বশে আমি যে সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করি বা যে বিরূপতা দেখি, সেই সৌন্দর্য্য ও বিরূপতা যে এই হিসাবে আমারই নিজের সৃষ্টি, তাহাও বলা যাইতে পারে।

সুতরাং এই ব্যক্তিগত অনুরাগের মাত্রা অনুসারে জগতে সৌন্দর্য্যের তারতম্য হয়—উহার মাত্রা বাড়ে ও কমে। যাহাদের অভ্যন্তরে অনুরাগের মাত্রা কম, সে সর্ব্বত্র সুন্দর পদার্থ দেখিতে পায় না; হয়ত কুৎসিত পদার্থই দেখে অথবা সকল দ্রব্যই বর্ণহীন অরঞ্জিত অবস্থায় দেখে। আর যাহার ভিতরে অনুরাগের মাত্রা অধিক, সে অন্যের নিকট রূপহীন বা কুৎসিত স্থলেও সৌন্দর্য্যের ও রূপের বিকাশ দেখিতে পায়। অর্থাৎ কি না, সে ব্যক্তি নিজের ব্যবহারের জন্য, নিজের তৃপ্তির জন্য জগতে সৌন্দর্য্যের ও রূপের সৃষ্টি করে। এই হেতু অনুরাগী ব্যক্তি কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের সংগ্রহকারী নহেন; তিনি সৌন্দর্য্যের বিধাতা ও নির্ম্মাতা। আমরা দেখি, মধুকর জাতি মধুর অন্বেষণ ও সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়; কিন্তু জীবতত্ত্ববিদেরা বলেন, মধুকরজাতীয় পতঙ্গ কর্ত্তৃকই ফুলে মধুর সৃষ্টি হইয়াছে। কতকটা সেইরূপে মধুকরোপম অনুরাগী ব্যক্তির চেষ্টায় জগতে সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

'কালিদাস এই শ্রেণীর অনুরক্ত পুরুষ ছিলেন, এবং বোধ করি মনুষ্য জাতি মধ্যে এত বড় অনুরক্ত পুরুষ আর জন্মায় নাই।' অপর সাধারণে যেখানে সৌন্দর্য্য দেখে না, কালিদাস সেখানে সৌন্দর্য্য দেখিতেন : অপরের নিকট যাহা সাদা, কালো অথবা বর্ণহীন, তাঁহার নিকট তাহা রূপবান্ ও রঞ্জিত। এমন করিয়া যেথায় সেথায় সৌন্দর্য্য-উৎপাদন করিতে, জগৎ যুড়িয়া সৌন্দর্য্য ছড়াইতে আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। কালিদাস নিজে সেই সৌন্দর্য্য দেখিতেন ও অপরকে তাহা দেখাইতেন। তিনি আপনার জন্য অপরূপ চশমাখানি তৈয়ার করিয়া অন্যের চোখে তাহা পরাইয়া দিতেন; আর যেন কোন অপূর্ব্ব কুহক অথবা যাদুবিদ্যার প্রভাবে সংসারের চিত্রপটখানা অভিনব আকার ধারণ করিত। তিনি যেখানে চাহিতেন, তখনই তাহা আপনা হইতে সুন্দর হইয়া যাইত। তিনি চাহিবার পূর্ব্বে সেখানে অন্যে রূপের আবির্ভাব দেখিতে পাইত না। অশোক তরু না কি পুষ্পোদগমের জন্য সুন্দরীর নূপুরক্বণিত চরণাঘাতের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে; সেইরূপ নীরস কর্কশ রূপহীন জগৎ সৌন্দর্য্য-পুষ্পের উদ্গমের জন্য কালিদাসের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিত। এমন করিয়া যেখানে সেখানে রূপের উৎপত্তি করিতে আর কেহ পারে নাই। মদস্রাবী হাতীর মত্ত গতিতে, অথবা বৃষভের খুরাস্ফালনে, অথবা হিমগিরিগহ্বর-প্রান্তস্থ কীচকের দূরাগত ধ্বনিতে অন্যে যে পুলক পায় না, কালিদাস তাহা পাইতেন। সায়ংকালে বল্কলপরিহিতা বনসুন্দরীগণ আলবালে জলসেচন আরম্ভ করিলে কেমন সুন্দর দেখায়, সুন্দরীর বদনকমলে কমল ভ্রমে মধুকর আসিয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে তাহাকে লীলাকমলাঘাতে তাড়নার জন্য মৃণালবাহু সঞ্চালিত করিলে কেমন দেখায়, এবং চন্দ্রকর-ধৌত শুদ্ধ স্ফটিক প্রান্তরে দিব্য কুমারীগণ মুক্তা ছড়াইয়া ক্রীড়মানা হইলে কিরূপ সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা আমরা তাঁহার প্রসাদে কতকটা অনুভব করিতে পারি; তবে তাঁহারই মত সেই রসের আকণ্ঠ সম্ভোগের ক্ষমতা আমাদের জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ। জননী বসুমতী কর্ত্তৃক নীয়মানা সীতা, অথবা হেমযজ্ঞোপবীতধারী মুক্তাক্ষমালালঙ্কৃত তেজঃসমষ্টিরূপ সপ্তর্ষির সহচারিণী অরুন্ধতী যখন ভর্ত্তৃচরণে নয়নদ্বয় নিহিত করিয়া অবস্থিতা ছিলেন, তখন কিরূপ মহিমার প্রভা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ইতর মানবে কখন পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিতে সমর্থ হয় নাই।

এই সকল কারণে বলা যাইতে পারে, যদি সৌন্দর্য্যানুভূতি মনুষ্য-প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়, কালিদাস মানুষের মধ্যে মানুষ। জগৎকে যদি সুন্দর দেখিতে চাও, তাঁহার নিকট যাও। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। তত্ত্বকথার অন্বেষণে যাইবার প্রয়োজন নাই।

কবি শব্দের বিবিধ সংজ্ঞা এ পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে কোন্‌টি যে গ্রহণীয়, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। কেহ বলেন—স্বভাবকে যিনি সুন্দর করিয়া তুলেন, সুন্দর করিয়া দেখেন ও সুন্দর করিয়া দেখান, তিনি কবি। কালিদাস এই সংজ্ঞানুসারে মহাকবি। কিন্তু অপরবিধ সংজ্ঞাও বর্ত্তমান আছে। কাহারও মতে যিনি জগতের একখানা যথাযথ স্বাভাবিক চিত্রপট আঁকিয়া দিতে পারেন, তিনিই যথার্থ কবি। অর্থাৎ জগতে সুন্দর ও কুৎসিত, কোমল ও কঠোর, দুইটা ভাগ স্বভাবতঃই বর্ত্তমান আছে; তখন সেই দুইটাকে পাশাপাশি আনিয়া কোনটারই উপর নিজে হইতে রঙ্‌ না ফলাইয়া, তাহাদের যথার্থ আপেক্ষিক পরিমাণের ইতরবিশেষ না করিয়া, আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া দেওয়াই প্রকৃত কবির কাজ। আজকাল কাব্য সমালোচনায় এই স্বাভাবিকতার, ইংরাজীতে যাহাকে realism বলে, ইহারই কতকটা প্রাধান্য দেখা যায়। যাঁহারা realistic কাব্যের প্রিয়, তাঁহারা অতিরঞ্জিত বর্ণনা ভালবাসেন না; কবির কল্পনা ও সৃষ্টি দ্বারা প্রবঞ্চিত হইতে চাহেন না। সংসারটা যেমন ভালয় মন্দয় চলিতেছে, সেইরূপ উহাকে ভালয় মন্দয় চিত্রিত দেখিতে তাঁহারা প্রয়াসী। উপরে জগতের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করা গিয়াছে, তাহাতে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে এই শেষোক্ত মতটার কোনরূপ ভিত্তি পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। যখন জগৎকে সকলে আপন মনের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া দেখে; বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট জগতের রূপ বিভিন্ন; তখন জগতের স্বাভাবিক মূর্ত্তি কিরূপ, তাহা ঠাহর পাই না। যখন মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন জগৎকে আপনি কল্পিত ও সৃষ্ট করিয়া লইয়াছে, তখন এমন একটা মনুষ্যের কল্পনানিরপেক্ষ জগৎ কোথায় আছে যে, তাহার মূর্ত্তিটা আসল রঙে চিত্রিত করিয়া সাধারণের দর্শনার্থে উপস্থিত করিতে হইবে?

সুতরাং কবিকে আপনার কল্পনার আশ্রয় লইতেই হইবে। অর্থাৎ তিনি তাঁহার জগৎকে যেমন নিজে দেখেন, তেমনই ভাবে আঁকিয়া অপরের সম্মুখে স্থাপিত করিতে হইবে। আমাদের তাহাতে লাভ এই যে, আমরা

আমাদের জগতে যেটুকু আপন চেষ্টায় দেখিতে পাইতেছিলাম না, তিনি তাহা দেখাইয়া দেন; আমরা যাহা যে ভাবে দেখিতেছিলাম, তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত করিয়া অন্য ভাবে ও নিজের মত করিয়া দেখান। অর্থাৎ কবি অনেক স্থলে আমাদের চক্ষু ফুটাইয়া দেন; কুত্রাপি আমাদের চোখের উপর যদি কোন ময়লার আবরণ জমিয়া থাকে, তাহা মুছাইয়া দেন, কুত্রাপি বা চোখের উপর একখানা চশমা বা দূরবীন এইরূপ একটা কিছু যন্ত্র ধরিয়া দেন। এই হিসাবে কবি এক রকম ডাক্তার। মানুষের মধ্যে অনেকে রঙ-কানা আছে, শুনা যায়; কিন্তু এই ব্যাধির চিকিৎসা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু কবি এই ব্যাধির প্রকৃত চিকিৎসক। যাহার রঙ দেখিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তিনি তাহাকে রঙ দেখিবার সামর্থ্য দিয়া অনুগৃহীত করেন।

তবে কবি মাত্রেরই কল্পনা যে জগৎকে একই বর্ণে রঞ্জিত করিবে, এমন কি কথা। জগৎকে যে সুন্দরই দেখিতে হইবে, এমন কোন আইন বিধাতা প্রণয়ন করেন নাই এবং কোন ব্যক্তি জগতের কোন অংশকে সুন্দর না দেখিয়া অন্য কোন মূর্ত্তিতে নিরীক্ষণ করে বলিয়া যে তাহাকে মনুষ্যত্বের পদবীতে নিম্নতর সোপানে বসাইতে হইবে, এইরূপও বলা যায় না।

বাহ্য জড় জগতের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বটে; কেন না, উহার সহিত আমাদের নিত্য আদান প্রদান চলিতেছে; আমাদের আত্মা প্রতিনিয়ত উহার সহিত কখন বিরোধ, কখন বা মৈত্রী স্থাপন করিয়া, অর্থাৎ রাজনীতিশাস্ত্রের বিধানমতে সাম-দানাদি চতুর্ব্বিধ উপায়ই অবলম্বন করিয়া, আপনার স্থিতি পুষ্টি ও অভিব্যক্তি সাধন করিয়া লইতেছে। কিন্তু জড়ভাগ ভিন্ন সমগ্র জগতের আর একটা অংশ আছে, যাহার সহিত আমাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ। আমি যে আত্মা নামধেয় পদার্থটুকু লইয়া আপনাকে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, কোন কারণে আমার আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিবেশীতেও তজ্জাতীয় অর্থাৎ আমারই আত্মার সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়া তাহাদিগকেও ঠিক আমারই সমান মনুষ্যপদবীতে স্থান দিই। এবং আমার এই আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিবেশী লইয়া অংশতঃ জড়ধর্ম্মী, অংশতঃ জীবধর্ম্মী ও অংশতঃ মনুষ্যধর্ম্মী—যে একটা সমষ্টির সৃষ্টি করিয়া লইয়াছি, তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ অত্যন্ত অতিরিক্ত পরিমাণে নিকট করিয়া

তুলিয়াছি। বরং অন্ন জল পরিত্যাগ করিয়া দুই দশ দিন কাটাইতে পারি, কিন্তু আমার প্রেতিবেশীকে ত্যাগ করিয়া এক মুহূর্ত্ত যাপন করা আমার পক্ষে নিতান্তই অসাধ্য।

কিন্তু এই সম্বন্ধটা কিরূপ? প্রকৃত কথা যে, এই সম্বন্ধ ত্যাগ করিলে আমার নিজের অস্তিত্বও বুঝি থাকে না। যেখানে অন্ন জল, ফল ফুল, গিরি ও নির্ঝর যথেষ্ট সংখ্যায় বর্ত্তমান আছে; যেখানে মলয় বহে ও পাখী গায়, এমন কি, এলা লতাও চন্দনতরুকে আলিঙ্গন করিয়া রহে ও পুষ্পস্তবকাবনম্রা লতা পবনহিল্লোলে সঞ্চারিণী হয়; সেই স্থানেও আমার সঙ্গিহীন ও প্রতিবেশীহীন জীবন কল্পনায় আনিতে গেলে শরীর বিভীষিকায় রোমাঞ্চিত হইয়া পড়ে। সুতরাং আমার সঙ্গীর সহিত ও প্রতিবেশীর সহিত সম্বন্ধ বড় নিকট। স্নেহ, প্রেম, দয়া, বাৎসল্য প্রভৃতি যাহা কিছু আমাতে মধুর ও যাহা কিছু আমার আত্মার উপজীব্য, সমস্তই সেই সম্বন্ধ হইতে উদ্ভুত; কিন্তু ইহাও কি প্রকৃত নহে যে, হিংসা ও দ্বেষ ও দম্ভ প্রভৃতি অন্য যাহা কিছু আমার আত্মাকে ক্ষুব্ধ, ক্ষুণ্ণ, পীড়িত ও জর্জ্জরিত করে, তাহারও উৎপত্তি সেইখানে? ইহাও কি সত্য নহে যে, সেই সম্বন্ধবশেই আমার শ্রবণ পূর্ণ করিয়া সেই অন্তর্ভেদী তীব্র দুঃখের কোলাহল উঠিতেছে; আমার জ্ঞান-জীবনের প্রথম মুহূর্ত্তেই যাহার আরম্ভ ও শেষ মুহূর্ত্তেই যাহার সমাপ্তি।

হায়, মনুষ্যজাতিমধ্যে এমন সৌভাগ্যশালী কয় জন আছেন, যাঁহাকে সংসারচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে এই দুঃখের আবর্ত্তে পড়িতে হয় নাই! তাঁহার সৌভাগ্যশালী প্রতিবেশী যে সুন্দর জগতের ও সুন্দরী প্রকৃতির রূপরাশি দেখিয়া বিমুগ্ধ রহিয়াছেন, সেই প্রকৃতিকে নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম ও ভীষণ দেখিয়া তিনি আতঙ্কে বিমূঢ় হয়েন নাই।

বস্তুতঃ জগতের এই অংশে উপস্থিত হইয়া উহাকে সুন্দর বলিব, কি ভীষণ বলিব, সহসা স্থির করা দায় হয়। এবং কবিও তাহার যখন যে মূর্ত্তির অনুভব করেন, তখন সেই মূর্ত্তি দেখাইতে বাধ্য হন।

সচরাচর এইটা দেখা যায় যে, কতকগুলি লোক অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যশালী; তাই তাহারা এক রকম স্বচ্ছন্দে আপনার অস্তিত্বটাকে বজায় রাখিয়া ও আপনার আত্মার পুষ্টিসাধন করিয়া চলিয়া গেল। অপর কতকগুলি লোক সেই সৌভাগ্যে বঞ্চিত; তাহারা সংসারের ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া পাক খাইতে খাইতে ম্রিয়মাণ হইয়া মর্দ্দিত হইতে থাকিল। মোটের উপর

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য লইয়া কথা ; কেন যে ইহার অবস্থা উহার অবস্থা হইতে ভিন্ন হইল, তাহার যুক্তি দেখান এক রকম অসাধ্য। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য লইয়া কথা ; কেন না, সর্ব্বদাই দেখা যায়, যেখানে নিতান্ত দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি অবহেলে হাসিয়া খেলিয়া পার হইল, সেখানে যাহার বাহুতে বল আছে ও অন্তরে সাহস আছে, সেও অকস্মাৎ স্খলিতপদ হইয়া দলিত ও পিষ্ট হইতে থাকিল। অবশ্য মানুষের সহজ যুক্তিপ্রিয়তা ও কারণানুসন্ধানপরতা উভয় স্থলেই একটা থিওরি আবিষ্কার করিয়া বসিবে সন্দেহ নাই। যেখানেই "ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয়" এই সংক্ষিপ্ত অথচ রুচিকর নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়, সেইখানেই মানুষে আপনার মনের ভিতর হইতে মনের তৃপ্তিকর একটা থিওরির আবিষ্কার করিতে বসে। কেহ বলে কর্ম্মফল, কেহ বলে অদৃষ্ট, কেহ বলে জন্মান্তর সেই সনাতন নিয়মের ব্যভিচারের কারণ। বলা বাহুল্য, মনুষ্যের আবিষ্কৃত অনেক থিওরি কেবল অজ্ঞানেরই নামান্তর। অথবা অজ্ঞতা প্রচ্ছাদনেরই কৌশল।

আসল ব্যাপারটা কিন্তু গোপন করিবার উপায় নাই। অধার্ম্মিকে জয়ের ঢক্কা নিনাদিত করিয়া অকুতোভয়ে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করে, আর ধার্ম্মিকে মুমূর্ষু হইয়া গুহার অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে, ইহাও যেমন অনেক সময়ে সত্য কথা ; দুর্ব্বলে যেখানে উত্তীর্ণ হয়, সমর্থ সেখানে পতিত হয়, ইহাও সংসারের সেইরূপ একটা লোমহর্ষণ সত্য। এই সত্য তোমাদের প্রিয় ও রুচিকর না হইতে পারে, তোমাদের রুচির সহিত মিলাইবার জন্য ইহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার হয়ত চেষ্টা করিতে পার, অথবা কোন রুচিকর থিওরির দ্বারা ইহার সমর্থনের প্রয়াস পাইতে পার, কিন্তু ইহার অস্তিত্বে সন্দেহ করিও না।

কথাটা সম্পূর্ণ প্রকৃত, কিন্তু তথাপি আমরা আমাদের যুক্তির ও থিওরির অভ্রান্ততা বিষয়ে এমনই সংশয়হীন যে, প্রত্যেকেই এক একটা নৈতিক তুলাদণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া ব্যক্তিবিশেষের নৈতিক বলশালিতার পরিমাণ করিতে বসি। এবং নিক্তিটা অমুক দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে দেখিবা মাত্র অমুক লোকটা এই মাত্রায় পাপিষ্ঠ ও অমুক লোকটা এই পরিমাণে পুণ্যবান্, দ্বিধাহীন চিত্তে ও নিঃসঙ্কোচে রায় প্রকাশ করিয়া থাকি। আমরা মনেও ভাবি না যে, আমরা যে তুলাদণ্ড হাতে লইয়া ওজন করিতে বসিয়াছি, সে তুলাদণ্ডের গঠনে এখনই একটা প্রকাণ্ড ভ্রান্তি রহিয়াছে, যাহা স্থিতিবিজ্ঞানের একান্ত বিরোধী। অথবা সেই দুইটা দ্রব্যের ওজনের তুলনা করিতেছি,

ভ্রান্তিবশে তাহার একটাকে জলের ভিতর মগ্ন করিয়া রাখিয়াছি ও আর একটা হাওয়ায় রাখিয়া দিয়াছি। অথবা হয়ত কোন দিক্ হইতে আমার অজ্ঞাতসারে বায়ুপ্রবাহ আসিয়া নিক্তির একটা পাল্লাকে উত্তোলিত করিয়া দিতেছে। এইরূপ বিচারপ্রণালী দ্বারা মনুষ্যের পুরস্কার বিধান ও দণ্ড নির্দ্দেশ দেখিয়া দুঃখও হয়, হাসিও পায়।

ফলে অমুক ব্যক্তি মেরুদণ্ড নমিত করিয়া যাইতেছে দেখিয়া একেবারে সিদ্ধান্ত করিও না যে, উহার আভ্যন্তরিক আত্মগত পাপের বোঝা উহার ভারকেন্দ্রকে নামাইয়া দিয়াছে, এবং অমুক ব্যক্তি লঘুপদক্ষেপে উড়িয়া উড়িয়া চলিতেছে দেখিয়া স্থির করিও না যে, পুণ্যাত্মতার হাইড্রোজেন বাষ্প উহার দেহরূপ বেলুনখানি স্ফীত করিয়া রাখিয়াছে। মনে রাখিও, মনুষ্যের ভাগ্য নামক একটা অনির্দ্দেশ্য অনিরূপ্য কিছু আছে, প্রাক্তন বা অদৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে যাহার সম্বন্ধে জ্ঞানের মাত্রা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না, সেই পদার্থটা হয়ত অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ তুলা-বিভ্রাটের জন্য দায়ী।

এই প্রবন্ধের আরম্ভে যে তত্ত্বকথাটার উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে একটু পরিস্ফুট হইয়া থাকিবে। সাহিত্যের মহাকবিগণ মধ্যে যাঁহারা নৈতিক জগতের এই অংশটা লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তাঁহারা এই তত্ত্বকথাটা পরিষ্কার করিয়া বলেন। নীতি-প্রচারক ও শাস্ত্রকার ও সমাজ-বিধাতার দলে যে কথাটা গোপন করিয়া মনুষ্য-সমাজের চোখে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিতে চাহেন, মহাকবিগণ সেই কথাটাই খুলিয়া বলেন এবং সত্যবাদিতা যদি প্রশংসনীয় হয়, তবে সেই প্রশংসা এই শ্রেণীর মহাকবিগণের প্রাপ্য।

কথাটা এই, যে ব্যক্তি আপনার ভাগ্যদোষে নিগৃহীত ও লজ্জিত ও মনুষ্যত্বের উচ্চ পদবী হইতে অবনমিত হইয়াছে, তাহার উপর আবার সমালোচনার তীব্র বাণ নিক্ষেপ কতকটা হৃদয়হীনতার কাজ। তাহার নিজের দুর্ব্বলতা বা নিজের হীনতা তাহার এই অবনতির জন্য একেবারে দায়ী নহে, তাহা বলিতেছি না, তবে কি না উপরে ভাগ্য বলিয়া যাহার নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, সেই ভাগ্যের উপর তাহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব নাই, ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য। সে আপন ভাগ্যের বিধাতা আপনি নহে, অথবা কতক পরিমাণে হইলেও সম্পূর্ণ পরিমাণে নহে। জগতের কোন বিধানকর্ত্তা স্বাভাবিক ক্রূরতার বশে নিরীহ জীবকে লইয়া খেলা করিতেছেন ও আমোদ দেখিতেছেন, এরূপ মীমাংসারও এ স্থলে অবতারণা নিষ্প্রয়োজন।

তাহার সেই ভাগ্যের বিধাতা কোন ব্যক্তিবিশেষ নহে; হয়ত তাহার পিতা মাতা, তাহার পূর্ব্বপুরুষ, তাহার প্রতিবেশীবর্গ অথবা তাহার পরিবেষ্টনকারী সমগ্র জগৎ তাহার ভাগ্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তাহার প্রধান দোষ এই যে, তাহার শরীরে এমন বল নাই যে, সে এই বাহির হইতে আপতিত প্রচণ্ড শক্তির প্রতিকূলে দাঁড়াইতে সমর্থ হয়। অথবা পিচ্ছিল পথে চলিতে যেরূপ সাবধানতা আবশ্যক, সে হয়ত তত দূর সাবধান হয় নাই। সে হয়ত জানিত না যে, পিছন হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে একটা অপরিচিত ধাক্কা আসিয়া তাহাকে ভূমিশায়ী করিবে। এরূপ স্থলে তাহার অধঃপতনের ফলভাগী অবশ্য সে নিজে; প্রকৃতির নিয়মই এই এবং প্রকৃতির বিচারই এই। তাহাতে হা-হুতাশ করিয়া কোন ফল নাই। তোমরা কিন্তু তাহার অধঃপতনে কৌতুক করিও না। কেন না, তোমরাও মনুষ্য, এবং কে বলিতে পারে যে, তোমার অবস্থাও এক দিন উহারই মত শোচনীয় হইতে পারিবে না।

দুঃখাতপদগ্ধ সংসারক্ষেত্রে সমালোচনা অপেক্ষা সহানুভূতি ও সহৃদয়তার অভাব অধিকতর অনুভূত হয়। দৈবযোগে কোন বৎসর বৃষ্টি না হইলে কৃষকে জলাশয় সেচিয়া ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা রক্ষার চেষ্টা করে। প্রকৃতি যেখানে নিষ্করুণা ও সংসার যেখানে ঊষর মরুভূমি, সেখানে মানুষে কি আপনার হৃদয় হইতে স্নেহের বারি ও শান্তির বারি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও বর্ষণ করিতে পারে না?

আমরা যাহাদিগকে মহাপাপী নামে নির্দ্দেশ করিয়া ঘৃণার সহিত তাহাদের সঙ্গ পরিহার করিয়া যাই, তাহারা যে প্রকৃতপক্ষেই তোমা আমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব, তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। হয়ত তাহাদের ভিতরে যে পরিমাণে মনুষ্যত্ব বর্ত্তমান আছে, তাহা তোমাকে আমাকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিলেও মিলিবে না। তাহারা অদৃষ্টদোষে ঘটনার চক্রাবর্ত্তে পড়িয়া ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে ও নিম্ন হইতে নিম্নতর প্রদেশে ক্রমেই পতিত হইয়াছে; আর আমরা সৌভাগ্যক্রমে সোজা দাঁড়াইয়া ধরাপৃষ্ঠে পা ফেলিয়া ফেলিয়া চলিতেছি। উভয়ের অবস্থাগত বিভেদের স্থলে মোটামুটি সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এই দুটি বিদ্যমান আছে। ঠিক তাহাদেরই মত ঘটনাচক্রে পড়িলে আমাদেরই অবস্থা কি হইত, তাহা সহসা বলা চলে না। নিজের

সৌভাগ্যের জন্য অহঙ্কার করিও না, অথবা অপরের দুর্ভাগ্য দেখিয়া পরিহাস করিও না। এবং তাহার জন্য কুম্ভীপাকের ব্যবস্থা হইয়াছে ও নিজের জন্য নন্দনকানন প্রবেশের টিকিট খরিদ করা আছে, ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না। বরং তাহার অবস্থাদৃষ্টে সাবধানতা শিক্ষা করিবার জন্য উদ্যোগী হও।

মাতৃগর্ভ হইতে ম্যাক্‌বেথ অসময়েও কতকটা অস্বাভাবিকরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন কথিত আছে। কিন্তু ঠিক যে একটা সয়তান বা পিশাচের অবতাররূপেই ভূমিষ্ঠ হয়েন, তাহার সম্যক্ প্রমাণ নাই। পিশাচের অবতার ধরাতলে অবতীর্ণ না হয় এমন নহে, এবং শিবারাব ও উল্কাবৃষ্টি সকল সময়ে সকল পিশাচাবতারের অবতরণ ব্যাপার সূচনা করে না। ম্যাক্‌বেথের সহিত যখন আমাদের প্রথম পরিচয় হয়, তখন যে সে নিতান্ত মন্দ লোক ছিল এমন নহে। অন্ততঃ তোমার আমার অপেক্ষা যে মন্দ লোক ছিল, তাহার প্রমাণাভাব। অন্তরের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে, নিজের ও অপরের চক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে, কোন না কোন স্থানে একটু দুর্ব্বলতা অবস্থিত ছিল বটে, এবং সেই দুর্ব্বলতাই শেষ পর্য্যন্ত তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল স্বীকার করি, কিন্তু সমগ্র মজ্জা ও সমগ্র ধাতু ব্যাপিয়া এমন কিছু ছিল না, যাহাতে তাহাকে মনুষ্যশ্রেণীতে না ফেলিয়া উপদেবতা-শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে। আকিলীসেরও না কি গুল্‌ফের কোথায় একটু দুর্ব্বল স্থান ছিল, যেখানে পারিস-নিক্ষিপ্ত শর প্রবেশলাভ করিয়া প্রাণত্যাগের কারণ হয়। এইরূপ ছিদ্র বা রন্ধ্র সুদৃঢ়তম দুর্গপ্রাকার অনুসন্ধান করিলেও মিলিয়া থাকে। সুতরাং ম্যাক্‌বেথ সাধারণ মনুষ্য-শ্রেণীর বাহিরে ছিলেন না। অথচ এই সামান্য রন্ধ্রপথে পাপ প্রবেশ করিয়া বেচারার কি পরিণাম ঘটাইল। নিষধরাজ নলের শরীরে প্রবেশের জন্য কোন দেবতা না কি বহু কাল ধরিয়া রন্ধ্রান্বেষণে তৎপর ছিলেন; তার পর এক দিন ঘটনাক্রমে লব্ধমার্গ হইয়া মহান্ অনর্থপাত উপস্থিত করেন ও নিরীহ রাজা মহাশয়ের দুর্গতির একশেষ করিয়াছিলেন। ম্যাক্‌বেথেরও অবস্থা সেইরূপ। ম্যাক্‌বেথের মনে কোথায় একটু ছিদ্র ছিল, কেহ এত দিন দেখিতে পায় নাই, তিনি স্বয়ং তাহার অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না। কিন্তু দুরন্ত দেবতা তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে যেন পূর্ব্ব হইতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়া বহু আয়াসে সেই ছিদ্রটি খুঁজিয়া লইল।

গুরুগম্ভীর ভাবে ম্যাক্‌বেথের সমালোচনায় অথবা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইবার আমার অভিরুচি নাই। সমালোচনা ও বিশ্লেষণের অসদ্ভাবের জন্য ম্যাক্‌বেথস্রষ্টা মহাকবির প্রেতাত্মাকে কখন নিঃশ্বাস ফেলিতে হইবে না। আমার এই প্রস্তাব অবতারণার উদ্দেশ্য এই পর্য্যন্ত যে মহাকবি এই স্থলে একটা সংসারের সত্য কথা নির্ভীকচিত্তে বলিয়া ফেলিয়াছেন। নীতিকার ও শাস্ত্রকার যে কথাটা স্পষ্ট বলিতে সাহস করেন না বা অন্যে বলিলে চোখ রাঙ্গাইয়া ভয় দেখান, মহাকবি সেই কথা অকুতোভয়ে বলিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এই অর্থে মহাকবির স্থান নীতিকার ও শাস্ত্র-কারের উপরে। সাধারণ মনুষ্যেও তাহা স্বীকার করে ; বিশেষ ওকালতির দরকার করে না।

পদার্থ-বিদ্যার অন্তর্গত গতিবিজ্ঞানে একটা সিদ্ধান্ত আছে যে, সময়-মত থাকিয়া থাকিয়া একটু একটু ধাক্কা দিলে হিমাচলের মত প্রকাণ্ড পদার্থটাকেও কাঁপাইতে বা ধরাশায়ী করা যাইতে পারে। কৈলাস-পর্ব্বত তুলিবার জন্য রাবণের এবং গন্ধমাদন উত্তোলনের জন্য হনুমানের মত মহাবীরের দরকার হইয়াছিল। কিন্তু পদার্থ-বিদ্যার পেণ্ডুলম্‌তত্ত্ব অবগত থাকিলে পঞ্চবর্ষবয়স্ক বালকেও এই প্রকাণ্ড ব্যাপারটা সহজেই সম্পন্ন করিয়া ফেলিতে পারিত। মনস্তত্ত্ববিদের ভ্রূকুটিভয় সত্ত্বেও আমি মনুষ্যের চিত্তটাকে একটা সুবৃহৎ মস্কো নগরের ঘণ্টার মত পদার্থ বলিতে চাহি। অর্থাৎ অনেক সময়ে বাহ্য শক্তি প্রভূত পরিমাণে বল প্রয়োগ করিয়াও মানুষের অন্তঃকরণকে স্থানভ্রষ্ট ও বিচলিত করিতে পারে না ; আবার অতি মৃদু পবন-হিল্লোল যদি সময়মত আসিয়া আস্তে আস্তে ছোট ছোট ধাক্কা দেয়, তাহা হইলে ঘণ্টাটা বেগে আন্দোলিত হইয়া দিগন্ত নিনাদিত করিয়া তুলিতে পারে। কোন কোন মহাকায় অর্ণবযান বড় বড় ঝটিকার বেগ অতিক্রম করিয়া সামান্য হাওয়ায় জলমগ্ন হয়। আবার উত্তাল তরঙ্গমালার উপর সের কতক কেরোসিন ঢালিয়াও তাহাদের ক্ষোভ প্রশমিত হইতে দেখা যায়। মানুষের মনও কতকটা সেইরূপ। যখন টলে না, তখন টলে না, আবার সময়ে অসময়ে অতি সামান্য কারণ উপরি উপরি ঘটিতে থাকিলে সাম্যাবস্থাচ্যুত হইয়া কোথায় পড়ে কে জানে।

ম্যাক্‌বেথ যখন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বীরদর্পে ও রাজপ্রসাদাশয়ে স্ফীত হইয়া ফিরিতেছিলেন, ঠিক এমনই সময়ে তাঁহার মনের ছিদ্রটা একটু এমনি

অসতর্কভাবে আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, শয়তানের অনুচরীগুলা ঠিক সময় বুঝিয়া একটা কুয়াশা ও দুর্দ্দিনের সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতির মুখখানা আঁধার করিয়া ফেলিল। এবং সেই আঁধারের সময় সুযোগ বুঝিয়া দুই চারিটা প্ররোচনা দ্বারা ছিদ্র-পথটা আর একটু প্রসারিত করিয়া দিল। ঠিক তদবধি ঘটনার পর ঘটনার ধাক্কা সময়মত আসিয়া বেচারীর চিত্তকে একেবারে ক্ষুব্ধ ও আন্দোলিত করিয়া দিল। শেষের আন্দোলনটার বেগ এতখানি বাড়িয়া গেল যে, বেচারী আর ফিরিয়া স্বস্থানে আসিতে পারিল না; একেবারে উল্টাইয়া পড়িল। তখন আর আশা নাই। হিমাচলের প্রস্থদেশে গভীর ফাটগুলা হাঁ করিয়া থাকে; উপরে পর্য্যটকের একবার পদস্খলন হইলে আর নিস্তার থাকে না। সেইরূপ একবার যখন পদস্খলন হইল, তখন অধোগতি রোধ করে কাহার সাধ্য? শয়তানের অনুচরেরা মানুষকে সর্ব্বদাই ফেলিয়া দিবার চেষ্টায় আছে; কিন্তু হায়, শয়তান যাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী, সেই ঠাকুরটি তখন নিজের অনুচর প্রেরণ করিয়া হতভাগ্যকে অধঃপতন হইতে রক্ষা কর্ত্তব্য বোধ করেন না।

ঠিক এই হিসাবে আমাদের কৃষ্ণকান্তের উইল ম্যাক্‌বেথের সহিত তুলনীয়। শেষ অধ্যায়ে কৃষ্ণকান্তের উইলের নায়ককে আমরা পাপের মূর্ত্তিমান্ অবতার স্বরূপে দেখিতে পাই। এমন কি, আমাদের অর্থাৎ সমালোচক সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন ব্যক্তি খুবই অল্প আছেন, যিনি নিঃসঙ্কোচে ও নির্ঘৃণভাবে তদবস্থ গোবিন্দলালের সঙ্গে দাঁড়াইয়া দুটা মিষ্ট কথা কহিতে সাহস করিতে পারেন। যদি গোবিন্দলালের সঙ্গে কলিকাতার রাস্তায় ঘটনাক্রমে আমাদের চোখোচোখি হয়, তৎক্ষণাৎ আমরা ঘৃণায় চোখ ফিরাইয়া চলিয়া যাই। হয়ত পূর্ব্বে এক সময় ছিল, যখন গোবিন্দলালের বৈঠকখানায় প্রত্যহ বিনা নিমন্ত্রণে হাজির হইয়া তিন ঘণ্টা ধরিয়া তাস পিটিয়া আসিতাম, এবং বুড়া কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধের সময় লুচি মণ্ডার যথেষ্ট সদগতি করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু এখন দৈবক্রমে দেখা হইলে তাঁহাকে দুইটা কায়িক কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেও সঙ্কোচ হয়। কি জানি, অপরে পাছে দেখিয়া ফেলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অধঃপতনের আরম্ভে গোবিন্দলালে যে পরিমাণ মনুষ্যত্ব ছিল, তোমাতে আমাতে ঠিক ততখানি বর্ত্তমান আছে কি না সন্দেহ। এবং এমন কি প্রমাণ পাইয়াছ যে, তাহার সেই মনুষ্যত্ব একবারে পশুত্ব বা পিশাচত্বে পরিণত হইয়াছে। গোবিন্দলালকে দেবতা বলিয়া পূজা বা

অনুকরণ করিতে বলিতেছি না; তবে তাহার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তোমার আমার ভাগ্যেও যে কখন ঘটিতে না পারে, এমন বিশ্বাসের কারণ নাই। এবং তাহার অধঃপতনের কারণই বা কি? অনুসন্ধানে দেখা যায়—তাহার দয়া, তাহার পরোপকারবৃত্তিও আর একটু সামান্য ছিদ্র মাত্র, যে ছিদ্রপথে দেবতাবিশেষ অব্যর্থ শর প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাবিয়া বুঝা উচিত যে, সেই দেবতার নিকট শার্দ্দূল-চর্ম্ম ব্যবধানবর্তী দেবদারুদ্রুম-বেদিকায় উপবিষ্ট সংযমিশ্রেষ্ঠও সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ পান নাই। সুতরাং সুযোগক্রমে প্রেরিত শরের সন্ধানের সহিতই গোবিন্দলালের চিত্তটা সাম্যাবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইল। একটু ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইল। তার পর ঘটনার পর ঘটনা, ধাক্কার পব ধাক্কা, ঠিক সময় বুঝিয়া ও সুযোগ বুঝিয়া ধাক্কা। বারুণীতীরে কুহু ডাক, আর উইল চুরি, আর রোহিণীর আত্মহত্যা-চেষ্টা, আর ফুল্লবিম্বাদিঘটিত ব্যাপার, আর মিথ্যা অপবাদ রটনা, আর ভ্রমরের অভিমান, আর কৃষ্ণকান্তের শেষ উইল। সাগরবক্ষশায়ী জাহাজখানি টলিতে টলিতে এত দূর টলিয়াছে যে, আর উদ্ধারের আশা নাই।

উদ্ধারের আশা নাই; ম্যাক্‌বেথের জীবনে এমন সময় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন আর তাহার উদ্ধারের আশা ছিল না; এবং গোবিন্দলালের জীবনে এমন সময় আসিয়াছিল, যখন তাহার উদ্ধারের আশা ছিল না। বাঁধের ক্ষয় হইতে হইতে এমন সময় আসে, যখন আর স্রোতের গতি রোধ করিবার আশা রহে না। কথাটা সত্য, কিন্তু মনুষ্য মাত্রের পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ সত্য। এই সত্যের সম্মুখে মানুষের হাসিবার বা উল্লাসিত হইবার কোন কারণ নাই। এই ভীষণ সত্য যে মানুষের চোখের উপর অহরহ উপস্থিত রহিয়াছে অথচ মনুষ্য ইচ্ছা করিয়া তাহা দেখে না, অথবা দেখিয়াও স্বীকার করে না, নিজে প্রবঞ্চিত হয় ও অন্যকে প্রবঞ্চনা করে, এই একটা পরম আশ্চর্য্যের বিষয়। যদিও বকরূপী ধর্ম্ম কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠির তাঁহার আশ্চর্য্য ঘটনার যে তালিকা দিয়াছিলেন, সেই তালিকায় ইহার উল্লেখ নাই।

ইংরাজদের ম্যাক্‌বেথে ও আমাদের কৃষ্ণকান্তের উইলে এই সত্য তত্ত্ব-কথাটা খুব পরিস্ফুট করিয়া ধরা হইয়াছে। উভয়ে এই বিষয়ে সাদৃশ্য। এই সাদৃশ্য হয়ত পাঠকের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য এত বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু নহিলে, প্রবন্ধের কলেবর বাড়ে না। ('ভারতী,' অগ্রহায়ণ ১৩০২)

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক আলোচনা-সমিতিতে পঠিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিষয়ক অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ শুনিয়া যে দুই চারিটি কথা মনে হইয়াছে, তাহা "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইলে অনুগৃহীত হইব।

প্রবন্ধের সমালোচনাকালে একটা কথা উঠিয়াছিল, এ কালে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যবস্থা পূর্ব্বের মত অক্ষুণ্ণ রাখা যাইতে পারে কি না। কথাটা সে সময়ে অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছিল; কিন্তু ইহার উত্তর বোধ করি দুষ্প্রাপ্য নহে। কোন সামাজিক ব্যবস্থাই চিরকাল সমান ভাবে চলিতে পারে না ও চলেও না। সমাজ যখন পরিবর্ত্তনশীল, তখন সমাজস্থিতির ব্যবস্থাও পরিবর্ত্তনশীল হইবে, ইহা স্বীকার্য্য। বস্তুতই মনুর সময়ের ব্যবস্থা এ সময়ে সর্ব্বতোভাবে প্রচলিত নাই। ইংরাজীর প্রভাব সমাজে প্রবেশের পূর্ব্বেই সমাজ আপনা হইতে শাস্ত্রকারদের সম্মতিক্রমে বা নিয়োগক্রমে আপনার ব্যবস্থা আপনিই পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছে। মনুর সময়ে চারিটি মুখ্য বর্ণ ও বোধ করি বহুতর সঙ্কর বর্ণ বিদ্যমান ছিল।

সেই চারিটি মুখ্য বর্ণের মধ্যে এখন কেবল ব্রাহ্মণই বিদ্যমান, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের লোপ হইয়াছে। শূদ্রের নাম আছে, কিন্তু সামাজিক অবস্থা উন্নত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, শূদ্রের এই সামাজিক উন্নতি ইংরাজী শিক্ষার বহু পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। চারিটি আশ্রমের মধ্যে কেবল গৃহস্থাশ্রমটাই বর্ত্তমান আছে। ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থের বিলোপ হইয়াছে। ভিক্ষু আছে, কিন্তু সে মনুর ভিক্ষু নহে। সে বোধ করি বৌদ্ধ ভিক্ষুর রূপান্তর।

শুনিতে পাই, সংহিতাকারেরাই কলিকালে ভিক্ষুর আশ্রম নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, সেটা বোধ হয় ভিক্ষুগণের উৎপাতেরই ফল। ভিক্ষুর আশ্রম অতি কঠিন আশ্রম। ভিক্ষু সমাজের আশ্রয়ে বাস করেন ও সমাজের নিকট আপনার অন্ন বস্ত্র যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা আদায় করেন; কিন্তু সমাজ তাঁহার নিকট বিনিময়ে কিছু দাবী করিতে পায় না। এইরূপ স্থলে ভিক্ষুর জীবন দায়িত্বহীন, নীতিবর্জ্জিত জীবনে পরিণত হইবার অত্যন্ত আশঙ্কা থাকে।

কিন্তু সেকালের অর্থাৎ মনুর সময়ের ভিক্ষুকে অত্যন্ত কঠিন এপ্রেন্টিসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইত।

বার্দ্ধক্যেই প্রব্রজ্যাগ্রহণ বিহিত ছিল। জীবনের কার্য্য সম্পাদন করিয়া যখন অবসর লইবার সময়, তখনই বৃদ্ধেরা পুত্র পৌত্রাদির স্কন্ধে সংসারভার সমর্পণ করিয়া ক্লান্ত দেহে জরাজীর্ণ শরীর ও অবসন্ন মন লইয়া সংসারের নিকট ছুটি লইতেন। সংসারের মধ্যে থাকিয়া সংসারের উপর আপনার বোঝা সমর্পণ তাঁহারা কতকটা অন্যায় মনে করিতেন; সংসারও তাঁহাদিগকে আর জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত রাখিয়া কষ্ট দেওয়া অকর্ত্তব্য মনে করিতেন। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে তাঁহারা ছুটি লইতেন; আপনার কৃত কার্য্যের পেন্‌সন্ স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ মাত্র অর্থাৎ প্রাণরক্ষার উপায় মাত্র সংসারের নিকট দাবি করিতেন। সংসার তাঁহাদের নিকট বিনিময়ে কিছু দাবি করিত না।

কিন্তু এই বন্দোবস্তে ভিক্ষুর আশ্রমে প্রবেশের পূর্ব্বে বিষম পরীক্ষা দিতে হইত। ঐ পরীক্ষা বানপ্রস্থাশ্রম। বনবাসীর জীবন অতি কঠোর জীবন; তাঁহাকে বনে বসিয়া সংসারের জন্য যৎপরোনাস্তি সহিতে হইত। অথচ সংসারের নিকট বিশেষ কিছু পাইতেন না। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ভিক্ষুর পেন্‌সনে অধিকার—ইহাই বোধ করি সাধারণ নিয়ম ছিল।

ভিক্ষুর আশ্রম প্রবেশে এইরূপ কঠোর নিয়মের বাঁধাবাঁধি থাকায় নীতিহীন ও দায়িত্বহীন ভিক্ষুর উৎপাত ঘটিবার সম্ভাবনা অধিক ছিল, বোধ হয় না। বানপ্রস্থের কঠোর পরীক্ষার পর ভিক্ষুর জীবন গ্রহণে সকলের সাহসে কুলাইত, তাহা বোধ হয় না। দ্বিজাতি মাত্রেই বৃদ্ধ বয়সে ভিক্ষু হইতেন, এইরূপ মনে করিবার সম্যক্ কারণ নাই। দ্বিজাতি ভিন্ন শূদ্রগণের অর্থাৎ সমাজের অধিকাংশ লোকের ভিক্ষু হইবার অধিকারই ছিল না। কাজেই সমাজে কোনও কালে ভিক্ষুর সংখ্যা যে খুব বাড়িয়াছিল, তাহা বোধ হয় না।

কিন্তু বেদে না কি একটা বিধি আছে, বৈরাগ্য জন্মিবা মাত্র যে-কেহ যে-কোন বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারে। যাহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, তাহাকে আটকাইয়া রাখা দায়—বুদ্ধদেব বা শঙ্করাচার্য্য বা চৈতন্য, কাহাকেই কেহ কোন উপায়ে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। জোর করিয়া আটকাইয়াও লাভ নাই। কিন্তু আশঙ্কা থাকে ভণ্ড বৈরাগ্যের। কৃত্রিম

বৈরাগ্যের আক্রমণ হইতে গৃহস্থাশ্রমকে রক্ষা করিবার জন্য মন্বাদি শাস্ত্রকার যে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গতই মনে হয়।

ফলে বৃদ্ধ বয়সে কঠোর বানপ্রস্থের পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে, এই সাধরণ নিয়ম প্রচলিত থাকিলেও, সেকালেও অনেকেই বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া অকালে প্রব্রজিত হইত, সংশয় নাই; এবং প্রকৃত বৈরাগীর অনুকরণে বৈরাগীর দলের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহাও সম্ভব। বুদ্ধদেবের সময়ে অথবা কিছু পূর্ব্বে এইরূপ অকালবিরাগীর দল অনেক হইয়াছিল, এবং বৈরাগ্য-আশ্রয়টা একরকম ফ্যাশন হইয়াছিল, মনে এই রকম সন্দেহ হয়।

বুদ্ধদেব স্বয়ং প্রকৃত সন্ন্যাসী ছিলেন; তাঁহার সন্ন্যাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কর্ম্মত্যাগ না করিয়া কর্ম্মই জীবনের অবলম্বন করিয়াছিলেন। এত বড় কর্ম্মী সন্ন্যাসী ভূপৃষ্ঠকে আর কখনও পবিত্র করে নাই।

কিন্তু তিনি শাস্ত্রের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বার অবারিত ভাবে মুক্ত করিয়া দিলেন, দ্বিজ-শূদ্রনির্ব্বিশেষে, স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সন্ন্যাসী হইতে থাকিল। পুত্রের প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর অনুতপ্ত হইয়া বয়সের একটা নিয়ম করিয়াছিলেন; অন্ততঃ পিতামাতার অসম্মতিতে কেহ সংসার ত্যাগ করিবে না, এইরূপ একটা নিয়ম করিয়াছিলেন, এবং স্ত্রীজাতিকে সন্ন্যাস প্রবেশের অনুমতি দিয়াও শেষে অনুতপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, মৎপ্রচারিত সদ্ধর্ম্মের আয়ুষ্কাল এইবার কমিয়া গেল।

তাঁহার অনুতাপ অনুচিত হয় নাই। কেন না, দেশটা কিছু দিনেই কপট সন্ন্যাসীর দলে ভরিয়া গেল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেক বড় বড় সাধু মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন। অনেক পণ্ডিত, পবিত্রচিত্ত মহাত্মা বসুধা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন সত্য বটে, কিন্তু কপট সন্ন্যাসীর উৎপাত হইতে গৃহস্থকে রক্ষা করিবার সম্যক্ উপায় বুদ্ধদেব কিছুই করিয়া যান নাই। যাহা করিয়াছিলেন, তাহা নিষ্ফল হইয়াছিল। ফলে যে সমাজ-বিপ্লব ঘটে, তাহাতে সনাতন ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হয়। স্বেচ্ছাচারী মঠধারী মহান্ত ও ভিক্ষুর উৎপাতে দেশ হইতে সদাচার বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়।

সাধারণ মনুষ্য পৌরুষ শক্তি অপেক্ষা অপৌরুষেয় শক্তিতে অধিক আস্থাবান্। বুদ্ধদেব অপৌরুষেয় শ্রুতিকে অতিক্রম করিয়া পৌরুষ যুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রাচীন পরীক্ষিত ঐতিহাসিক আদর্শকে

ঠেলিয়া দিয়া নূতন অপরীক্ষিত আদর্শকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহার ফলেই এই সমাজ-বিপ্লব ও স্বেচ্ছাচারের প্রাদুর্ভাব। যদি কাহারও দ্বিধা থাকে, তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের ইতিহাসটা পড়িয়া দেখিবেন। শঙ্করবিজয় গ্রন্থেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপে মঠধারী মহান্তের ও ভিক্ষুকের উপদ্রব রাজশাসন দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে. ভারতবর্ষে রাজশাসন এ সকল স্থলে হস্তক্ষেপে সাহস করে না। কিন্তু সমাজ শেষে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ নাম দেশের মধ্যে হেয় হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের বৌদ্ধগণকে কেহ হিমালয়পারে রাখিয়া আসে নাই; কিন্তু তাহারা আর সমাজে স্বনামে পরিচিত হইতে সাহস করে নাই। ভিক্ষুর আশ্রম গ্রহণ বোধ হয় এই কারণেই শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

এই বিপ্লব হইতে সমাজ রক্ষার জন্য শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ শ্রুতির ও ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া সদাচার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই জন্য সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার কালে আমরা আচারের বন্ধনের দৃঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হই ও স্মৃতিগ্রন্থকারদিগকে গালি দিই। তাঁহারা ধর্ম্মনীতির অপেক্ষা আচারনীতির অধিক আদর করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহাদিগকে নানাবিধ কুবাক্য বলি। আমরা ভুলিয়া যাই, নীতির প্রতিষ্ঠা কোন দেশেই কোন কালেই ব্যবস্থাপকের (Legislatorএর) কাজ নহে; আইনের দ্বারা সন্নীতির প্রতিষ্ঠা কোন কালেই হয় না; তবে সদাচারের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। এবং সদাচার—ইংরাজীতে যাহাকে decency, propriety প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া যায়, তাহা সমাজ-স্থিতির জন্য একান্ত আবশ্যক; এবং তাহার জন্যই রাজশাসনের ও শাস্ত্রের শাসনের আবশ্যকতা; নীতি (Morality) প্রতিষ্ঠা পক্ষে, রাজশাসনের ও শাস্ত্রের শাসনের কোনই মূল্য নাই। আধুনিক কালে যে সকল নিবন্ধকার ও সংগ্রহকার আচার-বন্ধনে সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়া কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই রাজাশ্রয়ে প্রতিপালিত। তাঁহারা স্বয়ং ঋষি ছিলেন না, তবে ঋষিবাক্যের দোহাই দিতেন ও রাজাকে পরামর্শ দিয়া রাজশাসন নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাজবিধি দ্বারা সদাচার প্রতিষ্ঠায় সফল হইয়াছিলেন।

কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যক্রমে একালের ধর্ম্মসম্প্রদায়-সকলের প্রবর্ত্তকগণ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ঠিক বুঝেন নাই। এমন কি, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যও

শ্রুতির সেই প্রাচীন বচনের দোহাই দিয়া বৈরাগ্যের দ্বার অবারিত রাখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকেরা স্ত্রীশূদ্রাদিকেও বৈরাগ্য গ্রহণে নিবারণ করেন নাই। ফলে আমরা শাক্ত মঠে ও বৈষ্ণব আখড়ায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে নাম মাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বিরাজিত দেখিতে পাইতেছি। যতি শঙ্করাচার্য্য যে দিন গৃহস্থ মণ্ডন মিশ্রকে পরাজয় করিয়া গৃহস্থাশ্রমের উপর সন্ন্যাসাশ্রমের প্রাধান্য সপ্রমাণ করেন, সেই দিন ভারতবর্ষের ইতিহাসে দুর্দ্দিন বলিয়া গণ্য করাই সঙ্গত।

একালে যে মনুর সময়ের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা কেহ আশা করেন না। বোধ করি ইচ্ছাও করেন না। সে দিন নাই, হইবেও না। কিন্তু বিপ্লব কোন কালেই বাঞ্ছনীয় নহে। পুরাতন আদর্শ পুরাতন ভিত্তির উপর বজায় থাকুক, ইহাই প্রার্থনীয়। সেই আদর্শ কালানুযায়ী মূর্ত্তি গ্রহণ করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই।

বিপ্লব বোধ করি কেহই চাহেন না। আধুনিক সমাজসংস্কারকেরাও চাহেন না। পরিবর্ত্তন আবশ্যক, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। তবে এক পক্ষ যতটা পরিবর্ত্তন চান, অন্য পক্ষ ততটা চান না;—স্থিতিশীল ও উন্নতিশীলে বোধ করি, এই মাত্র প্রভেদ। এই প্রভেদ সর্ব্বত্রই আছে; এদেশেও আছে; থাকাও প্রার্থনীয়।

তবে একালে সমাজব্যবস্থায় রাজশক্তির সাহায্য পাইবার আশা নাই; পাওয়া প্রার্থনীয়ও নহে। যখন হিন্দু রাজা ছিল, তখন যে পরিবর্ত্তন শাস্ত্রজ্ঞগণের পরামর্শে রাজসাহায্যে অবাধে সম্পাদিত হইত, একালে তাহা হইবার উপায় নাই। কেন না, রাজশক্তি, সমাজশক্তি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ইহা অস্বাভাবিক; কিন্তু উপায় নাই। ইহার ফলভোগে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যে পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা সমাজের চেষ্টায় ধীরে ধীরেই ঘটিবে। অনেকে শ্রুতির দোহাই দেওয়া, শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া অনাবশ্যক মনে করেন; আমরা উহা অনাবশ্যক বোধ করি না। সভ্যতম দেশেও—বিলাতে বা আমেরিকায় শ্রুতির দোহাই না দিলে কোন রাজব্যবস্থা টেকে না। সেখানে শ্রুতির নাম Constitution; উহা অপৌরুষেয়; কেন না, উহা অনাদি—উহার মূল কোথায়, খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ও উহা ব্যক্তিবিশেষের প্রতিষ্ঠিত নহে। অপৌরুষেয়ের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্র।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অঙ্গ দুইটি—প্রথম বর্ণধর্ম্ম—ইহা লইয়া আমাদের সামাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয় আশ্রমধর্ম্ম—আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ইহার প্রতিষ্ঠা। সমাজজীবনে বর্ণভেদ—ব্যক্তির জীবনে আশ্রমভেদ। বৈদিক কালে উভয় ধর্ম্মের যে মূর্ত্তি ছিল, এখন তাহা নাই। পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ ঘটিয়াছে—শ্রুতির ভিত্তি বজায় রাখিয়া পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে ঘটিয়াছে। যেখানে শ্রুতির ভিত্তি ঠেলিয়া আকস্মিক পরিবর্ত্তনের চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই ফল শোচনীয় হইয়াছে—ইতিহাস সাক্ষী। বর্ত্তমান কালেও সেইরূপ কালোচিত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে ও ঘটিবে ; কিন্তু শ্রুতির ভিত্তি ঠেলিয়া ফেলা বাঞ্ছনীয় নহে।

দেখিতে গেলে প্রাচীন কালের চারি আশ্রম, এখন কেবল গৃহস্থাশ্রমেই পরিণতি পাইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ একালে নাই। ভিক্ষু আছে ; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই একালের ভিক্ষু সেকালের ভিক্ষুর বিড়ম্বনা মাত্র। বর্ণধর্ম্ম কিন্তু সমাজের অস্থি-মজ্জায় বর্ত্তমান। একালের বর্ণগত প্রভেদ প্রধানতঃ তিনটি। প্রথম শোণিতগত—অনার্য্য-সন্তানেরা হিন্দু সমাজে গৃহীত হইয়া নিম্ন শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় ব্যবসায়গত—কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত প্রভৃতির বিভেদ ব্যবসায় লইয়া—এই জাতিভেদ দেশের মধ্যে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা বিস্তারের ও ব্যবসায়গত স্বার্থরক্ষার বর্ত্তমান কালের এক মাত্র উপায়স্বরূপ রহিয়াছে। যত দিন গ্রামে গ্রামে নূতন ধরণের টেক্‌নিক্যাল স্কুল না বসিতেছে ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন সমিতি গঠিত না হইতেছে, তত দিন এই জাতিভেদ এদেশ হইতে উঠিবে না। তৃতীয় দেশগত ভেদ—ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার বিবিধ শ্রেণী এই প্রাদেশিক ভেদ লইয়া। সেইরূপ অন্যান্য জাতির মধ্যেও এই প্রাদেশিক ভেদ বর্ত্তমান। ইংরাজের রাজ্যে রেলওয়ে-টেলিগ্রাফের দিনে এই ভেদটা কমিয়া যায়, এইরূপ একটা স্পৃহা সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে।

ইংরাজীতে যাহাকে Discipline বলে, আমাদের সমাজে বর্ণধর্ম্ম কতকটা সেই ডিসিপ্লিনের কাজ করে। সে দিন উপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধের আলোচনাকালে শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বলিয়াছিলেন,—'প্রবৃত্তির দমন' ও 'প্রতিভার বিকাশ' এই দুই বিষয়ে কতটা সফল হয়, তাহা দেখিয়া এইরূপ সামাজিক ব্যবস্থার সার্থকতা বিচার করিতে হইবে। বস্তুতই তাহাই। মোটামুটি বলা যাইতে পারে, ইউরোপের সমাজের

বন্দোবস্ত প্রতিভার বিকাশের অনুকূল; আমাদের দেশের সমাজের বন্দোবস্ত প্রবৃত্তির দমনের অনুকূল। ইউরোপে যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন পদবীতে স্থান পাইতে পারে—ইহাই সে দেশের সমাজতন্ত্রের থিওরি। বিলাতের যে-কোন শ্রমজীবী গ্লাড্‌ষ্টোনের আসনে বসিবার আশা করে; ফ্রান্সে বা আমেরিকায় যে-কোন ব্যক্তি প্রেসিডেণ্ট হইতে পারে,—প্রত্যেকেই যখন এইরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণের অধিকারী, তখন সে দেশের সামাজিক নিয়ম যে প্রতিভার বিকাশের অনুকূল হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই আকাঙ্ক্ষা মিটে না। ক্ষমতার অভাবে বা সুবিধার অভাবে বা ঘটনার চক্রে নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশ লোকই চিরজীবন নিম্ন শ্রেণীতেই আবদ্ধ থাকে; যাহার আকাঙ্ক্ষা মেটে, সে হয় খুব প্রতিভাবান্ বা খুব সৌভাগ্যশালী। সাধারণত প্রতিভা ও সৌভাগ্য, উভয়ই একত্র না হইলে আকাঙ্ক্ষা মেটে না। ফলে দাঁড়ায় এই, দুই চারি জন ক্ষমতাবলে বা সৌভাগ্যবলে গ্লাড্‌ষ্টোনের পদে ওঠে বটে; কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই উচ্চাকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকায় একটা দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হয়; ফ্যাক্টরীর ভিতর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বিলাতের দুর্ভাগা শ্রমজীবী যখন দেখিতে পায়, তাহার দিনান্তে অন্নের সংস্থান হইল না—সে জানে, সে গ্লাড্‌ষ্টোনের আসনে বসিবার অধিকারী, অথচ অদ্য রাত্রিটা তাহাকে রাজপথে ভূমি-শয্যাতেই কাটাইতে হইবে, তখন সে মনের ক্ষোভে বড়-লোকের ঘরে ঢেলা ছুঁড়িয়া অসন্তোষের পরিচয় দেয় ও কেহ কেহ বা সুবিধা পাইলেই রাজারাজড়ার বুকে গুলি চালায়।

আমাদের দেশের ব্যবস্থা কতকটা অন্যরূপ। চাষার ছেলে ও তাঁতীর ছেলে কখনও মনেও ভাবে না যে, তাহার রাজতক্তে বা রাজদরবারে বসিবার কোনও সম্ভাবনা আছে। সে জানে, সে পৈতৃক জাতিধর্ম্ম ও জাতিব্যবসায় অবলম্বনেই চিরজীবন কায়ক্লেশে কাটাইতে বিধাতা কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছে। তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার লেশ নাই। তাহার স্বাভাবিক প্রতিভা উচ্চমুখে তাকায় না; তথাপি প্রতিভা এমনই জিনিস যে, ক্বচিৎ কোনও স্থলে দুরন্ত প্রতিভা সমাজের বন্দোবস্ত ঠেলিয়া দিয়া কৃষকপুত্রকে বা তাঁতীর পুত্রকে রাজতক্তে বসাইয়াছে; এইরূপ উদাহরণ এদেশের ইতিহাসেও না মেলে, এমন নহে। কিন্তু এইরূপ উদাহরণ সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার মাত্র। সাধারণ নিয়মমতে প্রত্যেকেই পৈতামহিক পদবীতেই চিরজীবন শান্তির

সহিত ও সন্তোষের সহিত কাটাইয়া দেয়। এবং বিধাতা যদি নিতান্ত বিরূপ হইয়া দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত করেন, তখন নিতান্ত সন্তোষের সহিত মৃত্যুর ক্রোড়ে শান্তিলাভ করে,—রাজার বুকে ছুরি বসায় না।

কোন্ ব্যবস্থাটা ভাল, সে কথা নাই বা তুলিলাম। সকল জিনিসেরই ভাল মন্দ দুই দিক্ আছে। পাশ্চাত্য সমাজের ব্যবস্থার এক দিক্ ভাল, অন্য দিক্ মন্দ। আমাদের ব্যবস্থারও এক দিক্ ভাল, অন্য দিক্ মন্দ। তবে না হয় এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, ওদের ব্যবস্থা উন্নতির অনুকূল, কিন্তু স্থিতির অনুকূল নহে। পাশ্চাত্য সমাজ জমকাল, কিন্তু হয়ত ভঙ্গপ্রবণ। আমাদের ব্যবস্থা স্থিতির অনুকূল, কিন্তু উন্নতির তেমন অনুকূল নহে।

আমাদের শাস্ত্রে যাহা 'লোকস্থিতি'র সহায়, তাহারই নাম ধর্ম্ম। আদর্শ বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নরূপ ; কিন্তু এই বিভেদের জন্য কোন সমাজকে গালি দেওয়া সঙ্গত নহে। সমাজ অতি বৃহৎ পদার্থ—ইহা স্তুতি নিন্দার অতীত। নদ-নদীর গতির মত, জ্যোতিষ্কগণের গতির মত সমাজের গতিও কাহারও স্তুতি নিন্দার অপেক্ষা না করিয়া আপন পথে চলিয়া যায়।

আমাদের ব্যবস্থার পক্ষে একটা কথা বলিবার আছে। সচরাচর বলা হয়, এদেশের লোকে Dignity of labour—পরিশ্রমের গৌরব বুঝে না। আমার বিশ্বাস ঠিক উল্টা। আমাদের বিশ্বাস—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ"। ইহার অর্থ—আমি যে কর্ম্মে প্রেরিত ও নিযুক্ত হইয়াছি, তাহা অপেক্ষা গৌরবকর কর্ম্ম আমার পক্ষে আর নাই। কর্ম্ম মাত্রই মহৎ—যদি তাহা যথাযথরূপে সম্পাদিত হয়। অন্যের চোখে আমার কর্ম্ম নিন্দিত হউক, তাহাতে বড় আসে যায় না ;—আমার নিকট আমার কর্ম্ম গৌরবের সামগ্রী—ইহাই যদি আমার জীবনে সম্পাদন করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হইবে।

আমার বোধ হয়, এই ভাবটা আমাদের দেশে অতি ইতর লোকের মধ্যেও বিদ্যমান আছে। তাহাদের মনে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই ; কিন্তু আপন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারিলেই আপন জীবন সার্থক হইবে, এরূপ বোধই এদেশে সাধারণ নিয়ম। চাষার ছেলে চাষার কাজকে হীন কাজ মনে করে না ; তাঁতী তাঁতীর কাজকে ঘৃণা করে না—বস্তুত গৌরবেরই বিষয় ও শ্লাঘার বিষয়ই মনে করে। সেই কাজ না করিলেই তাহার 'জাতি' যায়—তাহার 'স্বধর্ম্ম' পালিত হয় না। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার 'স্বধর্ম্মে'—তাঁহার

'জাতিব্যবসায়ে' যেরূপ গৌরব বোধ করেন, একজন চাষা তাহার 'স্বধর্ম্মে'—তাহার 'জাতিব্যবসায়ে' তাহার অপেক্ষা কম গৌরব বোধ করে, তাহা মনে হয় না। যে ব্যক্তির ধারণা আছে, আমি রাজমন্ত্রিত্ব পাইবার অধিকারী, তবে দৈবগত্যা বা অন্যের ষড়্‌যন্ত্রের ফলে আমাকে কারখানায় মজুরি করিতে হইতেছে, তাহার স্বধর্ম্ম পালনে—মজুরি কর্ম্মে অনুরাগ হইতেই পারে না।

এই ভাবটাকে আমি অতি উন্নত ভাব মনে করি। সেদিন শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিয়াছিলেন, বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্ব্বে মনুষ্য নিষ্কাম ধর্ম্ম পালনে সমর্থ হয় না। ঠিক কথা। বিশ্বরূপ দর্শন সকলের সাধ্য নহে; সেরূপ সৌভাগ্যশালীর সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়। কিন্তু নিষ্কাম ধর্ম্মের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাহার নিকট পৌঁছিতে পারে; এবং এতদ্দেশের কৃষক ও শ্রমজীবী এই নিষ্কাম ধর্ম্মের আদর্শের প্রতি যতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, ততটা আর কোন দেশে হইয়াছে বোধ হয় না।

বস্তুতই আমাদের দেশে প্রত্যেক শ্রমজীবীর জীবনে এই মহান্ আদর্শ প্রতিবিম্বিত দেখি। যখন দেখিতে পাই, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শীত যাইতেছে, প্রকৃতির যাবতীয় অত্যাচার অকুণ্ঠিত ভাবে সহ্য করিয়া দরিদ্র কৃষক বৎসরের পর বৎসর তাহার ক্ষেতের টুকরাটিতে পরিশ্রম করিতেছে—কোন বার ফল পায়, কোন বার পায় না; কোন দিন উদর পূর্ণ হয়, কোন দিন হয় না,—কোনরূপ রাজদরবারে বসিবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা উহাকে উত্তেজিত করিতেছে না, গ্লাড্‌ষ্টোন্ হইবার সে কখনও স্বপ্ন দেখে না, তাহার অবসাদ দূর করিবার জন্য ও উত্তেজনা বিধানের জন্য চা নাই, মদ নাই, খবরের কাগজ নাই, রাজনীতিবিষয়ক, ধর্ম্মনীতিবিষয়ক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, কোন বক্তৃতার ব্যবস্থা নাই—অথচ সে খাটে, কিন্তু অবসন্ন হয় না—সে খাটে, কিন্তু নিজের জন্য নহে, আপন বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য, পত্নীর জন্য, পুত্রকন্যার জন্য, হয়ত পিসি মাসী, ভাই ভগিনীর জন্য চিরজীবন খাটে ও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বিরাম পায়—তখন আমার বোধ হয়, পৃথিবীতে নিষ্কাম ধর্ম্ম পালনের উদাহরণ যদি কোথাও থাকে, সে এখানে। এবং ভয়াবহ পরধর্ম্ম অবলম্বন অপেক্ষা এই স্বধর্ম্মে নিধনের কোন-না-কোন স্থানে অধিক মূল্য আছে বলিয়া সংশয় জন্মে। হইতে পারে, জীবনে তাহার বহু স্থলে পদস্খলন হইয়াছে, সে লোকের সহিত বিবাদ বিসংবাদ করিয়াছে, পেটের জ্বালায় কটু কথা ও মিছা কথা কহিয়াছে, রাগের মাথায় কাহারও

পিঠে লাঠি বসাইয়াছে, তোমার আমার ও সকলেরই মত সে নানা দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিয়াছে; এবং ইহাও নিশ্চয় যে, তাহার মৃত্যু হইলে সংবাদপত্রে ঘোষণা হইবে না, কোন স্থানে শোকসভা বসিবে না, কোন স্থলে স্মৃতিস্তম্ভ উঠিবে না; কয়েক বৎসর পরে তাহার নাম পর্য্যন্তও পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে; কিন্তু তথাপি সার্ আইজাক নিউটন বা মাইকেল ফ্যারাডে বা উইলিয়াম শেক্স্পীয়রের কৃত কর্ম্মের অপেক্ষা তাহার জীবনে কৃত কর্ম্মের গৌরব কম, তাহা মনে করিতে আমি সঙ্কুচিত হইতেছি। ('বঙ্গদর্শন,' চৈত্র, ১৩০৮

পরাধীনতা

হিন্দু জাতির পরাধীনতা কেন ঘটিল, এই প্রশ্নের নানাবিধ উত্তর ইতিহাস-গ্রন্থে প্রচলিত আছে।

কেহ বলেন, হিন্দু রাজারা এ জন্য দায়ী। জয়চন্দ্র মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়া প্রথম কীর্ত্তি রাখিয়া যান। লক্ষ্মণসেন মুসলমানের সঙ্গে লড়াই কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন নাই ইত্যাদি।

এই উত্তরে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। দুই একটা লোকের দোষে এত বড় একটা ঐতিহাসিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়া সম্ভব নহে। প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে হইলে আরও মূলে গিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে জাতীয় প্রকৃতির সম্বন্ধে আলোচনা আসিয়া পড়ে। অবশ্যই সেই সময়ে হিন্দুগণের জাতীয় প্রকৃতিতে এমন একটা কিছু ঘটিয়াছিল, যাহাতে পরাধীনতার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। জাতীয় প্রকৃতির শোচনায় অবনতি না ঘটিলে সহজে পরাধীনতা ঘটে না। নিশ্চয়ই কোন আভ্যন্তরীণ মূল কারণে সেই সময়ে ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্র অধঃপতিত হইয়াছিল। পরের আক্রমণে বাধা দিবার বা পরের আক্রমণ সহিয়া লইবার শক্তি তখন হিন্দু জাতির ছিল না। তাহাতেই মুসলমান এত সহজে ভারতবাসীকে পদানত করিয়া ফেলিয়াছিল।

বস্তুতই জাতীয় চরিত্রের ভয়াবহ অবনতি ব্যতীত এরূপ পরাজয় বা পরাধীনতা ঘটে না। সে পরাজয়ই বা আবার কেমন! জয়চন্দ্র কর্ত্তৃক নিমন্ত্রণ ব্যাপারের পূর্ব্বেই হিন্দুর সহিত মুসলমানের যথেষ্ট পরিচয় ছিল। তাহারও তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমানেরা কিছু দিন সিন্ধুদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছিল। হিন্দুদিগের দেবতার উপর ও হিন্দু গৃহস্থের স্ত্রীকন্যার উপর মুসলমান কিরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন, তাহা হিন্দুগণ সেই কয় দিনেই জানিতে পারিয়াছিলেন। ঠাণ্ডা রক্ত গরম করিবার জন্য যে সকল ইন্ধন আবশ্যক, মুসলমানকৃত ব্যবহারে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। অথচ তাহাতেও হিন্দুর রক্ত গরম হয় নাই, একেবারে তুষারের মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। সিন্ধুদেশ হইতে মুসলমান বিদূরিত হইবার পরও গজনীপতি কয়েক বার ভারতবর্ষে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অভ্যাগত

মহোদয়ের এক একবার সৎকার ব্যাপারে যে ব্যয়বিধানের ঘটা ইতিহাসে বর্ণিত দেখা যায়, তাহাতে অদ্যাপি বাঙ্গালী হৃদয় দুরু দুরু কম্পিত হইয়া থাকে ; এবং যখন শোনা যায়, এহেন অতিথিকে দলবলে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে একজন হিন্দু রাজা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, এবং আর একজন হিন্দু রাজা আপনার রাজ্যভার ও অধীন প্রজাবর্গের মান সম্ভ্রম ও ধন প্রাণ তাঁহাদের হস্তে বিনা বাক্যব্যয়েই সমর্পণ করিয়া আপনার জরাজীর্ণ অস্থি কয়খানির ও ভুক্তাবশিষ্ট প্রাণটুকুর কল্যাণপ্রার্থী হইয়াছিলেন, তখন জাতীয় অবনতি যে নিম্নতম সোপানে উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ মাত্র জন্মে না।

সুতরাং এই তত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে জাতীয় দুর্গতিরই কারণ নির্দ্দেশ আবশ্যক হইয়া পড়ে, এবং তত্ত্বান্বেষী ঐতিহাসিক মাত্রেই এই জাতীয় প্রকৃতির অধোগতির একটানা একটা মৌলিক কারণ দেখাইয়াছেন।

বলা বাহুল্য, ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন কারণ দেখাইয়া দিলেও সেই সমস্ত একটা খাঁটি কথাতে শেষ পর্য্যন্ত গিয়া দাঁড়ায়, এবং আমাদের বৈদেশিক ও স্বদেশীয় সমুদয় ঐতিহাসিকগণ প্রায় একবাক্যেই সেই কথা সমর্থন করেন। কথাটা পাঁচ জনে পাঁচ রকমে সাজাইয়া বলেন, এবং আপন আপন বুদ্ধির হাপরে বিবিধ মর্ম্মভেদী যুক্তির হাতিয়ার বানাইয়া লইয়া তৎপ্রয়োগে ইতিহাসের শরীরকে ছিন্দন, ভিন্দন, কৃন্তন ও বিশ্লেষণ করিয়া অভ্যন্তর হইতে মূল সত্যকে টানিয়া বাহির করেন। এক কথায় হিন্দুর যত দুর্গতির মূল— হিঁদুয়ানী ও হিঁদুয়ানীর প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষাকর্ত্তা ব্রাহ্মণঠাকুর।

ফলে, ঋগ্বেদের বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্বের সময় হইতে পুণার রাণ্ড সাহেবের হত্যাকাণ্ডের দিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ যে একটা প্রকাণ্ড ও গভীর ষড়্যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া আছে, অনাদি অনন্ত মহাকালের আদি ও অন্ত থাকিতে পারে, কিন্তু এই ষড়্যন্ত্রের আদি আবিষ্কার করিতে পারা যায় না ও অন্তেরও কোন উপস্থিত সম্ভাবনা নাই, ইহা বৈদেশিকগণের এবং আমাদের স্বদেশীয় শিক্ষিত-গণের নির্দ্ধারিত অবিসংবাদিত সত্য ; এবং এই ষড়্যন্ত্র হইতেই ভারতবর্ষে হিন্দু জাতির যত কিছু দুর্গতি, দুঃখ ও যন্ত্রণা। এক কালে হিন্দু জাতি অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এবং সেই উন্নতি আবহমান কাল চলিতে পারিত, কিন্তু দুষ্ট ব্রাহ্মণের কূট চেষ্টা পদে পদে সেই উন্নতির গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে ও অবশেষে হিন্দু জাতিকে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখর হইতে নেপালের

তরাই ভূমিতে নামাইয়া আনিয়া হাঁপ ছাড়িয়া প্রসাদ লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণই প্রাচীন ভারতের যত দুর্দ্দশার মূল।

এতগুলি বুদ্ধিমান্ লোকে একবাক্যে যাহা বলেন, তাহা মানিতে আমরা বাধ্য; তবে ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে ব্রাহ্মণকে পুঁছিয়া ফেলিলে কি অবশিষ্ট থাকে, তাহার কোন ঠাহর পাই না; এবং বাকী যাহা থাকে, তাহার উন্নতিই বা কি, আর অবনতিই বা কি, তাহাও বুঝিতে পারি না।

বুঝি আর না বুঝি, ব্রাহ্মণের দুরন্ত শাসননীতিতে ভারতের জাতীয় জীবন যে একেবারে কণ্ঠে আসিয়া পড়িয়া কেবল উড্ডয়নের অপেক্ষা মাত্র করিতেছিল, তাহা যুক্তি প্রয়োগে তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারা যায়। এবং যে পণ্ডিতই দুর্ভাগ্য ভারতের অধঃপতনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসেন, তিনিই এই ঐতিহাসিক ঘটনার মুখ্য কারণগুলি একে একে গণিয়া দিতে সঙ্কোচ করেন না।

কিন্তু এইখানে একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতে হইতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে পুনঃ পুনঃ অধঃপতন ও অবনতির কথা উল্লেখ করাটা ঠিক হইতেছে কি না, তাহা লইয়াই তর্ক উঠিতে পারে। কেন না, বিলাতের টাইম্‌স পত্র সম্প্রতি বলিয়াছেন, আমরা এককালে উন্নত ছিলাম, এখন অবনত হইয়াছি, ইহা মনে করাও আমাদের পক্ষে ঐতিহাসিক ভ্রম ও মহাপাপ। কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাবে এ কালের কোনও কথা আলোচিত হইতেছে না। এ কালে আমরা হিমালয়ের শিখরদেশে কেন, রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত একবারে বিমানমার্গে উন্নীত হইয়াছি, সে বিষয়ে যেমন কোনও সংশয় নাই, মুসলমানের সময়েও সেইরূপ আমাদের দুর্দ্দশার পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল, ইহাও তেমনই স্বতঃসিদ্ধ বাক্য।

প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের শাসননীতির বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের অবনতির কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কারণ পাওয়া যায়। এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে সেই কারণগুলি পুঞ্জীভূত হইয়া হিন্দুস্থানের অবস্থা ঠিক এইরূপ করিয়া তুলিয়াছিল যে, তখন মুসলমানের আগমন ও তৎকর্ত্তৃক আমাদের পরাজয় অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রথম—ব্রাহ্মণেরা সমুদয় বিদ্যা একটা সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়া তাহার চাবি আপন হস্তে রাখিয়াছিলেন। জনসাধারণ বিদ্যার আলোকে বঞ্চিত হইয়া মূর্খতার আঁধারে হাবুডুবু খাইতেছিল।

দ্বিতীয়—মূর্খতা হইতে কুসংস্কারের উৎপত্তি হয়। ব্রাহ্মণেরা আপনাদের চালকলার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য সেই কুসংস্কারগুলির প্রশ্রয় দিতেছিলেন এবং নানাবিধ কুপ্রথার ও উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণের সমবেত আত্মাকে জড়ীভূত ও নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তৃতীয়—ব্রাহ্মণেরা জনসাধারণের পায়ে যে অধীনতার শিকল পরাইয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহাদের প্রতি যে অত্যাচার ও নির্য্যাতনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বিধর্ম্মীর অধীনতা ও অত্যাচারও তাহার নিকট সুখের বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

চতুর্থ—ব্রাহ্মণেরা জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়া বিবিধ জাতির মধ্যে পরস্পর বিবাদ লাগাইয়া দিয়াছিলেন ও তাহাদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষের বহ্নিতে কেবলই ইন্ধন প্রয়োগ করিয়া আমোদ দেখিতেছিলেন। গৃহবিবাদে হীনবল সমাজের পরের আক্রমণ সহিবার ক্ষমতা থাকে না।

পঞ্চম—ব্রাহ্মণের অনুমোদিত কন্যা বিবাহাদি সামাজিক কুপ্রথায় সমগ্র জাতি হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল।

এইরূপে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ইত্যাদি ক্রমে কারণের সংখ্যা ক্রমেই বাড়াইতে পারা যায়, এবং সকলেরই মূলে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-প্রবর্ত্তিত সর্ব্ব-নাশকর জাতিভেদ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এততেও মনের তৃপ্তি জন্মে না, যেন আরও একটা কিছু অভাব রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুস্থান জয় ব্যাপারের ঐতিহাসিক বিবরণ দেখিলে একটা মোটা ঘটনা সহজে ধরা পড়ে। হিন্দুস্থানে যে সময়ে বড় রাজা কেহ ছিল না এবং দিল্লীপতি কতকটা ছোটখাট সাম্রাজ্য স্থাপনে যত্নপর হইয়াছিলেন এবং তিনিই মুসলমানের সঙ্গে কিছু দিন লড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারই সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টাতেই সর্ব্বনাশের বীজ অঙ্কুরিত হয়।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই, হিন্দু রাজার সহিত স্থানবিশেষে মুসলমানের লড়াই ঘটিয়া থাকিলেও হিন্দু প্রজা সেই লড়াইয়ে একবারে যোগ দেয় নাই। তাহারা নীরবে ও নির্ব্বিবাদে এই রাজনৈতিক বিপ্লব চক্ষুর সম্মুখে ঘটিতে দেখিল। স্বয়ং মুখ ফুটিয়া একটা উচ্চ কথা কহিল না।

মুসলমান হিন্দুর রাজসিংহাসন দখল করিয়া তাহাদের দেবমন্দির ভাঙ্গিল, তাহাদের জাতিধর্ম্ম লইয়া টানাটানি করিল, তাহাদের ধন মান অপহরণ করিতে লাগিল; রাজা তাহাদের রক্ষণে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু তাহারা স্বয়ং একটা দল বাঁধিয়া এ বিষয়ে কোনরূপ বাধা দেওয়া বা আপত্তি করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিল না।

হিন্দু প্রজার প্রকৃতিতে এ বিষয়ে একটু অসাধারণত্ব আছে, অন্য দেশে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রজা স্বয়ং সচেষ্ট থাকে, বিদেশী শত্রু উপস্থিত হইলে কেবল রাজার মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে না। রাজাকে যথাসাধ্য শত্রুদমনে সাহায্য করে এবং রাজা যখন নিজে পরাস্ত হয়েন, তখন প্রজা স্বয়ং কোমর বাঁধিয়া অবতীর্ণ হইয়া অন্ততঃ একবার শেষ চেষ্টা করিয়া লয়। আমাদের দেশের ইতিহাস অন্যরূপ। এখানে রাজনৈতিক বিপ্লবের সময় প্রজা নির্ব্বিকারচিত্ত। সে সময়ে তাহার নিজের যে একটা কর্ত্তব্য আছে, তাহা সে অনুভবই করিতে পারে না, যুদ্ধ করিয়া দেশরক্ষা রাজারই কর্ত্তব্য, তাহাতে আমাদের যে কোন দায়িত্ব আছে, তাহা আমরা বুঝি না। রাজা আপন সিংহাসন রাখিতে পারেন ভাল, তিনি সুখে থাকুন, অপরে আসিয়া যদি তাঁহার রাজছত্র কাড়িয়া লয়, ভাল, তাহাই হউক, আমরা নূতন রাজাকে খাজনা দিব, এবং তাঁহার বিধিব্যবস্থা পালন করিব, ভাবটা এইরূপ।

ভারতবাসীর নিকট রাজনৈতিক বিপ্লব কতকটা দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ও ঝড়ের মত সম্পূর্ণ দৈবনির্দ্দিষ্ট ঘটনা, দৈব উৎপাত উপস্থিত হইলে মরিতে হয় ও সহিতে হয়, তাহার প্রতিবিধান মনুষ্যের সাধ্য নয়, রাজার পরিবর্ত্তনও কতকটা সেইরূপ। রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইলে তাহাও সহিতে হইবে ও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহাতে ধন প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে নাচার। দৈব ঘটনার আবার প্রতিবিধান কি? যাহাকে আধুনিক ভাষায় রাজনৈতিক জীবন বলে, স্বদেশভক্তি, জাতীয় ভাব প্রভৃতি যাহার লক্ষণ, ভারতবাসীর সেই জীবনটা একেবারে নাই।

আর সেকাল হইতে আজি পর্য্যন্ত ভারতবাসীর প্রকৃতি ঠিক সেইরূপই রহিয়াছে। ভারতের প্রজা ভারতের রাজাকে খাজনা দেয়, সম্মান করে ও তাঁহার আজ্ঞামতে চলে। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সে সম্পূর্ণ উদাসীন, মুসলমানের হাত হইতে যখন রাজশক্তি ইংরাজের হাতে গেল, তখনও

ভারতীয় প্রজা তাহাতে অণুমাত্র বিচলিত হয় নাই ; তাহার মনে তজ্জন্য কোন দুঃখের উদয় বা আনন্দের উদয়ও হয় নাই, দেশের মধ্যে যে একটা ওলটপালট ঘটিয়া গেল, বিশ কোটির মধ্যে উনিশ কোটি লোক, বোধ হয় তাহার কোন সংবাদ রাখাও দরকার বোধ করেন নাই। মুসলমানের কর্ম্মচারী খাজানা আদায় করিতে আসিলে আমরা আপত্তি না কবিয়া খাজানা দিতাম ; এখন ইংরাজের কর্ম্মচারী খাজানা আদায় করিতে আসে, আমরা তাহার হাতে খাজানা দিই। তাহার খাজানা গ্রহণের অধিকার আছে কি না, জিজ্ঞাসার দরকার হয় না।

এই রাজনৈতিক জীবনের অভাবের কতকগুলা স্থূল লক্ষণ দেখা যায়। এ দেশে রাজায় প্রজায় কখন বিরোধ নাই ; আবার রাজায় প্রজায় সহানুভূতি বা স্বার্থের টানও নাই। রাজা যিনিই হউন, তাঁহাকে খাজানা দিতে আপত্তি করিতে নাই—তাঁহার আদেশ মানিয়া চলা উচিত। তিনি সুখে রাখেন—সুখের বিষয় ; তিনি নিগ্রহ করেন, তথাস্তু। দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু রাজকৃত অত্যাচারের আবার প্রতিবাদ কি ? তাহা হইলে ত ভূমিকম্প ও মারিভয়েও প্রতিবাদ আবশ্যক হইতে পারে। উভয়েরই পক্ষে কোন যুক্তি নাই। ইংরাজ নূতন রাজা হইয়া আমাদিগকে আরামে রাখিয়াছেন, পরম সৌভাগ্য ; আমরা ইংরাজকে আশীর্ব্বাদ করিব। ইংরাজ যদি অত্যাচারই করিতেন, তাহা হইলেও আমরা তাহা সহিতাম। বিধাতার বিধান,—মানুষে কি করিবে ?

আর একটা লক্ষণ—এই আসমুদ্র হিমাচল আমার স্বদেশ। হিমাচলের ও-পারে ও সমুদ্রের পারে ম্লেচ্ছভূমি ; সেখানে আমাদের যাইতে নাই ও সে দেশের সংবাদ গ্রহণের কৌতূহলও অস্বাভাবিক। সে সকল দেশে ম্লেচ্ছ বাস করে ও হয়ত গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরাদিও লীলাখেলা করিয়া থাকে। তাহাদের কাজকর্ম্ম, আহার ব্যবহার জানিয়া আমাদের কোন ফল নাই। কিন্তু হিমাচল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত এই দেশটুকু আমাদের। কামরূপ হইতে সিন্ধুতট পর্য্যন্ত এবং হরিদ্বার হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মের স্থান, এই দেশে আমাদের দেবমন্দির, আমাদের তীর্থস্থল সমস্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে।

আমাদের স্বজাতি, স্বধর্ম্ম, আত্মীয়, অন্তরঙ্গ সকলেই এই পরিধির মধ্যে বাস করে। কিন্তু তাই বলিয়া বিধর্ম্মী আসিয়া পঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছে,

তাহাতে বাঙ্গালীর মাথাব্যথার প্রয়োজন কি? অথবা বাঙ্গালী বিধর্ম্মীর পদানত হইল, তাহাতে মহারাষ্ট্রের কি আসে যায়?

জাতীয়তার ও রাজনৈতিক জীবনের যে সমস্ত লক্ষণ, এদেশে তাহার কিছুই নাই। কোন কালে যে ছিল, তাহারও প্রমাণ বর্ত্তমান নাই। রাজা নিগ্রহ করিলে তাহার প্রতিবাদ করা যেমন আমরা আবশ্যক বোধ করি না, রাজার বিপদ্ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সাহায্য দানও তেমনই অনাবশ্যক বোধ করি। রাজা প্রজা হইতে অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত। রাজলোক কতকটা দেবলোকের মত পুণ্যস্থানীয়। সেখানে কি যায়, কি আসে, তাহা আমাদের কৌতূহলের বা অনুসন্ধিৎসার বিষয় হইতে পারে না, সেখানকার ব্যবহারের উপর আমাদের কোন হাত নাই। সত্য বটে, আমাদের শুভাশুভ রাজলোক হইতে অনেক সময় নির্দ্ধারিত ও নিয়মিত হইয়া থাকে; কিন্তু আকাশে গ্রহগণের গতায়াত বা দেবলোকে দেবগণের গতিবিধিও আমাদের শুভাশুভের নিয়ামক। গ্রহের ফের ও দেবতার ইচ্ছা যেমন আমরা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতে বাধ্য, রাজলোকে বিহিত ব্যবস্থাও তেমনই মানিয়া লইতে ও গ্রহণ করিতে বাধ্য রহিয়াছি।

কিন্তু অন্য দেশের ইতিহাস ঠিক এমন নহে। সেখানে রাজা প্রজার সম্বন্ধ অন্যরূপ। রাজায় প্রজায় এমন সখ্য সৌহার্দ্য নাই। কথায় কথায় প্রজা রাজার কৈফিয়ৎ চাহিয়া থাকে। রাজা ঘাড় নাড়িলে প্রজা শিং নাড়া দেয়, রাজা ভ্রূভঙ্গি করিলে প্রজা দাঁত দেখায়। সময়ে সময়ে রাজাকে জেলে দেয়, অথবা রাজার উত্তমাঙ্গের সহিত নিম্নদেহের যোগাকর্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখে। কিন্তু আবার বৈদেশিক আসিয়া রাজাকে আক্রমণ করিলে তখন তাহারা রাজ্যের বিপদ্ বা নিজের বিপদ্ ভাবে; তখন তাহারা দল বাঁধিয়া অস্ত্র হাতে রাজাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, রাজার ও তাঁহার বেতনভুক্ সৈন্যের বাহুবলের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে না। বৈদেশিককে রাজার সহিত লড়াই করিতে হয় না, তাঁহার লড়াই প্রজার সহিত। রাজা সেখানে প্রজার সহায় মাত্র, অথবা প্রজার নির্দ্দিষ্ট বিশ্বস্ত সেনাপতি মাত্র।

তাহার সেই জাতীয় ভাবের লক্ষণ কি? যত দিন বহিঃশত্রুর আশঙ্কা না থাকে, সে তত দিন রাজ্যের মধ্যে অহর্নিশ রাজার সঙ্গে দ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকে। অহর্নিশ দ্বন্দ্ব—উৎকট কলরব। রাজায় প্রজায় নিয়ত অবিশ্রান্ত মল্লযুদ্ধ—কে কাহাকে হঠায়? ইউরোপের ইতিহাসই এই। রাজা

সময়ে সময়ে প্রজাকে দলিত করেন ; প্রজা কখন দলিত সর্পের ন্যায় গর্জ্জাইয়া রাজাকে দংশন করে। যাহারা সামাজিক ও শান্ত, তাহারা রাজাকে বুঝাইতেছে ও থামাইতেছে, শাসাইতেছে ; যাহারা সমাজদ্রোহী ও দুরন্ত, তাহারা রাজার ও রাজমন্ত্রীর মুণ্ড পাতের জন্য গভীর রাত্রে ষড়্যন্ত্র করিতেছে। ভারতের প্রজা বর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ ঘটিলে লক্ষ হিসাবে ও কোটি হিসাবে নির্ব্বাক্‌ভাবে মরিতে থাকে, ইউরোপের প্রজা এক বেলা উদর তৃপ্ত না হইলে রাজার অভ্যর্থনার জন্য ডাইনামাইট সংগ্রহ করে। এই গেল এক দিক্। অন্য দিকে যখন আবার বাহিরের শত্রু আসিয়া রাজ্য আক্রমণ করে, প্রজা তখন দলে দলে রাজার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, এবং রাজা যদি পরাস্ত হয়েন, তখন তাঁহার হস্ত হইতে শাসনদণ্ড স্বয়ং গ্রহণ করিয়া তাহা শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত করে। ভারতের প্রজা শান্তির সময়ে রাজাজ্ঞা অবহিতভাবে পালন করে, কিন্তু রাজার নাম পর্য্যন্ত জানিবার আগ্রহ দেখায় না। আবার এক রাজার হাত হইতে যখন রাজদণ্ড স্খলিত হইয়া অপরের হাতে যায়, তখন নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে চাহিয়া দেখে। ইউরোপের প্রজা শান্তির সময় রাজার প্রত্যেক কথার ও প্রত্যেক কার্য্যের কৈফিয়ৎ না লইয়া চলে না, কিন্তু বিগ্রহের সময় ও বিপ্লবের সময় সে স্বয়ং রাজার আসনে আসিয়া দাঁড়ায়।

কেন এমন হইল? ইতিহাস কি এ কথার উত্তর দিতে সমর্থ নহে? কেবল দুষ্ট ব্রাহ্মণের উপর দোষ চাপাইয়া দিলে প্রশ্নটার প্রতি সুবিচার হইল বোধ হয় না।

আবার সময়ে সময়ে মনে হয়, এই প্রশ্নের কতকটা এইরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।—ইউরোপে ও ভারতবর্ষে এই পার্থক্যের প্রধান কারণ, ইউরোপে প্রজা চিরকাল ধরিয়া পরাধীন ও ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল ধরিয়া স্বাধীন।

উত্তরটা নিতান্তই হেঁয়ালি গোছের হইয়া পড়িল। সাধারণতঃ শুনা যায়, ইউরোপের প্রজা স্বাধীন ও ভারতের প্রজাই চিরপরাধীন। ইউরোপে এক হিসাবে আবহমান কাল হইতে প্রজাতন্ত্র শাসন-নীতি চলিতেছে ; ভারতে হিন্দু রাজার সময়েও রাজশক্তি যথেচ্ছাচার পদ্ধতি ক্রমে চালিত হইত। ইহাই ইতিহাসের সর্ব্ববাদিসম্মত কথা। কিন্তু এই প্রচলিত মীমাংসার বিরুদ্ধ একটা কথা যখন বলিয়া ফেলিয়াছি, তখন তাহার সমর্থন আবশ্যক ;

ভাষাশাস্ত্র ও যুক্তিশাস্ত্রকে টানিয়া বুনিয়া যেমন করিয়া হউক, সমর্থন করিতে হইবে।

পরাধীন ও স্বাধীন শব্দ দুইটা একটু বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করিয়াছি। আমি হিন্দুর রাজ্যে বা মুসলমানের রাজ্যে, কি খ্রীষ্টানের রাজ্যে বাস করি, তাহা দেখিয়া আমার স্বাধীনতার পরিমাপ হইবে না। আমার নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের কতখানি রাজার অধীন ও কতখানি আমার নিজের অধীন, জীবনের কতগুলা কাজ রাজার হুকুমে সম্পাদন করিতে হয়, আর কতগুলা কাজই বা আমার ইচ্ছামত সম্পাদন করিতে পারি, তাহা দেখিয়াই আমার স্বাধীনতার মাত্রা স্থির করিতে হইবে। আমি বলিতে চাহি যে, এই হিসাবে সেকালের ভারতবাসী একালের ইউরোপীয়ের অপেক্ষাও অধিকতর স্বাতন্ত্র্য সম্ভোগ করিয়াছে।

ইউরোপের ইতিহাস ধারাবাহিক সূত্রে আলোচনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? রোম নগরীর সম্প্রসারণ হইতে ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসের আরম্ভ। গ্রীস অন্যান্য বিষয়ে ইউরোপীয় সভ্যতার জননী হইলেও রাজনীতি বিষয়ে গ্রীসের সহিত আধুনিক ইউরোপের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। রোমে রাজা ছিল না, কিন্তু প্রজার সমবেত শক্তি রাজার স্থানে কার্য্য করিত। রোম ক্রমে দেশের পর দেশ গ্রাস করিয়া আপনার কলেবর সম্প্রসারিত করিতে লাগিল, এবং যেখানে যাহাকে পাইল, সকলকেই এক আইনে অধীন করিয়া সকলকেই সমান রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়া সমান অর্থে রোমান করিয়া ফেলিল। ইউরোপের সমগ্র দক্ষিণ ভাগে, আফ্রিকার উত্তর ভাগে ও এসিয়ার পশ্চিম ভাগে যেখানে যে ছিল, সকলেই বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন আচার লইয়াও খাঁটি রোমক হইয়া উঠিল, এবং অবশেষে একজন বা বহু জন সেনানীর হাতে প্রভুশক্তি অর্পণ করিয়া রোমের বিশাল কলেবর পার্শ্বস্থ শত্রুগণের গ্রাস হইতে রক্ষায় প্রয়াসী থাকিল। মহাসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু একটা মহাজাতির সৃষ্টি হইল না। রোমের অভ্যুদয়কালে যে জাতীয় ভাবের, রাষ্ট্রের হিতের জন্য ব্যক্তিগত হিত-পরিহারের জন্য ব্যগ্রতার যেমন উদাহরণ মিলে, রোম যখন প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত হইল, তখন আর তেমন উদাহরণ পাওয়া যায় না। সাম্রাজ্য জমাট বাঁধিল না। ব্যক্তি মাত্রেই রোমক, কিন্তু মহারোমক জাতির প্রতিষ্ঠা হইল না। উত্তরদেশীয় বর্ব্বরগণ সাম্রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া সাম্রাজ্য

ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। যেমন উন্নতি, তদুপযোগী পতন! সেই ভয়ানক বিপ্লবে ইউরোপের ইতিহাসের প্রাচীন পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়া নূতন পরিচ্ছেদ আরব্ধ হইল। এই নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভে আমরা কি দেখিতে পাই? এক এক সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডে এক একটা নূতন সঙ্কীর্ণ জাতির প্রতিষ্ঠা হইতেছে। নূতনে পুরাতনে মিশিয়া গিয়া পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন মশলায় পুরাতন ইটের বাঁধন দিয়া নূতন ঘর নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই নূতন পরিচ্ছেদে দুইটি নূতন ঘটনার অবতারণা দেখা যায়।

প্রথম—পূর্ব্বে যে একটা বিশাল সাম্রাজ্য ছিল, তাহার মধ্যে কাহারও পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদের উপায় ছিল না। রোমক তাহার অসংখ্য শত্রুর সহিত লড়াই করিতে বাধ্য হইত, রোমক সেনানী রোমক সেনানীর সহিত লড়াই করিত; কিন্তু রোমক প্রজা কখন রোমক প্রজার সহিত লড়াই করে নাই। কিন্তু এই নূতন অধ্যায়ের সূচনায় ইউরোপ কতিপয় খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইল; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ; সেই যে রণকোলাহলের আরম্ভ হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত তাহা থামে নাই। নবম শতাব্দীর আরম্ভে পশ্চিম ইউরোপে রোম-সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কিন্তু সে কেবল নামে, সেই নূতন প্রতিষ্ঠায় আভ্যন্তরীণ বিগ্রহব্যাপার, রাজার সহিত রাজার, রাজ্যের সহিত রাজ্যের, জাতির সহিত জাতির ভীষণ জীবন-দ্বন্দ্ব নিবারণে সমর্থ হয় নাই। এবং সহস্র বৎসরব্যাপী প্রযত্নের বিফলতার ফলে এই উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভেই রোমের শেষ সম্রাট্ রোম-সাম্রাজ্যের নাম পৃথিবীর ইতিহাস হইতে তুলিয়া দিতে সম্মত হইলেন।

দ্বিতীয়—রোমের রাজা ছিল না; খ্রীষ্টজন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে রোমের শেষ রাজা তার্কুইন সিংহাসন হইতে তাড়িত হয়েন; এবং খ্রীষ্ট-জন্মের আট শত বৎসর পরে জার্ম্মানির রাজা পোপের হস্ত হইতে সাম্রাজ্যের মুকুট গ্রহণ করিয়া ভাঙ্গা ইট জুড়িয়া নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণের চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ কাল মধ্যে রোমে রাজা ছিল না। যিনি সম্রাটের মুকুট ধারণ করিতেন, তিনি রোমক জনসাধারণের বিশ্বস্ত ও মনোনীত ভৃত্য ও সেনানী মাত্র ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের এই নূতন পরিচ্ছেদে প্রত্যেক রাজ্যে এক একজন স্বতন্ত্র দণ্ডধর রাজার অভ্যুদয় দেখিতে পাই। তিনি রাজা বলিয়া রাজা নহেন;—তিনি বৈদেশিক, বিধর্ম্মী, বিজেতা, অস্ত্রধারী, শাসক, পালক, প্রজার বাহ্য জীবন ও অন্তর্জীবনের নিয়ামক রাজা। রাজার

প্রথম কাজ, প্রতিবেশী রাজার সহিত যুদ্ধ,—প্রজার অর্থব্যয়ে ও প্রজার শোণিতব্যয়ে; আপন স্বার্থের জন্য। রাজার দ্বিতীয় কাজ, প্রজার নিপীড়ন, প্রজার ভৌতিক ও আত্মিক জীবনের স্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিয়া আপনার সর্ব্বতোমুখী প্রভুশক্তির স্থাপনার জন্য আরম্ভে কিছু দিন ধরিয়া শৃঙ্খলমুক্ত বর্ব্বরতা; তখন প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের অট্টালিকা ভাঙ্গিতেছে। ইউরোপের সেই তামস যুগ। পরে নূতন ইতিহাসের নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভ—নূতন নূতন খণ্ড রাজ্য তখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইউরোপের এই মধ্যযুগ। এই সময়ে সুবিখ্যাত ফিউডাল তন্ত্রের উৎপত্তি।

ফিউডাল তন্ত্রের অর্থ কি? নবাগত বিজেতা বৈদেশিক রাজা আসিয়া প্রজার সমস্ত ভূসম্পত্তি একবারে আত্মসাৎ করিলেন। তার পর সেই ভূসম্পত্তি আপনার আশ্রিত ও অনুগতগণকে বণ্টন করিয়া দিলেন। রাজা দাতা ও প্রজা গ্রহীতা। দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে একটা চুক্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। দাতা প্রতিবেশীর সঙ্গে চিরদিন যুদ্ধ করিবেন। গ্রহীতা আপনার জীবন ও আপনার শোণিত দিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে দাতার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত থাকিবেন। যাঁহারা জমির বড় বড় টুকরা ভাগে পাইলেন, তাঁহারা আবার সেইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া আপন অধীন ভৃত্যবর্গকে জমি বাঁটিয়া দিলেন। শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইল এই, যাহার এক টুকরা জমি আছে, তাহার জীবনের প্রধান কার্য্য যুদ্ধ। নিজের জন্য নহে, পরের জন্য, শেষ পর্য্যন্ত রাজার স্বার্থ সাধনের জন্য ইউরোপ একটা বিশাল সমরক্ষেত্রে পরিণত হইল। রাজায় রাজায় যুদ্ধ—তাঁহাদের খেয়ালের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য যুদ্ধ। প্রজা-সাধারণ অস্ত্রধারী ভৃতিভুক্ সৈনিক ও ভৃত্য; তাহাদের প্রধান কার্য্য রাজাজ্ঞায় দেহপাত ও জীবন দান।

ইউরোপের মধ্যযুগে মনুষ্যজীবনের প্রধান কার্য্য যুদ্ধ। মনুষ্য মাত্রেই তখন যোদ্ধা ও অস্ত্রধারী সৈনিক। যে যুদ্ধ করিতে জানে না, সে মানুষের মধ্যে গণ্য হইত না। রাজায় প্রজায় আর এক অভিনব সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। কেবল যুদ্ধের সময় রাজার আদেশে দেহপাতে প্রতিশ্রুত থাকিয়াই প্রজা মুক্তি পাইল না। রাজা তাহার পদদ্বয়ে শিকলের উপর শিকল পরাইয়া ক্ষান্ত থাকিলেন না। তাহার অন্তঃশরীরেও বন্ধনের উপর বন্ধন করিলেন। রাজা শাস্তা, রাজা বিচারক, রাজা ব্যবস্থাপক, রাজার আদেশের নাম আইন। কেবল তাহাই নহে—রাজা গুরু, রাজা শিক্ষক,

রাজা উপদেষ্টা। রাজা জ্ঞানের পন্থা দেখাইয়া দিবেন, রাজা ধর্ম্মের পন্থা দেখাইয়া দিবেন, রাজা মুক্তির পন্থা দেখাইয়া দিবেন। প্রজাকে সেই পথে চলিতে হইবে—নতুবা মঙ্গল নাই। ধর্ম্মযাজক রাজশক্তির সহকারী পোপ এবং কৈসার উভয়েই পরদেবতার মরদেহে অবতার। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা রাজা করিবেন, ধর্ম্মের ব্যাখ্যা রাজা করিবেন। নীতির পথ রাজার আদেশে নিরূপিত হইবে। প্রজা যদি মানিয়া চলে, তাহার পক্ষে মঙ্গল, নতুবা তাহার নশ্বর জীবনের সার্থকতা নাই। তাহাকে পোড়াইয়া ফেলাই যুক্তিসিদ্ধ। আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে। এবং ইহাকে যদি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বলিতে চাও, শব্দশাস্ত্রের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

আরম্ভ এইরূপ, কিন্তু এই আরম্ভের পরিণতি কোথায়? রাজা মনুষ্যের আত্মাকে লুপ্ত করিতে চাহেন, কিন্তু মানুষের আত্মা লুপ্ত হইবার পদার্থ নহে। মানুষের আত্মা এক অপরূপ জিনিস।

মানুষের আত্মাকে স্বাতন্ত্র্যের মুক্ত বায়ুমার্গে বিচরণ করিতে দাও। সে মুক্ত বায়ু ত্যাগ করিয়া কারাগারে আরামে নিদ্রা যাইতে থাকিবে। তাহাকে দলিত ও পীড়িত কর, সে ভুজঙ্গের মত গর্জ্জিয়া উঠিবে। ইউরোপে তাহাই ঘটিয়াছে। সেখানে রাজায় প্রজায় সনাতন বিরোধ; ফলে প্রজার জয়। রাজা স্বার্থের উদ্দেশে প্রজার হস্তে হাতিয়ার দিয়াছিলেন, প্রজা সেই হাতিয়ার শেষ পর্য্যন্ত রাজারই বিরুদ্ধে চালনা করিয়াছে, ধীরে ধীরে রাজার হস্ত হইতে প্রভুশক্তি কাড়িয়া লইয়াছে। এবং এক দিকে বহিঃশত্রুর নিকট ও এক দিকে রাজার নিকট হইতে আত্মরক্ষণে কৃতকর্ম্মা হইয়াছে।

মধ্যযুগের ইউরোপের প্রজা মাত্রকেই বাধ্য হইয়া অস্ত্র ধরিতে হইত, তাহাদেরই উপর দেশ রক্ষার ও রাজ্য রক্ষার ভার ছিল, বহিঃশত্রুর সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তাহারাই রাজার পার্শ্বে দাঁড়াইত। প্রত্যেকেই এইরূপ সৈনিকবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য থাকায় ইউরোপ কতকগুলি সামরিক জাতির বাসস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরবর্ত্তী ইতিহাসে প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু ইউরোপের প্রজাসাধারণ আজি পর্য্যন্ত এক হিসাবে সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। মধ্য যুগ অতীত হইলে পর রাজা আর প্রজার উপর ভরসা স্থাপন করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

তখন রাজায় প্রজায় রীতিমত বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। রাজা প্রজার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না; তার পর আবার বারুদের আবিষ্কারে পুরাতন সামরিক পদ্ধতিই একবারে উল্টাইয়া গিয়াছে। রাজা তখন বেতনভুক্ বাঁধা সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। প্রজারা আপন আপন গৃহকর্ম্ম সম্পাদনের অনুমতি পাইল। কিন্তু রাজার এই বেতনভোগী সৈন্য প্রজার অর্থে পুষ্ট হইত ও যখন বাহিরের শত্রু উপস্থিত না থাকিত, তখন প্রজারই শাসন ও দমনে নিয়োজিত হইত। প্রজাও কাজেই আত্মরক্ষণের অনুরোধে অস্ত্র ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই। এখনও ইউরোপের প্রত্যেক রাজা বেতন দিয়া বিরাট্ বাহিনী পোষণ করিতেছেন। রাজার নিকট প্রজার ততটা ভয় নাই, কিন্তু রাজায় রাজায় যুদ্ধের, রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা পূর্ব্বের অপেক্ষাও বাড়িয়াছে বই কমে নাই। জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, লোলুপ ঈর্ষাপর প্রতিবেশীর গ্রাস হইতে রক্ষার জন্য অদ্যাপি ইউরোপের প্রত্যেক প্রজা অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে। জার্ম্মানি প্রভৃতি রাজ্যে প্রজা মাত্রেই সৈনিক; আবশ্যক মতে সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে প্রস্তুত। ইংলণ্ডে প্রজার অধিক মাত্রায় এ বিষয়ে স্বাধীনতা থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সেখানেও ইংরাজের রণপোত ও ইংরাজের বলন্টিয়ার উভয়েই রাষ্ট্রের পক্ষে সমান মূল্যবান্।

প্রজার পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক, সমস্ত কার্য্যেই ইউরোপের রাজা হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন; বজ্রবন্ধনে বাঁধিয়া তাহার দেহ ও মন উভয়কেই অভিভূত করিতে চাহেন। এই হেতু উভয়ের মধ্যে সনাতন দ্বন্দ্ব। এই সনাতন দ্বন্দ্বের ফলে সেখানে মুহুর্ম্মুহুঃ রাষ্টবিপ্লব। ফরাসী বিপ্লবে যে ভীষণ ভূমিকম্প আরব্ধ হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার ধাক্কা মধ্যে মধ্যে চলিতেছে। রাজায় প্রজায় বিবাদ অদ্যাপি থামে নাই। কখনও যে থামিবে, তাহার ভরসাও নাই।

ঠিক এই কারণেই ইউরোপের খণ্ড জাতিগুলির মধ্যে জাতীয় ভাব এত উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বাহিরে জাতির সহিত জাতির, রাজ্যের সহিত রাজ্যের চিরন্তন বিসংবাদ; ভিতরে রাজার সহিত প্রজার সনাতন বিরোধ; ফলে প্রজামাত্র তৎপর, কর্ম্মঠ, অস্ত্রধারী সৈনিকে পরিণত।

এই অংশে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে সমগ্র জাতি কখনও এক হইয়া জমাট বাঁধে নাই। এক মহাসাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে সকলেই

কখনও স্থান লাভ করে নাই। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সমগ্র মহাদেশকে বিভক্ত রাখিয়াছিল। কিন্তু এই একটি রাজ্যের অধিবাসীরা কখন এক-জাতীয়ত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। ইউরোপে যেমন ফরাসী, জার্ম্মান, ইতালীয় প্রভৃতি কয়েকটি দৃঢ়বদ্ধ জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাদের স্বার্থ পরস্পরের প্রতিকূল, যাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সহানুভূতির বন্ধন নাই, ভারতবর্ষে সেরূপ কয়েকটি খণ্ড জাতি গঠিত হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থা কতকটা ইহার জন্য দায়ী। ইটালীর একটা ভৌগোলিক সীমানা আছে, স্পেনের আছে, গ্রীসের আছে, ইংলণ্ডের আছে, ফ্রান্স ও জার্ম্মানির মধ্যেও একটা সীমানা খুঁজিলে মিলিতে পারে। বাঙ্গলার কোন নির্দ্দিষ্ট সীমানা নাই, পাঞ্জাবেরও সীমানা নাই, মধ্যদেশেরও নির্দ্দিষ্ট সীমানা নাই। এক বিশাল সমতল প্রান্তরের এক এক অংশ লইয়া এক এক জাতি বাস করে। সেইরূপ কর্ণাট ও দ্রাবিড়ের মধ্যে, দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে কোন ভৌগোলিক সীমারেখা প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই। উৎকলের ভাষাকে বাঙ্গালী পরিহাস করিয়া থাকে বটে, কিন্তু কোন্ স্থানে বাঙ্গালার শেষ, আর কোথায় উৎকলের আরম্ভ, তাহার নির্দ্দেশ একবারে অসাধ্য। কাজেই প্রজাগণের মধ্যে জাতিবিভাগ ও জাতিবিদ্বেষ স্থাপিত হয় নাই। বাঙ্গালী তাহার প্রতিবেশী হিন্দুস্থানীকে বিশেষ প্রেমের চক্ষে দেখে না, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন ধর্ম্মগত বিদ্বেষও বর্ত্তমান নাই। এইরূপ সর্ব্বত্র।

প্রাচীন ভারতবর্ষে একই সময়ে অনেকগুলি রাজা থাকিতেন। কিন্তু কোন রাজারই রাজ্যের স্থায়ী সীমাচিহ্ন ছিল না। যিনি যতটা অধিকার করিয়া থাকিতে পারিতেন, তাহাই তাঁহার রাজ্য। রাজায় রাজায় লড়াই হইত বটে, যিনি যখন একটু প্রবল হইতেন, তিনিই একবার করিয়া দিগ্বিজয়েও বাহির হইতেন। কিন্তু আবহমান কাল ধরিয়া উভয়ের মধ্যে বদ্ধমূল বিদ্বেষের উদাহরণ প্রায় ঘটিত না। ইউরোপের ইতিহাসে কালের সৃষ্টি হইতে আজি পর্য্যন্ত ফরাসীর সহিত ইংরাজের বা জার্ম্মানের সহিত ফরাসীর যে সম্বন্ধের উল্লেখ করে, সেইরূপ সম্বন্ধের উদাহরণ ভারতবর্ষের মধ্যে নাই।

ভারতবর্ষে জাতিভেদের উল্লেখ করিয়া যাঁহারা একটা প্রকাণ্ড অনর্থের কারণ আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঠিক বুঝাইয়া দেন না, জাতিভেদ

সূত্রে রাজনৈতিক দুর্ব্বলতা কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে। জাতিভেদ একটা বৈষম্য বটে, কিন্তু তাহা রাজনৈতিক অধিকার লইয়া নহে, তাহা সামাজিক অধিকার লইয়া। খুব সম্ভব, ইতিহাসের পুরাতন পাতা উল্টাইলে এই বৈষম্যের মূলে রাজনৈতিক কারণ আবিষ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে অংশের সহিত আমাদের পরিচয়, তাহার মধ্যে কোনও রাজনৈতিক বিবাদের অস্তিত্ব দেখা যায় না। এই কাল মধ্যে ব্রাহ্মণ কখনও অস্ত্র ধরিয়া শূদ্র দমনে প্রবৃত্ত হয় নাই, শূদ্রও কখনও অস্ত্র লইয়া ব্রাহ্মণের কণ্ঠচ্ছেদে উদ্যত হয় নাই। ব্রাহ্মণের প্রতি প্রেম শূদ্রের না থাকিতে পারে, কিন্তু উভয়ের মধ্যেই নিদারুণ বিদ্বেষ ও ঈর্ষার অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ বর্ত্তমান নাই।

বিদ্বেষ ও ঈর্ষার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও মূল বিচারে কিছু আসে যায় না। ব্রাহ্মণও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রব্যাপী, শূদ্রও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রব্যাপী ; উভয়ে কিছু স্বতন্ত্র ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ড অধিকার করিয়া বাস করে না। কোন রাষ্ট্রীয় বিপ্লব উপস্থিত হইলে উভয়েরই লাভ বা উভয়েরই ক্ষতি সম্ভব।

কাজেই দেখা যাইতেছে, ইউরোপে একটা যাহা বিদ্যমান আছে, ভারতবর্ষে তাহা নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্য উভয়েই বর্ত্তমান, কিন্তু ইউরোপে যেমন ফরাসী জার্ম্মান প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী, পরস্পর প্রতিকূল, দৃঢ়বদ্ধ, সুগঠিত জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, ভারতবর্ষে সেই অর্থে তেমন ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী জাতির বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় নাই। ভারতবর্ষের যে কিছু বর্ণগত বা ধর্ম্মগত বা সম্প্রদায়গত বিরোধ আছে, তাহা রাজনৈতিক বিরোধ নহে, তাহা সামাজিক বিরোধ ; তাহা প্রত্যেক প্রদেশের, প্রত্যেক ভূখণ্ডের অভ্যন্তরেই বর্ত্তমান। তাহা জমাট বাঁধিয়া এক একটা নির্দ্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট ভূখণ্ড অধিকৃত করিয়া রাখে নাই। ফলে ভারতবর্ষে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইয়াছে, রাজবংশে রাজবংশে বহু দিন ধরিয়া বিবাদ চলিয়াছে, কিন্তু জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে মর্ম্মঘাতী যুদ্ধ কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এক প্রদেশের লোক দল বাঁধিয়া অন্য প্রদেশের লোকের উপর রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না।*

---

* মধ্যে মুসলমানের আমলে মারাঠাগণ ও শিখগণ দুইটা জাতির প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিল ; তাহার মধ্যে মারাঠা প্রতিবেশীর উপর উৎপাত করিতেও ছাড়িত না। এইখানে ইউরোপীয় ইতিহাসের কতকটা অনুকৃতি দেখা যায়।

আমার বিবেচনায় ভারতবাসী প্রজার এই প্রকৃতিগত অসম্পূর্ণতাই তাহার পরাধীনতার প্রকৃত কারণ। ভারতবাসী পরাধীন ; কেন না, বাহিরের শত্রু আসিয়া স্বদেশ আক্রমণ করিলে তাহাতে যে আপত্তি করিতে হয়, সে তাহা জানে না ; রাজলোকে কোন অঘটন ঘটনা হইলে তাহাতে যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়, তাহা তাহার মনের মধ্যে স্থান পায় না। ইংরাজীতে যাহাকে প্যাটরিয়টিজম্ বলে, সে ভাবটা তাহার মনে কখনও অঙ্কুরিত হয় নাই। ভারতবর্ষে কখনও জাতীয়তার বিকাশ হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহা আলোচ্য বিষয় ; এবং দুষ্ট ব্রাহ্মণের ঘাড়ে সমস্ত নিক্ষেপ করিলেও যে উত্তরটা সম্যক্ হইল, তাহা বিবেচনা করিতে পারি না।

মনে করিও না যে, ভারতবাসীর প্রাণের ভয় অন্যের অপেক্ষা বেশী বা ভারতবাসী সাহস বিষয়ে অন্যের অপেক্ষা হীন। এ কথা যে বলিবে, সে ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করে নাই।

জাতীয় ভাব কেন যে এ দেশে বিস্তার লাভ করে নাই, তাহার একটু অনুসন্ধান দরকার। সমুদায় হিন্দু জাতি কেন যে একটা মহাজাতিতে পরিণত হয় নাই, তাহা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক।

এক রাজার অধীনতা জাতীয় ভাবের বিকাশে সহায়তা করে। রাজনৈতিক বন্ধনের মত বন্ধন খুব কম আছে। আজকাল এ দেশে যে একটু সুর ফিরিবার রকম দেখা যাইতেছে, যেন জাতীয় ভাবের অতি সামান্য একটু বিকাশ হইতেছে বলিয়া কখন কখন সন্দেহ জন্মিতেছে, এক দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ রাজছত্রের অধীনতা তাহার কারণ, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে এ ঘটনা বোধ হয় কখনই ঘটে নাই। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি নরপতি এক একবার বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহারও সাম্রাজ্য বোধ হয় অধিক দিন স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। সমগ্র ভারতকে বহু দিন ধরিয়া একছত্র করিয়া রাখিতে কোনও রাজবংশই বোধ হয় সমর্থ হন নাই। তৎপূর্ব্বে সমগ্র দেশ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বস্বপ্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই ব্যাপারটা জাতীয় ভাবের অবিকাশের একটা কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

আরও কয়েকটা কথা আছে। ভারতবর্ষ অতি বৃহৎ দেশ। ইহার ভিতর নানা জাতীয় নানা বর্ণের লোক বাস করে। প্রথমেই ত আর্য্য ও

অনার্য্য ও তদুভয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন বিবিধ সঙ্কর বর্ণ। আবার অনার্য্যগণের মধ্যে ছত্রিশ কোটি শাখা।

এই বর্ণভেদ ও জাতিভেদের সহিত আবার ভাষাগত ভেদ। আর্য্য-ভাষা অনার্য্যভাষাকে একবারে লুপ্ত করিতে পারে নাই। দক্ষিণাপথের অধিকাংশ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোকেও অনার্য্যভাষায় কথা কহে। সেই ভাষার মধ্যেও আবার তামিল তেলুগু প্রভৃতি নানা ভাষা। আরণ্য ও পার্ব্বত্য অনার্য্যদিগের সহস্র ভাষার কথা ছাড়িয়া দাও। এক আর্য্যভাষাই আবার প্রদেশভেদে কত রূপ গ্রহণ করিয়াছে। পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, বাঙ্গলা,—এক প্রদেশের লোকে অন্য প্রদেশের ভাষা বুঝেন না। ভাষাগত ঐক্য না থাকিলে সামাজিক বন্ধন কোনও কাজের হয় না। সমস্ত ভারতবর্ষকে এক দেশ বলাই কঠিন। বরং সমগ্র ইউরোপকে এক দেশ বলা যাইতে পারে, সমগ্র ইউরোপীয়কে এক জাতিভুক্ত বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষকে একটা দেশ ও সমস্ত ভারতবাসীকে এক জাতিভুক্ত বলিতে যাওয়া একরকম বিড়ম্বনা।

বন্ধনের মধ্যে কেবল একটা বন্ধন ছিল। বন্য ও পার্ব্বত্যগণকে ছাড়িয়া দিলে প্রায় সমস্ত ভারতবাসী এক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। আর্য্য জাতির বেদমূলক পন্থায় প্রায় সকলেই চলিতে শিখিয়াছিল ও বেদমূলক আচার গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যেও বিবিধ সম্প্রদায়-ভেদ, বিবিধ আচারভেদ ঘটিয়া সমস্ত জাতিকে কখনও জমাট বাঁধিতে দেয় নাই।

জাতীয়তার অভাব বুঝাইবার জন্য এইরূপ কতকগুলা কথা বলা যাইতে পারে; এবং সচরাচর এইরূপ কারণই অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সবগুলা জড়াইলে একটা কথায় দাঁড়ায়। ভারতবাসী এক জাতিতে পরিণত হয় নাই; কেন না, ভারতবর্ষ দেশটা অতি প্রকাণ্ড। ইহা একটা দেশ নহে, একটা মহাদেশ। ইহা এক জাতির আবাসভূমি নহে, এক বর্ণের লোক ইহাতে বাস করে না। ইহা নানা জাতি ও নানা বর্ণের মনুষ্যের বিহার-ক্ষেত্র। ইহাতে নানা ভাষা, নানা আচার, নানা ধর্ম্ম। রাজনৈতিক বা সামাজিক, ধর্ম্মগত বা ভাষাগত বা আচারগত, কোন একটা সাধারণ সম্বন্ধ এই বিংশ কোটি মনুষ্যকুলকে একটা বাঁধনে আবদ্ধ রাখে নাই। এই সাধারণ বন্ধনের অভাবে ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির এমন আকর্ষণ ঘটিতে পায় নাই,

যাহাতে উভয়ে একত্র হইয়া সাধারণ উদ্দেশ্যে আপনার জীবনের গতি পরিচালিত করিতে পারে।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিলেই কি মনের তৃপ্তি হয়? ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখা যায়? অন্যত্রও কি ঠিক এই সকল কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও অন্যবিধ ফলের উৎপত্তি হয় নাই?

মনে কর ইউরোপ। ইউরোপ একটা মহাদেশ। কিন্তু রুসিয়াখণ্ড ছাড়িয়া দিলে এই মহাদেশের যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আয়তনে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক বড় হইবে না। সেখানেও ঠিক জাতিভেদ, বর্ণভেদ, আচার-ভেদ আমাদের মতই বিভিন্ন। ইউরোপীয়েরা সকলেই আর্য্যবংশীয় বলিয়া যতই আস্ফালন করুন না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই রক্তে বার আনা অনার্য্যরক্ত রহিয়াছে, ইহা প্রকৃত কথা। তবে ইউরোপে আর্য্যে ও অনার্য্যে যতটা মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের দেশে ততটা মিশিতে পায় নাই, ইহা সত্য বটে। আর্য্য অনার্য্য বিভেদ ততটা পরিস্ফুট না থাকিলেও এক আর্য্য জাতিরই বিবিধ শাখা ইউরোপের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর অসাদৃশ্য, এমন কি, বিদ্বেষের ভাবও নিতান্ত কম নহে। তার পর ভাষাভেদ, সেও নিতান্ত ফেলিবার নহে। ইউরোপে যতগুলা দেশ, ততগুলা ভাষা; এমন কি, একটা দেশের মধ্যেও পাঁচটা ভাষার অস্তিত্ব নিতান্ত বিরল নহে। একটা ধর্ম্মের বন্ধন উপর উপর দেখা যায় বটে; তুর্কি ছাড়িয়া দিলে ইউরোপের সকলেই খ্রীষ্টান। কিন্তু সে বন্ধনটা কেবল নাম মাত্র, কাজে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কেন না, খ্রীষ্টানের সঙ্গে খ্রীষ্টানের যেমন বিবাদ, অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গে তত নহে। খ্রীষ্টান খ্রীষ্টানকে পোড়াইতে যেমন আনন্দলাভ করিয়া থাকে, অন্য কোন কার্য্যে তাহার তেমন আনন্দ নাই বা আগ্রহ নাই। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগত বিদ্বেষ কত দূর ভীষণ আকার ধারণ করিতে পারে, ইউরোপের ইতিহাস আগুনের অক্ষরে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

ফলে ভারতবর্ষও যেমন কখনও একছত্র হয় নাই, ইউরোপও তেমনই কখনও একছত্রাধীনতায় আসে নাই। ভারতবাসী একত্র হইয়া যেমন মহাজাতিতে পরিণত হয় নাই, ইউরোপবাসীও সেইরূপ মহাজাতিতে পরিণতি লাভ করে নাই, উভয়ত্র একই কারণ। ভারতবর্ষ একটা দেশ নহে, একটা মহাদেশ। ইউরোপও তেমনই একটা দেশ নহে, একটা

মহাদেশ। ভারতবর্ষে যেমন একটা জাতি নাই, অনেক জাতি, ইউরোপেও তেমনই একটা জাতি নাই, অনেক জাতি। ভারতবাসীর যেমন ভারতের জন্য প্রাণ কাঁদে না, ইউরোপবাসীরও সেইরূপ ইউরোপের জন্য প্রাণ কাঁদে না।

একই কারণে একই ফল উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষ ও ইউরোপ দুই মহাদেশে একই কারণে একই ফল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু উভয়ের সাদৃশ্য এই পর্য্যন্ত। ইহার পর আর সাদৃশ্য নাই। ইউরোপবাসীর ইউরোপের জন্য প্রাণ কাঁদে না বটে, কিন্তু ফরাসীর প্রাণ ফ্রান্সের জন্য কাঁদে; জার্ম্মানের প্রাণ জার্ম্মানির জন্য আবেগের সহিত কাঁদিতেছে; ইতালীয়ের প্রাণ ইতালীর জন্য কাঁদিয়া উঠিয়া ইতালীকে এক মহারাজ্যে পরিণত করিয়াছে; ইংরাজের প্রাণ রোমের জন্য কাঁদিয়া থাকে, গ্রীসের প্রাণের অবরুদ্ধ প্রবাহ বাহির হইতে না পারিয়া অন্তঃসলিল বহিতে থাকে। আধুনিক ইতিহাস তাহার প্রমাণ। কিন্তু বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গলার জন্য কখনও কাঁদে নাই। পঞ্জাবীর প্রাণ পঞ্জাবের জন্য কাঁদে নাই—সে একবার কাঁদিয়াছিল অত্যাচারী ধর্ম্মদ্বেষী মুসলমানের রক্ত পানের অবসর না পাইয়া। মারাঠা মহারাষ্ট্রের জন্য কাঁদিয়াছিল বলিলে বোধ করি ভুল হয়, সে যে একবার অশ্রু ফেলিয়াছিল, সে বোধ হয় আনন্দের অশ্রু ও উল্লাসের অশ্রু। আনন্দ—মোগল সেনাপতির গলার মুক্তা ছড়াটার জন্য, উল্লাস—যবন রাজার টুপি কাড়িয়া ও দাড়ি মুড়াইয়া আপন উৎকট পরিহাসরসিক বৃত্তির চরিতার্থতায়। ভারতবাসী কেহ কখনও স্বদেশের জন্য বা স্বজাতির জন্য কাঁদে নাই, ইহাই সাধারণ নিয়ম; সাধারণ নিয়মের ব্যভিচারের কেবল একটা মাত্র উদাহরণ ইতিহাসে লেখে,—তেমন উদাহরণ জগতের ইতিহাসেও বোধ করি দুর্লভ; সে উদাহরণ মেওয়ারের রাজপুত।

এইখানে ইউরোপীয় ও ভারতবাসীতে তফাৎ। ইউরোপবাসী মহাদেশের ভাবনা ভাবে না ও মহাজাতি প্রতিষ্ঠায় তাহার আগ্রহ নাই, কিন্তু সে তাহার খণ্ড দেশ মধ্যে খণ্ড জাতির প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাকে সেই জাতিশরীরের অঙ্গীভূত করিয়া স্পন্দিত হয়। সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ কতকগুলি খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে, এবং এক একটা রাজ্যে এক একটা দুর্দ্দম দৃঢ়বদ্ধ সবল জাতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ফরাসী জার্ম্মানির শোণিত পানের তৃষ্ণায় ব্যাকুল; কিন্তু ফরাসী আবার ফ্রান্সের জন্য আপন

শরীরের শেষ শোণিতবিন্দু প্রদান করিতে প্রস্তুত। তেমনই জার্ম্মান, তেমনই ইংরাজ। ইউরোপে এই অর্থে জাতীয় ভাবের স্ফুরণ ও বিকাশ হইয়াছে, ইউরোপে এই অর্থে প্যাট্রিয়টিজম্ উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

তার পর রাজায় প্রজায় সম্বন্ধ। আমাদের দেশে এই সম্বন্ধও ইউরোপ হইতে সম্পূর্ণ বিসদৃশ। অনেক ঐতিহাসিক ভারতের প্রাচীন শাসন-প্রণালীকে রাজতন্ত্র বা যথেচ্ছাচার প্রণালী বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় সেকালের শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণ প্রজাতান্ত্রিক ছিল; প্রজা যে পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগের আপনা হইতে অধিকার পাইয়াছিল, সহস্র বৎসরের বিবাদের ফলে আধুনিক ইউরোপীয় প্রজা তাহা পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। প্রাচীন হিন্দু রাজা পুরাণ-প্রথিত রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের সদৃশ ছিলেন, এরূপ আমার বিশ্বাস নাই। তাঁহারা দোষের গুণের মানুষ ছিলেন; এবং রাজ-জাতীয় মনুষ্যের স্বাভাবিক নিয়মমত বোধ হয়, গুণের ভাগ অপেক্ষা দোষের ভাগই অধিক ছিল। স্বার্থের জন্য বা রাজ্যের জন্য বন্ধু বন্ধুকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, পুত্র পিতাকে, ভৃত্য প্রভুকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; এরূপ উদাহরণ ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসেও বিরল নহে। কিন্তু অন্যত্র প্রজার সহিত রাজার যে একটা বিরোধ দেখা যায়, এখানে সেটা তেমন প্রবল মাত্রায় ছিল না। রাজার ও প্রজার মধ্যে তেমন দৃঢ় বন্ধনই বোধ হয় ছিল না। প্রজা খুব সামান্য ভাবেই রাজার প্রভুশক্তির অধীন ছিল। প্রজার রাজার নিকট নিপীড়িত হইবারও বিশেষ অবসর ঘটে নাই, রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবারও তেমন দরকার হয় নাই। অত্যাচারী প্রজাপীড়ক রাজা কেহ ছিল না, এমন কথা নহে। কথাটা হইতেছে সাধারণ নিয়ম লইয়া। কয়েকটা বিষয় আলোচনা করিলে এ বিষয়টা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইতে পারে।

সেকালের রাজার কেবল একটা কাজ। তিনি দণ্ডধর। তিনি সৈন্য-পরিবৃত হইয়া শত্রু হইতে রাজ্য রক্ষা করেন ও রাজসিংহাসন রক্ষা করেন। এবং তিনি রাজ্যের মধ্যে দুষ্টের শাসন দ্বারা শান্তিরক্ষা করিতেন। সর্ব্বত্র না হউক, অনেক স্থানে মন্ত্রণা দান ও বিচারের ভার ব্রাহ্মণের হাতে ছিল; এবং ব্রাহ্মণকে, যেমনই প্রবল রাজা হউন, ভয় করিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। শাসন বিষয়ে ও বিচার বিষয়ে রাজার খেয়াল ততটা কাজ করিতে পারিত না। কিন্তু এই স্থলেই বোধ হয় প্রজার সহিত রাজার

সম্বন্ধের শেষ। রাজা কর আদায় করিতেন, করের ভার দুর্ব্বহ ছিল কি না, সে বিষয়ে ইতিহাস কিছু বলে না। কর সংস্থাপনে রাজা ইচ্ছার উপর ও খেয়ালের উপর চলিতেন কি না, সে বিষয়েও ইতিহাস নিরুত্তর। রাজা যাহাই করুন, শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণ কিন্তু এ বিষয়েও রাজার শক্তি সংযত করিয়া দিতে অন্ততঃ চেষ্টার ক্রটি করিতেন না। রাজা কর আদায় করিতেন, তাহার দ্বারা আপন সেনা পোষণ করিতেন, শান্তিরক্ষা করিতেন, বাবুয়ানা করিতেন, এবং ইচ্ছা হইলে হয়ত সাধারণের হিতের জন্যও কতক খরচ করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু প্রজার স্বাধীনতা সংহারের জন্য এক কপর্দ্দক ব্যয় করিতেন, এরূপ প্রমাণ নাই।

ব্যবস্থা প্রণয়ন অর্থাৎ আইন কানুনের প্রণয়ন রাজার হাতে ছিল না। প্রজা আপন চিরাগত প্রথানুসারে আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। আইনের ব্যাখ্যাটা ব্রাহ্মণ ঠাকুরের হাতে ছিল বটে, এবং তিনি দায়ভাগ হইতে ডাক্তারী উপদেশ পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিতে ছাড়িতেন না; এবং অপরাধীর সংখ্যা ক্রমে বাড়াইয়া একবারে গণনার বাহির করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল অপরাধের অধিকাংশ স্থলেই স্বকৃত প্রায়শ্চিত্ত, জোর এক আধটু সামাজিক নিগ্রহের বিধান ছিল। রাজদ্বারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খবর পঁহুছিত না। বিচারাদি কার্য্যও অনেক স্থলে মধ্যস্থের দ্বাবা ও সমাজের মুরুব্বিদের দ্বারা সম্পাদিত হইত। গ্রামের ভিতর, পল্লীর ভিতর প্রজার দৈনন্দিন ও নিত্যনৈমিত্তিক জীবন-ব্যাপার গ্রামের লোকের পরস্পর সাহায্যে সম্পাদিত হইত। রাজার সহিত কোন বিষয়ে কোন সম্বন্ধ ছিল না বা সংঘর্ষ ঘটিত না। ফলে শান্তিরক্ষা ও শত্রুর সহিত লড়াই ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত কাজই প্রজারা আপনা আপনি আপনাদের মধ্যেই গোছাইয়া লইত। গ্রামের পাঁচ জনে মিলিয়া গ্রামের কাজ সম্পাদন করিত। সমাজের পাঁচ জনে কর্ত্তা হইয়া সমাজের কাজ সম্পাদন করিত। রাজার নিকট উপস্থিত হইতে হইত না; রাজাও কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। আভ্যন্তরীণ রাজনীতি রাজার অধিকার-বহির্ভূত ছিল। হইতে পারে, এই সকল ব্যাপারে ব্রাহ্মণ অন্যান্য জাতির উপর অবৈধভাবে ও অন্যায্য উপায়ে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিস্তারের চেষ্টা করিতেন, হয়ত এই সূত্রে ব্রাহ্মণের সঙ্গে অপরের বিরোধ ঘটিত বা বিদ্বেষ ঘটিত। কিন্তু সে বিরোধ প্রজায় প্রজায়; রাজার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না।

আর একটা প্রকাণ্ড স্বাধীনতা ভারতের প্রজার স্বাভাবিক ছিল,—ভারতের বাহিরে অন্যত্র মনুষ্য যাহার রসাস্বাদে আজি পর্য্যন্ত বঞ্চিত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষে রাজা কখনও প্রজার চিন্তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইউরোপে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে যাজকসম্প্রদায় জনসাধারণের জন্য ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। রাজা সেই যাজক-সম্প্রদায়ের সহায় ও পৃষ্ঠপোষক থাকিতেন। যে ব্যক্তি প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে রসনাস্ফালনে সাহসী হইত, সমগ্র রাজশক্তি বজ্রের মত তাহার মস্তকের উপর নিপতিত হইত।

কেহ যদি জ্ঞান বিজ্ঞানের একটা নূতন কথা প্রচার করিলেন, তৎক্ষণাৎ রাজাদেশে প্রজ্বলিত চিতানলে তাঁহার শরীরকে ভস্মীভূত করিয়া আত্মার সদ্গতির ব্যবস্থা হইল। ফলে অজ্ঞানের তমোময় অন্ধকার সমগ্র মহাদেশকে সহস্র বৎসর ধরিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বপ্রান্তে যে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখা জ্বলিয়া উঠিয়া সমগ্র জগৎকে আলোকিত করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, বর্ব্বর খ্রীষ্টানের বর্ব্বর রাজশক্তি ও বর্ব্বর যাজকশক্তি একত্র সম্মিলিত হইয়া তাহাতে শীতল বারিধারা নিক্ষেপ করিয়া অচিরে নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিল। জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, গণিত, পদার্থবিদ্যা, মনোবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা অঙ্কুরিত হইয়া সতেজে শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি করিতেছিল; তাহারা একবারে উন্মূলিত ও উৎপাটিত হইল। সুকুমার কলাবিদ্যা মানবের দুঃখময় জীবনে সুখের ও শান্তির প্রতিষ্ঠার জন্য নানা উপায়ে নিযুক্ত হইতেছিল; বর্ব্বরগণের প্রবল কুঠারাঘাতে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। জ্ঞানের পন্থা কণ্টকিত হইল; স্বাধীন চিন্তার দ্বার আবদ্ধ হইল; ইউরোপের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে চিতার অনলে দার্শনিকের ও তত্ত্বানুসন্ধায়ীর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইতে লাগিল।

রাজসম্প্রদায়ের ও যাজকসম্প্রদায়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। মানবাত্মার সম্প্রসারণের পথ রোধে সমবেত যাজকশক্তি ও রাজশক্তি কৃতকার্য্য হয় নাই। মনুষ্য আপন স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছে। খড়্গাহস্তে আপনার ন্যায্য সম্পত্তি ফিরাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর এই অন্তিম কালে, বিজ্ঞান যখন দর্পের সহিত অগ্রসর হইতেছে, দর্শন যখন অজ্ঞানের তিমিররাশি ভেদ করিয়া সত্যের রাজ্য

প্রতিষ্ঠার জন্য চলিয়াছে, এখনও কি সেই পুরাতন জরাজীর্ণ রাজশক্তি ও যাজক-শক্তি পৈশাচিক কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া নাই ?

ভারতবর্ষে বিধান অন্যরূপ। এখানে যে মানবসম্প্রদায়ের হস্তে জ্ঞানালোচনার ভার অর্পিত ছিল, রাজশক্তি সভয়ে তাহার নিকট প্রণত থাকিত। মনুষ্যের ধীশক্তি অপ্রতিহতপ্রভাবে সহস্র দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সহস্র দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল; কেহ বলিতে সাহস করে নাই, ঐ পন্থায় তুমি চলিও না। যিনি বলিতে চাহেন, ভারতের ব্রাহ্মণ মনুষ্যের চিন্তাশক্তিকে শৃঙ্খলিত ও নিগড়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি হয় অন্ধ, নতুবা মিথ্যাবাদী। তাঁহার সহিত বিচারের অবতারণা বিড়ম্বনা।

সামাজিক, নৈতিক, ভৌতিক ও মানসিক, সকল ব্যাপারেই ভারতীয় প্রজা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন ছিল; ঠিক এই কারণে রাজার সহিত কখনই তাহার বিরোধের আশঙ্কা ঘটে নাই। এই জন্য সে কখন অস্ত্রধারী সৈনিকের ব্যবসায় অবলম্বনে বাধ্য হয় নাই। রাজার সহিত রাজার যুদ্ধ হইত; এক রাজার হস্ত হইতে রাজদণ্ড অন্যে কাড়িয়া লইতেন; কিন্তু প্রজার স্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধে কেহই দণ্ডায়মান হইতেন না। প্রজাও সেই জন্য রাজ-পরিবারের ও রাজবংশের ভাগ্যপরিবর্ত্তনে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। রাজার সহিত বিরোধ করিতে হয়, রাজার নিকট আপনার পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইতে হয়, কথায় কথায় রাজার কৈফিয়ৎ চাহিতে হয়, ভারতের প্রজার এই শিক্ষালাভের অবসরই ঘটিয়া উঠে নাই। যে শিক্ষা ও যে পরীক্ষা, যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব হইতে জাতীয় ভাব ও রাজনৈতিক ভাব বিকশিত হয়, এদেশে তাহার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। কারণের অভাব, ফলেও সেইরূপ।

ভারতের প্রজা জানিত না, রাজার সহিত বিরোধ করিতে হয়; সে জানিত না, রাজার ছত্র দণ্ড লইয়া অপরে টানাটানি করিলে রাজার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইতে হয়; সে জানিত না, রাজবিপ্লবের ফলের সহিত প্রজার সামাজিক জীবনের শুভাশুভ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইতে পারে। অতি প্রাচীন কালে যুদ্ধ ব্যবসায় চালাইবার জন্য একটা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাদের নাম ছিল ক্ষত্রিয়। রাজার সিংহাসন রক্ষার জন্য, শত্রুহস্ত হইতে দেশ রক্ষার জন্য এই ক্ষত্রিয় জাতিই প্রয়োজনমত অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইত। বৌদ্ধ বিপ্লবের সময় প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির উচ্ছেদ হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যুদ্ধব্যবসায়ী মনুষ্যসম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল না;

যাহারা বেতন গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের ব্যবসায় চালাইত, তাহাদের কোন নৈতিক দায়িত্ববোধ ছিল না। প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির লোপ হইয়াছিল। প্রাচীন সমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, নূতন সমাজ গঠনের কার্য্য আরম্ভ হইতেছিল মাত্র। এই সময়ে পশ্চিম দেশ হইতে যবন, শক, হূণাদি বিবিধ সমরপ্রিয় বর্ব্বর জাতি হিন্দুস্থানে দলে দলে প্রবেশ লাভ করিতে থাকে; অনেক বড় বড় রাজ্য স্থাপনেও কৃতকার্য্য হয়। কিন্তু অল্প দিনেই তাহারা হিন্দুস্থানের সামাজিক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজের অন্তর্গত ও অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল। এই সকল নবাগত সমরপ্রিয় জাতিগণকে লইয়া ভারতবর্ষের নূতন ক্ষত্রিয় রাজপুতের অভ্যুত্থান হইল। যখন মুসলমান আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল, ভারতবর্ষের প্রজাসাধারণ তাহাতে শঙ্কিত ও ত্রস্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা আত্মরক্ষণে সমর্থ হয় নাই। আত্মরক্ষার জন্য যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন, সে শিক্ষা কখনও তাহারা পায় নাই। তাহারা দল বাঁধিয়া সাধারণ শত্রুর বিপক্ষে দাঁড়াইতে সমর্থ হয় নাই, অথবা ঐ কার্য্যের আবশ্যকতার উপলব্ধি করে নাই। নূতন ক্ষত্রিয় রাজপুত একা সেই দুরন্ত শত্রুর প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছিল। বেগবতী প্রবাহিণীর গতিরোধ তাহাদের অসাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু মুসলমানের মত প্রচণ্ড শত্রুর সঙ্গে তাহারাও যেরূপ লড়িয়াছিল, তাহার বিবরণ পৃথিবীর ইতিহাসে চিরকাল লিপিবদ্ধ থাকিবে।

মুসলমান আমাদের দেশের রাজা হইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রজার উপর উৎপীড়ন অত্যাচারও যথেষ্ট করিতেন; কিন্তু মোটের উপর পারিবারিক ও সামাজিক, দৈহিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্যের দিকে তাঁহাদেরও লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় নাই। কিছু দিনের মধ্যেই হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের অধিবাসী হইয়া ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; একই ভারতমাতা উভয়েরই জননীস্বরূপা হইয়া উঠিয়াছিলেন। সম্প্রতি বৈদেশিকের অধিকারে যেন উভয়ের সেই ভ্রাতৃভাবের ও সখ্যভাবের বন্ধন ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে সামাজিক আচারগত বন্ধন অসম্ভব; কিন্তু ভরসা যে, বিশালচ্ছায় ব্রিটিশ রাজছত্রের তলে দণ্ডায়মান উভয় জাতি এক ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সখ্যসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া পরস্পরকে বর্দ্ধিত ও পোষিত করিতে থাকিবে। ('সাহিত্য,' অগ্রহায়ণ, ১৩০৪)।

শিক্ষাপ্রণালী

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মীমাংসা হইয়াছিল, ইংরাজি না পড়িলে আমাদের কোন উন্নতি হইবে না, যেহেতু সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তালপত্রের গ্রন্থগুলিতে কেবল ক্ষীরসমুদ্রের ও দধিসমুদ্রের বর্ণনা আছে।

আজকাল সাব্যস্ত হইতে বসিয়াছে, ইংরাজি পড়িয়া ত বিশেষ কিছু ফল হইল না। পঞ্চাশ বৎসরের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় পণ্ড হইল দেখিয়া দেশের মধ্যে একটা হাহুতাশ ও কলরব উপস্থিত হইয়াছে ও চারি দিকেই তাহার প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে।

বৎসর দুই পূর্ব্বে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি বার্ষিক অধিবেশনের বক্তৃতাকালে সোসাইটির জন্মকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সোসাইটির সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির লেখকের তালিকা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, দেখ, তালিকামধ্যে বাঙ্গালীর নাম কেমন বিরল ; এত কাল ইংরাজি শিখিয়াও একটা সুচারু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ইহাদের মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইল না ; বাঙ্গালীর কোন আশাই নাই। তাহাদের মাথাই নাই।

দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী জাতির প্রতি দয়া বিতরণে বিধাতা তেমন মুক্তহস্ত নহেন, তথাপি কেমন করিয়া এই নিদারুণ বাক্যবাণ তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া তাঁহার হৃদয়কে একটু যেন করুণ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। কেন না, উক্ত অধিবেশনের পর এক বৎসর পার না হইতেই ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর কার্য্যকলাপ বাঙ্গালীর মলিন মুখকে সহসা জ্যোতির্ম্ময় করিয়া দিয়াছে।

বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত ক্ষুদ্র যন্ত্রটি বনমানুষের হাড়ের বিনা প্রয়োগে আদেশ মাত্রে আকাশতরঙ্গ ঘটিত যে সকল নিগূঢ় কথা বলিয়া ফেলে, তাহা সাধারণ বাঙ্গালীর নিকট দুর্ভেদ্য রহস্য মাত্র, কিন্তু তিনি যে তাহার শুষ্ক মুখে হাস্য সঞ্চার করিয়াছেন, তজ্জন্য সে তাঁহার নিকট চিরকাল ঋণী থাকিবেক।

যাহাই হউক, বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অনুর্ব্বরতা সম্বন্ধে আজকাল তত লম্বা কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, তথাপি কর্ষণ সত্ত্বেও ফল প্রসব হইতেছে না কেন, তাহা চিন্তনীয় বিষয়।

সে দিন বিজ্ঞান-সভায় বঙ্গের মহামান্য শাসনকর্ত্তা বলিয়াছেন, বাঙ্গালীর নিরাশ হইবার তেমন কারণ নাই, তবে কর্ষণের পদ্ধতি-দোষে এ রকম

ফলাভাব। সুচারুরূপে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কর্ষিত হইলেই ক্ষেত্রে শস্য জন্মিবে এবং কৃষ্ণ কাকের জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ ঘটিলেই সে গৃধ্ররাজের সহিত আপনার পার্থক্য বুঝিতে পারিয়া তাহার কর্কশ কলরবে বিরাম দিবে।

সেই পদ্ধতিটা কি? বক্তার মতে আমাদের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীটা ঠিক নহে। অর্থাৎ ভারত গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা লাভ যে প্রণালীতে বাঙ্গালী সন্তানকে মানুষ করিতেছেন, তাহাতে সে মানুষ না হইয়া কাক হইতেছে। ছাত্রেরা পাঠশালায় প্রবেশ করিয়া অবধি কেবল শব্দতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্ব অভ্যাস করে, সেই জন্য তাহাদের কেবল শব্দালঙ্কারে ও বাক্যালঙ্কারে আপনাকে অলঙ্কৃত করিবার শক্তি জন্মে। কখনও হাতে কলমে কাজ শিখে না, বিশেষতঃ বিজ্ঞান শাস্ত্র নামে যে একটা শাস্ত্রকে সকলেই নিন্দা করে, অথবা যাহার সাহায্য না লইলে এক পা চলিতে পারে না, সেই শাস্ত্রের একবারে আলোচনা নাই বলিলেই হয়। অথচ অন্য পক্ষে মিলের ও বার্কের রচনা হইতে কতকগুলা বচন সংগ্রহ করিয়া তাহার বাবদূকতা বৃদ্ধি পায়। কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপে তাহার প্রয়োগ করিতে হইবে, সে ক ই তাহার জন্মে না। অস্ত্র বড় উপকারী পদার্থ, কিন্তু যে অস্ত্রের ব্যব রে অনভিজ্ঞ ও প্রয়োগে অপটু, তাহার পক্ষে তাহা কেবল ভারস্বরূপ।

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত আছি; বিজ্ঞান শি কার উপকারিতা সম্বন্ধে অন্যের কোন সন্দেহ থাকিলেও আমাদের কিছু মাত্রও সংশয় নাই এবং বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসাদে আমাদের কার্য্যকারণ- ন ও তাহার সহিত কাণ্ডজ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে, তাহাও আমরা সম্পূর্ণ করি; আর হাতে কলমে শিক্ষা, যাহাকে ইংরাজিতে টেক্‌নিক্যাল বে প্রয়োগাভিজ্ঞতা জন্মে না, তাহাও স্বীকার ক ছে, তাহার উত্থাপনের পূর্ব্বে আর কে বি যাক।

আমাদের বিদ্যালয়ে ধর্ম্মহীন চরিত্র ভাল জমা তেই কোন বে আম থাকি

আমাদের সম্বন্ধ বুঝি না। আমরা উপরে ভাসি, তলে মগ্ন হইতে পারি না। যত দিন ধর্ম্মহীন ও নীতিহীন শিক্ষা বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন আমরা সংসার-সলিলে ভাসিতেই থাকিব।

এ কথাটাও আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাঁহারা এই বিষয়ে কথা তুলেন, তাঁহারা মীমাংসার পথ দেখান না। যাঁহাদের উপর শিক্ষার বন্দোবস্তের ভার আছে, তাঁহারাও ইহা স্বীকার করেন, কিন্তু কর্ত্তব্য বিচারের সময় কেমন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়েন। গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-জড়িত সমাজে আমরা কিরূপে ধর্ম্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি; বিশেষতঃ যখন আমরা এ বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিব না, এই প্রতিশ্রুতি করিয়া বসিয়া আছি। তবে ধর্ম্ম অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও নীতির উপদেশ চলিতে পারে; তাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়া দিয়াছেন যে, প্রবেশিকার সাহিত্য-পুস্তকের এত পাতার মধ্যে এত পাতার কম যেন নীতিকথা না থাকে। নীতিশিক্ষার এমন রাজকীয় পন্থা আবিষ্কার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন অন্যের কর্ত্তৃক অসাধ্য। কোন কোন বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা আরও কিছু বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মিশনারী স [illegible]বেরা ছাত্রদিগকে ভয় দেখান, বাইবেল-ক্লাসে উপস্থিত না থাকিলে [illegible]ক্ষা দিতে দিব না। অপিচ আর্য্য-বিদ্যার আকরগুলিতে আজকাল [illegible]তা পাঠের ও চাণক্যশ্লোক আবৃত্তির ব্যবস্থা হইতেছে। এমন কি, গবর্ণমে[illegible]টের আনুকূল্যে স্থাপিত "উচ্চতর শিক্ষাসমাজ" আপনার নাম গোপন করিয়াও মাঝে মাঝে নৈতিক লেক্‌চারের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, শুনি[illegible]। আশা করা যায়, গবর্ণমেণ্ট আগামী দশম বার্ষিক সেন্সাস লইব[illegible]

[illegible]ই সকল উপায়ে নীতিশিক্ষাপ্রাপ্ত বালকগণের সংখ[illegible]

দিবেন ও বর্ষে বর্ষে এই সকল উপায়ে ব[illegible]

তি হইতেছে, তাহার একটা করিয়া রি[illegible]

সম্প্রদায় আরও একটু মূ[illegible]

স্বভাবে কেবল মান[illegible]

[illegible] যাইতেছে।

এবং যথে[illegible]

ক ব[illegible]

করিবে ? এই জন্য কিছু দিন পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তাব হইয়াছিল, যাহারা বৎসরের মধ্যে এত দিন কুস্তিশালায় উপস্থিত না থাকিবে, তাহাদিগকে যেন পরীক্ষা দিতে না দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে মানসিক ব্যায়ামের মাত্রাটা কিছু কমাইবার এবং দরিদ্র অন্নহীন বালকের শারীরিক ব্যায়ামে অত্যন্ত আবশ্যক শরীর পোষণের উপাদান সংগ্রহের কোন প্রস্তাব হইয়াছিল কি না, ঠিক জানি না। এইরূপে নানারূপ কারণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে ও হইতেছে। কেহ বলেন, পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যা বেশী; কেহ বলেন, পাঠ্য পুস্তকের পাতা বেশী; কেহ বলেন, ছেলেরা না বুঝিয়া কেবল মুখস্থ করে; কেহ বলেন, পুস্তক মুখস্থ না করিয়া তাহার 'কী' অর্থাৎ অর্থ-পুস্তক মুখস্থ করে; কেহ বলেন, সেই 'কী' আবার ভুলে পূর্ণ। সম্প্রতি একখানি প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক কাগজ কয়েক মাস ধরিয়া প্রমাণের চেষ্টা করিতেছেন যে, বাঙ্গালী লিখিতে গেলেই ইংরাজি ভুলে, সেই জন্য এত দুরবস্থা। কেহ বা একবারে নির্ঘাত বলিয়া ফেলেন, ইংরাজি শিক্ষাটাই কিছুই নয়; স্কুলগুলি তুলিয়া দিয়া টোল বসাও।

আমরা নিরীহ ভাবে এই সকল কথারই সারবত্তা মানিয়া লইতেছি; কিন্তু প্রত্যেকটাতেই আমাদের সেই প্রাচীন 'কিন্তু' রহিয়াছে। ইংরাজি শিক্ষা উঠাই[illegible] যে শিক্ষা চলিতে পারে না, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না, কি[illegible] টবে কি ? ভুল না লিখিয়া শুদ্ধ ইংরাজি লিখিলে ভাল হয়, কি[illegible] অছিলা অনুসারে ভ্রান্ত লেখকের শাস্তি বিধান করিব ? [illegible] পরিশ্রম আবশ্যক, কিন্তু ফ্যামিন ফণ্ডের তহবিলেও আর এত [illegible] নাই যে, তাহার সাহায্যে ফুটবল ক্রীড়ার্থীর আহারের ব্যবস্থা [illegible] ইবে। ধর্ম্মশিক্ষা ত ভাল, কিন্তু ইণ্ডিয়ান মিরারের সার্টিফিকেট [illegible] সকলে গীতার অর্জ্জুনকৃত ভগবৎস্তোত্রকেও অসাম্প্রদায়িক বলিয়া [illegible]ার করিবে না। বিজ্ঞান শিক্ষা ত অতি উত্তম পদার্থ, কিন্তু যে [illegible]ক্ষপীয়র বা বার্ক মুখস্থ করিয়াছে, তাহার মুখে দুইটা মিষ্ট বাক্যের আশা [illegible] যায়, কিন্তু যে কেবল ডেশানেলের বিজ্ঞানগ্রন্থ মুখস্থ করিয়াছে, তাহার [illegible]ট সে আশাও নাই।

সকলেই সকল কথা বলেন, কিন্তু একটা সোজা কথা কেহই বলেন না, [illegible]া মুখে বলিলেও সেই বাক্যের ন্যায়সঙ্গত তাৎপর্য্য বুঝিয়া দেখেন [illegible]। সেই সোজা কথাটা এই যে, শিক্ষা কোথায় যে বাঙ্গালীসন্তান

শিক্ষালাভ করিবে? উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বর্ত্তমান; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দেন না, কেবল পরীক্ষা করেন; এবং সেই পরীক্ষার পদ্ধতি আবার এমন যে, যে শিখিতে ব্যস্ত, তার পরীক্ষায় উদ্ধারের আশা নাই; যে মুখস্থ করে, সে-ই তরিয়া যায়। শিক্ষার ভার স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের হাতে; কিন্তু প্রকৃত শিক্ষাদানে প্রকৃত বিদ্যালয়ের জীবনের স্থায়িত্ব সম্ভাবনা কতটুকু, তাহা যিনি জানেন, তিনিই বুঝিবেন। বিদ্যালয় শিক্ষা দেয় না, বিদ্যালয় পরীক্ষার জন্য ছাত্র তৈয়ার করে মাত্র।

সেই পদ্ধতিই বা আবার কেমন? ইংরাজেরা আজকাল সকল কাজ কলে চালান। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত নানা যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। জল তোলা, গাড়ী টানা, আলো জ্বালা, সমস্তই যন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদিত হয়। ইংরাজের সাম্রাজ্যে শাসনকার্য্য যন্ত্রে চলে। এ দেশে ইংরাজ-প্রবর্ত্তিত শিক্ষাকার্য্যও যন্ত্রে সম্পাদিত হয়। ছাত্রের পিতা বা অভিভাবক যথাসময়ে বালককে কলে ফেলিয়া আসেন; এবং কিছু দিন পরে কল হইতে বাহির করিয়া লয়েন। বালক যখন কল হইতে বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার ললাটপটে 'শিক্ষিত' [illegible] যদি অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে—পরিশ্রম ও ব্যয় বিধান সার্থক হইয়াছে; বালকের মন-শরীরের অভ্যন্তরে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কি না, লওয়া অনাবশ্যক।

মধ্যে শুনিয়াছিলাম, এডিসন্ সাহেব সন্দেশ তৈয়ার করিবার করিয়াছেন,—কলের এক প্রান্তে একটা গরু ও কয়েকগাছি ইক্ষুদ দিলে অন্য প্রান্ত হইতে সন্দেশ বাহির হইয়া আসে।

গরু ও ইক্ষুদণ্ডকে আহারোপযোগী সন্দেশে পরিণত করিবার সকল প্রতিভা আবশ্যক, তাহা যন্ত্রটি নীরবে ধারাবাহিকরূপে করিয়া থাকে। আমাদের শিক্ষাযন্ত্রে লব্ধপ্রবেশ বালক যখন শিক্ষি ছাপ লইয়া বাহির হইয়া আসে, তখন যন্ত্রসম্পাদিত বিকৃতিটা সন্দে মত মধুর হয় কি না, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

জীব-শরীরকেও আজিকালি যন্ত্রের সহিত উপমিত করিবার দাঁড়াইতেছে। জীবদেহ অনেক বিষয়ে যন্ত্রের মত হইলেও উভয়ের একটা পার্থক্য আছে। শরীর-যন্ত্রের বিবিধ অঙ্গের মধ্যে পরস্পর য সম্বন্ধ আছে, নির্জ্জীব যন্ত্রের বিবিধ অঙ্গের মধ্যে পরস্পর তেমন সম্বন্ধ নাই

ঘটিকাচক্রের একখানা চাকা ভাঙ্গিয়া গেলে যন্ত্র কিছু কালের জন্য বন্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে অন্যান্য চাকা ও অন্যান্য অঙ্গ নষ্ট হয় না; সেই ভাঙ্গা চাকাখানি মেরামত করিয়া দিলে ঘটিকাযন্ত্র আবার পূর্ব্বের মতই চলিতে থাকে। কিন্তু জীবদেহের একটা অঙ্গ বিকৃত বা ব্যাধিগ্রস্ত হইলে অনায়াসেই অন্যান্য অঙ্গও অল্প বা অধিক মাত্রায় বিকৃত ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে, রক্তের দোষে মাথা খারাপ হয়, মাথার দোষে হাত পা নষ্ট হয় ইত্যাদি। এবং একটা অঙ্গ একবার নষ্ট হইয়া গেলে তাহার মেরামতও সহজে চলে না।

নির্জ্জীব যন্ত্রের এক স্থানে বিকৃতি ঘটিলে বিকৃতিটা সেইখানেই আবদ্ধ থাকে; আর সজীব যন্ত্রের একটা স্থানে ব্যাধি ঘটিলে সেই ব্যাধি ক্রমে প্রসার লাভ করিয়া সমগ্র যন্ত্রকেই আক্রমণ করে। এক কথায় ইংরাজিতে যাহাকে সিম্পাথি বলে, জীবদেহের বিবিধ অঙ্গের মধ্যে তাহা বর্ত্তমান; যন্ত্রদেহের বিবিধ অবয়ব মধ্যে তাহা বর্ত্তমান নাই।

আমাদের ভারত সাম্রাজ্যের শাসন-প্রণালীর সহিত আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর তুলনা করিতে মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়। উভয়ই যন্ত্র সাহায্যে সম্পাদিত হয়। ইংরাজের রাজ্য শাসন কলে চলে, বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানও কলে চলে। শাসন-যন্ত্র ও শিক্ষা-যন্ত্র [illegible]ই বিবিধ অঙ্গ ও বিবিধ অবয়ব বর্ত্তমান আছে [illegible] মধ্যে পরস্পর যেন একটা সম্বন্ধ বা [illegible] শাসন-যন্ত্রের [illegible] মহারাজ্ঞী [illegible] নেমি যেমন [illegible] পুঞ্জের নিয়তি [illegible]। কিন্তু সেই [illegible], একের সংবাদ [illegible] সেই কেন্দ্র [illegible] শুষ্ক নীরস [illegible] ভেদ করিয়া [illegible]ই উপনীত হই[illegible] [illegible]হির হয়, তাহা [illegible]রীরের সর্ব্বত্র [illegible]

হইয়া অস্থি-মজ্জা ও স্নায়ু-পেশী প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক দূরস্থিত কোষের নিকট স্নেহসামগ্রী ও পুষ্টির উপাদান লইয়া যায় ; ও বিশুদ্ধ রক্তধারা-বাহিত উপাদানে পুষ্ট ও স্নিগ্ধ ও নবীকৃত হইয়া প্রত্যেক কোষ আপন জীবনযাত্রা নূতন বলে আরম্ভ করে। হৃৎপিণ্ড এইরূপে প্রত্যেক কোষের যথা-সময়ে সংবাদ লয় ও প্রত্যেক কোষ তাহার প্রতিবেশীর ও দূরস্থিত কুটুম্বগণের সংবাদ রাখে ও কেন্দ্রস্থিত হৃৎপিণ্ডের নিকট আবেদন পাঠাইয়া দেয়। আমাদের ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনচক্রে এইরূপ সজীবতার কোন চিহ্ন নাই। যাঁহাদের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত আছে, তাঁহারা নির্দ্ধারিত নিয়মের অনুসারে আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া যান ; ঘটিকাচক্রের চাকা হয়ত সব সময়ে যথানিয়মে কর্ত্তব্য পালন করে না, কিন্তু শাসন-যন্ত্রের প্রত্যেক চক্র বিনা তৈল প্রয়োগে নীরবে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া চলে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। অথবা জড় প্রকৃতি যেমন নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃত নিয়মের অনুসারে সকল প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহার দয়াও নাই, আবার ক্রোধও নাই, প্রেমও নাই, তেমনই বিরাগও নাই, সেইরূপ প্রেমশূন্য ঈর্ষাশূন্য, ঘৃণাশূন্য, অনুরাগ বিরাগ উভয় ভাববিবর্জ্জিত শাসন-যন্ত্র অহর্নিশ আপন কাজ করিয়া যাইতেছে, কাহারও মুখের পানে চাহিয়া আপনার কর্ত্তব্য পালনে বিরত থাকে না। শাসন-যন্ত্রের যে কয়েকটি বিশেষণ ব্যবহার করিলা[illegible] [illegible]গুলি ঠিক হইয়াছে কি না, সে বি[illegible] [illegible]পারে, কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা-যন্ত্রে[illegible] [illegible] বোধ হ[illegible]
কাহারও আপ[illegible]
সাঙ্কেতিক বর্ণ[illegible]
উহার প্রকৃত পা[illegible]
অধিকাংশের নিকট[illegible]
অনির্দ্দেশ্য, [illegible]
নেমিপ্রদেশে[illegible]
নিতান্তই ক[illegible]
[illegible]স্মিত হইয়াছি[illegible]
[illegible]াত্রী দেবী
[illegible]। তাঁহার [illegible]

শিক্ষা-যন্ত্রের কোন অনির্দ্দেশ্য স্থানে অবস্থিত থাকিয়া শুষ্ক কঠোর ব্যবস্থা নির্দ্দেশে ও নিয়ম নির্দ্দেশে ও দণ্ড চালনায় শিক্ষার্থীর ভ্রমণপথ নিয়ন্ত্রিত করেন। বাগ্‌দেবী ত দূরে আছেন, যে শিক্ষক ও অধ্যাপক সম্প্রদায় মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া উপাসিতার সহিত উপাসকের সম্বন্ধ স্থাপনে নিয়োজিত তাঁহারাও রাগানুরাগশূন্য যন্ত্রাঙ্গ মাত্রে পরিণত হইয়াছেন। আচার্য্য ও শিষ্যের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ ও অনুরাগের সম্বন্ধ না থাকিলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্য কেবল পণ্য বিনিময়ের ন্যায় হইয়া দাঁড়ায়; এবং সেই পণ্য বিনিময়ের ফলে আর যাহাই হউক না কেন, তাহাতে মনুষ্যত্বের পুষ্টিলাভের কোন আশা থাকে না। একালের বেতনভোগী রাজপুরুষ যেমন আপন নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের পর আপনাকে ঋণমুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহার পরিশ্রমের আশানুরূপ ফল লাভ ঘটিল কি না, তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে তাঁহার অবসরও নাই, প্রবৃত্তিও নাই, একালের অধ্যাপকও সেইরূপ তাঁহার বৃত্তির বিনিময়ে নির্দ্ধারিত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আপনার সকল কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইল ধ্রুব জানেন, তাঁহার শিষ্যের সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখিবার প্রয়োজন ঘটে না।

[illegible]কালের কুটিল চক্রে শিক্ষা আজকাল বিজ্ঞানশিক্ষা, সাহিত্যশিক্ষা, [illegible]শিক্ষা, নীতিশিক্ষা, ইতিহাসশিক্ষা, হাতে কলমে শিক্ষা বা টেক্‌নিক্যাল [illegible] ইত্যাদি নানা উপাধিতে অলঙ্কৃতা হইয়া সহস্র শ্রেণীতে বিভক্ত [illegible]াছে; এবং কোন্‌ শিক্ষা ভাল আর কোন্‌ শিক্ষা মন্দ এই তর্কের [illegible]ালাহলে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা [illegible]ই কোলাহলের অর্থ সম্যক্‌ উপলব্ধি করিতে একবারেই অক্ষম। শিক্ষা [illegible]লিলে আমরা কেবল একটা মাত্র শিক্ষাই বুঝিয়া থাকি; এবং সেই শিক্ষার [illegible] মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি, স্ফূর্ত্তি ও পরিপুষ্টি। যাহাতে অপুষ্ট মনুষ্যত্ব পুষ্টিলাভ [illegible]রে, প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব বিকাশ পায়, হীন মনুষ্যত্ব স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া জাগ্রত চেতন হইয়া উঠে, তাহাকেই আমরা শিক্ষা নামে অভিহিত করিয়া থাকি, [illegible]বং সেই শিক্ষার আবার একটা ভিন্ন যে পাঁচটা পথ আছে, তাহাও আমাদের [illegible] আসে না। সত্য বটে, মনুষ্য বয়স্ক হইলে তাহাকে একটা ব্যবসায়- [illegible] অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়,—এবং সেই ব্যবসায়- [illegible]ভিজ্ঞতা লাভের জন্য কিছু দিন একটা সঙ্কীর্ণ রাস্তায় শিকল পায়ে দিয়া [illegible]ক হইয়া উঠে। কিন্তু সে বয়সের কথা, বাল্যের কথা নহে।

যাহার মনুষ্যত্ব স্ফূর্ত্তি ও বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, যাহার গায়ে বল জন্মিয়াছে, যে অন্যের হাত না ধরিয়া অথবা যষ্টির সাহায্য না লইয়া নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে, যাহার চোখের উপর একটা রঙিন পরকলার আচ্ছাদন নাই, এবং সেই চোখ উন্মীলন করিয়া যে দিগন্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাকে এই ব্যবসা শিক্ষার জন্য প্রয়াসের দরকার হইবে না। সে আপন ব্যবসায় আপনি বাছিয়া লইবে, আপন রাস্তা আপনি দেখিয়া লইবে, এবং আবশ্যক হইলে সেই নির্ব্বাচিত পথে বাহির হইয়া কুঠার হস্তে তাহার প্রতিরোধক বিঘ্ন অপসারিত করিয়া, যাহা দুর্গম ছিল, তাহা সুগম করিয়া লইবে। তাহার জন্য তুমি চিন্তা করিও না। কিন্তু সেই বল সঞ্চয়ের পূর্ব্বে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে,—যাহাতে তাহার আপনার উপর নির্ভর করিবার শক্তি জন্মে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রকৃত কথা এই যে, বাল্যকালের উপযোগী যে শিক্ষা, সে শিক্ষার কেবল একটা অর্থ, এবং তাহার কেবল একটা উপায়। সত্য বটে যে, ব্যক্তিভেদে সেই উপায় প্রয়োগের বিধিরও অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন আবশ্যক ; কিন্তু সাধারণ নিয়ম একটা। কেবল বিজ্ঞান বা কেবল ইতিহাস বা কেবল সাহিত্য শিক্ষা দিলে চলিবে না। যেরূপেই হউক, বালকের মনুষ্যত্ব যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। পৃথিবীর এবং চাঁদের সূর্য্যের, অম্লজানের ও যবক্ষারজানের কতকগুলি সংবাদ আনিয়া মাথায় পূরিয়া দিলে তাহাকে শিক্ষা বলিব না। শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জন নহে, বালক যাহাতে স্বয়ং আপন চেষ্টায় সমর্থ হয়, তাহার বিধানের নামই শিক্ষা।

এইরূপ শিক্ষাকে ধর্ম্মবর্জ্জিত বা নীতিবর্জ্জিত শিক্ষা বলিলে চলিবে না : ঠিক যে উপায়ে তাহার মন শরীরে বলের সঞ্চার করিতে হইবে, ঠিক সেই উপায়েই এক সঙ্গে ধর্ম্মের ও নীতির বিকাশেরও চেষ্টা করিতে হইবে। বিজ্ঞানশিক্ষার অথবা ধর্ম্মশিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই,—আমাদের ইচ্ছা শিক্ষা যেন বিজ্ঞানসম্মত ও ধর্ম্মসঙ্গত হয়। বিজ্ঞানসম্মত ও ধর্ম্মসঙ্গত দুই বিশেষণ পৃথক্ করিয়া ব্যবহার করিলাম, তাহাতে কেহ যেন না বুঝেন যে, বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা একরূপ ও ধর্ম্মসঙ্গত শিক্ষা অন্যরূপ, দুইটা দুই কালের শিক্ষা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যাহা বিজ্ঞানসম্মত, তাহাই ধর্ম্মসঙ্গত ; যাহা বিজ্ঞানসম্মত নহে, তাহা ধর্ম্মসঙ্গতও হইতে পারে না।

এইরূপ শিক্ষা কি উপায়ে দেওয়া যাইতে পারে? বর্ত্তমান প্রবন্ধে সকল কথার আলোচনা অসম্ভব। প্রচলিত পদ্ধতির সমালোচনা ও দোষ প্রদর্শনার্থই বোধ হয় চারিটা প্রস্তাব লেখা যাইতে পারে ও প্রকৃষ্ট পদ্ধতি একটা গড়িয়া তুলিতে হইলে আরও দুটো প্রস্তাবে কুলায় না, তবে একটা মনের কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

প্রথমেই আমরা শিক্ষক মহোদয়ের নিকট সানুনয় প্রার্থনা করিব, মানব-সন্তান যতই দুর্ব্বল হউক, তাহাকে যেন একটা গতিহীন যন্ত্র বলিয়া বিবেচনা না হয়। প্রকৃতপক্ষে সে একটা জীব। অন্ততঃ একটা উদ্ভিদের পালন ও বর্দ্ধনের জন্য সচরাচর যে বিধি প্রচলিত আছে, মনুষ্যশিশুর পালনে ও বর্দ্ধনে যদি সেই-রূপ বিধানও অবলম্বিত হয়, তাহা হইলেও আমাদের তত ক্ষোভ থাকে না।

এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, একটা সামান্য তৃণজাতীয় উদ্ভিদেরও বৃদ্ধির জন্য খানিকটা হাওয়া ও খানিকটা জল ও খানিকটা রৌদ্রের নিতান্ত আবশ্যক। যদি কেহ আঁধার গর্ত্তের ভিতর অথবা শুষ্ক বালুকার উপর বাগান তুলিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাঁহাকে আমরা ভক্তির সহিত বন্দনা করিব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা পারে নাই। গাছের অঙ্কুর যখন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বাহির হয়, তখন যদি তাহার চারি দিকে একটা লোহার জাল পাতিয়া তাহাকে স্বাধীনভাবে মাথা তুলিতে না দেওয়া যায়,—তবে তাহার উদ্ভিদলীলা অচিরেই সমাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। প্রশস্ত স্থানে রসপরিষিক্ত মৃত্তিকার মধ্যে খোলা বাতাসে উন্মুক্ত আকাশের নীচে তাহাকে স্বাধীনভাবে বাড়িতে দাও ও তাহাকে আপনার আহার আপনি সংগ্রহ করিয়া আপনার অঙ্গ পোষণ করিতে দাও ও যত দিন বাল্যকালানুগত দৌর্ব্বল্য বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন প্রবল ...ক্রুর ও প্রবল আপদের আক্রমণ হইতে যত্নের সহিত ও স্নেহের ...া কর; দেখিতে পাইবে, কিছু দিন পরেই সে আপনি পূর্ণ ও সমর্থ ...খায় পল্লবে হরিদ্বর্ণ হইয়া উঠিবে, ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে; ...য়ায় সে তোমার সাহায্যের প্রার্থী থাকিবে না, তখন সে আত্মরক্ষার ...মার মুখাপেক্ষী হইবে না, তখন সে উন্মত্ত প্রভঞ্জনের সহিত মল্লযুদ্ধে ...য়াও স্থানচ্যুত হইবে না; স্বয়ং দূরপ্রসারী মূল বিস্তার করিয়া ...বে আলিঙ্গন ... থাকিবে ও ঊর্দ্ধে শাখা প্রশাখা ... করিবে।

যম, নিয়ম ও শাসনের কোন আবশ্যকতা নাই, এ কথা আমি বলিতে চাহি না। যদি প্রস্তাবের ভাষার ভঙ্গীতে সেইরূপ কেহ বুঝিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট সানুনয় ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমার এই মাত্র বলা উদ্দেশ্য যে, শাসন ও সংযম সম্পূর্ণ আবশ্যক হইলেও স্বাধীন বৃত্তির একবারে সংহার সাধনটা ঠিক নহে। শিক্ষার্থীর অন্তঃকরণে যে সকল শক্তির অঙ্কুর হইতেছে, সেই সকল শক্তিকে একবারে আবদ্ধ ও সংযত না করিয়া স্বাধীনভাবে খেলিতে দাও, এবং যত ক্ষণ সে স্বাধীনভাবে খেলা করিতে থাকিবে, তত ক্ষণ একটু দূরে ও অন্তরালে দণ্ডায়মান থাক। যদি তাহাকে পথভ্রান্ত হইয়া ধ্বংসের পথে চলিতে দেখ, তখনই সময় নষ্ট না করিয়া সাবধান করিয়া দাও; মুখের কথায় ফল না হইলে তীব্রতর শাসনের ব্যবস্থা কর। কিন্তু যখন বেত্রহস্তে দণ্ডায়মান হইবে, তখনও যেন তোমার মূর্ত্তি দেখিয়া গুরুমহাশয় বলিয়া ভ্রম জন্মিতে না পারে। এ কথাই মনে রাখিবে যে, জননীর পীযূষপূর্ণ স্তন্যধারাতেই তোমার জড় দেহ পুষ্টি লাভ করিয়াছে, কারাগৃহের নিয়মের মধ্যে তোমাকে বাস করিতে দিলে তোমার গুরুত্ব প্রাপ্তির অবকাশ ঘটিত না।

বাস্তবিকই নবাগত মানবশিশুর চোখের সম্মুখে এত বড় সৌন্দর্য্যপূর্ণ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বসুন্ধরাটা বিস্তৃত রহিয়াছে, ইহাতে দেখিবার বিষয় কত আছে ও শিখিবার বিষয় কত আছে। শিশুর সহিত যখন তাহার ভবিষ্যতের বাসভূমির প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন সকলই তাহার নিকট নূতন ও নূতনত্বের রহস্যে ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। কত আগ্রহের সহিত কত ঔৎসুক্যের সহিত সে সেই নূতন পরিচিতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য চেষ্টা পায় এবং সম্বন্ধ স্থাপনে যে একটু সফলতা লাভ করে, তাহাতে তাহার কত আনন্দ উপস্থিত হয়। এমন সময়ে তুমি যদি তাহার ও জগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই সম্বং[illegible] াপনে বাধা দিতে চাও ও তাহার সেই আনন্দের প্রতিরোধী হও, ত[illegible] তুমি নিষ্ঠুর ও পাষণ্ড; তুমি যদি সেইরূপ কার্য্যের দ্বারা তাহার হি[illegible] বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তুমি ঘোর মূর্খ।

তোমার এ স্থলে কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্য যথেষ্ট আছে। [illegible] বেত্রহস্তে তাহার গতিরোধ করিয়া দণ্ডা[illegible]মান হও ও মুক্ত জগতে তাহার সাক্ষাৎ করা নিষেধ করিয়[illegible] [illegible]
[illegible]বি কেবল তোমার [illegible]

সংযত করিয়া, তাহার নিকট উপস্থিত করিয়া তাহাকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে বুঝিব, তোমার কর্ত্তব্যবোধ হয় নাই। তুমি তাহাকে স্বাধীনভাবে জগতের মধ্যে বিচরণ করিতে দাও; নিত্য নূতন সামগ্রী আহরণ করিয়া তাহার ইন্দ্রিয়পঞ্চকের সম্মুখে স্থাপিত কর, তুমি তাহার হইয়া দেখিও না বা দেখাইয়া দিও না, সে স্বয়ং চেষ্টা করিয়া দেখিতে থাকুক। তাহার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়, প্রত্যেক স্নায়ু, প্রত্যেক পেশী জাগতিক বিবিধ পদার্থের স্পর্শে আসিয়া পরিচালিত হউক ও বৃদ্ধি লাভ করুক ও পুষ্টি লাভ করুক। তুমি গুরুমহাশয়ের ও উপদেষ্টার কঠোর মূর্ত্তি সংবরণ করিয়া সহচরের মত ও বন্ধুর মত তাহার পাছে পাছে চলিতে থাক। তাহার চিত্ত যেন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে না পারে; খাদ্য সামগ্রীর অভাবে যেন তাহার পাকস্থলীর নিষ্কর্ম্মা হইবার অবসর না ঘটে, অথচ দুষ্পাচ্য ও গুরুভার পদার্থের ভারে যেন পাকস্থলী অবসন্ন হইয়া না পড়ে। সে স্বয়ং দেখিবে, স্বয়ং শুনিবে, স্বয়ং স্পর্শ করিয়া পরীক্ষা করিবে; এবং পরীক্ষা করিয়া ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে বিবিধ পদার্থের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে থাকিবে। বহুত্বের মধ্যে একত্ব দেখিবে; সাদৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য দেখিবে, পাঁচ বার বা প্রতারিত হইবে এবং প্রতারিত হইয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইবে, পুনঃ পুনঃ তাহাকে প্রতারিত হইতে দিবে; যে কখন সংসারের মধ্যে প্রতারিত হয় নাই, তাহার ভাগ্যের আমি প্রশংসা করি না। সে পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হউক, তাহাকে প্রতারিত হইতে দেখিয়া তুমি দয়া করিবে না; কবল আশার বাক্যে, উৎসাহের বাক্যে ও স্নেহের বাক্যে তাহার মনে আগ্রহের ও প্রীতির ও ঔৎসুক্যের সঞ্চার কর। সে পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হউক ও অবশেষে সফলতা লাভ করিয়া পরমানন্দে ভাসিতে থাকুক; তুমি তাহার আনন্দে আনন্দ দেখাও, তাহার উৎসাহে উৎসাহিত হও, তাহার মনে উৎসাহের শক্তি আরও উদ্দীপিত করিয়া দাও। ইহারই নাম বিজ্ঞানশিক্ষা, ইহারই নাম সাহিত্যশিক্ষা, ইহারই নাম ধর্ম্মশিক্ষা। শারীরিক ও মানসিক ও নৈতিক, ত্রিবিধ শিক্ষাই একই প্রণালীতে সম্পাদিত হইবে। যাহাতে শরীরে বল আসিবে, তাহাতেই চিত্তে স্ফূর্ত্তি জন্মিবে, তাহাতেই বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ লাভ করিবে, তাহাতেই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে। ইহারই নাম আবার হাতে কলমে শিক্ষা; যে ঠেকিয়া না শেখে, [illegible] শিক্ষা হয় না।

আমার বিবেচনায় এই মূল সূত্রটি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে কার্য্যকালে কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, দেশ-কাল-পাত্রভেদে কিরূপ বিশেষ বিধান ও বিশেষ ব্যবস্থা আবশ্যক হইবে, তাহা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে, এ স্থলে সে সকল বিশেষ বিধির অবতারণায় প্রবৃত্ত হইব না।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে যে বিশেষ কোন নূতন তত্ত্বের উল্লেখ হইল, তাহা নহে। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, শিক্ষা কাহাকে বলে, তাহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার সময় সকলেই প্রায় একরকম কথাই বলিয়া থাকেন, তবে প্রয়োগের সময় আর মূল সূত্রের অনুসারে কার্য্য হয় না। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে, যাঁহারা বক্তৃতার সময় শিক্ষা সম্বন্ধে নানা যুক্তিপূর্ণ বাক্যমালা সাজাইয়া বলেন, তাঁহারাই আবার প্রয়োগের সময় ঠিক বিরোধী নীতি অবলম্বন করেন।

আজকাল আমাদের শিক্ষা-বিভাগের বালকদের ডিসিপ্লিনের একটা ধুয়া উঠিয়াছে। বাজারের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে বস্তুতঃই ডিসিপ্লিনের ব্যবস্থা একটু সুচারু না থাকিলে জীবনযাত্রা অচল হয়। কিন্তু তথাপি ডিসিপ্লিন কথাটা শুনিলেই মনে কেমন একটা ব্যথা লাগে। সেনানিবাসে, পুলিশের থানায় ও কারাগারে ডিসিপ্লিনের কঠিন বন্দোবস্তের দরকার বুঝিতে পারি, কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়গুলিও কি কালমাহাত্ম্যে ঐ সকল স্থানের সহি‹ এক পর্য্যায়ভুক্ত হইবার যোগ্য হইয়াছে? কর্ত্তৃপক্ষেরা এ ঘটনা যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে ভাল হয়। অন্যান্য দেশে ব্যবস্থা কির‹ জানি না, কিন্তু আমাদের সেকালে চতুষ্পাঠীতে শান্তি রক্ষার জন্য ‹ নীতি রক্ষার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা প্রয়োগের কোন দরকার ছিল, বোধ হয় না। মনুসংহিতাতেও ব্রহ্মচারীর কঠোর সংযম অভ্যাসের বিধি আছে; কিন্তু বিধির অপালনে দণ্ডবিধানের পারুষ্য দেখি না। অথবা মনুসংহিতার মহিমান্বিত ব্রহ্মচর্য্যের কথা এ স্থলে উত্থাপন করিয়াই আমি কেন অকারণে পাতকগ্রস্ত হইতে বসিয়াছি?

শিক্ষার প্রণালী যেমনই হউক না কেন, আনন্দ ও আগ্রহ ও উৎসাহ যদি তাহার আনুষঙ্গিক না হয়, তবে তাহাকে যে শিক্ষা নাম দিতে চাহে, [illegible] ষণ্ড, সে নাস্তিক। অভিধানে বাছিয়া আমি তাহার উপযুক্ত বি[illegible] মর্থ। আজকাল হিপ্নটিজম্ বিদ্যার সমালোচনায় যে

সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে এই কথারই সমর্থন করে। মনুষ্যের চিত্তের মত নমনীয় কোমল পদার্থ বুঝি আর কিছুই নাই। যখন এইরূপ অবস্থা, তখন শিক্ষার কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কেবল বেত্রাঘাত ও শাসন ও ভয় প্রদর্শন ও নৈরাশ্য সঞ্চারের ব্যবস্থা করিয়া মানসিক উৎকর্ষ জন্মাইবার আশা কেবল বাতুলের স্বপ্ন মাত্র। পক্ষান্তরে স্নেহের বাণী ও আশার বাণী দুর্ব্বল হস্তেও বল প্রদানে সমর্থ হইতে পারে। স্পন্দহীন হৃৎপিণ্ডকে উত্তেজিত করিতে পারে, স্নায়ুর মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া নির্জীব দেহেও জীবনের সঞ্চার করিতে পারে। এ সকল স্থূল কথা ও সহজ কথা ; অথচ কেহ বুঝিবে না, হা হতোঽস্মি ! হা দগ্ধোঽস্মি !

ব্যক্তিগত শিক্ষার সম্বন্ধে যে কথা বলা গেল, জাতীয় শিক্ষার সম্বন্ধেও সেই কথা আরও জোরের সহিত বলা যাইতে পারে। এবং আরম্ভ করিলে কথাও বোধ হয় ফুরাইবে না। প্রবন্ধান্তরে সে কথার আলোচনার চেষ্টা করিব। ('ভারতী,' জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫)

সামঃ

রাষ্ট্র ও নেশন্

বিংশ শতাব্দীতে যুগধর্ম্ম—রাষ্ট্র ও নেশন্, এই দুই ঐতিহাসিক পদার্থ অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই পণ্ডিতগণের বিশ্বাস। বঙ্গদর্শন নবজীবন লাভ করিয়াই এই যুগধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা বঙ্গদর্শনের অতীত জীবনের সহিত অসঙ্গত নহে।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের ভারতবর্ষে এই দুইটি পদার্থেরই কোন কালে অস্তিত্ব ছিল না। সাহাবুদ্দিন ঘোরিকে যদি ভারতবর্ষব্যাপী মহারাষ্ট্রের সম্মুখীন হইতে হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষের পরবর্ত্তী ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত। এবং ভারতবর্ষে নেশন্ থাকিলে পৃথিবীর ইতিহাসও কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত, তাহা বলা যায় না।

অধ্যাপক সীলী বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে নেশন্ নাই; কিন্তু এমন বীজ হয়ত আছে, যাহা হইতে কালে নেশন্ অঙ্কুরিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে। এই কারণে রাষ্ট্র কাহাকে বলে ও নেশন্ কাহাকে বলে, তাহা ভারতবাসীর পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। কিন্তু বুঝা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

নেশনের লক্ষণ সম্বন্ধে রেনাঁর মত বঙ্গদর্শনে সঙ্কলিত হইয়াছে। যিনি অবহিত ভাবে উহা পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিবেন, এক কথায় নেশনের সংজ্ঞা দেওয়া চলে না। রাষ্ট্র আশ্রয় করিয়া নেশন্ উৎপন্ন হয়; কিন্তু রাষ্ট্র মাত্রেই নেশন্ জন্মে না। ইউরোপ খণ্ডে রুষিয়া প্রবলপ্রতাপ রাষ্ট্র; কিন্তু রুষীয় জাতিকে নেশন্ বলা যায় কি না সন্দেহ।

নেশন্ বলা যায় না; কেন না, রুষিয়া নামে মহারাষ্ট্রের একমাত্র নিয়ন্ত্রী সর্ব্বতোমুখী রাজশক্তি। এই রাজশক্তি প্রজাশক্তির একবারে মুখাপেক্ষা করে না। প্রজাশক্তি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, রাজশক্তিকে সমর্থন করে না।

যেখানে রাজশক্তিতে ও প্রজাশক্তিতে এরূপ বিচ্ছেদ নাই, সেইখানেই নেশন্ মূর্ত্তিমন্ত অবস্থায় দণ্ডায়মান। ইউরোপে ব্রিটিশ, ফরাসী ও জার্ম্মান্ এবং আমেরিকায় মিলিত রাষ্ট্রের প্রজাগণ নেশনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বহু দিন পূর্ব্বে সেখানেও নেশনের অস্তিত্ব ছিল না। তবে ইউরোপের সমাজক্ষেত্রে

বহু দিন পূর্ব্বে এমন বীজ উপ্ত হইয়াছিল, যাহা হইতে বিবিধ নেশন্ অঙ্কুরিত ও প্রবৃদ্ধ হইয়াছে।

ইতালীয় নেশন্ ও জার্ম্মান নেশন্ প্রকৃতপক্ষে বিগত উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বপ্রধান ঐতিহাসিক সৃষ্টি।

সংক্ষেপে নেশনের লক্ষণবিবৃতি চলে না; যদি নিতান্তই সংক্ষেপে বলিতে হয়, তাহা হইলে নেশন্ অর্থে আমরা সুগঠিত, সংহত, শরীরবদ্ধ মানবসমাজ বুঝিব। ঐ সমাজ-শরীর সর্ব্বদা জাগ্রত ও সচেতন থাকিয়া আপনার স্বার্থ অর্থাৎ সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট; শত্রু হইতে আত্মরক্ষণে ও পরের বিরুদ্ধে আত্মপ্রসারে সর্ব্বদাই উন্মুখ; উহার প্রত্যেক অঙ্গ সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য একযোগে কাজ করে; এক অঙ্গে আঘাত দিলে অন্য অঙ্গ হইতে আর্ত্তধ্বনি উদ্গত হয়; এবং সমগ্র শরীরের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক অঙ্গ আপনার সঙ্কীর্ণ মঙ্গল পরিহার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সমগ্র নেশনের শক্তিকে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলে দেখা যায়, নেশনের রাজশক্তির মূল প্রজাশক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রজাশক্তিকে অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান। প্রজাশক্তি সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র রাজশক্তির মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ন রাখিতে যত্নপর। এবং যে প্রজাসঙ্ঘ লইয়া নেশনের শরীর, সেই প্রজাসঙ্ঘের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনার্থই রাজশক্তি বর্ত্তমান। রাজশক্তির অস্তিত্বের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই।

গজনীপতি মামুদ যখন সোমনাথ মহাদেবের মন্দির লুণ্ঠন করেন, তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক হিন্দু সমাজের সকলে সেই অত্যাচার-কাহিনীর সংবাদ রাখাও কর্ত্তব্য বোধ করে নাই। মহারাণা প্রতাপসিংহ যখন একাকী সিংহবিক্রমে দিল্লীশ্বরের সহিত যাবজ্জীবন সংগ্রাম করিয়াও আপনার উন্নত মস্তক অবনত করিতে স্বীকৃত হন নাই, ভিন্ন প্রদেশের ভারত-সন্তানের শীতল শোণিত তখন উষ্ণ হয় নাই; মারাঠা সৈন্য যখন উত্তর কালে দিল্লীশ্বরের প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিয়া বেড়াইত, তখন সেই প্রজাগণের স্বজাতিত্ব ও স্বধর্ম্মত্বের কথা মনেও স্থান দেয় নাই।

তাহার অর্থ, ভারতবর্ষব্যাপী প্রকাণ্ড পুরাতন হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু হিন্দু নেশনের অস্তিত্ব ছিল না, হিন্দু সমাজের একাঙ্গের ব্যথা অপর অঙ্গ অনুভবে সমর্থ ছিল না।

আবার চৌহানপতিকে আক্রান্ত ও বিপন্ন দেখিয়া রাঠোররাজ যখন হাস্য করিতেছিলেন, এবং মুসলমানহস্তে মগধ রাজ্য বিনষ্ট হইতে দেখিয়াও পার্শ্ববর্ত্তী বঙ্গরাজ যখন পলায়নের শুভ মুহূর্ত্ত নিরূপণার্থ পঞ্জিকা দেখিতেছিলেন, তখন ভারতবর্ষে খণ্ড রাষ্ট্র ছিল ও খণ্ড রাষ্ট্রমধ্যে কুলের ও কুলপতিগণের মর্য্যাদা ছিল, কিন্তু ভারতব্যাপী মহারাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্রব্যাপী মহানেশন্ ছিল না।

অতি প্রাচীন কালে এই সকল খণ্ড রাষ্ট্রে রাজশক্তি এক বংশ হইতে বংশান্তরে সংক্রান্ত হইত, এক কুল হইতে কুলান্তরে সংক্রান্ত হইত, প্রজাসজ্ঘ উদাসীনের মত চাহিয়া দেখিত। শাসনদণ্ড মৌর্য্যের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া মিত্রের হস্তে, মিত্রের হস্ত হইতে স্নুঙ্গের হস্তে, স্নুঙ্গের হস্ত হইতে অন্ধ্রের হস্তে সঞ্চালিত হইত, মৌর্য্য ও মিত্র ও স্নুঙ্গ ও অন্ধ্রের প্রজাপুঞ্জ তাহাতে সুখ-দুঃখের কোন কারণ দেখিত না। উত্তর কালে হিন্দু রাজার হস্ত হইতে শাসনদণ্ড মুসলমানের হস্তে, মুসলমানের শাসন হইতে খ্রীষ্টানের হস্তে গিয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষের প্রজাগণ এই সকল রাজবিপ্লবকে নৈসর্গিক বিপ্লবের ন্যায় অকাতর সহিষ্ণুতা সহকারে গ্রহণ করিয়াছে; স্বয়ং এই বিপ্লব ঘটনার অনুকূলে বা প্রতিকূলে দাঁড়াইবার কর্ত্তব্যতা মনে স্থান দেয় নাই। ইহার অর্থ—ভারতবর্ষে প্রজাশক্তি কখনও রাজশক্তির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া উহাকে বলবতী করে নাই; রাজশক্তি প্রজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; ভারতবর্ষে কখনও নেশন্ ছিল না।

ভারতবর্ষে নেশন্ ছিল না বলিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস এইরূপ হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইউরোপেও এক কালে নেশন্ ছিল না। ইউরোপে নেশনের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে, ভারতবাসীর কতকটা আশ্বাস না হউক, কতকটা শিক্ষালাভ ঘটিতে পারে, সন্দেহ নাই।

সামাজিক একতা, নেশন্ গঠনের সাহায্য করে; কিন্তু এই একতা কোথায়? বাহির করা দুষ্কর। ব্রিটিশ দ্বীপ মহাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন, ব্রিটিশ দ্বীপে সংহত নেশনের উৎপত্তি হইয়াছে বুঝা যায়। জাতিগত একতা পূর্ণমাত্রায় নাই; তবে অধিকাংশ ব্রিটিশ প্রজা সাক্সন্ বংশধর বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন। ভাষাগত একতা ছিল না, তবে ইংরাজি ভাষার প্রচারে অন্যান্য ভাষা লোপ পাইতে বসিয়াছে। ধর্ম্মগত একতা অনেকটা আছে; এক কালে সমগ্র প্রজাপুঞ্জকে একই বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা

ব্যর্থ হইয়াছে। ধর্ম্মগত ঐক্যের অপেক্ষা আচারগত ঐক্য অধিক আছে; আর সকলের উপর আছে রাষ্ট্রীয় ঐক্য। সমস্ত প্রজা এক রাষ্ট্রতন্ত্রের তুল্যরূপে অধীন। এই সমস্ত ঐক্যের ফলে বৃটিশ নেশন্; বহু শত বৎসর ব্যাপিয়া ইহার জীবন এক টানে উন্নতির মুখে চলিয়াছে। এই ঐতিহাসিক প্রাচীনতা প্রত্যেক ব্রিটিশ প্রজার আর একটা গৌরবের কথা—আর একটা ঐক্য-সাধন বন্ধন।

আইরিশ জাতির বাসভূমি ব্রিটিশ দ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন, তদ্ভিন্ন জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্ম্মগত অনৈক্য বর্ত্তমান; সকলের উপরে আইরিশ জাতি আপনাদের পরাজয়ের ও অপমানের কাহিনী এখনও ভুলিতে পারে নাই; ইংরাজ ঐতিহাসিকেরাও তাহা ভুলিবার অবসর দেন নাই। এখানে রাষ্ট্রীয় একতা সত্ত্বেও আইরিশ জাতি ব্রিটিশ নেশনের কলেবরে মিশিতে পারে নাই।

ফরাসী দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা প্রায় চারি দিকেই স্পষ্ট, কেবল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে সুচিহ্নিত সীমা নাই। সেই দিকেই গোল।

আইবীরিয় ও কেল্ট ও জার্ম্মান একত্র মিশিয়া ফরাসী জাতি উৎপন্ন হইয়াছে; প্রত্যেক ফরাসীর দেহে বোধ হয় তিনের রক্তই বর্ত্তমান। ধর্ম্মগত, আচারগত, ভাষাগত একতা অনেকটা বর্ত্তমান আছে। ফরাসী সাহিত্যের ও ফরাসী বিজ্ঞানের গৌরবে ফরাসী মাত্রই অধিকারী। আর একটা একতা প্রতিবেশী জার্ম্মানের প্রতি বিদ্বেষে। ফরাসীর প্রাচীন ইতিহাস জার্ম্মানের পরাজয়কাহিনী পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া ফরাসীর ঐক্যবার্ত্তা ঘোষণা করে। এই সকল ঐক্যের ফলে ফরাসী নেশন্।

তার পর জার্ম্মান নেশন্। এই জাতিতে বংশগত বিশুদ্ধি যতটা আছে, ততটা অন্য জাতিতে আছে কি না, সন্দেহ। জার্ম্মানের শরীরে পুরাতন রোম সাম্রাজ্যের বিপ্লাবক টিউটনের রক্ত প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থায় বর্ত্তমান বলিয়া জার্ম্মান শ্লাঘা করেন। তদুপরি ভাষাগত ও আচারগত ঐক্য ত আছেই। তথাপি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মান নেশন্ ছিল না। জার্ম্মান নেশন্ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের সৃষ্টি।

জার্ম্মান নেশন্ জমাট বাঁধিতে এত সময় লাগিবার কারণ কি? যে একতাবন্ধনে নেশনের উৎপত্তি, সেই একতা জার্ম্মান জাতিমধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিল। তথাপি জার্ম্মান নেশন্ জমাট বাঁধে নাই। ইহার অর্থ আলোচনার যোগ্য।

প্রথমেই দেখা যায়, জার্ম্মানির সুনির্দ্দিষ্ট সীমা নাই। উত্তরে ডেনমার্কের ও হলণ্ডের লো জার্ম্মান। পশ্চিমে ফরাসী, দক্ষিণে হাঙ্গেরীয়ান্ ও তুর্কি, পূর্ব্বে শ্লাব জাতি, এই বিভিন্ন ভাষী বিভিন্ন জাতির মধ্যের জার্ম্মানের বাস। কোন উন্নত পর্ব্বতপ্রাচীর বা কোন সাগরশাখা ব্যবধান স্বরূপ হইয়া জার্ম্মানের ভৌগোলিক সীমারেখার নির্দ্দেশ করে নাই। জার্ম্মান ঠিক জানে না, উত্তরে ও পশ্চিমে ও দক্ষিণে ও পূর্ব্বে কোথায় উহার বাসভূমির শেষ; কোন্ রেখা পার হইয়া সে পদার্পণ করিবে না। তাহার প্রতিবেশীরাও জানে না, কোন্ রেখা পার হইলে জার্ম্মানের স্বদেশে অনধিকার-প্রবেশ ঘটিবে। ফলে পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন জাতি জার্ম্মানিকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া ঐ দেশকে ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। এই অবিরাম সংগ্রামের তুমুল কোলাহলে ইউরোপের মধ্য যুগের ইতিহাস মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। নৈসর্গিক সীমান্তরেখার অভাবে জার্ম্মানও পুনঃ পুনঃ পররাষ্ট্র ও পরজাতিকে আক্রমণ করিয়াছে। শান্তির অভাবে জার্ম্মান জাতি জমাট বাঁধিতে অবসর পায় নাই।

এই নৈসর্গিক কারণ ছাড়া আর একটা ঐতিহাসিক কারণ দেখা যায়। সেই কারণ অনুসন্ধানে রোম সাম্রাজ্যের পতনকালে যাইতে হয়। রোম সাম্রাজ্যের পতনের সময় জার্ম্মান জাতি বিবিধ কুলে বিভক্ত ছিল। এক একটা কুল রোম সাম্রাজ্যের এক একটা প্রদেশ অধিকার করিয়া বসে। ফ্র্যাঙ্ক, গথ, লম্বার্ড প্রভৃতি কুলের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এই সকল বিভিন্ন কুলের পরস্পর সম্প্রীতি ছিল না। উহাদের পরস্পর বিরোধ জার্ম্মান জাতির সংহতির পক্ষে এক কালে প্রধান অন্তরায় ছিল। কুলপতি-গণের পরস্পর বিরোধ জার্ম্মান জাতিকে বহু দিন সংহত হইতে দেয় নাই।

কালক্রমে এই কুলগত বিরোধ লোপ পাইয়াছিল; কিন্তু আর একটা বিরোধ আসিয়া পড়ে। রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া কুলপতিগণ আপনাদের অনুগত অনুচরগণকে ভূমি বণ্টন করিয়া দেন। এই অনুচরগণের এক এক জন এক এক বিস্তীর্ণ প্রদেশের ভূস্বামী ও সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। রোম সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে সম্রাট্ পদবী একটা কুলবিশেষে ও বংশবিশেষে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু সম্রাট্ স্বয়ং প্রাদেশিক পরাক্রান্ত ভূস্বামিগণের একান্ত অধীন হইয়া পড়েন। এইরূপে ইউরোপের ফিউডাল তন্ত্রের উৎপত্তি হয়। জার্ম্মানরাজ রোমক সম্রাট্

নামে সমগ্র খ্রীষ্টীয় জগতের অধিপতি ছিলেন। কিন্তু কাজে এই সকল খণ্ড রাষ্ট্রের অধিপতি পরাক্রান্ত সামন্তবর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন মাত্র। খণ্ড রাষ্ট্রগুলি চিরদিন ধরিয়া পরস্পর বিবাদ করিত ; সম্রাট্ সেই বিবাদ নিবারণে একান্ত অসমর্থ ছিলেন। কালক্রমে ধর্ম্মগত বিবাদ এই রাষ্ট্রগত বিবাদের সহিত যুক্ত হইয়া আগুন আরও জ্বালাইয়া তুলে। প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক জার্ম্মান রাষ্ট্রপতিগণ বিকট ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সেই অগ্নিদাহে জার্ম্মান রাষ্ট্রতন্ত্র এক কালে ভস্মস্তূপে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

রোমক সম্রাটের পদবী কালক্রমে হাক্‌সবর্গ বংশে আবদ্ধ হইল ; হাক্‌সবর্গ বংশধরগণ বহু দিন ধরিয়া সমগ্র খ্রীষ্টীয় জগৎকে রোম সম্রাটের শাসনাধীন রাখিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু জার্ম্মান রাষ্ট্রপতিগণের একতা সাধনে সমর্থ হন নাই। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির অভ্যুদয়ে রোম সাম্রাজ্যের নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইল ; কিন্তু সেই ফরাসী সংঘর্ষের তুমুল বিপৎপাতও জার্ম্মানির একতা সাধনে সমর্থ হয় নাই। একতা সাধিত হয় নাই বটে, কিন্তু জার্ম্মান জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য এই একতা-বন্ধনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইয়াছিল। নূতন সৃষ্ট জার্ম্মান-সাহিত্য ও জার্ম্মান-দর্শন ও জার্ম্মান-বিজ্ঞান, এই একতা লাভের জন্য জার্ম্মান-রাষ্ট্র সকলকে একস্বরে আহ্বান করিতেছিল। হাক্‌সবর্গ বংশধর রোম সম্রাটের উপাধির মায়া কাটাইয়া অস্ট্রিয়া-সম্রাট্‌রূপে জার্ম্মান রাষ্ট্রপতিগণের উপর নাম মাত্র প্রাধান্যে তৃপ্ত রহিলেন। কিন্তু সেই প্রাধান্য পরিচালনায় তাঁহার শক্তি ছিল না। সহসা উদ্ধত প্রুসিয়া রাজ্য বিস্‌মার্কের মন্ত্রণাশক্তিতে পরিচালিত হইয়া অস্ট্রিয়াপতিকে জার্ম্মান রাষ্ট্রতন্ত্র হইতে নিষ্কাসিত করিয়া দিল ; এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের অদূরদর্শিতার ফলে ফরাসী বিগ্রহের সুযোগ আশ্রয়ে জার্ম্মান রাষ্ট্রসমূহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া জার্ম্মান নেশনের সৃষ্টি করিল। এই বিস্ময়কর ঘটনার পর সংহত জার্ম্মান নেশন্ ইউরোপ খণ্ডে উন্নত মস্তক তুলিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে ; এবং ধরাপৃষ্ঠে আপনার প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করিয়া দর্পের সহিত জার্ম্মান নেশনের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। জাতিগত, ভাষাগত ও আচারগত একতায় ধর্ম্মগত অনৈক্য লোপ করিয়াছে। এবং স্বার্থের ঐক্য ও ফরাসীবিদ্বেষের সাধারণ ঐক্য সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকার নির্ম্মাণ করিয়া নৈসর্গিক সীমান্তরেখার অভাব মোচন করিয়াছে।

ধর্ম্মগত, জাতিগত, আচারগত ও ভাষাগত একতা নেশন্ বন্ধনে সাহায্য করে, সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ ও ফরাসী ও জার্ম্মান জাতির নেশন্-বন্ধনে এই একতা সাহায্য করিয়াছে। অস্ট্রিয়া রাজ্য জার্ম্মান রাষ্ট্রসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও মুখ্যত এই ঐক্যের অভাবেই নেশনে পরিণত হইতে পারে নাই। অস্ট্রিয়া রাজ্যে জার্ম্মান ও শ্লাব ও তুরাণিক, তিন বিভিন্ন জাতির নিবাস। তাহাদের মধ্যে শোণিতের ভেদের সঙ্গে ভাষাভেদ, ধর্ম্মভেদ, আচারভেদ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। সেই জন্য এই বিভিন্ন জাতি জমাট বাঁধিয়া একটা পরাক্রান্ত নেশনে পরিণত হইতে পারিতেছে না; এবং এই অনৈক্যজাত দুর্ব্বলতার জন্যই অস্ট্রিয়াপতি প্রাচীন ঐতিহাসিক বিশ্রুতি সত্ত্বেও জার্ম্মান জাতির নেতৃত্ব পদ হইতে বহু শত বৎসর পরে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। ভাষাগত ও আচারগত ও ধর্ম্মগত ও কিয়ৎপরিমাণে জাতিগত ঐক্য ছিল বলিয়াই বিবিধ প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রপতির দ্বন্দ্বক্ষেত্র ইতালী ভূমিতেও এত দিনে নেশনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু সকল একতা ছাড়িয়া স্বার্থগত একতা। ইংরাজ জাতি স্কচ ও ওয়েল্‌সের ভাষাভেদ ও জাতিভেদ সত্ত্বে উহাদের সহিত একত্রে মিশিয়া নেশনে পরিণত হইয়াছে। তাহার কারণ, স্কচের স্বার্থ ও ওয়েল্‌সের স্বার্থ সম্প্রতি ইংরাজের স্বার্থের সহিত অভিন্ন। জার্ম্মান রাষ্ট্রসমূহ যে এত কালে বিসংবাদ ভুলিয়া একতাবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে, তাহার মূলে সেই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ—ফরাসীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। ইতালির নেশনত্ব প্রাপ্তির মূলেও সেই শত্রু হইতে আত্মরক্ষণরূপ সাধারণ স্বার্থ বিদ্যমান। এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ও সাধারণ স্বার্থের একতা অন্যবিধ অনৈক্যকে পরাভূত করিয়াছে। জার্ম্মানির নিকট পরাভবে সাধারণ স্বার্থে আঘাত পাইয়া ফরাসী জাতির নেশনত্ব আরও দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। ইংরাজের সহিত বাণিজ্য-প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংঘর্ষে জার্ম্মান জাতির সাধারণ স্বার্থে আঘাত সম্ভাবনায় জার্ম্মান জাতির নেশনত্ব ক্রমেই সংহত হইতেছে। এই সাধারণ রাষ্ট্রীয় স্বার্থের একতায় সকল বিভেদকে ডুবাইয়া দিয়া নেশনের সৃষ্টি করে। এই রাষ্ট্রীয় একতাই সর্ব্ববিধ অনৈক্যকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করে বলিয়া ব্রিটিশ দ্বীপের অধিবাসী মাত্রেই আজি তুল্য রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে ও সকলেই আপনাকে ব্রিটিশ নেশনের অঙ্গীভূত জানিয়া গৌরব বোধ করিতেছে। এই কারণেই আমরা ভারতজাত পার্সীকে ইংরাজের প্রতিনিধিরূপে পার্লামেন্টে দেখিতে পাইয়াছি। এই কারণেই ইহুদীর হস্তে

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ডের পরিচালনা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই নাই ; ইহুদী বল, আর পার্সী বল, আর মুসলমান বল, আর খ্রীষ্টান বল, জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে ব্রিটিশ রাজার ব্রিটনবাসী প্রজা মাত্রই প্রকাণ্ড ব্রিটিশ নেশনের অঙ্গীভূত ও সেই ব্রিটিশ নেশনের মাহাত্ম্য রক্ষায় যত্নশীল।

ধর্ম্মগত, ভাষাগত, জাতিগত ঐক্য নেশন্ বন্ধনে আনুকূল্য করে। এইখানেই নেশনরূপ মহাবৃক্ষের অঙ্কুরোদগমের বীজ। ইহার উপর রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ঐক্য থাকিলে সেই মহাবৃক্ষ সত্বেজে পুষ্টি লাভ করে ও বৃদ্ধি লাভ করে। স্বার্থের ঐক্য অন্যান্য বিষয়ে সামান্য অনৈক্যকে নষ্ট করিয়া নেশন্-শরীর গড়িয়া তুলে। আর যেখানে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের আকর্ষণ, ধর্ম্মগত বা আচারগত বা ভাষাগত অনৈক্যের বিকর্ষণে পরাভূত হয়, সেখানে নেশনের উৎপত্তি ঘটে না।

কিন্তু কেবল স্বার্থরক্ষায় সমর্থ হইলেই নেশন্ হয় না। বর্ত্তমান কালে রুশিয়ার মত স্বার্থরক্ষণে সমর্থ মহারাষ্ট্র কোথায়? কিন্তু রুশিয়া মহারাষ্ট্র মাত্র ; রুশিয়ায় নেশন্ নাই। নেশন্ নাই ; কেন না, এখানে রাজশক্তি প্রজাশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন। দোর্দ্দণ্ড রাজশক্তি প্রজাশক্তিকে সংযত ও নিয়মিত করে ; কিন্তু প্রজাশক্তির উপর উহার প্রতিষ্ঠা নাই। রাজা ও প্রজা জনসমাজের দুই প্রধান অঙ্গ ; যেখানে দুই অঙ্গের বিচ্ছেদ, যখন একের ব্যথায় অন্যে কাতর হয় না, যখন একে আঘাত পাইলে অন্যে সাড়া দেয় না, সেখানে নেশন্-শরীর বর্ত্তমান নাই।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে খণ্ড রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু সেই সকল রাষ্ট্রের মধ্যে একটা সমবেদনার আত্মীয় বন্ধন ছিল না। ভারতব্যাপী মহারাষ্ট্র স্থাপনের অনেক বার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু উহা স্থায়ী হয় নাই। ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্র ত ছিল না ; আবার নেশনও ছিল না ; কেন না, রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির কোনরূপ স্বার্থসম্বন্ধ ছিল না। রাজশক্তির অভ্যুদয়ে বা পরাভবে প্রজাশক্তি চিরদিনই উদাসীন ছিল। কাজেই ভারতবর্ষব্যাপী মহারাষ্ট্রও ছিল না, ভারতব্যাপী নেশনও ছিল না।

সম্প্রতি ভারতব্যাপী মহারাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে। ইংরাজ সাম্রাজ্যপতির ছত্রতলে ব্রিটিশ প্রজা ও ব্রিটিশ সম্রাটের সামন্ত ভূপতিগণ আশ্রয় লাভ করিয়া মহারাষ্ট্রের সৃজন করিয়াছে। রুশিয়া সম্রাট্ দূর হইতে ইহার

ঐশ্বর্য্যের প্রতি লুব্ধনেত্রে চাহিয়া আছেন; কিন্তু তাঁহার সাহস হয় না, এই মহারাষ্ট্রকে আক্রমণ করেন। কাজেই ভারতবর্ষব্যাপী রাষ্ট্রের এখন অস্তিত্ব আছে; কিন্তু ভারতবর্ষে অদ্যাপি নেশন্ সৃষ্টি হয় নাই। কেন না, ভারতে রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির কোন দৃঢ় বন্ধন নাই।

প্রজাশক্তির উপর রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত নহে; প্রজাশক্তি রাজশক্তির সহায় নহে; রাজশক্তিকে প্রজাশক্তি বিনীত ভাবে ভয় করে ও ভক্তি করে, কিন্তু ভালবাসে না ও আপনার আত্মীয়রূপে জানে না। যত দিন এই উভয় শক্তির মধ্যে একাত্মতা না জন্মিবে, তত দিন ভারতবর্ষে নেশনের সৃষ্টি হইবে না। যদি কালক্রমে একাত্মতার উৎপত্তি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে নেশনের উৎপত্তিও অসম্ভব।

বর্ত্তমান কালে আমাদের রাজশক্তি বৈদেশিকের হস্তে; কাজেই রাজায় প্রজায় মমত্ব-বন্ধনের অভাব বেশ বুঝা যায়। কিন্তু যখন রাজশক্তি দেশীয় রাজার হাতে ছিল, তখনও এই রাজায় প্রজায় মমত্বের বন্ধন কেন ছিল না, বিচার্য্য বিষয় হইয়া পড়ে।

মুসলমান আক্রমণকালে ভারতবর্ষে একতার অভাব বেশ বুঝা যায়। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে একতার অভাব, ভারতবর্ষের পতনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের একতার অভাব, পতনের প্রধান কারণ বটে, সন্দেহ নাই; কিন্তু রাজার সহিত প্রজার ঐক্য-বন্ধনও অন্যতর প্রধান কারণ, তাহা ঐতিহাসিকেরা সর্ব্বদা লেখেন না। ভারতবর্ষে রাষ্ট্ররক্ষার কাজ চিরদিনই রাজার হাতেই অর্পিত আছে। রাজা আপনার সৈন্য সামন্ত লইয়া শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু প্রজা তাঁহার সাহায্য করিত, এরূপ প্রমাণ অধিক পাওয়া যায় না। রাজা যাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়াছেন—প্রজা বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। রাজার সহায়রূপে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দাঁড়ান কর্ত্তব্য বোধ করে নাই; অথবা রাজার পরাজয়ের পর স্বয়ং আক্রমণকারীকে নিরোধ করা কর্ত্তব্য বোধ করে নাই। ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস। এখানে রাজায় রাজায় চিরকাল যুদ্ধ হয়। প্রজা উদাসীন হইয়া দাঁড়াইয়া দেখে, এবং যে জয়লাভ করে, তাহার নিকট অকাতরে আত্মসমর্পণ করে।

ইউরোপের ইতিহাস অন্যরূপ। বোনাপার্টি ইংলণ্ড আক্রমণ করিবেন, এই আশঙ্কা উপস্থিত হইবা মাত্র ব্রিটিশ প্রজা দলে দলে ভলন্টিয়রের

নাম লেখাইয়াছিল। সিডান ক্ষেত্রে তৃতীয় নেপোলিয়ান আত্মসমর্পণ করিবার পরও ফরাসী প্রজা জার্ম্মানের সহিত যুঝিয়াছিল। সে দিন বুয়র যুদ্ধে ইংরাজের রাজশক্তি কয়েক বার আঘাত পাইবা মাত্র ব্রিটিশ প্রজা দলে দলে সমুদ্রপারে দেহপাতের জন্য ছুটিয়াছিল।

সেকালে ভারতবর্ষ শত খণ্ডে শত রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। ইহাতে বিস্মিত হইবার বড় কারণ নাই। ইংরাজদের মধ্যে কেমন ঐক্য আছে, ফরাসীদের মধ্যে কেমন ঐক্য আছে, জার্ম্মানেরাও এত কাল পরে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে ; আর ভারতবাসীরা এক হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়াও ঐক্য-বন্ধন লাভ করে নাই ; এ জন্য ভারতবাসীকে তিরস্কার করা একটা প্রথা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের কোন একটা দেশের তুলনা ঠিক সঙ্গত নহে। বরং সমগ্র ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা হইতে পারে। আয়তনে বা লোকসংখ্যায় ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপ মহাদেশেরই তুলনা হয় ; ইউরোপের অন্তর্গত কোন দেশেরই তুলনা হয় না। রোম সম্রাট্ সমগ্র ইউরোপকে একচ্ছত্র করিতে পারেন নাই।

দুই সহস্র বৎসর চেষ্টার পর সেই চেষ্টা নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। সমগ্র ইউরোপ খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে ; কিন্তু এক হয় নাই। প্রায় সমগ্র ইউরোপ রোমের সভ্যতার উত্তরাধিকারী, তথাপি সমগ্র ইউরোপ এক হয় নাই। তখন ভারতবর্ষের মত প্রকাণ্ড দেশ, যাহা আয়তনে ইউরোপ অপেক্ষা অধিক ছোট নহে, যাহার লোকসংখ্যা ইউরোপের সমান, যাহার ভিতরে বর্ণভেদ, জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, ভাষাভেদ, আচারভেদ প্রভৃতি ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশী, সেই প্রকাণ্ড দেশের সমগ্র অধিবাসী যে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একটা বৃহৎ রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে নাই, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বরং ইউরোপের মধ্যে যেরূপ জাতিবিদ্বেষ ও ধর্ম্মবিদ্বেষ বর্ত্তমান, ভারতবর্ষের মধ্যে সেইরূপ জাতিবিদ্বেষ বা ধর্ম্মবিদ্বেষ কোনও কালে ছিল না।

ইংরাজ ও ফরাসী, ফরাসী ও জার্ম্মান, জার্ম্মান ও রুশ, ইংরাজ ও রুশ, ইহাদের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষা, বিদ্বেষের মাত্রা অত্যন্ত তীব্র। বাঙ্গালী ও বেহারী, বেহারী ও পাঞ্জাবী, মারাঠা ও রাজপুত, ইহাদের মধ্যে সেরূপ তীব্র বিদ্বেষ বা ঈর্ষা কোনও কালেই ছিল না। আবার সপ্তোপ্রদপে প্রোটেষ্টাণ্ট ও কাথলিকের মধ্যে যেইরূপ বিদ্বেষ, মারামারি,

রক্তারক্তি ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় শাক্তে শৈবে বা শাক্তে বৈষ্ণবে, এমন কি, হিন্দু বৌদ্ধেও সেরূপ রক্তারক্তি ব্যাপার কখনও ঘটে নাই; বোধ করি, এইরূপ ধর্ম্মগত বিদ্বেষ ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বভাববহির্ভূত।

ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিলে, ঐক্যের অভাবে ভারতবাসীকে তিরস্কার করা উচিত হয় না।

সমগ্র ইউরোপ এক হয় নাই। উহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র খণ্ড রাষ্ট্রগুলি জমাট বাঁধিয়া এক একটা মহাপ্রতাপ নেশনে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে সমগ্র ভারতবর্ষ এক মহারাষ্ট্রে পরিণত না হইয়া যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হইত, তাহা হইলেও ভারতবর্ষের পতন অনিবার্য্য না হইতেও পারিত।

এই জন্য আমার বোধ হয়, ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় অনৈক্য; বহুসংখ্যক খণ্ড রাজ্যের অস্তিত্ব পতনের একটা প্রধান কারণ হইলেও প্রধানতম কারণ নহে। ভারতবর্ষ ইউরোপের মত বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত হইলেও ভারতবর্ষের পরাধীনতা অনিবার্য্য হইত না। ভারতবর্ষের পতনের কারণ যে, উহার অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলি নেশনে পরিণত হয় নাই। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে অনৈক্য ত ছিলই, কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রমধ্যে প্রজাশক্তি রাজশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। রাজশক্তি প্রজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। প্রজাশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায় রাজশক্তি সম্যক্‌রূপ সামর্থ্য লাভ করিতে পারে নাই। রাজার সুখ দুঃখে প্রজা কখনও সমবেদনা দেখায় নাই। রাজার ভাগ্যবিপর্য্যয়ে প্রজা উদাসীন ছিল। রাজার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া প্রজা রাষ্ট্র রক্ষার জন্য আপনার দুর্জ্জয় শক্তি প্রয়োগ করিতে শিখে নাই। রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি যেখানে এইরূপ বিচ্ছিন্ন, সেখানে নেশন্ জন্মে না।

ভারতবর্ষে নেশনের অস্তিত্ব ছিল না; সেই জন্য ভারতবর্ষ পরাক্রমণ নিরোধে সফল হয় নাই। [নেশন্ জন্মিবার বীজ ভারতক্ষেত্রে না ছিল, এমন নহে, কিন্তু সেই বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্‌গম ঘটে নাই।]

এইখানে ইউরোপের ইতিবৃত্তের সহিত ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তে অনৈক্য আছে। উভয়ত্র ইতিহাস ভিন্ন পন্থায় চলিয়া ভিন্ন ফল উৎপাদন করিয়াছে। উভয়ত্র এই প্রভেদের মূল কারণ কি, তাহা ঐতিহাসিকগণের বিচার্য্য বিষয়। প্রস্তাবান্তরে আলোচনার চেষ্টা করা যাইবে। ('বঙ্গদর্শন,' ভাদ্র ১৩১৪রের

সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার

মানবদেহে কতকগুলি ব্যাধি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য সহস্রবিধ ঔষধের ব্যবস্থা শুনিতে পাওয়া যায়। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনস্তম্ভে এই শ্রেণীর প্রত্যেক রোগেব জন্য সংখ্যাতীত অব্যর্থ ঔষধের নূতন আবিষ্কার, আড়ম্বর সহকারে প্রতিনিয়ত ঘোষিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য রোগি-সম্প্রদায় মধ্যে যাঁহার কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তিনিই জানেন, যেখানে অব্যর্থ ঔষধের সংখ্যা যত অধিক, রোগমুক্তির আশাও সেখানে ততই সামান্য।

এই ঘটনাকে একটা নৈসর্গিক নিয়মের একটা উদাহরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে স্থলে উপদেষ্টার সংখ্যাবাহুল্য বিদ্যমান, সেখানে উপদেশ বিশেষ ফল প্রসব করে না বলিয়াই বুঝিতে হইবে। যেখানে শিক্ষাদানের জন্য বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের সৃষ্টি আবশ্যক হয় নাই, সেখানে ফলোৎপত্তিও শিক্ষকদত্ত উপদেশের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না।

পৃথিবীর বর্ত্তমান দেড় শত কোটি অধিবাসীর মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই জননীগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া জননীর স্নেহে পালিত হইয়া মানুষ হইয়াছে, কিন্তু এই অত্যন্ত প্রাচীনা বসুন্ধরার পৃষ্ঠদেশে এমন কত দেড় শত কোটি মানব এ পর্য্যন্ত মর্ত্ত্যলীলা সমাপন করিয়া চলিয়া গেল ; কিন্তু জননীগণকে অপত্যস্নেহের উপদেশ দিবার জন্য একখানাও নীতিপুস্তক এ পর্য্যন্ত রচিত হইল না, অথবা ধর্ম্মপ্রচারকমুখে একটাও গুরুগম্ভীর Sermon প্রদত্ত হইল না। অথচ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রত্যেক জননী বিনা উপদেশে, বিনা আইনে, বিনা পুলিসে অপত্যের প্রতি আপনার কর্ত্তব্য যথোচিতরূপে সম্পাদন করিয়া আসিতেছে। পক্ষান্তরে, যে দিন হইতে বিদ্যালয় নামক শিশুজন-ভয়ঙ্কর পদার্থের আবিষ্কার হইয়াছে, সেই দিন হইতেই পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের ঔচিত্য সম্বন্ধে কত সালঙ্কার বক্তৃতামালা ছাত্রবৃন্দের প্রতি প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে ; তথাপি ডিসিপ্লিনের ও ইণ্টার-স্কুল-রুলের এত কড়াকড়ির দিনেও এই ছাত্রবৃন্দের মধ্যে এমন উদাহরণ বিরল নহে, যাহারা জনান্তিকে মাষ্টার মহাশয়কে নিতান্ত অশাস্ত্রীয় বিশেষণে সম্বোধন করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

আমাদের সমাজমধ্যে উপদেষ্টার সংখ্যা ও গুরুর সংখ্যা যেরূপ সমগুণ শ্রেণীর নিয়মানুসারে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে, তাহাতে সমাজের ভবিষ্যৎ সামাজিকগণের পক্ষে চিন্তার বিষয় হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। বর্ত্তমান কালে আমাদের সমাজ বিবিধ ব্যাধিতে রুগ্ন ও জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু চিকিৎসকের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া এক একবার আশঙ্কা হয়, বুঝি বা বৈদ্য-সঙ্কটেই রোগীর প্রাণ যায়।

প্রত্যেক বৈদ্যরাজই এক একটা অব্যর্থ ঔষধের পেটেণ্ট লইয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন ও প্রশংসাপত্রমণ্ডিত ঔষধের বোতল মাথায় রাজপথে হুঙ্কার করিয়া গৃহস্থের শান্তিভঙ্গ করিতেছেন। কিন্তু হায়! অমোঘ ঔষধের সংখ্যাও যে পরিমাণে অধিক, রোগ প্রতিকারের সম্ভাবনাও সেই পরিমাণে অল্প। বর্ত্তমান সময়ে যদি কোন অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তি আপনাকে অকস্মাৎ লোকসমাজে জাহির করেন ও সামাজিক ব্যাধির উৎকটতা সম্বন্ধে লেক্‌চার দিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি ভদ্র জনের সংশয়-সমাকুল দৃষ্টিপাত কতকটা স্বাভাবিক হয়। সাধারণে আশঙ্কা করিতে পারেন, এই অপরিচিত মনুষ্যটির অসাময়িক বক্তৃতাবর্ষণের পর-মুহূর্ত্তেই তাঁহার ঝুলি হইতে এমন একটি কৌটা বাহির হইবে, যে কৌটার অন্তর্গত বটিকাগুলি সাইবিরিয়ার তুষারক্ষেত্র হইতে আনীত ম্যামথের অস্থিচূর্ণ হইতে প্রস্তুত হওয়ায় একেবারে অব্যর্থ, এবং তাহার একটি কৌটা মাত্র যিনি খরিদ করিবেন, তাঁহার রোগ মোচন ত হইবেই, পরন্তু পথ্যলাভের পরদিনই কবিরাজ মহাশয় ঘটকালি করিয়া ক্যাম্‌স্‌কট্‌কার রাজকন্যার সহিত রোগীর বিবাহ ঘটাইয়া দিবেন। সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ মহোদয়েরা নিতান্ত অনুকম্পা করিয়া যে অক্ষম ব্যক্তিকে এই মাননীয় জনসাধারণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যদি সেই শ্রদ্ধালব্ধ অনুকম্পার অপব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া দুঃসাধ্য সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার সম্বন্ধে গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে তাহার অহম্মুখতা হয়ত মার্জ্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই অপরাধ স্বীকার করিয়া লইয়া এই অপকার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার পরম সহিষ্ণু শ্রোতৃমহোদয়গণ ক্ষমার জন্য কতকটা প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন, এইরূপ ভরসা করিতে পারি। এবং শ্রোতৃবৃন্দ যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনুগ্রহ বর্ষণে

উন্মুখ, তখন তাঁহাদের সহিষ্ণুতা পরীক্ষায় আমারও কতকটা অধিকার আছে,—ধরিয়া লইতে পারি।

আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াই দেখিতে পাই, আমাদের সমাজে সর্ব্বত্রই একটা নৈরাশ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা বড় একটা আশা বুকে বাঁধিয়া এত কাল আশ্বস্ত ছিলাম, যেন সে আশা আমাদের চূর্ণ হইয়াছে। আমরা এত দিন ধরিয়া যাহার মুখ চাহিয়া ছিলাম, সে যেন আমাদিগকে ফেলিয়া গিয়াছে। এখন কেবল অতৃপ্ত বাসনার আর অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার বিষাদধ্বনি কোথাও অস্ফুটভাবে, কোথাও পরিস্ফুটভাবে সমুদ্গত হইতেছে। এই আকালিক বিষাদের, এই নৈরাশ্যের মূল কি?

অধিক দিনের কথা নহে, বোধ করি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ত এমন অবস্থা ছিল না। যে আশালতা আজ ছিন্নমূল হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে, সেই আশালতার তখন সতেজে অঙ্কুরোদ্গম হইতেছিল।

পঞ্চশতবর্ষব্যাপিনী অশান্তির পর যখন আমরা পরাক্রান্ত পাশ্চাত্য-জাতির রাজছত্রতলে আশ্রয় লাভ করিয়া প্রথম শান্তির মুখ দেখিতে পাইয়াছিলাম, তখনই এই আশালতার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল। যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্র আলোক আমাদের মুদিত নেত্রকে সহসা খুলিয়া দিল, তখন আমরা যেন দীর্ঘ নিদ্রার অবসানে সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া নূতন ভাস্করের প্রভাতকিরণ দেখিতে পাইলাম, আমাদের মৃতকল্প শরীরে নব জীবনের সঞ্চার হইল। যখন দস্যু তস্করের হস্ত হইতে আমাদের ধন প্রাণ নিরাপদ্ হইল, যখন প্রবঞ্চক প্রতিবেশীর হস্ত হইতে সম্ভ্রম রক্ষার জন্য রাজদ্বার অবারিতভাবে উন্মুক্ত হইল, যখন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা দ্বারা অভিনব সভ্যতা ও বৃহত্তর জগতের সহিত আমাদের নূতন ঘনিষ্ঠ ও আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপিত হইল, যখন ষ্টীম এঞ্জিন ও টেলিগ্রাফ এই নূতন সভ্যতার অজেয় বিক্রম ও অতুল ঐশ্বর্য্য ও অমিত মহিমার সহিত আমাদের পরিচয় স্থাপন করিয়া আমাদিগকেও সেই বিক্রমের ও ঐশ্বর্য্যের ও মহিমার অংশভাক্ করিবার আশা দিল, তখন আমাদের আশালতা যে অচিরে পুষ্পপল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠিবে, তাহার সংশয় মাত্রও নিরাকৃত হইয়াছিল। কিন্তু সে অধিক দিনের কথা নহে; সিপাহীযুদ্ধের বিপ্লবান্তে যে মহীয়সী মহারাজ্ঞী ভারতের সাম্রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া বিংশ কোটি প্রজার হৃদয় অভয়বাণী দ্বারা আশ্বস্ত ও আনন্দিত করিলেন, সেই পূজনীয়া

মহিলা আজ পর্য্যন্ত বেলাবপ্রবলয়া পরিখীকৃতসাগরা বসুন্ধরার ঐশ্বর্য্যমহিম-মণ্ডিত সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন ; কিন্তু তাঁহার কোটি প্রজার হৃদয়ে যে আশার ও আশ্বাসের ও পুলকের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা যেন অঙ্কুরেই ছিন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতির সম্পর্কে আসিয়া আমরা যে ভাবী ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, সে সুখস্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যে মোহের ঘোরে আমরা এত দিন আচ্ছন্ন ছিলাম, সে মোহের ঘোর যেন কাটিয়া গিয়াছে। কেহ যেন আমাদের কানে কানে দৃঢ় স্বরে বলিয়া দিয়াছে, তোমরা দীন, কুটীরমধ্যে ছিন্ন কন্থায় শয়ন করিয়া তোমরা ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখিতেছিলে, সে স্বপ্ন সফল হইবার নহে। পরন্তু তোমরা ভিক্ষুক ; ভিক্ষুকের জীবনে শ্রেয়োলাভের আশা বিড়ম্বনা। গত কতিপয় বর্ষ ধরিয়া যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অধিক কথা খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

ফলে আমরা যে পথ অবলম্বন করিয়া এত দিন চলিতেছিলাম, সে পথ যেন ঠিক পথ নহে ; এখন কোন্ নূতন পথ আমাদের অবলম্বনীয়, তাহার নির্ণয়ই আমাদের সামাজিকগণের পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পথভ্রান্ত পথিক যেমন দিশাহারা হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, আকাশের ধ্রুবতারা তখন তাহার সংশয়াকুল চিত্তে বিশ্বাস স্থাপনে সমর্থ হয় না, আমরাও সেইরূপ দিশাহারা হইয়া গন্তব্য পথ নির্ণয়ে অসমর্থ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি ; কোন্ অনির্দ্দেশ্য স্থান হইতে কালো মেঘ আসিয়া আমাদের সেই ক্ষীণপ্রভ ধ্রুবতারাটিকেও ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

যদি কেহ মনে করেন, আমি কোন কাল্পনিক বিভীষিকায় আতঙ্কিত হইয়া আপনিই প্রতারিত হইতেছি ও অন্যকে অমূলক আশঙ্কায় উত্তেজিত করিবার চেষ্টা পাইতেছি, তাঁহাদিগকে আমার মনের ভাব স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য দুই একটা উদাহরণের উল্লেখ আবশ্যক হইতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে এইরূপ উদাহরণও নিতান্ত বিরল নহে, এবং তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে হইবে না। আমরা যে কাজে হাত দিতে যাই, সেই কাজই শেষ পর্য্যন্ত পণ্ড হইয়া পড়ে। আমরা যে পথে কোন একটা লক্ষ্যের অভিমুখে গমন করি, সেই পথ আমাদিগকে সেই লক্ষ্যের নিকটবর্ত্তী না করিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে লইয়া যায়। অন্যান্য দেশে যে প্রণালীতে যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, আমাদের দেশে সে

প্রণালীতে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে গেলে শেষ পর্য্যন্ত নিষ্ফল হইতে হয়। আমরা পূর্ব্ব হইতে গণনা করিয়া যে ফলের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকি, সে ফল যথাসময়ে উপস্থিত হয় না; যাহা আমরা মনে ভাবি না, তাহাই আসিয়া উপস্থিত হয়। আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার জন্য একটা উদাহরণের আলোচনা করিব, আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রণালী। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন ভারতবর্ষের প্রজাগণের শিক্ষাভার গ্রহণ করেন, তখন বাগ্‌দেবী প্রাচ্য বা প্রতীচ্য কোন্ মূর্ত্তিতে আমাদের উপাসনা করিবেন, এই কথা লইয়া একটা বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছিল। সেই বিতণ্ডার ইতিবৃত্ত ও চরম মীমাংসা সর্ব্বজনবিদিত; তাহার বিস্তৃত পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। প্রাচ্য শিক্ষা ও প্রতীচ্য শিক্ষা, উভয়ের পক্ষেই বড় বড় মহারথ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দ্বন্দ্বক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত যাঁহারা প্রতীচ্য শিক্ষাপ্রণালীর পক্ষপাতী, তাঁহারাই জয়লাভ করেন। তাঁহাদের যুক্তি কতকটা এইরূপ।—ভারতবাসীর ধাতুতে ও মজ্জাতে বৈজ্ঞানিকতার অত্যন্ত অভাব; প্রাচ্য প্রণালীর শিক্ষা সেই অভাবের পূরণ করিতে কিছুতেই সমর্থ হইবে না। ভারতবাসী চিরদিন ধরিয়া কাব্য লিখিয়া আসিতেছে ও স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছে, তাহাদের নিকট বাহ্য জগৎটা সমগ্রই একটা তরল পদার্থে অথবা একটা ছায়াময় কল্পনার সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে, সেই জন্য বাহ্য জগতের উপর তাহাদের কিছুমাত্র প্রসক্তি নাই। সেই জন্য তাহারা বাহ্য জগতের উপর প্রভুত্ব লাভেও সমর্থ হয় নাই। বাহ্য জগৎকে তাহারা যথাসাধ্য অপমানিত করিয়াছে, তাহাতেই যেন জগৎও অপমানিত বোধ করিয়া আর তাহাদিগকে ধরা দিতে চাহে না; তাহাদের স্পর্শের মধ্যে আসিতে চাহে না। ভারতবাসী যখন বাহ্য জগৎকে আলিঙ্গন করিতে উপস্থিত হয়, তখন বাহ্য জগৎ তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়। ভারতবাসী যখন ধরাপৃষ্ঠে পদক্ষেপ করে, বসুন্ধরা তখন তাহার পদতল হইতে সরিয়া যান। কাজেই ভারতবাসী তখন শূন্য পথে পা ফেলিয়া চলিতে থাকে। বস্তুতঃ ত্রিশ কোটি মনুষ্যের সমবায়ে গঠিত একটা সমগ্র জাতি ইউলিসিসের দৃষ্ট লোটস্‌ঈটারগণের মত নেশার ঘোরে ঝিম ধরিয়া বসিয়া আছে; বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে একটা প্রকাণ্ড ফক্কিকা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে যন্তবিশ্য সাজিয়া বসিয়া আছে, এরূপ দৃশ্য পৃথিবীর অন্যত্র বিরল। একটা সমগ্র জাতি

পুরাণ-কথিত হরিশ্চন্দ্রের কটকের মত সংসারের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া শূন্যমধ্যে নিরবলম্বভাবে অবস্থান করিতেছে, এইরূপ দৃশ্য আর কোথাও নাই।

সিদ্ধান্ত হইয়া গেল, প্রাচ্য দেশের বীণাপুস্তকধারিণী, শতদলবাসিনী বাগ্‌দেবীকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসন দিয়া ঈজি চেয়ারশায়িনী, বুটপরিহিতা, পাউডার-পরিলিপ্তা বিলাতী সরস্বতীকে এ দেশে আমদানী করিতে হইবে। প্রাচীন কল্পনাপ্রধান প্রাচ্য বিদ্যাকে বিসর্জ্জন দিয়া, তাহার স্থানে বিজ্ঞানপ্রধান প্রতীচ্য বিদ্যাকে স্থাপিত করিতে হইবে। প্রাচীন কালের পৌরাণিক ভূগোল বিবরণে দধিসমুদ্র ও ক্ষীরসমুদ্র প্রভৃতির বিবরণ আছে, অথচ কলম্বস্, ড্রেক্ ও ফ্রাবিশারের সময় হইতে ফ্রাঙ্কলিন, রস ও ন্যানসেনের সময় পর্য্যন্ত নাবিকেরা সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করিয়া সমুদ্রমধ্যে নোনা জল ব্যতীত এক ছটাকও স্বাদু জল সংগ্রহ করিতে পারিলেন না! এই সকল কাল্পনিক বিবরণে কেবল রসনেন্দ্রিয় দ্রাবিত হয় মাত্র অথচ তাহার পরিতৃপ্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না; ইত্যাদি বিবিধ যুক্তিপরম্পরা দেখাইয়া বিখ্যাত লর্ড মেকলে, তাঁহার মহোৎপাদিনী ভাষায় প্রতীচ্য শিক্ষানীতির সমর্থন করিলেন; এবং কবে সেই শুভ দিন আসিবে, যখন প্রাচ্য বর্ব্বরগণ প্রতীচ্য শিক্ষার সহিত প্রতীচ্য সভ্যতা লাভ করিয়া প্রতীচ্য রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য লালায়িত হইবে, এই সুখস্বপ্ন দেখিয়া পুলকিত হইলেন। ভারতবর্ষে ইংরাজী বিদ্যা প্রচলনের সূত্রপাত হইল। ভারতবর্ষের রাজধানীতে ইংরাজ অধ্যাপকের পরিচালিত ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। ইংরাজ অধ্যাপকের পদপ্রান্তে বসিয়া বঙ্গীয় যুবকগণ বেকনের Essay ও মিল্‌টনের Areopagitica অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। আরিষ্টটলের সমাজনীতি সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। Paleyর Evidence ও Reidএর মনস্তত্ত্ব হইতে নূতন তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, বার্কের অনুকরণে প্রকাশ্য সভায় রাজনৈতিক বক্তৃতায় গলা সাধিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দু কালেজ হইতে প্রতীচ্য সভ্যতার ধ্বজা ধরিয়া যে সকল মহারথগণ বহির্গত হইলেন, তাঁহাদের আস্ফালনে ভূমিকম্পের সূচনা হইল। বাঙ্গালীর ক্ষীণবল জাতীয় জীবনে এমন উৎসাহের আবেগ আর কখনও বুঝি দেখা যায় নাই। বহু কাল পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে সুগ্রীব-পরিচালিত সেনা স্বর্ণলঙ্কার বেলাভূমিতে

পদার্পণ করিয়া যে মহোৎসাহ দেখাইয়াছিল, বোধ হয়, তাহারই সহিত এই নবীন উৎসাহের কতকটা তুলনা হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে সীতার উদ্ধার বিষয়ে সংশয় সকলের মন হইতে গিয়াছিল কি না, জানি না; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে হিন্দুয়ানিরূপ বিকট দশাননের কবল হইতে ভারতমাতার উদ্ধার যে অবিলম্বেই সাধিত হইবে, সে বিষয়ে কাহারও দ্বিধা রহিল না। কিছু দিন মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল; নগরে নগরে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল; প্রতীচ্য শিক্ষা ও প্রতীচ্য সভ্যতার আলোক নিভৃত পল্লীগ্রামমধ্যেও কুসংস্কারের অন্ধকার দূরীকরণে প্রবৃত্ত হইল। ইংরাজী লেখকে ও ইংরাজী কথকে অচিরকাল মধ্যেই "ছাইল সকল ঘাট বাট"; স্থির হইয়া গেল, ভারতের মুখচন্দ্রমার মালিন্য অচিরেই অপসৃত হইবে।

তাহার পর অধিক দিন গত হয় নাই, কিন্তু ইহার মধ্যেই বায়ু প্রতিকূল মুখে ফিরিয়াছে। চারি দিকেই এখন হতাশের আক্ষেপ। বিলাতী বিদ্যা এ দেশে ফলিল না। প্রাচীনপন্থীরা বলিতেছেন, ইংরাজী শিখিয়া ছেলেগুলা কেবল সহবৎবর্জ্জিত হইতেছে, ধর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য হইতেছে, নাস্তিক হইতেছে। রাজপুরুষেরা বলিতেছেন, ইহারা কেবলই চাকরি চাহিতেছে ও চাকরি না পাইলে সংবাদপত্র বাহির করিয়া দেশমধ্যে অসন্তোষের বীজ ছড়াইতেছে। রাজজাতীয়েরা বলিতেছেন, ইহারা শ্বেতাঙ্গ দেখিলেই সেলাম করিতে চাহে না, ইহাদের এতটা নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়াছে। পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, ইহারা এত কাল ধরিয়া বিজ্ঞানের বহি মুখস্থ করিল, অথচ ইহাদের মধ্যে একটা নিউটন জন্মিল না, একটা ফ্যারাডে জন্মিল না; ইহাদের মস্তিষ্কের উপকরণ কেবল কাদা আর মাটি। সমাজসংস্কারকেরা বলিতেছেন, ইহারা এখনও বাল্যকালে বিবাহ করে, অথচ বলে—আমাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার দাও, আমাদের টেক্স বাড়াইও না, আমাদিগকে বিনা দোষে জুতা মারিও না। কাজের লোকেরা বলেন, ইহারা কেবল কবিতা লেখে ও উপন্যাস লেখে, দেশের ধনবৃদ্ধির দিকে ইহাদের চেষ্টা নাই। যাঁহারা কাজের লোক নহেন, তাঁহারা বলেন, ইহাদের ধনতৃষ্ণা অত্যন্ত বাড়িয়াছে, কলেজের বাহির হইয়াই ইহারা সরস্বতীকে বিসর্জ্জন দেয় ও অর্থের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়।

ফলতঃ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিশ্বজগৎ ভারত উদ্ধারের জন্য যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখের প্রতি চাহিয়াছিল, এখন এক রকম সিদ্ধান্ত হইয়া

গিয়াছে, সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত অকর্ম্মণ্য, জরদ্গব মনুষ্য সম্প্রদায় আর কোথাও নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী যাহা এ পর্য্যন্ত এ দেশে প্রচলিত ছিল, তাহা আর কোন সুফল প্রসব করিতে পারিবে না; তাহা এক রকম নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। বড় বড় রাজপুরুষ তাঁহাদের উচ্চ আসন হইতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি ভ্রূকুটী-ভঙ্গী করিতেছেন। ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি ও শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি নিয়ত হলাহল উদ্গার করিতেছেন। সার্ চার্লস ইলিয়ট বলিলেন, ইহারা মিল ও বার্ক পড়িয়া রাজনীতির ঝঙ্কার দিতে শিখিয়াছে মাত্র; টাইমস্ পত্র বলিলেন, ইহারা ইতিহাস পড়িয়া কেবল রাজদ্রোহ শিক্ষা করিতেছে। ঈগল্ পক্ষী তাহার চঞ্চুপুট ব্যাদান করিয়া নেটিব্ দাঁড়কাকগুলাকে জানবাজার ষ্ট্রীটের অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের কচকচি হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। পার্লামেণ্টে আমাদের কালা নাইট ভবনগরী বলিলেন, এখন কিছু দিনের জন্য উচ্চ শিক্ষা বন্ধ করিয়া ইহাদিগকে জুতা সেলাই করিতে শিখাইলে দেশের শ্রীবৃদ্ধির একটা উপায় হইতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় এখন কতকটা ধরার ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের অস্তিত্বের আবশ্যকতা নিতান্ত প্রমাণ-সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা তাঁহাদের পক্ষ হইয়া দুই একটা মিষ্ট কথা বলিতেছেন, তাঁহারা বস্তুতই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌বোকেশন উপলক্ষে আমাদের মহামান্য রাজপ্রতিনিধি ও আমাদের অকৃত্রিম হিতৈষী সার্ এণ্টনি ম্যাক্‌ডোনেল আমাদের এই দুর্দ্দিনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে মিষ্ট কথা কহিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা লাভের অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু শিক্ষা-প্রণালীর যে সংস্কার আবশ্যক, তাহা এক রকম সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া গিয়াছে, একটা যে নূতন বন্দোবস্ত আবশ্যক, তাহা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কিন্তু সেই বন্দোবস্তটা কিরূপ হইবে, তাহাই এখন বিচারের ও বিতণ্ডার স্থল। 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্'! মহাজনের পন্থাই এই সঙ্কটের স্থলে এক মাত্র পন্থা, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য-ক্রমে মহাজন একজন নহেন, বহু জন; কাজেই পন্থার নির্দ্দেশও কঠিন সমস্যা। ব্যাধি একটা, কিন্তু চিকিৎসক অনেক; ঔষধের সংখ্যার সীমা নাই। এবং প্রত্যেক ঔষধই যেখানে অব্যর্থ, সেখানে পীড়িতের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ ও শোচনীয়। নমুনাস্বরূপ দুই একটা ব্যবস্থার উল্লেখ করিতে পারি।

ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সময়ে প্রাচ্য শিক্ষার বিরুদ্ধে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধেও সেই যুক্তি প্রযুক্ত হইতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে একটা প্রধান অভিযোগ যে, ইহা অত্যন্ত লিটারারি, ইহাতে বৈজ্ঞানিকতায় সম্যক্ আদর নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবাসীর ধাতুতে বৈজ্ঞানিকতার অত্যন্ত অভাব। ভারতবাসী পিতৃপিতামহক্রমে লিটারারি; আচার্য্য ম্যাক্‌সমূলর বলিয়াছেন, ভারতবাসী একবারে ফিলসফার হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়েন। ভারতবাসী প্রত্যেকেই এক একজন শুকদেব। শুকদেবের সংখ্যা-বাহুল্য পারমার্থিক হিসাবে যতই প্রার্থনীয় হউক না, ব্যাবহারিক হিসাবে ততটা আশাপ্রদ নহে। কেন না, আমাদের ভারতবর্ষে দশ বৎসর অন্তর এক একটা প্রবল দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া জঠরজ্বালাকে কিছু দিনের জন্য অত্যন্ত তীব্র করিয়া ব্যাবহারিক জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও দৃঢ়ীভূত করিয়া দেয়। এমন কি, যে সকল সংসারবিরক্ত সন্ন্যাসিগণ মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যেন-তেন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের সেই মাধুকরী বৃত্তিতেও বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া আর একটা বৃত্তির অবলম্বনে বাধ্য করে, যাহার ফলে তাঁহাদিগকে সঙ্কীর্ণ সংসার-কারাগার হইতেও সঙ্কীর্ণতর অন্যবিধ কারাগারে আশ্রয় লইতে হয়। যে বৈজ্ঞানিকতা ভারতবাসীর এই ফিলসফি-প্রবণতা ও কাব্য-প্রবণতা ও বৈরাগ্য-প্রবণতা কতকটা দমন করিয়া তাহাকে বৈষয়িক প্রবৃত্তি দিতে পারে, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে না কি সেই বৈজ্ঞানিকতার একান্ত অভাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বন্দোবস্ত অনুসারে ছাত্রগণ বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রাণপণে কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষকগণের প্রযুক্ত যাবতীয় ব্রহ্মাস্ত্রকে ফাঁকি দিতে সমর্থ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মজ্জাতে ও ধাতুতে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্তি জন্মায় না।

আমাদের বিদ্যালয়সংযুক্ত ল্যাবরেটারিগুলিতে যে সকল ছাত্র অতি মনোযোগ সহকারে ব্যাটারি ও থার্ম্মোমিটর লইয়া নাড়াচাড়া করে, পাঁচ বৎসর পরেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের বৈঠকখানার আলমারিগুলি পুরাতন ল-রিপোর্টের সারিতে সুশোভিত হইয়াছে, এবং চাপকানের উপর চাদর ও মস্তকে শামলা পরিধান করিয়া তাঁহারা নবীন কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছেন।

চল্লিশ বৎসর হইল, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এ দেশের উচ্চশিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ দেশের লোকের বিজ্ঞানের প্রতি আনুরক্তি জন্মিল না। মাননীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের জীবনব্যাপী উদ্যম এখন কেবল সাংবৎসরিক নৈরাশ্যের উচ্ছ্বাসে পরিব্যক্ত হইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য নূতন উপাধি প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন হইতে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নামের পশ্চাতে নয়নানন্দকর অভিনব উপাধি সংযোগের অবসর পাইবে। কিন্তু এই নূতন ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের প্রতি আনুরক্তি আমাদের ছাত্রসম্প্রদায়মধ্যে কত দূর বর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে অনেকের মনে গভীর সংশয় রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় নূতন নূতন উপাধির প্রলোভন সম্মুখে ধরিতে পারেন, এবং বড় বড় কেতাবের তালিকা দ্বারা তাঁহাদের ক্যালেণ্ডারের পাতা সুশোভিত করিতে পারেন; কিন্তু শিক্ষার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে নাই। বিজ্ঞান শিখিতে যে যন্ত্র তন্ত্র কারখানা আবশ্যক তাহা বিশ্ববিদ্যালয় যোগাইতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সে ক্ষমতা নাই। গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে অর্থব্যয়ে পরাঙ্মুখ। লর্ড কেল্‌বিনের ন্যায় বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের অনুরোধ সত্ত্বেও প্রেসিডেন্সি কালেজে ফিজিক্যাল ল্যাবরেটারি স্থাপনের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে আমাদের গবর্ণমেণ্ট অক্ষমতা স্বীকার করিয়াছেন। অথচ এই প্রেসিডেন্সি কালেজেই যে কিছু সামান্য উপকরণ আছে, তাহার অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক খেলিবার অবসর পাইলে খেলিতে না পারে এমন নহে। এই প্রেসিডেন্সি কালেজ হইতেই দুই জন বাঙ্গালী বিজ্ঞানবিদের নাম ভারতবর্ষের চতুঃসীমা ছাড়াইয়া বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত মফস্বলের কালেজগুলির ও আমাদের দেশীয় লোকদিগের পরিচালিত কালেজগুলির অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, সেখানে বিজ্ঞান শিখাইবার যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহা স্মরণ করিলে চক্ষে জল আসে। এইরূপ মশলা লইয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গদেশে বৈজ্ঞানিক বানাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ অস্বাভাবিক শিক্ষাপ্রণালীর ফল যে স্বভাবসঙ্গত হইবে, তাহার আশা একরূপ নাই বলিলেই চলে। উনানে আগুন ধরাইবার জন্য বাতাস দিতে ও ফুঁ দিতে হয়, কিন্তু বাতাস দিবার পূর্ব্বে যথেষ্ট পরিমাণে ইন্ধন যোগান আবশ্যক। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গণ্ডদ্বয় যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া প্রাণপণে ফূৎকার প্রয়োগের ব্যবস্থা

করিতেছেন, কিন্তু উপযুক্ত ইন্ধনের যেরূপ ঐকান্তিক অভাব, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট গণ্ডপীড়া হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু দেশের মধ্যে বিজ্ঞানাগ্নি সন্দীপিত হইবার আশা সুদূরপরাহত।

বিজ্ঞান শিক্ষার সহিত নিকট সম্পর্কবিশিষ্ট আর একরকম শিক্ষা আছে, তাহাকে টেক্নিক্যাল শিক্ষা বা হাতে-কলমে শিক্ষা বলে। অনেকের মুখে আজকাল শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই টেক্নিক্যাল শিক্ষার বন্দোবস্ত হইলেই দেশের অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। হাতে-কলমে শিক্ষা যে জাতীয় উন্নতির জন্য নিতান্ত আবশ্যক, তাহা নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যতীত কেহ অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু এই শিক্ষার জন্য যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বক্তৃতা করেন ও হা-হুতাশ করেন, তাঁহারা এপর্য্যন্ত টেক্নিক্যাল শিক্ষার প্রণালীটা কিরূপ হইবে, তাহার একটা পরিষ্কার উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। অনেকের মতে ডাক্তার সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসভাকে দেশলাইয়ের বা সাবানের কারখানাতে পরিণত করিলেই আমাদের টেক্নিক্যাল শিক্ষার একরকম বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে। বঙ্গদেশের অদৃষ্টে নানাবিধ বিধিবিড়ম্বনা ঘটিয়াছে ; বিজ্ঞানসভার অদৃষ্টেও এইরূপ শোচনীয় পরিণতি আছে কি না জানি না ; তবে আশা করি, সেই পরিণতি যেন বিলম্বিত নয়।

হাতে-কলমে শিক্ষা আমাদের দেশে কখনও ছিল না, এবং এখনও নাই, এমন নহে। মনুষ্য যে দিন তাহার আদিম বর্ব্বর অবস্থায় পাথর ভাঙ্গিয়া অস্ত্রনির্ম্মাণ অভ্যাস করিয়াছিল, সেই দিনই হাতে-কলমে শিক্ষার প্রথম বন্দোবস্ত হইয়াছিল। মনুষ্য সমাজ মাত্রেই শিল্পোৎপন্ন বিবিধ সামগ্রীর আবশ্যক, এবং সেই শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণের কৌশল এক শ্রেণীর মনুষ্যকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা করিতে হয়। আমাদের দরিদ্র সমাজের আবশ্যক-মত শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণের ব্যবস্থা এত কাল আমাদের সমাজের মধ্যেই বর্ত্তমান ছিল। চাষার ছেলে ছেলেবেলা হইতে চাষ শিখিত, ছুতারের ছেলে ছেলেবেলা হইতেই ছুতারের কাজ শিখিত। তন্তুবায়পুত্র আপন ঘরে বসিয়া তাহার পৈতৃক যন্ত্রাদি লইয়া তাঁত বোনা শিখিত। জাতিভেদে ব্যবসায়ভেদের ব্যবস্থা থাকায় অতি অল্প ব্যয়ে দরিদ্র শিল্পীর পক্ষে শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। ঘরের ভাত খাইয়া পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত যন্ত্রাদির সাহায্যে আপনার পিতা পিতামহের নিকট বা আত্মীয় স্বজনের নিকট শিল্পকৌশল অভ্যাস করার যে সুন্দর বন্দোবস্ত আমাদের দেশে এত কাল প্রচলিত

ছিল, এবং এখনও আছে, তাহাতে সমাজের সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যই এত কাল সম্পাদিত হইয়াছে। এবং এই শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে যে সকল শিল্পিসম্প্রদায় এ দেশে জন্মিয়াছে, তাহাদের কারুকার্য্য অনেক বিষয়ে এখনও বৈদেশিকগণেরও বিস্ময়োৎপাদক হইয়া আছে। এত কাল পর্য্যন্ত আমরাই শিল্পসামগ্রী বিদেশে যোগাইতাম, ইউরোপের লোকে এ দেশের শিল্পদ্রব্য লইয়া যাইবার জন্যই এ দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কালে ষ্টীম এঞ্জিনের প্রতাপে এখন পুরাতন বন্দোবস্ত সমস্তই উল্টাইয়া গিয়াছে। এখন ইউরোপের লোকেই সমস্ত পৃথিবীকে শিল্পের সামগ্রী যোগাইতেছে। ইউরোপের কল-কারখানার সহিত আমাদের সনাতন প্রণালী এখন আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সেই জন্য আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীরও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপে যে প্রণালীতে হাতে-কলমে শিক্ষাদান হয়, এখন এ দেশেও সেই প্রণালীতে শিক্ষাদান আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য যে সকল সরঞ্জাম আবশ্যক, তাহা আমাদের দেশে অদ্যাপি বর্ত্তমান নাই। দেশের মধ্যে কল-কারখানা নাই; দেশের লোক অনভিজ্ঞতাবশতঃ নূতন কাজে হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ। মূলধনের একান্ত অভাব; যাঁহাদের ধন আছে, তাঁহারা ত বিশ্বাস ও সাহসের অভাবে সেই ধনের ব্যবসায়ে নিয়োগে কুণ্ঠিত। বৈদেশিক রাজা দেশীয়দের সাহায্য করিতে একবারে পরাঙ্মুখ। এরূপ স্থলে হাতে-কলমে শিক্ষার সুবিধামত বন্দোবস্ত হওয়া অসম্ভব। হাতে-কলমে শিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক, সন্দেহ নাই; এবং দেশের ত্রিশ কোটি অধিবাসীর ষাটি কোটিখানা হাতও বর্ত্তমান রহিয়াছে, কেবল কলমের অভাবে শিক্ষাটা ঘটিয়া উঠিতেছে না।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর যে সংস্কার ও সংশোধন আবশ্যক, তাহা রাজা ও প্রজা উভয় পক্ষ হইতেই একরকম স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ সার্ সৈয়দ আমেদের স্মৃতিস্থাপনা উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার স্থাপিত আলিগড় কালেজকে স্বতন্ত্র মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীমতী আনি বেসান্ত কাশীধামে হিন্দুর জাতীয় ভিত্তির উপর স্থাপিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করিবার জন্য হিন্দুসমাজকে আহ্বান করিয়াছেন। বাঙ্গালার জমীদারগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় ভূস্বামিগণের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে

নীতির উৎকর্ষ ও স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ বিধানের কোনরূপ বন্দোবস্ত নাই দেখিয়া, কলিকাতা শহরে ছাত্রদিগের জন্য হায়ার ট্রেনিং ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় শিক্ষা-বিভাগের মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বাঙ্গালীর ক্ষীণপ্রাণ শিশুগণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে দুর্ব্বহ ভূতের বোঝা বহিবার অকারণ পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি দিয়া নিম্ন শিক্ষাপ্রণালীর আমূল সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন। পশ্চিম ভারতবর্ষে যে সমাজ হইতে আমাদের দাদাভাইকে আমরা পাইয়াছি, সেই সমাজের অপর এক স্বদেশবৎসল মহাত্মা উচ্চতর শিক্ষা বিস্তারের জন্য বদান্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে প্রস্তুত হইয়া আমাদের ধনিগণের সম্মুখে মহাদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

এত দিন আমরা যে প্রাচ্য শিক্ষাকে অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছিলাম, আজকাল তাহার প্রতি অনেকের সুদৃষ্টি পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে কেবলই যে ক্ষীরসমুদ্রের ও দধিসমুদ্রের কথা নাই, সেখানে যাস্ক ও পাণিনি ও আর্য্যভট্ট ও ভাস্করাচার্য্যের মত মনস্বিগণও লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা কেহ কেহ যেন স্মরণ করিতেছেন। ফলে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণের প্রতিও একালের ইংরাজী শিক্ষিতগণের শ্রদ্ধা ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষার আবশ্যকতা অনেকের মনে স্থান লাভ করিয়াছে। স্থানবিশেষে এই চেষ্টা নিতান্ত অদ্ভুত ফলের উৎপাদন করিয়াছে। আমাদের মত ফিলজফিক্যাল জাতি স্বভাবতঃই হাস্যরসের আস্বাদনে বঞ্চিত ; কিন্তু বর্ত্তমান কালে ইংরাজী বিদ্যা গলাধঃকরণের সহকারে গীতা ও চাণক্যশ্লোকের চাটনির ব্যবস্থা হইয়া যে নিতান্ত আংগ্লোবেদিক খেচরান্ন ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে নিতান্ত অরসিকেরও রসপ্রবৃত্তি না হইয়া যায় না। যাঁহারা সনাতন ধর্ম্মের বা জাতীয় আচারের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ঈদৃশ কৌতুকের অভিনয় করিতেছেন, তাঁহাদের অভিনয় দেখিয়া রসগ্রাহী লোকের হাস্য সংবরণ কঠিন হয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের আন্তরিক উদ্দেশ্যকে আমি শ্রদ্ধা করি। বস্তুতঃ যে শিক্ষাপ্রণালী জাতীয়তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক ; এবং যাহা অস্বাভাবিক, তাহা হইতে স্থায়ী ফল লাভের সম্ভাবনা অল্প। যুগান্তর হইতে যে জাতীয় স্বভাব বর্দ্ধিত, পুষ্ট ও বিকশিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার সহিত একবারে সকল সম্পর্ক রহিত করিলে, কেবল শিক্ষাপ্রণালী কেন, কোন প্রণালীই অভিব্যক্ত হইতে পারে

না। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর প্রতিষ্ঠাতাগণ এই সরল স্থূল কথাটা বুঝিতে পারেন নাই। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে সম্বন্ধ, যে আদান-প্রদান না থাকিলে সমগ্র শরীরের পুষ্টিসাধন হয় না, আমাদের শিক্ষাসমাজের শরীরমধ্যে যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্ত্তমান আছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সেই সম্বন্ধ, সেই আদান-প্রদান, সেই সমবেদনা বর্ত্তমান নাই ; তাই উহা বর্দ্ধিত ও পুষ্ট ও শ্রীযুক্ত হইতে পারিতেছে না। বিলাত হইতে যে শিক্ষাপ্রণালী সশরীরে আমাদের দেশে আমদানি করা হইয়াছে, তাহা আমাদের জাতীয় ভাবের সহিত মিশিতে পারে নাই ; সেই অস্বাভাবিক প্রয়াসে যে অস্বাভাবিক ফল প্রসব করিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি ?

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে নীতি শিক্ষার ও ধর্ম্ম শিক্ষার আদর নাই বলিয়াই সচরাচর একটা আক্ষেপ উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধিমানেরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া উপদেশ দেন, নীতিপুস্তকের সংখ্যা পাঠ্যমধ্যে বাড়াইয়া দিলেই ছাত্রগণকে দুর্নীতি একবারে পরিত্যাগ করিবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও একবার হুজুগে পড়িয়া নিয়ম করিয়াছিলেন, প্রবেশিকা পরীক্ষার সাহিত্যবিষয়ক পাঠ্য গ্রন্থে অন্ততঃ এত পাতা নীতিকথা থাকা চাই। কিন্তু গ্রন্থ পাঠ করিয়া সন্নীতির উৎকর্ষ বিধানে যাঁহারা আশা করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভেলা বাহিয়া সাগর সন্তরণে প্রবৃত্ত হয়েন। গ্রন্থ পাঠ দ্বারা ধর্ম্মনীতির উৎকর্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর নাম উল্লেখ করিলে আজিকার দিনে আমার অনেক বন্ধু হয়ত লগুড় উত্তোলন করিবেন, কিন্তু তথাপি আমি বলিতে চাহি যে, নীতি শিক্ষারও একটা কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী আছে। কেবল বস্তুতত্ত্ব শিখাইবার জন্যই কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে ফল পাওয়া যায়, এমন নহে ; শিক্ষা মাত্রেই এই প্রণালী ফলোপধায়ক ; এমন কি, আমি বলিতে চাহি যে, শিক্ষা মাত্রেরই বোধ হয় এই এক মাত্র প্রণালী। যিনি ইংরাজী রচনা অভ্যাস করিতে চাহেন, তিনি দশ বৎসর কাল বেন সাহেবের ব্যাকরণ ও মরিস সাহেবের accidence অভ্যাস করিলেও ইংরাজী রচনায় নৈপুণ্য লাভ করিতে পারিবেন না ; তাঁহাকে বাছিয়া বাছিয়া ভাল রচনা প্রচুর পরিমাণে পড়িতে হইবে, এবং স্বয়ং প্রচুর পরিমাণে ইংরাজী রচনা অভ্যাস করিতে হইবে। হাইড্রোজেন বায়ু স্বাদহীন, গন্ধহীন, বর্ণহীন, এইরূপ সারা বৎসর ধরিয়া মুখস্থ করিলেও ছাত্রদের হাইড্রোজেন কেবল একটা নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ পদার্থ, এইরূপই একটা জ্ঞান জন্মিবে

মাত্র, প্রকৃতপক্ষে হাইড্রোজেনের স্বরূপ জানিতে হইলে বোতল বোতল গ্যাস স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া অগ্নি প্রয়োগে জ্বালাইতে হইবে।

কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী এই চোখে দেখিয়া হাতে লইয়া ঘাঁটিয়া নাড়িয়া ভাঙ্গিয়া পোড়াইয়া দেখারই নামান্তর মাত্র। নীতি শিক্ষারও কিণ্ডারগার্টেন আছে; শিক্ষকের কাছে কেবল নীতি সম্বন্ধে লেক্‌চার শুনিলে চলিবে না; শিক্ষককে নীতি সম্বন্ধে ডিমনষ্ট্রেশন দিতে হইবে। তাঁহাকে আপন গৃহস্বরূপ ও সমাজস্বরূপ ল্যাবরেটরিতে দাঁড়াইয়া সন্নীতির দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। ছাত্রেরা স্বচক্ষে সেই দৃষ্টান্ত দেখিবে ও তাহার ফল ভোগ করিবে; শিক্ষক স্বয়ং ভাল কাজ করিয়া তজ্জাত আনন্দ উপভোগ করিবেন ও ছাত্রদের দ্বারা ভাল কাজ করাইয়া তাহাদিগকে তাহার আনন্দ উপভোগ করাইবেন। শিক্ষক স্বয়ং মিথ্যাচার ও অসদাচার হইতে দূরবর্ত্তী থাকিবেন ও আপনার ছাত্রগণকে মিথ্যাচার ও অসদাচার হইতে দূরে রাখিবেন। পরন্তু সহানুভূতির ও স্নেহের ও প্রীতির বন্ধনে ছাত্রদিগকে আবদ্ধ রাখিয়া বেত্রের শাসন ও জরিমানার শাসন ও percentageএর শাসন অপেক্ষা এই বন্ধন যে কত অধিক ফলদায়ক, তাহা ছাত্রদিগকে আত্মজীবনে অনুভব করিবার শক্তি দিবেন। শিক্ষার দ্বারা যদি নীতির উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর হয়, তাহা এইরূপ শিক্ষার ফলে; কেবল পাঠ্য পুস্তক মধ্যে নৈতিক উপদেশ কণ্ঠস্থ করিবার ফলে নহে।

নীতিশিক্ষার এই কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী মনে করিতে গেলেই আমাদের প্রাচীন কালের পুরাতন শিক্ষাপ্রণালী মনে আসে। সে এক কাল ছিল; তখন গুরু-শিষ্যের মধ্যে দোকানদারী সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল না; তখন বেতনের পরিবর্ত্তে বিদ্যাবিক্রয় নিতান্ত হেয় প্রণালী বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন গুরু-শিষ্যের মধ্যে অন্যবিধ বিনিময়ের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল; এক পক্ষে স্নেহ ও প্রীতি, অন্য পক্ষে শ্রদ্ধা ও ভক্তি। উপনয়ন সংস্কারের পর ধৃতব্রত মানব যখন ব্রহ্মচারীর ইউনিফরম্ পরিয়া দেবতাগণের ও আত্মীয় জনের আশীর্ব্বচন মস্তকে লইয়া পিতৃভবন হইতে গুরুগৃহে উপস্থিত হইত, তখন সেই কুটীরবাসী গম্ভীরমূর্ত্তি অপরিচিত পুরুষ সেই নবীন আগন্তুককে স্নেহপূর্ণ প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া সম্ভাষণ করিয়া লইতেন; গুরুগৃহ তখন তাহার পিতৃগৃহে পরিণত হইত; শিক্ষাদাতা তখন জন্মদাতার স্থান পরিগ্রহ করিতেন, গুরুপত্নী তখন জননীর স্থান গ্রহণ করিতেন,

গুরুপুত্রগণ বয়স্যের স্থান ও ভ্রাতার স্থান গ্রহণ করিত। গুরুগৃহে বাসকালে যে সকল জ্ঞানোপদেশ প্রদত্ত হইত, তখন যে সকল শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত, তাহার সহিত আধুনিক শিক্ষার ও আধুনিক শাস্ত্রের তুলনার প্রয়োজন নাই; যখন সেই পুরাকালের ভারতভূমির বেদধ্বনিমুখরিত ঋষিপুরিষৎ, সেই মৃগ-শিশুকুলের বিচরণভূমি, সেই হোমধেনুসমূহের বিহারস্থলী, সেই ঋষিকন্যা-সেবিত লতাবিতান, সেই নীবারকণাকীর্ণ উটজাঙ্গন, সেই শুক-মুখভ্রষ্ট ইঙ্গুদিফল-চিহ্নিত শ্যামল শস্যক্ষেত্র, সেই সমিৎকুশ-ফলাহরণ-প্রত্যাগত ঋষি-শিষ্যমণ্ডলী যখন মানস নেত্রে প্রতিভাত হয়, তখন সেকালের শিক্ষাপ্রণালীর সহিত একালের বিদ্যাবিপণিসমূহে শিক্ষাবিক্রয় প্রথার তুলনা করিয়া দীর্ঘশ্বাস আপনা হইতে বহির্গত হয়।

বর্ত্তমান অধ্যাপনাপ্রণালীকে আমি যে বিদ্যাবিক্রয় বলিয়া উল্লেখ করিতেছি, তাহার একটা কৈফিয়ৎ আবশ্যক। বেতন গ্রহণ করিয়া বিদ্যাদান যে একবারে অবৈধ ব্যাপার, তাহা আমি বলিতে চাহি না। অধ্যাপকেরও জীবনধারণ আবশ্যক, এবং অধ্যাপনাই যাঁহার এক মাত্র জীবিকা, তাঁহাকে সেই উপলক্ষ্যেই জীবনোপায় সংগ্রহ করিতে হইবে। আধুনিক চতুষ্পাঠীমধ্যে ছাত্রের নিকট বেতন গ্রহণের প্রথা বর্ত্তমান নাই; কিন্তু চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরাও দেশের ধনিসম্প্রদায় কর্ত্তৃক এক হিসাবে পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন। দেশে যখন হিন্দু রাজা শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন, তখন তাঁহারা রাজার ব্যয়েই প্রতিপালিত হইতেন। একালে আর অধ্যাপকের জন্য ভূমিদানের তাম্রশাসন ক্ষোদিত হয় না; কিন্তু তথাপি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণের সামান্য অভাব পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তি হইতে ও ধনিসম্প্রদায়ের অনুগ্রহ হইতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপ বন্দোবস্তে যে একবারে দোষ নাই, তাহাও আমি বলিতে চাহি না। ধনীর অনুগ্রহের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করিয়া থাকিতে হইলে অনেকটা আত্মমর্য্যাদার হ্রাস হয়; এবং ক্রমশঃ চাটুবৃত্তি শিক্ষা অভ্যস্ত হইয়া আসে। আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যেও এমন উদাহরণ বিরল নহে, তাঁহারা সামান্য অর্থের জন্য অসার অকর্ম্মণ্য জমিদারসন্তানকেও "রাজন্ তব যশো ভাতি দধিবৎ" বলিয়া চাটুকীর্ত্তনে কুণ্ঠিত হয়েন না। চতুষ্পাঠীর প্রণালীকে আমরা প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর শেষ অবস্থা বলিয়া মনে করিতে পারি, যখন

অধ্যাপকের পালন ও উচ্চশিক্ষা প্রদান রাজার কর্ত্তব্য ও সাধারণের কর্ত্তব্য, অর্থাৎ ষ্টেটের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। একালেও সাধারণ শিক্ষার ভার ষ্টেটের লওয়া উচিত কি না, তাহা লইয়া মধ্যে মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। নিম্নশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার ভার যে ষ্টেটের লওয়া উচিত, সে বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। আমাদের দেশে ও ইংরাজের দেশে নিম্নশিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে গবর্ণমেণ্ট ইতস্ততঃ করেন না। উচ্চ-শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে আমাদের গবর্ণমেণ্ট বড় রাজী নহেন; সেই ভারটার অংশ নিজের পক্ষে লাঘব করিয়া দেশের লোকের উপর ফেলিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ব্যাকুল। বিলাতেও প্রাচীন কালের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধনিসম্প্রদায়ের প্রদত্ত সম্পত্তি হইতে পালিত হইয়া থাকে, এ সকলের উপর রাজার তেমন কর্ত্তৃত্ব নাই। জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশে রাজা উচ্চশিক্ষার জন্য অকাতরে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না। আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্টও কুণ্ঠিত; দেশের ধনিসম্প্রদায়েরও তেমন অবস্থা নহে যে, বর্ত্তমান প্রণালীর উচ্চশিক্ষার গুরু ভার তাঁহারা সম্যক্‌রূপে বহন করেন। কাজেই শিক্ষার্থিগণের উপরেই ভারটা একবারে চাপিয়া পড়িতেছে। শিক্ষার্থিগণের প্রদত্ত বেতনে শিক্ষাপ্রদান এ দেশে প্রায় নিয়ম হইতে চলিয়াছে। কিন্তু দরিদ্র দেশের দরিদ্র শিক্ষার্থীর ক্ষমতা যেরূপ, শিক্ষার ও অধ্যাপনার অবস্থাও তদনুযায়ী হইয়া পড়িতেছে। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগের সঙ্গে একত্র বাস করেন; উভয়ের মধ্যে জ্ঞানের বিনিময়ের সহিত ভাববিনিময় ও শ্রদ্ধা-ভক্তির বিনিময়ও ঘটিয়া থাকে। এই বিষয়ে বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অনেকাংশে আমাদের চতুষ্পাঠীর মত। এ দেশে আমরা বিলাত হইতে উচ্চশিক্ষার প্রণালী আনাইয়াছি; কিন্তু তজ্জন্য যে ব্যয়ের প্রয়োজন, তাহার ভার লইতে কেহই প্রস্তুত নহে। গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষার খরচ দিতে কুণ্ঠিত, ধনিসম্প্রদায় অক্ষমতার ওজর করেন; ছাত্রসম্প্রদায়ের ক্ষমতার একান্ত অভাব। আমরা প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়াছি; বৈদেশিক প্রণালীর ব্যয়ভার গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত নহি। আমাদের অবস্থা নিতান্তই অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিকতাই আমাদের ব্যাধি। ফলও ঠিক তদনুরূপ হইতেছে।

আমাদের মত দরিদ্রের পক্ষে ঐশ্বর্য্যশালীর অনুকরণ চেষ্টা বস্তুতই অস্বাভাবিক। হয়ত এই দারিদ্র্যই আমাদের সকল ব্যাধির মূল।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, আমরা দরিদ্র। রাজপুরুষেরাও বলেন, আমাদের দেশের চারি আনা লোক প্রতি দিন অর্দ্ধাশনে যাপন করে। অথবা তাঁহাদের স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এই সে দিন মাত্র ভারতের কোটি প্রজার অন্নসংস্থানের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের মহারাজ্ঞীর প্রতিনিধি ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া 'দেহি দেহি' শব্দে পৃথিবীর লোকের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। বিগত দুর্ভিক্ষের সমালোচনায় নিযুক্ত কমিশনের রিপোর্ট স্বাক্ষরিত না হইতেই পশ্চিম-ভারতে আবার রণবাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে; আবার বৃটিশ সিংহের চতুরঙ্গিণী সেনা দুর্ভিক্ষ-দৈত্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সাজ সাজ শব্দে আহূত হইয়াছে। ইহার উপর আর কথা নাই। আমাদের দারিদ্র্যব্যাধির উপশম করিতে পারিলে হয়ত অন্যান্য উপসর্গ আপনা হইতে দূর হইতে পারিবে। সুতরাং এই দারিদ্র্যের কথাটা আমাদের বিশেষরূপে আলোচ্য।

আলোচ্য বটে; কিন্তু আলোচনা করিতে গেলেই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কেন না, দারিদ্র্যের কথা আনিতে গেলেই 'পলিটিক্যাল ইকনমি' নামক একটা বিকট শাস্ত্রের আশ্রয় লইতে হয়, এবং আমাকে কাতরভাবে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আপনাদের অনুগৃহীত এই দীন প্রবন্ধ-পাঠক উক্ত শাস্ত্রের প্রতি কস্মিন্ কালে অনুরাগ স্থাপনে সমর্থ হয়েন নাই। সুতরাং আমার আশা নাই যে, আমি ইহার সম্যক্ আলোচনায় সমর্থ হইব! দারিদ্র্যের কথা আনিতে গেলেই আমাদের আয়-ব্যয়ের কথা, টাকা আনা গণ্ডার ভীষণ ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ আসিয়া পড়ে, এবং পাটীগণিত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির অভাবে আমার ঐ লোমহর্ষণ অনুষ্ঠানে হাত দিতে স্বতই শঙ্কা হয়। পাঠ-শালায় পড়িবার সময় সঙ্কলন, ব্যবকলন, সম্ভূয় সমুত্থান প্রভৃতি শব্দপরম্পরা কেবল রাত্রিযোগে দুঃস্বপ্নের সৃষ্টি করিত। আমার এরূপ ক্ষমতা নাই যে, হিসাব করিয়া আমাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা যথাযথ উত্তর দিব। তবে পরের মুখে দুই চারি কথা যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহারই সার সঙ্কলনপূর্ব্বক আপনাদিগের উপর উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব।

আমরা দরিদ্র, সে বিষয়ে কাহারও কোন সংশয় নাই; কিন্তু সেই দারিদ্র্য বাড়িতেছে কি না, এই প্রশ্নের দুই রকম উত্তর শুনিতে পাওয়া যায়। এক উত্তর সরকারী, অন্য উত্তর বেসরকারী। অন্য দেশের কথা জানি না, কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণতঃ প্রাকৃতিক ঘটনার তথ্যনির্ণয়েও সরকারী ও বেসরকারী দুই রকম সিদ্ধান্ত সচরাচর প্রচলিত আছে। দেশে দুর্ভিক্ষ

হইয়াছে কি না? বেসরকারী উত্তর—দুর্ভিক্ষে অর্দ্ধেক লোক মরিয়া গেল; সরকারী উত্তর—দুর্ভিক্ষ কোথায়? শহরে প্লেগ আসিয়াছে কি না? সরকার যখন বলেন—প্লেগে বিস্তর লোক মরিতেছে, সাধারণের তখন স্থির সিদ্ধান্ত, এ সমস্তই কবিকল্পনা। দারিদ্র্য সম্বন্ধে সরকারী উত্তর—দেশ দরিদ্র, কিন্তু ইংরাজ শাসনের কল্যাণে উত্তরোত্তর ধনবৃদ্ধি হইয়া দারিদ্র্য দূরীভূত হইতেছে; বেসরকারী উত্তর—ইংরাজের শাসনে আমরা অত্যন্ত সুখে আছি সন্দেহ নাই, কিন্তু কিছু দিন পরে দেশে আর কানা কড়িটিও থাকিবে না। এ রহস্য মন্দ নহে; কিন্তু রহস্যের সমালোচনায় কৌতুক ও শিক্ষা আছে। উভয় পক্ষে বহু দিন হইতে বিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে; উভয় পক্ষের তূণীর হইতে ক্ষুরধার যুক্তির বাণসমূহ সর্ব্বদা প্রক্ষিপ্ত হইতেছে; কিন্তু সমরে জয় পরাজয়ের অদ্যাবধি মীমাংসা হইল না।

বেসরকারী পক্ষ বলেন, তোমরা হোম চার্জ্জ বলিয়া যে টাকাটা বৎসর বৎসর আপন দেশে লইয়া যাইতেছ, তাহা আমাদের নিছক লোকসান; ইংরাজ সৈনিক, ইংরাজ রাজপুরুষ যে টাকা এ দেশ হইতে লইয়া যায়, তাহার এক কড়াও আর এ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। দেশীয়ের হাতে শাসনকার্য্য ও শান্তি রক্ষার ভার দিলে দেশের টাকাটা দেশে থাকিত।

সরকারী পক্ষ বলেন, ঠিক। কিন্তু এত কাল ত তোমরা দেশ শাসন করিয়া আসিতেছিলে, কিন্তু শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হও নাই। বাহিরের শত্রু আসিয়া মাঝে মাঝে তোমাদের সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইত। অভ্যন্তরে দস্যু-তস্কর, বর্গী-পিণ্ডারীর অনুগ্রহে কাহারও ধন প্রাণ নিরাপদ ছিল না, আমরা তোমাদিগকে শান্তি দিয়াছি। বহিঃশত্রুর ভয় নাই; ভিতরে নির্ব্বিবাদ শান্তি; সকলে এখন মনের সুখে পরিশ্রমের ফল ভোগ করিবার অবসর পাইয়াছে। সহস্রগুণ দিবার জন্য সূর্য্যদেব রস গ্রহণ করেন; আমরাও পরিশ্রমের বেতনস্বরূপ একগুণ গ্রহণ করি; তোমরা আমাদের আশ্রয়ে থাকিয়া সহস্রগুণ লাভ করিয়া থাক। তোমরা শান্তির অবসর পাইয়া পরিশ্রমের দ্বারা ধনের উৎপাদন করিতে পারিতেছ, ধনের সৃষ্টি করিতে অবসর পাইয়াছ। তোমরা সহস্রগুণ ধন উৎপাদন করিবে, আমাদিগকে একগুণ বেতনস্বরূপ দিবে না কেন? আমরা কি পেটে না খাইয়া তোমাদের প্রহরীর কাজ করিব ও তোমাদের ঘরাও বিবাদের মধ্যস্থতা করিব?

আমরা নিরুত্তর হইয়া বলি, রাজপুরুষেরা, রাজকর্ম্মচারীরা তেমন অধিক লয়েন না বটে, কিন্তু এই ইংরাজ ব্যবসায়ীরা দেশের অনেক টাকা লইয়া যায়।

ও পক্ষ হাসিয়া বলেন, অরে মূর্খ, নীলকর ও চাকরের শুভাগমনের পূর্ব্বে এ দেশের মাটিতে নীলের ও চায়ের চাষ হইতে পারে, তাহা কয় জন লোকে জানিত? ইংরাজ ব্যবসায়ীর আগমনের পূর্ব্বে এ দেশের লোক রাণীগঞ্জের মাটি খুঁড়িয়া কয় মণ কয়লা তুলিত? আসামের জনশূন্য অরণ্যে হস্তী ভিন্ন তোমাদের মত হস্তিমূর্খ কতগুলি প্রতিপালিত হইত? ইংরাজ ব্যবসায়ী ও ইংরাজ কুঠিয়াল আসিয়া এ দেশের ছাইমুঠোকে কড়ি-মুঠোয়, এ দেশের ধূলিমুষ্টিকে স্বর্ণমুষ্টিতে পরিণত করিয়াছে; লৌহকে স্পর্শমণিসংযোগে কাঞ্চনে পরিণত করিয়াছে। যখন ইংরাজের জাহাজ ঐ দেশে আসে নাই, তখন চীনাম্যানের জন্য কত কোটি টাকার আফিম এ দেশের জমি হইতে উৎপন্ন হইত? ভারতবর্ষে যে শস্যসম্পত্তির, রত্ন-সম্পত্তির কখনও অস্তিত্ব ছিল না, ইংরাজ আসিয়া সেই সম্পত্তির আবিষ্কার করিয়াছে। তাহার আবিষ্কৃত স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির কতক ভাগ, সিংহের প্রাপ্য ভাগ, সে গ্রহণ করিবে, ইহাতে অন্যায় কি? কিন্তু তোমাদিগকেও ত সে একবারে ফাঁকি দেয় না। কত লক্ষ লক্ষ কৃষক, কত লক্ষ লক্ষ কুলি মজুর ইংরাজ কুঠিয়ালের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেছে, তাহার সংবাদ রাখ কি?

ইহার উত্তর নাই। আমরা তখন অন্য পথে ঘুরিয়া উত্তর দিই,—কিন্তু তোমাদের দেশের শিল্পীর দৌরাত্ম্যে আমাদের দেশীয় শিল্প লোপ পাইতে চলিল, শিল্পিকুল নিরন্ন হইয়া পড়িল, তাহার কি?

প্রতিপক্ষ বলেন, তোমাদের এ আবদার অসহ্য। এই অবাধ বাণিজ্যের ও স্বাধীন ব্যবসায়ের দিনে এ সকল আবদার শোভা পায় না। বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য—উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। তোমাদের শিল্পিগণ প্রতিযোগিতায় হঠে কেন? তাহারা আমাদের মত কল-কারখানা খুলিয়া আমাদের মত বুদ্ধি খাটাইয়া আমাদিগকে পরাস্ত করুক, তাহাতে কোন বাধা নাই। তাহারা সেই মান্ধাতার আমলের সনাতন মার্গ ত্যাগ করিবে না, আমরা তাহার কি করিব? তোমরা অগ্রসর হইবে না বলিয়া আমরা ত আর পশ্চাতে ফিরিতে পারি না। আমরা স্বাধীন ব্যবসায় চাহি;

কাহাকেও বাধা দিতে চাহি না; যাহার যেমন ক্ষমতা, সে তেমনই পন্থা দেখিয়া লউক।

অকস্মাৎ একটা উত্তর দিবার অবকাশ পাইয়া আমরা অমনই বলিয়া উঠি—ঐ ত, ঐ অবাধ বাণিজ্যই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। আমাদের নিরন্ন দেশের খাদ্য সামগ্রী, আমাদের ধান গম তোমরা অবাধ বাণিজ্যের নামে লইয়া যাইতেছ; পূর্ব্বে পাল-তোলা জাহাজের আমলে যাহা দশ বৎসরে লইয়া যাইতে, এখন রেল তার ষ্টীমারের আমলে তাহা দশ দিনে লইয়া যাইতেছ ও তাহার বিনিময়ে কতগুলা কাচ আর লোহা আর মাটি দিয়া আমাদিগকে প্রতারিত করিতেছ। এখন তোমাদের অবাধ বাণিজ্যের কল্যাণে টাকায় আট মণ চালের কথা আমাদের উপন্যাস হইতে চলিয়াছে; বাক্সে রৌপ্যমুদ্রা ও হাল আইনমতে স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চিত থাকিলেও আমাদের অন্নাভাবে প্রাণবিয়োগ ঘটিবে।

প্রতিপক্ষ মহাশয় তখন দশনপ্রভায় শ্মশ্রুগহন মুখমণ্ডলের ধ্বান্তরাশি বিদূরিত করিয়া বলিতে থাকেন,—ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, টাকায় আট মণ চাল যেন তোমাদের পক্ষে উপন্যাসই থাকে। টাকায় আট মণ চাল, কি ভীষণ কথা! এই কৃষিপ্রধান দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এমন এক কাল ছিল, যখন সে তাহার সংবৎসরের পরিশ্রমের ফল শস্য, যাহা দস্যুর হস্ত হইতে ও দস্যু হইতেও ভয়ানক জমিদার ও তাঁহার পারিপার্শ্বিকগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া আপনার ও আপনার পরিজনবর্গের দেহরক্ষার জন্য সঞ্চিত করিতে সমর্থ হইত, তাহার বিনিময়ে সে কি পাইত? না, আট মণের বিনিময়ে এক খণ্ড রজতমুদ্রা। এইরূপ বিনিময় ব্যাপারের পর তাহার অন্যান্য দৈহিক প্রয়োজন নির্ব্বাহ একরূপ অসাধ্য সাধন; হয়ত তাহার শীতনিবারণ ও লজ্জানিবারণও ঘটিত না। হয়ত ক্রেতার অভাবে তাহার ক্ষেতের ফসল মূষিকের উদরে যাইত বা ক্ষেতে পচিত; তাহার রাজকরের সংস্থানও ঘটিয়া উঠিত না। আমাদের অনুগ্রহে ও স্বাধীন বাণিজ্যের অনুগ্রহে সে আর তাহার পরিশ্রমলব্ধ জীবনোপায় শস্যসম্পত্তি মূষিকের ও তস্করের ও নায়েব গোমস্তার উদর পূরণের জন্য গোলা বাঁধিয়া রাখে না; এখন নিজে উদর পুরিয়া খাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার বিনিময়ে নানাবিধ প্রয়োজনীয় সামগ্রী, হয়ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিলাসোপকরণ পর্য্যন্ত, সামান্য মূল্যে আমাদের

নিকট গ্রহণ করে ও জীবনে আরাম ও স্বাস্থ্য উপভোগ করিবার অবসর পায়। একালে চাষার ছেলে ছাতা মাথায় দেয়, জামা গায় দেয়, জুতা পরে; চাষার গৃহিণী সোনায় রূপায় আপনার শ্যাম তনু অলঙ্কৃত করে; কৃষক গৃহস্থ এখন পোষ্ট অফিস হইতে কুইনাইন খরিদ করে, এবং হয়ত শৌণ্ডিকালয়েও এক আধ বার লব্ধপ্রবেশ হইয়া দিনান্তের পরিশ্রমজাত অবসাদ দূর করিবার অবকাশ পায়। সেকালের ধনী লোকে আইন-ই-আকবরীর ব্যবস্থামত বাদশাহী পোলাও চারি আনা খরচে প্রস্তুত করিত; কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে, সেকালের কৃষকেরও ভাগ্যে শাকান্ন ভিন্ন অন্য সামগ্রী জুটিত। সেকালে সাত কোটি টাকা ব্যয়ে তাজমহল নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না, সেকালে মজুররমণীরা মুক্তা পোড়াইয়া পান সাজিত। দেশের মধ্যে পলান্নভোজী কয় জন? আর শাকান্নভোজীই বা কয় জন? পলান্ন ভোজনের খরচটা এখন হয়ত বাড়িয়াছে, কিন্তু শাকান্ন-ভোজীর আরাম কমিয়াছে মনে করিবার কোন কারণ নাই।

তোমাদের দেশে যে এই ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ঘটিতেছে, তাহার জন্য অবাধ বাণিজ্যকে দায়ী করিও না। প্রত্যুত দুর্ভিক্ষের জন্য ভারতবর্ষের ল্যাটিচুড বা অক্ষাংশ যতটা দায়ী, আমরা ততটা দায়ী নহি। দুর্ভিক্ষ সেকালেও ছিল; হয়ত আরও বেশী বেশী ছিল। কিন্তু প্রজার দুঃখের কাহিনী তখনকার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিবার অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় সকলে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।

সে যাহা হউক, আমরা কিছু জোর করিয়া প্রজার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লই না। সে আপনার উদর পূরণের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই চোরের জন্য ও আগুনের জন্য না রাখিয়া আমাদিগকে ইচ্ছাসুখে বিক্রয় করে। স্বাধীন বাণিজ্য স্বাধীন ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন। কৃষকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগকে তাহাদের ভুক্তাবশেষ প্রদান করিয়া তাহার বিনিময়ে বিলাসসামগ্রী গ্রহণ করে। তাহাদের স্বেচ্ছাকৃত ঐ সকল বিলাসদ্রব্যই কি প্রমাণ করিতেছে না যে, তাহাদের অবস্থা দিন দিন ফিরিতেছে? তবে তাহারা যে যথোচিত উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না, সে নানা কারণে। তাহারা তোমাদেরই স্বজাতীয়, সুতরাং গণ্ডমূর্খ, অদূরদর্শী, যদ্ভবিষ্য, কুসংস্কারাপন্ন। তাহারা জাতি মানে, পেটে না খাইয়া মরিবে, অথচ বৃত্ত্যন্তর গ্রহণ করিবে না; ব্রাহ্মণের চতুরতায় ভুলিয়া তাহাকে যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিবে; বিধবা পিসী

মাসী সম্প্রদায়কে অকারণে খাইতে দিবে, অথচ তাহাদের বিবাহ দিয়া একটা গতি করিয়া দিবে না; স্বয়ং ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ করিবে, এবং তৎপূর্ব্বেই সন্তানোৎপাদন করিয়া ঐহিক পিণ্ডের যোগাড় না থাকিতেও পারত্রিক পিণ্ডলাভের জন্য লালায়িত হইবে। এই জাতি যদি দরিদ্র না হয়, তবে হইবে কে?

এই সকল যুক্তিবর্ষণের পর আমাদিগকে কাজেই নিরুত্তর হইতে হয়। বিশেষতঃ যখন যুক্তির অন্তরালে পিনাল কোডের একটা নূতন ধারা আকস্মিক আপতনের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। আমাদের পক্ষে নিরুত্তর হওয়াই শ্রেয়স্কর। কিন্তু মনের মধ্যে একটা খট্‌কা থাকিয়া যায়;—সবই ঠিক, কিন্তু তবু যেন কোথায় কি একটা গোল থাকিয়া গেল। বর্ত্তমান কালে আমাদের আয় বাড়িয়াছে সত্য কথা; আয়ের বিবিধ নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে সত্য কথা, কিন্তু আয়ের সঙ্গে কি ব্যয়ও বাড়ে নাই? এবং ব্যয়ের অঙ্ক যাহা বাড়িয়াছে, তাহা কি ঠিক আমাদের ইচ্ছাক্রমেই বাড়িয়াছে; এই ব্যয়বৃদ্ধি বিষয়ে কি আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে? এক একটা ছেলে মানুষ করিতেই এখন খরচ পড়ে কত? সেকালে ছেলেগুলা ভূমিষ্ঠ হইয়া 'উঙা উঙা' শব্দ করিত; একালের ছেলেগুলা ভূমি স্পর্শ করিবা মাত্র 'ডাক্তার আন, ডাক্তার আন' বলিয়া কাঁদিতে থাকে। ডাক্তার বাবু আসিয়া অনেককে ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিয়া ভবিষ্যতের খরচ কমাইয়া দেন, সুতরাং তাঁহার ভিজিটের টাকাটা নিতান্ত লোকসান মনে করা অন্যায়। কিন্তু দৈবাৎ যদি একটা ছেলে ডাক্তারকে ফাঁকি দিয়া পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল, অমনই তাহার স্কুলের খরচ যোগাইতে হইবে। ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় জ্যামিতি ও পরিমিতি ও ভূবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা ও ব্যাকরণ ও অর্থব্যবহার ও নীতিকথা ও তত্ত্বকথা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক শাস্ত্রগ্রন্থসকলের ভীষণ ভার দুর্ব্বল শিশুর কণ্ঠরোধ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মাইয়া জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া গৃহস্থের ভাবী ব্যয়ের সংক্ষেপ সাধনের আশা দেয় বটে; কিন্তু আপাততঃ ঐ সকল শাস্ত্রগ্রন্থের মূল্য যোগাইতে গৃহস্থের প্রাণ অস্থির হয়।

ছাত্রবৃত্তি পাস করিয়া চাষার ছেলে আর লাঙ্গল ধরিতে চাহে না, কিন্তু আদালতে পেয়াদাত্ব গ্রহণ করিয়া নানা কৌশলে অর্থোপার্জ্জনে ব্যুৎপত্তি লাভ করে, ইহা নিতান্ত মন্দ নহে। কিন্তু ভদ্র গৃহস্থের ছেলেকে ইংরাজী

পড়াইতে হয়। এনট্রান্স পাস করিলে দূরদেশে কলেজে পাঠাইতে হয়। সেখানে কলেজের বেতন ও পুস্তকাদির হিসাবে যে খরচ পড়ে, থিয়েটারের পয়সা যোগাইতে তার তিনগুণ পড়িয়া যায়। এত প্রয়াসের ফলে যাঁহারা উপাধিভূষিত হইয়া বাহির হয়েন, তাঁহাদের চাপরাশের ও সামলার মূল্যও সহজে আদায় হয় না। বিবাহ উপলক্ষ্যে কিঞ্চিৎ অর্থাগমের আশা থাকিলেও অন্ধ বিধাতা সকলকে কেবল পুত্ররত্নে সৌভাগ্যশালী করেন নাই।

এইরূপ সর্ব্বত্র। কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেরই ব্যয়ের অঙ্ক অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। বিলাতী সভ্যতা যেখানে যে পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে সেই পরিমাণেই ব্যয়বাহুল্য হইয়াছে। আমাদের আয় বাড়িয়া থাকিলেও সঙ্গে সঙ্গে যদি ব্যয়ও সেই অনুপাতে বাড়িয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের অবস্থার তেমন সুবিধা হইল কোথায়? অন্ততঃ আয় ব্যয়ের হিসাব করিতে গিয়া কোন্‌টা কত বাড়িয়াছে, তাহা না জানিলে আমাদের অবস্থা কিরূপ, তাহার নির্ণয় হইবে কিরূপে? সরকারী ও বেসরকারী উভয় পক্ষ কেবল আয়ের অঙ্ক বা কেবল ব্যয়ের অঙ্ক লইয়া আলোচনা করেন, উভয় দিক্ খতাইয়া দেখিলে এত দিন একটা মীমাংসা বোধ করি স্থির হইয়া যাইত। অথচ মীমাংসা এত কাল হইল না। ওয়েডারবর্ণ ও দাদাভাই নৌরজী ভারতবর্ষ দেউলিয়া হইল বলিয়া ক্রমাগত ষ্টেট্ সেক্রেটারীর কর্ণজ্বালার উৎপাদন করিতেছেন; ষ্টেট্ সেক্রেটারী ক্রমাগত জবাব পাঠাইতেছেন—আমরা তোমাদিগকে ক্রমেই উত্তর দিক্ পানের দরজার নিকট লইয়া যাইতেছি। আমাদের পক্ষে এরূপ স্থলে তূষ্ণীম্ভাবই বিধি।

যাঁহারা আমাদের ব্যয় বৃদ্ধি ও বিলাসিতা বৃদ্ধি দেখিয়া আমাদের অবস্থার সচ্ছলতা অনুমান করেন, তাঁহাদের সেই অনুমানের যাথার্থ্যে একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়। অবশ্য অবস্থা ভাল না হইলে বিলাসের দিকে, খরচের দিকে, অনাবশ্যক অপব্যয়ের দিকে মানুষের মন যায় না, ইহাই সাধারণ নিয়ম; এবং যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিলাসের উপকরণ আহরণ করে, তাহার অবস্থার সচ্ছলতা স্বভাবতঃই অনুমেয়। ইহা স্বভাবেরই নিয়ম; মানুষ কিছু পেটে না খাইয়া বাবুয়ানার ভড়ং করে না। কিন্তু এই স্বাভাবিক নিয়মের কি কোথাও ব্যভিচার নাই? বুদ্ধিদোষে, সঙ্গদোষে, কর্ম্মবিপাকে, প্রকৃতির তাড়নায় মনুষ্য কি কখনও এই স্বাভাবিক নিয়ম হইতে ভ্রষ্ট হয় না? কুবেরপুত্রও আপনার অস্বাভাবিক প্রকৃতির তাড়নায়

পৈতৃক ঐশ্বর্য্য নষ্ট করিয়া ভিক্ষাবৃত্তির অবলম্বনে বাধ্য হয়। ব্যক্তি পক্ষে যাহা ঘটিতে পারে, ব্যক্তিসমষ্টি বা সমাজ পক্ষে তা ঘটা কি একেবারে অসম্ভব? সমাজচক্র কি বর্ত্তমান কালে ঠিক স্বাভাবিক নিয়মেই চালিত হইতেছে? আমাদের সমাজে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন বাণিজ্য প্রভৃতি শ্রবণনিনাদী শব্দসমূহ কি ঠিক অভিধানপ্রচলিত অর্থেই ব্যবহৃত হয়? ইহা ভাবিবার বিষয় ও আলোচনার বিষয়।

আমরা বর্ত্তমান কালে যে সর্ব্বাঙ্গীণ শান্তি ও আরাম উপভোগ করিতেছি, সেই অবস্থা কি মনুষ্যসমাজের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে পারে? আমাদের প্রভু জাতি মহামহিম, মহৈশ্বর্য্যশালী, মহাজ্ঞান, মহানুভাব, মহাশয়। কিন্তু আমরা তাঁহাদের তুলনায় সর্ব্বাংশেই ক্ষুদ্র। এবং বৃহত্ত্বের সান্নিধ্য ক্ষুদ্রের স্বাভাবিক ক্ষুদ্রত্বকে কি আরও ক্ষুদ্র করিয়া দেয় না? আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া স্বাধীন চিন্তার অবকাশ পাইয়াছি বলিয়া ঘটা করিয়া বক্তৃতা করি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের সেই চিন্তা কি আমাদেরই চিন্তা? আমরা প্রাদেশিক শাসন কার্য্যে প্রভুশক্তি হইতে কতকটা ক্ষমতা লাভ করিয়াছি বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকি; কিন্তু গত দুই সপ্তাহ কালের কাউন্সিলগৃহের যাঁহারা সংবাদ রাখেন, তাঁহারা কি বলিতে পারেন যে, সেই শাসন কি প্রকৃতই আমাদেরই আয়ত্ত?

আমরা বিলাতের লোকের সহিত স্বাধীনভাবে বাণিজ্য চালাইয়া থাকি; কিন্তু সেই বাণিজ্য কি সর্ব্বতোভাবেই স্বাধীন?

আমি রাজনীতির সম্পর্ক একবারে বর্জ্জন করিয়া নিতান্ত একাডেমিক্ অর্থে জিজ্ঞাসা করিতেছি, প্রবলের সাহায্যে যে দুর্ব্বল মুগ্ধ, তাহার স্বাতন্ত্র্য কোথায়? সূর্য্যালোকের সন্নিধানে খদ্যোতের স্বাভাবিক দীপ্তি কত দূর পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়? মাতৃক্রোড়শায়ী স্তন্যপায়ী শিশুর কতকটা স্বাতন্ত্র্য আছে বটে, কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্যের দৌড় কতটুকু? আমাদের দয়াময়ী ঘটোঘ্নী গবর্ণমেণ্ট জননী আমাদিগকে যে স্তন্যপীযূষদানে অহরহ তৃপ্ত রাখিয়াছেন, এবং ঘুম-পাড়ানিয়া গান অবিরত কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিয়া আরামের পালঙ্কে আমাদের ঘুম পাড়াইতেছেন, আমাদের এই পীযূষপানের ও সুখনিদ্রার ও স্বপ্ন-দর্শনের স্বাতন্ত্র্যের দৌড় কতটুকু?

আমাদের অবস্থা কতকটা হট্‌হাউসের যত্নপালিত চারার মত। আমরা যথাসময়ে জল পাই, আলো পাই, শীতাতপ উপভোগ করি, আমাদের কীটের

ভয় নাই, শিশিরের ভয় নাই, বড় বড় মহীরুহ যখন প্রভঞ্জনের সহিত মল্লযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভূমিশায়ী হয়, আমরা তখন গ্লাসকেসের ভিতর হইতে তাহাদের অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া থাকি ; কিন্তু হায় ! দৈব বিধানে আমাদের প্রভুর যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ শিথিল হয়, যদি আমাদের মালী মহাশয় একদিন আমাদিগকে জল যোগাইতে ও সার যোগাইতে ভুলিয়া যান, তবে সংসারের নিষ্ঠুর জীবনদ্বন্দ্বে আমাদের ঔদ্ভিদিক জীবনের পরমায়ু কতটুকু হইয়া দাঁড়ায় ?

আমাদের এই হটহাউস-পালিত জীবনে স্বাভাবিকতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা আভিধানিক অর্থে নহে। অন্য সমাজে যে কারণে যে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, আমাদের সমাজে সে কারণে সে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস হইতে যে সকল সমাজতত্ত্বের সূত্র সঙ্কলন করিয়াছ, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহা প্রয়োগ করিতে যাইও না।

আমি বলিতে চাহি যে, এই অস্বাভাবিকতাই আমাদের সমাজশরীরের সকল ব্যাধির নিদান ; এখন ইহাই একমাত্র ব্যাধি ; অন্য সকলই তাহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বা উপসর্গ মাত্র। অন্যান্য দেশে সমাজজীবন স্বাভাবিক নিয়মে প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে ও বিকাশ লাভ করিয়াছে ; আমাদের দেশে সমাজ পরপ্রদত্ত অনুগ্রহের উপর ভর করিয়া জীবনরক্ষা করিতেছে। পরে না বলাইলে আমরা বলিতে চাই না, কাজেই আমাদের বলিবার শক্তি কতটুকু আছে, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আমাদের গায়ে কতটুকু বল আছে, তাহা আমরা জানি না। আপনার সম্বন্ধে এই শোচনীয় অনভিজ্ঞতা হইতে আমাদের অক্ষমতার উৎপত্তি। যে কাজ আমরা সম্পাদন করিতে পারিব, তাহাতে আমরা হাত দিতে সাহস করি না; তাহা এই অনভিজ্ঞতার ফলে। যে কাজ আমাদের অসাধ্য, আমরা তাহাতে হাত দিয়া নিষ্ফল হইয়া থাকি ও উপহাস্য হই, তাহাও এই অনভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন। আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী উচিতমত ফল উৎপাদন করিল না, ঠিক এই কারণে। আমাদের দেশে কোম্পানী খুলিয়া কারবার করিতে গেলে উদ্যম ব্যর্থ হয়, সেও এই কারণে। আমাদের ধর্ম্মসংস্কারের চেষ্টা, সমাজসংস্কারের চেষ্টা, সভা সমিতি মন্ত্রণা, সমস্তই বাক্য মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তাহারও মূল কারণ এইখানে মিলিবে। আমরা আপন কর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রভু নহি, আমাদের হৃদিস্থিত কোন হৃষীকেশ

আমাদিগকে যে পথে চালাইতেছেন, আমরা সেই পথে চলিতেছি। আমাদের সংসারযাত্রা প্রকৃতপক্ষেই রঙ্গমঞ্চে অভিনয়; অথবা বুদ্ধিজীবী জীবের সম্পাদিত অভিনয় নহে; পরহস্তধৃত সূত্রবিলম্বিত পুত্তলিকার অভিনয় মাত্র। আমরা কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন কাজ করি না, আমরা লোককে দেখাইতে চাই—আমরা কাজ করি। আমরা গবেষণার ও পাণ্ডিত্যের অভিনয় করি, সাহেবদের কাছে প্রশংসা লাভের জন্য; আমরা দেশহিতৈষিতার অভিনয় করি, বড় হইবার জন্য; আমরা বদান্যতার অভিনয় করি, উপাধি লাভের জন্য; আমরা সমাজসংস্কারের অভিনয় করি, আপনাকে জাহির করিবার জন্য; আমরা বিলাসিতার ও সাহেবিয়ানার অভিনয় করি, সভ্যতা ফলাইবার জন্য। জগৎ সংসার আমাদিগের অভিনয় দেখিয়া হাসে ও করতালি দেয়, আমরা মনে ভাবি, আমরা কেমন বীর। আমরা রঙ্গমঞ্চের বিল্বমঙ্গলের মত চীৎকার করিয়া প্রেমের আবেগের অভিনয় করি, এবং লোকের করতালিধ্বনি শুনিয়া মনে করি, প্রেমের বুঝি চীৎকারই স্বভাব। আমরা উদরান্নের সংস্থান না করিয়াও বিলাতী পণ্যদ্রব্যে ঘর সাজাই, বিলাতের বণিকেরা ভাবে, কেমন শিকার মিলিয়াছে। আমাদের বিলাসিতার বৃদ্ধি দেখিয়া আমাদের ধনবৃদ্ধি ঘটিয়াছে মনে করিও না; আমাদের শরীরে অভিনেতার চাকচিক্যময় পরিচ্ছদ দেখিয়া সেই পরিচ্ছদে আমাদের স্বামিত্ব কল্পনা করিও না।

বিলাতী পণ্যদ্রব্যের পরিবর্ত্তে আমাদের স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্যে আমরা কাজ চালাইব, মাঝে মাঝে এইরূপ একটা তরঙ্গ উঠে। কিন্তু সর্ব্বত্র যেরূপ, এখানেও আমাদের চেষ্টা সেইরূপ বাক্য মাত্রে পর্য্যবসিত হয়; বিলাতের মত কলের সাহায্যে অল্পমূল্যে শিল্পদ্রব্য ও বিলাসের দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, অথচ বিলাসের দ্রব্য ব্যবহারে যথেষ্ট সখ আছে। আমাদের বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকারী অস্বাভাবিক অবস্থায় এই সকল দ্রব্য নহিলেও একরকম চলে না; এরূপ অবস্থায় বাক্য ভিন্ন কার্য্যের সম্ভাবনাই বা কোথায়? যত দিন স্বদেশে বিলাসোপকরণ প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা না জন্মিতেছে, তত দিন এই বিলাসিতাকে একটু সংযত করিতে পারিলেই ভাল হয়। কিন্তু এইরূপ সংযমের উপদেশ দেওয়া যতটা সহজসাধ্য, উপদেশমতে কাজ করা ততটা সহজ নহে। মনুষ্যের অন্তরের মধ্যে আরামের দিকে, স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে, বিলাসের দিকে একটা স্বাভাবিক

টান আছে। বিশেষতঃ, মনুষ্যসমাজে যাহাকে সভ্যতা বলে, তাহার সহিত বিলাসপ্রিয়তার যেন একটা কিছু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সকল দেশেরই ইতিহাস একই রকম সাক্ষ্য দেয়। আমাদের এই ভারতবর্ষেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যের সময় যখন সংসারে আসুরক্তির প্রতি ও বিষয়স্পৃহার প্রতি ঘোরতর সংগ্রাম চলিয়াছিল, ভগবান্ বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ যখন সমস্ত জগৎ-সংসারকে শূন্য পদার্থে পরিণত করিয়াছিলেন, এবং সেই শূন্যের প্রতি অনুরাগকে অজ্ঞানের ও মূঢ়তার পরাকাষ্ঠা বলিয়া প্রচার কবিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ই তদানীন্তন সমাজে বিলাসের স্রোতেও যেন জোয়ারের বান ডাকিয়াছিল। তদানীন্তন প্রাচীন কাব্য ও প্রাচীন স্থাপত্য যাহা এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে, তাহাই তাহার প্রধান সাক্ষী। মনুষ্যের এই স্বাভাবিক বিলাসপ্রিয়তার ও আরামপ্রিয়তার সহিত সংগ্রাম বোধ করি, নিরর্থক শ্রম। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান কালের বিলাসপ্রিয়তার যে অংশ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণচেষ্টা হইতে উৎপন্ন, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক; স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন বিলাসপ্রিয়তার দমনের জন্য স্বভাবনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মাত্রেরই একটা সীমা আছে; যখন শারীরিক অবসাদ উপস্থিত হয়, তখন আকাঙ্ক্ষারও তৃপ্তি হয়; কিন্তু যে প্রবৃত্তির মূল অস্বাভাবিক, তাহা শরীরের অবসাদ ও ইন্দ্রিয়ের গ্লানি সত্ত্বেও বিবিধ অস্বাভাবিক ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া আগুনের মত ক্রমে ক্রমে জ্বলিয়া যায়। একটা অন্ধ অনুকরণপ্রবৃত্তি বা ফ্যাশান হইতে যাহার উদ্ভব, তাহার তৃপ্তি সহজে ঘটে না। আমাদের বিলাসিতা ও সাহেবিয়ানা অস্বাভাবিক; কেন না, ইহা আমাদের মত দরিদ্রের আর্থিক অবস্থার অনুরূপ নহে; এই সাহেবিয়ানা আমাদের পক্ষে শোভন হয় না; পরের নিকট ধার করিয়া যে জিনিস লওয়া যায়, তাহার উপর স্বত্ব স্বামিত্ব ও অধিকার অত্যন্ত শিথিল থাকে। পরের পোষাক শরীরে কোন মতেই মানায় না, প্রত্যুত অনেক সময় সংএর মত দেখায়। আবাব আমাদের এই যে অন্ধ ফ্যাশানের অনুবৃত্তি, এই পরানুকরণচেষ্টা, ইহাকেও ঠিক স্বাধীন ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন বলিতে পারি না; কেন না, এখন আমাদের অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, ইচ্ছা না থাকিলেও ও সামর্থ্য না থাকিলেও লোক দেখাইবার জন্য ও পরকে দেখাইবার জন্য পরের খাতিরে আমাদিগকে সাহেব সাজিতে হয় ও সভ্যতা ফলাইতে হয়।

স্বভাবতঃ যে দরিদ্র, তাহার পক্ষে ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর অস্বাভাবিক। স্বভাবতঃ যে ছোট, তাহার পক্ষে ছোট হইয়া থাকাই স্বাভাবিক। ক্ষুদ্র যদি অস্বাভাবিক বলপ্রয়োগ করিয়া বড় হইবার চেষ্টা করে, তাহার সেই অস্বাভাবিক প্রয়াসের পরিণাম কল্যাণপ্রদ হয় না। আমরা হুঙ্কার ও কলরবের সহিত বড় বড় কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হই, আর কাজ সফল হইল না দেখিয়া নৈরাশ্যের আক্ষেপ করিতে থাকি। আমরা বামন হইয়া চাঁদের আশায় হাত বাড়াই ও চাঁদ ধরা পড়িল না দেখিয়া শেষে চাঁদের নিন্দা করি। মানবশিশু হামাগুড়ি অভ্যাস করিয়া পরে চলিতে শিখে, আমরা বড় মানুষকে চলিতে দেখিয়া একবারে পদক্ষেপের জন্য দণ্ডায়মান হই; হামাগুড়ির অভ্যাস দরকার বোধ করি না। আমাদের যে সকল পৈতৃক স্বকীয় সম্পত্তি আছে, যাহা আমাদের পূর্ব্বপিতামহেরা পরম যত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এখন পুরাতন, জীর্ণ ও মলিন, সেই জন্য সেই সকল সামগ্রীতে আমাদের মন বসে না; তাহাদের মালিন্য দূর করিতে, মরিচা সাফ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না; আমরা চাকৃচিক্যযুক্ত পরের দ্রব্য দেখিবা মাত্র মুগ্ধনেত্রে তাহার প্রতি চাহিতে থাকি এবং একটু অবসর পাইলেই তাহা আত্মসাৎ ও সিন্দুকবদ্ধ করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু আমরা মনে ভাবি না যে, পরের দ্রব্যের প্রতি এরূপ অনুরাগ নীতিশাস্ত্রসম্মত নহে ও ইহার ফলে সেই দ্রব্যে আমাদের স্বামিত্ব কখনও স্বীকৃত হয় না, পরন্তু ধরা পড়িলেই কর্ণমর্দ্দন লাভ ঘটে। কিন্তু চিরকাল মর্দ্দন লাভ করিয়া আমাদের কর্ণ দুইটাও যার-পর-নাই সহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের মূল ব্যাধির একটা উৎকট উপসর্গ সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা শক্তির অভাবে, অনুরাগের অভাবে, শ্রদ্ধার অভাবে, বুদ্ধির অভাবে, অভিজ্ঞতার অভাবে সকল কাজেই হাত দিয়া বিফলপ্রযত্ন হই ও অবশেষে পরস্পরকে গালি দিতে আরম্ভ করি। এই জাতিকে গালি দেওয়া একালের লোকের একটা দারুণ ব্যাধি হইয়া পড়িয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই ভাবি, আমি বড় বীর, কেবল আমার সঙ্গীদিগের কাপুরুষতাতেই লড়াইটা ফতে হইল না। একটা সুবিধা বা অবসর পাইবা মাত্র আমরা প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া বা খবরের কাগজে লিখিয়া আমাদের স্বজাতিকে গালি দিতে থাকি। যিনি ধর্ম্মসংস্কারক, তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন, আমি বড় ধার্ম্মিক, আর তোমরা সকলে পাপপঙ্কে ডুবিয়া রহিয়াছ, ইহাতে ভারত-উদ্ধার হইবে কিসে? যিনি

সমাজসংস্কারক, তিনি তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন, আমি বড় সাহসী; আমি এই মাত্র আমার বৃদ্ধ পিতামহের পৈতা ছিঁড়িয়া দিয়া আসিয়াছি, এবং বৃদ্ধা পিতামহীর পাকা চুলে কলপ মাখাইয়া আসিতেছি, কেবল তোমাদেরই সৎসাহসের অভাবে ও কাপুরুষতায় আমরা সভ্যজগতে মুখ দেখাইতে পারিতেছি না। যাঁহার রাজদ্বারে কেরাণীগিরির দরখাস্ত গৃহীত হয় নাই, তিনি সংবাদপত্রে ঘোষণা করিতেছেন, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যত দিন কেবল চাকরীর জন্য ব্যস্ত থাকিবেন, তত দিন ভারতের কোন আশা নাই। যিনি বড় সাহেবের কানমলা খাইয়া অক্লেশে হজম করিয়াছেন, তিনি হুঙ্কার ছাড়িতেছেন, যত দিন তোমরা স্বদেশের জন্য ও স্বজাতির জন্য ধন প্রাণ সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে না পারিবে, তত দিন তোমাদের মনুষ্যজন্ম অজাগলস্তনের ন্যায় নিরর্থক থাকিবে। যিনি আবার সমাজমধ্যে সুনীতির অভাব দর্শনে ব্যথিতপ্রাণ, তিনি সকলের উপর গলা তুলিয়া বলিতেছেন, তোমরা চরিত্র উন্নত কর, চরিত্রবল ব্যতিরেকে তোমাদের সকল চেষ্টাই পণ্ড হইবে।

এই দৃশ্য নিতান্ত মন্দ নয়। পরকে গালি দিলে নানা বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। এখনি পীনাল কোডের নূতন ধারা আসিয়া সবেগে আপতিত হইতে পারে। বিলাতী বুট সকল সময়ে পীনাল কোডের দীর্ঘসূত্রিতা পছন্দ না করিয়া অন্যরূপ সরাসরি বিচারের ব্যবস্থা করে। এরূপ ক্ষেত্রে স্বজাতিকে গালি দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপৎ। বিশেষতঃ পরের নিকট বাহবা পাইবারও ইহাতে অনেকটা সম্ভাবনা আছে। গালাগালি পর্ব্বের অভিনয়ের মত দর্শক হাসাইবার উপায় আর নাই; এবং আমরা সংসারের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া পরস্পরের প্রতি মুখ খিঁচাইয়া পরস্পরকে গালি দিয়া যে বিকট অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে বিশ্বজগতের দর্শকবৃন্দের মধ্যে উৎকট হাস্যরসের অবতারণার সহিত যথেষ্ট করতালি লাভ হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি?

শাস্ত্রে বলে, গৃহছিদ্র প্রকাশ করিতে নাই; কিন্তু আমরা আমাদের পুরাতন ঘরের চালে ও প্রাচীরে যেখানে যতগুলা ছিদ্র আছে, তাহার প্রত্যেককে লক্ষ্য করিয়া এক একটা দূরবীন লাগাইয়া যত অনাত্মীয় অপরিচিত লোককে আমোদ দেখাইতেছি ও মনে করিতেছি, আমরা কেমন সত্যনিষ্ঠ, আমরা কেমন উদার। আমি পরকে দেখাইতে চাই, আমি কত

ভাল, আমি কত উদার, আমি কত সভ্য ; আর আমার সমস্ত আত্মীয় অনুচর প্রতিবেশী আমা হইতে কত নীচ, কত হেয়, কত অসভ্য। এইরূপ উদারতার নামান্তর আত্মদ্রোহ ও সমাজদ্রোহ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

এই গালাগালি পর্ব্বের অভিনয়টা আমাদের সমাজে এখন সমারোহের সহিত চলিয়াছে।

আমাদের ধনিসন্তানেরা বড়সাহেবদের চরণের জন্য তৈলনিষ্পীড়নার্থ সবেগে ঘানি চালাইতেছেন, আমরা গম্ভীরভাবে তাঁহাদিগকে গালি দিয়া থাকি। আমাদের সংস্কারকেরা সভ্যতা ফলাইবার জন্য সমাজের যেখানে যাহা ক্ষত আছে, তাহা পরের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকেও গালি দিয়া থাকি। আমাদের ধর্ম্মধ্বজীরা আপন আপন ধ্বজার নীচে দাঁড়াইয়া প্রতিবেশীকে পরকালের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে আপনার ইহকালের বন্দোবস্ত পাকা করিয়া লইতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকেও গালি দিয়া থাকি। আমাদের অধ্যাপক গোখলে মহাশয় বিধিবিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত হইয়া রাজার নিকট বিনীতভাবে ক্ষমাভিক্ষা করিলেন, আমরা তাঁহাকেও কাপুরুষতার জন্য ধিক্কার দিলাম, আমরা প্রত্যেকেই এক একটা বালগঙ্গাধর তিলক। অথচ আমাদের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কার্য্যই অস্বাভাবিক মূলে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া নিষ্ফল হইয়া থাকে ও যাঁহারা গালি দেন, তাঁহাদেরও নৈতিক সাহস ও চরিত্রবল ও পুরুষকার যে সমধিক উন্নত, তাহার কোন প্রমাণ এ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। ইহা অপেক্ষা অস্বাভাবিক হাস্যকর দৃশ্য আর কি আছে ?

আমার অনুগ্রাহক শ্রোতৃবর্গ হয়ত এত ক্ষণ মনে মনে হাসিতেছেন ও বলিতেছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধপাঠকও উপদেশের ছলে বেশ এক চোট গালি দিয়া লইলেন। প্রবন্ধপাঠকও দুনিয়ার বাহির হইতে চাহেন না, এবং বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালী জাতির এক মাত্র কার্য্য বাদ দিলে প্রবন্ধের জন্য বিষয় পাওয়াই দুর্ঘট হইয়া উঠে। যদি অদ্যকার এই প্রহসনের অভিনয়ের পর-মুহূর্ত্তেই আমাদের জাতীয় জীবনের এই অঙ্কে যবনিকাপতন হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে নিতান্ত সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিব। আমরা দুর্ব্বল, সুতরাং বিশ্বজগতের সকলেরই আমাদিগকে গালি দিবার সম্পূর্ণ অধিকার

রহিয়াছে, এবং তাঁহারা সেই অধিকারের সদ্ব্যবহারেও ত্রুটি করেন বলিয়া বোধ হয় না। মেকলের মত মকর তিমিঙ্গিল হইতে ডেলী মেলের ষ্টীভেন্সের মত ফরফরায়মান শফরী পর্য্যন্ত সকলেই সেই অধিকারের সম্যক্ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। যখন বসুধাব্যাপী কুটুম্বসমাজ সকলেই আমাদিগকে গালি দিতেছেন, তখন দিন কতক আপনাকে আপনি গালি না দিলেও শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতৃপ্ত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন, নিজের দোষ নিজে না দেখিলে চরিত্রশোধনের উপায় থাকে না; কথাটা সত্য কথা; কিন্তু কেবলই দোষের আলোচনায় কেবল আত্মগ্লানির অবতারণা করে। প্রতিনিয়ত আপনার ক্ষুদ্রত্বের আলোচনা করিলে ক্ষুদ্রত্বই ক্রমে জীর্ণতর হইতে থাকে; কেবলই আপনার দৌর্ব্বল্যের বিষয় ভাবিলে স্নায়ুযন্ত্র আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সংসারে বাহুবলে যাহা সম্পন্ন হয় না, তাহা মনের বলে অনেক সময় সম্পন্ন হইয়া যায়। মানসিক বল দুর্ব্বল বাহুতে অনেক সময়ে দৈত্যের শক্তি আনিয়া দেয়। ইংরাজীতে যাহাকে বলে confidence, আপনার শক্তিতে অতিবিশ্বাস, তাহা সাংসারিক উন্নতির পক্ষে অনেক সময় অনুকূল হয়। এই বৃহৎ জগতের মধ্যে ক্ষুদ্রের ও দুর্ব্বলের ও দরিদ্রের স্থান যে একবারে নাই, এমন নহে। আমাদের দৌর্ব্বল্য ও ক্ষুদ্রত্ব লইয়া যদি আমরা প্রবলের দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি করিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের অবমাননা অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দারিদ্র্য লইয়া যদি ঐশ্বর্য্যশালীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া চাটুকারবৃত্তি অবলম্বন করিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের মনুষ্যত্বের অবমাননা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যদি ঐশ্বর্য্য হইতে ও বৃহত্ত্ব হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিয়া আমাদের ভগ্ন কুটীরমধ্যে আমাদের পুরাতন জীর্ণ গৃহসজ্জাগুলির মধ্যে যাহা আমাদের নিজস্ব, অথবা যাঁহাদের শোণিত আমাদের ধমনীমধ্যে বহিতেছে—উঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত, পরের নিকট ভিক্ষালব্ধ বা ঋণলব্ধ নহে, তাহারই মধ্যে আমরা স্থির হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের মনুষ্যত্বের গৌরব কি কিছু বাড়িবে না? ভগ্ন কুটীর কি অট্টালিকার প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিনিক্ষেপে সাহসী হইবে না? আমাদের সমাজশরীরে কি ধনসঞ্চয় ঘটিবে না? প্রকৃতি ও কাল কি চিরদিনই আমাদের প্রতিকূল থাকিবে?

অদ্যকার এই ধরাপৃষ্ঠে যে সকল জাতি জ্ঞানের ও গৌরবের ও মাহাত্ম্যের ধ্বজা ধরিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আমাদের স্থান

নাই। জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের, শক্তির সহিত শক্তির, ঐশ্বর্য্যের সহিত ঐশ্বর্য্যের, জাতির সহিত জাতির ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল আপূরিত হইতেছে, আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠ সেই কোলাহলের তীব্রতাবর্দ্ধনে অধিকারী নহে। কিন্তু আমরা যদি সেই উচ্চ কোলাহল, উৎকট উদ্যম ও অমানুষিক চেষ্টা দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া কেবল মুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া থাকি, এবং আত্মগ্লানি ও আত্মাবমাননার অভ্যাস দ্বারা আপনাদিগকে জড় পদার্থে পরিণত করি, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ বড় ভয়াবহ। পরন্তু যদি আমরা আমাদের প্রাচীন পুরাতন সভ্যতার ও মাহাত্ম্যের ভগ্নাবশেষের অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া সার্ব্বভৌমিকত্বের অসার উপহাস্য আস্ফালন ত্যাগ করিয়া আমাদের সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বিজনে লোকনয়নের অসাক্ষাতে আমাদের কালানুরূপ ও দেশানুরূপ ও অবস্থানুরূপ সাধনা অভ্যাস করিয়া ধনসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে ভবিষ্যতের ইতিহাস অন্যরূপ আকার ধরিতেও পারে।

আমার এই সুদীর্ঘ প্রস্তাবের উপসংহারের পূর্ব্বে আমার এত ক্ষণের স্বজাতিনিন্দারূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যদি একবার স্বজাতির গৌরব-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে শ্রোতৃবর্গ আমাকে উপহাস করিবেন না। আমাদের কলকারখানা নাই, আমরা জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানি চালাইতে পারি না, আমাদের দেশলাইয়ের কারখানা চলিল না, আমাদের প্রবিন্‌শিয়াল রেলওয়ের শকটশ্রেণী অতি মন্থর গতিতে চলিতেছে, এই মনে করিয়া হা-হুতাশ করিয়া বিশেষ কোন লাভ নাই। আমাদের বর্ত্তমান অস্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের উদ্যমের নিষ্ফলতাই স্বাভাবিক। স্বতন্ত্র জাতি যাহা দশ বৎসরে শিখিয়াছে, আমাদের মত পরতন্ত্র জাতিকে তাহা শত বৎসরে শিখিতে হইবে, পুনঃ পুনঃ ঠেকিয়া শিখিতে হইবে; এবং এই অবস্থাতেও আমরা যে অকর্ম্মণ্য হেয় জীব নহি, তাহাও নানা স্থানে সপ্রমাণ হইয়াছে। বর্ত্তমান কালকে যাঁহারা জাতীয় জীবনের নবাভ্যুদয়ের কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আমি কখনই তাঁহাদের মতের অনুমোদন করিতে পারি নাই; শত শত বৎসরের অন্ধকারের পর যাঁহারা নূতন জ্যোতির আবির্ভাব দেখেন, তাঁহাদের নেত্রদ্বয়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। আমি বর্ত্তমান কাল ও বর্ত্তমান কালের অব্যবহিত পূর্ব্বের মুসলমানি কালকে জাতীয় জীবনের অপরাহ্ণ মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিব।

তবে এই অপরাহ্ণের পরে সন্ধ্যা আসিবে কি না, তাহা বলিতে আমি সমর্থ নহি। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের মানসিক প্রতিভাবলে আমাদের সমাজতন্ত্র এরূপে গঠিত ও পরিচালিত হইয়াছে যে, বৌদ্ধ চার্ব্বাক নানকপন্থী কবীরপন্থী চৈতন্যপন্থী প্রভৃতি অন্তঃশত্রু ও শক পহ্লব হূন যবনাদি বহিঃশত্রুর পুনঃ পুনঃ আক্রমণেও উহা অদ্যাপি ভাঙ্গিয়া যায় নাই; পরন্তু যখন যে নূতন জাতির সহিত উহাকে দ্বন্দ্ব করিতে হইয়াছে, সেই দ্বন্দ্বের ফলেই আপনি নূতন শক্তির সঞ্চয় করিয়া নূতন বলে আপনাকে জীবিত রাখিয়াছে। সেই জন্য এই বর্ত্তমান অবস্থাতেও আমাদিগের গৌরব করিবার আছে। বর্ত্তমান কালে আমাদের মধ্যে সেক্‌সপীয়ার জন্মেন নাই, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র জন্মিয়াছেন; অর্দ্ধ শত বৎসর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার প্রভাবে মাইকেল ফ্যারাডে জন্মেন নাই, কিন্তু আমরা জগদীশচন্দ্রকে পাইয়াছি। বিজ্ঞানপ্রধান উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম কালে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সমাজের অগ্রণীগণ জড় পদার্থের ও আকাশের সম্বন্ধ নির্ণয়ার্থ যে মহতী চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন, আমাদের এই পতিত সমাজের অন্তর্ভুক্ত আমাদেরই পরিচিত কোন পরমাত্মীয় ব্যক্তি উদাসীন স্বদেশীয়গণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে বৈদেশিকগণের সন্দেহাকুল নয়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সহস্র বিঘ্ন সত্ত্বেও পদার্থবিজ্ঞানের সেই মহাতথ্যের অনুসন্ধানে সাহায্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিবৃত্তে শ্লাঘার ঘটনা বলিয়া বিবেচনা করি।

বর্ত্তমান কালেও যদি গৌরবের কথা না পাওয়া যায়, আমরা আমাদিগের অতীত ইতিহাসে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব। অতীতের নাম উল্লেখ করিবা মাত্র এক সম্প্রদায়ের লোক আমার প্রতি ভীতিবিহ্বল নেত্রে স্থাপিত করিবেন। তাঁহারা ভাবিবেন,—হয়ত আমি আমার স্বদেশীয়গণকে ভবিষ্যতের মুখে অগ্রবর্ত্তী হইতে নিষেধ করিয়া অতীতের মুখে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে আহ্বান করিব। তাঁহাদের আগে চলা বন্ধ করিতে বলিয়া পাছু হঠিতে উপদেশ দিব। কিন্তু প্রথমেই বলিয়া রাখি, তাঁহাদের এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। সমাজ-ঘড়ীর কাঁটাকে ফিরাইয়া দিবার আমার আদৌ প্রবৃত্তি নাই। কলি যুগের এই ভয়াবহ প্রকোপের সময় আবার যে অশ্বমেধ ও সোমযাগের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে, এরূপ আমার ভরসা নাই। আবার যে মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতের অনুশাসনমতে আমাদের সমাজযন্ত্র সর্ব্বদা চালিত হইবে, এরূপ আমার আশা নাই। বালকেরা স্কুলে এডমিশনের সময় যে আবার মুণ্ডিতশিরা হইয়া

অজিন কাষায় ধরিয়া স্কুলগৃহে প্রবেশ করিবে, তাহার আমি ভরসা করি না। নূতন গ্রাজুয়েট যে তাহার গাউন হুড্ পরিত্যাগ করিয়া গোলদিঘীতে স্নানের পর সমাবর্ত্তন করিবে, তাহারও আমি আশা করি না। কিন্তু যে প্রাচীন সমাজ মানবসভ্যতার প্রত্যূষকাল হইতে সংসারের জীবনদ্বন্দ্বে সহস্র আঘাত সহস্র নিষ্ঠুর আক্রমণ সহ্য করিয়াও আজ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই প্রাচীন সমাজকে আমি নমস্কার করি। যে পুরাতন ধর্ম্মমার্গ এই পুরাতন সমাজকে বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাকে আমি অকপটভাবে ভক্তি করি। যে পুরাতনী বাণী পুরাণ কবি বিশ্ববিধাতার চতুর্ম্মুখ হইতে সমীরিত হইয়া প্রজাপতিপরম্পরায় ও ঋষি-পরম্পরায় ও শাস্ত্রকারপরম্পরায় ও অধ্যাপকপরম্পরায় বিবিধ ছন্দে, বিবিধ ঝঙ্কারে ধ্বনিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত বিশ্বজগতে প্রতিধ্বনি উৎপাদন করিতেছে, সেই চতুষ্টয়ী বাণীর সম্মুখে আমি ভক্তিসহকারে প্রণত হই।

যদি আমাদের সামাজিক ব্যাধির কোন ফলপ্রদ চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়, তাহা এই আত্মসমাজের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা ও অবিচলিত ভক্তি। যদি অকৃত্রিম স্বদেশহিতৈষা ও স্বজাতিপ্রিয়তা আমাদের মধ্যে কখনও উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেই আমাদের অবস্থার অস্বাভাবিকতা দূর হইবে, আমাদের সামাজিক ব্যাধির প্রতীকার হইবে। যদি আমরা কখনও রঙ্গমঞ্চের অস্বাভাবিক প্রহসনের অভিনয় ত্যাগ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যোচিত কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে চাই, আমাদের এই প্রাচীন সমাজের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা হইতেই সেই ক্ষমতা উৎপন্ন হইবে। যাঁহারা এই পুরাতন সমাজের সহিত সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া বিদেশ হইতে আনীত বা চৌর্য্যলব্ধ উপকরণ দ্বারা নূতন সমাজ গড়িতে চাহেন, তাঁহারা মূলচ্ছেদনের পর শাখা হইতে ফলপ্রাপ্তির কামনা করেন। যাঁহারা এই পুরাতন সমাজকে অদ্য হীনবল ও অধঃপতিত ও শাসনবিষয়ে অসমর্থ দেখিয়া ইহার প্রতি নির্ম্মম বিদ্রূপবাণীর প্রয়োগ করেন, তাঁহাদের কাপুরুষত্ব অবজ্ঞেয়।

কিন্তু বলিতে দুঃখ হয়, আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী আমাদের সমাজের প্রতি এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধার উৎপাদনে সমর্থ হয় নাই। আমরা বিজাতীয় সমাজের সম্বন্ধে যে সংবাদ রাখি, আমাদের আত্মসমাজের সম্বন্ধে সে সংবাদ রাখা আবশ্যক বোধ করি না। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ফলে কবি জন্মিয়াছেন, ঔপন্যাসিক জন্মিয়াছেন, বাগ্মী জন্মিয়াছেন, রাজনীতিকুশল ব্যক্তি জন্মিয়াছেন,

গণিতবিৎ ও বৈজ্ঞানিক পর্য্যন্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাকালের ও বর্ত্তমান কালের সমাজতত্ত্বের শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করেন, শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে এরূপ উদাহরণ নিতান্তই বিরল। ভারতবর্ষের বিবিধ-ধর্ম্মী, বিবিধকর্ম্মী ত্রিশ কোটি মনুষ্যের ভাষাতত্ত্ব, আচারতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা অদ্যাপি বৈদেশিকের হস্তে রহিয়াছে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বৈদেশিক সমাজের ইতিবৃত্ত ও সমাজতত্ত্বের আলোচনা করেন, তাঁহারা স্বদেশের ইতিবৃত্ত ও সমাজতত্ত্বের আলোচনায় সম্পূর্ণ উদাসীন। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের ও সমাজতত্ত্বের কথায় তাঁহারা হয়ত সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখান, অথবা অবজ্ঞার ও অশ্রদ্ধার হাসি হাসিয়া থাকেন। আমাদের প্রাচীন বা বর্ত্তমান সমাজের প্রতি যাঁহাদের ভক্তি নাই বা অনুরাগ নাই, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলাম। যাঁহারা হিন্দুয়ানির নবোত্থিত ধ্বজার নিম্নে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনাদিগকে প্রাচীন সমাজতন্ত্রের ও সনাতন ধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেও এই ঔদাসীন্য ও এই অবজ্ঞা দেখিয়া ব্যথিত হইতে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের আলোচনা করিয়া যে সকল তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন, তাহার যাথার্থ্যে তাঁহাদের শ্রদ্ধা না থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহারাও ত প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণের জন্য শ্রম স্বীকার করেন না, এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে সকল ভ্রমসঙ্কুল মিথ্যাবাদের প্রচার করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস আছে, সেই সকল মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদনের জন্য যে পরিশ্রম, যে গবেষণা, যে অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাও স্বীকার করেন না। এই ঔদাসীন্যে, এই অনুরাগের অভাবে তাঁহাদের সমাজভক্তির অকৃত্রিমতায় সন্দেহ থাকিয়া যায়। আমার বোধ হয়, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীই তাঁহাদের এই ঔদাসীন্যের জন্য ও অবজ্ঞার জন্য দায়ী। যে প্রণালী জাতীয় ভাবের ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে, তাহাতে প্রকৃত স্বজাতি-অনুরাগ ও স্বদেশ-অনুরাগ আনিতে পারে না, কেবল স্বজাতির প্রতিও একটা কৃত্রিম অন্তঃসারশূন্য মৌখিক আসক্তির ছদ্ম ভাব উৎপাদন করে মাত্র।

আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বে শিখিবার কথা আছেই বা কি যে, সে দিকে সময় নষ্ট করিব ? গোটাকতক শিলালিপি ও খানকতক তাম্রশাসন ও কয়েকখানা প্রক্ষিপ্তোক্তিপূর্ণ কীটদষ্ট গ্রন্থ মাত্র যে পুরাতত্ত্বের অবলম্বন, তাহার

সমালোচনায় ফল কি? গ্রীসের ইতিহাস আছে, রোমের ইতিহাস আছে, রোম সাম্রাজ্যের বিশাল কলেবর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যে সকল খণ্ড রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই ধারাবাহিক প্রামাণিক ইতিহাস আছে। সেই সকল ইতিহাস হইতে মনুষ্য জাতির বিবিধ অবস্থাবিপর্য্যয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চে যে মহানাটকের অভিনয় ম্যারাথনের দিন হইতে ওমতুরমানের দিন পর্য্যন্ত অভিনীত হইতেছে, তাহার প্রত্যেক দৃশ্য, প্রত্যেক অঙ্ক, প্রত্যেক অভিনেতার নাট্যপ্রণালী উজ্জ্বলালোকে দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয়। ভারত-সমাজের সেরূপ ইতিহাস কোথায়?

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু যুক্তিটা সম্পূর্ণ অসার। ভারতের ইতিহাস নাই বলিয়া কি সেই ইতিহাসের উদ্ধারে আমরা প্রযত্ন করিব না? শিলালিপি ও তাম্রশাসন ও কীটদষ্ট গ্রন্থ যে কয়েকখানা আছে, তাহা সকলই কি বৈদেশিকের কর্ত্তৃক পঠিত হইয়া, বৈদেশিকের কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়া ভারত-সমাজের বিকৃত ইতিহাসের সৃষ্টি করিবে? যে দেশের প্রাচীন ইতিহাস দেশীয়গণের ভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হয় না, সে দেশের সামাজিকগণের মধ্যে প্রকৃত স্বজাতিবাৎসল্য জন্মিতে পারে না। সভ্যতাগর্ব্বিত ইংরাজরাও আপনাদের উনবিংশ শতাব্দীর উন্নতির ও ঐশ্বর্য্যের ও পরাক্রমের অঙ্কুর সার্দ্ধ সহস্র বৎসর পূর্ব্বের জার্ম্মান জলদস্যু ও বনদস্যুদের সমাজমধ্যে বিকশিত দেখিয়া কতই গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করেন, আর আমাদের এই পুরাতন সভ্যতার স্রোত মানবেতিহাসের অজ্ঞাত কোন্ পুরাকাল হইতে সিন্ধুতটবাসী হিন্দু সমাজ হইতে, কাস্পীয়তটবাসী আর্য্য সমাজ হইতে বা কোন্ অজ্ঞাত মহাসিন্ধু-তটবাসী কোন্ অজ্ঞাত সমাজ হইতে আজ পর্য্যন্ত একই ধারায় কখনও খরস্রোতে কখনও মন্দপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, তাহার আলোচনা কি অনুরাগ ও প্রীতির উৎপাদনে অসমর্থ?

ভাবের উদ্দীপনা মনুষ্যকে সকল সময়ে ঠিক পথে লইয়া যায় না, কিন্তু মনুষ্যজীবন ভাব কর্ত্তৃকই মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়। ইংরাজীতে যাহাকে feeling ও emotion বলে, সেই অর্থে ভাব শব্দ প্রয়োগ করিতেছি। জ্ঞান অবকাশ-মত ভাবকে সংযত করে, সংহত করে, গঠন প্রদান করে, সংশোধিত করে, প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যজীবন ভাব কর্ত্তৃকই পরিচালিত হয় ও নিয়ন্ত্রিত হয়। জ্ঞান চেষ্টার প্রসূতি নহে, ভাবই চেষ্টার প্রসূতি; চেষ্টা হইতে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, যে কর্ম্মসমষ্টি লইয়া মনুষ্যের জীবন। শুধু মনুষ্যের ব্যক্তিগত জীবন কেন,

সমাজের জীবনও মুখ্যতঃ ভাব কর্ত্তৃকই নিয়মিত হইয়া থাকে। সমাজের ইতিহাস মুখ্যতঃ ভাবের ইতিহাস, অথবা ভাব কর্ত্তৃক প্রণোদিত ও পরিচালিত কর্ম্মের ইতিহাস। সমাজের জ্ঞানিসম্প্রদায় কখনও বা উদ্দামগতি ভাবের বেগবত্তা কমাইয়া দেন, কখনও ভাবের স্রোতে ভাঁটা পড়িলে তাহার বেগবত্তা বাড়াইয়া দেন, ভাবের স্রোতকে অবসরমত ও ক্ষমতামত নূতন খাতে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করেন ; কিন্তু ভাব যখন প্রবাহিত হইতে থাকে, তখনই ভাবের স্রোতে মনুষ্যসমাজ চলে ; কখনও বা মন্দবেগে চলে ; কখনও বা খরস্রোতে বাঁধ ভাঙ্গিয়া কূল ছাপাইয়া ধুইয়া ভাসাইয়া চলিতে থাকে। উদাহরণ, ইউরোপে খ্রীষ্টানি প্রচার, chivalryর অভ্যুদয়, renaissance ও reformation ও ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব। ভাবের প্রবাহ সময়ে সময়ে এইরূপ খরস্রোতে চলিতে থাকে, তখন সমাজের নূতন জীবন লাভ হয়, সমাজ তখন নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করে, যাহাকে এত দিন মৃতকল্প বলিয়া বোধ হইত, সে এখন জীবনের স্রোতে তরঙ্গ উঠাইয়া কলকল নাদে ছুটিতে থাকে। সমাজের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, সমাজের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ পদবীতে সমাসীন, সমাজের যাঁহারা নেতা, তাঁহারা এই ভাবের স্রোতের সৃষ্টি করিয়া দেন, আবার সমগ্র সমাজ, যাহা এত দিন জড়ভাব, নিশ্চেষ্ট ভাব অবলম্বন করিয়াছিল, সমগ্র সমাজ যখন সেই দুর্দ্দম প্রবাহে নীয়মান হয়, জ্ঞানিগণ ও নেতৃগণও তখন সেই স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলেন।

আমাদের জাতীয় জীবনের যে স্রোত এখন অল্পবেগে চলিয়াছে, সেই স্রোতে বেগ উৎপাদনের জন্য এইরূপ ভাবের উদ্দীপনা প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশবাৎসল্য সেই উদ্দীপনা প্রদানে সমর্থ। এবং এই স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশবাৎসল্য জন্মাইবার জন্য সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয় স্থাপন আবশ্যক। সমাজের কোথায় কি আছে, সমাজশরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুঁজিয়া দেখিতে হইবে, কোথায় কয়খানা হাড় আছে, কোথায় কয়টা শিরা আছে, কোন্ খাতে রক্ত চলে, কোন্ স্নায়ু দিয়া চেষ্টাশক্তি পরিচালিত হয়। অনুরক্তভাবে সন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। কোথায় কোন্ ক্ষত আছে, কোথায় কোন্ ব্রণ আছে, তাহারও অনুসন্ধান চাই, কিন্তু বৃত্তিগ্রাহী মমত্বহীন সার্জনের অনুসন্ধানে চলিবে না, অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মত সকরুণ সপ্রেম অনুসন্ধান আবশ্যক। তাহার পর সেই সমাজ-শরীরের ভ্রূণাবস্থা হইতে শৈশব, শৈশব হইতে যৌবন, যৌবন হইতে প্রৌঢ়দশা,

সমস্তেরই আনুপূর্ব্বিক ধারাবাহিকভাবে তন্ন তন্ন করিয়া তত্ত্ব লইতে হইবে। সমাজের প্রাচীন ইতিহাস যথাসাধ্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। তবেই সেই সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবে, শ্রদ্ধা ভক্তিতে, ভক্তি প্রেমে ও প্রেম শেষ পর্য্যন্ত মহাভাবে পরিণত হইবে। সমাজের যাঁহারা নেতা, যাঁহারা শিক্ষিত, যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা চিন্তাপটু, তাঁহারা সেই মহাভাবের উদ্বোধন করিবেন ও সেই মহাভাবকে শিরায় শিরায় সঞ্চালিত ও স্নায়ুতে স্নায়ুতে প্রবাহিত করিয়া দিবেন। সেই মহাভাবের স্ফূর্ত্তিলাভে সমাজ-শরীর কণ্টকিত হইবে, ধমনীতে রক্তপ্রবাহ বেগে ছুটিবে, হৃৎপিণ্ড মুহুর্ম্মুহুঃ স্পন্দিত হইতে থাকিবে। নবজীবনসঞ্চারের হর্ষোদ্গত অশ্রুপ্রবাহে বন্যা আসিবে ; সেই বন্যাস্রোতে বিঘ্ন বিপত্তি কোন্ অকূলে ভাসিয়া যাইবে। ইহাই আমাদের সামাজিক ব্যাধির চিকিৎসা, ইহাই আমাদের সকল রোগের এক মাত্র প্রতিকার। ('সাহিত্য,' আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩০৬)

অরণ্যে রোদন*

এই উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে যদি অরণ্যের সহিত উপমিত করি, তাহা হইলে সভ্যমণ্ডলীর প্রতি এবং সভার আহ্বানকর্ত্তা চৈতন্য লাইব্রেরির অধ্যক্ষগণের প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয় সত্য, কিন্তু আমাদের এই রোদন যে নিতান্তই অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল, সে বিষয়ে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সন্দেহ করিবেন না। তবে এই নিষ্ফল পরিশ্রমে কাজ কি, বলিয়া কেহ যদি প্রবন্ধপাঠককে এইখানেই নিরস্ত হইতে বলেন, তাহা হইলে তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, বিনা রোদনে এই বাঙ্গালী-জীবন অতিবাহন করা যাইবে কিরূপে ? আমাদের এই সমগ্র শিক্ষিত সমাজ যদি আজ সহসা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসেন যে, কিছুতেই আমরা আর কাঁদিব না, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবনে আর কর্ত্তব্য কি অবশিষ্ট থাকে, খুঁজিয়া মেলা দুর্ঘট হইয়া উঠে। নিতান্তই অন্য কর্ম্মের অভাবে আমরা এত দিন ধরিয়া বাল্যকালে মাষ্টার মহাশয়ের বেত্রগৌরবের ও যৌবনে আপিসের কর্ত্তার উপানৎগৌরবের উপলব্ধি করিয়া আসিতেছিলাম ; কেন করিতেছিলাম, তাহা নিজেও ঠিক জানিতাম না, অন্যে জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর দিতে পারিতাম না ; আমাদের রাজপুরুষেরা আমাদের এত দিনের সেই প্রিবিলেজটা, সেই অধিকারটা কাড়িয়া লইতে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতেও যদি একবার রোদন না করি, তাহা হইলে রোদনক্ষমতাই বা বিধাতা আমাদিগকে দিয়াছেন কিসের জন্য ? এইরূপে উদ্দেশ্য সমর্থনের পর কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার লইয়া যে কোলাহল সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে, সেই কোলাহলের অর্থ বুঝিবার পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় জন্তুটা কিরূপ, বুঝিবার একবার চেষ্টা করা উচিত। কেহ বলেন, উহা মাংসাশী, উহা কেবল বালকবৃন্দের রক্ত খায় ও হাড় চিবায় ; কেহ বা বলেন, না, উহা উদ্ভিজ্জাশী ও তৃণভোজী, উহার বাঁটে দুধ পাওয়া যায়, উহার শিঙে ভেঁপু হয় ও উহার হাড়ে আত্মারাম সরকারের প্রেতপুরুষ চমকিত হয়। প্রাণিতত্ত্বে

* ১৫ই আশ্বিন তারিখে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি. আই. ই. মহোদয়ের সভাপতিত্বে চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশনে পঠিত।

বিদ্যা না থাকিলেও আমরা যখন উহার দুধ খাইয়া মানুষ হইয়াছি, উহার হাড়ে ভেল্‌কি বাজি দেখাইয়া আসিতেছি, এবং এই মুহূর্তেই যখন তারস্বরে ভেঁপু বাজাইতে দাঁড়াইয়াছি, তখন উহার সহিত আমাদের পরিচয় কিছু না আছে, এমন নহে। এবং সেই পরিচয়ের উপর নির্ভর করিয়া আপনাদের ধৈর্য্য ভিক্ষা করিতেছি।

শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু সেই শিক্ষাটাই বা কিরূপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে নানাবিধ থিওরি প্রচলিত আছে। এক সম্প্রদায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য লিবারাল এজুকেশন দেওয়া। এই লিবারাল এজুকেশন শব্দটা খুব জমকাল শুনায়; দূর হইতে উহা সূর্য্যকর-মণ্ডিত আকাশচারী এক খণ্ড মেঘের মত খুব জাঁকাল মূর্ত্তি গ্রহণ করে; কিন্তু কাছে ধরিতে গেলেই উহা কুয়াসার মত ধরা দেয় না। একটু চাপিয়া ধরিলে লিবারাল এজুকেশনের অর্থ দাঁড়ায়—সকল শাস্ত্রেই জ্ঞান লাভ, এবং সকল শাস্ত্রে জ্ঞান লাভের নামান্তর সকল শাস্ত্রেই অপরিপক্বতা ও পল্লব-গ্রাহিতা। সকল শাস্ত্রে বলিলে বোধ করি ভুল হয়; যে সকল পণ্ডিতেরা কোন গূঢ় কারণে গণিত শাস্ত্রকে ও বিশেষতঃ বিজ্ঞান শাস্ত্রকে একটু সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা বোধ করি, ঐ দুই শাস্ত্রকে লিবারাল এজুকেশনের বিষয় করিতে চাহেন না। ভাষা সাহিত্য দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই এই লিবারাল এজুকেশনের বিষয় হইতে পারে; গণিত বিজ্ঞানও যে না পারে, তাহা নহে; তবে ঐ দুই বিদ্যা কতকটা টেক্‌নিক্যাল গোছের; বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার স্থান না থাকিলেও তত ক্ষতি নাই। কিন্তু কি প্রাচীন, কি আধুনিক, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে, সকল শাস্ত্রেই কিছু কিছু জ্ঞান দান এবং টেক্‌নিক্যাল শাস্ত্রকে যথাসাধ্য বর্জ্জন করিয়া লিবারাল বিদ্যা দানই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা বোধ হয় না। বরং বোধ হয়, কোন একটা বিশেষ শাস্ত্রে পারদর্শী করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইউরোপের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ন্যায়শাস্ত্র, থিয়লজি, আইন, গণিত শাস্ত্র, এমন কি, সঙ্গীত শাস্ত্র প্রভৃতি টেক্‌নিক্যাল শাস্ত্রে পারদর্শিতা জন্মাইবার ব্যবস্থা ছিল। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় কোন কোন টেক্‌নিক্যাল শাস্ত্রের আলোচনার জন্য ও অধ্যাপনার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। একালের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই চিকিৎসা,

ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন প্রভৃতি টেক্‌নিক্যাল শাস্ত্রের অধ্যাপনা হয়। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির স্বতন্ত্র ফ্যাকল্‌টির যোগ হইতেছে। আর বিজ্ঞানের কথা,—বিবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপনাই একালের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যেন সর্ব্বপ্রধান কাজ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের প্রাচীন চতুষ্পাঠীগুলিকে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানভুক্ত মনে করি, সেখানেও দেখিবে, কোথাও সাহিত্য, কোথাও ন্যায়শাস্ত্র, কোথাও বা ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। কাজেই লিবারাল শিক্ষাদান অপেক্ষা টেক্‌নিক্যাল শিক্ষাদানই, সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য জন্মাইবার চেষ্টা অপেক্ষা একটা কোন শাস্ত্রে গভীরতর পাণ্ডিত্য জন্মাইবার চেষ্টাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। এবং এক এক বার বোধ হয়, তাহা হওয়াই উচিত। একটা দেশের দশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতেই সকল শাস্ত্রের অধ্যাপনার ব্যবস্থা থাকিলে কোনটারই ব্যবস্থা সুচারুরূপে ঘটে না; এক একটা বিশেষ শাস্ত্র অধ্যাপনার ভার এক এক বিশ্ববিদ্যালয় লইলে সকল শাস্ত্রেরই সম্যক্ চর্চ্চার সুবিধা হয়; এক জায়গায় না হইলে অন্য জায়গায় হয়।

আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহরের গায়ে মোটা হরপে খোদা আছে "Advancement of Learning" অর্থাৎ বিদ্যার উন্নতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই উন্নতিসাধনে কতটা সফল হইয়াছে, তাহা অনেকেই সন্দেহ করেন; কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিদ্যার উন্নতিসাধনেই নিযুক্ত রহিয়াছে। একালে জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যেরূপ খ্যাতি প্রতিষ্ঠা আছে, সেরূপ আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই; আর সর্ব্বত্রই লোকে শিক্ষা বিষয়ে জার্ম্মানির অনুকরণের জন্যই লালায়িত। জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকাল অধ্যাপনা বা জ্ঞানপ্রচার গৌণ উদ্দেশ্য; এবং জ্ঞানের উন্নতিই মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সেখানে বড় বড় পণ্ডিতগণ নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারে, নূতন নূতন সত্যের উদ্ঘাটনে সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন। শিক্ষার্থীরাও অধ্যাপকগণের নিকট সেই সত্য আবিষ্কারের পন্থা শিখিতেছে, কালে তাহারাও সেই কার্য্যে ব্রতী হইবে। গবেষণা এখন অধ্যাপনার স্থান গ্রহণ করিতেছে। সেকালে অধ্যাপকেরা পুরাণ কথা শিখাইয়াই তৃপ্ত থকিতেন; একালে আর পুরাতনের উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না; এখন নূতনকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্যই সকলে

ব্যস্ত। অকস্‌ফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় সত্যানুসন্ধানের বন্দোবস্তে জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পায়ের নিকট বসিতে পারে না।

একটা অতি পুরাতন থিওরি আছে যে, মানুষ গড়িয়া তোলাই শিক্ষার মুখ্য ও চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বঙ্কিমবাবুর ভাষায় বলিলে বলিতে হয়, মনুষ্যের সমুদয় বৃত্তিগুলির সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্যবিধান দ্বারা উহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তিসাধনই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অধ্যাপক হক্‌স্‌লিও এক জায়গায় এইরূপ বলিয়াছেন। অকস্‌ফোর্ডের মত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের মধ্যে শাস্ত্রাধ্যাপনার ও শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়া কৌতুক ব্যায়াম প্রভৃতির দ্বারা দেহের স্ফূর্ত্তি ও বিবিধ সামাজিকতা-বর্দ্ধক অনুষ্ঠানের দ্বারা মানসিক স্ফূর্ত্তিসাধনের ব্যবস্থা আছে। ইংরাজেরা কথায় কথায় তাঁহাদের স্পর্দ্ধিত জাতীয় জীবনের সহিত অকস্‌ফোর্ডের সম্বন্ধের বর্ণনা করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। উপরে যাহাকে লিবারাল এজুকেশন বলিয়াছি, সমগ্র চিত্তবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তিসাধনই বোধ করি উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য, এবং তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই থাকে না। আজকাল শাস্ত্রবিশেষে ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ specializationএর একটা ধুয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু একটা বিষয়ে, সে বিষয়টা যতই গুরু হউক না, একটা বিষয়ে আবদ্ধ থাকিলে সঙ্কীর্ণতা ও এক-দেশদর্শিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং একদেশদর্শিতা ও সঙ্কীর্ণতা ব্যক্তিগত বলবৃদ্ধির পক্ষে যতই অনুকূল হউক না কেন, সমস্ত জাতির সাধারণ শিক্ষায় উহা জাতীয় বলবৃদ্ধির বা মনুষ্যত্ববৃদ্ধির অনুকূল হইতে পারে না। কাজেই লিবারাল এজুকেশনের কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। অপর পক্ষ যে ইহা অস্বীকার করেন, তাহা নহে ; তাঁহারা বলেন, ঐরূপ উন্নত অর্থে লিবারাল শিক্ষা বড় ভাল কথা ; এমন কি, আর একটু নীচে যাইয়া প্রত্যেক ব্যক্তিরই মানুষ হইতে হইলে সকল বিষয়েই কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক, উহাও অস্বীকার্য্য নহে। কিন্তু ইঁহারা বলিবেন, বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক এইরূপ শিক্ষার স্থান নহে। সকল শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা, যাহা সভ্যদেশে মনুষ্য মাত্রেরই আবশ্যক, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন পর্য্যায়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখান হইতেই আনা উচিত। আর ঐ যে খুব লম্বা কথাটা—সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তিসাধন, তাহা কোন বিদ্যামন্দিরের প্রাচীরের মধ্যে ঘটিতে পারে না। সেই স্ফূর্ত্তিসাধনের

জন্য বিদ্যামন্দিরের প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া মনুষ্যসমাজের সুবৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে; বিদ্যামন্দিরের অন্তর্গত ক্ষুদ্র সমাজে তাহার অনুকরণ বা অভিনয় হইতে পারে বটে; কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষার স্থান অন্যত্র। সৃষ্টিকর্ত্তা সকল মানুষকে এক ছাঁচে ঢালিয়া গড়েন নাই। বিভিন্ন ব্যক্তির রুচি প্রবৃত্তির শক্তি বিভিন্ন দিকে। সেই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির রুচি প্রবৃত্তি ও শক্তি বুঝিয়া সেই সেই ব্যক্তিগত শক্তিবর্দ্ধনের চেষ্টা করিলে অধিক ফললাভের সম্ভাবনা। সকলকে এক ভাবে গড়িতে গেলে কোনটার গঠনই মজবুত হয় না; প্রত্যেকের কাঠামোর বিশিষ্ট দিকে নজর দিয়া বিশিষ্টভাবে গড়িবার চেষ্টা করিলে, তাহার বলবিধানে অধিকতর সফলতা ঘটিতে পারে। পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্র অতি ভীষণ; এখানে কেহ কাহাকেও খাতির করে না; এখানে দয়া নাই, মমতা নাই; এখানে সকলেই আপনাকে বাঁচাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সম্মুখসমরের উপযোগী বল সঞ্চয় করিয়া রাখা আবশ্যক। যে ব্যক্তি যে পথে গেলে শক্তিসঞ্চয় করিতে পারিবে, তাহাকে সেই পথে যাইতে স্বাধীনতা দিলে তবেই সে যথাযথ শক্তিসঞ্চয়ের অবসর পাইবে; নতুবা একটা কাল্পনিক সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ আদর্শ খাড়া করিয়া অন্ধ, খঞ্জ, মূক, বধির, সকলকেই নিজ নিজ স্বাভাবিক বিকৃতি ও হীনতা হইতে মুক্ত করিয়া সেই আদর্শের গঠন দিতে গেলে, অনর্থক পরিশ্রম ভিন্ন বিশেষ ফল হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে সেই শক্তিসঞ্চয়ের স্থান। শিক্ষার্থী যখন নাবালক থাকে, যখন সে নিজের মতি গতি প্রকৃতি কোন্ দিকে, তাহা নিজেই জানে না, তখনই নিম্নতর বিদ্যালয়ে তাহার যথাসম্ভব লিবারাল শিক্ষার বিধান কর, এবং পরে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যখন আপনাকে চিনিতে পারে, তখন তাহাকে আপন রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট পথে স্বাধীন ভাবে চলিতে দাও; সকলকে জোর করিয়া এক রাস্তায় চলিতে বাধ্য করিও না; তাহা হইলেই প্রত্যেকের পক্ষে মঙ্গল হইবে ও সমাজের পক্ষেও মঙ্গল হইবে।

উভয় পক্ষের বাদ প্রতিবাদের গণ্ডগোলে আর সময় নষ্ট করিবার দরকার নাই। ফলে, উভয় পক্ষের উক্তিতে কিছু না কিছু সত্য আছে। মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও রুচি অনুসারে তাহার একদেশের গঠন দ্বারা তাহার বলবিধান অতি উত্তম কথা; এবং মনুষ্যের সমস্ত বৃত্তির সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাহার মনুষ্যত্বকে পূর্ণতা প্রদান আরও উত্তম কথা। কিন্তু যে উদ্দেশ্যটা যত উত্তম,

সেই উদ্দেশ্য কার্য্যতঃ সাধন করা তত কঠিন। ইংরাজেরা বলিতে পারেন, আমাদের অকস্‌ফোর্ড আমাদের সামাজিকত্বে আমাদের মনুষ্যত্বে পূর্ণতা প্রদান করিয়া আমাদের জাতীয় শক্তি প্রদান করিয়াছে; তাহারই বলে আমরা ভূমণ্ডলকে তোলপাড় করিতেছি, তাহারই বলে আমাদের পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য, আমাদের পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য, আর আমাদের পৃথিবীবিপর্য্যাসকারী অহঙ্কার। হইতে পারে; তোমরা বড়, তোমাদের মুখে সকল কথাই শোভা পায়। আবার জার্ম্মানি বলিতে পারেন, আমাদের সহস্র বিদ্যা-মন্দিরে আজ শত বৎসর ধরিয়া যে ব্যক্তিগত বিশিষ্ট শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহারই ফলে দেখ—আজিকার জার্ম্মান সাহিত্য, জার্ম্মান বিজ্ঞান, জার্ম্মান দর্শন, জার্ম্মান পাণ্ডিত্য, জার্ম্মান শিল্প, জার্ম্মান সঙ্গীত এবং সকলের উপর সেই উদ্ধত, স্পর্দ্ধিত জার্ম্মান জাতীয়তা, যাহার ফলে সীডানক্ষেত্র, যাহার ফলে "mailed fist," যাহার ফলে "make no prisoners," যাহার ফলে অন্য জাতির চক্ষুঃশূল "made in Germany!" আমরাও বলি, সত্য কথা; তোমরাও বড়, তোমাদের মুখেও সকল কথাই শোভা পায়। সফলতা দেখিয়া বিচার করিতে গেলে হয়ত জার্ম্মান শিক্ষানীতিকেই প্রাধান্য দিতে এক একবার ইচ্ছা হয়; জার্ম্মানের জীবনগঠনে জার্ম্মান শিক্ষানীতির প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই; এবং যখন দেখা যায় অতি অল্প দিনের মধ্যেই জার্ম্মানি কি ছিল, কি হইয়াছে, তখন ঐ শিক্ষানীতির প্রতি পক্ষপাত আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। আর ইংরাজ যখন অকস্‌ফোর্ডের গল্প করেন, তখন ইংরাজের বর্ত্তমান অবস্থা কতটা ইংরাজের শিক্ষানীতির ফল, আর কতটাই বা ইংরাজের বহুশতাব্দীব্যাপী রাষ্ট্রিক অভিব্যক্তির ফল, আর কতটাই বা তাহার নিবাসভূমি ক্ষুদ্র দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থানের ফল, তাহার সম্যক্ মীমাংসা দুষ্কর বলিয়া বোধ হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আজকাল একটা নূতন কথা শুনা যাইতেছে; কিছু দিন পূর্ব্বে এ কথাটা তেমন স্পষ্টভাবে শুনা যাইত না। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে দুইটা পরস্পর বিপরীত থিওরি প্রচলিত আছে। একটার ইংরাজী নাম individualism, ব্যক্তিতন্ত্রতা; আর একটার নাম socialism, সমাজতন্ত্রতা। এক দল বলেন, ব্যক্তির জন্যই সমাজ; আর এক দল উল্টাইয়া বলেন, সমাজের জন্যই ব্যক্তি। ব্যক্তির উন্নতি না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না ও সমাজের উন্নতি না হইলে ব্যক্তির

হয় না; কাজেই একের স্বার্থে অন্যের স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত। সত্য কথা; কিন্তু সত্য হইলে কি হয়। এক দল বলেন, ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ও স্বতন্ত্রভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে দাও; সমাজের যে ব্যবস্থা ব্যক্তিগত স্ফূর্ত্তির অনুকূল, তাহাই বজায় রাখ; তবে কি না, সমাজ না থাকিলে ব্যক্তির উন্নতি নাই; সেই জন্য সমাজ রাখিবার জন্য যতটুকু দরকার, সমাজের খাতিরে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের ততটুকু সঙ্কোচন কর। এই মতের একজন প্রসিদ্ধ প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্‌সর। অন্য পক্ষ বলেন, যখন সমাজের কুশলের উপরই ব্যক্তিগত কুশল সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, তখন সমাজের মঙ্গলার্থ ব্যক্তিকে আপনার স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জ্জনের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তজ্জন্য ব্যক্তিকে সর্ব্বতোভাবে সমাজের অধীন রাখিতে হইবে; তবে যেটুকু স্বাধীনতা দিলে সমাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, সেইটুকু স্বাধীনতা তাহাকে দিতে পার। আজকালকার অনেক বিখ্যাত ও অখ্যাত পণ্ডিত এই মতের পোষণ করেন।

বেশী দিনের কথা নহে, যখন রেলওয়ে ও ষ্টীমার সহসা ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হইয়া ধরাপৃষ্ঠের আয়তন সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিল, এবং টেলিগ্রাফের তার বায়ুপথে উড্ডীন ও জলপথে নিমগ্ন হইয়া কালেরও সংক্ষেপ সাধন করিয়া ফেলিল, তখন বড় বড় তত্ত্বজ্ঞ মহানন্দে নৃত্য করিয়া বলিলেন, এইবার মানবজাতিসমূহ চিরন্তন হিংসাবিদ্বেষ বিসর্জ্জন দিয়া পরস্পর সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইবে ও পরস্পর প্রেমালিঙ্গনে জড়াজড়ি করিবে। অধিক দিন গত হয় নাই, কিন্তু ফলে দেখা যাইতেছে, মনুষ্যের এই ঘনিষ্ঠতাবন্ধনের ফল অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতির সহিত জাতির প্রেমালিঙ্গনের পাশটা অত্যন্ত দৃঢ় হইয়াছে, সন্দেহ নাই; বিশেষতঃ সভ্য জাতি যখন অসভ্য জাতিকে প্রেমপাশে বাঁধিয়া ফেলে, সে দড়ি ছেঁড়ে কাহার সাধ্য! আর সভ্য জাতির প্রীতিচুম্বনের ফলে পরস্পরের গণ্ডদেশ হইতে রুধিরধারা সবেগে ক্ষরিত হইতেছে, এবং তৎকালে উভয়ের বিকশিত দন্তচ্ছটা ও কণ্ঠধ্বনি প্রতিদ্বন্দ্বী সারমেয়যুগলের সাক্ষাৎকার ও প্রীতিসম্ভাষণকেও পরাভূত করিতেছে। এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সভ্য জাতির প্রেমালিঙ্গন শিবাজী ও আফজল খাঁয়ের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রেমালিঙ্গনকে স্মরণ করায়। হার্বার্ট স্পেন্‌সর আশা করিয়া বসিয়াছিলেন, অচিরে সভ্য জগতে সামরিক যুগের অশান্তির অবসান ঘটিয়া বাণিজ্য যুগের চিরশান্তির প্রতিষ্ঠা হইবে। সেই মহামনা বৃদ্ধ দার্শনিক আজ

পর্য্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ অলঙ্কৃত করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; এবং তিনি দুঃখ ও নৈরাশ্যের আর্ত্ত নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছেন, বাণিজ্যকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া মনুষ্য মনুষ্যের প্রতি, সমাজ সমাজের প্রতি তীক্ষ্ণ ছুরিকা আস্ফালন করিতেছে। যাহাদের সহিত বন্ধুত্বের আশা ছিল, তাহারা দারুণ শত্রুতে পরিণত হইয়াছে; এবং বিশাল বসুন্ধরা প্রত্যেকের পক্ষে এক বিশাল শত্রুপুরীতে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক রাষ্ট্র আপনার প্রতিবেশী হইতে আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বদা বিনিদ্রভাবে সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এবং কিসে শত্রুর ক্ষয় ও আপনার জয় হয়, তাহাই উহার এক মাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল ব্যক্তিতন্ত্রের অবনতি ও সমাজতন্ত্রের অথবা রাষ্ট্রতন্ত্রের অভিব্যক্তি। রাষ্ট্র কিরূপে বড় হইবে, রাষ্ট্র কিরূপে বলিষ্ঠ হইবে, রাষ্ট্রের কিরূপে গৌরব বাড়িবে, রাজনীতিবিৎ হইতে সাহিত্যসেবী পর্য্যন্ত সকলেরই তাহাই প্রধান চিন্তার কারণ হইয়াছে। ব্যক্তির জীবন কিসের জন্য? রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্রকে বাড়াইবার জন্য। রাষ্ট্রের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে ব্যক্তিকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বিংশ শতাব্দী এই রাষ্ট্রতন্ত্রকে বক্ষে লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছে।

কোন্ শিক্ষানীতি উৎকৃষ্ট, এখন কি আর খুলিয়া বলা আবশ্যক? উহাই প্রকৃষ্ট শিক্ষানীতি, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সমাজের, তাহার রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষণে সম্যক্‌রূপে সমর্থ করে। সেই শিক্ষাই শিক্ষা, যে শিক্ষা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির বলাধান করিয়া, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত শক্তির স্ফূর্ত্তি সাধন করিয়া, তাহাকে সমাজের বা রাষ্ট্রের দাসত্বের জন্য উপযোগী করে। প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার প্রতিবেশীর জন্য যুদ্ধার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে; রাষ্ট্রভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি যেন সর্ব্বদা শিক্ষিত সৈনিকরূপে আপন রাষ্ট্র রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকে। সেই সকল পুরাতন কথা এখন আর শোনা যায় না, অথবা এখন তাহা নূতন অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। শিক্ষা দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির সমগ্র বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তিসাধন করিতে হইবে;—উত্তম কথা; কেন না, তাহার সমগ্র বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি লাভ করিলে উহা রাষ্ট্রের ইষ্টসাধনেই আবশ্যক হইবে। শিক্ষা দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত রুচি প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা বিশিষ্টভাবে আপন আপন পথে অভিব্যক্ত করিতে হইবে;—অতি উত্তম কথা; কেন না,

ক্ষমতা অভিব্যক্ত হইলেই ত রাষ্ট্রের স্বার্থসাধনে নিয়োজিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান বা উচ্চশিক্ষাদান; কিন্তু সংসারের ভীষণ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার্থ বা আত্মহিতার্থ শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা সেই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; রাষ্ট্রকে বলিষ্ঠ করিয়া রাষ্ট্রের হিতসাধনই সেই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য; তবে রাষ্ট্রের হিতেই যখন তাহার হিত, রাষ্ট্র নষ্ট হইলে তাহার ব্যক্তিত্বও যখন ধ্বংস পাইবে, তখন গৌণভাবে এই শিক্ষা দ্বারা তাহার ব্যক্তিগত মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রবিৎ, রাজনীতিবিৎ ও একালের শিক্ষানীতিবিৎ, সকলেই শিক্ষার এই উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং কি বিশ্ববিদ্যালয়, কি নিম্ন বিদ্যালয়, কি লাবরেটরি, কি লাইব্রেরি, কি কারখানা, সর্ব্বত্র এই শিক্ষার উৎকর্ষ বিধানের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন। বলা বাহুল্য, জার্ম্মানিতে এই শিক্ষানীতি সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং জার্ম্মানিতেই এই শিক্ষানীতি অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী গঠিত সংস্কৃত ও পুনঃসংস্কৃত হইয়াছে। অন্যান্য দেশ ও অন্যান্য জাতি এই নীতির অনুসরণের জন্য ব্যাকুল রহিয়াছে মাত্র। অনেকটা সফলও যে না হইয়াছে, তাহা নহে; চক্ষুর সম্মুখে উদাহরণ জাপান।

বস্তুতই আজ আমি অরণ্যে রোদনে প্রস্তুত হইয়াছি, কিন্তু আমাকেও স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এত ক্ষণ শিক্ষানীতি সম্বন্ধে এত বাগ্‌বাহুল্য দ্বারা পরমসহিষ্ণু শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণপীড়া উৎপাদন করিলাম, আমার রোদনের ও চীৎকারের এই অংশের বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কোনই আবশ্যকতা ছিল না। কেন না, আমাদের ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রসঙ্গে ইহার মধ্যে কোন শিক্ষানীতিরই প্রয়োগের অবসর মাত্র নাই। আমাদের দেশে যে রাষ্ট্র সম্প্রতি বর্ত্তমান, অধ্যাপক সীলি সেই শ্রেণীর রাষ্ট্রকে inorganic state, অঙ্গহীন বা ছিন্নাঙ্গ, সুতরাং জীবনহীন রাষ্ট্র সংজ্ঞা দিয়া তাহাকে আলোচনার অযোগ্য বলিয়া অবজ্ঞাত করিয়াছেন। আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তি বৈদেশিকের হস্তে; যেখান হইতে শক্তির পরিচালনা হয়, তাহার সহিত সমগ্র সমাজের কোন জীবন্ত সম্বন্ধ নাই, কোন চেতনার সম্পর্ক নাই। সমাজশরীর তাহার মস্তিষ্ক হইতে এতটা বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে যে, একের উপর আঘাত অন্যকে স্পর্শ করে না, একে বেদনা পাইলে অন্যত্র তাহার সমবেদনার সঞ্চার হয় না। রাষ্ট্রীয় শক্তির সহিত যখন রাষ্ট্রভুক্ত জনসঙ্ঘের কোন সম্পর্ক নাই, তখন ইউরোপের বর্ত্তমান শিক্ষানীতির প্রয়োগেরও এখানে কোন অবসর

দেখি না। আমরা আমাদের রাষ্ট্রের স্বার্থসাধনে ও হিতসাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম। মৃত্তিকা রস যোগাইয়া ও সার যোগাইয়া গাছকে পোষণ করে সত্য কথা, কিন্তু তাহা বলিয়া মৃত্তিকা গাছের অঙ্গপ্রত্যঙ্গমধ্যে গণ্য হয় না; সেইরূপ আমরাও কর দিয়া ও অন্ন যোগাইয়া রাষ্ট্রের পোষণ করিতেছি, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা রাষ্ট্রের অঙ্গমধ্যে গণিত নহি; আমরা রাষ্ট্ররূপী বৃক্ষের শাখা পল্লব ফল ফুল কিছুরই মধ্যে নহি, আমরা তলস্থ উর্ব্বরা ভূমি মাত্র; তাহার উপর ভর দিয়া বনস্পতি দাঁড়াইয়া আছে, তাহার রস শোষণ করিতেছে, এবং তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া ছায়া দিতেছে, এবং প্রতিবেশী গাছ আগাছার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে। আমাদের এই অধম নির্জ্জীব অস্তিত্ব যে কখনও রাষ্ট্রীয় হিতসাধনে ও স্বার্থের রক্ষণে নিযুক্ত হইবে, রাষ্ট্র তাহা আশা করে না বা অপেক্ষা করে না। আমাদের যাহা রাষ্ট্র, তাহা আমাদের হইতে স্বাধীন, তাহা আমাদের মুখাপেক্ষা করে না, তাহা আমাদের বলে বলীয়ান্ নহে, তাহা আপন বলে বলীয়ান্—অমিত তেজে বলীয়ান্; এই অক্ষম দুর্ব্বল মেরুদণ্ডহীন মনুজসমষ্টির সাহায্যের অপেক্ষা করা সে নিজের দুর্ব্বলতার লক্ষণ মনে করে।

সুতরাং ইউরোপের প্রচণ্ড রাষ্ট্রিক শিক্ষানীতির আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইতে পারে, এরূপ মনে করা বাতুলতা মাত্র। তবে আমাদের মহামহিম মহাবল মহানুভাব রাষ্ট্র আমাদিগকে যে নির্জ্জীব মানবজীবন ধারণের অধিকার দিয়াছেন, সেই মানবজীবনের যথাসম্ভব স্ফূর্ত্তির জন্য আমাদেরও একটা শিক্ষার প্রয়োজন আছে, এবং আমাদেরও একটা শিক্ষানীতি আছে। তাহার সহিত পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষানীতিসমূহের তুলনায় আলোচনার কোনই প্রয়োজন নাই। রাষ্ট্রের উন্নতি, রাষ্ট্রের বলবিধান, রাষ্ট্রের হিতসাধন প্রভৃতি ত দূরের কথা; শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অন্যান্য যে সকল থিওরির উল্লেখ করিয়াছি, সে সকলেরও এ দেশে যথাযথ অর্থে প্রয়োগ সম্ভবে না। লিবারাল এজুকেশনের উচ্চতম অর্থ বলিয়াছি—সমস্ত বৃত্তির সামঞ্জস্য সাধন দ্বারা সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তিসাধন; কিন্তু যে জাতির সমস্ত শুভাশুভ পরহস্তগত, যাহাদের পায়ে শিকল, হাতে শিকল, গলায় শিকল, তাহাদিগের উদ্দেশে অত দীর্ঘ সুললিত বাক্য প্রয়োগ করিলে নিতান্তই উপহাস করা হয়। আবার টেক্‌নিক্যাল এজুকেশন অর্থাৎ বিশিষ্ট ঐকদেশিক শিক্ষা ব্যক্তিগত শক্তির উন্মেষণের পক্ষে উপযোগী; এ সকল বাক্যও তাহাদের প্রতি

প্রয়োগ করা নিষ্ফল। যাহাদের প্রবৃত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সেই প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির উপায় নাই; যাহাদের রুচি থাকিতে পারে, কিন্তু সেই রুচির পরিতৃপ্তির উপায় নাই; যাহাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ক্ষমতার প্রয়োগের স্থান বা অবকাশ নাই; তাহাদের পক্ষে এই শিক্ষানীতির কথা তোলাও অনাবশ্যক। ঐ সকল লম্বা লম্বা কথা, ঐ সকল দীর্ঘ সমাস, ঐ সকল সুললিত বিশেষণঘটা, ঐ সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ থিওরি ত্যাগ করিয়া আমাদের দুর্ব্বল হীন inorganic জীবনের উপযোগী শিক্ষানীতি অবলম্বন করিতে হইবে।

ফলেও দাঁড়াইয়াছে তাহাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যে আইনের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, সেই আইনের preamble মধ্যে আমাদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য কি, তাহা স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। "It has been determined to establish a University at Calcutta for the purpose of ascertaining by examination the persons who have acquired proficiency in different branches of Literature, Science and Art and of rewarding them by academical degrees as evidence of their respective attainments." এই ইংরাজীর বাঙ্গালা অনুবাদ আবশ্যক নহে; কিন্তু ইহার মধ্যেও দুই চারিটা সুদীর্ঘ ও সুললিত বিশেষণ যখন রহিয়াছে, তখন ইহার তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা আবশ্যক।

শিক্ষার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, অন্যান্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকার্য্য ও পরীক্ষাকার্য্য উভয়ই স্বহস্তে গ্রহণ করেন। লণ্ডনে একটা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, সেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ভার না লইয়া কেবল পরীক্ষার ভার লইতেন। সেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হইল। ছাত্রেরা যেখানে হউক, বনে জঙ্গলে হাটে মাঠে ঘাটে শিক্ষা পাইয়া আসিবে; বিশ্ববিদ্যালয় কেবল দেখিবেন, তাহাদের কোন্ শাস্ত্রে কিরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে। তাহাদিগকে এক একটা ছাপ দিয়া, এক একটা উপাধি দিয়া সংসারে ছাড়িয়া দিবেন। লোকে যেন বুঝিতে পারে—এই ব্যক্তির জ্ঞান জন্মিয়াছে, আর অন্য ব্যক্তির জ্ঞান জন্মায় নাই। শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণ, দুই কার্য্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন; শিক্ষার উদ্দেশ্য অমানুষকে মানুষ করা; আর পরীক্ষার উদ্দেশ্য অমানুষ মানুষ হইয়াছে কি না

দেখা, অমানুষের মধ্য হইতে মানুষ বাছিয়া লওয়া। বলা বাহুল্য, পৃথিবীতে এমন কোন উপায় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার সাহায্যে অমানুষ হইতে নিঃসন্দেহে মানুষ ছাঁকিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা বৃহৎ ছাঁকনি বা চালুনি যন্ত্র মনে করিতে পারি। চালুনিতে হাজার কতক মানুষ অমানুষ ফেলিয়া দেওয়া হয়; চালুনিতে নাড়া দিলে তাহার ছিদ্র দিয়া মানুষগুলা বাহির হইয়া আসে; অমানুষগুলা তফাৎ হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, চালুনি যেমনই হউক, উহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না। যখনই নাড়া দেওয়া যায়, তখনই মানুষের গা লাগিয়া কতকগুলি অমানুষও বাহির হইয়া আসে; আর অদৃষ্টদোষে অতি উৎকৃষ্ট মানুষও সময় সময় আটকাইয়া যায়। কাজেই এক বার নাড়া দিলে চলে না, দুই তিন বার নাড়া দিয়া শস্য হইতে তুষকে পৃথক্ করিতে হয়। কিন্তু শস্যের শস্যত্ব উৎপাদনের জন্য চালুনি যন্ত্র দায়ী নহে। সে কেবল আপনাকে নাড়া দিয়াই খালাস। শস্য যেখান হইতে আসুক, তাহাতে তাহার কিছু আসে যায় না।

যে এডুকেশন ডেস্প্যাচের পরামর্শে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে স্পষ্ট লেখা ছিল, the Universities were to be established *not so much to be in themselves places of instruction, as to test the values of the education obtained elsewhere*; অর্থাৎ কি না, শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে দায়ী থাকিবেন না; মূর্খে যেন ফাঁকি দিয়া পণ্ডিত নামে উতরাইয়া আসিতে না পারে, বিশ্ববিদ্যালয় তাহার জন্যই দায়ী। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহরের উপর Advancement of Learning যতই চক্‌চক্ করুক, বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে Advancement of Learningএর কোনই উপায় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাটে মাঠে ঘাটে লোকে শিক্ষা পাইয়া আসিবে, বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে বাজাইয়া লইবেন মাত্র; যেন মেকি চালান না হয়। হাট মাঠ ঘাট হইতে যদি কেহ শিক্ষা পাইয়া বাদন সহ্য করিতে না আসে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তাহাতে কিছু যায় আসে না। কেহ আসে, ভালই; তাহাকে বাজাইয়া লইব; কেহ না আসে, আরও ভাল, বাজানর পরিশ্রম রহিল না। তবে নিতান্তই হাট মাঠ ঘাট যে যেখান হইতে আসিবে, সকলকেই বাজাইতে হইলে পরিশ্রমের বড় আধিক্য হয়; তজ্জন্য নিয়ম হইল যে, সকল ঘাটের ও সকল হাটের পরীক্ষার্থীকে আমরা

বাজাইব না ; আমাদের জানাশুনা চিহ্নিত হাট মাঠ ঘাট হইতে যাহারা আসিবে, তাহাদিগকেই খুব জোরে বাজাইব। উহার উদ্দেশ্য কেবল পরিশ্রম বাঁচান।

ফলে দাঁড়াইল এই, এ দেশে কয়েকটি ছাঁকনি যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হইল, তাহাদের খুব জাঁকাল নাম দেওয়া হইল বিশ্ববিদ্যালয় ; কিন্তু কার্য্যতঃ হইল বিশ্বপরীক্ষালয়। যেহেতু কোন যন্ত্র হইতে এক ক্রান্তি বিদ্যার উদ্গমের কোন ব্যবস্থা থাকিল না। লোকে অন্য স্থান হইতে বিদ্যা পাইয়া আসিবে, চালুনিতে নাড়া দিয়া দেখা যাইবে, কাহার বিদ্যা কত মোটা ও যাহাদের বিদ্যা বেশ মোটাসোটা, তাহাদিগকে তপ্ত মুদ্রায় চিহ্নিত করিয়া সংসারে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে ও বলা হইবে, যাও বৎস, এই বিশাল সংসারক্ষেত্রে তৃণ শষ্পের অভাব নাই, চিহ্নিত পুচ্ছ লইয়া সুখে চরিয়া খাও ; "and ever in your life and conversation show yourself worthy of the same." এইখানে বলা আবশ্যক যে, যে সকল পরীক্ষার্থী এই চিহ্ন লইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশে উপস্থিত হইতেন ও হইয়া থাকেন, এই চরিয়া খাইবার অধিকারপ্রাপ্তি ভিন্ন তাহাদের মনের মধ্যে অন্য কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষার লেশ মাত্র ছিল না ও নাই। আমাদের দেশে যখন ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার হয় নাই, তখনও এক প্রকার দেশী বিদ্যা প্রচলিত ছিল, এবং ভট্টাচার্য্যের টোলে ঐ বিদ্যা প্রদত্ত হইত ; সে বিদ্যার অন্য কোন মূল্য থাক আর নাই থাক, উহার সহিত রজতকাঞ্চনের বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। যে মূঢ়েরা সেই বিদ্যা উপার্জ্জনে জীবন অতিবাহিত করিত, তাহাদিগকে ঘরের কড়ি খরচ করিতে হইত না, এবং যাহারা বিদ্যা উপার্জ্জন করিত, তাহারাও বিদ্যার বিনিময়ে পরের কড়ি আদায় করিবার সুবিধা পাইত না। কিন্তু ইংরাজি বিদ্যা দেশে প্রচলিত হইবা মাত্র লোকে দেখিতে পাইল যে, ইংরাজেরা সমুদ্রপার হইতে নানাবিধ অদ্ভুত সামগ্রী আনিয়াছেন, তার মধ্যে এও একটা অত্যন্ত অপরূপ সামগ্রী। অতি সহজে এ একটা পেট ভরিবার উপায়। এই বিদ্যার উপার্জ্জনে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ কড়ি খরচ করিতে হয় বটে ; কিন্তু তার পর ইহা বেচিয়া বা ইহার বিনিময়ে বা ইহার নামে যথেষ্ট কড়ি ঘরে আইসে। অর্থোপার্জ্জনের যত পন্থা দেশের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে এইটাই সব চেয়ে সহজ পন্থা হইল। ইহাতে অধিক মূলধনের দরকার হয় না, ইহাতে অধিক ব্যবসায়বুদ্ধি আবশ্যক হয় না, এবং সব চেয়ে সুবিধা—

ইহাতে দেউলিয়া হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। কাজেই এই নিরন্ন দেশের ক্ষুধাতুর লোকেরা দলে দলে এই বিলাতী বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইবার জন্য ঝুঁকিতে লাগিল; এবং দলে দলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চালুনির ভিতর প্রবেশ করিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ চালুনির ঝাঁকড় সহ্য করিতে লাগিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশনে ভাইস চ্যান্সেলার বিদ্যার মহিমা ও শিক্ষার গরিমা সম্বন্ধে যতই তত্ত্বকথা উপদেশ দিন না কেন, এ দেশের শিক্ষার্থীর মধ্যে পৌনে ষোল আনার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হইবার এক মাত্র উদ্দেশ্য কোনরূপে জীবিকার সংস্থান। ইহা অত্যন্ত সত্য কথা, ইহা লুকাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশের বিদ্যার্থীরা সাহিত্য চাহে না, দর্শন চাহে না, তাহারা চাহে কেবল উদরান্ন। পৃথিবী গোলই হউক আর ত্রিকোণই হউক, পৃথিবী স্থিরই থাকুক, আর বন্ বন্ করিয়াই ঘুরুক, চন্দ্র মৃৎপিণ্ড হউন বা সুধাভাণ্ড হউন, ম্যাকবেথের রচনাকর্ত্তা শেকস্পীয়র হউন আর নেপোলিয়ন বোনাপার্টি হউন, পলাশীযুদ্ধের বিজেতা ক্লাইবই হউন, আর চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদকই হউন, তাহাদের তাহাতে কিছুই যায় আসে না; তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের প্রত্যাশায় দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, যাহাই গলাধঃকরণ করিতে বলিবে, তাহারা তাহাই করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে। এবং তাহারা যেরূপ সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে পূর্ণ বৈরাগ্যের সহিত দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্যের বিবিধ মিষ্টান্ন, তিক্তান্ন, পলান্ন, খেচরান্ন উদরস্থ করে, তাহাতে তাহাদের অধ্যবসায়ের, তাহাদের সহিষ্ণুতার, তাহাদেব অনাসক্তির, তাহাদের বৈরাগ্যের, তাহাদের বীরত্বের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এবং আমরা তাহাদিগকে কিছুতেই দোষ দিতে পারি না। এই নিরন্ন দেশের দরিদ্র শিক্ষার্থী দর্শন বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য বুঝে না, কাব্যসাহিত্যের রসাস্বাদন করিতে জানে না, "বিদ্যার জন্য বিদ্যার গৌরব" করিতে জানে না, ইত্যাদি দীর্ঘচ্ছন্দ কথা বলিয়া যাঁহারা বিদ্রূপ করেন ও টিটকারি দেন, তাঁহারা নিতান্তই হৃদয়হীন। তাহারা যে উচ্চতর উদ্দেশ্য লইয়া বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করে না, তজ্জন্য তাহাদিগকে উপহাস করা নিতান্ত অমানুষের কাজ। এবং যখন দেখিতে পাই যে, আমাদের অধিকাংশ দরিদ্র শিক্ষার্থী পরের নিকট ধার-করা জীর্ণ গাউনে কথঞ্চিৎ শরীর আবৃত রাখিয়া ভাইস চ্যান্সেলারের হস্ত হইতে কম্পিতহস্তে সাধের

ডিপ্লোমাখানি গ্রহণ করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য উৎফুল্ল হয়, কিন্তু তাহার পর সেনেট হাউসের সোপানাবলী অতিক্রম করিয়াই আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবন আঁধার দেখে; যখন দেখিতে পায়; তাহাদের বৃদ্ধ পিতা মাতা, তাহাদের বিধবা পিসী মাসী, তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত ভাই ভগিনী বড় আগ্রহের সহিত বহু বৎসর ধরিয়া তাহাদের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু সেই আশা পূরণের বিশেষ কোন ভরসা নাই; যখন দেখিতে পাই, শতের মধ্যে পাঁচ জন মাত্র সংসারে প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ সফলতা উপার্জ্জন করে, কিন্তু বাকী পঁচানব্বই জনকে অধম কেরাণীজীবন অথবা তদপেক্ষা হীনতর অন্য কোন বৃত্তি আশ্রয় করিয়া প্রত্যহ শত অপমান নীরবে সহ্য করিতে হয়, অপমানের অশ্রুধারা তাহাদের গণ্ডদেশ দিয়া বিগলিত হইতে পারে না, কিন্তু লোকলোচনের অন্তরালে তাহাদের অভ্যন্তরে ক্ষরিত হইয়া তাহাদের হৃদয়কে ক্লিন্ন করে, তাহাদের প্রাণকে জীর্ণ করে, তাহাদের অন্তরিন্দ্রিয়কে অবসন্ন করে; এবং সে এই অপমান নীরবে সহ্য করে, কেবল নিজের জন্য নহে, পরের জন্য, পিতা মাতার জন্য, স্ত্রী পুত্রের জন্য, ভাই ভগিনীর জন্য, নিরাশ্রয় মাসী পিসীর জন্য, তখন বলিতে ইচ্ছা হয়, ধর্ম্মপালনে যদি জ্ঞানার্জ্জনের অপেক্ষা গৌরব থাকে, এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্ম যদি মানবধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা হয়, তবে হে বিধাতঃ, হে দেবদেব, এই দরিদ্র জীবগণকে তুমি দয়া করিও।

গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালন যে কেবল আমাদের দেশেই আছে, এমন নহে, এবং অন্নাভাব যে কেবল ভারতবর্ষীয় জনগণেরই একচেটিয়া সম্পত্তি, তাহা নহে। অন্য দেশেও জীবনসংগ্রাম অধিকাংশ নরনারীর পক্ষে অতি তুমুল ব্যাপার; এবং সেই জীবনসংগ্রাম হইতে সর্ব্বদেশে রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সকলেরই উৎপত্তি। দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য অতি উৎকৃষ্ট বস্তু; উহারা মনুষ্যকে উন্নত করে, উচ্চ পর্য্যায়ে অধিরূঢ় করে, মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি ও স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ সাধন করে। কিন্তু জগতে মনুষ্যসংখ্যার তুলনায় অন্নের সমষ্টি যখন নিতান্ত অধিক নহে, এবং সেই অন্নের জন্য সংগ্রামেই জীবজগতের প্রতিষ্ঠা, তখন সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মনুষ্যসমাজের অধিকাংশ যে অন্নার্জ্জনের জন্য অবকাশহীন হইয়া নিযুক্ত থাকিবে, তাহা বিচিত্র কি? এ বিষয়ে পাশ্চাত্যে ও ভারতবর্ষীয়ে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু এক বিষয়ে প্রভেদ আছে। পাশ্চাত্য সভ্যদেশে মনুষ্যের অন্নার্জ্জনের

জন্য সহস্র পন্থা বিদ্যমান আছে। যে সকল দেশ ভাগ্যবলে ও ঐতিহাসিক নিয়মবলে আজকাল উন্নতির পদবীতে দণ্ডায়মান আছে, তাহাতে অন্নার্থীর অন্নাগমের জন্য সহস্র পন্থা মুক্ত রহিয়াছে। সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি দেশের শিল্প বাণিজ্যের বিস্তারের জন্য ভীষণ উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে দণ্ডায়মান আছে। দেশের মধ্যে সহস্র কারখানা, সহস্র টেক্‌নিক্যাল স্কুল দেশের লোককে অন্নার্জ্জনের উপায় দেখাইবার জন্য প্রস্তুত আছে। এমন কি, পাশ্চাত্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার, সত্যের আবিষ্কার প্রভৃতি অতি উন্নত ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া যে স্পর্দ্ধা করেন, সেই জ্ঞানবিস্তারের মূলে, সেই সত্যাবিষ্কারের মূলেও যে মানবের অন্নার্জ্জনস্পৃহা, মনুষ্যজীবনের চিরন্তন বুভুক্ষা বর্ত্তমান নাই, এমন নহে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা প্রবেশ করেন, তাঁহারা সকলেই যে পাণ্ডিত্যপ্রয়াসী, সকলেই যে সত্যান্বেষী, সকলেই যে বিদ্যার উপাসক, অন্নার্জ্জন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, তাহা বলিতে পারা যায় না। বিদ্যার সহিত অন্নের সম্বন্ধ থাকা বড়ই পরিতাপের বিষয়, সন্দেহ নাই; এবং বিদ্যার সহিত অন্নের সম্পর্কের অভাব যদি কোন দেশে বর্ত্তমান ছিল বা থাকে, তাহা এই আমাদের অন্নহীন ভারতবর্ষেই ছিল, এবং এখনও বোধ করি, ব্রাহ্মণের চতুষ্পাঠীর ভগ্ন প্রাচীরের মধ্যেই বর্ত্তমান আছে; কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে তাহা নাই। তবে সে দেশে যে কেবল অন্নার্থী মাত্র, তাহার জন্য অন্য উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে; বিশ্ববিদ্যালয় তাহার এক মাত্র দ্বার নহে। আমাদের দেশের অবস্থা অন্যরূপ। আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় শক্তি ভিতরে শান্তি রক্ষা করেন, বিচার দান করেন, দেশকে পরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, এবং টেলিগ্রাফ ও রেলপথ খুলিয়া বৈদেশিক সামগ্রীর শুভাগমনের ও দেশীয় সামগ্রীর অন্তর্দ্ধানের উৎকৃষ্ট উপায় বিধান করেন। কিন্তু তদ্ভিন্ন দেশের লোককে অন্নার্জ্জনে সাহায্য করা আমাদের রাষ্ট্রীয় শক্তির কর্ত্তব্যমধ্যে গণিত হয় না। এ দেশে কল নাই, কারখানা নাই, টেক্‌নিক্যাল স্কুল নাই, শিল্প নাই বা যাহা ছিল, তাহাও যাইতে বসিয়াছে; বাণিজ্য নাই; কেন না, দেশীয় বণিকের পণ্যদ্রব্যবাহী পোতকে বিদেশে প্রেরণের জন্য যে সঙ্গীন বন্দুক কামানের প্রয়োজন, সেই সঙ্গীন-বন্দুক কামান সরবরাহ করিতে কেহ প্রস্তুত নহে। সকলের উপর সভ্যতার ধ্বজা স্কন্ধে লইয়া পরের ভূমি লুণ্ঠন করিবার ও পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করিবার কোন উপায়ই বর্ত্তমান

নাই। এ দেশের ভূমিতে কেবল শস্য জন্মে, দেশের প্রায় সমস্ত লোকে সেই শস্য উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে, এবং যে বৎসর শস্য জন্মে, সে বৎসর খাইতে পায়, যে বৎসর জন্মে না, সে বৎসর মরিবার অধিকার কেহ কাড়িয়া লয় না; আমাদের রাষ্ট্রশক্তি সেই শস্যসম্পত্তির রাজভাগ গ্রহণ করেন, তাহাতে প্রজার জীবনোপায় সম্যক্ বর্ত্তমান থাকে কি না, তাঁহা যে মাননীয় মহোদয়* অদ্য সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া আমাকে ও আপনাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহার নিকট তাঁহার সদুত্তর পাইবেন, আমার কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এ দেশের লোক যখন আবিষ্কার করিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পাইলে অন্নার্জ্জনের কিছু সুবিধা হইতে পারে, তখন যে তাহারা সেই সুবিধার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহাতে তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। যে সময়ে এ দেশে ইংরাজী বিদ্যার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, সেই সময়ে ইংরাজের রাজকার্য্য সুচারুভাবে পরিচালনের জন্য কুলি মজুর চাপরাসী হইতে মুন্সেফ ডেপুটি পর্য্যন্ত আবশ্যক হইয়াছিল; তাঁহারাও বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে অনুগ্রহ করিয়া কুলি মজুর মুন্সেফ ডেপুটি প্রভৃতি অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় 'ইণ্ডিল মিণ্ডিলে' কিঞ্চিৎ অধিকার না থাকিলে ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিবার উপায় নাই, এবং গবর্ণমেণ্ট যখন চিহ্নিতগণের জীবিকার সংস্থান করিতে লাগিলেন, তখন দেশের লোকেও যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত 'ইণ্ডিল মিণ্ডিলে' অধিকারী হইতে লাগিল, তাহা বিচিত্র কি?

ফলে অন্য দেশে শিক্ষানীতি যাহাই হউক, আমাদের দেশে সে সকলের প্রয়োগের একান্ত অভাব। অন্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানচর্চ্চা করেন, সত্যাবিষ্কার করেন, মনুষ্যের ব্যক্তিগত ক্ষমতাবিকাশের চেষ্টা করিয়া তাহাকে রাষ্ট্রের কর্ম্মঠ ভৃত্যে পরিণত করেন, মনুষ্যের সমগ্র চিত্তবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি সাধন করেন। তাঁহারা যথার্থই শিক্ষা দেন, এবং এত যত্নেও যদি কেহ শিক্ষা না পায়, তাহাকে শিক্ষিতের চিহ্ন না দিয়া জীবিকার জন্য অন্য পন্থা আশ্রয় করিতে বলেন। আমাদের দেশে শিক্ষার সে সকল উদ্দেশ্য নাই। এ দেশের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ঐরূপ বুঝিলে শিক্ষানীতিকে উপহাস করা

---

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি. আই. ই.।

হয়, এবং স্বয়ং প্রতারিত হইতে হয়। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাই দেন না। তাঁহারা কেবল পরীক্ষা করেন। যাঁহারা অন্যত্র শিক্ষা পাইয়া পরীক্ষার জন্য আবেদন করেন, তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য জীবিকার্জ্জন, চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তিলাভও নহে, মনুষ্যত্বের বৃদ্ধিও নহে, পাণ্ডিত্যের অর্জ্জনও নহে। তবে মনুষ্য কোন দেশেই নির্জ্জীব পদার্থ নহে; দুই এক জন মনুষ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট ও উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া সহসা পাণ্ডিত্য উপার্জ্জন করিয়া ফেলে, জীবিকার্জ্জনের জন্য তেমন লালায়িত হয় না; সে তাহার দোষ নহে, তাহার মনুষ্যত্বের দোষ। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ও শিক্ষার্থীদিগের সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনাদিতে পরীক্ষা গ্রহণ করেন সত্য বটে, এবং কেহ কেহ অকস্মাৎ সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানে পরিপক্কও হইয়া উঠে, সত্য কথা; কিন্তু এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর সে উদ্দেশ্য নহে। অপিচ বিশ্ববিদ্যালয় যে উপায়ে পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করেন, সে উপায়ও পাণ্ডিত্য পরীক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় নহে। এ দেশের সকল শিক্ষার্থীরই যে এই হীন উদ্দেশ্য, তাহা আমি বলিতে চাহি না; অন্যান্য সভ্যতর দেশেও অধিকাংশ শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য ইহা অপেক্ষা উচ্চ নহে। কিন্তু সে দেশে সকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় না; তাহাদের জীবিকার্জ্জনে শক্তি প্রদানের জন্য অন্য সহস্র শিক্ষাগার বর্ত্তমান আছে। আমাদের এক বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র অগতির গতি, এক মাত্র উপায়। সত্য বটে, আজকাল গবর্মেণ্ট দেশের লোকের জন্য কৃষি-বিদ্যালয়, চিকিৎসা-বিদ্যালয়, পশু-চিকিৎসা-বিদ্যালয়, গুটিপোকা-বিদ্যালয় প্রভৃতি নানা বিদ্যার আলয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে স্থাপন করিতেছেন, কিন্তু তাহা দেশের কোটি সংখ্যায় গণিত লোকের পক্ষে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। এ দেশে জীবনোপায়ের এক মাত্র দ্বার বিশ্ববিদ্যালয়, এবং জীবিকার্জ্জনই শিক্ষানীতির এক মাত্র লক্ষ্য।

এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যা দেন না, বিদ্যার পরীক্ষা করেন, অন্য স্থান হইতে বিদ্যা লইয়া আসিতে হয়। এবং এই বিদ্যা লইবার জন্য অনেকগুলি স্থান দেশের মধ্যে ছড়াইয়া আছে। এই সকল স্থানই প্রকৃতপক্ষে এ দেশের বিদ্যালয়; বিশ্ববিদ্যালয়কে বিদ্যালয় না বলিয়া পরীক্ষালয় বলাই উচিত। বিদ্যা দিবার জন্য যে সকল আলয় আছে, তাহার কতক সরকারী, কতক বেসরকারী। বিদ্যার্থীরা সেখানে পয়সা দিয়া বিদ্যা খরিদ করে। বিদ্যার মূল্য সরকারী আলয়ে বেশী, বেসবকারী আলয়ে কম। কোথাকার বিদ্যা

ভাল, কোথাকার বিদ্যা মন্দ, তাহা নির্ব্বাচনের ভার শিক্ষার্থীর উপর। বিদ্যার্থীরা আপনাপন অবস্থা বুঝিয়া মোটের উপর যেখানে সস্তা পায়, সেইখানেই বিদ্যা খরিদ করে। বেসরকারী আলয়গুলির চেয়ে সরকারী আলয়গুলির চাকচিক্য অনেক বেশী; আর establishment খরচার তারতম্যে একই মাল বিভিন্ন দোকানে বিভিন্ন মূল্যে পাওয়া যায়। আর দেশী দোকানে শাদা রঙের আকর্ষণ নাই; এই কালো দেশে শাদার অস্তিত্ব অন্ততঃ æsthetic cultureএর জন্যও আবশ্যক।

আমাদের গবর্মেণ্ট এ দেশের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের, নিম্ন শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা, উভয় শিক্ষার বিস্তারের দায়িত্ব স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। বেণ্টিক ও মেকলের সময় হইতে গবর্মেণ্ট এ দেশের লোককে উচ্চ শিক্ষা দিবার ভার হাঁকিয়া ডাকিয়া, দেশীয় প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীকে গালিগালাজ করিয়া, স্বয়ং স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পরবর্ত্তী কালেও গবর্মেণ্ট কখনও আপনাকে এ দায় হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। সম্পূর্ণ মুক্তি বলিলাম; কেন না, ইদানীং ইংরাজ গবর্মেণ্টের উচ্চ শিক্ষাবিষয়িণী নীতি একটু অন্যরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছিল; রাজপুরুষগণের কণ্ঠ হইতে উচ্চ শিক্ষার কথাগুলা বাহির হইবার সময়, এক আধটুকু আটকাইয়া যাইতেছিল। ইদানীং রাজপুরুষেরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, গবর্মেণ্ট নিম্ন শিক্ষা বিস্তারের জন্যই মুখ্যতঃ দায়ী, উচ্চ শিক্ষার জন্য তেমন দায়ী নহেন। এই কথা বলিবার সময় একটা থিওরির আশ্রয় লওয়া হইত। কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাতে পণ্ডিতদের মধ্যে একটা থিওরি উঠিয়াছিল, গবর্মেণ্ট প্রজার কাজে যত হাত না দেন, ততই ভাল। গবর্মেণ্টের প্রধান কার্য্য, বোধ হয় এক মাত্র কার্য্য শান্তিরক্ষা। তদ্ভিন্ন প্রজার কিসে ভাল হইবে না হইবে, সে বিষয়ে রাজার হস্তক্ষেপ না করাই ভাল। প্রজা স্বাধীনভাবে আপনার কাজ আপনি করিবে। রাজা স্বয়ং প্রজার ভাল করিতে গেলে উদ্দেশ্য ভাল থাকিলেও ফল প্রায় উল্টা হইয়া পড়ে। এই নীতির নাম laissez-faire নীতি। যেমন অন্য বিষয়ে, তেমনই শিক্ষা বিষয়েও; প্রজা আপনার উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা আপনি করিবে; রাজার তাহাতে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই। এতদ্ভিন্ন আরও একটা কথা ছিল। গবর্মেণ্টের টাকা প্রজাসাধারণের টাকা; উহা সাধারণের শিক্ষার জন্য, mass educationএর জন্য খরচ করিতে পারা যায়। উচ্চশিক্ষা

সাধারণের জন্য নহে, অল্প লোকের জন্য, উচ্চতর শ্রেণীর জন্য; সাধারণের অর্থ শ্রেণীবিশেষের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিলে অবিচার হয়, অন্যায় হয়।

এই সকল কারণ দেখাইয়া কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের রাজপুরুষগণ উচ্চ শিক্ষা হইতে ক্রমশঃ হাত গুটাইবার সংকল্প করিতেছিলেন। যত দিন দেশের লোকে উচ্চ শিক্ষার মূল্য বুঝিত না, তত দিন রাজা তাহাদিগকে পথ দেখাইয়াছেন; এখন দেশের লোকে উচ্চ শিক্ষার মূল্য বুঝিয়াছে, তাহারা উচ্চ শিক্ষার উপায়বিধান নিজেই করিয়া লউক। গবর্মেণ্ট বড় বড় কলেজগুলি ক্রমশঃ উঠাইয়া দিয়া, কেবল উচ্চ আদর্শ বজায় রাখিবার জন্য দুই একটা বড় কালেজ রাখিয়া নিম্ন শিক্ষার প্রচারে প্রবৃত্ত হউন।

কিন্তু থিওরিগুলার পরমায়ু অনেক সময় কম হয়। পাশ্চাত্য দেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য গবর্মেণ্ট অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন; এক একটা বিশ্ববিদ্যালয় এক একটা রাজার হালে বাড়িতে লাগিল; এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত উচ্চ শিক্ষার ফলে দেশের উন্নতি বিষয়ে কোন থিওরিষ্ট সন্দেহ করিতে সাহস পাইলেন না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষণ হইতে লাগিল। সহসা জাপানের অভ্যুদয় হইল। জাপানের অভ্যুদয়ে অনেক ঐতিহাসিক থিওরি বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। রাজা অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া প্রজাকে উচ্চ শিক্ষা দিতে লাগিলেন; প্রজার মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিলেন না; দেখিতে দেখিতে দেশের অবস্থা ফিরিয়া গেল। "অসভ্য জাপান" ইউরোপের সভ্য জাতির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িল। পৃথিবীর লোক স্তব্ধ হইল।

পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় আর সেই পুরাতন থিওরির দোহাই দেওয়া চলে না। ষ্টেটের চেষ্টায় জাতীয় উন্নতি ঘটে না, এ কথা বলিবার আর উপায় নাই। উচ্চ শিক্ষাদান ষ্টেটের কর্ত্তব্য নহে, তাহা আর বলা চলে না। আমাদের গবর্মেণ্টও সে কথা পুরা সাহসে কখনও বলিতে পারেন নাই। বরং লর্ড কর্জ্জন ভারতবর্ষে আসিয়াই অন্যরূপ কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। লর্ড কর্জ্জন স্বয়ং University man বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন। লর্ড কর্জ্জনের আগমনে শিক্ষানীতি কাজেই একটু অন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। যখন আমাদের পরলোকগতা ভারতেশ্বরীর স্মরণচিহ্ন স্থাপনের উদ্যোগ হয়, তখন কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সংগৃহীত অর্থ উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয়িত

হউক ; ভারতেশ্বরীর নামে ভারত সাম্রাজ্যের উপযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হউক। তাহার উত্তরে শুনা যায়, ভারত গবর্মেণ্ট প্রজাগণকে উচ্চ শিক্ষা দিবার দায় হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা করেন না ; উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য গবর্মেণ্ট স্বয়ং সম্পাদন করিবেন। সংগৃহীত অর্থে অন্যরূপ স্মরণচিহ্ন স্থাপিত হউক। তার পর যখন লর্ড কর্জ্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরস্বরূপ সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, My one ambition is to make this University worthy of India—to set before it a high ideal and to render it capable of follwing the footsteps of its European prototypes. Indeed I should like to open up before it, vistas of future expansion and influence such as have not yet dawned upon its vision ; তখন আর কাহারও মনে কোন সন্দেহের অবসর থাকিল না। লর্ড কর্জ্জনের আশ্বাসবাণী আমাদের হৃদয় আর্দ্র করিয়া তুলিল ; আমরা মনে করিলাম, এইবার বুঝি আমাদের অদৃষ্ট ফিরিল, আমরা এত দিন পরে বুঝি পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিশ্ববিদ্যালয় দেশের মধ্যে স্থাপিত দেখিব। আশা করিলাম, দেশের মধ্যে স্থানে স্থানে Teaching University প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেখানে বড় বড় মনস্বী অধ্যাপক আসিয়া জ্ঞান দান করিবেন, জ্ঞানের প্রচার করিবেন, জ্ঞান অর্জ্জন করিবেন, এবং ভারতবাসীকে জ্ঞানার্জ্জনের পন্থা দেখাইবেন। শিক্ষাবিভাগের বর্ত্তমান কর্ম্মচারিগণের অন্ততঃ কিয়দংশ বুয়র যুদ্ধের সেনাপতিত্ব গ্রহণে প্রেরিত হইবেন, এবং তাঁহাদের স্থানে, যাঁহারা পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গৌরব, যাঁহারা জ্ঞান-বৃক্ষের তলে বসিয়া তাহার ছায়া উপভোগ করিয়াছেন, তাহার ফল আস্বাদ করিয়াছেন ও তাহার আহরণের উপায় জানিয়াছেন, এবং অপরকে সেই ফলের আস্বাদনে অধিকারী করিবার জন্য আগ্রহান্বিত আছেন, সেইরূপ ধীমান্ প্রতিভাবান্ জ্ঞানান্বেষী মনস্বিগণ নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। অধ্যাপকের সহিত ছাত্রের যথোচিত গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। অধ্যাপক আপনার চরিত্র ও আপনার পাণ্ডিত্য ও আপনার সহৃদয় ব্যবহার দ্বারা ছাত্রগণের প্রীতি ভক্তি আকর্ষণের চেষ্টা করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যথোপযুক্ত লাইব্রেরি, লাবরেটরি, মিউজিয়াম, উদ্যান, ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতিতে সুশোভিত হইয়া দিগ্‌দেশ হইতে শিক্ষার্থিগণকে আকর্ষণ করিবে, এবং পুনরায় আমরা নগরে

নগরে নালন্দা ও বিক্রমশিলার পুনরভ্যুদয় দেখিয়া জাতীয় জীবনে পুনরভ্যুদয়ের আশায় উৎফুল্ল হইব।

এত দিন পর্য্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যার উন্নতির যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, অনেকে বলেন, তাহাতে দেশে বিদ্যার তেমন উন্নতি ঘটে নাই। ঘটে নাই, তাহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই ছিল না। ঘটিলেই বরং বিস্ময়ের কারণ জন্মিত। ঘোড়ার ডিমে শত বৎসর ধরিয়া তা দিলেও পংক্ষিরাজ বাহির হয় না। লর্ড কর্জ্জনের আশ্বাসবাণীর পরে আশা হইয়াছিল, এবার বুঝি বাস্তবিকই শিক্ষারথ টানিবার জন্য উচ্চৈঃশ্রবার আমদানি করা হইবে। তার পর লর্ড কর্জ্জন বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত করিলেন। কমিশন পবনগতিতে অঙ্গ বঙ্গ দ্রাবিড় কেরল কাশী কোশল পরিক্রমণ করিয়া ফিরিলেন। কিন্তু হায়! এখন লোকে বলিতেছে, রাবণবংশের ধ্বংস হইল, কিন্তু সীতা-উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা হইল না।

আমাদেরই দুরদৃষ্ট, সন্দেহ নাই; কেন না, কমিশনের মধ্যে যে সকল মনস্বী ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহারা সকলেই মাননীয় শ্রদ্ধাভাজন মহাশয় ব্যক্তি; এমন কি, ভারতবর্ষের বিশাল মুসলমানসমুদ্র মন্থন দ্বারা আবিষ্কৃত কৌস্তভটিকেও আমরা যথোচিত শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য। ইঁহাদের মত লোকের চেষ্টায় যদি আমাদের আশা পূর্ণ না হয়, সে আমাদের অদৃষ্টেরই দোষ। অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়; আমরা অভাগা, আমাদের অদৃষ্টগুণে মহাসাগরের জলটুকু সমস্ত শুকাইয়া গিয়া কেবল নুনটুকু মাত্র তৃষ্ণানিবারণের জন্য অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। এখন ইউনিভার্সিটী কমিশনের উপদেশমধ্যে দুই চারিটির সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাউক।

ইউনিভার্সিটী কমিশন একবারে গোড়ায় হাত দিয়া সেনেট সভার সংস্করণে উপদেশ দিয়াছেন; বর্ত্তমানে সেনেটের যে সকল সভ্য আছেন, তাঁহাদের অনেকেই কেবল সেনেটের অলঙ্কার মাত্র; কমিশন বলিতেছেন, তাঁহারা অলঙ্কারস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের শোভাবর্দ্ধন করুন; শিক্ষানীতিতে তাঁহাদের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান সদস্যগণের মধ্যে এক শত জনকে লইয়া নূতন সেনেট গঠিত হউক; অন্যান্য সদস্যেরা কনভোকেশনের দিন academic costume পরিয়া সভার শোভাবর্দ্ধন করুন; দুষ্ট লোকে বলিতেছে, সভার শোভাবর্দ্ধনের জন্য সেই সকল

সদস্যগণকে টানিয়া আনার প্রয়োজন কি ? গবর্ণমেন্ট হাউসের অধিবাসীদিগকে ধরিয়া আনিয়া চেয়ারের উপর বসাইয়া দিলে বোধ করি সভার শোভা আরও উজ্জ্বল হইত ; এবং তাঁহাদের অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধনের জন্য রঙ্গিল গাউনেরও দরকার হইত না। এক শত জন সদস্য লইয়া যে নূতন সেনেট-সভা গঠিত হইবে, তাহার হস্ত হইতে প্রায় সমস্ত প্রধান ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া নূতন সিণ্ডিকেটে অর্পণ করিবার জন্য কমিশন উপদেশ দিয়াছেন। নূতন সিণ্ডিকেটের গঠনপ্রণালী যেরূপ হইবে ও সিণ্ডিকেটের হস্তে যেরূপ প্রভুশক্তি অর্পণ করা হইতেছে, তাহাতে সকলে আশঙ্কা করিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় একটা গবর্মেণ্টের ডিপার্টমেণ্টে পরিণত হইবে ; উহার আর স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা কিছুই থাকিবে না। আমরা সেনেটের পুনর্গঠনে বা সিণ্ডিকেটের স্বাধীনতাসঙ্কোচে তত আশঙ্কার কারণ দেখি না। কেন না, কমিশন নিরতিশয় ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্ত্তব্য কার্য্য সমস্তই খুঁটিনাটি করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এবং নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ঐ সকল দুশ্চিন্তার দায় হইতে একবারে অব্যাহতি দিয়াছেন। কোন্ কালেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, কোন্ কালেজ থাকিবে না, তাহা গবর্মেণ্ট স্বয়ং নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীরা কালেজের অবস্থা তদন্ত করিয়া খারিজ দাখিলের রিপোর্ট করিবেন ; সিণ্ডিকেটকে তজ্জন্য স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী রাখিতে হইবে না। ছাত্রেরা কোন্ বয়সে পরীক্ষা দিবে, কি বিষয়ে পরীক্ষা দিবে, কত মার্ক পাইলে পাস হইবে, এই সমস্তই কমিশন বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন ; সুতরাং নূতন সিণ্ডিকেটের বা নূতন সেনেটের এই সকল চিন্তায় মাথাব্যথা জন্মাইবার কোন অবসর থাকিবে না। বরং নূতন সেনেট ও নূতন সিণ্ডিকেট জন্মগ্রহণ করিয়া কি কর্ম্ম লইয়া জীবন যাপন করিবেন, তাহাই অনেকের ভাবনার বিষয় হইয়াছে। সুতরাং সিণ্ডিকেটের ভাবী প্রভুত্বের আশঙ্কায় আজি হইতে আমাদের চিন্তিত হইবার কোনই কারণ নাই। তদ্ভিন্ন বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির উন্নতিবিধানের জন্য কমিশন নানাবিধ উপদেশ দিয়াছেন। ঐ সকল বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অবস্থা অতি শোচনীয়। যাহাতে বিদ্যালয়গুলিতে যন্ত্রাগার হয়, পুস্তকালয় হয়, ছাত্রাবাস হয়, ইত্যাদি বিবিধ উপদেশ দিয়া প্রাইভেট কালেজের অধ্যক্ষদিগকে উপকৃত করিয়াছেন। তবে ঐ সকল উন্নতি সাধনের জন্য অর্থ কোথা হইতে আসিবে, তাহার কোন

উপায় নির্দ্দেশ করেন নাই। কেবল ছাত্রপ্রদত্ত অর্থ হইতে আধুনিক প্রণালীর উচ্চ শিক্ষা নির্ব্বাহিত হইতে পারে, এ কল্পনা এই আধুনিক ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যত্র কার্য্যকর হইয়াছে কি না, জানি না। এ দেশের ধনিগণ উচ্চ শিক্ষার জন্য যথোচিত ব্যয়বিধানে পরাঙ্মুখ বলিয়া গালি খান; কিন্তু ধনিগণকে গালি দিয়াও বিশেষ লাভ নাই। রাজপুরুষগণ তাঁহাদিগকে যে ভাবে দোহন করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের নিকট আর অধিক দুগ্ধের আশা করিলে প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আর অন্য দেশে এক এক কার্ণেজি এক এক নিশ্বাসে যে ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করেন, আমাদের অধিকাংশ ধনীর পক্ষে তাহা নিশার স্বপন। কাজেই এই বিদ্যালয়গুলির উন্নতির আশা দেখি না। উন্নতির আশা না থাকিলেও এই বিদ্যালয়গুলির উন্নতি বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, সরকারী কালেজগুলির উন্নতি সম্বন্ধে কমিশন কোন কথা বলেন নাই কেন? সরকারী কালেজের অবস্থা কি এতই উন্নত যে, সে সম্বন্ধে কোন উপদেশের প্রয়োজন নাই? বলা বাহুল্য, এ দেশে গবর্মেণ্ট কালেজগুলিই বেসরকারী কালেজের পক্ষে আদর্শস্বরূপ। সরকারী আদর্শ উন্নত করিলে বেসরকারী আদর্শকেও বাধ্য হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে হইবে, অথবা জীবন-সংগ্রামে নষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু আমরা বলি, কমিশনের এই নীরবতার জন্যও আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। গবর্মেণ্টকে সদুপদেশ দেওয়া তাঁহারা অনাবশ্যক বোধ করিয়াছেন; বাহিরের লোককে তাঁহারা যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা শিরোধার্য্য করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তৎপরে কমিশন ভারতবর্ষের দরিদ্র ছাত্রবর্গের উপর নিতান্তই দয়াপরবশ হইয়া একটা বিধি দিয়া ফেলিয়াছেন। দুরন্ত শয়তান আমাদের দরিদ্র ছাত্রগণকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পাইয়া খল সর্পের মত তাহাদিগকে জ্ঞানবৃক্ষের রসাস্বাদনে প্রলোভিত করিয়া সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইতেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন সেই নিঃসহায়দিগের এক মাত্র ত্রাণকর্ত্তা স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাতে কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে প্রেম করিতে দ্বিধা বোধ করিবে?

এই কয়েকটি নমুনা হইতেই কমিশনের রিপোর্টের ধরণটা বুঝা যাইবে। অকারণে আর পুঁথি বাড়াইয়া কাজ নাই। সংসারকার্য্যে পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িতে হয়; কমিশন পুরাতনকে ভাঙ্গিবার অনেক সুব্যবস্থা

করিয়াছেন, নূতন গড়িবার তেমন উপায় করেন নাই। কমিশনের রিপোর্ট পড়িয়া এই কারণেই আমাদের নৈরাশ্য জন্মে। আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্র জঞ্জালে ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ, ইহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় দেখি না। কমিশন সম্মার্জ্জনী ও কুঠার হস্তে ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এবং দুই হাতে সেই সম্মার্জ্জনীর ও কুঠারের প্রয়োগের দ্বারা জঞ্জাল ও জঙ্গল সাফ করিতে বসিয়াছেন। যে সকল কালেজের ভাল বাড়ী নাই, তাহা উঠাও; যাহাতে লাইব্রেরি লাবরেটরি নাই, তাহা উঠাও; যাহাতে হোষ্টেল নাই, ছাত্রদের ক্রীড়াস্থল নাই, মাষ্টারদের বসিবার ঘর নাই, সে সকল উঠাও। তার উপর যে সকল কালেজ সেকেণ্ড গ্রেড্ কালেজ, সেগুলাকেও লজিকের খাতিরে একদম উঠাইয়া দাও। ভাল কথা; এইরূপ কুঠার চালনার পর যে সকল কালেজ থাকিবে, তাহা নিশ্চয়ই উচ্চ অঙ্গের বিদ্যালয় হইবে। তাহাদের অবস্থা বর্ত্তমান কালেজগুলির সাধারণ অবস্থা অপেক্ষা উচ্চ হইবে সন্দেহ নাই। আবার কমিশন বলিতেছেন, এন্ট্রান্সে ছাত্রদের বয়স বাড়াইয়া দাও; তাহাদের পরীক্ষা আরও শক্ত কর; তাহাদিগকে, ফেল হইলে, বারে বারে পরীক্ষা দিতে দিও না; সকলের উপর গরীবের ছেলেকে, বিশেষ ক্ষমতা না থাকিলে পড়িতে দিও না, এবং এন্ট্রান্স পাসের পর চাকরির প্রলোভন দিও না; তাহা হইলে অধিক ছাত্র পাস করিতে পারিবে না; যাহারা পাস করিবে, তাহারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ মানুষের মতন হইবে। ইহাও ঠিক কথা। এখন জিজ্ঞাস্য, তবে কি এইরূপেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমকক্ষ হইবে? এইরূপেই কি ভারতসন্তান অর্থান্বেষণে ও অন্নান্বেষণে বিমুখ হইয়া জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে? এই উপায়ে কি জাতীয় শক্তির বৃদ্ধি, জাতীয় বিদ্যার বৃদ্ধি ঘটিবে? একটা জাতির গায়ে বল সঞ্চারের দুইটা উপায় আছে। এক উপায়, যে সকল ব্যক্তি আশৈশব দুর্ব্বল, তাহাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করাইয়া তাহাদের বলবর্দ্ধনের চেষ্টা। এইরূপে দুর্ব্বলের গায়ে কালক্রমে বল সঞ্চার হইতে পারে; ও বলিষ্ঠের বল আরও বাড়িতে পারে। কিন্তু এতদ্ভিন্ন আর একটা উপায় আছে। যে শিশু দৌর্ব্বল্য লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তখনই তাহাকে নুন খাওয়াইয়া বা গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা। তাহা হইলে দুর্ব্বল মানুষগুলা, যাহাদের হাড়ে দোষ, তাহারা মূলেই নষ্ট হইবে ও সমাজ অচিরে

বীরের সমাজে পরিণত হইবে। শুনা যায়, পুরাকালে স্পার্টানেরা আপনাদের জাতীয় শক্তিবর্দ্ধনের জন্য এই দ্বিতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল। এখনও যাহারা গরু ঘোড়ার breed তৈয়ার করে, তাহারাও এই ব্যবস্থার আশ্রয় লয়। ডারুইন ইহার নাম দিয়াছেন artificial selection। প্রকৃতির হাতে এই ব্যবস্থার নাম natural selection। কোন্ ব্যবস্থাটাতে বেশী ফল হয়, বলিতে পারি না; কিন্তু আমাদের কমিশন এই artificial selectionএর ব্যবস্থাই গ্রহণ করিয়াছেন। দু হাতে কুঠার ধরিয়া সজোরে প্রয়োগ কর; যে দুর্ব্বল, সে মারা যাউক; সে বাঁচিবার উপযুক্ত, সে বাঁচিয়া আসুক। কমিশন আমাদের পরীক্ষালয়গুলিকে বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে বলেন নাই; পরীক্ষা কার্য্যকেই আরও কঠিন করিয়া তুলিতে বলিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে যথোচিত অর্থসাহায্য করিবার জন্য গবর্মেণ্টকে বলেন নাই; তৎপ্রতি শিক্ষাভার অর্পণের কথা অতি সন্তর্পণে তুলিয়াছেন: প্রতিভাবান্ অধ্যাপক সংগ্রহ করিবার কথা তুলেন নাই, শিক্ষক ছাঁকিয়া লইবার জন্য নূতন একটা পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন; দেশব্যাপী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্থানে নগরাবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা তোলেন নাই; দেশীয় ভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাসাদি শাস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা দিতে সাহস না করিয়া প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর গোড়ায় গলদ রাখিয়া দিয়াছেন। আমাদের কিন্তু আশা ছিল অন্যরূপ; বোধ হয়, লর্ড কর্জ্জনের ইচ্ছাও ছিল অন্যরূপ। লোকে বলিতেছে, কমিশন নিজের কথা বলেন নাই, তাঁহাদের হৃদিস্থিত হৃষীকেশ তাঁহাদিগকে যে কথা বলাইয়াছেন, তাঁহারা সেই কথাই বলিয়াছেন। আমরা তাহাতে বিশ্বাস করি না, এরূপ বিশ্বাসে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। আমরা এখনও আশা করিয়া বসিয়া আছি, লর্ড কর্জ্জন আপনার University man এই গর্ব্বের সার্থকতা প্রদর্শন করিবেন; তাঁহার বাক্যে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য থাকিবে; তাঁহার প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত হইয়া তাঁহার শাসনকালকে ও মহামহিম ভারতেশ্বরের মহাভিষেক-বর্ষকে ভারতেতিহাসের পৃষ্ঠে মহিমান্বিত করিয়া রাখিবে।

আমরা এই কয় মাস ধরিয়া শুষ্ক হৃদয় লইয়া বারিবিন্দুর প্রত্যাশায় উর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া ছিলাম। ইউনিভার্সিটি কমিশন বারিবর্ষণের পরিবর্ত্তে শিলাবৃষ্টির ব্যবস্থা করিলেন; আমাদের শুষ্ক হৃদয় আর্দ্র করিবার জন্য এক ফোঁটা তরল জল দিলেন না। কেবল পরীক্ষা দ্বারা, কেবল বাছাই করিয়া

কেবল চালুনি নাড়িয়া, ছাঁকনি ঝাড়িয়া একটা জাতির মধ্যে বিদ্যার উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতি ঘটান যায় না। একালের সরস্বতীর উপাসনায় যে সকল বহ্বাড়ম্বর, যে সকল উপকরণ, সাজসরঞ্জাম আবশ্যক, সেই সকল না জোটাইলে সরস্বতী কখনই কৃপাদৃষ্টি করিবেন না। সেকালে সরস্বতী কুটীরবাসিনী ছিলেন, কিংবা পদ্মবনে পদ্মের উপর দাঁড়াইয়া গোটাকতক পদ্মফুল উপহার পাইলেই তৃপ্ত হইতেন। একালের পাশ্চাত্য সরস্বতী তেমন নহেন, ইঁহার উপাসনার সরঞ্জাম জোটাইতে এক একটা রাজ্য দেউলিয়া হয়। আমার statistics সংগ্রহ করিবার অবসর নাই, শ্রোতৃগণের ধৈর্য্যচ্যুতিরও আশঙ্কা আছে। আপনাদিগকে অনুরোধ করি, জার্ম্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকার এক একটা বিশ্ববিদ্যালয় কত কোটি টাকার সম্পত্তি অধিকার করিয়া আছে, একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। যে অকস্‌ফোর্ড কেম্‌ব্রিজের আমরা এত গল্প শুনি, তাহারা ঐ সকল বিদ্যালয়ের নিকট লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া থাকে। কিন্তু অকস্‌ফোর্ড কেমব্রিজেরও সম্পত্তির সহিত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্পত্তির একবার তুলনা আবশ্যক।

যাহা হউক, সে সকল বড়লোকের বড় কথায় আমাদের দরকার কি ? আমাদের টাকাও নাই, টাকা দিবার লোকও নাই। ইউনিভার্সিটি কমিশন যেখানে টাকার কথা উঠিয়াছে, সেইখানেই চোখে সরিষার ফুল দেখিয়াছেন। তাঁহাদের রিপোর্টে পদে পদে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। Teaching University কি পদার্থ, কমিশন না জানেন, এমন নহে ; কিন্তু গবর্মেণ্টের কাছে তাহার ব্যয় চাহিতে কমিশন সাহস করেন নাই। কমিশন বলিয়াছেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কালে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিদ্যাদানে প্রবৃত্ত হইবে, কালে আপনার অধ্যাপক নিযুক্ত করিবে, পুস্তকালয় রাখিবে, যন্ত্রাগার বসাইবে ইত্যাদি। তবে তাহার খরচ ;—বিশ্ববিদ্যালয়ের ত তেমন অর্থ-সামর্থ্য নাই ; গবর্মেণ্ট ত আর সে টাকা দিতে পারিবেন না ; তবে দেশের রাজা মহারাজ আছেন, তাঁহাদিগকে উপাধি দিব, তাঁহাদিগকে ফেলো সাজাইয়া দিব ; আর এই যে প্রাইভেট কালেজগুলি—উহাদের কাছেও কিছু পাওয়া উচিত। অকস্‌ফোর্ডের মত বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টেটের খরচে চলে না ; বাহিরের লোকের প্রচুর দানেই উহাদের জীবিকা ; অন্য পক্ষে গবর্মেণ্ট উহাদের শিক্ষা-নীতিতেও হস্তক্ষেপ করেন না। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি

গবর্মেন্টের অধীন ; যেটুকু স্বাতন্ত্র্য ছিল, তাহাও বুঝি থাকে না ; অথচ গবর্মেন্ট আশা করেন, বাহিরের বদান্যতায় বিশ্ববিদ্যালয় পুষ্ট হইবে। উত্তম কথা,—প্রাইভেট কালেজের মধ্যে যাঁহাদের জীবন বড়ই কঠিন, যাঁহারা বর্ত্তমান আঘাত হজম করিয়াও বাঁচিবেন, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ সাহায্য করিয়া বেত্রাঘাত সহ্য করিতে থাকুন ; আমাদের ধনিগণ উপাধি লাভের নূতন পন্থায় ধাবমান হইয়া জনগণের নেত্রোৎসব সম্পাদন করুন ; এবং আমাদের গবর্মেন্ট ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দ্দারকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়া উচ্চ শিক্ষার লড়াই ফতে করুন ! কিন্তু হে ভারতসন্তান, তোমাকে মিনতি করি, তুমি এই অবসরে শিখিয়া রাখ, পরান্নে শরীর পোষণ হয় না, দ্বারদেশে চীৎকার করিয়া গৃহস্থের কর্ণশূল উৎপাদনে বিশেষ কোন লাভ নাই ; জানিয়া রাখ, সরস্বতী কুটীরবাসী দরিদ্র উপাসককে ঘৃণা করেন না। অতএব হে ভারতসন্তান, হে সৌম্য, হে প্রিয়দর্শন, পুনশ্চ বলিতেছি, দেবোপাসনার জন্য পুরোহিতের সাহায্য নিতান্তই আবশ্যক নহে ; যে উপাসনাপ্রণালী জানে ও প্রণালীমত উপাসনা করে, দেবতা তাহারই প্রতি প্রসন্ন হন। ফাঁকি দিয়া মানুষ ভোলাইতে পারা যায়, কিন্তু দেবতা ভুলাইতে পারা যায় না ; বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। দেখ, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সাধনার নাম পরিশ্রম, সাধনার নাম অনুরাগ, সাধনার নাম শ্রদ্ধা, সাধনার নাম ভক্তি, সাধনার নাম ত্যাগ। তোমরা স্বাবলম্বন অভ্যাস দ্বারা শ্রমের সহিত, অনুরাগের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত, ত্যাগের সহিত দেবতার উপাসনা কর ; তোমাদের আয়াস নিষ্ফল হইবে না। নতুবা সমস্তই নিষ্ফল হইবে ; আমাদের মত দরিদ্রের,—যাহাদের অবস্থা ঘোর অস্বাভাবিকতারূপ মহাব্যাধিতে গ্রস্ত, তাহাদের অর্থ নিষ্ফল, শ্রম নিষ্ফল, বিদ্যা নিষ্ফল, বুদ্ধি নিষ্ফল, জীবন নিষ্ফল এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ফল অদ্যকার মত **অরণ্যে রোদন**। ('সাহিত্য,' আশ্বিন ১৩০৯)

মহাকাব্যের লক্ষণ

ইংরাজি এপিক্ শব্দের অনুবাদে মহাকাব্য শব্দের প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এপিকের সমস্ত লক্ষণের সহিত মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণ মিলে কি না, তাহা বলিতে পারি না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে আমার কিছু মাত্র জ্ঞান নাই, কিন্তু শুনিয়াছি যে, আলঙ্কারিকেরা মহাকাব্যের লক্ষণ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মহাকবিগণের চিন্তার কারণ কিছুই রাখেন নাই। কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য এ দেশে চলিত আছে, এবং ঐ সকল মহাকাব্য সম্ভবত অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই গ্রন্থকে মহাকাব্য বলা চলে কি না, তাহা লইয়া একটা তুমুল সমস্যা গোড়াতেই দাঁড়ায়। ইংরাজি পুস্তকে রামায়ণ ও মহাভারত এপিক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা উহাদিগকে মহাকাব্য বলিতে সর্ব্বদা সম্মত হন না। প্রথমত এ দুই গ্রন্থ অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মাবলী অত্যন্ত উৎকটরূপে লঙ্ঘন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মহাকাব্য বলিলে উহাদের গৌরবহানির সম্ভাবনা জন্মে। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি আখ্যা দিলে বোধ করি এই দুই গ্রন্থের মর্য্যাদা রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু মহাকাব্য বলিলে উহাদের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়।

বস্তুতই মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়। কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জ্জুনীয় যে অর্থে মহাকাব্য, রামায়ণ মহাভারত কখনই সে অর্থে মহাকাব্য নহে। কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয় যে শ্রেণীর—যে পর্য্যায়ের গ্রন্থ, রামায়ণ মহাভারত কখনই সে শ্রেণীর—সে পর্য্যায়ের গ্রন্থ নহে। একের নাম মহাকাব্য দিলে, অন্যকে মহাকাব্য বলা কিছুতেই সঙ্গত হয় না।

রামায়ণ মহাভারতের ঐতিহাসিকত্বে ও ধর্ম্মশাস্ত্রত্বে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ থাকিয়াও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, উহাতে কাব্যরসও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। মহর্ষি বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, উঁহারা যাহা লিখিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কবিত্ব রহিয়া গিয়াছে,—হয়ত উঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু কবিত্ব যে আছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

রামায়ণ মহাভারতে কবিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই মহর্ষিদ্বয়কে মহাকবি ও তাঁহাদের কাব্যদ্বয়কে মহাকাব্য না বলিলে চলে না। কেন না, ভাষাতে আর কোন শব্দ নাই, যদ্দারা এই কাব্যদ্বয়ের সঙ্গত নামকরণ চলিতে পারে। কুমারসম্ভব কিরাতার্জ্জুনীয়কে আপাতত মহাকাব্যের শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দিয়া আমরা রামায়ণ মহাভারতকেই মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

মনে হইতেছে, মেকলে কোথায় বলিয়াছেন, সভ্যতার সহিত কবিত্বের কতকটা খাদ্য-খাদক বা অহি-নকুল সম্বন্ধ রহিয়াছে। সভ্যতা কবিত্বকে গ্রাস করে; অথবা সভ্যতার আওতায় কবিতার লতা বাড়িতে পায় না। বলা বাহুল্য, মেকলের অনেক উক্তির মত এই উক্তিটিকেও সুধী জনে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার আস্ফালন সত্ত্বেও ইউরোপখণ্ডে কবিত্বের যেরূপ স্ফূর্ত্তি দেখা গিয়াছে, তাহাই তাহার প্রমাণ। অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আমার বোধ হয়, মেকলের ঐ উক্তির ভিতর একটু প্রচ্ছন্ন সত্য আছে। সভ্যতা কবিত্বের মস্তক চর্ব্বণ না করিতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যকে বোধ করি সশরীরে গ্রাস করিয়া ফেলে। আবার বলা আবশ্যক, মহাকাব্য শব্দ আমি আলঙ্কারিকসম্মত অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও প্যারাডাইস্ লষ্ট্‌কে আমি এ স্থলে মহাকাব্যের মধ্যে ফেলিতেছি না। রামায়ণ মহাভারত যে পর্য্যায়ের কাব্য, সেই পর্য্যায়ের কাব্যকেই আমি মহাকাব্য বলিতেছি। পৃথিবীতে কত কবি কত লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্য সেই কোন্ কালে রচিত [illegible]াছে, তাহার পর আর একখানাও রচিত হইল না। পাশ্চাত[illegible] সাহিত্যে লেখকের কিছু মাত্র ব্যুৎপত্তি নাই; কিন্তু সন্দেহ হ[illegible] হোমারের নামে প্রচলিত গ্রন্থ দুইখানি ব্যতীত আর কোন কাব্য[illegible] মহাভারতের সমান পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। [illegible] দেশে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত কবিত্বের অবনতি হইয়াছে, এ কথা কেহই [illegible] পারিবেন না; কিন্তু শেক্সপীয়ারের নাম মনে রাখিয়াও অকুতোভয়ে ব[illegible] যাইতে পারে, ইউরোপ মহাদেশেও একবারের বেশী হোমারের জন্ম হয় নাই।

বস্তুতই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ প্রাচীন কালে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হইয়াছিল; তাহার প[illegible]

কত হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হইল না। কেন এরূপ হইল, তাহার কারণ চিন্তনীয়; কিন্তু সেই কারণ আবিষ্কারে লেখকের ক্ষমতা নাই। তবে এক একবার মনে হয়, মনুষ্য-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাই বোধ করি আর সেই শ্রেণীর মহাকাব্য উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল নহে।

রামায়ণ মহাভারত ও হোমারের মহাকাব্যে আমরা মনুষ্যসমাজের যে চিত্র অঙ্কিত দেখি, তাহাতে সেই সমাজকে আধুনিক হিসাবে সভ্য বলিতে পারা যায় না। মনুষ্যসমাজের সে অবস্থা আবার কখনও ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা জানি না; কিন্তু তাৎকালিক সমাজে যে সকল ঘটনা প্রতিদিন সংঘটিত হইত, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা ঘটিতে পারে না। আমরা এমন কল্পনায় আনিতে পারি না যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি কোন ইউরোপের রাজসভায় আতিথ্য স্বীকার করিয়া অবশেষে রাজলক্ষ্মীকে ষ্টীমারে তুলিয়া প্রস্থান করিতেছেন ও তাহার প্রতিশোধ গ্রহণার্থ ইউরোপের নরপালবর্গ ওয়াশিংটন অবরুদ্ধ করিয়া দশ বৎসর কাল বসিয়া আছেন। ডিলারী বন্দীকৃত লর্ড মেথুয়েন্‌কে গাড়ীর চাকায় বাঁধিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বন্ধুর উপত্যকায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা কোন দিনের টেলিগ্রামে দেখিবার কেহ আশা করেন নাই। সিডান্‌ক্ষেত্রে বিসমার্ক লুই নেপোলিয়ন্‌কে হস্তগত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বুক চিরিয়া নেপোলিয়ন্‌-বংশের শোণিতের আস্বাদ গ্রহণ আবশ্যক বোধ করেন নাই। ...াযুগ অবসানের বহু দিন পরে বুয়রদেশে লঙ্কাকাণ্ডের অপেক্ষাও তুমুল ...র ঘটিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু কোন বিজয়ী মহাবীরকে তজ্জন্য লাঙ্গুলের ... করিতে হয় নাই। ...াই।

...লের এই অসভ্যতা আমাদের চোখে বড়ই বীভৎস ঠেকে, সন্দেহ ... সেকালের সামাজিকতার আর একটা দিক্‌ আছে, একালে সে ... তেমন দেখিতে পাই না। বার্ক এক সময় আপনার মহাপ্রাণতার ... বলিয়াছিলেন, শিভাল্‌রির দিন গত হইয়াছে। শিভাল্‌রি নামক ...নির্ব্বাচ্য বস্তু নগ্ন বর্ব্বরতার সহিত নিরাবরণ মনুষ্যত্বের অপূর্ব্ব মিশ্রণে সমুৎপন্ন। একালে মানুষ মানুষের রক্ত পান করিয়া জিঘাংসার তৃপ্তি করিতে চাহে না বটে; কিন্তু আবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কটাক্ষমাত্রশাসনে, পত্নীর অপমান স্বচক্ষে দেখিয়াও আত্মসংযমে সমর্থ হয় কি না, বলা যায় না।

একালের রাজারা মালকোঁচা মারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গদাহস্তে অবতীর্ণ হন না সত্য বটে, কিন্তু ভীমরতিগ্রস্ত পিতার একটা কথা রাখিবার জন্য ফিজি দ্বীপে নির্ব্বাসন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন কি না, বলিতে পারি না। অশ্বত্থামা ঘোর নিশাকালে সুখসুপ্ত বালক-বৃদ্ধের হত্যাসাধন করিয়া ভীষণ ক্রূরতা দেখাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু সভা ডাকিয়া ও খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া সেই ক্রূরতার সমর্থন তাঁহার নিতান্তই আবশ্যক হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণ যখন জয় বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া নিশাকালে শত্রুশিবিরে ভীষ্মের নিকট দীনভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভীষ্মকে তাঁহার জীবনটুকু দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের লৌহবর্ম্মের অন্তরালে কারেন্সি নোটের গোছা লইয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই।

গত চারি হাজার বৎসরের মধ্যে মনুষ্যসমাজের বাহিরের মূর্ত্তিটা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির কতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বলা দুষ্কর। মনুষ্যের বাহিরের পরিচ্ছদটা সম্পূর্ণ বদলাইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যের ভিতরের গঠন অনেকটা একরূপই আছে। সেকালের রাজারাজড়াও বোধ করি সময়মত কৌপীনধারী হইয়া সভামধ্যে বাহির হইতে লজ্জিত হইতেন না; কিন্তু এখনকার অন্নহীন শ্রমজীবীরাও সমস্ত অঙ্গের মালিন্য ও বিরূপতা পোষাকের আচ্ছাদনে আবৃত রাখিতে বাধ্য হয়। সেকালে ক্রূরতা ছিল, বর্ব্বরতা ছিল, পাশবিকতা ছিল, এবং তাহা নিতান্ত নগ্ন, নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। তাহার উপর কোনরূপ আচ্ছাদন, কোনরূপ পালিশ, কোনরূপ রঙ ফলান ছিল না। একালেও ক্রূরতা, বর্ব্বরতা ও পাশবিকতা হয়ত ঠিক তেমনই বর্ত্তমান আছে; তবে তাহার উপর একটা কৃত্রিম ভণ্ডামির আবরণ স্থাপিত হইয়া, তাহার বীভৎস ভাবকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। সম্প্রতি চীনদেশে সভ্য ইউরোপের সম্মিলিত সেনা যে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আটিলা ও জঙ্গিস্ খাঁর প্রেতাত্মার আর লজ্জিত হইবার কোন কারণই নাই।

বস্তুতই চারি হাজার বৎসরের ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, মনুষ্যচরিত্র অধিক বদ্‌লায় নাই; তবে সমাজের মূর্ত্তিটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এবং মনুষ্যসমাজের অবস্থা যে কাব্যগ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেই কাব্যের মূর্ত্তিও যে তদনুসারে পরিবর্ত্তিত

হইয়া যাইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। বিস্ময়ের কারণ থাক আর নাই থাক, আধুনিক কালের সাহিত্যে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের আর আবির্ভাব হয় নাই, এবং আর যে কখনও হইবে, তাহা আশা করাও দুষ্কর। সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ বোধ হয় অতীত হইয়া গিয়াছে।) কালের যখন অবধি নাই ও পৃথ্বী যখন বিপুলা, তখন বড় কবির ও বড় কাব্যের অসদ্ভাব কখন হইবে না, কিন্তু মনুষ্যসমাজের সেই প্রাচীন অবস্থা ফিরিয়া আসিবার যদি সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে মহাকবির ও মহাকাব্যের বোধ করি আবির্ভাব আর হইবে না।

বস্তুতই আর আবির্ভাবের আশা নাই। মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা বোধ করি আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একবারে চলিয়া গিয়াছে। মহাকাব্যগুলিকে আমরা মহাকায় অদ্ভুত পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। এক একবার মনে হয়, উহাদিগকে কোন মানবহস্তনির্ম্মিত কৃত্রিম কারুকার্য্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রকৃতির হস্তনির্ম্মিত নৈসর্গিক পদার্থের সহিত উপমিত করা উচিত।

আমাদের ভারতবর্ষের মহাভারতকে এক একবার ভারতবর্ষের হিমাচলের সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। হিমাচল যেমন তাহার বিপুল পাষাণ-কলেবরের অঙ্কদেশে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, মহাভারতের বিপুল কলেবর তেমনই ভারতীয় সাহিত্যকে কত সহস্র বৎসর কাল অঙ্কে রাখিয়া লালন পালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছে। হিমাচলের বিশাল বক্ষোদেশ হইতে বিনিঃসৃত সহস্র উৎস হইতে সহস্র স্রোতস্বিনী অমৃতরসপ্রবাহে ভারতভূমিকে আর্দ্র ও সিক্ত করিয়া 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছে, সেইরূপ মহাভারতের মধ্য হইতে সহস্র উপাখ্যান, সহস্র কাহিনী, সহস্র কথা সমগ্র জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে সহস্র ধারা প্রবাহিত করিয়া পুণ্যতর ভাবপ্রবাহে জাতীয় সাহিত্যকে চিরহরিৎ রাখিয়া বহু কোটি লোকের জাতীয় জীবনে পুষ্টি ও কান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ যেমন হিমাচলের ক্রমবিন্যস্ত স্তরপরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে কত বিস্ময়কর জীবের অস্থিকঙ্কাল উদ্ধার করিয়া অতীতের লুপ্ত স্মৃতি কালের কুক্ষি হইতে উদ্‌ঘাটন করেন; সেইরূপ প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই বিশাল

গ্রন্থের স্তরপরম্পরা হইতে ভারতীয় জনসমাজের অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত নিদর্শনের চিহ্ন ধরিয়া ইতিহাসের অতীত অধ্যায় আবিষ্কার করেন।

ভূতত্ত্ববিৎ তাঁহার মানস চক্ষু অতীত কালের পরপারে প্রসারিত করিয়া দেখিতে পান, বসুন্ধরার ইতিহাসে এমন এক দিন আসিয়াছিল, যখন মহাকাল স্বয়ং আপনার ভীম বাহু প্রসারণ করিয়া উত্তপ্ত ধরাগর্ভে বিপুল শক্তিরাশি কেন্দ্রীভূত করিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে সেই পুঞ্জীকৃত শক্তিসমষ্টি আপনাকে প্রসারিত করিয়া ভূবক্ষ বিদারণ করিয়া বহির্গত হইল। ভীষণ ভূকম্পে ধরাপৃষ্ঠ মুহুর্মুহু আলোড়িত হইল। সাগরবক্ষ উচ্ছ্বসিত হইয়া পুনরায় ভীতিভরে অপসরণ করিল। পূর্ব্বসাগরের বেলাভূমি হইতে পশ্চিম-সাগরের বেলাভূমি পর্য্যন্ত ভূগর্ভ বিদারণ করিয়া মহাকায় পাষাণ-কলেবর হিমাচল গাত্রোত্থান করিল। তাহার তুহিনমণ্ডিত সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল শৃঙ্গসমূহ বেষ্টিত করিয়া ঝঞ্ঝাবায়ু ঘোররাবে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ধূম্রবর্ণা কাদম্বিনীর বক্ষোদেশে সৌদামিনী স্ফুরিত হইতে লাগিল। শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল ; দ্রোণিদেশ অধিত্যকায় উত্থিত হইল ও অধিত্যকা দ্রোণিদেশে নামিয়া গেল ; অরণ্যানী জ্বলিয়া উঠিল, জীবকুল নীরব হইল, মহাকালের তাণ্ডব নর্ত্তনের সহকারে অট্টহাস্যে দিগন্ত নিনাদিত হইতে লাগিল।*

কেন এমন হয় জানি না, কিন্তু নিসর্গের ইতিবৃত্তে যেমন মহাকাল মাঝে মাঝে এইরূপ তাণ্ডব নর্ত্তনের উন্মত্ত ক্রীড়া প্রদর্শন করেন, মানব-সমাজের ইতিবৃত্তেও সেইরূপ সময়ে সময়ে তাঁহার অট্টহাস্যের নির্ঘোষধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের ঘটনা প্রাচীন ভারতসমাজের একদেশে সংঘটিত হইলেও, ইহাকে আমরা সমগ্র মনুষ্যসমাজের একটা মহাবিপ্লবের চিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মনুষ্যহৃদয়ের ঈর্ষা, দ্বেষ, জিগীষা ও জিঘাংসা প্রভৃতি উৎকট দুর্দ্দম প্রবৃত্তিসমূহ কালে কালে কেন্দ্রাকৃষ্ট ও পুঞ্জীকৃত, ঘনীভূত ও স্তূপীকৃত হইয়া যখন আপনার শক্তিতে আপনি বাহির হইতে চাহে, তখন উহা লেলিহান অগ্নিজিহ্বা ব্যাদান করিয়া সমাজমধ্যে আপনার জ্যোতির্ম্ময়ী জ্বালা প্রসারণ করে ; ভক্তি শ্রদ্ধা, প্রীতি প্রেমের উৎস পর্য্যন্ত সেই ভীষণ

* ভূতত্ত্ববিদের মধ্যে যাঁহারা লায়ালের শিষ্য, তাঁহাদের হিমালয়োৎপত্তির এই কাল্পনিক বর্ণনায় শঙ্কিত হইবার কারণ নাই। প্রাদেশিক catastrophe লায়ালের মতের বিরোধী নহে।

উত্তাপে শুকাইয়া যায়; সমগ্র সমাজের পৃষ্ঠদেশ বিপ্লবের ভূমিকম্পে মুহুর্মুহু আন্দোলিত হইয়া উঠে। অন্তর্নিহিত শক্তিরাশি সমাজের কলেবরকে বিদীর্ণ করিয়া, সহস্র খণ্ডে চূর্ণ করিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে; লক্ষ বৎসরের সঞ্চিত সৌন্দর্য্যরাশি ও রূপরাশি সেই তরল অনলপ্রবাহে ভস্মীভূত হইয়া যায়। মহাভারতের বর্ণিত ঘটনার মধ্যে আমরা মহাকালের অট্টহাস্যের প্রতিধ্বনি দূর হইতে শুনিতে পাইয়া স্তব্ধ হই ও মুহ্যমান হই। এ সেই মানবসমাজের চিরন্তন বিপ্লবের ইতিহাস—যাহা যুগযুগান্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে; যাহা সাগরগর্ভকে মালক্ষেত্রে উত্তোলিত করিয়া মালক্ষেত্রকে সাগর-গর্ভে নিমগ্ন করে; যাহা পর্ব্বতচূড়ার সহিত পর্ব্বতচূড়ার সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া প্রলয়াগ্নির সৃষ্টি করে। সেই অগ্নিশিখায় অরণ্যানী মরুভূমিতে পরিণত হয়, জীবকুল ধরাপৃষ্ঠে অস্থিকঙ্কাল রাখিয়া কালের কুক্ষিতে অন্তর্হিত হয়। ইহা সেই সনাতন ধর্ম্মের অভ্যুত্থান, যাহা দলিত, পীড়িত ও সঙ্কুচিত করিয়া ধর্ম্মের পুনঃ স্থাপনের জন্য মহেশ্বরের মহৈশ্বর্য্যের অবতারণা আবশ্যক হয়; ভীত, বিস্মিত মানবচিত্ত যখন সেই ঐশ্বর্য্যের মহিমায় মোহ প্রাপ্ত হইয়া তাহার চরণোপান্তে আপনাকে লুণ্ঠিত করে।

মহাভারতের বর্ণিত ইতিহাস মানবসমাজের বিপ্লবের ইতিহাস। ভারতবাসীর জাতীয় ইতিহাসে বাস্তবিকই কোন দিন এইরূপ মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল কি না, তাহা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনুসন্ধান করিবেন। হয়ত কোন ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ঘটনার স্মৃতি মাত্র অবলম্বন করিয়া মহাকবি আপনার চিত্তবৃত্তির সমাধিকালে মানবসমাজের মহাবিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; এবং সেই স্বপ্নদৃষ্ট ধ্যানলব্ধ মহাবিপ্লবের,—ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের মহাসমরের চিত্র ভবিষ্যৎ যুগের লোকশিক্ষার জন্য অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। ভূগর্ভে সঞ্চিত যে শক্তির বলে হিমাচল ভূগর্ভ ভিন্ন করিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছিল, সে শক্তি এখন সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উপশান্ত হইয়াছে; এখন হিমাচলের সানুদেশ নিবিড় বনস্থলীতে শ্যামায়মান হইয়াছে; তাহার আয়ত বক্ষে এখন নিবিড় জলদমালা বারি বর্ষণ করিয়া সেই শ্যাম-ভূমির হরিৎকান্তি অব্যাহত রাখিয়াছে; আর সেই জলদমালার বহু উর্দ্ধে ধবলগিরি ও গৌরীশঙ্করের শুভ্রোজ্জ্বল দেহ দূর হইতে দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে

যে সামাজিক বিপ্লবে, যে অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে প্রাচীন ভারতসমাজে অশান্তির ঝটিকা বহিয়াছিল, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার পর সেই ব্যাপারের স্মৃতি পর্য্যন্ত প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; ঝটিকা শান্ত হইয়াছে; মহাসিন্ধুর কল্লোল স্তব্ধ হইয়াছে, বনানীর দাবাগ্নিগর্জ্জন নীরব হইয়াছে; এখন সেই মহাভারত হইতে সহস্র সাহিত্যধারা প্রবাহিত হইয়া আমাদের জাতীয় সাহিত্যে ও জাতীয় জীবনে শাখাপল্লবের ও পত্রপুষ্পের উদ্গম করিয়া তাহাকে বিকসিত ও প্রফুল্ল রাখিয়াছে; আর আমরা দূর হইতে ভীমার্জ্জুন, কর্ণ-দুর্য্যোধন, ভীষ্ম-দ্রোণ, অশ্বত্থামা-কৃতবর্ম্মার দৃঢ়গঠিত, উন্নতশীর্ষ, জ্যোতির্দীপ্ত কলেবরকে ধবলমুকুটধারী কিরণোজ্জ্বল ধবলগিরির ন্যায় ভারতসমাজক্ষেত্রের দূরস্থিত দিগ্বলয়ে দণ্ডায়মান দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইতেছি।

এই হিমালয়ঘটিত উপমাটা এত ক্ষণ অনুগ্রহপরায়ণ পাঠকবর্গের নিতান্তই কর্ণশূল হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সম্পর্কে আর একটা কথা না বলিয়া নিরস্ত হইতে পারিতেছি না। মহাভারতকে আদর্শ মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া এবং হিমগিরির সহিত তাহার তুলনা করিতে গিয়া লেখক মহাকাব্যের একটা লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিয়া ফেলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই আবিষ্কার জগতের যাবতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের রোমহর্ষ উৎপাদন করিবে। তাহা জানিয়াও সেই আবিষ্কারটি পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিবার দুঃসাহস আশ্রয় করিলাম; আশা করি, তাঁহাদের শুভ্রোজ্জ্বল দশনচ্ছটা লেখককে রণারম্ভেই পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য করিবে না।

লেখকের মতে যে কাব্য পড়িতে হয় না, তাহারই নাম মহাকাব্য। না পড়িয়াই আমরা মহাকাব্যের কাব্যরসাস্বাদনে অনেকটা অধিকারী হইতে পারি। রামায়ণের চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকের ও মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের অধিকাংশই অপঠিত রহিয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে বোধ করি পাঠকসমাজের অধিকাংশই লজ্জিত হইবেন না। তথাপি এই পাঠকসমাজ উভয় মহাকাব্যের কাব্যরসের আস্বাদন জানেন না, ইহা স্বীকার করিতে তাঁহারা কখনই সম্মত হইবেন না। রামচরিত্র ও কৃষ্ণচরিত্র, লক্ষ্মণচরিত্র ও কর্ণচরিত্র, দশাননচরিত্র ও দুর্য্যোধনচরিত্র, ভরতচরিত্র ও ভীষ্মচরিত্র, মহাকাব্যের গহন বন ভেদ করিয়া এই সকল মহামানব-চরিত্রের স্পর্শ লাভ আমাদের অধিকাংশের ভাগ্যেই ঘটে নাই। আমরা দূর হইতে উহা নিরীক্ষণ করিয়াছি মাত্র; তথাপি দূর হইতেই

তাহার মাহাত্ম্যে আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছি। জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, ভারতবর্ষে আর্য্যসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি মাতৃস্তন্য পান করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে, অথচ রামচরিত ও সীতাচরিতের পুণ্যধারা সেই মাতৃস্তন্যের প্রবাহের মত তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয় নাই, স্নায়ুতন্ত্রীতে তাড়িত স্রোতের সঞ্চালন করে নাই, তাহার অস্থিতে, তাহার মজ্জায়, তাহার পেশীতে বল বিধান করে নাই, সেই হতভাগ্যের—সেই পিণ্ডীভূত জড়ের ভারত-সমাজে স্থান কোথায়? পঞ্চবিংশতি কোটি হিন্দুসন্তানের অধিকাংশ অন্য কারণ না থাকিলেও, শুদ্ধ ভাষাজ্ঞানের অভাবে, সেই পুণ্য স্রোতস্বিনীর মূল প্রস্রবণে গিয়া তৃষ্ণা-নিবারণে অশক্ত আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু লক্ষ্মণের মত ভাই, হনুমানের মত দাস, ভীষ্মের ন্যায় পিতামহ ও কর্ণের ন্যায় বৈরীর জাগ্রত জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি কয় জনের মানস চক্ষুর সম্মুখে দণ্ডায়মান নাই? আমাদের বঙ্গদেশেরই অসংখ্য নরনারী মাতৃমুখে লঙ্কাদহনের ও লক্ষ্মণভোজনের কথা শুনিয়াছে; কথকের মুখে, গায়কের মুখে মন্থরার লাঞ্ছনা ও অঙ্গদ-রাবণ-সংবাদের অতিরঞ্জনে আমোদিত হইয়াছে; যাত্রায়, গানে ভরতমিলন ও সীতানির্ব্বাসন অভিনীত হইতে দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে; কৃত্তিবাসী রামায়ণ হস্তে অবকাশরঞ্জন করিয়াছে; এবং শেষের সে দিন রামনাম শুনিতে শুনিতে জগৎসংসারের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু সেই আদিকবির অমৃতলেখনীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় তাহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু আপনি জ্ঞানী, আপনি পণ্ডিত, আপনি কলাবিৎ, আপনি সমালোচক, আপনি সমজদার, আপনি সন্তরণ দিয়া সংস্কৃত-সাহিত্য-সমুদ্রের পার দেখিয়াছেন, আপনার সপ্তকাণ্ড রামায়ণ আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ রহিয়াছে, আপনার যদি বিশ্বাস থাকে যে, ঐ পল্লীবাসিনী মূর্খ বৃদ্ধার অপেক্ষা আপনি নিঃসংশয়ে রামরসায়নে অধিকতর রসগ্রাহী হইয়াছেন, তাহা হইলে আপনাকে ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিব।

বস্তুতই আমার বিশ্বাস, মহাকাব্যের লক্ষণ এই যে, উহার আগাগোড়া অক্ষরে অক্ষরে পড়িবার প্রয়োজন নাই। মূল হোমার পৃথিবীতে কয় জন লোক পড়িয়াছে? পণ্ডিতসমাজের মধ্যে কয় জন লোক হোমারের তর্জ্জমা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছেন? অধিকাংশের পক্ষে কেবল হোমারের গল্প শুনা আছে মাত্র। অথচ ট্রয় নগরের প্রাকারসম্মুখে সমুদ্রবেলা পূর্ণ করিয়া

আমরা আগামেম্‌নন্‌-পরিচালিত গ্রীক অক্ষৌহিণীর সন্নিবেশ বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট তুলিকায় চিত্রিত দেখিতেছি। সেই বিস্তীর্ণ স্তব্ধ সেনাকুলিত রণাঙ্গনের উপর দিয়া একিলীস্‌, আজাক্‌স্‌ ও দায়োমীদের বিশালবক্ষা পরিণদ্ধকন্ধর শালপ্রাংশু জীবন্ত মূর্ত্তি বিচরণ করিতেছে; বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হইতেছে, কিন্তু ট্রয় নগরের দুর্ভেদ্য প্রাকার ভগ্ন হইল না; গ্রীক বীরগণের শিবিরমধ্যে মানবহৃদয়ের সনাতন ঈর্ষাবিদ্বেষ ধূমায়মান হইতে লাগিল। সেই ধূম হইতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, গ্রীক বীরগণ ক্ষণেকের জন্য উদ্দেশ্যভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পরস্পর আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইলেন; তার পর-অঙ্কের যবনিকা তুলিবা মাত্র অকস্মাৎ পাত্রোক্লসের চিতাধূম প্রশমিত হইতে না হইতে একিলীসের রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; রোষাগ্নিদীপ্ত রুদ্রমূর্ত্তি হুঙ্কার করিয়া গর্জ্জন করিল; পরক্ষণেই দেখিতে পাই, মহাবীর হেক্টরের শবদেহ সেই ভীমকর্ম্মার রথচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া রুধিরধারায় রণক্ষেত্র শোণিতাক্ত করিতেছে ও মর্ত্তে নরগণের ও আকাশে দেবগণের মুগ্ধ নেত্র বিস্ফারিত হইয়া সেই ক্রূর কর্ম্মের প্রতি নীরবে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

পাঠকবর্গ যদি এত ক্ষণ বুঝিয়া থাকেন, কৃত্তিবাস পড়িলেই বাল্মীকি পড়ার কাজ হইবে, এবং যে সকল পাঁচালী পয়ার শুনিয়া কাশীদাস ভারতকথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেই পাঁচালী পড়িলেই আর দ্বৈপায়ন ঋষির শরণ লইতে হইবে না, তাহা হইলে লেখকের নিতান্ত দুর্ভাগ্য। বদরিকাশ্রমযাত্রী যাঁহারা হিমালয়ের চড়াই উত্‌রাই অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, কৈলাসযাত্রী যিনি ষোল হাজার ফুট উপরে উঠিয়া 'নীতি-পাস্‌' অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, এমন কি, দার্জ্জিলিঙে কিংবা সিমলা-শৈলের আলোকমণ্ডিত রাজপথে যাঁহারা বিহার করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা হিমালয়ের যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, হিমালয়ের পাদদেশের সমতলবাসীর পক্ষে তাহা ইন্দ্রিয়মনের অগোচর, সন্দেহ নাই। কিন্তু আশঙ্কা হয়, হিমালয়ের এক এক দেশে, এক এক অঙ্গে, তাহার কিন্নরীসেবিত গুহামধ্যে, তাহার সরলদ্রুমাচ্ছন্ন সানুদেশে, তাহার গৈরিকখচিত উপত্যকায়, তাহার মারুতপূর্ণরন্ধ্র আপাদিত-বেণুকৃত্য কীচক-বনে, তাহার হিমশীকরবাহি-পবন-সেবিত গিরিনির্ঝরপ্রান্তে চিত্তবিভ্রমকর অতুল্য শোভা আছে সত্য; কিন্তু সেই একদেশব্যাপী শোভা, সেই প্রাদেশিক মূর্ত্তি, সমগ্র হিমাচলের প্রতি নিরীক্ষণের বড় অবকাশ দেয়

না। হিমাচলের বিরাট্ মূর্ত্তির শোভা হৃদগত করিতে হইলে যেমন দূরে থাকিয়া তাহার তুঙ্গ শিখররাজির দিকে অবলোকন আবশ্যক, সেইরূপ রামায়ণ মহাভারতের বিশাল মহাকাব্যের মধ্যে অসংখ্য খণ্ড কাব্য নিবিষ্ট রহিয়াছে; অনেক বনজঙ্গল ভেদ করিয়া, অনেক প্রস্তরকঙ্কর অতিক্রম করিয়া, অনেক চড়াই উত্‌রাই পার হইয়া, ক্লান্তশরীরে সেই সকল খণ্ড কাব্যের সৌন্দর্য্যদর্শনে অধিকারী হইতে পারিলে, দর্শকের মন আনন্দরসে অভিপ্লুত হয়, সন্দেহ নাই; সেই সকল খণ্ড কবিতার উপমাও অন্যত্র দুর্লভ, সন্দেহ নাই; কিন্তু সমগ্র মহাকাব্যের মাহাত্ম্য উপলব্ধির বিষয়ে সেই খণ্ড কাব্যের আলোচনা বিশেষ সাহায্য করে না। সমগ্র মহাকাব্যের মহিমা উপলব্ধি করিতে হইলে, যেন মহাকাব্য হইতে কতকটা দূরে থাকাই সঙ্গত। সেই সকল খণ্ড কাব্যের খণ্ড সৌন্দর্য্যকে চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরাইয়া মহাকাব্যের বিশালায়তনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাই সঙ্গত।

আমাদের মধ্যে অনেকেই মূল মহাকাব্য পড়েন নাই, কিন্তু সকলেই দূর হইতে সেই মহাকাব্য দেখিয়াছেন; ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-অশ্বত্থামার উন্নত চরিত্র হিমগিরির উন্নত শৃঙ্গের ন্যায় দূর হইতে সকলেরই নেত্রগত হইয়াছে। তথাপি আমরা মহাকাব্যের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি। ইউরোপীয় সমালোচকদের অবস্থা অন্যরূপ। রামায়ণ মহাভারতের ইউরোপীয়গণের লিখিত সমালোচনা পড়িয়া আমাদিগকে নিরাশ হইতে হয়। তাঁহারা আমাদের মত দূর হইতে নয়ন ভরিয়া মহাকাব্যের কাব্য-সৌন্দর্য্য দেখিতে পান নাই; নিকটে গিয়াও সমগ্র মহাকাব্য অধ্যয়নের অবকাশ তাঁহাদের পক্ষে ঘটে না। বিশেষত পর্ব্বতে উঠিবার সময় তাহার বন জঙ্গল, তাহার প্রস্তর কঙ্কর তাঁহাদিগকে ক্লান্ত ও অবসন্ন করিয়া দেয়; তাঁহাদের ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় পরাস্ত হইয়া যায়। তবে যিনি সৌভাগ্যক্রমে কোন একটা প্রদেশের, কোন একটা অঙ্গের শোভাদর্শনে সফল হন, তিনি সেই শোভা বর্ণনা করিয়াই আপনার কাজ শেষ হইল, মনে করেন। মহাভারতের অন্তর্গত শকুন্তলার উপাখ্যান, নলোপাখ্যান, সাবিত্রীর উপাখ্যান প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড কাব্য সৌন্দর্য্যগৌরবে গরিষ্ঠ, সন্দেহ নাই; ইউরোপীয় সমালোচকেরা ঐ সকল উপাখ্যানের প্রশংসা করেন। কিন্তু আমরা জানি, ঐ সকল খণ্ড কাব্যের যতই সৌন্দর্য্য থাক, মহাকাব্যের বিশাল সৌন্দর্য্যের নিকট তাহা স্থান পায় না। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকের লেখনী এই

সকল খণ্ড কাব্যের সমালোচনায় যেমন উদার হইয়া পড়ে, মূল মহাকাব্যের প্রশংসায় তেমন উদারভাব দেখাইতে পারে না।

যাহা পড়িতে হয় না, তাহাই মহাকাব্য; মহাকাব্যের এই লক্ষণ নির্দ্দেশের অর্থ বোধ করি এতক্ষণে অনেকটা স্পষ্ট হইয়া থাকিবে। মহাকাব্য না পড়িলে চলিতেও পারে; কিন্তু যাহা মহাকাব্য নহে, তাহা না পড়িলে একেবারেই চলে না। কালিদাস খুব বড় কবি, হয়ত ব্যাস বাল্মীকি হইতেও বড় কবি; কিন্তু তিনি মহাকাব্য লেখেন নাই। কুমারসম্ভব বুঝিতে হইলে তাহার গল্প শুনিলে চলিবে না, তাহার অনুবাদ পড়িলে চলিবে না; তাহা হইলে মূল কুমারসম্ভব তন্ন তন্ন করিয়া স্কুলের ছাত্রের মত টীকাটিপ্পনী সহ পড়িতে হইবে। নহিলে কুমারসম্ভব পড়াই হইবে না। কালিদাসের ভাষা, কালিদাসের ছন্দ, কালিদাসের ধ্বনি, কালিদাসের নিকটে না গেলে শুনিতে পাইবে না; দূর হইতে তাহার কিছুই বুঝিবে না। কালিদাস শিল্পী; তিনি পাতরের উপর পাতর বসাইয়া সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, শাদা ধপ্‌ধপে মার্ব্বেলের ইটের উপর ইট বসাইয়া দেয়াল তুলিয়াছেন, সেই দেয়ালের গায়ে মণিমাণিক্য-রত্ন-প্রবালের লতাপাতা কাটিয়া তাহাকে বিচিত্র শোভায় অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তিনি তাজমহল গাঁথিয়াছেন, আল্‌হাম্‌ব্রা গাঁথিয়াছেন; সেই সকল কারুশিল্পের শোভা দেখিতে হইলে নিকটে যাইতে হইবে; সকলেও সে শোভা দেখিবে না; সমজ্‌দারের চোখ লইয়া ও সমালোচকের রুচি লইয়া সেখানে যাইতে হইবে। নতুবা দেখিতে পাইবে না ও বুঝিতে পারিবে না।

শেক্‌স্‌পীয়র হয়ত আরও বড় কবি, তাঁহার স্থান হয়ত হোমারেরও অনেক উচ্চে, কিন্তু তিনিও মহাকাব্য লেখেন নাই। গ্রীক কবির হেলেনকে আমরা চোখে দেখি নাই, তাঁহার গল্প শুনিয়াছি মাত্র; কিন্তু যে রূপের আগুনে ট্রয় নগর ভস্মীভূত হইয়াছিল, তাহা আমাদের কল্পনার নেত্রকেও অদ্যাপি ঝলসিয়া দিতেছে। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের নায়িকাগণের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইলে কেবল গল্প শুনিলে বা অনুবাদ পড়িলে চলিবে না। তাহাদিগকে নিকটে গিয়া স্বচক্ষে দেখিতে হইবে; সমজদারের চোখ লইয়া দেখিতে হইবে। শেক্‌স্‌পীয়রের ভাষা, তাঁহার ছন্দ, তাঁহার ধ্বনি হইতে দূরে থাকিয়া শেক্‌স্‌পীয়রকে চিনিবার আশা করা যায় না। এক একবার মনে হয় বটে, শেক্‌স্‌পীয়রের এক একখানা খণ্ড কাব্যের ভিতর হইতে

যেন সাগরকল্লোলের অথবা ভূগর্ভতরঙ্গের মত শব্দ বাহির হইয়া আসিতেছে, যেন দাবদাহের গম্ভীর শব্দ দূর হইতে কানে বাজিতেছে, কিন্তু নিকটে না গেলে সে শব্দের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। শেক্‌স্‌পীয়র হয়ত একালের মহাকবি, কিন্তু তিনি মহাকাব্য রচনা করেন নাই।

কৃত্রিম পদার্থের সৌন্দর্য্যের সহিত স্বাভাবিক পদার্থের সৌন্দর্য্যের ঠিক তুলনা হয় না। কোন্ সৌন্দর্য্য বড়, তাহার তুলাদণ্ডে পরিমাপ চলে না। মনুষ্যপ্রতিভা সময়ে সময়ে যেন বিধাতার সৃষ্টিকেও পরাস্ত করে। সেই জন্য কৃত্রিমের পার্শ্বে স্বাভাবিককে দাঁড় করাইয়া কে ছোট, কে বড়, নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া সমীচীন নহে। কৃত্রিমে যাহা আছে, তাহা স্বাভাবিকে থাকে না; আবার স্বাভাবিকে যাহা থাকে, তাহা কৃত্রিমে থাকে না। উভয় বস্তু ভিন্ন পর্য্যায়ের। মহাকাব্য চতুরাননের বদন হইতে বিনির্গত হয় নাই, উহা মনুষ্যেরই রচনা, সন্দেহ নাই; কিন্তু উহাতে একটা স্বাভাবিকত্ব আছে, তাহা সেই মনুষ্যের রচিত অন্য উৎকৃষ্ট বা উৎকৃষ্টতর কাব্যে নাই। তাহাতে বন জঙ্গল, প্রস্তর কঙ্কর থাকিলেও তাহার একটা গৌরব আছে, তাহাকে দূর হইতে চেনা যায়; তাহার গল্প শুনিলে মন অভিভূত হয়; তাহাকে বুঝিতে হইলে সমজদার হইতে হয় না, শিক্ষানবিশী করিতে হয় না; চশমা পরিতে হয় না; স্বভাবদত্ত চক্ষু লইয়াই তাহাকে চিনিতে ও বুঝিতে পারা যায়। এই অলঙ্কারহীন, পরিচ্ছদহীন মুক্ত স্বাভাবিকতাই মহাকাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ। মনুষ্যের সভ্যতা, অন্তত বর্ত্তমান কালের সভ্যতা অত্যন্ত কৃত্রিম বস্তু। এই কৃত্রিমতার আমি নিন্দা করিতেছি না; হয়ত কৃত্রিমতাই মনুষ্যত্বের প্রধান লক্ষণ; হয়ত কৃত্রিমতা মনুষ্যত্ব হইতে অভিন্ন; অন্তত মানবিকতার সহিত পাশবিকতার যাহা পার্থক্য, তাহারই নাম কৃত্রিমতা। সুতরাং কৃত্রিমতার নিন্দা করিলে মনুষ্যের বিশিষ্ট ধর্ম্মকেই নিন্দা করা হয়। এই জন্য কৃত্রিমতার নিন্দা করিতে চাহি না। কৃত্রিমতাই মনুষ্যের গৌরব বলিলেও বিস্মিত হইব না। কৃত্রিমতাতেই মনুষ্যত্বের চরম স্ফূর্ত্তি, তাহাও বলা যাইতে পারে। কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিতেই মানবপ্রতিভার পরাকাষ্ঠা, তাহাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তথাপি কৃত্রিম শিল্প কৃত্রিম। উহাতে চাকচিক্য আছে, গাঁথনি আছে, ওস্তাদি আছে ও সকলের উপরে উহার চেষ্টাকৃত নির্ম্মাণ-কল্পনায়—উহার ডিজাইনে মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের আভাস আছে; আর যাহা স্বাভাবিক, তাহাতে চাকচিক্য নাই, গাঁথনি নাই, তাহা

অযত্নকৃত অযথাবিন্যস্ত ঝটিকাভগ্ন বারিধারাবর্ষিত বৃহৎ দ্রব্যের সমাবেশে গঠিত। মানুষের বর্ত্তমান কালের সভ্যতা অত্যন্ত কৃত্রিম। সেই জন্য মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ যে স্বাভাবিকতা, সেই স্বাভাবিকতার অভাবে বোধ হয় বর্ত্তমান সভ্যতায় মহাকাব্যের উৎপত্তির প্রতিরোধ করে। আধুনিক সভ্যতা কবিত্ব সৃষ্টির অন্তরায় নহে, কিন্তু মহাকাব্য সৃষ্টির বোধ হয় অন্তরায়। এখন কর্ম্মযন্ত্রে ভ্রমমাণ মনুষ্যকে তাহার নিরবকাশ জীবনের কথঞ্চিৎলব্ধ অবসরের ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তগুলিকে খণ্ড কাব্যের ও খণ্ড সৌন্দর্য্যের জ্বালা ও বৈচিত্র্য দ্বারা পূর্ণ করিতে হয়, বৃহৎ পদার্থে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া তাহার বিশাল সৌন্দর্য্যের উপভোগের অবকাশ থাকে না। সেই জন্যই বোধ হয়, সভ্য সমাজে শেক্‌স্‌পীয়র জন্মিয়াছেন, কিন্তু হোমার জন্মেন নাই বা বাল্মীকি জন্মেন নাই। ইহাতে মনুষ্য জাতির ক্ষতি কি লাভ, তাহা গণনার অবসর লেখকের নাই। আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাতেই আমাদিগকে তৃপ্ত থাকিতে হইবে। সংসারের স্রোত উল্টাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা সহস্র চেষ্টা করিলেও মহাকবির উৎপাদনে সমর্থ হইব না। তবে কাল নিরবধি ও পৃথ্বী বিপুলা; আবার যদি কালের স্রোতে মহাকবির উৎপত্তি ঘটে, তাহাতেও আমরা বিস্মিত হইব না। ('বঙ্গদর্শন,' পৌষ ১৩০৯)

আমিষ ভোজন

আমিষ ভোজনের কর্ত্তব্যতা লইয়া অনেক বিচার হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও যে মীমাংসা হইবে, লেখকের এরূপ দুরাশা নাই।

তিন দিক্ হইতে এই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। শরীর রক্ষার কথা বিজ্ঞানের বিষয়; খরচের কথা অর্থশাস্ত্রের বিষয়; তার পর ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা।

বিজ্ঞানের কথাটা আগে শেষ করা যাক। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, মনুষ্যশরীরের উপাদান অনেকটা কয়লা, অনেকটা জল, খানিকটা ছাই। কাজেই খাদ্য সামগ্রীতে এই তিন পদার্থ থাকা দরকার। তিন উপাদানের মধ্যে কয়লাটা এক অর্থে প্রধান। শরীরের তাপ রক্ষার জন্য কয়লা পোড়াইতে হয়; কাজকর্ম্ম করিতে হইলে কয়লা পোড়াইতে হয়; সেই জন্য শরীরের মধ্যে প্রতিনিয়ত কয়লা পোড়ে। শরীর একটা এঞ্জিন সদৃশ। সেই এঞ্জিনটা গঠন করিতে খানিকটা কয়লা ও ছাই ও জলের প্রয়োজন। এই তিন সামগ্রী একত্রযোগে মনুষ্যশরীর নির্ম্মাণে লাগে।

দুঃখের বিষয়, আমরা কয়লা ও ছাই, এই দুই পদার্থ হজম করিতে পারি না, অন্য উপায়ে শরীরমধ্যে গ্রহণ করি। উদ্ভিদেরা বায়ু হইতে কয়লা সংগ্রহ করে, মাটি হইতে ছাই ও জল সংগ্রহ করে। এই তিন পদার্থ মিশিয়া জটিল উদ্ভিদদেহ নির্ম্মিত হয়। প্রাণী আবার উদ্ভিদদেহ আত্মসাৎ করিয়া ঐ তিন পদার্থকে আরও জটিলতর করিয়া মিশাইয়া ফেলে ও আপন শরীর নির্ম্মাণ করে। সামান্য কয়লা, ছাই ও জলকে উদ্ভিজ্জে পরিণত করিতে বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক, স্বয়ং সূর্য্যদেব ইহাতে সহায়। উদ্ভিদদেহকে প্রাণিদেহে পরিণত করিতেও প্রয়াসের দরকার; কিন্তু প্রাণিদেহকে প্রাণিদেহে পরিণত করিতে তত প্রয়াস লাগে না। প্রাণীর দুই শ্রেণী। এক শ্রেণী নিরুপায় ও নির্ব্বোধ; ইহারা কায়ক্লেশে উদ্ভিজ্জ আহার করিয়া উদ্ভিদদেহকে প্রাণিদেহে পরিণত করে। আর এক শ্রেণী চালাক; ইহারা বিনা আয়াসে বা অনায়াসে অন্য প্রাণীর দেহকে আত্মসাৎ করিয়া নিজদেহে পরিণত করে। ফলকথা উদ্ভিজ্জ হইতে প্রাণিদেহ নির্ম্মাণে যতটা কষ্ট, এক প্রাণীর দেহ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া অন্য প্রাণীর দেহে পরিণতি পাইতে তত কষ্ট নাই। মোটের উপর মাংস হজম সহজ; উদ্ভিদ হজম করা কষ্টসাধ্য।

উদ্ভিজ্জাশী মাটি হইতে খরচ করিয়া ইট তৈয়ার করিয়া ঘর বানান ; মাংসাশী একেবারে তৈয়ারি ইট সংগ্রহ করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করেন। উপমাটা অবশ্যই অত্যন্ত মোটাগোছের হইল।

ফলে উদ্ভিজ্জ খাদ্যের অনেকটা বর্জ্জন করিতে হয় ; বাকীটাকেও প্রয়াস সহকারে রক্তমাংসাদিতে পরিণত করিতে হয়। প্রাণিজ খাদ্যে ততটা বর্জ্জনীয় অংশও নাই, পরিণতির প্রয়াসটাও কম। এ সকল শরীরবিজ্ঞান-সম্মত স্থূল কথা ; ইহা লইয়া বিবাদ করিলে চলিবে না। সংক্ষেপে ইহার অর্থ এই যে, একরাশি উদ্ভিজ্জ ভোজনে যে ফল, অল্প মাত্র মাংস ভোজনেও সেই ফল। রাশি রাশি পদার্থ ভোজন করিতে হয় বলিয়াই প্রধান প্রধান উদ্ভিজ্জাশী জন্তুর পাকযন্ত্রও প্রকাণ্ড, সমস্ত শরীরের আয়তনও মোটের উপর প্রকাণ্ড। গরু, মহিষ, ঘোড়া, উট, হাতী প্রভৃতি উদাহরণ। প্রধান প্রধান মাংসাশী জীবের পাকযন্ত্রও ছোট, শরীরও ছোট। সিংহ ব্যাঘ্রাদি উদাহরণ। এই হিসাবে আমিষ ভোজনে লাভ ; উদ্ভিজ্জ ভোজনে লোকসান।

কোন কোন উদ্ভিদের কোন কোন অংশ প্রায় মাংসের মতই পুষ্টিকর হইতে পারে। ছোলা, মুগ, মসুরী, কলাই প্রভৃতি পদার্থ উদাহরণ। কৃষি দ্বারা এই সকল পুষ্টিকর উদ্ভিজ্জ কতক পাওয়া যায়। আবার রসায়নসম্মত উপায়ে সাধারণ উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে মাংসের মত বা মাংসের অপেক্ষাও পুষ্টিকর পদার্থ তৈয়ার করা না যাইতে পারে, এমন নহে। কিন্তু কৃষিলব্ধ ও রাসায়নিক উপায়লব্ধ পুষ্টিকর খাদ্য সম্প্রতি তেমন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। কাজেই সে উপদেশ নিষ্ফল।

মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য কি? উদ্ভিজ্জের মধ্যে ধান, গম প্রভৃতি শস্য, ছোলা মুগ প্রভৃতি কলাই ও নানাবিধ ফল মূল সম্প্রতি মনুষ্যের খাদ্য। এই সমস্ত দ্রব্য কৃষিলব্ধ। মনুষ্যের আদিম অবস্থায় এ সকল দ্রব্য পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল না ; মনুষ্য কৃষিবিদ্যা দ্বারা এ সকলের একরকম সৃষ্টি করিয়াছে বলা যাইতে পারে। উদ্ভিজ্জাশী ইতর জন্তু ঘাস পাতা খায়, তাহা মনুষ্যের পাকযন্ত্রের উপযোগী নহে। কাজেই মনুষ্যের আদিম কালে প্রাণিজ খাদ্যই প্রধান ছিল সন্দেহ নাই, একালেও অসভ্য ও বন্য মনুষ্য মৃগয়াজীবী। যাহাদের পশুপালন জীবিকা, তাহাদেরও প্রধান খাদ্য পশুমাংস। পশুহত্যায় সাহায্যের জন্যই আরণ্য বৃকের কুক্কুরত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ভোজনার্থই গোমেষাদি পশু গ্রাম্যত্ব লাভ করিয়াছে। ফলে মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য

প্রাণিমাংস। প্রাণিমাংস যেখানে কুলায় নাই, যেখানে ভূমি উর্ব্বরা ও প্রকৃতি অনুকূল, সেইখানে মনুষ্য বুদ্ধির জোরে কৃষিবিদ্যা সৃষ্টি করিয়া বিবিধ আরণ্য অখাদ্য উদ্ভিজ্জকে মনুষ্যোপযোগী খাদ্য দ্রব্য উৎপাদনে সমর্থ করিয়া লইয়াছে। তথাপি কৃষিজীবী সভ্যতম সমাজেও মনুষ্য অদ্যাপি বহুল পরিমাণে মাংসভোজী, তাহার কারণ কি?

সভ্য সমাজে মনুষ্যসংখ্যা এত বেশী যে, কৃষিজাত দ্রব্যে কুলায় না। সেই জন্য ঘাস পাতা প্রভৃতি যে সকল উদ্ভিজ্জ মানুষের অখাদ্য, তাহাকে পশুসাহায্যে পশুমাংসে পরিণত করিয়া মনুষ্য কাজে লাগায়। সভ্য সমাজে মানুষ উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ খাদ্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতেছে, তথাপি কুলাইতেছে না; সভ্যতম সমাজেও বিস্তর লোক অর্দ্ধাশনে বা অনশনে থাকে। তাহার মূল কারণ আহারসামগ্রীর অপ্রাচুর্য্য।

তিনটা কথা পাওয়া গেল। মাংস উদ্ভিজ্জের অপেক্ষা পুষ্টিকর; মাংস মনুষ্যের নির্দ্দিষ্ট খাদ্য; কৃষিজাত উদ্ভিজ্জ কোন সমাজের পক্ষে যথেষ্ট ও প্রচুর নহে। সুতরাং মনুষ্যের প্রবৃত্তি মাংসের দিকে। মনুষ্য প্রাকৃত নিয়মে জীবন রক্ষার জন্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মাংস ভোজনে বাধ্য।

এই কয়টি কথার প্রতিকূলে বিরোধ উত্থাপন ভ্রম। তথাপি কেহ কেহ বিবাদ তুলেন।

কেহ বলেন, অনেক নিরামিষাশী ব্যক্তিকে সুস্থ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী দেখা যায়। এটা কোন কাজের কথা নহে। মনুষ্যের দীর্ঘজীবিত্ব ও স্বাস্থ্য এত বিভিন্ন কারণে নিয়মিত হয় যে, ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের উদাহরণ দ্বারা ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা চলে না।

কেহ দেখান, উদ্ভিজ্জাশী জীবজন্তু দীর্ঘজীবী; যেমন হাতী ঘোড়া, ইত্যাদি। এ কথাটাও বিজ্ঞানসম্মত নহে। জীববিজ্ঞান অন্যরূপ ব্যাখ্যা দেয়। আহার ও পরমায়ুর মধ্যে সম্বন্ধ আছে সন্দেহ নাই। উপরেই বলিয়াছি, উদ্ভিদজীবী জীবের কলেবরও বৃহৎ হয়; বৃহৎ কলেবরের সহিত দীর্ঘ পরমায়ুরও একটা সম্বন্ধ আছে, তাহা জীববিজ্ঞান স্বীকার করে। ইহার ব্যাখ্যা হার্বার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থে আছে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ফলে কোন জাতির পরমায়ুর পরিমাণ একেবারে নির্দ্ধারিত হইয়া গেলে আর খাদ্য নির্ব্বাচন দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই। সংক্ষেপে এ তত্ত্ব বুঝান চলে না; ইহার ভিতরে অনেক কথা আছে।

এই পর্য্যন্ত গেল বিজ্ঞানের কথা। অর্থশাস্ত্র কি বলে দেখা যাউক। জীবনরক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক ব্যাপার, উদরের জ্বালার মত জ্বালা নাই। স্বাভাবিক কারণে মনুষ্যের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র ; কারণ, যত মানুষ আছে, তত খাদ্য নাই। মাংস যেখানে সস্তা, মনুষ্য সেখানে মাংসই খাইবে ; ইহাতে আপত্তি নিরর্থক।

নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী পাঠক এত ক্ষণ আমার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন। কিন্তু মাভৈঃ। এখনও আশা আছে! এখনও ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা আছে। আমিষ আহার ধর্ম্মসঙ্গত কি না, এ প্রশ্নের উত্তর আবশ্যক। সচরাচর এইরূপ উত্তর দেওয়া হয়।

মাংস ভোজনে স্বভাব হিংস্র হইয়া থাকে। মাংসভোজী পশু হিংস্র, ক্রূর, নিষ্ঠুর।

কথাটা ঠিক নহে। মাংস খাইয়া সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র স্বভাব পাইয়াছে বলা সঙ্গত নহে। বয়স বাড়িলে ব্যাঘ্রের হিংস্রত্ব বাড়ে, তাহার প্রমাণ নাই। পুরুষানুক্রমে তাহাদের নিষ্ঠুরতা বাড়িতেছে, তাহাও নহে। হিংস্র না হইলে ব্যাঘ্রের চলে না, সেই জন্য ব্যাঘ্র হিংস্র। নিরীহস্বভাব ব্যাঘ্রের এ জগতে স্থান নাই। প্রকৃতি ঠাকুরাণী যে দিন খর নখর ও খরতর দন্ত দ্বারা ব্যাঘ্রাবয়বকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন ও তাহার পাকযন্ত্রকে উদ্ভিজ্জ পরিপাকে সম্পূর্ণ অশক্ত করিয়াছেন, ঠিক সেই ক্ষণেই তাহার স্বভাবকেও নিষ্ঠুর করিয়া দিয়াছেন। মাংসাশী জন্তুর হিংস্র স্বভাব প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল, মাংস ভোজনের আনুষঙ্গিক হইলেও মাংস ভোজনের ফল নহে। মাংস খাইলেই মাথা গরম ও রক্ত গরম হইবে, এমন কোন প্রমাণ নাই। তবে মাংস আহরণের সময় মাথা গরম ও রক্ত গরম হওয়া আবশ্যক, নতুবা মাংস সংগ্রহ চলে না।

মনুষ্যের পক্ষেও তাহাই। মাংস খাইলেই যে প্রকৃতি ক্রূর হইবে, তাহা নহে ; তবে যাহাদের মাংস না হইলে চলে না, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ক্রূর হইতে হয়। কেন না, মাংস সংগ্রহ ব্যাপারটাই নিষ্ঠুর কাজ। মাংস একবার উদরগত হইলে আর যে ক্রূরতা বাড়াইবে, তাহার কোন কথা নাই। যাহার মাংসই প্রধান খাদ্য, মাংস যাহাকে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে, তাহার ব্যবসায় নিষ্ঠুর না হইলে চলিবে না। মাংস ভোজনের ফলে মনুষ্য নিষ্ঠুর হয় না, উগ্রস্বভাব হয় না। শরীরবিজ্ঞান

কিছুই বলে না। হয় কি না, বিনা পরীক্ষায় প্রমাণেরও আশা নাই। সেরূপ পরীক্ষা হইয়াছে কি না জানি না।

হিন্দুর ন্যায় কৃষিজীবী জাতি নিরীহস্বভাব ; কেন না, হিন্দুর দেশে কৃষিলব্ধ খাদ্য এত জন্মিয়া থাকে যে, মাংস সংগ্রহের তেমন প্রয়োজন নাই। ইংরাজ প্রভৃতি উগ্রস্বভাব ; কেন না, তাহাদের দেশে যে পরিমাণ শস্য জন্মে, তাহাতে সকলের উদরের জ্বালা থামে না। কাজেই উহাদিগকে নিষ্ঠুর পশু-হত্যা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আজকাল স্বদেশজাত উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ একত্র করিলেও উহাদের আহার সঙ্কুলান হয় না ; সেই জন্য উহারা স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাইতেছে ও বিদেশের লোককে ঠেঙ্গাইয়া তাহাদের মুখের আহার কাড়িয়া লইতেছে। এই ব্যবসাটাই নিষ্ঠুর ; উদরের জ্বালায় তাহাদিগকে নিষ্ঠুর হইতে হয়। অনেকে বলেন, শীতপ্রধান দেশে অধিক মাংস আবশ্যক। এ কথার মূল কি, তাহা জানি না। কথাটা বোধ হয় বিজ্ঞানসম্মত নহে। ইউরোপীয়ের মাংসাহারের সহিত তাহাদের দেশের শীতাধিক্যের মুখ্য সম্বন্ধ নাই। মাংস শীত নিবারণে সাহায্য করে না। উদ্ভিজ্জের অভাবে উহারা মাংস খায় ; সেই মাংস সংগ্রহের জন্য তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ক্রূরস্বভাব হইতে হইয়াছে। মাংস ভোজন করিয়া উহারা ক্রূর-স্বভাব হয় নাই। সংগ্রহ ও ভোজন দুইটা পৃথক্ ব্যাপার। সংগ্রহকারী নিষ্ঠুর ; ভোজনকারী নিষ্ঠুর না হইতেও পারে। তবে যিনি ভোজন করেন, তাঁহাকেই অনেক সময় সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, আবার স্বয়ং সংগ্রহ না করিতে পারিলে অপরের দ্বারা সংগ্রহ করিতে হয় ; স্বয়ং অন্তরালে থাকিয়া সংগ্রহ কার্য্যের অনুমোদন ও সাহায্য করিতে হয়। সুতরাং তিনি গৌণভাবে এই নিষ্ঠুর ব্যবসায়ের জন্য দায়ী।

কথাটা দাঁড়াইল এই। মাংসভোজনে মানসিক বৃত্তিসকল উত্তেজিত হয়, তাহার সম্যক্ প্রমাণ নাই, তবে মাংস আহরণে নিষ্ঠুরতা আবশ্যক। এবং যিনি স্বয়ং মাংস আহরণ করেন না, অন্যের আহৃত মাংস ভোজন করেন, তিনিও গৌণভাবে নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। নিষ্ঠুরতা যদি অধর্ম্ম হয়, তিনি এই অধর্ম্মের অংশতঃ ভাগী, তাহার সন্দেহ নাই।

আমরা উপরে বলিয়াছি, মাংস ভোজনে শরীরের বৃদ্ধি আছে ; স্বাস্থ্যের উন্নতি আছে ; দেশ কাল ভেদে মাংস নহিলে জীবন রক্ষাই চলে না। এমন আহার মাংসভোজনে অধর্ম্ম আছে কি না? উত্তর দেওয়া তত

সহজ নহে। 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।' নতুবা মনুষ্যসমাজে এ বিষয়ে এত মতভেদ কেন ?

ইউটিলিটি ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে; লোকহিতই ধর্ম্ম। কিন্তু কোন একটা কার্য্য ধর্ম্মসঙ্গত স্থির করিতে গিয়া যিনি ক্ষতি লাভ গণনার হিসাব করিতে বসেন, এই কার্য্যে লোকহিত হইবে কি না, বিবিধ যুক্তি ও বিবিধ বিজ্ঞানের সাহায্যে অঙ্কপাত করিয়া গণনা করিতে বসেন, তাঁহার মত নির্ব্বোধ দ্বিতীয় নাই। এরূপ গণনা অসম্ভব। এই বিচারে গণনার আয় না লইয়া আমাদের সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কি বলে, তাহার সন্ধান লওয়াই বিধেয়। ইংরাজিতে যাহাকে কন্‌শেন্‌স্ বলে, আমি তাহাকেই সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলিতেছি। এ প্রবৃত্তিই যে আবার সকল লোকের পক্ষে একই রকম ও এই প্রণালীতেই যে সর্ব্বত্র খাঁটি উত্তর পাওয়া যাইবে, কোথাও ঠকিতে হইবে না, তাহাও আমি বিশ্বাস করি না। চোরের সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে আমার সাহস হয় না। তবে ধর্ম্ম নিরূপণের সময় মোটের উপর ইউটিলিটির হিসাব ও ক্ষতি লাভ গণনা অপেক্ষা ইহার উপর নির্ভরই শ্রেয়ঃ।

নিষ্ঠুরতা যতই আবশ্যক হউক না কেন, সাধু লোকের সম্বন্ধে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিষ্ঠুরতার প্রতিকূল। নিষ্ঠুরতার দিকে সাধু লোকের অনুরাগ হইতে পারে না। অথবা নিষ্ঠুরতায় যার যত বিরাগ, সে তেমনই সাধু। মনুষ্যের প্রতি নিষ্ঠুরতা সর্ব্বতোভাবে সাধু প্রকৃতির পক্ষে কষ্টকর; ইতর জীবের প্রতি দয়াও সৎসম্মত। এমন কি, সাদা চামড়ার মধ্যেও সময়ে সময়ে পশুপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

পাঠক মহাশয় ক্ষমা করিবেন, শ্বেত চর্ম্মের অভ্যন্তরে যে বিশুদ্ধ মানবপ্রেম বর্ত্তমান থাকিতে পারে, সহস্র ঐতিহাসিক উদাহরণ সত্ত্বেও আমি ইহা সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করিতে পারি না। এই ভয়ানক অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কার হইতে মুক্তিলাভ আমার পক্ষে একরকম অসম্ভব। ইতিহাস ও কোন একটা পাশ্চাত্য ফিলানথ্রপির প্রকৃত উদাহরণ সম্মুখে ধরিলেই সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপমধ্যে উনিশ শত বৎসরের খ্রীষ্টানির ধারাবাহিক রক্তাঙ্কিত চিত্রপট সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলে।

মানবপ্রেম সম্বন্ধে যাহাই হউক, ইউরোপের লোকেও পশুক্লেশনিবারিণী সভা স্থাপন দ্বারা এবং পাস্তুর-প্রবর্ত্তিত চিকিৎসাপ্রণালীর বিরোধাচরণ

করিয়া পশুপ্রেমের পরিচয় দেন; কেহ কেহ বা আমিষাহার বর্জ্জনের ফ্যাশন তুলিয়া ইন্দ্রিয়সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখান। সুতরাং জীবহিংসা ও জীবের প্রতি নিষ্ঠুরতা যে সাধু জনের সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে পীড়া দেয়, তাহাতে সংশয় নাই। ইউটিলিটির হিসাব ত্যাগ করিয়া এই ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিলে ধর্ম্মমীমাংসা যদি সুকর হয়, তবে জীবহিংসা অধর্ম্ম। মাংস ভোজনে জীবহিংসার প্রশ্রয় দেয়, সুতরাং জীবহিংসা অধর্ম্ম। জীবের মাংস সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হইতে পারে; তথাপি জীবহত্যা অধর্ম্ম।

আমাদের হিন্দু সমাজের এ বিষয়ে মত কি, তাহা বিবেচ্য। 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' এই মত এই দেশেই প্রচারিত হইয়াছিল; খ্রীষ্টানের দেশে নহে। ব্রাহ্মণ-শাসিত, সমাজের উচ্চতর স্তরে হিংসার প্রতি যতটা বিরাগ আছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও ততটা আছে কি না জানি না। অন্ততঃ এ দেশের বৃহৎ মানবসম্প্রদায় যে ভাবে জীবহিংসা ও আমিষাহার বর্জ্জন করিয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও তেমন দেখা যায় না। অথচ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত অহিংসাধর্ম্মের স্থানে স্থানে বিরোধ দেখা যায়। এই ঘটনাটার আর একটু বিচার আবশ্যক।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মূল বেদ। বেদ পশুহিংসার বিরোধী নহে। বৈদিক যজ্ঞে পশুহত্যার ব্যবস্থা ছিল। ঋষিরা মাংসভোজী ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, একালে যে মাংস হিন্দুর পাতিত্যজনক, ঋষিদের নিকট তাহাও উপাদেয় ছিল। একালে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক উপাসনা বৈদিক যজ্ঞের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। দেবোদ্দেশে পশুহত্যা এই সকল উপাসনাতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। একালে অনেক ব্রাহ্মণসম্প্রদায় মাংস বর্জ্জন করিয়াছেন, অনেকে দেবোদ্দিষ্ট মাংস ভিন্ন অন্য মাংস খান না, তথাপি মাংস ভোজন হিন্দুর বর্জ্জনীয়, এরূপ ব্যবহার নাই। পিতৃশ্রাদ্ধে মাংস ব্যবহার অদ্যাপি প্রচলিত। আয়ুর্ব্বেদ ও বৈদিক শাস্ত্রে বিবিধ মাংসের গুণকীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা আছে। বলা বাহুল্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলে আয়ুর্ব্বেদ এরূপ বিধানে সাহসী হইতেন না। শাস্ত্রে স্পষ্ট নিষেধ নাই, স্থানবিশেষে স্পষ্ট ব্যবস্থা আছে; অথচ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি মাংসভোজনের বিরোধী; এ স্থলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত অহিংসাধর্ম্মের সম্বন্ধ বিষয়ে খটকা উপস্থিত হয়।

এই খটকা বহু দিন পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছিল। অন্ততঃ মনুসংহিতা ও মহাভারত রচনার সময় শাস্ত্রের সহিত সহজ ধর্ম্মের এই বিষয়ে বিরোধ

উপস্থিত হইয়াছিল। অহিংসাধর্ম্ম বৌদ্ধগণের প্রবর্ত্তিত মনে করিবার সম্যক্ কারণ নাই। বুদ্ধদেব স্বয়ং মাংসভোজন একেবারে নিষেধ করিয়া যান নাই। শ্রমণসম্প্রদায়মধ্যে মাংসভোজন প্রথা ছিল। একালের বৈদেশিক বৌদ্ধেরা মাংসভোজনে কুণ্ঠিত নহেন। তবে করুণাসিন্ধু ভগবান্ শাক্যমুনি বৈদিক যজ্ঞে পশুহত্যার নিন্দা করিয়াছিলেন; এ দেশে অহিংসা-ধর্ম্ম প্রচলনের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অস্বীকার করিলে চলিবে না।

মনুসংহিতাকার বড়ই গোলে পড়িয়াছিলেন। তিনি বৈদিক ধর্ম্মের পক্ষপাতী; বৈদিক আচার অব্যাহত রাখিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা; অথচ তাঁহার মনে বলিতেছে, জীবহত্যা কাজটা ভাল নহে। বৈদিক ব্যবহার লোপে তিনি সাহসী হয়েন নাই; যজ্ঞানুষ্ঠান ভিন্ন অন্যত্র জীবহত্যার তিনি নিন্দা করিয়াছেন; শেষ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন—"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"

এই মীমাংসা একালের লোকের পছন্দ হইবে না। একালের লোকে বলিবেন, মনুসংহিতাকার ভীরুতার পরিচয় দিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আদেশ সত্ত্বেও তিনি প্রাচীন শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘনে সাহসী হয়েন নাই। একালের যুক্তি যে, ধর্ম্মনির্ণয়ে শাস্ত্রের ব্যবস্থা গ্রাহ্য নহে। সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বা কন্‌শেন্‌স্ যাহা অনুমোদন করিবে, তাহাই গ্রাহ্য। সমস্ত সমাজসংস্কারকের মুখে এই এক কথা। হিন্দু সমাজ শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘনে সাহসী হয় না; কাজেই সংস্কারকগণ হিন্দু সমাজের নিপাত কামনা করেন।

আমরা হিন্দু সমাজের ওকালতিতে প্রবৃত্ত হইব না। তবে এই বিবাদটার সমালোচনা করিব। বিষয়টা আলোচ্য; কেন না, কেবল হিন্দু সমাজ কেন, সকল সমাজেই শাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির এই বিরোধ দেখা যায়।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মূল বেদ। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম শব্দটা ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যবহার করিতেছি। কেন না, আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মে বেদবিরোধী অনেক উপাদান প্রবেশ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মূল বেদ। 'ধর্ম্ম' শব্দ ও 'বেদ' শব্দের একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। ধর্ম্ম বলিলে ঠিক রিলিজন বুঝায় না। রিলিজনের মুখ্য সম্বন্ধ ঈশ্বর, পরকাল ও অতিপ্রাকৃতের সহিত। ধর্ম্মের সম্বন্ধ মনুষ্যের সমগ্র জীবনের সহিত। আমরা সম্পূর্ণ ঐহিক স্বার্থের জন্য আহার বিষয়ে ডাক্তারের ব্যবস্থা লই, রাজাকে নির্দ্দিষ্ট খাজনা দিয়া থাকি; সম্পত্তিতে স্বত্ব

লইয়া প্রতিবাদীর সহিত মোকদ্দমা করি। এ সকল কার্য্য রিলিজনের অন্তর্গত নহে। কিন্তু ইহা খাঁটি ধর্ম্মের অন্তর্গত। এই সকল কার্য্য যথাবিধানে সম্পাদন না করিলে অধর্ম্ম। ডাক্তার ও উকীল ও ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রাহ্মণের শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মব্যবস্থাপক। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মশাস্ত্রের কিয়দংশ ডাক্তারী ও কিয়দংশ আইন। অনেকে এ জন্য বিস্মিত হন, অনেকে গালি দেন। আমরা বিস্ময়ের বা গালি দেওয়ার কারণ দেখি না। ব্যবহার সঙ্গত হইতেছে কি না, সে কথা স্বতন্ত্র। ধর্ম্ম শব্দটা রিলিজন অর্থেই ব্যবহার করিতে হইবে, এমন কোন আইন নাই। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম মনুষ্যের সমগ্র কর্ত্তব্যসমষ্টি।

বেদ শব্দে সঙ্কীর্ণ অর্থে কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ বুঝায়। প্রশস্ত অর্থে বেদ শব্দ গ্রহণ করা আবশ্যক। ইংরাজি প্রতিশব্দ tradition অনেকটা কাছাকাছি আসিতে পারে। আরও প্রশস্ত করিয়া মনুষ্য জাতির অথবা আর্য্য জাতির ধর্ম্মমার্গে ও কর্ম্মমার্গে সমগ্র অতীত কাল ধরিয়া উপার্জ্জিত অভিজ্ঞতার নাম বেদ। এই বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য, অনাদি। ইহার আদি পাওয়া যায় না। অন্ততঃ মনুষ্য জাতির যে দিন আরম্ভ, এই অভিজ্ঞতার সেই দিন আরম্ভ। কিংবা ইহার আরম্ভ আরও পূর্ব্বে। ব্রাহ্মণের শাস্ত্র খুঁজিলে ডারুইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনতত্ত্ব মিলিতে পারে, এরূপ আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু প্রাকৃতিক অভিব্যক্তিতে ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পৃথিবীর অন্য কোন মনুষ্য সম্প্রদায়ের এই বিশ্বাস নাই। ব্রাহ্মণের ইহাই প্রধান গৌরব। ব্রাহ্মণের মতে মনুষ্যের একদিনে সহসা সৃষ্টি হয় নাই। মনুষ্যের অভিজ্ঞতাও একদিনে জন্মে নাই। কোন্ তারিখে এই অভিজ্ঞতার বীজ বপন হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় নাই। হয়ত জগতের যে দিন আদি, এই অভিজ্ঞতারও সেই দিন আরম্ভ। কাজেই বেদ অনাদি; ঋষিগণ বেদের দ্রষ্টা বা শ্রোতা; স্বয়ং জগন্নিয়ন্তা ব্রহ্মাও বেদের স্রষ্টা নহেন। খ্রীষ্টানি হিসাবের সৃষ্টি ব্রাহ্মণ মানিতেন না। জগতের সৃষ্টি হয় নাই; বেদেরও সৃষ্টি হয় নাই। বেদ অপৌরুষেয়।

মনুষ্য তাহার প্রাচীন বহু কালের উপার্জ্জিত অভিজ্ঞতার ফলে কতকগুলি সামাজিক নিয়মের অধীন হইয়া সমাজ বাঁধিয়া বাস করে। এই সকল নিয়মের পরিচালনার ভার কতক রাজার উপর, কতক যাজকের উপর, কতক জনসাধারণের উপর। কিন্তু তাঁহারা নিয়ন্তা ও পরিচালক, কেহই স্রষ্টা

নহেন। এই সকল নিয়ম প্রকৃতির অঙ্গীভূত; প্রাকৃতিক নিয়মে বিকাশ পাইয়াছে, বিকৃত হইতেছে, লয় পাইবে। কাজেই ব্রাহ্মণের চক্ষে এই সকল সামাজিক নিয়ম অর্থপূর্ণ ও মাহাত্ম্যে মণ্ডিত। সহস্র যুগের অতীত ইতিহাস এই সকল সামাজিক নিয়মের শনৈঃ শনৈঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই সকল নিয়মের সমষ্টি ধর্ম্ম। প্রকৃতির মহাযন্ত্রে যে নিয়ম, যে শৃঙ্খলা, যে ব্যবস্থা আছে, মানবসমাজের অন্তর্গত নিয়মসমষ্টি তাহার অন্তর্গত। ধর্ম্ম জগদ্বিধানের একটা ভাগ। মাধ্যাকর্ষণের উপর তোমার আমার হাত নাই; সামাজিক নিয়মের উপর আমাদের হাত নাই; ধর্ম্ম অনাদি ও সনাতন ও পুরাতন।

আচার অনুষ্ঠান পরিবর্ত্তনশীল, ধর্ম্মের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু ধর্ম্ম পুরাতন। মাধ্যাকর্ষণে ব্যভিচার নাই, তথাপি পৃথিবী একত্র স্থির নাই। প্রাকৃতিক নিয়মে ব্যভিচার নাই, তথাপি ধরাপৃষ্ঠ যুগ ব্যাপিয়া বিবিধ বিকারে বিকৃত হইয়াছে। সামাজিক নিয়মের ব্যভিচার নাই, ধর্ম্ম সনাতন, তথাপি আচার অনুষ্ঠান পরিবর্ত্তনশীল, ধর্ম্মের মূর্ত্তি মনুষ্যের নিকট দেশকালভেদে বিভিন্ন। দেশকালভেদে নীতি, ইংরাজিতে যাহাকে মরালিটি বলে, তাহাও পরিবর্ত্তিত হয়; দেশকালভেদে আচারও পরিবর্ত্তিত হয়। মনুসন্তানের পুরাতন জ্ঞানসমষ্টিরূপী বেদমধ্যে ধর্ম্ম নিহিত আছে; অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি সহকারে ধর্ম্মের পরিসর বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্রাহ্মণ একাধারে রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল। অতীতের প্রতি ভক্তি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কর্ষিত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট ফলপ্রসূ হইয়াছে। কিন্তু সেই ভক্তি সমাজের গতি রুদ্ধ করে নাই। মনুর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ সনাতন ধর্ম্মের মার্গে অব্যাহত ভাবে চলিয়াছে; বিনা রক্তপাতে বিনা কোলাহলে প্রাচীন আচার প্রাচীন অনুষ্ঠান ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। যে ব্রাহ্মণকে উন্নতির বিরোধী বলে, সে ভারতবর্ষের ইতিহাস অধ্যয়ন করে নাই; সে পৃথিবীর অন্য দেশের ইতিহাস পড়ে নাই; সে চক্ষু সত্ত্বে অন্ধ।

কথাপ্রসঙ্গে বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। পাঠক মার্জ্জনা করিবেন। মনুষ্য অভাবে প্রকৃতির নিয়োগে জীবন রক্ষার জন্য চিরকাল পশুমাংস ভোজন করিয়া আসিতেছে। ইহাতে এক হিসাবে অধর্ম্ম নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সকল মনুষ্যের মতই নির্ব্বিকারচিত্তে মাংস ভোজন করিতেন; কেন না, তাহাই প্রকৃতির ব্যবস্থা, তাহাই মানবের প্রাচীন ধর্ম্ম। দেবতার

প্রীতির জন্য পশুবলি হইত; পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই ইতিহাস; একেশ্বরবাদী ইহুদীরাও জেহোবার মন্দিরে বিবিধ প্রাণী হত্যা করিত। এই কারণে বৈদিক যজ্ঞে হিংসার ব্যবস্থা। শস্যপূর্ণ ভারতভূমিতে কৃষিবৃত্তিপরায়ণ আর্য্যসন্তানের আর তেমন জীবহিংসার প্রয়োজন হয় নাই; জীবের প্রতি দয়াবৃত্তির স্বাভাবিক নিয়মে বিকাশ হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অন্তঃকরণের নূতন ভাবের উদ্বোধন করিল। আশা করিতে পার, মনুষ্য বিজ্ঞানবলে একদিন এমন বলিষ্ঠ হইবে, যে দিন আর নিষ্ঠুর হিংসার প্রয়োজন হইবে না, সে দিন সমগ্র পৃথিবীতে অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবে। এখনও মনুষ্যের সে অবস্থা হয় নাই। মনুষ্যকে জ্ঞানাভাবে ও শক্তির অভাবে অদ্যাপি প্রাচীন হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইয়াছে। অতীতের প্রতি ভক্তিপরায়ণ মনুসংহিতাকার মনুষ্যের প্রাচীন ধর্ম্মের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। নূতন ধর্ম্মকে আগ্রহের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রকৃতি কর্ত্তৃক বঞ্চিত দুর্ব্বল ক্ষুধার্ত্ত মানবকে এই পরম ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া নিষ্ফল। অগত্যা মনুসংহিতাকারের সহিতই বলিতে হয়—

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

('পুণ্য,' বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫)

মাতৃমন্দির*

কেরোসিনের প্রদীপ জ্বালিলে তাহার চিমনির ভিতর হাওয়া জন্মে; আপন ঘরে আগুন দিয়া গ্রামের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড বাধাইলে ছোটখাট একটা ঝটিকার উৎপত্তি হয়। কিন্তু দেশশুদ্ধ লোক জটলা করিয়া দেশব্যাপী সাইক্লোন উৎপাদন করিতে পারে না।

বাঙ্গলা দেশ ব্যাপিয়া যে একটা হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা অতি-বড় বিজ্ঞ ব্যক্তিও অস্বীকার করিতে পারিবেন না; এবং এই হাওয়া যে কেবল আমাদের চেষ্টায় ও ইচ্ছায় জন্মে নাই, তাহাও বলা বাহুল্য। বাক্যবাগীশ বাঙ্গালী ফুৎকার প্রয়োগে পটু, কিন্তু সাত কোটি বাঙ্গালী এক-সঙ্গে ফুৎকার দিলেও বাঙ্গলা দেশে এমন একটা ঝটিকাবর্ত্তের উৎপাদন করিতে সমর্থ হইত না। ঝড় একটা বহিতেছে, তাহা স্বীকার্য্য; প্রত্যক্ষ প্রমাণেও যদি কেহ অস্বীকার করেন, তাঁহাকে আমরা ভারতসচিব সাধু মর্লির বক্তৃতা হইতে কোটেশন তুলিয়া মানাইতে পারিব, এরূপ ভরসা করি।

এই হাওয়ার বেগে নীয়মান হইয়া বাঙ্গলার যত নগণ্য ধূলিকণা, বাঙ্গলার যেখানে যত তৃণাদপি লঘু পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহা এখানে ওখানে সেখানে পুঞ্জীভূত হইতেছে ও স্থানে অস্থানে স্তূপের সৃষ্টি করিতেছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দর্শনে দেখিতে পাইতেছি। বাঙ্গলার ইতিহাসে বর্ত্তমান যুগকে আমরা দল বাঁধার যুগ আখ্যা দিতে পারি। আজিকার হাওয়ার গতি দল বাঁধার দিকে। যিনি যেখানে আছেন, তিনি সমানধর্ম্মা ব্যক্তিকে খুঁজিয়া লইয়া তাহার সহিত দল পাকাইতেছেন। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যাঁহারা রাজনীতির চর্চ্চা করেন, তাঁহারা কংগ্রেসে, কন্‌ফারেন্সে, জেলাসমিতিতে, পল্লীসমিতিতে দল পাকাইতেছেন; যাঁহারা সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী, তাঁহারা সামাজিক কন্‌ফারেন্সে মিলিত হইতেছেন; যাঁহারা সনাতন ধর্ম্মের অনুগত, তাঁহারা ধর্ম্মমহামণ্ডলে সম্মিলিত হইতেছেন; যাঁহারা শিল্পের উন্নতি চান, তাঁহারা দল বাঁধিতেছেন; যাঁহারা শিক্ষার উন্নতি

* ১৩১৪ সালের ১৭ই কার্ত্তিক কাশীমবাজারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের উদ্বোধনকল্পে রামেন্দ্রবাবু বর্ত্তমান প্রবন্ধটি পাঠ করেন। কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন।

চান, তাঁহারা দল বাঁধিতেছেন; আমরা সাহিত্যসেবীরাই কি চুপ করিয় থাকিব? সকলের দেখাদেখি আমরাও জোট বাঁধিয়া এখানে আজ উপস্থিত হইয়াছি। সকলেই যদি দল বাঁধিতে চাহেন, আমরাই বা দল না বাঁধিব কেন? সকলেই যদি হাওয়ার অনুকূলে গা ঢালিয়া দেন, আমরাই বা বসিয়া থাকিব কেন? আমাদের এই সাহিত্য-সম্মিলনকে যদি কেহ গড্ডলিকা-প্রবাহের মত পরের অনুকরণজাত বলিয়া উপহাস করিতে চাহেন, তাহাতে আমরা কর্ণপাত করিব না।

করিব না, কেন না, যে হাওয়ার বেগে নীয়মান হইয়া আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, তাহা বিধাতার প্রেরিত বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। সাত কোটি বাঙ্গালী একযোগে ফুৎকার দিয়া কখনই ইহা জন্মাইতে পারিত না।

আমাদের বন্ধুগণ, যাঁহারা নানা স্থানে নানারূপ দল বাঁধিতেছেন, তাঁহারা সকলেই এক একটা কর্ম্মক্ষেত্র স্থির করিয়া লইয়াছেন। কেহ লোকশিক্ষার ভার লইতেছেন, কেহ শিল্প শিক্ষার ভার লইতেছেন, কেহ কাপড়ের কল চালাইতেছেন, কেহ দেশের অন্ন বাহিরে না যায়, তাহার জন্য প্রাচীর গাঁথিবার কল্পনা করিতেছেন, কেহ সরকারের নিকট রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য ঘোঁট করিতেছেন, কেহ দল বাঁধিয়া সরকারের উপর গোসা করিয়া বসিয়া আছেন, কেহ বা হাতের কাছে কর্ম্ম না পাইয়া স্বরাজ স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেছেন। আমরা সাহিত্যসেবী, আমরা দল বাঁধিয়া কি করিব? আমরা কর্ম্মক্ষেত্র কোথায় পাইব? আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র কিরূপ হইবে?

বলা বাহুল্য, আমাদের দলের সহিত অন্যান্য দলের একটু পার্থক্য আছে। কোন শরীরী জড় পদার্থ লইয়া সাহিত্যের কারবার চলে না, অশরীরী ভাবপদার্থ লইয়া সাহিত্যের কারবার। আমরা ভাবের হাটে বেচা কেনা, লেনা দেনা করিয়া থাকি। আমাদের নিকট যাহার মূল্য অধিক, হাতে তাহা ধরা দেয় না, ছুঁইতে গেলে তাহা ধুঁয়ার মত ও বাষ্পের মত হাত হইতে সরিয়া পড়ে। কঠিন ধরাপৃষ্ঠে পা ফেলিয়া আমরা বিচরণ করি না; আমরা পাখীর মত বায়ুমার্গে উড়িয়া বেড়াই। এই উড্ডয়ন কার্য্যে আমাদের আর কোন লাভ নাই; লাভের মধ্যে কেবল আনন্দ। এই আনন্দের জন্যই আমাদের যা কিছু পরিশ্রম এবং যা কিছু চেষ্টা, এবং বলা বাহুল্য, এই

পরিশ্রম স্বীকারে আমরা কুণ্ঠিত নহি। কেন না, এই চেষ্টাতেই আমাদের জীবনের সাফল্য।

আমরা এই পাখীর দল যে আজ নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত হইয়া এই ছায়ামণ্ডপতলে ঘটা করিয়া পরামর্শ করিতে বসিয়াছি, আমাদের এই সভাভঙ্গ হইলে, তৎপরে আমরা কি করিব? আমাদিগকে আবার ত উড়িতে হইবে, আমরা কোন্ পথে কোন্ দিকে উড়িব? দেশের যে হাওয়া বহিয়াছে, সেই হাওয়ার গতি লক্ষ্য করিয়াই আমাদিগকে উড়িতে হইবে। প্রবাহের অনুকূলে উড়িলেই সুবিধা; এবং সেই দিকে উড়িলেই আমাদের পরিশ্রমেরও লাঘব হইবে। কেবল দেখিতে হইবে, হাওয়ার গতিটা কোন্ দিকে? উহা সুপথে না বিপথে? উহার টান একটা আশ্রয়ের দিকে, না কোন অকূল পাথারে আমাদিগকে নিক্ষিপ্ত করিয়া উহা আমাদের বিহঙ্গ-জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিবে?

সকল দেশেই এক এক সময়ে এক একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে ঝড় বহে। কোন দেশেই অন্তরীক্ষ চিরকাল প্রশান্ত থাকে না। চিরবসন্ত কোন দেশেই বিরাজ করে না। বৎসরে যেমন ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়, মানবসমাজের ইতিহাসে তেমনই যুগের পরিবর্ত্তন ঘটে; এক এক যুগের হাওয়া এক এক দিকে। যুগের যাহা লক্ষণ—যাহাকে যুগধর্ম্ম বলা যায়, হাওয়ার গতি দেখিয়া তাহার নিরূপণ হয়।

আমাদের বাঙ্গলা দেশেও কত বার এইরূপ হাওয়া বহিয়াছে; কত বার কত যুগপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সেই হাওয়ার বেগে নীয়মান হইয়া দেশের লোকে বিক্ষিপ্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে। ভাবের পাথারে তখন তরঙ্গ উঠিয়াছে, কখনও বা পাথারের উপর তুফানের সৃষ্টি হইয়াছে। তাৎকালিক সাহিত্যিকেরা সেই হাওয়াতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন; সেই তরঙ্গ ঠেলিয়া পাথারের মধ্যে তাঁহারা সাঁতার খেলিয়াছেন।

বাঙ্গলা দেশের, বাঙ্গালী জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই; কিন্তু বাঙ্গলা দেশের অতি পুরাতন সাহিত্য আছে। সেই সাহিত্য বাঙ্গালীর পক্ষে অগৌরবের বস্তু নহে। এমন কি, সেই সাহিত্যই বাঙ্গালীর পক্ষে এক মাত্র গৌরবের ধন। চণ্ডীদাস মধুর রসের সুধার ধারা ঢালিয়া যে সাহিত্যকে আর্দ্র করিয়াছেন, রামপ্রসাদ তাঁহার মায়ের চরণে আপনাকে নৈবেদ্যস্বরূপে অর্পণ করিয়া যে সাহিত্যে ভক্তিরসের স্নেহ সেচন করিয়াছেন,

সেই সাহিত্য শিরে ধরিয়া ভবের বাজারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার অধিকারে আমাদিগকে বাধা দিতে কেহ সাহস করিবে না।

বসুমতীর বড়বাজারের প্রদর্শনীতে বাঙ্গালীর পক্ষে আর কোন পণ্য দ্রব্য দেখাইবার আছে কি? ধনপতি সদাগরের ডিঙ্গায় চাপিয়া সিংহল যাত্রার সময়ে যাঁহারা সাত সাগরের জল খাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহিনী তুলিয়া আমরা প্রাচীন বাঙ্গালীর বাণিজ্যের প্রসার প্রতিপন্ন করিতে পারি; কিংবা প্রতাপাদিত্য দিল্লীপতির সহিত লড়াই করিবার পূর্ব্বে আপন পিতৃব্যের মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন, এই প্রমাণে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালীর বাহুবল প্রতিপন্ন করিতে পারি। কিন্তু তথাপি আমার সংশয় আছে যে, প্রাচীন বাঙ্গালীর এই বৈশ্যবৃত্তির বা বীরবৃত্তির উদাহরণ বড়বাজারে অধিক মূল্যে বিকাইবে না। জাতির সহিত জাতির ও রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের জীবনদ্বন্দ্বের বিকট কোলাহল, যাহা শত শতাব্দের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আজ পর্য্যন্ত মানবের ইতিহাসে ধ্বনিত হইতেছে, সেই কোলাহলের মধ্যে বাঙ্গালীর ক্ষীণ কণ্ঠ শ্রুতিগোচর হয় না বলিলেই চলে। বাঙ্গালীর ভবিষ্যতের আশা ও ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা যাহাই হউক, বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসে বাঙ্গালীর বৈশ্যবৃত্তির ও বীরবৃত্তির কীর্ত্তিকথা লইয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত হইতে আমরা কখনই সাহসী হইব না।

নাই বা হইলাম! তজ্জন্য লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইবার হেতু দেখি না। বাঙ্গলার পুরুষপরম্পরাগত সহস্র বৎসরের ধারাবাহিক সাহিত্য রহিয়াছে। সেই সাহিত্য লইয়া আমরা ভবের হাটে উপস্থিত হইব; সেখানে কেহ আমাদিগকে ধিক্কার দিতে পারিবে না।

বাঙ্গলার ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু এই সাহিত্য হইতে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালীর নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় পাই। সেকালের বাঙ্গালী কিরূপে কাঁদিত, কিরূপে হাসিত, তাহার অন্তরের মর্ম্মস্থলে কখন কোন্ স্বরে ধ্বনি উঠিত, তাহার আশার কথা, আকাঙ্ক্ষার কথা, তাহার স্বপ্নের কথা, এই প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমরা জানিতে পারি। পৃথিবীতে কয়টা জাতি এত দিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে? যাহারা এত দিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে, তাহাদিগকে আপনার অস্তিত্বের জন্য লজ্জিত হইতে হইবে না।

সে আজ দেড় হাজার বৎসরের কথা, যখন চীন পরিব্রাজক ফা হিয়াং সুহ্মরাজ্যের রাজধানী তাম্রলিপ্তার বন্দর হইতে জাহাজে চড়িয়া সিংহল যাত্রা

করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সহিত্য তখন জন্ম গ্রহণ করে নাই; তখনকার বাঙ্গালী যে ভাষায় কথা কহিত, তাহাকে বাঙ্গলা ভাষা বলিব কি না, তাহা জানি না। বাঙ্গালী জাতি কিন্তু তখন গঠিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। পুণ্ড্র, চণ্ডাল ও কৈবর্ত্ত তখন বোধ করি বাঙ্গলা দেশ ছাইয়া অবস্থিত ছিল। অনার্য্যের অধিবাস বঙ্গভূমিতে আর্য্যের উপনিবেশ, তাহার বহু পূর্ব্বে কোন্ পৌরাণিক যুগে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় কঠিন; রামায়ণে ও মহাভারতে, এমন কি, ঐতরেয় ব্রাহ্মণাদি বৈদিক সাহিত্যে তাহার স্মৃতি মাত্র অবশিষ্ট আছে। নরকাসুরের বংশধর কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে অক্ষৌহিণী চালনা করিয়াছিলেন; পৌণ্ড্রক বাসুদেব যদুপতি বাসুদেবের স্পর্দ্ধা করিতেন; এই সকল নরপতির দেহমধ্যে আর্য্যশোণিত প্রবাহিত ছিল কি না, জানিবার কোন উপায় নাই। তবে আর্য্যসভ্যতা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল। সে কোন্ পুরাতন কালের কথা! আমি যে কালের কথা বলিতেছি, তাহা সেকালের তুলনায় একাল। এই একালেই বা বাঙ্গলার অবস্থা কিরূপ ছিল ও বাঙ্গালীর অবস্থা কিরূপ ছিল? ভাগীরথী তখনও শত শাখা বিস্তার করিয়া শত মুখে সাগরসঙ্গমে চলিতেন; গঙ্গাস্রোতের অন্তরমধ্যে দিগ্বিজয়ী রাজারা যে জয়স্তম্ভ নিখাত করিয়া যাইতেন, পর-বৎসরের গঙ্গাস্রোতে তাহা সমূলে উৎপাটিত হইত। সোনার বাঙ্গলার ধানের ক্ষেতে শালিধানের চারা এখনকার মতই উৎখাত হইয়া প্রতিরোপিত হইত ও হেমন্তাগমে কৃষকপত্নী রাত্রি জাগিয়া সোনার ফসল রক্ষা করিত, উজ্জয়িনীর মহাকবি তাহার সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। সেকালের রাজধানীতে ও নগরমধ্যে নাগরিকেরা যেরূপ দৌরাত্ম্য করিত, দশকুমারচরিতের বর্ণনার সহিত একালের নাগরিকচরিত্র মিলাইলে বাঙ্গলা দেশে মানব-চরিত্রের এই দেড় হাজার বৎসরে সবিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাও বোধ হয় না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, উত্তরবঙ্গের কামরূপ ও পুণ্ড্ররাজ্য ফা হিয়াংএর সময়েই প্রাচীনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। আরও দুই শত বৎসর পরে যখন হুয়েং চ্যাং বাঙ্গলা দেশের গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখনও উত্তরবঙ্গের সেই দুই রাজ্য সমৃদ্ধ অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। হুয়েং চ্যাংএর পূর্ব্ববর্ত্তী কালেই পশ্চিমবঙ্গ, আর্য্যাবর্ত্তের গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, গুপ্ত রাজাদের তাম্রশাসন তাহার সাক্ষী। গুপ্ত-সাম্রাজ্য

ধ্বংসের পরও তাহার এক ভগ্নাংশ পশ্চিমবঙ্গে আত্মরক্ষা করিতেছিল, হুয়েং চ্যাং স্বয়ং তাহার সাক্ষী। এই সভাস্থলের ক্রোশ দুই তিন ব্যবধানমধ্যে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে রাঙ্গামাটির রক্তমৃত্তিকামধ্যে হুয়েং চ্যাং-বর্ণিত সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ হয়ত নিহিত রহিয়াছে। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন তখন আর্য্যাবর্ত্তের চক্রবর্ত্তী পদে আসীন আছেন। গৌড়েশ্বর গুপ্তরাজা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হত্যা সাধন করিয়া সেই চক্রবর্ত্তী রাজার ক্রোধানল জ্বালিয়া দিয়াছিলেন। গুপ্ত নরপতিরা বৈদিক প্রথার প্রবর্ত্তক ছিলেন, তাঁহাদের রাজ্যকালে ব্রাহ্মণ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিতেছিল। কিছু দিন পরেই দেখিতে পাই, বেদপন্থী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বঙ্গের রাজসভায় আহুত হইয়া বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হইতেছেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালী সমাজের ভিত্তিপত্তন আরম্ভ হইয়াছে।

তার পরেই পালরাজাদের অভ্যুদয়। বাঙ্গলার ইতিহাসে এই একটা নূতন যুগ। তখন দেশ জুড়িয়া একটা নূতন হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। পুরাতন তখন ভাঙ্গিতেছে, উহার ভগ্নাবশেষের আবর্জ্জনা সেই যুগের হাওয়ায় দেশ জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই জঞ্জালের মধ্য হইতে মাল মশল্লা সংগ্রহ করিয়া নূতনের গঠন চলিতেছে। এই যুগটা বস্তুতই অতি আজগুবি যুগ। চারি দিকেই তখন অদ্ভুত রসের বাহুল্য। পালরাজারা সৌগত শাসন মানিতেন। ব্রাহ্মণ্য তাঁহাদের সময়ে মাথা তুলিবার চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণভাবে সফল হইতে পারিতেছে না। তখন ব্রাহ্মণ্যের সহিত বৌদ্ধ পন্থার দ্বন্দ্ব চলিতেছে। দ্বন্দ্বের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা আছে। উভয়ের সমন্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে উভয়কে আশ্রয় করিয়া ও উভয়কে বিকৃত করিয়া তান্ত্রিকতা মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। নাথযোগীদের চেলারা তখন গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী বুজরুকি দেখাইয়া বেড়াইতেছে। যোগীরা সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহারা মাটিতে পা ফেলিয়া চলেন না, তাঁহারা গাছে চড়িয়া আকাশপথে দেশ ভ্রমণ করেন। বড় বড় বটের গাছ ও তালের গাছ তাঁহাদের এয়ারশিপের কাজ করে। তাঁহারা মন্ত্র পড়িয়া জলের ছিটা দিবা মাত্র মানুষ অবলীলাক্রমে ভেড়া বনিয়া যায়। তখন হাড়ি গুরুর আদেশে রাষ্ট্রপতি রাজ্যসম্পৎ ত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ধর্ম্মঠাকুরের ডোম পুরোহিতের সম্মুখে ব্রাহ্মণ মাথা হেঁট করিয়া চলেন। চণ্ডী দেবী ব্যাধের নিকট পসার জাহির করিয়া পূজা লইবার জন্য

ব্যস্ত, চ্যাংমুড়ি বিষহরি চাঁদ সদাগরের সর্ব্বনাশ করিয়া মহাদেবের উপর জয় লাভ করেন।

যে দেশে যে সময়ে ভবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী রাষ্ট্র শাসন করেন, সে দেশে সে সময়ে সকলই সম্ভবপর হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তখন উলূকবাহন ধর্ম্মঠাকুরের তোষামোদ করিতে প্রবৃত্ত হন। চণ্ডীর আদেশে হনুমান্ ধনপতি সদাগরের ডিঙ্গা ডুবাইবার আয়োজন করেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ, সীতাপতি যাঁহার পদরেণু গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন, যাঁহার ব্রহ্মবলের নিকট বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রতেজ নিষ্প্রভ হইয়াছিল, যিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র, তিনি আপনার প্রাচীন মহিমা ভুলিয়া গিয়া নূতন করিয়া সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষায় মহাচীন দেশে বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হন; এবং সেই মহামুনির আদেশে মাতলামি ধরিয়া "উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে" এই উপদেশমতে বীরভূম জেলায় রামপুরহাটের নিকট তারাপুর গ্রামে তারাপীঠের সম্মুখে গড়াগড়ি দিয়া অবশেষে সিদ্ধি লাভে সমর্থ হন।

বশিষ্ঠ ঋষির যখন এই অবস্থা, তখন তিনি যে ভাষায় সঙ্কলিত ঋক্ মন্ত্র দর্শন করিয়া মহর্ষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই দেবভাষা প্রাকৃত ভাষার নিকট অভিভূত হইয়া থাকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা হইতে সংস্কৃত শব্দের নির্ব্বাসনের যাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে নজীর সংগ্রহের জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে না। মহারাজ আদিশূর বঙ্গদেশে বৈদিক পন্থা প্রবর্ত্তনের জন্য যে সকল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরদের নামকরণেই এই নজীর মিলিবে। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের পাঁচ পুরুষ পরে যে বংশধরগণ বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদের নাম—'আউ' আর 'গাউ'; কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষের পঞ্চম পুরুষগণের নাম 'হারো' আর 'নারো'; ভরদ্বাজগোত্রজ শ্রীহর্ষের পঞ্চম পুরুষ 'আবর' আর 'পাবর' আর 'সাবর'। সেকালের আদর্শ রাজার নাম লাউসেন, রাজমহিষীদের নাম 'উত্তনা' আর 'পুত্তনা'; শ্রেষ্ঠী বণিকের পত্নীদের নাম 'খুল্লনা' আর 'লহনা'। যাঁহারা খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহারের একান্ত পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে আপনার পুত্রকন্যার নামকরণে এই খাঁটি বাঙ্গলা নামগুলির ব্যবহারের জন্য আমি সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা অগ্রণী হউন; আমরা তাঁহাদের অনুসরণ করিব।

আজ হইতে হাজার বৎসর পূর্ব্বে পালরাজারা বর্ত্তমান ছিলেন ; এবং সে সময়ে দেশের মধ্যে যে হাওয়া বহিয়াছিল, তাহারই প্রবাহে বাঙ্গলা সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, এইরূপ আমরা অনুমান করি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্প্রতি শূন্যপুরাণ নামক একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন ; সেই গ্রন্থের ভাষা ও বিষয় দেখিয়া আজি পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত গ্রন্থমধ্যে উহাকে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ মনে করা যাইতে পারে।

এই মুর্শিদাবাদের অন্তঃপাতী লালগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে ঐ গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। আপনাদিগকে ঐ গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। বাঙ্গলা সাহিত্যে উহা এক নূতন জিনিষ,—কতকটা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঐ গ্রন্থের বয়স কিরূপ নিরূপণ করিয়াছেন জানি না, কিন্তু আমার বিবেচনায় উহা অন্ততঃ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল, বাঙ্গলা সাহিত্য তিন শত বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। বঙ্গবিজেতা উপন্যাসের বিখ্যাত গ্রন্থকার তোড়র মলের সভায় কৃত্তিবাস, কালিদাস ও কবিকঙ্কণকে একসঙ্গে উপস্থিত করিয়া সেই ধারণার পরিচয় দিয়াছিলেন। আজ আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যকে অন্ততঃ আরও তিন শত বৎসর পিছাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছি। এবং এই শূন্যপুরাণই যে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ, তাহাই বা কিরূপে বলিব! মহীপাল ও যোগীপালের গীত আমাদিগকে আরও পূর্ব্ববর্ত্তী পালরাজ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যে অধুনাবিলুপ্ত হাকন্দপুরাণ বাঙ্গলা দেশে এক কালে ভাগবতপুরাণের অপেক্ষা বেশী আদর পাইত, তাহার নামেই বোধ হয়, উহা সংস্কৃত ভাষার বড় ধার ধারিত না। এই শূন্যপুরাণের কত কাল পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহা কিরূপে বলিব ? ফলে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পালরাজাদের সময়ে ডোমে যখন পৌরোহিত্য করিত ও হাড়িতে যখন গুরুগিরি করিত, ব্রাহ্মণ্য যখন অবসন্ন ও ম্রিয়মাণ হইয়া মুখ লুকাইয়াছিল, মহাদেব যখন কোচপাড়ায় ভিক্ষার জন্য বাহির হইয়া কোচবধূদের সহিত রহস্যালাপ করিতেন, এবং লাঙ্গল হাতে

জমি চষিতে প্রবৃত্ত হইয়া মশার কামড়ে বিপন্ন হইতেন, ধর্ম্মের গাজনে ঢাকের বাদ্যে পল্লীসমাজ যখন উন্মত্ত হইয়া উঠিত, সেই অদ্ভুত রসের একত্র সমাবেশের সময়ে, বাঙ্গলার শস্যক্ষেত্রের উপর শ্রাবণের বারিধারার বেগ মাথালির উপরে বহন করিয়া, উৎখাত-প্রতিরোপিত ধান্যের হরিদ্বর্ণ চারাগুলি জমিতে গুছাইবার অবকাশে, বাঙ্গলার কৃষকের কণ্ঠে গোপীচাঁদ ও মাণিকচাঁদ, লাউসেন ও ইছাই ঘোষের যে কীর্ত্তিকথা গীত হইত, তাহা হইতেই আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে, আপাততঃ এইরূপ মনে করিয়া লইতে পারি।

দক্ষিণ দেশ হইতে ওষধিনাথবংশীয় সেনরাজারা বাঙ্গলা দেশে প্রবেশ করিয়া হাওয়ার গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বঙ্গের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালের ভ্রষ্টাচার ব্রাহ্মণকে সদাচার শিখাইবার জন্য তৎকালের রাজা ও রাজমন্ত্রী একযোগে দানসাগর ও ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব রচনা করিলেন, আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কায়স্থকে কৌলীন্য মর্য্যাদা দিলেন, যে জনসঙ্ঘ শাস্ত্রশাসন অবহেলা করিয়া যোগী গুরু ও ডোম পুরোহিতের অনুবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহাদিগকে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্থান দিলেন। জয়দেবের মধুরকোমল-কান্তপদাবলী দেবভাষায় গ্রথিত হইয়া ভাবুক জনকে নূতন রসের আস্বাদন দিয়া নূতন পথের পথিক করিল। মুসলমান আসিয়া সেনরাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন, কিন্তু সেনরাজারা যে নূতন বাতাস বহাইয়া গিয়াছিলেন, তাহা এই রাষ্ট্রবিপ্লবেও নিবৃত্ত হয় নাই। দণ্ডধারী রাজা যে সমাজ সংস্কার ও সমাজ শাসনের কার্য্য প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, রাজার হস্ত হইতে রাজদণ্ড স্খলিত হইলেও সমাজ সেই কার্য্য স্বয়ং চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হিন্দু সমাজে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত আচারের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা বন্ধনের পর বন্ধন আঁটিতে লাগিলেন; কুলীনদিগের মেল বন্ধনে ও রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে তাহার পরাকাষ্ঠা ঘটিল। রামায়ণ ও মহাভারতের পুরাণ কথা ক্রমশঃ মহীপালকে ও মাণিকচাঁদকে স্থানভ্রষ্ট করিতে লাগিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে সুধাস্রোত বহাইলেন, শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পার্ষদেরা তাহাতে গৌড়ভূমি ভাসাইয়া দিলেন। এই কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত, ইহার সবিস্তার বর্ণনা অনাবশ্যক।

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর কয়েক শত বৎসর অতীত হইয়াছে। ঠিক দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে এই সভাস্থলের অনতিদূরে বাঙ্গলার ইতিহাসের

এক অঙ্কের অভিনয়ে যবনিকাপাত হইয়া গিয়াছে। স্বদেশী বা বিদেশী যে সকল অভিনেতা সেই যবনিকাপাতকালে অভিনয় কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদের প্রেতাত্মা এখন কোথায় কি অবস্থায় বিদ্যমান আছেন, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু চিত্রগুপ্তের কোন্ খাতায় তাঁহাদের নাম লেখা আছে, তাহা আমরা কতকটা অনুমান করিতে পারি। পিতৃপুরুষের কর্ম্মের ফলভাগ যদি বংশধরকে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে সেই সময়ে আমাদের পিতৃপুরুষেরা যে ধ্বজা তুলিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্মুখে রাখিয়া বিধাতার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবার অধিকার আমাদের কিছুতেই থাকে না। যাহাই হউক, বিধাতা কি মনে করিয়া এই পতিত জাতির মধ্যে আজ একটা নূতন হাওয়া তুলিয়াছেন; এবং সেই হাওয়ার বেগেই নীয়মান হইয়া আধুনিক বঙ্গের সাহিত্যসেবীরা আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। হাওয়ার গতিবিধি নিরূপণ করিয়া আমাদের গন্তব্য পথের নির্ণয় করিতে হইবে।

যুগে যুগে যুগধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যিনি সম্ভূত হইয়া থাকেন, তাঁহার সম্ভব প্রতীক্ষায় যাঁহারা বসিয়া আছেন, একালের যুগধর্ম্মের লক্ষণ কি, তাহার আলোচনা না করিলে তাঁহাদের চলিবে না। সুখের বিষয় যে, বিধাতৃ-প্রেরণায় মানবসমাজে যখন যে হাওয়া বহে, তাহাতেই সেই যুগধর্ম্ম নিরূপিত করিয়া দেয়। আমরা সাহিত্যসেবীরা গর্ব্বের সহিত অনুভব করিতেছি যে, অধুনাতন বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে যিনি আমাদের সকলের অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক ছিলেন, বিধাতা তাঁহার মুখ দিয়াই একালের যুগধর্ম্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

শ্যামা মায়ের পাগল ছেলে কবি রামপ্রসাদ তাঁহার পাগলী মায়ের চরণতলে আপনার মন প্রাণ যোল আনা উৎসর্গ করিয়া গিয়াছিলেন। এই আত্মনিবেদন উপলক্ষ্যে তিনি যে গীত গাইয়াছেন, তাহার ধ্বনি আমাদের কানের ভিতর প্রবেশ করিয়া চিরদিন ধরিয়া মরমের তারে ঝঙ্কার দিবে। সেই ঘোররূপা মহারৌদ্রী গলদ্রুধিরচর্চ্চিতা শ্যামাঙ্গিনী জননীর হস্তধৃত করাল খড়্গ রামপ্রসাদের হৃদয়ে কোনরূপ আতঙ্ক জন্মাইত না, তাঁহার রাঙ্গা পায়ের রক্ত জবার অভিমুখে তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা নিবদ্ধ থাকিত, এবং তিনি সেই রক্ত জবায় দৃষ্টি রাখিয়া তন্ময় হইয়া নিরবধি আনন্দসুধা পান করিতেন। তাঁহার চোখে মায়ের যে মূর্ত্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা অন্যের চোখে হয় নাই।

সাধকভেদে যেমন জননীর মূর্ত্তিভেদ হয়, সেইরূপ দেশভেদে ও কালভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করেন। "বন্দে মাতরম্" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীকে যে মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি আমাদের উপস্থিত যুগধর্ম্মের অনুকূল মূর্ত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রেব পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী মায়ের এই মূর্ত্তি এমন স্পষ্টভাবে দেখিতে পান নাই, এবং সেই মূর্ত্তিকে ইষ্টদেবতারূপে স্বীকার করিয়া তদুপযোগী সাধনার সময় পান নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলার সাহিত্যসেবীরা এই মূর্ত্তি দর্শনের জন্য বাঙ্গালীকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। প্রবাসযাত্রী মধুসূদন দত্ত "সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ," এই চিন্তায় যখন ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তখন তিনি ক্ষণেকের জন্য এই "শ্যামা জন্মদার" প্রতি অশ্রুসিক্ত লোচনে চাহিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র যখন এই জননীকে আহ্বান করিয়া তাঁহার ভেরী বাজাইতেন, তখন আমাদের হৃৎপিণ্ড যেমন স্পন্দিত হইত, তেমন আর তাঁহার অন্য কোন আহ্বানে ঘটিত না।

বঙ্গদর্শনের প্রথম [দ্বিতীয়] বৎসরে, ঐ পত্রিকায় "দশ মহাবিদ্যা" নামে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধের লেখক কে, তাহা আপনারা অবগত আছেন। তাঁহার সহচর ও সহবর্ত্তীরা একে একে অন্তর্হিত হইয়াছেন ও হইতেছেন; তিনি আমাদিগকে উপদেশ দিবার জন্য এই সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারিলে আমরা কৃতার্থ হইতাম। আমরা সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত হইয়া তাঁহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতেছি। ঐ প্রবন্ধে তিনি আমাদের জননীর স্বীকৃত মূর্ত্তিসকলের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, জননী আপন হাতে আপন মাথা কাটিয়া ছিন্নমস্তা সাজিয়াছেন; তাঁহার ছিন্ন কণ্ঠ হইতে সমুদ্গত শোণিতধারা ডাকিনী যোগিনীতে পান করিতেছে, কোন্ তারিখে কোন্ স্থানে জননী আপন হাতে আপন মাথা ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাহা প্রবন্ধলেখক খুলিয়া বলেন নাই। মায়ের এখনকার মূর্ত্তি ধূমাবতী—বর্ষীয়সীর দেহ কঙ্কালসার, চক্ষু কোটরগত, পরিধানে ছেঁড়া কাপড়, মাথায় রুক্ষ কেশ, গায়ে ধূলি উড়িতেছে। ভাঙ্গা রথের মাথার উপর কাক ডাকিতেছে।

সেই বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র যখন যুগধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি জননীর মূর্ত্ত্যন্তর দেখিয়াছিলেন; সে মূর্ত্তি মায়ের

ষোড়শী মূর্ত্তি—মা যাহা ছিলেন, অথবা কমলামূর্ত্তি—মা যাহা হইবেন। এই মূর্ত্তি তিনি দেখিয়াছিলেন, আর ভক্তিবিহ্বল স্বরে ডাকিয়াছিলেন—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

অতঃপর আর বলিতে হইবে না, আমাদের যুগধর্ম্মের লক্ষণ কি? বঙ্গের সাহিত্যগুরু আমাদিগকে যে লক্ষ্য ধরিয়া যাইতে বলিয়াছেন, বঙ্গের সাহিত্যসেবী মাত্রকেই সেই লক্ষ্যের অভিমুখে চলিতে হইবে। প্রত্যেকের পক্ষে চলিবার পথ ভিন্ন হইতে পারে। সাহিত্যসেবীর মধ্যে কেহ কবি, কেহ ঔপন্যাসিক, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ জ্ঞান প্রচারে ব্রতী, কেহ ভক্তিপথের উপদেষ্টা, কেহ কর্ম্মমার্গের পথপ্রদর্শক। কিন্তু আজিকার দিনে বঙ্গের সাহিত্যসেবীর এক বই দ্বিতীয় লক্ষ্য হইতে পারে না। যিনি যে কামনা করিয়া কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাকে সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীর চরণে সেই কর্ম্মফল অর্পণ করিতে হইবে। যিনি যে ফুল আহরণ করিবেন, সে সকল ফুলই সেই রাঙা চরণের রক্ত জবার সহিত মিশাইতে হইবে। পত্র, পুষ্প, ফল, তোয়—যাহা আহরণ করিবেন, তাহা ভক্তিপূর্ব্বক সেই স্থানেই অর্পণ করিতে হইবে। "যজ্জুহোসি, যদশ্নাসি, যৎ করোষি, দদাসি যৎ"—ভগবতীর আদেশ—সে সমস্তই সেই এক চরণে অর্পণ করিতে হইবে।

এই সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত থাকিতে পারে। এই সভাস্থলে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহারা অনেকেই অনেক উদ্দেশ্য লইয়া এখানে আসিয়াছেন। কেহ বা এই সাহিত্য-সম্মিলনকে বঙ্গের দুঃস্থ সাহিত্যসেবকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে বলিবেন; কেহ বা ইহাকে সাহিত্যিকগণের স্বার্থরক্ষিণী সভায় পরিণত করিতে চাহিবেন; কেহ বা বাঙ্গলা সাহিত্যের আবর্জ্জনা অপসারণের জন্য সম্মার্জ্জনী হাতে লইতে উপদেশ দিবেন; কেহ বা বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে গ্রাম্য অপভাষা নির্ব্বাসনের জন্য কমিশন বসাইতে অনুরোধ করিবেন। এই সমুদয় উদ্দেশ্যের

সহিতই আমার সহানুভূতি আছে! এ সকলই কাজের কথা ও পাকা কথা, তাহা আমি সন্দেহ করি না। কিন্তু যিনি যে কাজেই লিপ্ত থাকুন, একটা উচ্চতর লক্ষ্যকে সর্ব্বদা সম্মুখে না রাখিলে চলিবে না। আপনার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও আমরা সকলে মিলিয়া একটা উচ্চ লক্ষ্য, একটা মহৎ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারি।

বর্ত্তমান কালে দেশে যে হাওয়া বহিতেছে, তাহাতে দেশের লোককে দল বাঁধিয়া সমবেত শক্তি প্রয়োগে কোন্ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে বলিতেছে, তাহাই যথাসাধ্য বিবৃত করিবার জন্য আমি চেষ্টা করিয়াছি। যে মায়ের পূজা করিব বলিয়া বাঙ্গালী আজ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, আমরা সাহিত্যসেবী, আমরাও আমাদের সামর্থ্য অনুসারে সেই মায়ের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইব। আজ যিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আমার অপেক্ষা স্পষ্টতর ভাষায় পুনঃ পুনঃ আপনাদিগকে সেই কর্ম্মের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক" এই উদ্দীপনাময় কাতর আহ্বান, তাঁহার কণ্ঠ হইতে ইতঃপূর্ব্বে মুহুর্মুহুঃ নিঃসৃত হইয়াছে। "আমরা এসেছি আজ মায়ের ডাকে" বলিয়া তিনি যখন বীণার তারে আঘাত করিয়াছেন, তখন আমাদের শিরায় শিরায় রক্তধারা বেগে বহিয়াছে। "আগে চল, আগে চল ভাই" বলিয়া তিনি যখন আমাদিগকে পুরোগমনে উৎসাহিত করিয়াছেন, তখন অনেকেরই পঙ্গু চরণ লম্ফ প্রদানের উদ্যোগ করিয়াছে; মরা গাঙ্গে বান দেখিয়া যখন তিনি জয় মা ব'লে তরী ভাসাইতে বলিয়াছেন, তখন তরী ভাসাইব কি, গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপিয়া পড়িতে অনেকের প্রবৃত্তি হইয়াছে। তাঁহার নেতৃত্বে এই সাহিত্য-সম্মিলন যদি আপনার লক্ষ্য স্থির করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে সাহিত্য-সম্মিলনের এই দুই দিনের পরিশ্রম নিতান্ত বিফল হইবে না।

কিন্তু আমরা সাহিত্যসেবী, আমরা কিরূপে সেই মায়ের অর্চ্চনা করিব? আমরা যে মায়ের কোলে অবস্থান করিয়া তাঁহার স্তন্যপানে বর্দ্ধিত হইয়াছি, সেই মাকে আমরা ভাল করিয়া চিনিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। যে দিন আমরা মাকে চিনিতে পারিব, সে দিন আমাদের সাধনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু এখনও আমাদের সাধনা আরম্ভ হয় নাই; আমরা মাকে চিনিতে এ পর্য্যন্ত সম্যক্ চেষ্টাই করি নাই। চিনিবার চেষ্টাই আমাদের বর্ত্তমান কালের অর্চ্চনা। এবং আমরা সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া যদি

সেই চিনিবার উপায় বিধান করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলেই সাহিত্য-সম্মিলন সফল মনে করিব।

আহ্লাদের বিষয়, এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদের বড় সম্ভাবনা নাই। এই সাহিত্য-সম্মিলনে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সাহিত্যসেবক কর্ত্তৃক যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে, জননীর পরিচয় লাভই সে সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রস্তাবগুলি আপনাদের সম্মুখে স্থাপিত হইলেই আপনারা তাহা বুঝিতে পারিবেন।

একটি কথা আপনাদিগকে নিবেদন করিয়া রাখিতে চাহি যে, আজিকার সভায় যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত হইবে, সেই সকল প্রস্তাবের অনুযায়ী কাজ ইহার মধ্যেই কিছু কিছু আরব্ধ হইয়াছে। আপনারা বোধ হয় জানেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ নামে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য-সভা আজ চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য, বাঙ্গলার পুরাতত্ত্ব প্রভৃতির উদ্ধারের জন্য নিযুক্ত আছেন। অল্প অর্থবল এবং অল্পতর লোকবল লইয়া সাহিত্য-পরিষদ্ যতটুকু সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে সাহিত্য-পরিষদ্ গর্ব্বিত হইতে পারেন। এই কয় বৎসরের চেষ্টায় সহস্রাধিক অজ্ঞাতপূর্ব্ব বাঙ্গলা গ্রন্থ পরিষৎ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে কতিপয় গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া কীটের ও অগ্নির কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। বহুসংখ্যক গ্রন্থকারের নাম ও কীর্ত্তি সাহিত্য-পরিষৎ বিস্মৃতির কুক্ষি হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কৃত্তিবাস কাশীদাসের মত বিখ্যাত কবিগণ কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পনের বৎসর পূর্ব্বে লোকের সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না; সাহিত্য-পরিষৎ অনেকাংশে সেই অস্পষ্টতা দূর করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের হাতের লেখা পুঁথি আশ্রয় করিয়া তাঁহার চণ্ডীগ্রন্থ প্রকাশ করিতে পরিষৎ প্রস্তুত হইয়াছেন। বাঙ্গলার পুরাতত্ত্ব ও বাঙ্গলা ভাষার গঠনপ্রণালী সাহিত্য-পরিষদের আলোচনার বিষয় হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষদের কৃত কর্ম্মের ফর্দ্দ দিয়া তাহার পক্ষে ওকালতির জন্য আমি আজ আসি নাই, তবে সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদের একটি আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়াছে, সেই আকাঙ্ক্ষাটি আমি আপনাদিগকে পরিষদের পক্ষ হইতে জানাইতে চাহি। সেই আকাঙ্ক্ষাটি অন্যতর প্রস্তাবরূপে আপনাদের সম্মুখে যথাসময়ে উপস্থিত করা হইবে। প্রস্তাবটির গুরুত্ব বোধে আমি একটু ভূমিকা করিয়া রাখিব। সাহিত্য-পরিষদ্ একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে

চাহেন, সেখানে বসিয়া আমরা বাঙ্গলা দেশকে ও বাঙ্গালী জাতিকে প্রত্যক্ষ-ভাবে ও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইব। সেইখানে বসিয়া আমরা বঙ্গভূমির বর্ত্তমান অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারিব ও অতীত ইতিহাসের সম্যক্‌রূপে আলোচনার সুযোগ পাইব।

সেই মন্দিরের এক পার্শ্বে একটি পুস্তকালয় থাকিবে, সেখানে বাঙ্গলা ভাষায় রচিত, মুদ্রিত, অমুদ্রিত, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ সংগৃহীত হইবে। বঙ্গের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হাতে-লেখা প্রাচীন পুঁথি সেইখানে স্তূপাকৃতি হইবে। সহস্র বৎসরের ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে কিছু ফসল জন্মিয়াছে, তাহা আমরা এক স্থানে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত দেখিতে পাইব। গ্রীক ও রোমান হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক মার্কিন ও জাপানী পর্য্যন্ত যে-কোন বৈদেশিক আগন্তুক বাঙ্গালীর সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও সেই স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইংরেজ সরকার বাঙ্গলার ভূগোল, ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন ও সরকারী সাহায্য ব্যতীত যিনি যাহা সংগ্রহ করিতেছেন, তাহা সেই স্থানে সযত্নে রক্ষিত হইবে।

মন্দিরের অন্য স্থানে আমরা বঙ্গের সাহিত্যিকগণের স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাইব। চণ্ডীদাস যে বাশুলী দেবতার পূজক ছিলেন, কবিকঙ্কণ স্বপ্নাবেশে চণ্ডীদেবীর যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আপনার গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কৃত্তিবাস যে ভিটায় বসিয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, কাশীরাম দাস যে কেশে পুকুরের নিকট বাস করিতেন, রামপ্রসাদ যে আসনে বসিয়া সাধনা করিতেন, এই সকলের ছায়াচিত্র বা তৈলচিত্র গৃহপ্রাচীর শোভিত করিবে। শ্রীচৈতন্যের হস্তাক্ষরের পার্শ্বে নিত্যানন্দের ছড়ি বিদ্যমান থাকিবে। রামমোহন রায়ের পার্শ্বে হেমচন্দ্রের পাষাণমূর্ত্তি উপবিষ্ট থাকিবে। বিদ্যাসাগরের পাদুকার নিকটে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী শোভা পাইবে।

আর এক স্থানে বাঙ্গলার পুরাতত্ত্বের উপাদান সংগৃহীত হইবে। বাঙ্গলার যেখানে যে তাম্রশাসন বাহির হয়, যেখানে যে মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহা সেই স্থানে সজ্জিত হইবে। পাষাণের উপর বা ইষ্টকের উপর উৎকীর্ণ লিপিসমূহের প্রতিলিপি সুরক্ষিত হইবে। বঙ্গের পরিত্যক্ত রাজধানীসমূহের ভগ্নাবশেষের ছায়াচিত্র উহাদের পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করাইবে। বাঙ্গলার যে

যে স্থান বিরাট রাজার নামের বা কর্ণসেনের নামের সহিত জড়িত আছে, চাঁদ সদাগরের বা বেহুলা ঠাকুরাণীর স্মৃতির সহিত মিশিয়া আছে, সেই সকল স্থানের চিত্র আমরা সেখানে বসিয়া দেখিতে পাইব। প্রাচীন দুর্গ, দেবমন্দির ও অট্টালিকাদি দর্শনীয় যেখানে যে কিছু আছে, তাহার চিত্রও আমরা সেইখানে দেখিব। প্রতাপাদিত্যের বাড়ীর ভাঙ্গা কলসী হইতে পলাশীর লড়াইয়ের গোলা পর্য্যন্ত সংগৃহীত দেখিব।

আর এক স্থানে বাঙ্গলার কর্ম্মবীরদের স্মৃতিচিহ্নের সংগ্রহ থাকিবে। প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম হইতে রামগোপাল ঘোষ ও কৃষ্ণদাস পাল পর্য্যন্ত সকলেরই কোন না কোন নিদর্শন দেখিয়া আমরা পুলকিত হইব। কর্ম্মীদের পার্শ্বে পণ্ডিতদের স্থান থাকিবে। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ও তার্কিকশিরোমণি হইতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণের বংশলতা ও জীবনচরিত সংগৃহীত হইবে। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলী সংগৃহীত হইয়া তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবে।

বাঙ্গলার বিখ্যাত জমিদারবংশের ইতিবৃত্ত আমরা সেখানে জানিতে পারিব। বাঙ্গলার ফুল-ফল, লতা-পাতা, গাছ-পালা, জীবজন্তু, শিল্পসম্ভারের নমুনা দেখিয়া আমরা বঙ্গভূমিকে চিনিয়া লইব। দৃষ্টান্তবাহুল্যের আর প্রয়োজন নাই। এই মন্দিরকেই আমি মাতৃমন্দির নাম দিতে পারি ও এই মন্দিরমধ্যে সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভারকে আমি মাতৃপ্রতিমা নাম দিতে পারি। সাহিত্য-পরিষদের এই আশার কথা ও আকাঙ্ক্ষার কথা আমি বহু আশা বুকে বাঁধিয়া সাহিত্য-সম্মিলনের সম্মুখে স্থাপন করিতে সাহসী হইয়াছি। আশা করি, আপনারা ইহার অনুমোদন করিবেন। আমাদের প্রত্যেকের শক্তি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; কিন্তু "অল্পানামপি বস্তুনাং সংহতিঃ" যখন কার্য্য-সাধিকা হয়, তখন আপনাদের শক্তিসমষ্টির পক্ষে এই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা অসাধ্য না হইতেও পারে।

এই মন্দির গঠনে প্রভূত লোকবল ও প্রভূত ধনবল আবশ্যক। বাঙ্গলার সাহিত্যসেবীরা লোকবল যোগাইতে পারেন; কিন্তু ধনবল তাঁহাদের নাই। ধনবলের জন্য আমাদিগকে বাঙ্গলার ধনীদিগের দ্বারস্থ হইতে হইবে। আজিকার দিনে যখন বাঙ্গলার ধনী দরিদ্র সকলেই মায়ের ডাকে সাড়া দিতেছেন, তখন মায়ের কাজের জন্য ভিক্ষাভাণ্ড হাতে লইয়া ধনীর দ্বারস্থ হইলে আমাদিগকে বিমুখ হইতে হইবে না, এই আশা করি। বঙ্গের ধনিগণ

ধনের কিয়দংশ এইরূপে মাতৃপূজায় নিয়োগ করিয়া তাঁহাদের ধনবত্তা সার্থক করুন, এই প্রার্থনা।

যাঁহার উদ্‌যোগে ও আহ্বানে আজ আমরা এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কাশীমবাজার নগরে উপস্থিত হইয়াছি, বলা বাহুল্য, এই কার্য্যের সফলতার জন্য মুখ্যতঃ আমাদিগকে তাঁহারই মুখের দিকে তাকাইতে হইবে। তাঁহার নেতৃত্ব বিনা এই কার্য্য সম্পন্ন হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এই প্রস্তাবে আমি তাঁহার অনুমোদন ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদের আতিথ্য লাভে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন আজ অতুল আনন্দ লাভ করিতেছেন; কিন্তু সেই আনন্দের অভ্যন্তরে দারুণ ব্যথার চিহ্ন প্রচ্ছন্ন ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। গত বৎসর আমরা আতিথ্য লাভের আনন্দ ভোগের জন্য আয়োজন করিতেছিলাম; নিষ্ঠুর বিধাতা অকস্মাৎ বজ্র হানিয়া আমাদিগকে সেই আনন্দভোগে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের দারুণ শোক বঙ্গের সাহিত্যসেবকেরা বিনা বাক্যে অঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার সম্যক্ হেতুও বর্ত্তমান ছিল। মহিমচন্দ্রের বিনয়মণ্ডিত মুখশ্রীর সহিত আমার যেরূপ পরিচয় ঘটিয়াছিল, আপনাদের সকলের সেরূপ ঘটে নাই, কিন্তু বঙ্গের এই দুর্দ্দিনে তাহার একটি উজ্জ্বলতম আশার প্রদীপ অকস্মাৎ নিবিয়া গেলে, বঙ্গসমাজ যে তমোমলিন হইয়া যাইবে, ইহা স্বাভাবিক। সাহিত্যিক সমাজ তখন যে ব্যথা পাইয়াছিলেন, সেই ব্যথার চিহ্ন কথঞ্চিৎ আচ্ছাদিত রাখিয়া আজ অতিথিরূপে এই সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্য যিনি আপনার অরুন্তুদ মর্ম্মপীড়া মর্ম্মস্থলে সংগোপন করিয়া, বঙ্গের সারস্বত সমাজের অতিথিসৎকারে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বোধ করি প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই উপলক্ষে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন না করিলে, আমাদের ধর্ম্মহানি হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এই আকাঙ্ক্ষার অনুমোদন করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন যদি এই সময়ে মাতৃমন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে মহারাজের সহকারিতা প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে আশা করি, আমাদের এই সময়ের অনুপযোগী ধৃষ্টতা মার্জ্জিত হইবে। হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে যে আগুন জ্বলিয়া থাকে, তাহার নির্ব্বাপণ মানুষের সাধ্য কি না, তাহা জানি না; তবে পুণ্য কর্ম্মের জাহ্নবীবারি তাহাকে কতকটা শান্ত রাখিতে পারে।

এই সারস্বত সম্মিলনের আহ্বানে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া মহারাজ যে পুণ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শোকবহ্নির উপর শান্তি-বারি নিক্ষেপ করিতে পারে। মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকে আমি পুণ্যতম কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করি। মহারাজের যদি ইহা অনুমোদিত হয় এবং তিনি যদি অগ্রণী হইয়া বঙ্গের জনগণকে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন, তাহা হইলে মহারাজের নিত্যানুষ্ঠিত সহস্র পুণ্য কর্ম্মের মধ্যে এই পুণ্যতম কর্ম্ম তাঁহার অন্তরের বিয়োগব্যথার অপনোদনে সমর্থ হইবে, ইহাই বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিয়া আমি আপনাদিগকে সাহিত্য-সম্মিলনের কর্ত্তব্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছি। ('উপাসনা,' ১৩১৫, ষষ্ঠ সংখ্যা)

জগৎ-কথা

[১৯২৬ সনে প্রকাশিত]

ভূমিকা

স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের গ্রন্থের ভূমিকার প্রয়োজন হয় না। এই অপূর্ব্ব পুস্তকখানি গ্রন্থকারের মৃত্যুর চারি বৎসর পরে কেন প্রকাশিত হইল, তাহার যে একটু ইতিহাস আছে, তাহাই নিবেদন করিব। এই পুস্তকের কিয়দংশ স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তার পরে রচনা শেষ করিয়া ত্রিবেদী মহাশয় ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ছাপা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। ছাপানো ফর্ম্মাগুলি কোথায় গেল, সন্ধান হইল না। ত্রিবেদী মহাশয়ের আত্মীয়গণ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লইয়া 'সাহিত্য-পরিষদে'র শরণাগত হইলেন। পরিষৎ আশা দিলেন, কিন্তু ছাপাইতে পারিলেন না। শেষে পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থার ভার আমার উপরে পড়িল। দেখিলাম, 'জগৎ-কথা'র মতো পুস্তক অপ্রকাশিত থাকিলে বঙ্গভাষার যে ক্ষতি হইবে, তাহা কোনো কালে কেহ পূরণ করিতে পারিবেন না। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান্ প্রেস চিরদিনই সৎ-সাহিত্য প্রচারের পরম সহায়। ইঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক 'জগৎ-কথা' প্রকাশের ভার লইলে নিশ্চিন্ত হইলাম।

ত্রিবেদী মহাশয়কে আমি গুরুতুল্য জ্ঞান করি। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানচর্চ্চায় তিনিই আমাকে পথ দেখাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে অনেক শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাই আমার তত্ত্বাবধানে আজ 'জগৎ-কথা' প্রকাশিত হইল দেখিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

শান্তিনিকেতন, বীরভূম
শারদীয়া পঞ্চমী, ১৩৩৩

শ্রীজগদানন্দ রায়

জড় জগৎ

জগৎ-কথা অর্থাৎ জড় জগতের কথা বলিব। জড় জগতের কথা জড়েরই কথা। জড়ের কথা বলিবার পূর্ব্বে, জড় পদার্থ বলিতে আমরা কি বুঝি, সেটা স্পষ্ট বুঝা আবশ্যক। কোন্ শব্দ কোন্ অর্থে প্রয়োগ করিব, সেটা আগে স্থির করিয়া না লইলে বড় গণ্ডগোলে পড়িতে হয়। লেখক এক অর্থে লিখিতেছেন, পাঠক অন্য অর্থ মনে করিয়া পড়িতেছেন, এরূপ প্রায় ঘটে; ফলে অকারণ উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটিয়া যায়; মনে নানারূপ খটকা থাকে, তাহার মীমাংসা হয় না।

জড় শব্দটি আমাদের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র হইতে গৃহীত। সেই প্রাচীন শাস্ত্রে যাহা চেতন নহে, তাহাকে জড় বলিত। জগতে এমন এক জন কেহ আছেন, তিনিই 'আমি'; আর যাহা কিছু আছে, তিনিই অর্থাৎ সেই 'আমি'ই তাহার জ্ঞাতা। আমি জ্ঞাতা আর সমস্ত আমার জ্ঞানের বিষয়। চন্দ্র, সূর্য্য, ইট, কাঠ আমার জ্ঞানের বিষয়; আমার দেহ ও চক্ষু-কর্ণাদি অবয়বও আমার জ্ঞানের বিষয়; এমন কি, আমার অন্তরিন্দ্রিয় যে মন, যাহার সাহায্যে আমি চন্দ্র-সূর্য্যের ও ইট-কাঠের তত্ত্ব আহরণ করিয়া থাকি, এবং আমার যে বুদ্ধি, যদ্দ্বারা মন কর্ত্তৃক সমাহৃত সেই তত্ত্বকে পরিপাক করিয়া আমি কাজে লাগাই, সেই মন ও বুদ্ধি পর্য্যন্ত আমার জ্ঞানের বিষয়। শাস্ত্রমতে কেবল আমিই এক মাত্র চেতন পদার্থ; আর যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই আমার জ্ঞানের বিষয় ও চেতনাহীন জড় পদার্থ। অতএব চন্দ্র-সূর্য্য, ইট-কাঠ হইতে আমার মন ও বুদ্ধি পর্য্যন্ত সমস্তই জড় পদার্থ।

প্রাচীন দার্শনিকদিগের এইরূপ বিচারপ্রণালী আমাদের নিকট আপাততঃ হেঁয়ালির মত ঠেকে। ইহার তথ্যনির্ণয় লইয়া এখন কাজ নাই।

পাশ্চাত্য শাস্ত্রে জগতের দুইটি অংশের কথা শুনা যায়; একটার নাম mind, আর একটার নাম matter; যে শাস্ত্র mindএর তত্ত্ব আলোচনা করে, তাহাকে আজকাল মনোবিজ্ঞান (mental science) বলা যায়; আর যে শাস্ত্র matterএর তত্ত্ব আলোচনা করে, তাহাকে জড়বিজ্ঞান (physical science) বলা যায়। আমাদের প্রাচীন

শাস্ত্রকারদের হিসাবে কিন্তু একালের মনোবিজ্ঞানেরও অধিকাংশ জড়বিজ্ঞানের অন্তর্গত হইয়া পড়ে।

জড় কাহাকে বলে ?

সে যাহা হউক, পাশ্চাত্য শাস্ত্রে যাহাকে matter বলে, আজকাল বাঙ্গালায় **জড়** শব্দটিকে সেই অর্থে প্রয়োগ করা হয়। প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে জড়ের অর্থ ব্যাপকতর; হালের ভাষায় উহার অর্থ সঙ্কীর্ণ। আমরা এই গ্রন্থে জড় শব্দটি এই আধুনিক সঙ্কীর্ণ অর্থেই প্রয়োগ করিব। ইংরেজীতে যাহাকে matter বলে, আমরা তাহাকে জড় বলিব।

এই সঙ্কীর্ণ অর্থেই বা জড় পদার্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা স্থির করা আবশ্যক। কোন্‌টা জড়, কোন্‌টা জড় নহে, ইহার মীমাংসা আপাততঃ সহজসাধ্য মনে হইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যায়, এই মীমাংসা লইয়া বহু দিন ধরিয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে যুদ্ধ চলিয়াছে। তাপ, আলোক, তাড়িত প্রভৃতিকে এক কালে জড়ের মধ্যে স্থান দেওয়া হইত; এখন আবার সদর্পে বলা হয়, উহারা জড় নহে; জড়ের ধর্ম্ম মাত্র। ফলে কোন্‌টা জড়, আর কোন্‌টা জড়ের ধর্ম্ম, ইহার নির্ণয় বড় কঠিন ব্যাপার।

আপাততঃ মনে হইতে পারে, জড়ের একটা নির্দ্দিষ্ট পারিভাষিক সংজ্ঞা দিলেই গোল মিটিয়া যাইবে; যে জিনিসটা সেই সংজ্ঞার ভিতর পড়ে, তাহা জড়; যাহা পড়ে না, তাহা জড় নহে। কিন্তু ফলে দেখা গিয়াছে, কোন সংজ্ঞাই ষোল আনা মনে লাগে না; প্রত্যেকটাতেই একটা না একটা গোল থাকে। সম্প্রতি আমরা সেই গোল-ব্যূহ ভেদের প্রয়াস পাইব না। জড়ের কয়েকটি সংজ্ঞা, যাহা নানা পণ্ডিতে নানা সময়ে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাই পাঠকের সম্মুখে স্থাপন করিব, এবং অতি সংক্ষেপে দেখাইব, প্রত্যেকটাতেই একটা না একটা আপত্তি উঠে।

(১) যাহার ওজন বা ভার আছে, তাহা জড়। আপত্তি—এ কালের পণ্ডিতেরা আকাশ নামক একরূপ জগদ্ব্যাপী পদার্থ মানিয়া লন, উহার ভার আছে কি না, তাহার প্রমাণ নাই; অথচ অনেকে উহাকে জড় বলেন। সম্প্রতি ইলেক্‌ট্রন নামে একরূপ কণিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে; অনেকের অনুমান যে, ঐ ইলেক্‌ট্রন-সমবায়ে অন্যান্য জড় নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু ঐ ইলেক্‌ট্রনের ওজন আছে কি না, কেহ জানে না। উহাকে জড় বলিব কি না?

(২) যাহার দেশব্যাপ্তি আছে, অর্থাৎ যাহা স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহা জড়। ইহাতেও আপত্তি ঘটে। বৈজ্ঞানিকেরা শক্তি নামক আর একটা পদার্থ মানেন, তাহা জড় নহে ; অথচ তাহার দেশব্যাপকতা আছে। আলোক উত্তাপ প্রভৃতি এই শক্তির বিবিধ রূপ।

(৩) যাহা চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহাই জড়। ইহাতে আপত্তি আসে, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা জড় স্বয়ং, না জড়ের ধর্ম্ম? সূর্য্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, না সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য?

অলমতিবিস্তরেণ। আরও অনেক সংজ্ঞা আছে ; কয়েকটির উল্লেখ করিলাম মাত্র ; কোনটিই নির্দ্দোষ নহে ; অতএব এখানে আর পুঁথি বাড়াইয়া কাজ নাই।

কাজটা কিন্তু ভাল হইল না। পুঁথির আরম্ভে বলিয়াছিলাম, শব্দের অর্থ স্পষ্ট না বুঝিয়া তাহার তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে ; আমরা জড়ের তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম বটে, কিন্তু জড়ের একটা নির্দ্দিষ্ট পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে পারিলাম না।

চুলচেরা পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে পারিলাম না বলিয়া এইখানে পুঁথি বন্ধ করিলে চলিবে না। কোন রকমে কাজ চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আপাততঃ অত্যন্ত মোটা হিসাবে কাজ চালাইবার ব্যবস্থা করিব। সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন যেমন বিপত্তি ঠেকিবে, তেমনই তেমনই তাহা হইতে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা যাইবে।

চুন-পাথর, ইট-কাঠ, জল-বায়ু প্রভৃতি জিনিসকে আমরা জড় বলিয়া গ্রহণ করিব। আমার শরীরটা, অথবা যে অস্থি মজ্জা রক্ত মাংস প্রভৃতি মশলায় আমার এই ভঙ্গুর দেহযন্ত্র নির্ম্মিত, তাহাকেও জড় বলিব। এই হইল জড়ের স্থূল দৃষ্টান্ত। এখন এই স্থূল দৃষ্টান্তেই কাজ চলিবে। এই মোটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া চলিলে আপাততঃ কোনও মোটা ভুলের আশঙ্কা থাকিবে না।

জড়ের তিন অবস্থা

জড়ের মোটামুটি তিন অবস্থা দেখা যায়—**কঠিন, তরল** ও **বায়বীয়** অবস্থা। ইট-কাঠের কঠিন অবস্থা, তেল-জলের তরল অবস্থা, আব বায়ুর বায়বীয় অবস্থা।

এইখানে একটু ভাষাবিভ্রাট আসে। বায়ুর অবস্থা ত বায়বীয় হইবেই, উহা কি আর জলীয় বা তৈলীয় হইবে? কঠিন ও তরল যেমন দুইটি অবস্থাজ্ঞাপক বিশেষণ শব্দ পাওয়া গেল, সেইরূপ এই তৃতীয় অবস্থাজ্ঞাপক আর একটি বিশেষণের ভাষায় অভাব রহিয়াছে। একটা বায়ুর সহিত আমাদের চিরকালের পরিচয় আছে; এই বায়ুতে আমাদের শ্বাসক্রিয়া চলে; উহাই প্রকৃতপক্ষে প্রাণবায়ু; আমরা সেই বায়ুসাগরে ডুবিয়া আছি। কিন্তু সেই বায়ুর মত অবস্থাপন্ন অর্থাৎ "বায়বীয়" অবস্থাপন্ন আরও নানা বায়ু আছে; তাহাদের সহিত সর্ব্বসাধারণের ততটা পরিচয় নাই। সোডাওয়াটারের বোতল খুলিলেই একটা বায়ু বেগে বাহির হইয়া আসে, উহা প্রাণহানিকর বায়ু। শহরের রাস্তায় আলোক দিবার জন্য যে গ্যাস জ্বালান হয়, উহাও একপ্রকার বায়ু। সোডাওয়াটারের বায়ুও বায়ু, জ্বালানি গ্যাসও বায়ু, আর আমাদের চিরপরিচিত বায়ুও বায়ু; এই বায়ুবিভ্রাট হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য একটি নূতন নামের সৃষ্টি করা নিতান্তই আবশ্যক। পাঠককে ভাষার গোলকধাঁধায় ফেলিলে লেখকের অধর্ম্ম হইবে।

ইংরেজী ভাষাতেও এক কালে ঐরূপ বায়বীয় অবস্থাজ্ঞাপক বিশেষণ শব্দের অভাব ছিল। এক air শব্দ চলিতেছিল; নূতন নূতন আবিষ্কৃত বায়ুকেও air বলা হইত। কোনটা fixed air, কোনটা inflammable air, কোনটা dephlogisticated air। ইংরাজেরা gas এই শব্দটিকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া এই ভাষাবিভ্রাট হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। ইংরেজীতে এখন বায়ুবৎ পদার্থ মাত্রেরই সাধারণ নাম gas. আমাদিগকেও সেইরূপ একটা শব্দ আহরণ করিতে হইবে।

কেহ কেহ gas শব্দটি বাংলা হরপে লিখিয়া গ্যাস নামটি বাঙ্গলা ভাষায় চালাইতে চাহেন। আমি তাহাতে কিছুতেই সায় দিব না। ঐ শব্দ ঐরূপে লিখিলে আমাদের ভাষার ধাতের সঙ্গে মিশিবে না; বড় কদর্য্য দেখাইবে। একটা ভদ্রতর শব্দ চাই।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে নানাবিধ বায়ুর উল্লেখ আছে—প্রাণ অপান ব্যান ইত্যাদি। ঐ সকল বায়ু সম্পূর্ণ কাল্পনিক না হইলেও, কোন্‌টা কি অর্থে প্রযুক্ত হইত, ঠিক করিয়া বলা কঠিন। কাজেই উহাদের কোনটিকে লওয়া চলিবে না। তবে উহাদের মধ্যে একটা সাধারণ অংশ আছে;—'অন্' ধাতুর অস্তিত্ব;—আমরা ঐ অন্ ধাতুটাকে কাজে লাগাইতে

চাহি। সংস্কৃতে বায়ু অর্থে অনিল শব্দ আছে; উহা অন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। আমরা জোর করিয়া ঐ অনিল শব্দটিকে ব্যাপকতর অর্থে অর্থাৎ যে-কোনও বায়বীয় পদার্থের বিশেষণরূপে গ্রহণ করিব; বায়ু শব্দটি চলিত ভাষায় এত প্রচলিত যে, উহাকে নূতন অর্থ দেওয়া চলে না; অনিল শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় আছে; অথবা সংস্কৃতবহুল বাঙ্গলায় আছে; চলিত বাঙ্গলা, যাহা লোকমুখে প্রচলিত, তাহাতে অনিল শব্দের ব্যবহার নাই। কাজেই উহাকে এই নূতন ব্যাপক অর্থে চলিত ভাষায় গ্রহণ করা চলিতে পারে। দার্শনিকদের পঞ্চ ভূতের অন্তর্গত অন্যতম ভূত মরুৎ; এই মরুৎ নামটা লইলেও চলিতে পারিত। কিন্তু উহার গায়ে অতিরিক্ত পণ্ডিতি গন্ধ আছে; চলিত ভাষায় চলিবে না।

শব্দ সৃষ্টি করা দুরূহ; প্রাচীন শব্দের নূতন পারিভাষিক অর্থ দেওয়া ভিন্ন বৈজ্ঞানিক লেখকের গত্যন্তর নাই। সকল ভাষাতেই এইরূপ করিতে হয়; বাঙ্গলাতেই বা না করিব কেন?

অতএব জড়ের ত্রিবিধ অবস্থা। **কঠিন** অবস্থা, **তরল** অবস্থা ও **অনিল** অবস্থা। ইট-কাঠ কঠিন; তেল-জল তরল; আর বায়ু আর জ্বালানি গ্যাস আর সোডাওয়াটারের হাওয়া অনিল।

তিনটি অবস্থা বলা গেল। কেন না, একই জড় পদার্থ তিন রূপ গ্রহণ করিতে পারে; উহাদের অবস্থান্তরপ্রাপ্তি ঘটে, ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায়। যেমন জল। উহা কঠিন হইলে বরফ হয়; আর অনিল হইলে অদৃশ্য হইয়া বাষ্পে পরিণত হয়।

সোনা-রূপার মত কঠিন পদার্থ উত্তাপ পাইয়া তরল হয়। আবার কর্পূরের মত কঠিন পদার্থ উবিয়া গিয়া অনিলে পরিণত হয়। ইহা সকলেই জানেন, সকলেই দেখিয়াছেন। ইহা লইয়া এখানে বাড়াবাড়ির দরকার নাই।

কঠিন পদার্থ

কঠিন পদার্থ নানা রকমের। উহাদের নানা গুণ, নানা ধর্ম্ম। গোটাকতকের ধর্ম্মের উল্লেখ করা যাইতেছে।

সোনা, রূপা, তামা **ঘাতসহ**; আঘাত করিলে ভাঙ্গে না; হাতুড়ির ঘায়ে সোনা-রূপার পাতলা পাত হয়। দস্তার কিংবা সীসার তেমন পাতলা পাত হয় না।

কাচ, কয়লা, হীরা হাতুড়ির ঘা সহে না; উহাদের পাত হয় না; উহারা ভাঙ্গিয়া যায়; উহারা **ভঙ্গপ্রবণ** বা **ভঙ্গুর**।

আবার সোনা-রূপা ছিদ্রের ভিতর দিয়া জোরে টানিলে মিহি তার হয়; সীসা ও দস্তার তত মিহি তার হয় না। কাচ গলাইয়া সেই গলন্ত কাচে সরু তার টানা যায়; কিন্তু কঠিন থাকিতে টানা চলে না; কয়লা, হীরার ত কথাই নাই।

ঐ সকল তারে টান দিলে তার একটু লম্বা হয়; টান তুলিয়া লইলে সে লম্বিতত্বটুকু থাকে না; আগেকার দৈর্ঘ্য আবার ফিরিয়া আসে। টানে দৈর্ঘ্য বাড়ে, টানের অভাবে স্বভাবপ্রাপ্তি ঘটে; এই গুণের নাম **স্থিতিস্থাপকতা**।

কিন্তু এই স্থিতিস্থাপকতার একটা সীমা থাকে। এতটুকু টানিলে তার এতটুকু লম্বা হইল; আবার টান ছাড়িলে স্বভাবে ফিরিল; কিন্তু সীমা ছাড়াইয়া টানের মাত্রা চড়াইলে আর স্বভাবে ফিরিয়া আসে না; পূর্ব্বের তুলনায় একটু লম্বা থাকিয়া যায়। ইহার অর্থ,—স্থিতিস্থাপকতার একটা সীমা আছে; সেই সীমার ভিতরে স্থিতিস্থাপক, সীমা ছাড়িলে আর স্থিতিস্থাপক থাকে না।

টানের মাত্রা আরও বাড়াইলে তার ছিঁড়িয়া যায়; কোনও ধাতুর তার এক মণের ভারে ছিঁড়ে, কোনও ধাতুর তার তেমনই মিহি হইলেও দুই মণ ভার সহ্য করে। যত ক্ষণ না ছিঁড়ে, ততক্ষণ টান সহে; যখন টান না সহিয়া ছিঁড়িয়া যায়, তখন হয় ভঙ্গুর। ভাঙ্গা, ছেঁড়ারই প্রকারভেদ। টানের বা আঘাতের মাত্রাধিক্যে সোনা-রূপার মত ঘাতসহ ধাতুর পাত বা তার ছিঁড়িয়া যায়; ভঙ্গপ্রবণ কাচ বা হীরা ভাঙ্গিয়া যায়। আঘাতটাও টানের স্বজাতীয়—উহা সহসাপ্রযুক্ত টান বা হেঁচকা টান।

তামার বা লোহার ছড়ির মাঝখানে একখানা ভারী পাথর ঝুলাইলে ছড়ি কুঞ্চিত হয় বা বাঁকিয়া যায়; ভার তুলিয়া লইলে সেই বক্রতা থাকে না; ভারের অভাবে আবার স্বভাবপ্রাপ্তি ঘটে; ইহাও স্থিতিস্থাপকতার পরিচয়। কিন্তু এখানেও স্থিতিস্থাপকতার সীমা আছে; সীমা ছাড়াইয়া ভারের মাত্রা বাড়াইলে এতটা নুইয়া যায় বা বাঁকিয়া যায় যে, আর স্বভাবে ফিরিয়া আসে না। অর্থাৎ সীমার ভিতরে যাহা স্থিতিস্থাপক, সীমা ছাড়াইলে তাহা স্থিতিস্থাপক থাকে না। আবার অতিমাত্রায় ভার

দিলে ঐ ছড়ি এতটা বাঁকে যে, ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। যতক্ষণ না ভাঙ্গে, ততক্ষণ উহা ভারসহ; যখন ভাঙ্গে, তখন ভঙ্গুর। ভার সহে বলিয়াই ছাদে আমরা লোহার কড়ি, কাঠের বরগা ব্যবহার করি; কিন্তু সাবধান, অতিরিক্ত ভার কিছুতেই সহে না; সকলের জোর সমান নয়।

হীরা দিয়া কাচ কাটা যায়, কাচে হীরা কাটে না। ঢালাই লোহার আঁচড়ে পেটাই লোহাতে দাগ পড়ে, পেটাই লোহার আঁচড়ে ঢালাই লোহাতে দাগ পড়ে না। ঢালাই লোহা **কঠোর**; পেটাই লোহা **কোমল**। হীরার মত কঠোর জিনিস আর নাই। তামার খাদ মিশাইলে সোনা-রূপার কঠোরতা বাড়ে; গহনা গড়িতে বা টাকা সিকি আধুলি মুদ্রা ছাপিতে সেই জন্য সোনা-রূপাতে তামা মিশায়। সীসা সোনা-রূপার চেয়েও কোমল; উহাতে নখেরও আঁচড় পড়ে। যাহা অতিকঠোর, তাহাও অতিভঙ্গুর হইতে পারে। কাচ খুব কঠোর, উহাতে ইস্পাতের আঁচড় লাগে না; কিন্তু উহার ভঙ্গপ্রবণতা প্রসিদ্ধ।

আর দৃষ্টান্ত বাড়াইবার দরকার নাই। কঠিন পদার্থে নানা গুণ অল্পবিস্তর পরিমাণে বর্ত্তমান দেখা গেল—কাহারও কোনটা অধিক, কাহারও অন্যটা অধিক। নানা গুণ, যথা—**ঘাতসহতা, টানসহতা, ভারসহতা, স্থিতিস্থাপকতা, ভঙ্গুরতা, কঠোরতা**। ইহার মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে আর একটু সূক্ষ্ম বিচার আবশ্যক।

আয়তন ও আকৃতি

স্থিতিস্থাপকতার বিচারের পূর্ব্বে একটা কথা বুঝিতে হইবে—উহা জড় পদার্থের দেশব্যাপ্তি। জড় পদার্থ মাত্রই, কি কঠিন, কি তরল, কি অনিল, সকলেই খানিকটা দেশ বা স্থান বা জায়গা ব্যাপিয়া অবস্থান করে; ইহাই জড় পদার্থের **দেশব্যাপ্তি**।

কোন জিনিস অল্প জায়গা লইয়া থাকে, উহা ছোট; কোনটা অধিক জায়গা ব্যাপিয়া থাকে, উহা বড়। একটা মটরের চেয়ে একটা কুল বড়, একটা কুলের চেয়ে একটা বেল বড়; ভেড়াটার চেয়ে ঘোড়াটা বড়, ঘোড়াটার চেয়ে হাতীটা বড়; ঘটিটার চেয়ে ঘড়াটা বড়; আর ছেলেটার চেয়ে বুড়োটা বড়। এই বৃহত্ত্ব জ্ঞাপনের জন্য আমরা একটি শব্দ ব্যবহার করিব,—**আয়তন**। যাহা বৃহৎ, তাহার আয়তন অধিক; যাহা ক্ষুদ্র,

তাহার আয়তন অল্প। কুলের চেয়ে বেলের আয়তন বড়, ঘোড়ার চেয়ে হাতীর আয়তন বড়। বলা বাহুল্য, পদার্থের আয়তন এই দেশব্যাপ্তির ফল; কেহ অল্প দেশ জুড়িয়া আছে, উহার আয়তন অল্প; কেহ অধিক দেশ জুড়িয়া আছে, উহার আয়তন অধিক। বলা উচিত, এই ছোটত্ব বড়ত্ব তুলনামূলক বা অপেক্ষাকৃত।

দেশব্যাপ্তির আর একটা ফল আছে। তাহার নাম **আকৃতি**। আকৃতিভেদে কোনটা গোল, কোনটা চেপটা, কোনটা ছুঁচল; কোনটা দণ্ডাকার, কোনটা স্তম্ভাকার; সকলেই সাকার, নিরাকার কেহই নহে। ভাঁটার আকার ভাঁটার মত,—তা ছোটই হউক, আর বড়ই হউক; হাতীর আকার হাতীর মত—ছানাই হউক, আর ধাড়িই হউক—ঘোড়ার মত বা সাপের মত বা মাছির মত নহে। এই আকৃতি যে দেশব্যাপ্তির ফল, তাহা বলা বাহুল্য। কতটা দেশ জুড়িয়া বা ব্যাপিয়া আছে, তাহা দেখিয়া আয়তন স্থির হয়; আর কি রকমে দেশ জুড়িয়া আছে, তাহা দেখিয়া আকৃতির নিরূপণ হয়। হাতী যেরূপে দেশ জুড়িয়া আছেন, তাঁহার বাচ্চাও সেই রকমে সেই ধরনে দেশ জুড়িয়া থাকেন; উভয়ের আকৃতি প্রায় সমান। কিন্তু ভেড়া বা ঘোড়ার দেশব্যাপ্তির ধরনটা অন্যরূপ; উহাদের আকৃতিও অন্যরূপ।

পরিমাণ-সমস্যা

দ্রব্য মাত্রই কতকটা দেশ জুড়িয়া থাকে, এই বাক্যে আমরা একটা ঘোর সমস্যায় উপস্থিত হইলাম। কোন্ দ্রব্য কতটা দেশ ব্যাপিয়া আছে, ইহা স্থির করিয়াই কোন্‌টা ছোট, কোন্‌টা বড় স্থির হয়; কে কত ছোট, কে কত বড় স্থির হয়। দুইটা পদার্থের বৃহত্ত্বের বা আয়তনের তুলনা হয়। কে কত ছোট, কে কত বড়, এইরূপ তুলনার নাম **পরিমাণ**। এই পরিমাণ কর্ম্মটাই বৈজ্ঞানিক বিচারের প্রাণ। বৈজ্ঞানিক বিচারের প্রারম্ভেই কত বড় ও কত ছোট, এই তুলনাসূচক সমস্যার কথা উঠে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি মোটামুটি বলিয়া দেয়, কোন্‌টা বড়, কোন্‌টা ছোট; কিন্তু কত বড়, কত ছোট, তাহা বলে না; বলিলেও তাহাতে অনেক সময় ভুল ভ্রান্তি থাকে। এই জন্য আমরা সবিশেষ চেষ্টা করিয়া পরিমাণ করি,—মাপিয়া স্থির করি,—কোন্‌টা কত ছোট, কোন্‌টা কত বড়। কোন কিছুর

আয়তন কত, তাহা ঠিক করিবার পূর্ব্বে এই পরিমাণ-সমস্যার মীমাংসা আবশ্যক।

আমরা যে দেশে অবস্থিত, সেই দেশ ত্রিধা বিস্তৃত ; পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে, দক্ষিণ হইতে বামে ও নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে, এই তিন মুখে বিস্তৃত। যাহা কেবল একধা বিস্তৃত, তাহা রেখা ; যাহা দ্বিধা বিস্তৃত, তাহা তল বা পৃষ্ঠ বা ক্ষেত্র। এই রেখা ও তল উভয়ই কাল্পনিক সংজ্ঞা মাত্র : উহা আমরা কল্পনায় অনুভব করি মাত্র ; উহা বুদ্ধিবৃত্তির গোচর, উহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। ইন্দ্রিয়গোচর জড় দ্রব্য যে দেশে ব্যাপ্ত, সেই দেশ কিন্তু ত্রিধা বিস্তৃত। কাজেই একটা বাক্সের মত বা একখানা কেতাবের মত কোন দ্রব্য কতটা দেশ ব্যাপিয়া আছে, ঠিক করিতে হইলে, উহা তিন মুখের কোন্ মুখে কতটা বিস্তৃত আছে, ঠিক করিতে হয়। উহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ, এই তিনের নির্ণয় করিতে হয়। কোন্ মুখে কতটা বিস্তৃত, তাহা স্থির করিবার জন্য একটা মাপকাঠি তৈয়ার করিতে হয়। এই মাপকাঠিটাও জড় পদার্থ ; উহার বেধ ও বিস্তার আমরা নজরে আনি না, অথবা মনেও আনি না ; কেবল দৈর্ঘ্যের হিসাব রাখি। তার পর উহার দৈর্ঘ্যের সহিত যে জিনিসের আয়তন মাপিতে হইবে, তাহার দৈর্ঘ্যের, বিস্তারের ও বেধের তুলনা করি। মাপকাঠির দৈর্ঘ্য যতই হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না ; তাহাকে বলি এক কাঠি। যে বাক্সটার দৈর্ঘ্য বিস্তার বেধ তিনই এক কাঠির দৈর্ঘ্যের সমান, সেই বাক্সটা যে জায়গা ব্যাপিয়া থাকে, তাহার নাম দেওয়া যায় এক ঘনকাঠি। যাহার দৈর্ঘ্য বিস্তার বেধ প্রত্যেকেই দুই কাঠির দৈর্ঘ্যের সমান হয়, তাহা যে দেশ জুড়িয়া থাকে, তাহা হয় আট ঘনকাঠি। কেন না, ইহা অক্লেশে দেখান যাইতে পারে, এই বৃহত্তর দেশটাকে আটটি ছোট ছোট টুকরা দেশে বিভক্ত করা চলে ও সেই প্রত্যেক টুকরা ঠিক এক ঘনকাঠি দেশ জুড়িয়া থাকে।

যে মাপকাঠিটাকে আমরা এক কাঠি বলি, সে কাঠিটার দৈর্ঘ্য কত হইবে, তাহা আমার ইচ্ছাধীন। কাজের সুবিধা অনুসারে তাহা স্থির করিতে হয়। হাবড়া হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত লোহার রেল পাতিতে হইবে ; কত দীর্ঘ রেল চাই, তাহা মাপিবার জন্য লম্বা মাপকাঠি লইলেই সুবিধা ; ঐ লম্বা মাপকাঠির নাম মাইল। কিন্তু দোকানে কাপড় কিনিবার সময় অত বড় কাঠিতে সুবিধা হয় না, তখন ছোট কাঠি লইতে হয়। তাহার

নাম—হাত, অথবা গজ। আরও ছোট মাপের জন্য আরও ছোট কাঠি হইলে সুবিধা হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাঠি ব্যবহার করিয়া থাকে; তাহাতে উপস্থিত কাজে সুবিধা হয়; কিন্তু পরস্পর কারবারে অসুবিধা ঘটে। ইংরেজের মাপকাঠি গজ, আর বাঙ্গালীর মাপকাঠি হাত; এখানে দশ গজ আর উনিশ হাত, ইহার মধ্যে কোন্‌টা বড়, কোন্‌টা ছোট, অকস্মাৎ বলা চলে না; একটা গজ একটা হাতের কয় হাতের সমান, তাহা না জানিলে বলা চলেই না। আবার ইংরেজের বড় মাপকাঠি মাইল ছোট মাপকাঠি ইঞ্চির কয় ইঞ্চির সমান, তাহা না জানিলে, দশ মাইল বড়, না বিশ হাজার ইঞ্চি বড়, তাহা শীঘ্র বলা চলে না। নানা মাপকাঠি চলিত থাকিলে কারবারের কত অসুবিধা, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। এ দেশে জমি জরিপের সময় বাদশাহী আমলের কাঠা ও হালের কাঠা লইয়া জমিদারে প্রজায় কত গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়া থাকে। পাকি মাপ ও কাঁচি মাপের অসুবিধা কাহারও অজানা নাই। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য সভ্য দেশে যাঁহাদের উপর রাষ্ট্র-পরিচালনার ভার থাকে, তাঁহারা আইন দ্বারা মাপকাঠি বাঁধিয়া দেন। প্রজাদিগকে সেই মাপকাঠি বাধ্য হইয়া ব্যবহার করিতে হয়। বিলাতে পার্লেমেণ্ট সভা ঐরূপ মাপকাঠি বাঁধিয়া দিয়াছেন। একটা দৃঢ় ধাতুদণ্ড পার্লেমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠি; উহা রাজমন্ত্রীদের জিম্মায় রক্ষিত থাকে; উহার ছাপ-দেওয়া নকল প্রজাদের নিকট বিলি করা হয়। উহার নাম বৃটিশ গজ। গরম পাইলে ধাতুদণ্ডের দৈর্ঘ্য একটু বাড়িয়া যায়; এই জন্য কতটা গরম থাকিতে উহার দৈর্ঘ্য এক গজ বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহাও আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আছে। সূক্ষ্ম মাপে এই বৃদ্ধিটুকু অগ্রাহ্য করা চলে না।

এই গজের ১৭৬০ গজের নাম মাইল; ছোট মাপের জন্য গজের তৃতীয়াংশের নাম ফুট; আর ফুটের দ্বাদশাংশের নাম ইঞ্চি। ইঞ্চির ভগ্নাংশের পৃথক্ নাম নাই। আমরা এ দেশে প্রচলিত হাত-কাঠিকে আঠার ইঞ্চির সমান ধরিয়া লই।

ছোট জিনিস মাপিতে ছোট কাঠির দরকার হয়; ইঞ্চির চেয়ে ছোট দৈর্ঘ্য মাপিতে ইঞ্চির ভগ্নাংশের দরকার; ইঞ্চির দ্বাদশাংশ লওয়া যাইতে পারে; তার চেয়ে ছোট মাপে আরও ছোট ভগ্নাংশের দরকার হয়। কিন্তু

দৈর্ঘ্য যে কত ছোট হইতে পারে, তাহার কোন ইয়ত্তা নাই; যত ছোট ভগ্নাংশকেই মাপকাঠি কর না কেন, তার চেয়ে ছোট দৈর্ঘ্য মাপিবার সময় আরও ছোট কাঠির দরকার হইবে; কিন্তু মানুষের ইন্দ্রিয় মোটা; মানুষের ইন্দ্রিয়কে এক জায়গায় গিয়া থামিতে হয়; তার চেয়ে ছোট কাঠি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। কাজেই বাধ্য হইয়া মানুষকে সেইখানে থামিতে হয়; তার চেয়ে সূক্ষ্ম মাপ চলে না। এইখানে পরিমাণ-সমস্যার আর মীমাংসা চলে না; যত সূক্ষ্ম পরিমাণ করি না কেন, সূক্ষ্মতার একটা সীমা আছে, সেখানে পরিমাণ-কর্ম্ম মানুষের অসাধ্য।

বৈজ্ঞানিক এইখানে আসিয়া হারি মানেন। ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানের দ্বার; ইন্দ্রিয় যেখানে পরাস্ত হয়, জ্ঞানও সেখানে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার একটা সীমা আছে; তবে মানুষে বুদ্ধি খাটাইয়া সেই সীমাটাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে পারে। কৌশলক্রমে সীমাটাকে ক্রমশঃ ঠেলিয়া লওয়া চলে। চোখ আলোকের সাহায্যে দেখে; আলোক যেখানে পাওয়া যায় না, মানুষ সেখানে কৌশলক্রমে আলোক আনিয়া পুঞ্জীভূত করে, চোখ তখন দেখিতে পায়। এই সকল কৌশলের জন্য দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কৌশল উদ্ভাবনে মানুষের শক্তির সীমা কোথায়, তাহা কেহ বলিতে পারে না; কাজেই মানুষ যন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রিয়কে ক্রমেই স্বকার্য্যসাধনে সমর্থ করিয়া তুলিতেছে; শেষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়শক্তি একটা সীমায় পৌঁছে বটে, কিন্তু সেই সীমা যে আবার কোথায় গিয়া সীমা পাইবে, তাহা বলিতে পারি না। কাজেই বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ; কিন্তু ইহার গতি সম্পূর্ণতার অভিমুখে; সম্পূর্ণ কখনও হইবে না; তবে সম্পূর্ণতার অভিমুখে ক্রমশঃ চলিতেছে এবং আশা করা যায় যে চলিবে।

যে সকল কঠিন পদার্থের আকৃতি বাক্সের মত বা কেতাবের মত বা চতুষ্কোণ কৌটার মত, তাহাদের দৈর্ঘ্য বিস্তার বেধ মাপিলে আয়তন মাপা চলে, তাহা উপরে বলিয়াছি। তরল পদার্থের আয়তন ঐরূপ মাপা কৌটায় পুরিয়া কয় কৌটা হইল, তাহাও সহজে মাপা চলে। কিন্তু কঠিন পদার্থের আকৃতি ভাঁটার মত বা থালার মত বা থামের মত হইলে, অত সহজে মাপা চলে না। এইরূপ হইলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি মানুষকে

সাহায্য করে। জ্যামিতি শাস্ত্র আসিয়া বলিয়া দেয়, একটা ভাঁটার ব্যাসের দৈর্ঘ্য জানিলে কিরূপে তাহার আয়তন স্থির হইবে; ব্যাসের দৈর্ঘ্য হয় যদি পাঁচ কাঠি, ভাঁটার আয়তন হইবে কত ঘনকাঠি, ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা জ্যামিতি শাস্ত্রের উপর। তবে জ্যামিতি শাস্ত্র যে-কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। অষ্টাবক্র ঋষির মত আকৃতি হইলে, জ্যামিতি শাস্ত্রও হারি মানে। তখন মানুষের বুদ্ধিকে পরাস্ত হইতে হয়। তখন কৌশলের আশ্রয় লইতে হয়। একটা বড় গামলা কানায় কানায় জলে পুরিয়া সেই জলে অষ্টাবক্রকে ডুবাইতে হয়। খানিকটা জল উছলিয়া পড়ে; সেই জলটা আবার সেই কৌটার কত কৌটা হইল দেখিয়া তাহার আয়তন কত, স্থির করা চলে। অষ্টাবক্রের যে আয়তন, এই উচ্ছলিত জলের আয়তন তাহার সমান।

স্থিতিস্থাপকতা

কঠিন পদার্থ মাত্রেরই একটা আয়তন আছে, এবং একটা আকৃতি আছে। জোরে চাপ দিয়া আয়তন একটু কমান যায়। ইহার নাম **সঙ্কোচন**। চাপ তুলিয়া লইলে পূর্ব্ব আয়তন ফিরিয়া আসে, চাপের অভাবে স্বভাবপ্রাপ্তি ঘটে। এই ধর্ম্ম স্থিতিস্থাপকতা; ইহা **আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা**। আবার কঠিন পদার্থের আয়তন না কমাইয়া আকৃতি বদলান চলে; মোচড় দিলে উহা বক্র হয়; ইহার নাম **আকুঞ্চন**। মোচড় ছাড়িয়া দিলে বক্রতা দূর হয়; তখন স্বভাবে ফিরিয়া আসে। ইহাও স্থিতিস্থাপকতা; তবে ইহা **আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা**। কঠিন পদার্থের দুই রকমেরই স্থিতিস্থাপকতা আছে;—আয়তনগত ও আকৃতিগত। চাপে সঙ্কোচন, আর মোচড়ে আকুঞ্চন, দুইটাই আয়াসসাধ্য। এই আয়াসের মাত্রা দেখিয়া স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ নিরূপিত হয়। যেখানে আয়াস অধিক, সেখানে স্থিতিস্থাপকতাও অধিক। যেখানে আয়াস অল্প, সেখানে স্থিতিস্থাপকতাও অল্প। ইস্পাত কাচ পাথর কাঠ, এই সকল জিনিসেরই আয়তন বদলান বা আকৃতি বদলান অতি আয়াসসাধ্য। ইহারা অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক।

একটা গোল ভাঁটা বা বর্ত্তুলকে জোরে এক দিকে চাপিলে উহা চেপটা হইয়া যায়; উহার বর্ত্তুলত্ব থাকে না; উহার আকৃতির বদল হয়। একটা মার্ব্বেলের বা কাচের ভাঁটাকে চেপটা করা বড়ই শক্ত; একটা রবারের

বলকে চেপটা করা তার চেয়ে অনেক সহজ। অতএব মার্ব্বেল বা কাচের আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা রবারের চেয়ে অধিক। কেন না, যেখানে আয়াস অধিক, সেখানে স্থিতিস্থাপকতাও অধিক।

কথাটা নূতন বলিয়া মনে হয়। চলিত ভাষায় রবারের স্থিতিস্থাপকতা প্রসিদ্ধ। রবারের চেয়ে কাচের স্থিতিস্থাপকতা অধিক, ইহা কেমন কেমন শুনায়। কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। বিজ্ঞানের ভাষা ঠিক চলিত ভাষা নহে। চলিত ভাষায় যে শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, বিজ্ঞানের ভাষায় সে শব্দ ঠিক সে অর্থে প্রযুক্ত হয় না। বৈজ্ঞানিক বিচারে খুব সাবধান হইয়া ভাষা ব্যবহার না করিলে পদে পদে ঠকিতে হয়। চলিত কথাবার্ত্তায় অতটা বাঁধাবাঁধি চলে না। কাজেই বৈজ্ঞানিকের ভাষা একটু স্বতন্ত্র। বৈজ্ঞানিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগেই শব্দগুলির নির্দ্দিষ্ট বাঁধাবাঁধি অর্থ দিয়া লইতে হয়; চলিত ভাষায় যেমন এলোমেলো নানা অর্থ থাকে, সেরূপ থাকিলে চলে না; এই নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ অর্থের নাম পারিভাষিক অর্থ। সরকারী আইন-কানুনের গোড়াতেই যেমন কতকগুলি শব্দের পারিভাষিক অর্থ দেওয়া হয়, সেইরূপ আরম্ভে পরিভাষা নির্ণয় করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রও ফাঁদিতে হয়।

এ বিষয়ে কাচে আর রবারে পার্থক্য কি? বিজ্ঞানের ভাষায় কাচের স্থিতিস্থাপকতার **মাত্রা** অধিক; কিন্তু উহার **দৌড়** অল্প। আগে একবার বলিয়াছি, একটা ধাতুদণ্ডের মাঝখানে একটা ওজন ঝুলাইলে উহা বাঁকিয়া যায়, ভার নামাইলে আবার বক্রতা নষ্ট হয়। অর্থাৎ ধাতুর আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা আছে। কিন্তু ভারের মাত্রা অধিক হইলে এতটা বাঁকিয়া যায় যে, তখন আর স্বভাবে ফেরে না; একটা স্থায়ী বক্রতা আসিয়া পড়ে। বুঝিতে হইবে যে, তখন স্থিতিস্থাপকতা আর নাই; ঐ ধাতু পূর্ব্বে ছিল স্থিতিস্থাপক, এখন হইয়াছে নমনীয়। ঐ ধাতুর স্থিতিস্থাপকতার যে নির্দ্দিষ্ট সীমামধ্যে দৌড় ছিল, উহা সেই সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। দৌড়ের সীমা ছাড়াইলে আর উহা স্থিতিস্থাপক থাকে না; নমনীয় হইয়া পড়ে।

কাচের ছড়িতেও ভার ঝুলাইলে উহা বাঁকে; গুরু ভার ঝুলাইলে উহা ভাঙ্গিয়া যায়। এখানেও বুঝিতে হইবে, স্থিতিস্থাপকতার দৌড়ের সীমা ছাড়াইয়া ভার ঝুলান হইয়াছে। সীমার ভিতরে কাচ ছিল স্থিতিস্থাপক; সীমা ছাড়াইয়া হইয়াছে ভঙ্গুর।

রবারের স্থিতিস্থাপকতার মাত্রা অল্প বটে, কিন্তু দৌড় খুব বেশী; চাপ দিয়া অনেকটা চেপটা করা চলে। রবারের সূতাকে টানিয়া অনেকটা লম্বা করা চলে। আবার টান ছাড়িলে পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া পায়। অল্প আয়াসে আকৃতির অনেকটা বদল হয়। কাজেই স্থিতিস্থাপকতার মাত্রা অল্প, কিন্তু দৌড় অধিক। কিন্তু এখানেও দৌড়ের একটা সীমা আছে; অধিক টানে রবারের সূতাও ছিঁড়িয়া যায়। তখন যে রবার ছিল স্থিতিস্থাপক, তাহা হইয়া পড়ে ভঙ্গুর।

তরল পদার্থ

তরল পদার্থের হাতের কাছে উদাহরণ জল। কঠিনের সঙ্গে ইহার প্রভেদ কি? প্রভেদ অনেক। জল গড়াইয়া যায়, জলে স্রোত হয়; জল ফোঁটা ফোঁটা পড়ে; জলে অক্লেশে হাত ডুবাও, জল সেখান হইতে সরিয়া যাইবে, আবার হাত তোল, জল দ্বিধা না করিয়া স্বস্থানে আসিয়া স্থান পূরণ করিবে। মাটিতে বা পাথরে এমন করিয়া হাত ডোবান চলে কি? পাথরে ছুরির আঁচড় দাও; স্থায়ী চিহ্ন থাকিবে; জলে ছুরির আঁচড় স্থায়ী হয় কি? জল যে এইরূপ অবাধে সরিয়া নড়িয়া বহিয়া যায়, ইহাই জলের তারল্য।

আবার ঘটির জল দেখ; কেমন ঘটির গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে। ঘটির ভিতরটার যে আকার, জল ঠিক সেই আকার গ্রহণ করিয়াছে। ঘটির জল থালায় ঢাল, জল বিনা আপত্তিতে থালায় ছড়াইয়া বিছাইয়া পড়িল; কোনও বাক্যব্যয় নাই, থালার আকার গ্রহণ করিল। জল যেন সুশীল সুবোধ গোপালের মত বালক; যা পায়, তাই খায়; যা পায়, তাই পরে।

জলের আকৃতির কোন বাঁধাবাঁধি নাই। কাচ বা কাঠ বা পাথর যেমন গড়ন্ত আকৃতি লইয়া জমাট হইয়া বসিয়া থাকে, জলের সে অহমিকা নাই। কাচের পুতুল হয়; জলের পুতুল গড়া চলে চলে না। কাঠের আকৃতি বদলান, কাঠকে নোয়ান, মচকান, মোচড়ান কত আয়াসসাধ্য; জল কিন্তু নুইয়াই আছে, কোনও আয়াসের অপেক্ষা করে না। জল ভাঙ্গেও না, মচকায়ও না; কেন না, উহা ভাঙ্গিয়াই আছে, মচকাইয়াই আছে। মাটির ঢিপি থাকে, পাথরের পাহাড় থাকে, বালির স্তূপ থাকে; জলকে স্তূপাকৃতি করিয়া ঢিপি বাঁধা চলে কি? জলের আকৃতি বদলাইতে কোনও আয়াস

আবশ্যক হয় না। উপরে বলিয়াছি, যাহার আকৃতি বদলাইতে যত আয়াস দরকার হয়, তাহার আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা তত অধিক। জলের আকার পরিবর্ত্তনে যখন কিছুই আয়াস লাগে না, তখন বলিতে হইবে, জলের আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা একবারেই নাই। এই হইল ইহার তারল্য; কঠিনের সঙ্গে তরলের প্রভেদ এইখানে।

জলের আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা নাই বটে, কিন্তু আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা বড় অল্প নহে। জলের আকুঞ্চনে কোন ক্লেশ নাই, কিন্তু সঙ্কোচন প্রচুর আয়াসসাধ্য। একটা চোঙায় জল পুরিয়া তাহাতে প্রচুর চাপ দিলে তবে যৎকিঞ্চিৎ আয়তন কমে; আবার সেই চাপ তুলিয়া দিলে পূর্ব্বের আয়তন ফিরিয়া পায়। কিন্তু এত অল্প কমে যে, বুঝা দায়; কাজেই জলের আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতার মাত্রা কঠিনের সহিতই তুলনীয়।

জল অতি সুবোধ বালক; কিন্তু জলেরও একটা জেদ আছে। জল ঘটিতেই রাখ, আর চোঙাতেই রাখ, আর থালাতেই রাখ অথবা একটা পুষ্করিণীতেই রাখ, উহার পৃষ্ঠদেশ সমতল ও সমোচ্চ হইবেই। কোথাও উচু নীচু ঢিপি থাকিবে না। কঠিনা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ কত বন্ধুর; কোথাও পাহাড়, কোথাও ডাঙা, কোথাও বিল, কোথাও খাল। আর জলের পিঠ একটানা সমান। জলের এক ধার উচু, এক ধার নীচু হয় না। অতি নির্ব্বোধেও পুকুরের জল এধারে উচু, ওধারে নীচু বলিতে চাহিবে না; কোন ব্যক্তিকে জল উচুর দলস্থ বলিলে গালি দেওয়া হয়। হাওয়া দিলে পুষ্করিণীর জলের পিঠে হিল্লোল দেয়, উহা তরঙ্গায়িত হয়, কিন্তু সে হাওয়ার জোরে; হাওয়া না থাকিলে যে সমতল, সেই সমতল।

জলের এই বিষয়ে জেদ দেখা যায়; যেমন করিয়া হউক, পিঠটা সমতল রাখিবেই; উহাতে ঢিপি বাঁধাও চলিবে না, আঁচড় কাটাও চলিবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা জেদ নহে, বরং উহা জেদের অভাব। জলের অসীম নমনীয়তাই উহার ঐরূপ আচরণের হেতু। খাড়া হইয়া থাকিতে, বাঁকিয়া থাকিতে, মাথা তুলিয়া থাকিতেই জেদের দরকার; ঢলিয়া পড়িতে জেদের দরকার নাই।

জলের এই তারল্য, এই টলটলে ঢলঢলে ভাব, এই ঢলিয়া পড়ার—এই প্রবাহ জন্মানর প্রবৃত্তি তেলে আছে, ঘিয়ে আছে, ঘোলে আছে, আবার গুড়েও আছে। এ সকলই তরল পদার্থ। গুড়ও তরল পদার্থ; তবে জলে

আর গুড়ে একটু প্রভেদ স্পষ্ট দেখা যায় ; গুড়ও ঢলেন ও বহেন, কিন্তু একটু বিলম্বে। জলে যত তাড়াতাড়ি দ্রুত স্রোত জন্মে, গুড়ে তত দ্রুত স্রোত জন্মে না। গুড়ে হাত ডুবাইলে গুড় সরিয়া যায়, হাত সরাইলে আবার স্থান পূরণার্থ সরিয়া আসে, কিন্তু একটু বিলম্বে আসে ; যেন গুড়ের গায়ে গায়ে ঘষাঘষি আটকা-আটকির ভাব আছে। সেই ঘর্ষণের ফলে একটু বিলম্ব ঘটে, একটু সময় লাগে। গুড় তরল ; কিন্তু **গাঢ়** ; উহার তারল্যে **গাঢ়তা** আছে। জলে সেই গাঢ়তা অল্প,—একেবারে নাই, এমন নহে,—তবে গুড়ের চেয়ে অনেক কম। তরল পদার্থ মাত্রেই এই গাঢ়তার তারতম্য আছে।

গালার বাতি আপাততঃ কঠিন পদার্থ বলিয়া বোধ হয় ; কিন্তু দেখা যায়, উহাও কালক্রমে ঢলিয়া নুইয়া বাঁকিয়া যায় ; আপনা হইতেই যায়, নিজের ভারে নিজে বাঁকিয়া যায়। বাক্সের ভিতরে শীলমোহরের ছাপের জন্য রক্ষিত গালার বাতি আপনা হইতে কালক্রমে বাঁকিয়া যায়, অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ফলে উহাও তরল পদার্থ, কিন্তু উহার গাঢ়তা খুব বেশী ; এত বেশী যে, অল্প সময়ে উহার নমনীয়তা, উহার তরলতা আমরা বুঝিতেই পারি না। বহু বিলম্বে উহা প্রত্যক্ষ করি।

ফলে দাঁড়াইল এই যে, কালসহকারে নোয়াইবার এই প্রবৃত্তিটাই তারল্যের লক্ষণ। জলের মত জিনিস খুব শীঘ্র নুইয়া পড়ে, গুড়ে একটু বিলম্ব হয় ; গালায় বহু বিলম্ব ঘটে।

তামার মত, লোহার মত কঠিন ধাতুদ্রব্যেরও যে এই নমনীয়তা একেবারে নাই, তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তামার বা লোহার দণ্ডে গুরু ভার ঝুলাইলে উহা স্থায়িভাবে নুইয়া পড়ে, ভার তুলিলেও আর স্বভাবে ফিরে না। এমন কি, বড় বড় কড়িকাঠ, লোহার বীম, নিজের ভারে নিজে স্থায়ী বক্রতা প্রাপ্ত হয়, এবং যত দিন যায়, ততই সেই বক্রতা বাড়ে। আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতার দৌড়ের যে সীমা আছে, সেই সীমা ছাড়াইলেই এই দশা ঘটে, তখন কাঠিন্য গিয়া তারল্য আসে। সেই সীমার ভিতরে উহা স্থিতিস্থাপক ও কঠিন, সীমার বাহিরে উহা নমনীয় ও তরল। সোনা রূপা, তামা লোহা, উহারা কিছু দূর পর্য্যন্ত কঠিন, তার পর তরল ; খুব গাঢ়ভাবে তরল। উহাদের গাঢ়তা এত অধিক যে, অল্প সময়ে তারল্য টের পাওয়া যায় না। তবে খুব জোরে যদি আঘাত করা যায়, জোরে হাতুড়ির

ঘা দেওয়া যায়, তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই স্থিতিস্থাপকতার সীমা ছাড়াইয়া যায়, তখন উহাদের নমনীয়তা বা তারল্য ধরা পড়ে। এই তারল্যটুকু আছে বলিয়াই জোরে আঘাতে সোনা রূপার পাত হয়, জোরে টান দিলে তার হয়। সম্পূর্ণ ভাবে তারল্যহীন হইলে পাত হইত না বা তার হইত না। কঠিন পদার্থের ঘাতসহতা একটু তারল্যেরই লক্ষণ।

দেখা গেল, কাঠিন্যের বা তারল্যের নিরূপণ খুব সহজ নহে। একই পদার্থে কাঠিন্যের সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ তারল্য থাকিতে পারে। বলা যাইতে পারে, যাহাদের আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা আছে, যাহারা ভাঙ্গিবে, কিন্তু মচকাইবে না, তাহারাই মোটের উপর কঠিন। আর যাহাদের আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা নাই, যাহারা ক্রমশঃ মচকাইয়াই যায়, নোয়াইয়াই যায়, তাহারা তরল। যাহা কাঠিন্যের সীমার ভিতর কঠিন, তাহাও সীমার পারে তরল হইতে পারে; তবে গাঢ়তার জন্য তাহার তারল্য শীঘ্র প্রকাশ না পাইতে পারে। এরূপ স্থলে তারল্যের প্রকাশ সময়সাপেক্ষ।

তরল পদার্থের চাপ

এইবার তরল পদার্থের আর একটা বিশেষ গুণের কথা পাড়িব। একটা চোঙায় বালি পুরিয়া তার তলে ছিদ্র করিলে ছিদ্র দিয়া ঝুরঝুর করিয়া বালি বাহির হইবে, কিন্তু চোঙার গায়ে পাশে ছিদ্র করিলে সে পথে বালি বাহির হইবে না। কিন্তু চোঙায় জল পুরিয়া তলায় বা পাশে যেখানে ছিদ্র কর না কেন, সেই পথে জলের প্রবাহ ছুটিবে। বালি কেবল চোঙার তলের উপর চাপ দেয়, আর জল তলেও চাপ দেয়, পাশেও চাপ দেয়। শুধু পাশে কেন, জল উর্দ্ধমুখেও চাপ দিতে পারে। গাড়ুতে কানায় কানায় জল পুরিলে দেখা যায়—উহার নলের মুখ হইতে উর্দ্ধমুখে জলের ফোয়ারা ছুটিয়াছে। নলের মুখটা গাড়ুর কানার নীচে থাকিলে এরূপ ঘটে। কানায় কানায় জলে ভরা কলসীর গলার নীচে—অর্থাৎ যেখানটাকে কলসীর কাঁধ বলা চলিতে পারে, সেই কাঁধে একটা ফুটা করিলে নীচের জল উর্দ্ধমুখে বাহির হয়। সে যাক, উর্দ্ধমুখে চাপ পড়ে বলিয়াই ভিতরের জল বাহিরে উর্দ্ধমুখে ছুটিতে থাকে। জলেরই ফোয়ারা হয়; বালির এরূপ ফোয়ারা হয় না। জল নিম্নমুখে, পার্শ্বমুখে, উর্দ্ধমুখে, সকল মুখেই চাপ দেয়। তরল পদার্থেরই এই স্বভাব, উহার **চাপ** সর্ব্বতোমুখ। কঠিন পদার্থের চাপ কেবল নিম্নমুখ।

জলের চাপ সর্ব্বতোমুখ বটে, তবে সর্ব্বত্র পরিমাণে সমান নহে। জলের পিঠ সর্ব্বদা সমতল থাকে, আগে বলিয়াছি; সেই পিঠের যত নীচে যাওয়া যায়, অর্থাৎ যত গভীর জলে নামা যায়, চাপের মাত্রা ততই বাড়িয়া যায়। ইহাও ঐ চোঙা হইতেই পরীক্ষা করিলে বুঝা যাইবে। চোঙার পাশে দুইটা ছিদ্র কর; একটা উচ্চে, একটা নিম্নে। দুই ছিদ্র দিয়াই জল বাহির হইবে, কিন্তু উপরের ছিদ্রপথে যে জল বাহির হইবে, তাহার বেগ অল্প, নীচের ছিদ্রের জলের বেগ অধিক। কেন না, যে জল নীচের ছিদ্র দিয়া বাহির হইতেছে, সে গভীর জল; উপরের ছিদ্রের জল তত গভীর জল নহে। জলের গভীরতা যেখানে এক হাত, সেখানে যে চাপ, গভীরতা যেখানে দশ হাত, সেখানে চাপ ঠিক তাহার দশগুণ,—পোনেরগুণও নহে, নয়গুণও নহে,—ঠিক দশগুণ।

ঠিক দশগুণ কিরূপে জানিলে? পাঠক হয়ত উত্তর দিবেন—কেন, এ ত সহজ হিসাব, ত্রৈরাশিকের আঁক। এক হাত নিম্নে চাপ যদি হয় একগুণ, দশ হাত নিম্নে চাপ হইবে দশগুণ। এক টাকায় এক মণ চাউল হইলে দশ টাকায় দশ মণ চাউল পাওয়া যাইবে, সেইরূপ। কিন্তু আমাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে, চাপের এই হিসাবে উত্তরটা যদিও ঠিক হইল, কিন্তু হিসাবের প্রাণালীটা ঠিক হইল না।

প্রাকৃতিক নিয়ম

কেন ঐ হিসাব ঠিক হইল না, বলিবার পূর্ব্বে একটা পাল্‌টা প্রশ্ন করিব। এক হাত নিম্নে যে চাপ, দশ হাত নিম্নে চাপ তাহার দশগুণ না হইয়া যদি বিশগুণ হইত, তাহা হইলে তুমি কি করিতে? যদি বিধির বিধান সেইরূপ হইত, তাহা হইলে তুমি কি করিতে? তুমি হাজার কান্নাকাটা করিলেও, মাথা. খুঁড়িলেও বিধির বিধান উল্‌টাইত না। তখন ত্রৈরাশিকের হিসাব খাটিত না। বিধাতার ব্যবস্থার উপর তোমার কি হাত আছে? বিধাতার ব্যবস্থা বলিতে যদি আপত্তি থাকে, বল—প্রকৃতির খেয়াল বা প্রাকৃতিক নিয়ম। নামে কিছু যায় আসে না। খেয়ালই বল, আর নিয়মই বল, আর বিধানই বল, ঐরূপ হইলে তোমার ত্রৈরাশিকের হিসাব কোথায় থাকিত? বাধ্য হইয়া তাহাই মানিয়া লইতে হইত। যদি পরিমাণ করিয়া বস্তুতই দেখা

যাইত, এক হাত নীচে যে চাপ, দশ হাত নীচে চাপ তাহার বিশগুণ, তখন তাহাই মানিতে হইত। কাহার সহিত এখানে ঝগড়া চলিবে?

যদি বল, বিধাতার বিধান বা প্রকৃতির খেয়াল এমন অসঙ্গত কেন হইবে? তাহার উত্তরে আমি বলিব, কেন হইবে না? তাহার উপর তোমার কি জোর? অথবা যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এইরূপ বিচার, চাপ বিশগুণই বটে, দশগুণ নহে, তখন আর কি কথা? যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। ঘাড় পাতিয়া মানিতে হইবে।

বস্তুতঃ সর্ব্বত্র ত্রৈরাশিকের নিয়ম খাটে না। এক বৎসরের গরুর দাম দশ টাকা হইলে, দুই বৎসরের গরুর দাম বিশ টাকা হইবে কি? না, এখানে ত্রৈরাশিকের নিয়ম খাটিবে না। ওজনে চাউল কিনিবার সময় খাটে, কিন্তু বয়স ধরিয়া গরু কিনিবার সময় খাটে না। চাউল কিনিবার সময়ই কি সর্ব্বদা খাটে? তাহাও নহে। এক টাকায় এক মণ চাউল পাওয়া যায়, কিন্তু দশ টাকার চাউল লইলে অনেক সময় একটু সস্তা দরে পাওয়া যায়, দশ মণের কিছু অধিক পাওয়া যায়। অল্প জিনিস যে দরে বিক্রয় হয়, অধিক জিনিস তার চেয়ে সস্তা দরে বিক্রয় হয়। দরটা জানিলে তবে হিসাব চলে। যেখানে সমান দর, সেইখানেই ত্রৈরাশিক চলে, নতুবা চলে না। দর সমান কি না, তাহা বাজারে গিয়া না জানিলে চলিবে না; ঘরে বসিয়া ত্রৈরাশিক কষার কর্ম্ম নহে। যেখানে ত্রৈরাশিক খাটে, সেইখানেই ত্রৈরাশিক খাটিবে। যদি বাজারে গিয়া বুঝ, ত্রৈরাশিক চলিবে না, তখন ত্রৈরাশিক খাটাইলে চলিবে না। ফলে, বাজারের উপর তোমার যেমন হাত নাই, সেখানে বিক্রেতার খেয়াল অথবা বাজারের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, সেইরূপ বৈজ্ঞানিক হিসাবেও বিধাতার খেয়াল বা প্রকৃতির নিময় মানিয়া চলিতে হইবে। বাজারে গিয়া যেমন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়, কোন্ ওজনে কত দর, এখানেও সেইরূপ প্রকৃতির বাজারে জিজ্ঞাসা করিয়া যাচাই করিয়া জানিতে হইবে, হিসাবের প্রণালীটা কিরূপ; ত্রৈরাশিক থাকিবে কি না? যদি যাচাই করিয়া জানিতে পার, ত্রৈরাশিক চলিবে, উত্তম; হিসাব সহজ হইল; যদি দেখ চলিবে না, তাহা হইলে হিসাব জটিল হইয়া পড়িল। যাহা দেখিবে, তাহাই ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

জলের চাপের হিসাবে ত্রৈরাশিকের অঙ্কই খাটে; এক হাত নীচে যে চাপ, দশ হাত নীচে তাহার দশগুণ দেখা যায়, এগারগুণও দেখা যায় না,

নয়গুণও দেখা যায় না। উত্তম কথা, যখন বিধাতার বিধান বা প্রকৃতির খেয়াল এইরূপ, তথাস্তু। যদি অত সহজ হিসাব না হইত, যদি বিধান বা খেয়াল অন্যরূপ হইত, তাহাই মানিতে হইত।

অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ

ফলে, ঘরে বসিয়া কাগজে কলমে আঁক কষিলে কোন কালে কোন জিনিসের মূল্যনির্ণয় চলে না। বাজার যাচাই করা চাই। প্রকৃতির বাজারও যাচাই করা আবশ্যক। এই কর্ম্মের নাম পর্য্যবেক্ষণ। আরও ছোট কথায় **অবেক্ষণ**। যদ্দ্বারা অবেক্ষণ হয়, তাহার নাম ইন্দ্রিয়—দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি। এইগুলি বাহিরের ইন্দ্রিয়; ইহা ছাড়া একটা ভিতরের ইন্দ্রিয় আছে—তাহার নাম মন। দেখিয়া শুনিয়া স্থির করিতে হইবে, কোথায় কিরূপ বিধান বা কোথায় কিরূপ খেয়াল। বুদ্ধিবৃত্তির চেষ্টায় ইহার নিরূপণ হইবে না। বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলি এই সকল বিধান অনুসন্ধান করিয়া মনের দুয়ারে হাজির করিবে; মন বা অন্তরের ইন্দ্রিয় তাহা বুদ্ধির নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। বুদ্ধি তখন বাজারের বিধানের সংবাদ পাইয়া তদনুসারে আঁক কষিতে বসিবেন। আঁক যে সর্ব্বত্রই ত্রৈরাশিকের নিয়মে হইবে, তাহা নয়।

বাস্তবিকই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোথায় কি বিধান, তাহা ঠিক করিয়া লইতে হয়। পরিমাণ নিরূপণের জন্য মাপকাঠি ব্যবহার করিতে হয়, করিবে। ইন্দ্রিয় যদি অপটু হয়, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য কৌশল উদ্ভাবন, যন্ত্রের উদ্ভাবন করিবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দূরদৃষ্টির জন্য চোখে চশমা লাগাইতে হয় লাগাও, দূরবীন লাগাইতে হয় লাগাও;—এ সকল কৌশলময় যন্ত্র ইন্দ্রিয়কে সাহায্য করিবে। কিন্তু চোখটা চাই। চোখ না থাকিলে চশমায় চলিবে না, দূরবীনও কানা হইবেন।

জলের চাপ কত হাত নীচে কত, তাহা মাপিয়া দেখিতে হইবে; অবেক্ষণ দ্বারা ঠিক করিতে হইবে। জলে ডুবিয়া চাপের পরিমাণ মাপা সহজ নহে; তবে চোঙাতে জল পুরিয়া, চোঙার গায়ে, উপরে, নীচে, নানা স্থানে ফুটা করিয়া, কোন্ ছিদ্র হইতে কত বেগে জল বাহির হইতেছে দেখিয়া, কত হাত নীচে কত চাপ, তাহা মাপা চলিতে পারে। চোঙা

গড়িয়া, তাহাতে জল পুরিয়া, গায়ে ছিদ্র করিয়া, নীচে কত চাপ মাপিতে হইবে। এইরূপ বন্দোবস্তপূর্ব্বক যে অবেক্ষণ, তাহার নাম **পরীক্ষণ।** যে ঘটনা আপনা হইতে ঘটে না, তাহা কৌশলপূর্ব্বক ঘটাইয়া অবেক্ষণের নাম পরীক্ষণ। অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ, এই দুই উপায়ে আমরা প্রকৃতির বিধান বা বিধাতার খেয়াল কোথায় কিরূপ, জানিয়া লই। অন্য উপায় নাই। ইহাই বৈজ্ঞানিকের পন্থা। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কারের এক মাত্র উপায় অবেক্ষণ বা পরীক্ষণ-সহকৃত অবেক্ষণ। বহু স্থলে প্রকৃতির আচরণের উপর হস্তক্ষেপ করিবার আমরা অবসর পাই না ; সে ক্ষেত্রে পরীক্ষণের উপায় থাকে না ; অবেক্ষণেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। জ্যোতিষ্কগণের গতিবিধি, মেঘ বৃষ্টি, জল ঝড়, ভূমিকম্প, জোয়ার ভাটা প্রভৃতির উপর আমাদের কিছু মাত্র প্রভুত্ব নাই ; আমরা কেবল বসিয়া বসিয়া ঐ সকল ঘটনা অবেক্ষণ করি মাত্র ; এবং যদি ঐ সকল ঘটনার পারম্পর্য্যে বা সাহচর্য্যে প্রকৃতির কোন বিশেষরূপ খেয়াল বা বিধান দেখিতে পাই, তাহা টুকিয়া যাই। তবে অবেক্ষণ ব্যাপারে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যার্থ যন্ত্রের আশ্রয় লইয়া থাকি ও মাপের জন্য, সূক্ষ্ম পরিমাণের জন্য নানা কৌশল উদ্ভাবন করি। কিন্তু কঠিন তরল অনিল বিবিধ পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধানের সময়, উত্তাপের আলোকের তাড়িতের ক্রিয়াপ্রণালী বুঝিবার সময় আমরা ইচ্ছা করিয়া, চেষ্টা করিয়া, প্রাকৃতিক ঘটনায় ঐ সকল ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক যে সকল জটিলতা আছে, তাহা যথাসাধ্য বর্জ্জন করিয়া, ঐ সকল আনুষঙ্গিক ফলাফলকে আয়ত্ত রাখিয়া, উহা আলোচনা করি, পর্য্যবেক্ষণ করি ; এইরূপ পর্য্যবেক্ষণের নাম পরীক্ষা। এই পরীক্ষাপদ্ধতি আশ্রয় করিয়াই বিজ্ঞানশাস্ত্র এত অল্প দিনের মধ্যে এত অদ্ভুত ফল লাভে সমর্থ হইয়াছে। প্রকৃতিতে যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহা বড়ই জটিল ; একটা কারণে নানা কার্য্য ঘটে ; নানা কারণ একত্র উপস্থিত হইয়া একটা কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করে ; কোন্ কারণের ফলে কোন্ কার্য্য, তাহা কেবল অবেক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করা কঠিন হয়। এই জন্য যত দিন মানুষ কেবল অবেক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া সন্তুষ্ট ছিল, তত দিন জ্ঞানের উন্নতি মন্থরগতিতে ঘটিয়াছিল। যে দিন হইতে বুদ্ধিমানেরা প্রকৃতির জটিলতা বুদ্ধিপূর্ব্বক পরিহার করিয়া, নানা কারণের মধ্যে একটি কারণকে সম্মুখে রাখিয়া, অন্য কারণগুলিকে কৌশলক্রমে ও চেষ্টাক্রমে

অপসৃত করিয়া, সেই একটি কারণের ফলে কি কার্য্য হয়, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন, তখনই জ্ঞানের উন্নতি দ্রুতগতিতে আরম্ভ হইল। এই জন্যই কথায় কথায় বলা হয়, একালের বিজ্ঞানশাস্ত্র মুখ্যতঃ পরীক্ষা-প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

ফলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের অবলম্বিত এই পদ্ধতি কোন এক জন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এক দিন সহসা আবিষ্কার করিলেন, তার পরদিন হইতেই বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতির আরম্ভ হইল, এরূপ মনে করা ভুল। যে দিন হইতে কার্য্যসাধনার্থ মনুষ্য বুদ্ধিপূর্ব্বক চেষ্টা প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে,—সে কোন্ দিনের কথা, তাহা ইতিহাসে লেখে না—সেই দিন হইতেই এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানুষের এমন অবস্থা ছিল, যখন মানুষ নিজে অগ্নি উৎপাদন করিতে জানিত না; কিন্তু তখনও অগ্নির অস্তিত্ব জানিত না, এমন নহে। অগ্নিগিরি হইতে অগ্নিশিখা বাহির হয়, বজ্রপাতে গাছ জ্বলিয়া উঠে, ভূগর্ভ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হয়, এই সকল নৈসর্গিক ঘটনা আরণ্য মানুষেরও গোচর ছিল। কিন্তু যে দিন কাঠে কাঠ ঘষিয়া বা পাথরে পাথর ঠুকিয়া মানুষ অগ্নির উৎপাদনে সমর্থ হইল, যে দিন অগ্নির উৎপাদনে মানুষ অবেক্ষণ ছাড়িয়া পরীক্ষণ ধরিল, সেই দিন বুঝিল যে, এই কাজের এই ফল, এই কারণের এই কার্য্য। সে দিন মানুষের জ্ঞানার্জ্জনের ক্ষমতা সহসা বিস্তার লাভ করিল; মানুষের মনুষ্যত্বের মাত্রা সেদিন হঠাৎ বাড়িয়া গেল; প্রকৃতির একাংশের উপর তাহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। মনুষ্য কর্ত্তৃক সেই প্রথম অগ্নি উৎপাদনের দিন একটা প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্ক্রিয়া ঘটিল, বোধ হয় তত বড় আবিষ্ক্রিয়া মানুষের জ্ঞানের ইতিহাসে পরবর্ত্তী কালে আর ঘটে নাই। চাষা যখন ভাবী ফলের প্রত্যাশায় যথাসময়ে ভূমি চষিয়া বীজ বপন করে, তখন সে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে; তাহার কোন বিস্মৃতনামা পূর্ব্বপুরুষ বা পূর্ব্বপুরুষগণ পরীক্ষা দ্বারা যে নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিল, সে তাহাই এখন নিজের কাজে লাগায়। ফলে, মানুষ মাত্রই এক এক জন ছোটখাট বৈজ্ঞানিক।

ফলে, মনুষ্যে ও পশুতে এইখানে প্রভেদ; পশু পর্য্যবেক্ষণ করিতে জানে, কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বক পরীক্ষা করিতে অসমর্থ; মানুষ পর্য্যবেক্ষণও করে, পরীক্ষাও করে। জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য মানুষের অবলম্বিত উপায়ই এই। জ্ঞান আর বিজ্ঞান উভয়ই সমার্থক; বিজ্ঞান অর্থে বিশিষ্ট জ্ঞান; বুদ্ধি-পরিচালিত

চেষ্টায় উপার্জ্জিত বিশিষ্ট জ্ঞান। পশুরও জ্ঞান আছে; প্রাকৃতিক ক্রিয়ানিচয়ের অবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান আছে; সেই জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিতে না চাও, ক্ষতি নাই। কিন্তু মানুষ বহু কাল হইতে বৈজ্ঞানিক; কবে হইতে বৈজ্ঞানিক, তাহা ইতিহাসে লেখে না। সে পর্য্যবেক্ষণও করে, পরীক্ষাও করে, সেই জন্য তাহার জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যায়। যে দিন হইতে মানুষ পশুভাব ছাড়িয়া মানুষভাব পাইয়াছে, সেই দিন হইতেই সে বৈজ্ঞানিক।

একালে যিনি মুখ খুলিতে বা কলম ধরিতে জানেন, তিনিই বিজ্ঞানের অপূর্ণতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দুটা বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন না। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন দেখিয়া বলা হয়, বিজ্ঞানের পদ্ধতি দুষ্ট; উহার বিচারে আস্থা স্থাপন অযুক্ত; বৈজ্ঞানিকের কথায় নির্ভর করা অনুচিত। ফলে, এই সকল বিদ্রূপোক্তি উপেক্ষণীয়; কেন না, বিজ্ঞানের পদ্ধতিই মনুষ্য মাত্রের অবলম্বিত ও অবলম্বনীয় এক মাত্র পদ্ধতি। যিনি উপহাস করিতেছেন, তিনিও অন্য কোন পদ্ধতি জানেন না; তিনিও নিজের জীবনে ঐ এক মাত্র পদ্ধতি অজ্ঞাতসারে অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন। তাঁহারও ইন্দ্রিয়বৃত্তি, মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি তাঁহাকে প্রকৃতির ক্রিয়ানিচয়ের পারম্পর্য্য ও সাহচর্য্যের অবেক্ষণে নিযুক্ত রাখিয়াছে; তিনি তাঁহার সাধ্যমত কৌশল উদ্ভাবনা দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে পরীক্ষণ ব্যাপারে সমর্থ করিতে সঙ্কোচ করেন না। তিনিও তাঁহার ও তাঁহার পূর্ব্বগামীদিগের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানকে নিজ জীবনযাত্রার পরিচালনায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন। তিনি যাহা করেন, যাঁহাদিগকে বিশিষ্টভাবে বৈজ্ঞানিক খ্যাতি দেওয়া হয়, সেই বৈজ্ঞানিকেরাও তাহাই করেন; তাঁহার জ্ঞানও অপূর্ণ, বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানও অপূর্ণ। এই অপূর্ণতার কারণে তাঁহার সকল চেষ্টা ফলপ্রদ হয় না, বৈজ্ঞানিকের সকল চেষ্টাও ফলপ্রসূ হয় না। তাঁহাকেও অপূর্ণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া যেমন মাঝে মাঝে জীবনযাত্রায় ঠকিতে হয়, বৈজ্ঞানিককেও অপূর্ণ বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া তেমনই মাঝে মাঝে ঠকিতে হয়। অপূর্ণতা উভয়েরই আছে,—তবে মাত্রার ইতরবিশেষ; আর উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, তিনি হয়ত বৈজ্ঞানিককে উপহাস করেন, আর বৈজ্ঞানিক তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্বজনকে মনুষ্যত্বের সোপানে ক্রমশঃ তুলিয়া দেন।

তরল পদার্থের চাপে ফিরিয়া আসা যাক। তরল পদার্থের চাপ সর্ব্বতোমুখ; তবে তাহার পরিমাণ সর্ব্বত্র সমান নহে। যেখানে গভীরতা যত, সেখানে চাপ তত অধিক। কত অধিক, তাহা ত্রৈরাশিকের আঁক কষিয়া বাহির করা চলে; কেন না, এ ক্ষেত্রে প্রকৃতির তাহাই বিধান।

কতকগুলা চোঙায় বা পাত্রে জল ঢালিয়া যদি পরস্পর কোনরূপে যোগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সবগুলিতেই জলের পিঠ ঠিক সমান উচুতে থাকে; একটায় উচ্চতা কম, অন্যটায় বেশী হয় না। গড়গড়ার নলের দুই প্রান্ত দুই হাতে ধরিয়া ঝুলাইয়া তাহার এক মুখে জল ঢালিলে দেখা যাইবে, দুই ধারের নলে জলের পিঠ ঠিক সমান উচ্চে আছে। একটা প্রান্ত উচুতে, অন্য প্রান্ত নীচে ধরিয়া নলকে জলপূর্ণ করিলে দেখা যাইবে, নিম্নস্থ মুখ দিয়া ঊর্দ্ধমুখে জলের ফোয়ারা বাহির হইতেছে; জল ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়া অন্য মুখের জলতলের সমোচ্চ হইবার চেষ্টা করিতেছে। যেখানে যত ফোয়ারা আছে—নৈসর্গিক বা কৃত্রিম, সকলেরই মূল এইখানে। নিকটা-নিকটি কতকগুলি পুষ্করিণী বা ইঁদারা থাকিলে, সকলগুলিরই জলের পিঠ সমান উচ্চ থাকে; গরমি কালে একটার জল যেমন নামে, অন্যগুলিতেও জল তেমনই নামিয়া যায়। এখানে বুঝিতে হইবে, সচ্ছিদ্র মৃত্তিকামধ্য দিয়া জলের সঞ্চরণ ঘটিতেছে; পুকুরে পুকুরে ও কূপে কূপে মাটির নীচে যোগ রহিয়াছে। বড় শহরের নিকট পাহাড় থাকিলে পাহাড়ের উপরে জল ধরিয়া সেই জল নলযোগে শহরের লোকের বাড়ী বাড়ী সরবরাহ করা হয়।

কোন ভারী জিনিস জলে ডুবাইলে তাহা লঘু বলিয়া বোধ হয়;—যেন তাহার ওজন কমিয়া যায়। তাহার অর্থ কি? সেই জিনিসের উপর চারি দিক্,—চারি দিক্ কেন, দশ দিক্ হইতে জলের চাপ পড়ে; আশ হইতে পাশ হইতে, নীচ হইতে উপর হইতে চাপ পড়ে। আশপাশের জলের গভীরতা সমান, চাপও সমান; চাপে চাপে কাটাকাটি হইয়া যায়। কিন্তু উপরের জল জিনিসটাকে নীচে চাপে, নীচের জল উহাকে উপরে ঠেলে। উপরের জলে গভীরতা কম, চাপটাও কম; নীচে গভীরতা বেশী, ঠেলাটাও বেশী; মোটের উপর উপরের চাপ অপেক্ষা নীচের ঠেলা অধিক হওয়ায় নীচের ঠেলারই প্রাবল্য ঘটে; দশ দিকের জল চক্রান্ত করিয়া জিনিসটাকে মোটের উপর উপর-মুখেই ঠেলা দেয়। তার জন্য উহার ভার অর্থাৎ নিম্নে যাইবার প্রবৃত্তি যেন কমিয়া যায়। সকল জিনিসেরই নিজের একটা ভার

বা ওজন আছে; ইহার কথা পরে হইবে। এই ভারের দরুন সকল জিনিসই নীচে নামিতে চায়। জল কিন্তু চায় ঠেলিয়া তুলিতে। ভার বেশী, ঠেলা কম হইলে জিনিস ডুবে; ভার কম, ঠেলা বেশী হইলে জিনিস ভাসিয়া উঠে।

এক টুকরা শোলা হইতে একখানা প্রকাণ্ড জাহাজ পর্য্যন্ত জলে ভাসে। জলে ভাসিবার সময় জিনিসটার কিয়দংশ জলে ডুবিয়া থাকে, কিয়দংশ জলের উপর থাকে। নিমগ্ন অংশের পৃষ্ঠে আশপাশের জলের ও নীচের জলের চাপ পড়িতেছে। আশপাশের চাপ কাটাকাটি হইয়া যায়। নীচের জলের চাপ জিনিসটাকে উর্দ্ধমুখে ঠেলিয়া ধরিয়া থাকে। জিনিসটার ভার বা ওজন উহাকে নীচে নামাইবার চেষ্টা করিতেছে; জলের উর্দ্ধমুখ চাপ উহাকে উপরে তুলিবার চেষ্টা করিতেছে; এ ক্ষেত্রে যখন জিনিসটা স্থির আছে, নামিতেছে না, উঠিতেছেও না, তখন বুঝিতে হইবে, উহার ভারের পরিমাণ যত, জলের ঠেলার পরিমাণও ঠিক তত।

জিনিসটা ভাসিয়া আছে, উহার কিয়দংশ তখন জলে মগ্ন। খানিকটা জলকে স্বস্থান হইতে সরাইয়া জিনিসটার মগ্ন অংশ যেন সেই জলশূন্য জায়গাটুকু অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই মগ্ন অংশের আয়তন যত, যে জলটুকু অপসারিত হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে, তাহারও আয়তন তত। সেই জলটুকু যখন স্বস্থানে ছিল, তখন স্বস্থানে স্থির হইয়াই ছিল, উহার নিজের ভারে নিজে নিম্নগামী হইতে চাহিতেছিল, কিন্তু উহার নীচের জলের ঠেলা উহাকে নিম্নগামী হইতে দিতেছিল না; কাজেই উহা স্বস্থানেই স্থির ছিল। এখন সেই জল স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। অন্য জিনিসের কিয়দংশ আসিয়া সেই জায়গাটুকু অধিকার করিয়াছে ও নীচের জলের ঠেলা পাইয়া সেই স্থানে স্থির আছে। জলে আগে জলকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, এখন জলে সেই ভাসন্ত দ্রব্যটাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। উভয়ত্র ঠেলা সমান, অতএব উভয়ত্র ভারও সমান। যে জলটুকু স্থানচ্যুত হইয়াছে, তাহারও যে ভার, যে ওজন, এখন যে জিনিস আসিয়া সেই জলের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহারও সেই ভার, সেই ওজন। নতুবা একের স্থান অন্যে পূরণ করিয়া এমনই স্থিরভাবে থাকিতে পারিত না।

এটুকু বিচারে পাওয়া যায়। জলের চাপ যে সর্ব্বতোমুখ, এই সিদ্ধান্তটুকু অবেক্ষণলব্ধ ও পরীক্ষণলব্ধ,—ইহা তর্কে বা বিচারে পাওয়া যায় না।

জলের বেলায় প্রকৃতি ঠাকুরাণীর খেয়াল কেন এরূপ হইল, কেন অন্যরূপ হইল না, এ প্রশ্ন নিষ্ফল। প্রকৃতির যে বিধান প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তাহাই ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু এইটুকু মানিয়া লইলেই ভাসন্ত দ্রব্যের ওজন আর তৎকর্ত্তৃক অপসারিত জলটুকুর ওজন যে ঠিক সমান হইবে, ইহা বিচার দ্বারা আসিয়া পড়ে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি জোরের সহিত বলিবে, চারি দিক্ হইতে ঐরূপে চাপিয়া বা ঠেলিয়া ধরা যদি জলের স্বভাব হয়, তাহা হইলে ভাসন্ত দ্রব্যের ওজন স্থানচ্যুত জলের ওজনের সমান হইবেই হইবে। ইহা হওয়া উচিত ; ইহার অন্যথা হইলে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তির চালনা অসম্ভব হইত। বিচারের ফলে যে এই নূতন তথ্যটুকু পাওয়া যায়, ইহার যাথার্থ্যে যদি সংশয় উপস্থিত হয়, তবে আবার পরীক্ষা করিয়া, ভাসন্ত জিনিসটাকে নিক্তিতে ওজন করিয়া, আর অপসারিত জলটুকুকে নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিতে পার, উভয় ওজন ঠিক সমান কি না। দেখিতে পাইবে, ঠিক সমান হইবে। যদি দেখ সমান নহে, তবে বুঝিতে হইবে, আমাদের বিচারপ্রণালীতে দোষ নাই, গোড়াতে যে পরীক্ষালব্ধ সত্যের উপর আমরা নির্ভর করিয়াছিলাম, জলের চাপ যে সর্ব্বতোমুখ ভাবিয়াছিলাম,—গভীরতা বৃদ্ধিতে চাপের বৃদ্ধি হয়, এই যে তথ্য নির্ণয় করিয়াছিলাম, সেই তথ্য নির্ণয়ে ভুল আছে। অবেক্ষণেই ভুল ছিল, তাহাতেই বিচারফলেও এমন ভুল ঘটিল। গোড়ায় গলদ না থাকিলে এমন ভুল হইত না।

পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর যুক্তি খাটাইয়া দেখা যায়, ভারী জিনিসকে জলে একবার ডুবাইয়া দিলে, তাহার দশ দিকের জলে চক্রান্ত করিয়া তাহাকে ঊর্দ্ধমুখে ঠেলিয়া ধরে, এই ঠেলাটাও ঠিক স্থানচ্যুত জলের ওজনের সমান হয়। জলমগ্ন দ্রব্যের ভারের যে লাঘব দেখা যায়, সেই লাঘবের পরিমাণও এইটুকু। অপসারিত জলের যে ওজন, মগ্ন দ্রব্যের ভার ঠিক ততটুকুই কমিয়া যায়। যে দ্রব্যের ওজন ছিল পাঁচ সেরের ওজন, মনে কর— জলে ডুবাইলে তাহার ওজন তিন সের পরিমাণে কমিয়া গেল ; জলে ডুবিবার পূর্ব্বে ছিল পাঁচ সের ; জলে ডুবিয়া হইয়াছে দুই সের মাত্র। জলে ডুবিলে জিনিস এইরূপ হাল্‌কা হয়। গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমিদীস এই তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। গল্প আছে, এই তথ্য আবিষ্কার করিয়া তিনি আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিলেন। শাস্ত্রেও বলে, বিজ্ঞানই আনন্দ।

এখন অনিলে আসা যাক। অনিলের সর্ব্বজনপরিচিত উদাহরণ বায়ু—যে বায়ুর সাগরে আমরা ডুবিয়া আছি। তরলে যে নমনীয়তা দেখিয়াছি, তাহা অনিলেও বর্ত্তমান; অনিলের নমনীয়তার সীমা নাই বলিলেও চলে। বায়ুর কোনও নির্দ্দিষ্ট আকার নাই। বায়ুতে ছুরির দাগ লাগে না, বায়ুতে বেঞ্চি টেবিল তৈয়ার হয় না, বায়ুতে পুতুল গড়া চলে না। জলে যে তারল্য আছে, বায়ুতেও সেই তারল্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। বায়ু যে পাত্রে রাখ, বায়ু সেই পাত্রের মধ্যে সেই আকারই গ্রহণ করিবে। কাজেই, বায়ুরও আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতার একবারে অভাব। পরন্তু জলকে মুখখোলা পাত্রে রাখা চলে; বায়ুকে সেরূপেও রাখা চলে না। খোলা মুখ দিয়া বায়ু বাহির হইয়া আসে। জল তেমন বাহির হয় না। বোতলের অর্দ্ধেকটা জলে পুরিয়া বাকী অর্দ্ধেক জলহীন রাখিতে পারি; কিন্তু বোতলের অর্দ্ধেকে বায়ু পুরিয়া বাকী অর্দ্ধেক বায়ুহীন রাখা চলে না। বায়ু আপনাকে প্রসারিত করিয়া সমস্ত বোতলটাই অধিকার করিবে। এমন কি, উহাকে ছিপি দিয়া আটকাইয়া রাখিতে হইবে; নতুবা মুখ খোলা থাকিলে সেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। সোডাওয়াটারের বোতলে ছিপি আঁটিয়া বায়বীয় পদার্থ আটকান থাকে; জলও আটকান থাকে। ছিপি খুলিবা মাত্র সেই বায়বীয় পদার্থ বেগে বাহির হয়; কিন্তু জল বাহির হয় না। আমোনিয়ার শিশির ছিপি খুলিবা মাত্র আমোনিয়ার তীব্র গন্ধে ঘর ভরিয়া যায়; আমোনিয়া নামক অনিল তখন বোতলে আটকান থাকে না।

দেখা গেল, তরলে আর অনিলে মিল আছে, আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতার অভাবে। আবার ভেদও আছে; কেন না, অনিল স্বতঃপ্রসরণশীল; তরল সেরূপ নহে। আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা তরলের আছে, প্রচুর মাত্রায় আছে; অনিলের আছে, কি নাই? ফাঁপা রবারের গদিতে বায়ু পুরিয়া তাহাকে চাপ দিয়া সঙ্কুচিত করা চলে; অল্প চাপেই অনেকটা সঙ্কোচ ঘটে; আবার চাপ তুলিয়া লইলে পূর্ব্বআয়তন ফিরিয়া পায়। গাড়ীর চাকার বেড়ে বায়ুর গদি আঁটিবার তাৎপর্য্য ইহাই। অতএব আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা আছে বৈ কি। তবে জলের মত অধিক নাই। কেন না, জলের যৎকিঞ্চিৎ সঙ্কোচনে প্রচুর আয়াস লাগে; বায়ুর অল্প আয়াসেই প্রচুর

সঙ্কোচ ঘটে। অতএব আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা অনিলের আছে বৈ কি; তবে কঠিনের তুলনায় বা তরলের তুলনায় অনেক অল্প।

তরলে ও অনিলে এইরূপ মিল আছে দেখিয়া—উভয়ের মধ্যে এই সমানতা দেখিয়া উহাদের একটা সাধারণ নাম দেওয়া যায়। ইংরেজীতে উভয়কেই বলে fluid। এই নাম উহাদের চাপল্যজ্ঞাপক। আমরা বাঙ্গলায় অনুবাদে চপল শব্দ ব্যবহার করি। তরল ও অনিল, উভয়েরই চাপল্য আছে—উহারা **চপল**। তরলও চপল, অনিলও চপল। চাপল্য কাঠিন্যের উল্‌টা।

অনিলের চাপ

দেখা গেল, তরলে অনিলে কতকটা ভেদ, অনেকটা মিল। আরও একটা মিল আছে। বায়ুরও চাপ আছে। যে জিনিস বায়ুতে নিমগ্ন থাকে, তাহার আশে পাশে, উপরে নীচে বায়ুর চাপ পড়ে। একটা বাক্সে বা বোতলে বায়ু পুরিলে সেই বাক্সের বা বোতলের গায়ে চাপ পড়ে; যেখানেই ফুটা কর না, বায়ু বাহির হইয়া আসিবে। বায়ুর চাপও জলের চাপের মত সর্ব্বতোমুখ; কাজেই জলে কোন জিনিস মগ্ন করিলে তাহা যেমন লঘু বা হাল্‌কা বোধ হয়, বায়ুতে নিমগ্ন দ্রব্যও তেমনই কতকটা হাল্‌কা হওয়া উচিত। বাস্তবিকও তাই; বায়ুশূন্য প্রদেশে ওজন করিয়া দেখা গিয়াছে, জিনিসের ওজন যেন একটু বেশী হয়। যে বায়ুটুকু অপসৃত হয় বা স্থানচ্যুত হয়, তাহার ওজন যতটুকু, বায়ুমগ্ন দ্রব্যের ওজন ঠিক ততটুকুই কমিয়া যায়। হঠাৎ আমরা তাহা বুঝিতে পারি না; কেন না, বায়ু নিজেই অতি হাল্‌কা। তবে তদ্রূপ হাল্‌কা জিনিস বায়ুমধ্যে উপস্থিত হইলে তখন বায়ুর চাপের ফল ধরা পড়ে। বায়ুমগ্ন দ্রব্যের ওজন স্থানচ্যুত বায়ুর ওজনের চেয়ে কম হইলে বায়ুর ঠেলে উহা ঊর্দ্ধগামী হয়। যেমন বেলুন বা ব্যোমযান। উহাতে একটা বৃহৎ ব্যাগের ভিতর একরকম অতি হাল্‌কা অনিল পোরা থাকে; ঐ অনিলের ওজন এত কম যে, ব্যাগের ওজন সমেত উহার ওজন স্থানচ্যুত বায়ুর ওজনের চেয়েও কম হয়। কাজেই উহা বায়ুর ঠেলে উপরে উঠিতে চেষ্টা করে।

জলের চাপ জলের গভীরতাসাপেক্ষ। সমুদ্রের জল স্থানে স্থানে চারি পাঁচ মাইল গভীর। সমুদ্রের তলের উপর সেই চারি পাঁচ মাইল

খাড়াই জলের চাপ পড়ে। ভূপৃষ্ঠের উপর বায়ুর সাগর আছে; কত দূর ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত আছে, বলা কঠিন। অন্ততঃ ৫০।৬০ মাইল পর্য্যন্ত ত আছেই। বায়ু খুব লঘু হইলেও, এতটা গভীর বায়ুসাগরে যখন আমরা ডুবিয়া আছি, তখন সেই ভার টের পাই না কেন? টের পাই না বলিয়া চাপ যে নাই, এমন হইতে পারে না। আশে পাশে, উপরে নীচে, ভিতরে বাহিরে, চাপ পড়ায় চাপের অধিকাংশ কাটাকাটিতেই যায়। স্নানের সময় গভীর জলে ডুবিলেও আমরা জলের চাপ বুঝিতে পারি না; বরং মনে হয়, জল উপর-মুখে ঠেলিয়া তুলিয়া ভাসাইবার চেষ্টাই করিতেছে। এক পাশ হইতে বা এক দিক্ হইতে বায়ু সরাইতে পারিলে, তখন অন্য দিকের বায়ুর চাপ বেশ বোঝা যায়। একটা গেলাসের বা বাটির মুখ নিজের মুখের উপর লাগাইয়া উহার ভিতরের বায়ু চুষিয়া লইলেই চাপের পরিচয় পাওয়া যাইবে। বাহিরের বায়ুর চাপে গেলাসটা বাটিটা গালে আঁকড়াইয়া ধরিবে। তখন ছাড়াইতে জোর লাগিবে। চামড়ার বা রবারের ফাঁপা গোলার ভিতরে বায়ু এরূপে বাহির করিয়া লইলে বাহিরের বায়ুর চাপে ঐ গোলা চুপসিয়া যায়। একটা পিচকারির মুখ জলে ডুবাইয়া উহার কাঠিটা যখন টানিয়া তোলা যায়, তখন পিচকারির ভিতরে জল উঠে। পিচকারি এইরূপ জল টানিবার জন্যই ব্যবহৃত হয়। জল এইরূপে আপনার পিঠের সীমা ছাড়াইয়া উপরে উঠে কেন? বাহিরের জলের পিঠের উপর বায়ুসাগরের চাপ পড়িতেছে। পিচকারির ভিতরে বায়ু থাকিলে, সেই বায়ুরও চাপ থাকিবে; জল উঠিবে না; ভিতরে যদি বায়ু না থাকে, কাঠিটা—পিচকারির অর্গলটা টানিয়া তুলিলে ভিতরটা একেবারে খালি পড়িয়া যায়—সেখানে বায়ু থাকে না;—তখন বাহিরের বায়ুর চাপে জল পিচকারির ভিতর উঠিতে থাকে। ফোয়ারাতে যে কারণে জল উঠে, কতকটা সেইরূপ। সেখানে এক দিকের জলের চাপে অন্য দিকে জল উঠে; এখানে বাহিরের বায়ুর চাপে ভিতরে জল উঠে। জল কত দূর উঠে? প্রচলিত বাঁশের বা টিনের পিচকারি,—যাহা লইয়া ছেলেরা হোলির উৎসবে খেলা করে, তাহা এক হাত দেড় হাত লম্বা হয়; উহার সমস্তটাই জল তুলিয়া জলপূর্ণ করা যায়। যদি পিচকারি বিশ হাত, কি ত্রিশ হাত লম্বা করা যায়, তাহা হইলেও কি সমস্তটা জলপূর্ণ হইবে? এইরূপ বৃহৎ পিচকারি তৈয়ার করিয়া পরীক্ষা হইয়াছে। কূপের ভিতর হইতে, খনির ভিতর হইতে জল তুলিবার জন্য

ঐরূপ বৃহৎ পিচকারির—খেলার জন্য নয়, কাজের জন্য ব্যবহার আছে। এইরূপ বড় পিচকারির নাম বোমাকল—ইংরেজীতে বলে পম্প। দেখা গিয়াছে, ঐরূপ বৃহৎ পিচকারির দ্বারা বাইশ হাত উচ্চ পর্য্যন্ত জল তুলিতে পারা যায়, তাহার উর্দ্ধে কিছুতেই জল উঠে না। পিচকারিতে জল উঠে বাহিরের বায়ুর চাপে; সেই চাপে যতটুকু উঠা উচিত, ঠিক ততটুকু উঠিবে; তাহার অধিক উঠিবে না। পিচকারির ভিতরে প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চির উপর বায়ুর যতটুকু চাপ, পিচকারির ভিতরে প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চির উপর ঠিক ততটুকু ওজনের জল ঠেলিয়া তুলে। বাইশ হাত পর্য্যন্ত জল উঠিলে ঐ জলের চাপ ঠিক বাহিরের বায়ুর চাপের সমান হয়। তাই জল বাইশ হাত পর্য্যন্ত উঠে, আর উঠে না। বাইশ হাত উচু জলের ওজন কত? এক বর্গ ইঞ্চি ফুকর, আর বাইশ হাত লম্বা নল জলপূর্ণ করিয়া সেই জলের ওজন করিলে ওজন প্রায় সাড়ে সাত সের হয়। অতএব প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চি জমির উপর সাড়ে সাত সের ওজনের বায়ু চাপ দিতেছে।

মিথ্যা নহে। প্রতি বর্গ ইঞ্চি জমির উপর, এমন কি, আমাদের দেহের প্রতি বর্গ ইঞ্চির উপর বায়ুর চাপ সাড়ে সাত সের ওজনের সমান। পিচকারি দিয়া জলের বদলে পারা টানিয়া দেখা যায়, জল উঠে বাইশ হাত, কিন্তু পারা উঠে ত্রিশ ইঞ্চি মাত্র; অর্থাৎ দেড় হাতের কিছু বেশী। পারা জলের চেয়ে সাড়ে তের গুণ গুরুভার। কাজেই যে চাপে বাইশ হাত অর্থাৎ তেত্রিশ ফুট জলকে ঠেলিয়া তুলে, তাহাতে পারাকে ত্রিশ ইঞ্চির অধিক ঠেলিয়া তুলিতে পারে না।

উচু পাহাড়ের উপর চড়িয়া দেখা গিয়াছে, সেখানে পারা ত্রিশ ইঞ্চিও উঠে না। তাহার তাৎপর্য্য এই, সেখানে বায়ুব চাপ কিছু কম। তা হইবেই ত! চাপ গভীরতাসাপেক্ষ। ভূপৃষ্ঠে বায়ুসাগরের যে গভীরতা, উচু পর্ব্বতে গভীরতা তার চেয়ে অল্প।

একটা কাচের এক-মুখ-খোলা নল,—ধর, চল্লিশ ইঞ্চি লম্বা নল পারায় পূর্ণ করিয়া, তার মুখ পারার পাত্রে ডুবাইয়া নলটাকে খাড়া করিয়া ধরিলে নলের খানিকটা পারা বাহির হইয়া আসে, সবটা ভিতরে থাকে না। যেটুকু নলের ভিতরে থাকে, তাহার খাড়াই হয় ত্রিশ ইঞ্চি; তার উপরে দশ ইঞ্চি ফাঁক থাকে; উহা প্রায় শূন্য থাকে; সেখানে বায়ুও থাকে না; পারাও থাকে না, অন্ততঃ তরল পারদ থাকে না। ঐ নলকে পাহাড়ের

উপরে বা বেলুনে লইয়া আরও ঊর্দ্ধে গেলে দেখিবে যে, পারা ত্রিশ ইঞ্চিও দাঁড়াইল না; আর একটু নামিয়া আসিল। ঐরূপ নলের ভিতর পারার খাড়াই দেখিয়া বায়ুর চাপ কোথায় কত, তাহা নির্ণয় হয়। উহাকে **বায়ুমান** যন্ত্র বলা যায়, ইংরেজী নাম বারোমিটার। ঘরের ভিতরে বায়ু আছে, খোলা উঠানেও বায়ু আছে। উঠানের বায়ুর যে চাপ, ঘরের ভিতরের বায়ুরও সেই চাপ। ছাদের ব্যবধান আছে বলিয়া মনে করিও না যে, ঘরের মেজের উপর যখন বায়ুসাগর নাই, তখন বায়ুর চাপ অল্প। তরল আর অনিলের ধর্ম্মই এই যে, যেখানে চাপ অধিক, সেখান হইতে, যেখানে চাপ অল্প, সেখানে উহা সঞ্চরণ করে; ইহাতেই স্রোত জন্মে, প্রবাহ জন্মে। অবশ্য সঞ্চরণের পথ থাকা চাই। পথ থাকিলে চাপের একটু ন্যূনাধিক্যই যথেষ্ট; তরল আর অনিল, উভয়ই প্রবাহিত হইয়া, যেখানে অধিক চাপ, সেখান হইতে, যেখানে অল্প চাপ, সেখানে প্রবাহিত হইয়া, দুই জায়গার চাপ সমান করিয়া লয়। উহাদের নমনীয়তা, উহাদের চাপল্যই ইহার কারণ। উঠানের বায়ুর সঙ্গে যখন ঘরের বায়ুর যোগ আছে, তখন উভয়ত্রই বায়ুর চাপ সমান। উঠানে চাপ অধিক হইলে উঠানের বায়ু ঘরে ঢুকিয়া চাপ সমান করিয়া লয়। ঘরে অধিক হইলে ঘরের বায়ু উঠানে চলিয়া চাপ সমান করিয়া লয়। কাজেই ঘরে বাহিরে শেষ পর্য্যন্ত চাপ সমানই হয়।

চাপের এইরূপ ইতরবিশেষেই বায়ুমধ্যে প্রবাহ জন্মে। কখনও কোন কারণে কোনও দেশের বায়ুর চাপ কমিয়া গেলে অন্য দেশের বায়ু তৎক্ষণাৎ সেই দেশে বেগে চলিয়া আসে। তখন হাওয়া বহে। চাপের মাত্রাভেদ অধিক হইলে হাওয়ার বেগও অধিক হয়,—হাওয়া তখন ঝড়ে দাঁড়ায়। বায়ুর চাপ নানা কারণে কমে, কখন্ কতটুকু কমে, তাহা পূর্ব্বোক্ত বায়ুমান যন্ত্রে জানা যায়। চাপ অধিক কমিলে ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ বুঝিতে হইবে।

দেখা গেল, ঘরের ভিতরে বায়ুরও চাপ আছে; বাহিরেও যত, ভিতরেও তত। ঘরের জানালা দরজা নিফাঁক করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেও যে বায়ু ঘরের মধ্যে বদ্ধ থাকিল, তার সেই চাপই বজায় থাকে। পথ রুদ্ধ হইবা মাত্র চাপ বাড়ে না বা কমে না।

একটা বোতল যেন একটা ছোট ঘর। উহার ভিতরে যে বায়ু আছে, তাহারও চাপ বাহিরের চাপের সমান। ঐ বোতল যদি ছিপি দিয়া বন্ধ করি, তাহা হইলেও ভিতরে যে বায়ু আটকান থাকিল, তাহার চাপ সেই বাহিরের বায়ুর সমান থাকিল। নতুবা বোতল খুলিলেই হুস্ করিয়া খানিকটা হাওয়া চলাচল করিবে। তাহা ত হয় না। বাক্সের ভিতরে, দোয়াতের ভিতরে, যেখানে যত রন্ধ্র আছে, সকল রন্ধ্রেই বায়ু আছে; যেখানেই থাকুক, উহার চাপ সেই বাহিরের বায়ুর সমান, প্রতি বর্গ ইঞ্চির উপর সাড়ে সাত সেরের ওজন।

পিচকারির কাঠি অর্থাৎ অর্গল টানিলে পিচকারির ছিদ্র দিয়া বায়ু প্রবেশ করিবে। যে বায়ু প্রবেশ করিল, তাহার চাপও সেই বাহিরের চাপের সমান। ছিদ্র আঙ্গুল দিয়া বন্ধ কর, তখনও ভিতরে বদ্ধ বায়ুটুকুর সেই চাপ থাকিয়া গেল।

তখনও সেই চাপ থাকিল বটে, কিন্তু ছিদ্র রুদ্ধ রাখিয়া যদি অর্গলটি নাড়া যায়, তখন আর সে চাপ থাকিবে না। এখন অর্গলটি ঠেলিলে ভিতরের বায়ু সঙ্কুচিত হইবে। সঙ্কোচনে প্রয়াস লাগিবে; কেন না, বায়ুর আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা আছে। যতই ঠেলিবে, ততই সঙ্কোচন ঘটিবে; অর্থাৎ বদ্ধ বায়ুর আয়তন কমিয়া যাইবে। আয়তন যত কমিবে, উহার চাপও তত বাড়িবে। পিচকারিকে ধরিয়া টানিতে যে জোর দিতে হইতেছে, তাহাতেই কতকটা বুঝিবে যে, ভিতরে বায়ুর সঙ্কোচনের সহিত চাপের মাত্রা বাড়িতেছে। এখন যদি ছিদ্র হইতে আঙ্গুল সরাইয়া লই, অমনই ভিতরের বদ্ধ বায়ু—যার চাপ এখন বাহিরের বায়ুর চেয়ে বেশী হইয়াছে, ঐ বদ্ধ বায়ু—খানিকটা হুস্ করিয়া বাহিরে আসিবে। ক্ষণেকের জন্য একটা হাওয়ার সৃষ্টি হইবে; একটু পরেই ভিতরে বাহিরে চাপ আবার সমান হইবে।

ছিদ্র বদ্ধ করিয়া অর্গল ঠেলিলে বদ্ধ বায়ুর সঙ্কোচ ঘটে এবং চাপ বাড়ে, আর অর্গল টানিলে আয়তন বাড়িয়া প্রসারণ ঘটে, তখন চাপ কমে। চাপ যখন কমিয়াছে, তখন ছিদ্র খুলিয়া দিলে বাহিরের বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিয়া চাপ সমান করিয়া লইবে।

ছিদ্র বদ্ধ করিয়া অর্গল ঠেলিলে বদ্ধ বায়ুর সঙ্কোচ ঘটে এবং চাপ বাড়ে, আর অর্গল টানিলে আয়তন বাড়িয়া প্রসারণ ঘটে, তখন চাপ কমে। চাপ

যখন কমিয়াছে, তখন ছিদ্র খুলিয়া দিলে বাহিরের বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিয়া চাপ সমান করিয়া লইবে।

আয়তন বৃদ্ধিতে চাপের হ্রাস, আয়তন হ্রাসে চাপের বৃদ্ধি। কতটা বৃদ্ধিতে কতটা হ্রাস? বিনা পরীক্ষায় বলা চলে না। তর্কে চলিবে না। প্রকৃতির বাজার যাচাই করা চাই। মাপিয়া দেখিতে হইবে, কতটা সঙ্কোচে চাপের কতটা হ্রাস ঘটে। রবার্ট বয়েল মাপিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, প্রকৃতির খেয়াল অদ্ভুত; হিসাব খুব সহজ। আয়তন অর্দ্ধেক কমিলে চাপ হয় দ্বিগুণ; আয়তন তিন ভাগ হইলে চাপ হয় তিনগুণ। আয়তন যে হারে কমে, চাপও ঠিক সেই হারে বাড়ে। রবার্ট বয়েল ইংরেজ; তিনি প্রায় আড়াই শত বৎসর আগে বর্ত্তমান ছিলেন।

বায়ুর এই ধর্ম্ম প্রায় অনিল মাত্রেই বর্ত্তমান। কিন্তু এই ধর্ম্ম তরলে নাই। চাপের বৃদ্ধিতে জলের আয়তনেও সঙ্কোচ ঘটে, কিন্তু যৎসামান্য। জলের আয়তন কমাইয়া অর্দ্ধেক করিতে হইলে, এক বোতল জলকে চাপিয়া আধ বোতল করিতে হইলে ভীষণ চাপ দিতে হইবে; তত চাপ দেওয়া এখন মানুষের সাধ্য নহে। আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা অনিলেরও আছে; তবে জলের তুলনায় নিতান্ত অল্প; কেন না, জলের সঙ্কোচনে যে প্রয়াস আবশ্যক, বায়ুর সঙ্কোচনে তাহার তুলনায় যৎসামান্য প্রয়াস লাগে।

জড় পদার্থের তিন অবস্থা—কঠিন, তরল, অনিল। তিন অবস্থার কি কি লক্ষণ দেখা গেল। আর একবার আওড়ান ভাল।

কঠিনের নির্দ্দিষ্ট আয়তন ও নির্দ্দিষ্ট আকৃতি থাকে। চাপিলে আয়তন কমে, আর মোচড়াইলে আকৃতি বদলায়। কিন্তু উভয়ই আয়াসসাধ্য। স্বভাবের বিকার ঘটে, তবে বিকারের হেতু অপসৃত হইলে স্বভাবে ফিরিয়া আইসে। ইহাই স্থিতিস্থাপকতা। কঠিনের আয়তনগত ও আকৃতিগত উভয়বিধ স্থিতিস্থাপকতা প্রচুর। আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতার দৌড় সকল জিনিসের সমান নহে। রবারের দৌড় খুব বেশী; কাঠ পাথরের কম। রবারের দৌড় বেশী; কিন্তু মাত্রা কম; কেন না, রবার সহজেই চেপটা হয়, টানা যায়। কাঠ পাথর ধাতুর দৌড় কম; সীমার মধ্যে আকৃতি বদলাইলে স্বভাবে ফিরিয়া আসিতে পারে। কিন্তু সীমা ছাড়িয়া গেলে ফিরে না। তখন কাচ বা পাথর ভাঙ্গিয়া যায়; উহারা ভঙ্গপ্রবণ। কিন্তু ধাতু নোয়াইয়া যায়। যত সময় যায়, ততই নোয়ায় বেশী। নোয়ায় বলিয়াই ধাতু ঘাতসহ,

কাচের মত ভঙ্গপ্রবণ নহে। কিন্তু ধাতুর এই নমনীয়তা উহার কাঠিন্যের লক্ষণ নহে। কঠিন পদার্থেও কিঞ্চিৎ তারল্য একাধারে বর্ত্তমান থাকিতে পারে, ইহা তাহারই লক্ষণ।

তরলের ও অনিলের নির্দ্দিষ্ট একটা আয়তন আছে বটে ; কিন্তু আকৃতির বাঁধাবাঁধি নাই। আকৃতি বদলাইয়াই আছে। বিনা আয়াসেই বদলায়। কাজেই আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা দুয়েরই নাই। এই জন্যই এত সহজে জলে আর বায়ুতে স্রোত বহে, প্রবাহ জন্মে। এই জন্য উভয়কেই চপল বলা যাইতে পারে। আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা দুয়েরই আছে ; তরলের অনেক বেশী, কঠিনের সহিত তুলনীয় ; অনিলের অনেক কম। বোতলের ভিতর খানিকটা অংশ জলে পূর্ণ করা চলে ; কিন্তু খানিকটা অংশ বায়ুতে পোরা চলে না। অনিল প্রসারিত হইয়া সমস্ত বোতলে ব্যাপ্ত হইয়া যায়।

তরল ও অনিল উভয়েই চাপ দেয় ; সেই চাপ আবার সর্ব্বতোমুখ। চাপের পরিমাণ গভীরতাসাপেক্ষ ; উভয়েরই ভার আছে বলিয়া গভীরতা-সাপেক্ষ। দুই স্থানে চাপের সামান্য ইতরবিশেষ হইলেই প্রবাহ ছুটিয়া চাপ সমান করিয়া লয়। কোনও দ্রব্য তরলে বা অনিলে ডুবাইলে উপর নীচের ও চারি পাশের চাপে উহাকে ঠেলিয়া তুলিবার চেষ্টা করে ; উহার ভার একটু কমাইয়া দেয়। মগ্ন দ্রব্যের নিজের ভার তৎকর্ত্তৃক অপসারিত তরলের বা অনিলের ভারের চেয়ে কম হইলে সকল দিক্ হইতে ঠেলা পাইয়া সেই মগ্ন দ্রব্য উপরে ভাসিয়া উঠিতে চায়। তরলের চাপ বাড়াইলে সঙ্কোচন ঘটে, কিন্তু অল্প সঙ্কোচনে প্রচুর চাপ লাগে। কিন্তু অনিলের চাপ দ্বিগুণ করিলেই আয়তন একেবারে অর্দ্ধেক হইয়া যায় ; চাপ দশগুণ করিলে আয়তন একেবারে কমিয়া দশ ভাগের এক ভাগ হয়। চাপ যে হারে বাড়ে, আয়তনও সেই হারে কমিয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত সত্য।

ভার

ভার বা ওজন শব্দটা পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছি। উহার অর্থ বিচার আবশ্যক। কঠিন, তরল, অনিল, ত্রিবিধ জড়েরই ভার আছে। অনিলের ভারও বায়ুশূন্য স্থানে নিক্তিতে ধরা পড়ে। এই ভার ব্যাপারটা কি ?

পাঁচ সের বাটখারা হাতে ধরিয়া রাখিতে ক্লেশ হয় ; আমরা বলি, উহা খুব ভারী ; ছাড়িয়া দিলেই ইহা ভূপতিত হয় ; পতন নিবারণের জন্য উহা

ধরিয়া রাখিতে হয় ; তাহাতে মাংসপেশী পিষ্ট ও পীড়িত হয়, রক্তসঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে, স্নায়ুযন্ত্র আহত হইয়া ক্লেশের অনুভূতি হয়। ঐ ক্লেশের মাত্রা দেখিয়া আমরা মোটামুটি ভারের পরিমাণ করি। কিন্তু ঐ ক্লেশের অনুভূতির উপর নির্ভর করা চলে না ; ক্লেশ মানসিক বেদনা মাত্র ; উহার মাত্রা পরিমাণের কোন উপায় নাই ; কাজেই কেবল হাতে ধরিয়া কোন্ জিনিসের ভার কত, আন্দাজ প্রায়ই ঠিক হয় না। ভার মাপিবার জন্য সূক্ষ্ম উপায় বাহির করিতে হইবে।

ভারী দ্রব্য মাত্রই ছাড়িয়া দিলে ভূপতিত হয়, ভূপতন নিবারণের জন্যই পূর্ব্বোক্ত ক্লেশ। সকল দ্রব্যই মাটিতে পড়ে। তূলার মত, কাগজের মত, ধূলার মত দ্রব্যের ভূপতনে বিলম্ব ঘটে ; বায়ু ভূপতনে বাধা দেয় বলিয়া বিলম্ব ঘটে। বায়ুর ঠেলে বেলুনের মত হাল্‌কা দ্রব্য নিম্নগামী না হইয়া উর্দ্ধগামী হয়। কিন্তু বায়ুশূন্য স্থানে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এমন দ্রব্য নাই, যাহা ভূপতিত হয় না।

উচু ছাদ হইতে পাথর ফেলিলে দেখা যায়, পাথরখানা ভূমিতে পড়ে। কত সময়ে কতটা পড়ে, মাপিয়া না দেখিলে বিজ্ঞান সন্তুষ্ট হয় না। মাটিতে পড়ে, এই জ্ঞান ত সকলেরই আছে,—ইহা সাধারণ জ্ঞান ; কত সময়ে কতটা পড়ে, এই বিশিষ্ট জ্ঞানই বিজ্ঞান। ঘড়ি ধরিয়া মাপকাঠি লইয়া মাপিয়া দেখিতে হইবে। এই প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধিবলে বাহির হইবে না। এখানে প্রকৃতির খেয়াল কিরূপ, তাহা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানিতে হইবে। ঘড়ি ধরিয়া মাপকাঠি লইয়া মাপিয়া দেখা হইয়াছে, প্রথম সেকেণ্ডে পড়ে প্রায় ১৬ ফুট, দ্বিতীয় সেকেণ্ডে ৪৮ ফুট, তৃতীয় সেকেণ্ডে ৮০ ফুট, চতুর্থ সেকেণ্ডে ১১২ ফুট। প্রকৃতির কি অদ্ভুত খেয়াল! বরাবর সমান বেগে নামে না ; প্রথমটা ধীরে নামে ; ক্রমশঃ দ্রুত নামে ; বেগ ক্রমে বাড়িয়া যায়। কত সময়ে কতটা পথ চলে, তাহা দেখিয়া আমরা বেগের নিরূপণ করি। যে ঘণ্টায় এক মাইল হাঁটে, তাহার বেগ কম ; যে ঘণ্টায় তুই মাইল হাঁটে, তাহার বেগ দ্বিগুণ। পতন্ত দ্রব্যের বেগ কত বাড়ে? পতন্ত দ্রব্য প্রথম সেকেণ্ডে পড়ে ১৬ ফুট, দ্বিতীয় সেকেণ্ডে ৪৮ ফুট, তৃতীয় সেকেণ্ডে ৮০ ফুট বেগ। বাড়িল কি হিসাবে? ১৬ + ৩২ = ৪৮, ৪৮ + ৩২ = ৮০, ৮০ + ৩২ = ১১২। কি অদ্ভুত ব্যাপার ; বেগের বৃদ্ধি প্রতি সেকেণ্ডেই সমান, এক এক সেকেণ্ডে ৩২ ফুট করিয়া।

প্রকৃতির খেয়াল এইরূপ হইল কেন? ইহার কোনও উত্তর নাই। বেগ কেন বাড়ে? উত্তর নাই। কেন সেকেণ্ডে ৩২ ফুট হিসাবে বাড়ে, ৪০ ফুট বা ২৫ ফুট হিসাবে বাড়ে না? উত্তর নাই। প্রকৃতির খেয়ালই ঐরূপ। দেখিতেছি যে, বাড়ে এবং ঐ হিসাবে বাড়ে। যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। প্রকৃতির যাহা খেয়াল, যাহা বিধির বিধান, তাহাই মানিতে হইবে। যদি না বাড়িত, তাহাই মানিতে হইত। যদি সেকেণ্ডে ৩২ ফুট হিসাবে না বাড়িয়া সেকেণ্ডে ৩২০০ ফুট হিসাবে বাড়িত, তাহাই মানিতে হইত। প্রকৃতির খেয়ালের উপর আমাদের কোনও প্রভুত্ব নাই।

প্রকৃতির খেয়ালই বল, আর বিধির বিধানই বল, উহার উপর আমাদের কোন হাত নাই। কেন এমন হইল, এইরূপ তর্কেরও কোন অবসর নাই। এইরূপ না হইয়া অন্যরূপ হওয়া উচিত ছিল, এরূপ আক্ষেপও নিষ্ফল। যাহা বিধান, তাহা প্রত্যক্ষগোচর, অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা তাহা সাবধানে আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। ঘড়ি ধরিয়া সাবধানে মাপিয়া অবেক্ষণ দ্বারা আমরা জানিয়াছি যে, এ ক্ষেত্রে এইরূপ বিধান। যত দিন লোক ঘড়ি ধরিয়া মাপিবার চেষ্টা করে নাই, তত দিন লোকে জানিত না যে, এইরূপ অদ্ভুত একটা বিধান আছে। আম জাম নারিকেল, সকল দ্রব্যই বোঁটা ছিঁড়িলে ভূপতিত হয়, সকলেই চিরকাল তাহা দেখিতেছে, কিন্তু উহার পতনের বেগ যে ঐ হিসাবে বাড়িয়া যায়, তাহা কেহ জানিত না। এখনও কয় জন লোকে জানে? বায়ুশূন্য স্থানে সকল দ্রব্যই—সোনার গিনি হইতে হাল্‌কা তূলা পর্য্যন্ত সকল দ্রব্যই ঠিক ঐরূপে ঐ হিসাবে বেগ বাড়িতে বাড়িতে ভূপতিত হয়, তাহাও এক কালে কেহ জানিত না। এখনও কয় জনে জানে?

প্রাকৃতিক নিয়ম

এখন আমরা জানিয়াছি, সকল দ্রব্যই ঠিক ঐরূপ বর্দ্ধমান বেগে নিম্নগামী হয়, অর্থাৎ উর্দ্ধ হইতে নিম্নে নামে। যে পথে যে রেখা ধরিয়া নামে, ঐ রেখাকে বাড়াইলে পৃথিবীর কেন্দ্র স্পর্শ করিবে। বর্ত্তুলাকার পৃথিবীর মাঝে যে কেন্দ্র আছে, সেই কেন্দ্র স্পর্শ করিবে। অতএব বলা যাইতে পারে, আম জাম নারিকেল গাছ হইতে পড়িবার সময় পৃথিবীর কেন্দ্র অভিমুখে পতিত হয়। উহাদের গতি ভূকেন্দ্রের অভিমুখ। উহারা—

উহারা কেন,—যাবতীয় জড় দ্রব্য ভূকেন্দ্রের অভিমুখে পতিত হয় এবং পড়িবার সময় সকল দ্রব্যেরই বেগ সেকেণ্ডে ৩২ ফুট হিসাবে বাড়িয়া যায়। ইহাই বিজ্ঞান। এইরূপ অবেক্ষণলব্ধ তথ্যকে বলা হয় **প্রাকৃতিক নিয়ম**। যেন প্রকৃতি ঠাকুরাণী একটা নিয়ম বাঁধিয়া আইন গড়িয়া দিয়াছেন, সকল দ্রব্যকেই ঐরূপে ভূকেন্দ্রাভিমুখে নামিতে হইবে। কাজেই, উহারা ঐরূপ বিধানমতে বা নিয়মমতে নামিতে বাধ্য। অবশ্য, তিনি ঐরূপ আইন কেন করিলেন, কেন অন্যরূপ করিলেন না, এ প্রশ্নের উত্তর নাই ; অথবা এ প্রশ্নের এক মাত্র উত্তর—ইহা তাঁহার খেয়াল।

ইহা বেশ কাব্য। এক জন প্রকৃতি দেবী বা বিশ্বদেবতা, কল্পনা করিয়া তিনি নিজের খেয়ালমতে আইন গড়িতেছেন ও নিয়ম খাকাইতেছেন ও আমকে জামকে নারিকেলকে সেই নিয়মে বাধ্য করিতেছেন, ইহা বেশ কবিকল্পনা। এইরূপ কাব্যে অনেকের তৃপ্তি ঘটিতে পারে ও ঘটিয়াও থাকে ; কিন্তু ইহাতে জ্ঞানের বৃদ্ধি কিছুই হয় না। কেন না, ইহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে বলিবার কিছুই নাই। আম জাম নারিকেল আপনারাই পরামর্শ করিয়া ঐরূপ নিয়মে পড়িতেছে বা অন্য কাহারও প্ররোচনায় অন্যের স্থাপিত নিয়মে বাধ্য হইয়া ঐ হিসাবে ভূকেন্দ্রমুখে পড়িতেছে, তাহা আমরা জানি না। অতএব এই প্রত্যক্ষগোচর অবেক্ষণলব্ধ বা পরীক্ষণলব্ধ প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে প্রকৃতির খেয়ালই বল, আর বিধির বিধানই বল, তাহাতে বিশেষ কিছু জ্ঞান বৃদ্ধি হয় না। আমরা যাহা দেখিতেছি, যাহারই বিধান হউক, ঘাড় পাতিয়া তাহাই মানিব। যদি অন্যরূপ দেখিতে পাইতাম, তাহাই মানিতাম।

বৈজ্ঞানিকেরা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা এইরূপ নানাবিধ প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কার করিয়াছেন। তরলের ও অনিলের চাপ সর্ব্বতোমুখ, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম—তরল ও অনিল পদার্থ মাত্রের পক্ষে ইহা দেখা যায়। অনিলের চাপ যে হারে বাড়ানো যায়, অনিলের আয়তন সেই হারে কমে, ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম—অনিল মাত্রই এই নিয়মে সঙ্কুচিত হয়। এ সমস্তই প্রাকৃতিক নিয়ম—সমস্তই অবেক্ষণলব্ধ সত্য। যদি অবেক্ষণে অন্য নিয়ম দেখা যাইত, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম হইত। যদি কোনও একটা অনিল ঐরূপ নিয়মে সঙ্কুচিত না হইয়া অন্যরূপে সঙ্কুচিত হইত, তাহা হইলে তাহার পক্ষে তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম হইত।

দেখা যায়, অনিল মাত্রেরই সঙ্কোচনে এক নিয়ম; বায়ুই বল, আর সোডাওয়াটারের অনিলই বল, আর আমোনিয়া অনিলই বল, সকল অনিলের সঙ্কোচনে একই নিয়ম। কিন্তু তরল পদার্থের বা কঠিন পদার্থের সঙ্কোচনে এক নিয়ম নহে। জলের যে হারে সঙ্কোচ ঘটে, তেলের সে হারে ঘটে না। লোহার যে হারে ঘটে, সোনার সে হারে ঘটে না। সমুদয় অনিল এক নিয়ম মানে; কিন্তু তরল বা কঠিন প্রত্যেকের পক্ষে নিয়ম আলাহিদা। কি করা যাইবে! যাহা দেখা যায়, তাহাই মানিতে হইবে।

এক শ্রেণীর কবি আছেন, তাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব দেখিয়া আত্মহারা হন, এবং কেহ বা নিয়মবদ্ধ বিশ্বজগতের, কেহ বা নিয়মকর্ত্তা বিশ্ববিধাতার মাহাত্ম্য গান করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। ইহাদের কাব্য এইরূপ—আহা, প্রকৃতির কি বিচিত্র লীলা! প্রকৃতিতে সর্ব্বত্রই নিয়মের রাজ্য! কোথাও তাহার অণু মাত্র ব্যতিক্রম নাই! নিয়মের রাজ্যে কোথাও অনিয়ম নাই! সকলকেই বাঁধা নিয়মে চলিতে হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব যতই অদ্ভুত হউক, এই বিস্ময় তদপেক্ষা অদ্ভুত। যে দ্রব্য যে ভাবে চলিতেছে, তাহার পক্ষে তাহাই যখন প্রাকৃতিক নিয়ম, তখন অনিয়মের সম্ভাবনা কোথায়? কোনও বস্তু যদি কোনও নিয়ম না মানিত, তাহার পক্ষে সেই না-মানাটাই প্রাকৃতিক নিয়ম হইত। সমস্ত অনিলে একই সঙ্কোচন-নিয়ম মানে, ভাল কথা। যদি কোন অনিল নিয়ম না মানিত, একবারে এলোথেলো উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলিত, সেই উচ্ছৃঙ্খলতাই তাহার পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়ম হইত। বস্তুতই এমন অনিল দুই দশটা আছে, উল্লিখিত সাধারণ নিয়ম তাহারা সম্যক্‌রূপে মানে না। তাহাদের পক্ষে তাহাই নিয়ম। এইরূপ যখন ব্যবস্থা, তখন প্রকৃতির রাজ্যে সর্ব্বত্র নিয়মের অস্তিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইবার অবসর কোথায়?

ফলে, জগতে নানা ঘটনা ঘটিতেছে; যাহাই ঘটুক না, একটা না একটা পদ্ধতিতে ঘটিতেই হইবে। যে চলে, তাহাকে একটা না একটা পথে চলিতেই হইবে। কেহ সোজা পথে, কেহ বাঁকা পথে চলিবে। যে সোজা চলে, সোজা চলাই তাহার নিয়ম; যে বাঁকা চলে, বাঁকা চলাই তাহার নিয়ম। যে যেরূপে চলে, তাহাই যদি তাহার পক্ষে নিয়ম হয়,

তাহা হইলে অনিয়মের সম্ভাবনা বা কল্পনা কিরূপে হয়? ইহাতে বিস্ময়ের হেতুই বা কি হয়?

জগতে নিয়মের রাজত্ব সম্বন্ধে যে সকল ভাবুকতাপূর্ণ বাক্য শুনা যায়, সমস্তই কাব্য। কাব্য ছাড়িয়া আমরা বিজ্ঞানের আসরে নামিব: বিজ্ঞানে প্রাকৃতিক নিয়ম কি অর্থে প্রযুক্ত হয়, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব। পর্য্যবেক্ষণে দেখা যায়, জাগতিক ঘটনাগুলি একবারে পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে। সকলেই আপন আপন পথে চলে বটে, কিন্তু পথে পথে মিল আছে। কেহ বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায় চলে, কতকগুলি বা জোট বাঁধিয়া এক ধারায় চলে। প্রত্যেক দ্রব্যই যেখানে আপন ধারায় চলে, কাহারও সহিত কাহারও মিল থাকে না, তখন উহাই তাহার পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়ম হইলেও, আমরা উহাকে নিয়ম বলিতে চাই না; উহাকে নিয়ম না বলিয়া অনিয়ম বলিলেই ভাল হয়। যেখানে অনেকগুলি জিনিসের একটা বিষয়ে মিল আছে, অনেকগুলিতে একজোট হইয়া এক ধারায় চলে, সেইখানেই আমরা নিয়ম আছে বলিয়া থাকি। জগতে অনৈক্যের অভাব নাই; কিন্তু বহুতর অনৈক্যের মধ্যে বহু ঐক্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানই বিজ্ঞানের একটা প্রধান কার্য্য। অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ এই ঐক্যসন্ধান কার্য্যের প্রধান সহায়। দেখিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় যে, কোথায় ঐক্য আছে; এবং যেখানে ঐক্য দেখি, সেইখানে বলি যে, এখানে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব সাবধানে অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়।

বস্তুতঃ এখানেও বিজ্ঞানে ও সহজ জ্ঞানে কোনও প্রভেদ নাই। যদি প্রত্যেক ঘটনাই আপন আপন ধারায় ঘটিত, কোনও ঘটনার সহিত কোনও ঘটনার মিল দেখা না যাইত, তাহা হইলে মনুষ্যের জীবনযাত্রাই অসাধ্য হইত। মনুষ্যের কেন, পশুরও জীবনযাত্রা চলিত না। পশুরাও জানে,—কেবল যে সংস্কারবশে জানে, তাহা নয়,—অবেক্ষণ দ্বারা লব্ধ জ্ঞানবলে জানে, কোথায় গেলে কিরূপ আহারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। কুকুর মনিবকে ভালবাসে, অন্য লোককে কামড়াইতে যায়; বিড়াল যথাসময়ে গৃহস্বামীর ভোজনের ভাগ লইতে আসে। এ সকল তাহাদের অবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান। তাহারাও বহু দিনের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নিয়মের আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে। মনিবের ব্যবহারে যদি কোনরূপ ঐক্য বা সঙ্গতি না থাকিত,

গৃহস্বামীর ভোজনকাল যদি স্থির না থাকিত, তাহা হইলে কুকুর বা বিড়াল ঐরূপ নির্ভর করিতে পারিত না।

আমরাও যে রাত্রিশেষে যথাসময়ে সূর্য্যোদয় হইবে জানিয়া কালিকার আহারের ব্যবস্থা আজ করি, শীতকালে ফল পাকিবে জানিয়া বর্ষারম্ভে ধান বুনি, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা বহু দিনের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নানাবিধ প্রাকৃতিক ঘটনামধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইয়াছি, কতিপয় প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কার করিয়াছি। ঐরূপ কতকগুলি নিয়ম জানা আছে বলিয়াই জীবনযাত্রা চালান সম্ভবপর হয়। নতুবা আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক বা চেষ্টাপূর্ব্বক জীবনযাত্রা চালাইতে পারিতাম না। কেবল সহজাত সংস্কারের বশে অন্ধভাবে যতটুকু চলা সম্ভব হইত, ততটুকুই চলিত। কালসহকারে আমাদের ভূয়োদর্শন ঘটে; নূতন নূতন ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া—সাবধানে বুদ্ধিসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমরা যতই ঐক্য আবিষ্কার করি, ততই আমাদের বিষয়জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, ততই আমরা সেই জ্ঞানকে নানা কর্ম্মে নিযুক্ত করি, ততই প্রকৃতির উপর আমাদের আধিপত্য বাড়ে।

বল

যাক, ভূমিতে পড়িবার সময় সকল দ্রব্যের বেগ বাড়ে; প্রতি সেকেণ্ডে কত বাড়ে? পর্য্যবেক্ষণে জানিয়াছি, সেকেণ্ডে ৩২ ফুট হিসাবে বাড়ে। যাহারা পর্য্যবেক্ষণ করে নাই, তাহারা ইহা জানে না; কেবল বুদ্ধিবলে ইহা আবিষ্কারের কোন সম্ভাবনা নাই। এইরূপে বেগ বাড়ে কেন? তাহাও আমরা জানি; তবে এরূপ স্থলে আমরা বলিয়া থাকি যে, যেখানে বেগ বাড়ে, সেখানে **বল** আছে; পতন্ত দ্রব্যের উপর 'বল' প্রযুক্ত হয়, পৃথিবীর কেন্দ্র অভিমুখে বল প্রযুক্ত হয়। পৃথিবীর আকর্ষণবলে পতন্ত দ্রব্যের বেগ বাড়ে। এই 'বল' শব্দটির পারিভাষিক অর্থ আছে। প্রচলিত ভাষায় উহার অর্থ যাহাই হউক, বিজ্ঞানের ভাষায় উহার কাটাছাঁটা অর্থ আছে। যেখানে দেখা যায়, বেগ বাড়িতেছে, সেইখানে বলা যায় যে, গতি যে মুখে, সেই মুখে বল আছে; যেখানে বেগ কমিতেছে, সেইখানে বলা যায়, গতির বিপরীত মুখে বল আছে। যেখানে বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, সেখানে বলা যায়, বলও নাই।

পতন্ত দ্রব্যের বেগ বাড়ে দেখিয়া আমরা বলি, পৃথিবীর অভিমুখে উহার যখন গতি, তখন পৃথিবীর অভিমুখে একটা বল প্রযুক্ত হইতেছে। বেগ বাড়িতেছে বলিলেও যে ফল, বল আছে বলিলেও সেই ফল ; কেবল ভাষাটা একটু পণ্ডিতি ধরণের করা হয়, এই মাত্র ; কেন বেগ বাড়িতেছে, উহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করা হয় না।

অনেকের ধারণা যে, ভাষাটা একটু ঘুরাইয়া বলিলেই যেন জ্ঞানের সীমা বর্দ্ধিত হইল। বলের ইংরেজী নাম ফোর্স (force); এই force শব্দ লইয়া কত লোক কত কাব্য রচনা করিয়াছেন। বেগবৃদ্ধির কারণ ঐ force ; force আছে বলিয়াই বেগের বৃদ্ধি ঘটে। উহা যেন একটা কি নিরাকার দেবতাবিশেষ, উহার কাজই হইতেছে বেগ বাড়ান। বিধাতা যেন কতকগুলা ফোর্স সৃষ্টি করিয়া বিশ্বজগতে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহারা পতন্ত দ্রব্যের বেগবর্দ্ধনে বা বেগনাশ কর্ম্মে নিযুক্ত আছে। উহার মধ্যে একটা ফোর্স আম জাম নারিকেলকে ভূকেন্দ্রের অভিমুখে বর্দ্ধমান বেগে প্রেরণ করিতেছে। যেন ভূকেন্দ্রে অবস্থিত এই অশরীরী দেবতা তাহার নিরাকার করপ্রসারণে সকল দ্রব্যকে ভূকেন্দ্রমুখে টানিতেছে। এই সকল ফোর্স আছে বলিয়াই জগতের মধ্যে যেন এই কাণ্ডকারখানা, হুড়াহুড়ি, ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি ব্যাপার চলিতেছে। অতএব গাও ফোর্সের জয়গান। দুঃখের বিষয়, অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক এইরূপ কল্পনার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রের পক্ষে এইরূপ কবি-কল্পনার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় না। ইহার দোষ এই যে, যেখানে আমরা কিছুই জানি না, সেখানেও একটা জ্ঞানের ভাণ আসে। বস্তুতঃ force বা 'বল' বলিয়া কোন অস্তিত্বযুক্ত ভাবপদার্থ কোথাও কিছু নাই। ইহা একটা কল্পিত নাম মাত্র। এই নাম লইয়া একটা দেবতা গড়া বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। বিজ্ঞানের পক্ষে ইহা পৌত্তলিকতা। পতন্ত দ্রব্যের বেগের বৃদ্ধি হয়, ইহাই একটা তথ্য,—অবেক্ষণলব্ধ তথ্য ; ইহা একটা প্রত্যক্ষগোচর ঘটনা—উহাই সত্য। বলের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ হয় না ; উহা একটা ভাষার খেলা মাত্র। 'মরিয়াছেন' পরিবর্ত্তে 'মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন' বলিলে যেমন নূতন কিছুই বলা হয় না, 'পতন্ত দ্রব্যের বেগ বাড়ে' এই বাক্যের পরিবর্ত্তে 'পতন্ত দ্রব্যের উপর একটা বল (force) প্রযুক্ত হইতেছে' বলিলেও তাহার অধিক কিছু বলা হয় না।

সর্ব্বজনবোধ্য চলিত ভাষার পরিবর্ত্তে পণ্ডিতজনবোধ্য পারিভাষিকের ব্যবহার করা হয় মাত্র।

মাধ্যাকর্ষণ

বেগ যেখানেই বাড়ে বা যেখানেই কমে, সেইখানেই আমরা বলিয়া থাকি, গতির অভিমুখে বা বি-মখে একটা বল আছে; এবং সেই বলের এক একটা বিশেষ নাম দিয়া থাকি। আম জাম নারিকেলের পতনকালে বেগ বাড়ে দেখিয়া আমরা বলি, নিম্নমুখে বা পৃথিবীর কেন্দ্রমুখে একটা বল আছে এবং সেই বলের নাম দিই **মাধ্যাকর্ষণ**। একটা মানুষকে দড়ি দিয়া টানিলে বা আকর্ষণ করিলে সে যেমন কাছে আসে, পতন্ত দ্রব্যও কতকটা সেইরূপ ভূকেন্দ্রের অর্থাৎ ভূমধ্যের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়। মাধ্যাকর্ষণ নামের এই সার্থকতা। কিন্তু ইহাতে কেহ যেন মনে না ভাবেন যে, পৃথিবী এইরূপে আম জামকে টানিতেছেন। পৃথিবী আকর্ষণশক্তিবলে সকল দ্রব্যকেই নিজের দিকে টানেন, ইহা বিজ্ঞানের ভাষা নহে; ইহা কাব্যের ভাষা।

নারিকেল বর্দ্ধমান বেগে মাটিতে পড়ে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-বলে ঐরূপ হয়। এই উত্তর অবৈজ্ঞানিক। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-বল কোনরূপ প্রত্যক্ষগোচর পদার্থ নহে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আছে বলিতেছি কেন? পতন্ত নারিকেলের বেগ বাড়ে, এই জন্য বলিতেছি যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আছে, এই উত্তর বরং বিজ্ঞানসঙ্গত। এই জন্তুটা গরু, অতএব ইহা শিং নাড়ে ও হাম্বা করে, ইহা অযুক্তি। শিং নাড়ে ও হাম্বা ডাকে, অতএব ইহার নাম দিয়াছি গরু, ইহাই যুক্তিযুক্ত।

পৃথিবী ও নারিকেলের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর কোনরূপ দড়া-দড়ি আছে কি না, সে স্বতন্ত্র কথা ও বিচার্য্য কথা। থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। এখনও বিজ্ঞানবিদ্যা সেরূপ কোন সংযোগরজ্জুর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারে নাই, অথচ একটা কিছু সংযোগ না থাকিলেও একটা অপরটার দিকে চলে কিরূপে, তাহাও ঠিক বুঝাইতে পারে না। হয়ত. কোনরূপ বন্ধন আছে, তাহা ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইতে পারে।

বলের কোনরূপ অস্তিত্ব নাই বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক এই কাল্পনিক পদার্থকে মাপিতে ছাড়েন না! বেগের বৃদ্ধিতেই বল; বেগের যেখানে

খুব বৃদ্ধি, সেখানেই খুব বল; যেখানে অল্প বৃদ্ধি, সেখানে অল্প বল। সেকেণ্ডে ৩২ ফুট হিসাবে যেখানে বৃদ্ধি, সেখানে যে বল, সেকেণ্ডে ৬৪ ফুট হিসাবে যেখানে বৃদ্ধি, সেখানে বল তাহার দ্বিগুণ, এইরূপ হিসাব করিয়া বল মাপা যায়। পতন্ত দ্রব্যের বেগের বৃদ্ধি ঘড়ি ধরিয়া মাপিয়া দেখা গিয়াছে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র উহা ঠিক সমান নয়। প্রায় সমান, কিন্তু ঠিক সমান নয়। কলিকাতায় যাহা, লণ্ডনে তার চেয়ে একটু অধিক। নিরক্ষ-বৃত্তের নিকটে যত যাই, বল ততই একটু কমে। মেরু প্রদেশের নিকটে যত যাই, ততই একটু বাড়ে। আবার যত উচ্চে যাওয়া যায়, ততই একটু কমে। সমুদ্রপৃষ্ঠে যতটুকু, হিমালয়ের পৃষ্ঠে তার চেয়ে একটু কম।

ভূগোলবিদ্যায় বলে, পৃথিবী ঠিক বর্ত্তুলাকার নহে; নিরক্ষবৃত্তের নিকট একটু ফাঁপা, আর মেরুপ্রদেশে একটু চাপা। লণ্ডন শহর ভূকেন্দ্র হইতে যত দূরে, কলিকাতা তার চেয়ে একটু অধিক দূরে। আবার সমুদ্রপৃষ্ঠ ভূকেন্দ্র হইতে যত দূরে, হিমালয়ের পৃষ্ঠ তার চেয়ে একটু অধিক দূরে। কাজেই দেখা যাইতেছে, ভূকেন্দ্র হইতে দূরে গেলে পতন্ত দ্রব্যের বেগবৃদ্ধির মাত্রাটা একটু কমই হয়।

বেগবৃদ্ধির মাত্রা ধরিয়া বলের মাত্রা পরিমিত হয়; অতএব পতন্ত দ্রব্যের উপর বল—যাহার নাম দেওয়া হয় মাধ্যাকর্ষণ, সেই বলও সর্ব্বত্র সমান নহে। ভূকেন্দ্র হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, মাধ্যাকর্ষণের মাত্রা ততই একটু করিয়া কমিয়া থাকে। যে দ্রব্য যত বেগে পড়িতে যায়, তাহার পতন নিবারণে, তাহাকে ধরিয়া স্থির রাখিতে ততই ক্লেশ হয়। সে দ্রব্য ততই ভারী লাগে। অতএব এই বর্দ্ধমান বেগে পতনপ্রবৃত্তিই সকল দ্রব্যের ভারের হেতু। যেখানে পতনপ্রবৃত্তি যত অধিক, মাধ্যাকর্ষণ বল যত অধিক, সেখানে দ্রব্যের ভারও ততই অধিক।

কলিকাতার চেয়ে লণ্ডনে একটা টাকার ভার একটু অধিক; এক ভরি রূপার ভার একটু অধিক; এক সের চাউলের ভার একটু অধিক। এ আবার কি কথা? ইহা সত্য কথা—ইহা পরীক্ষিত সত্য। কিরূপে পরীক্ষা করিবে? ভারের পরিমাণ ও পরীক্ষা আমরা কিরূপে করিয়া থাকি? ভারপরীক্ষার যন্ত্রের নাম তুলাদণ্ড—তুলদাঁড়ি ও নিক্তি। তুলদাঁড়িতে আমরা ওজন করি কিরূপে? দাঁড়ির এক পাল্লায় চাউল রাখি, অন্য পাল্লায় বাটখারা রাখি; দাঁড়ি যখন ঠিক ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সমান্তরাল হইয়া দাঁড়ায়,

তখন বলি, চাউলের ভার বাটখারার ভারের সমান। এইরূপে ভার পরিমাণ করাকে ওজন করা বলে। কলিকাতা হইতে লণ্ডনে গেলে চাউলের ভার যতটুকু বাড়ে, বাটখারার ভারও ঠিক ততটুকু বাড়ে। কলিকাতাতেও এক সের চাউলের ভার যে বাটখারার ভারের সমান, লণ্ডনেও এক সের চাউলের ভার ঠিক সেই বাটখারার ভারের সমান হয়। দুয়েরই ভার সমানভাবে বাড়িয়া যাওয়ায় ওজনে ভারের বৃদ্ধি ধরা পড়ে না। কিন্তু অন্য উপায়ে এই বৃদ্ধি ধরিতে পারি। রবারের সুতাতে কোন দ্রব্য ঝুলাইলে উহা একটু লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়ে; উহার দৈর্ঘ্য একটু বাড়ে। অর্থাৎ ভার যে হারে বাড়িয়াছে, সুতার দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধিও ঠিক সেই হারে ঘটে। এক সের দ্রব্য কলিকাতায় রবারের সুতায় ঝুলাইলে সুতা যেটুকু বাড়িতে দেখা যায়, লণ্ডনে তার চেয়ে একটু অধিক বাড়িতে দেখা যায়। ভারের বৃদ্ধি ধরিবার ইহা স্থূল উপায়। কিন্তু আর একটা সূক্ষ্ম উপায়ে ভারের বৃদ্ধি ধরা পড়ে। একগাছা সুতার এক প্রান্তে একটা ভারী দ্রব্য বাঁধিয়া অন্য প্রান্ত স্থির রাখিয়া দুলাইয়া দিলে দ্রব্যটা দুলিতে থাকে; ঘড়ির পেণ্ডুলমের মত দুলিতে থাকে—পেণ্ডুলমের মত বলি কেন, উহাই পেণ্ডুলম। এই পেণ্ডুলম ঘণ্টায় কত বার দোলে, তাহা দেখিয়া ভারের হ্রাসবৃদ্ধি সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ করা চলে। দেখা যায়, কলিকাতায় যে পেণ্ডুলম ঘণ্টায় যত বার দোলে, লণ্ডনে সেই পেণ্ডুলম ঘণ্টায় তার চেয়ে কয়েক বার অধিক দোলে। ভারের সঙ্গে এই দোলন-সংখ্যার সম্পর্ক আছে। লণ্ডনে ভার একটু অধিক হয়; অধিক বার দোলনেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। নিরক্ষবৃত্ত হইতে লণ্ডনে লইয়া গেলে জিনিসের ভার হাজারকরা প্রায় তিন বাড়িয়া যায়।

উচু পর্ব্বতে উঠিলে ভার কমে, উহাও পেণ্ডুলম দোলাইলে দেখা যায়। পৃথিবীর কেন্দ্র ছাড়িয়া যত দূরে যাওয়া যায়, ততই ভার কমে। পৃথিবী ছাড়িয়া দশ বিশ হাজার মাইল দূরে যাওয়া সম্ভব হইলে ভার আরও কমিত, ইহা সহজেই মনে হয়। দশ বিশ লক্ষ মাইল দূরে যাইলে ভার অত্যন্ত হাল্‌কা হওয়ার সম্ভব, ইহাও অনুমানসিদ্ধ। অবশ্য অত দূরে যাইবার উপায় নাই, কাজেই প্রত্যক্ষ ভাবে পরীক্ষা চলে না।

দেখা গেল যে, চাউলের ভার সর্ব্বত্র সমান থাকে না, ইহা অস্বীকারের উপায় নাই; কেন না, ইহা অবেক্ষণলব্ধ তথ্য। কিন্তু ভার কমিলেও চাউল ত কমে না। কোন গুরুভার দ্রব্য জলে ডুবাইলে উহা হাল্‌কা হয়, জলের

ঠেলে উহার ভার যেন অনেকটা কমিয়া যায় : কিন্তু সেই জিনিসটাই ত থাকে ; এ ক্ষেত্রেও কতকটা সেইরূপ। এক সের চাউলের ভার যতই কমুক বা বাড়ুক, উহাতে পেট ভরিবে সমানই। চাউলের ভার বাড়ে কমে, কিন্তু চাউল বাড়ে কমে না। তবে চাউলটা কি ? চাউলের চাউলত্ব কিসে ?

এক মণ চাউল মাথায় করিয়া দোকান হইতে বহিয়া আনিতে কি ক্লেশ ! যে বোঝা বহে, সে প্রার্থনা করে, যদি ইহার ভার আরও কম হইত ! ভার একেবারে না থাকিলে মুটে ভাড়া আদৌ লাগিত না। মুটে ভাড়া লাগিত না, অথচ উদর পূরণের পক্ষেও কোন ব্যাঘাত ঘটিত না।

অতএব চাউলের যাহা ভার, তাহা চাউলের চাউলত্ব নহে। ভার কোথাও বেশী, কোথাও কম ; কলিকাতায় যে ভার, দার্জিলিঙে তার চেয়ে কিঞ্চিৎ কম ; ভূমণ্ডলে যাহা, চন্দ্রমণ্ডলে তাহার চেয়ে অনেক কম ; কিন্তু তাই বলিয়া উহার ক্ষুধানিবারণের শক্তি বেশী কম হয় না। তেমনই সোনার ওজন যদি একেবারে না থাকিত, উহার সুবর্ণত্ব যাইত না ; উহাতে ঠিক সেই পরিমাণের গহনা গড়ান চলিত, পরন্তু অলঙ্কারধারিণীকে অলঙ্কার বহনের ক্লেশটা পাইতে হইত না !

বস্তু

অতএব চাউলের যাহা চাউলত্ব ও সোনার যাহা সুবর্ণত্ব, তাহা ভার নহে : তাহার একটা নাম দেওয়া প্রয়োজন। ইংরেজীতে একটা নাম আছে—mass ; বাঙ্গলায় বাঁধা নাম নাই। বিজ্ঞানের পুস্তকে যাঁহার যাহা ইচ্ছা হয়, তিনি সেই নাম দেন। কোন নামটাই এখনও চলে নাই বা সর্ব্বজনসম্মত হয় নাই। একটা নূতন বাঙ্গলা নাম দিবার এখনও অবকাশ আছে। আমার বিবেচনায় উহাই যখন চাউলের চাউলত্ব ও সোনার সুবর্ণত্ব ও জড় দ্রব্য মাত্রের জড়ত্ব, তখন উহার জড়ত্ব নাম দেওয়া চলিতে পারে। ইংরেজীতে আর একটি নাম আছে inertia ; বিজ্ঞানের পুস্তকে এই inertia শব্দটি লইয়া নানা বাগ্‌জালের অবতারণা হয় : কিন্তু প্রকৃতপক্ষে mass ও inertia ঠিক সমানার্থক ; inertia বলিতে যে ভাব আসে, জড়ত্ব বলিতেও ঠিক সেই ভাব আসে ; inertia জড়ের জড়ত্ব, ইহাই mass। কাজেই mass অর্থে 'জড়ত্ব' শব্দের প্রয়োগে আমি আপত্তি

দেখি না। তবে ইংরেজীতে যেমন দুইটি শব্দ আছে, সেইরূপ বাঙ্গলাতে যাঁহারা দুইটি পারিভাষিক শব্দ দেখিতে চান, তাঁহাদের জন্য জড়ত্ব বুঝাইতে আর একটি শব্দ উপহার দিব। পূর্ব্বে আমি এই অর্থে জিনিস শব্দ ব্যবহার করিতাম; কেহ কেহ উহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন, শব্দটা বস্তুতই কর্কশ। জিনিস না বলিয়া আমি এখন **বস্তু** বলিব। এই দ্রব্যটায় বস্তু কত, অর্থ—ইহার mass কত? এই দ্রব্যে অনেকটা বস্তু আছে; ইহা অত্যন্ত massive। বস্তু শব্দ massএর বদলে চলিতে পারে। তাহাই এই পুস্তকে পারিভাষিক অর্থে প্রয়োগ করিব।

বাঙ্গলা ভাষায় পদার্থ, বস্তু, দ্রব্য, জিনিস, এই কয়টি শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। জিনিস শব্দটি বিদেশ হইতে আসিয়াছে; উহার তাৎপর্য্য ঠিক কি, তাহা জানি না। পদার্থ, বস্তু ও দ্রব্য, এই তিনটি সংস্কৃত ভাষা হইতে পাইয়াছি। সংস্কৃত ভাষায়, বিশেষতঃ সংস্কৃত দর্শনের পারিভাষিক ভাষায় উহাদের বিশেষ সংজ্ঞা আছে। কিন্তু বাঙ্গলায় সেই সকল সংজ্ঞার প্রচলনের বোধ করি আর উপায় নাই। বাঙ্গলাতে আসিয়া শব্দগুলির অর্থ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তথাপি তিনটি শব্দ যখন আছে, তখন বাঙ্গলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় উহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করা এখনও চলিতে পারে। বস্তু শব্দ জড়ত্ব বুঝাইবার জন্য রাখিয়া, দ্রব্য শব্দটি নির্দ্দিষ্ট আকারের ও আয়তনের জিনিস, ইংরেজীতে যাহাকে বলে, সেই অর্থে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কঠিন তরল অনিল body ইত্যাদি অবস্থা বুঝাইবার জন্য পদার্থ শব্দটি রাখিয়া দিতে পারি। এই গ্রন্থে যথাসাধ্য এই পরিভাষা আশ্রয় করিব।

এখন বলা যাইবে, এক সের চাউলকে কলিকাতা হইতে বিলাতে লইয়া গেলে উহার ভার বাড়ে, কিন্তু উহার বস্তু বাড়ে না—সেই এক সেরই থাকে। এক ভরি সোনা বিলাতে গেলে উহার ভার বাড়ে, কিন্তু বস্তু সমান থাকে। অতএব গৃহিণীদিগের বিলাত যাওয়ায় লাভ নাই। পুরুষেরা বিলাতে যান—মহিলারা যাইবেন না; সেখানে গহনার ভার বাড়িবে মাত্র।

দেখা গেল যে, ভারবহনে ক্লেশ আছে, বস্তুবহনে কোন ক্লেশের সম্ভাবনা না থাকিতেও পারে। ভার ও বস্তু স্বতন্ত্র ধর্ম্ম। এখন এই বস্তু পরিমাণের উপায় কি?

আমরা সেরে মণে ছটাকে যাহা নির্দ্দেশ করি, তাহা ভার নহে, তাহা বস্তু। আমার কুটুম্ব স্বর্গগত ফকির চৌধুরী পূর্ণ আহারের পর একদিন এক সের ঘৃত, আর একদিন ছিয়ানব্বইটা আম উদরসাৎ করিয়াছিলেন। এ স্থলে সেই ঘৃতের বা আম্ররসের ভার বহনের জন্য তাঁহাকে কেহ বাহাদুরি দেয় নাই; এতটা বস্তু যে তিনি হজম করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার মাহাত্ম্য। এখন এই বস্তু মাপিব কিরূপে? দৈর্ঘ্য মাপিতে মাপকাঠি দরকার; একটা নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের কাঠি ঠিক করিয়া লইয়া তাহাকে এক ধরিয়া তাহার সহিত তুলনায় দুই কাঠি তিন কাঠি দশ কাঠি স্থির করি। সেইরূপ বস্তু মাপের জন্য খানিকটা নির্দ্দিষ্ট বস্তুকে এক ধরিয়া তাহার সহিত তুলনায় বস্তুর পরিমাণ চলিতে পারে। বিলাতে এই জন্য পাউণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে। এ দেশে উহা চলিত নাই। এ দেশে প্রচলিত এক সের। উহা এক পাউণ্ডের প্রায় দ্বিগুণ। এক সেরের চল্লিশ গুণে এক মণ, এক সেরের ষোল ভাগে এক ছটাক, এক সেরের আশী ভাগে এক তোলা বা এক ভরি। চলিত কথায়—আমরা বলি এটার ভার এক সের, ওটার ভার পাঁচ সের; কিন্তু বলা উচিত, এটার বস্তু এক সের, ওটার বস্তু পাঁচ সের অথবা এটার ভার এক সের বস্তুর ভারের সমান, ওটার ভার পাঁচ সের বস্তুর ভারের সমান।

ভার আর বস্তু যদি পৃথক্ হইল, তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে, এক সের সোনার ভার এক সের রূপার ভারের সমান কি না? এক সের চাউলের ভার এক সের লোহার বাটখারার ভারের সমান কি না? দুই দ্রব্যের বস্তু সমান হইলে ভারও সমান হইবে কি না? প্রশ্নটা আর একটু স্পষ্ট করা আবশ্যক। নিক্তিতে বা দাঁড়িতে আমরা দুইটা দ্রব্যের ভার সমান কি না, তাহাই দেখি। এক পাল্লায় থাকিল চাউল, অন্য পাল্লায় থাকিল লোহার বাটখারা। দাঁড়ি সোজা হইলে বুঝিব, দুই পাল্লায় সমান টান পড়িয়াছে, দুই পাল্লাই সমান বেগে ভূমিমুখে বা পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে নামিতে চাহিতেছে; দাঁড়ির ঠিক মাঝখানটা আটকান থাকাতে কোনটাই নামিতে পারিতেছে না। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে; দুই পাল্লাতেই ভার সমান হইয়াছে; বস্তু সমান হইয়াছে কি না, প্রতিপন্ন হয় না। কেন না, ভূকেন্দ্রাভিমুখে পতন চেষ্টাতেই দ্রব্যের ভার হয়। সেই পতন নিবারণ করিতে গিয়াই ভারবহনের ক্লেশ। বস্তুর সহিত এই পতনপ্রবৃত্তির কোন

সম্পর্ক নাই। চাউলের ও বাটখারার ভার সমান হইল, কেন না, দুই পাল্লার পতনপ্রবৃত্তি সমান হওয়াতে কোন পাল্লাই নামিতে পারিল না; কিন্তু উভয়ের বস্তু সমান, কে বলিল? উভয়েরই বস্তু এক সের, তাহা কিরূপে জানিব? বস্তু আর ভার যদি একই ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না; কিন্তু যখন দেখিতেছি, ভার স্থানভেদে ভিন্ন হয়, বস্তু ভিন্ন হয় না, তখন ভার সমান হইলেই যে বস্তু সমান হইবে, কে বলিল?

ফলে, ভার যখন সমান, বস্তু তখন সমান হইবে, উহা হঠাৎ বলা চলে না। বস্তু সমান কি না, তাহা পরীক্ষার স্বতন্ত্র উপায় থাকা উচিত।

বস্তুর আর একটা নাম দিয়াছি 'জড়ত্ব'। এই জড়ত্ব কি, কোন্ ধর্ম্মকে জড়ত্ব বলিতেছি, তাহা এখনও স্পষ্ট বুঝি নাই। উহা পারিভাষিক সংজ্ঞা—স্পষ্ট অর্থ না দিলে বস্তু মাপিবার উপায় পাওয়া যাইবে না।

প্রথমে মানিয়া লইতে হইবে, ভারের সহিত উহার কোন সম্পর্কই নাই। নব্বই মণ লোহা কলিকাতা হইতে বিলাতে লইয়া গেলে উহার ভার একটু বাড়ে, দার্জিলিঙে লইয়া গেলে উহার ভার একটু কমে; চাঁদ যত দূরে, তত দূর লইয়া গেলে উহার ভার কমিয়া এক সের লোহার ভারের তুল্য হয়; পৃথিবীর কেন্দ্রে লইয়া যাইতে পারিলে ভার একবারে কিছুই থাকে না। কাজেই এই ভারটা একটা আগন্তুক ধর্ম্ম। লোহার লৌহত্বের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। লোহার ভার এইরূপ অল্পাধিক হয় বটে, কিন্তু এমন কিছু ঐ লোহাতে আছে, যাহা কমেও না, বাড়েও না; উহাই লোহার বস্তু। লোহার ভার যদি একেবারে না-ই থাকিত, ভূপৃষ্ঠের মুখে উহার পতনপ্রবৃত্তি যদি না-ই থাকিত, তাহা হইলেও উহাতে সেই বস্তুর কোন তারতম্য হইত না। সেই বস্তুই ঐ দ্রব্যের জড়ত্ব; এই জড়ত্বের কখনও হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। এক সের চাউল দোকান হইতে কিনিয়া আনিলাম; ভূপৃষ্ঠে সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া ভূকেন্দ্রে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইলে উহার ভার কিছুই থাকিবে না। কিন্তু উহার ক্ষুধানিবারণের শক্তি কিছুই কমিবে না। উহার বস্তু—উহার জড়ত্ব সমান থাকিবে। কাজেই ওজন করিয়া অর্থাৎ তুলদাঁড়ির দুই পাল্লার পতনপ্রবৃত্তির তুলনা করিয়া বস্তুর পরিমাণ ঠিক হয় না।

বস্তুর পরিমাণ

এখন প্রশ্ন এই—এই যে বস্তু, ইহার পরিমাণ করিব কিসে? কোন্ দ্রব্যে কতটা বস্তু আছে, নির্ণয় করিব কিরূপে? দুইটা দ্রব্যের মধ্যে কোন্‌টার বস্তু অধিক, কোন্‌টার অল্প, তাহা নির্ণয় করিব কিরূপে?

বস্তু পরিমাপের একটা উপায় ধাক্কা। মনে কর, একটা খালি ঘড়া, আর একটা জলপূর্ণ ঘড়া। উভয়ের সমান আকার—সমান আয়তন; একটার ভিতরে বায়ু, অন্যটার ভিতরে জল: অথচ ধাক্কা দিলেই বুঝা যাইবে, কোন্‌টায় বস্তু আছে অধিক। একটা ধাক্কা দিলে খালি ঘড়াটা হটমট করিয়া দূরে গিয়া পড়িবে, পূর্ণ কুম্ভটা হয়ত স্বস্থান হইতে ঈষৎ বিচলিত হইবে মাত্র। এইরূপ ধাক্কা দিয়া কোন্‌টা কত নড়িয়া যায়, তাহাই দেখিয়া আমরা মোটামুটি বস্তুর পরিমাণ নিরূপণ করি। দুইটা দ্রব্যের উপর ধাক্কা সমান হওয়া চাই, নতুবা তুলনা চলিবে না। ঠিক সমান ধাক্কা খাইয়া যেটা অল্প বিচলিত হয়, তাহার বস্তু অধিক, এবং যেটা অধিক বিচলিত হয়, সেটার বস্তু অল্প, বুঝা যাইতে পারে; কিন্তু দুই ধাক্কা ঠিক সমান হইল কি না, বলা খুব সহজ নহে। স্প্রিং কিংবা রবারের দড়ির টান দিয়া বরং এই ধাক্কার পরিমাণ চলিতে পারে। দুইটা স্প্রিংএ যদি সমান টান পড়ে, তাহা হইলে ধাক্কাও সমান হইবে মনে করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বলের এক মাত্র কাজ বেগ উৎপাদন। ধাক্কা বলেরই প্রকারভেদ; সমান বল পাইয়াও যে দ্রব্যে অল্প বেগ জন্মে, তাহার বস্তু অধিক। বস্তু অর্থে ইহাই বুঝিব।

অন্যরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিব। মনে কর, দুই জন আরোহী দুইখানা ডিঙ্গিতে চড়িয়া জলে ভাসিতেছে। এক জন যদি দড়ি দিয়া বা আকর্ষী দিয়া অন্য জনকে টানে, তাহা হইলে কি হইবে? দেখা যাইবে, দুইখানা ডিঙ্গিই পরস্পর নিকটে আসিতেছে। তা যে ব্যক্তিই টানুক না কেন। রামের ডিঙ্গি শ্যামের দিকে চলিতেছে, শ্যামের ডিঙ্গিও রামের দিকে চলিতেছে। যদি দেখা যায়, দুই ডিঙ্গিই ঠিক সমান বেগে পরস্পরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহা হইলে বুঝিব, দুইটারই বস্তু সমান। রামসমেত রামের ডিঙ্গি, আর শ্যামসমেত শ্যামের ডিঙ্গি, উভয়েতেই সমান বস্তু আছে। আর

যদি দেখি, একের বেগ অধিক, অন্যের বেগ অল্প, তাহা হইলে বুঝিব, যাহার বেগ অধিক, তাহার বস্তু অল্প, যাহার বেগ অল্প, তাহার বস্তু অধিক।

এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা বস্তুর সমানতা অথবা অল্পাধিক্য পরিমাণ করা যাইতে পারে। যে বিচলিত হয় যত সহজে, তাহাতে বস্তু তত অল্প, জড়ত্ব তত অল্প; যে বিচলিত হয় যত প্রয়াসে, তাহাতে বস্তু তত অধিক, জড়ত্ব তত অধিক। বস্তু বা জড়ত্বের পারিভাষিক অর্থ ইহাই। অন্য অর্থ দিব না।

এইরূপে ওজনের কাছ দিয়া না গিয়াও বস্তু মাপা চলিতে পারে। এইরূপে যেন স্থির হইল, এই লৌহপিণ্ডের বস্তু ঐ স্বর্ণপিণ্ডের বস্তুর সমান। এখন দাঁড়িপাল্লায় চড়াইয়া উভয়ের ভার সমান কি না, ওজন করিয়া পরীক্ষা কর। বস্তু সমান বলিয়া ভারও যে সমান হইবে, এমন কোন কথা নাই। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, বস্তুগত্যা দেখা যায়, দুটি দ্রব্যের বস্তু সমান হইলে ভারও সমান হয়—তা সোনা রূপা, কাঠ পাথর, জল বাতাস, যে জিনিসই হউক না। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম—প্রকৃতির খেয়াল বলিতে হইত। যদি এরূপ না হইত, তাহাতেও বিস্মিত হইবার কারণ থাকিত না। বস্তু সমান হইলেই যে ভার সমান হইতেই হইবে, প্রকৃতির উপর এমন জোর হুকুম কেহ দিতে পারে না। বস্তু সমান হইয়াও ভার সমান না হইতেও পারিত। কিন্তু প্রকৃতির এমনই খেয়াল হইয়াছে যে, যে যে দ্রব্যের বস্তু সমান, সেই সেই দ্রব্যের ভারও সমান হইয়াছে। হইয়াছে, ভালই হইয়াছে। সন্ধান করিয়া আমরা অনৈক্যের মধ্যে এই যে ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছি, ইহাতে সুবিধাই হইয়াছে। ভার সমান দেখিয়াই আমরা বস্তু সমান বুঝিয়া লই। নিক্তিতে ওজন করিয়া যখন দেখি, দুই পাল্লায় ভার সমান, তখন জানিতে পারি, দুই দিকে বস্তুও সমান। এইরূপে খুব সহজেই বস্তুর সমানতা দেখিয়া লই। যদি প্রাকৃতিক নিয়ম ঐরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইত, ভার সমান হইলেও বস্তু সমান না হইত, তাহা হইলে তুলদাঁড়িতে ওজন করিয়া বস্তুসামান্য পরীক্ষা করা চলিত না।

দোকানে যখন আমি চাউল কিনিতে যাই, তখন আমি কি চাই? ভার চাই, না বস্তু চাই? উত্তরে বলিব, আমি খানিকটা বস্তুই চাই—যে বস্তুতে আমার উদর পূর্ত্তি হইবে, ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে, সেই বস্তু চাই। এক মণ চাউল কিনিলে এক-শ লোকের খোরাক হইবে, এই আশাতেই আমি চাউল কিনিয়া থাকি। ঐ এক মণ চাউলের ভার লইয়া আমার কিছু মাত্র প্রয়োজন সাধিত

হয় না। তাহার ভার যদি কিছু মাত্র না থাকিত, তাহা হইলে সুবিধা বই অসুবিধা হইত না। এক মণ বস্তুর জন্য আমি সমুচিত মূল্য দিয়া থাকি, ভার না থাকিলে সেই মূল্য লাগিত, কিন্তু ভারবহনের মটে ভাড়াটা লাগিত না। এই ভারটায় আমার কোন উপকার নাই। আমি চাই খানিকটা বস্তু; উপরন্তু ঐ বস্তুর অনাবশ্যক ভারের জন্য আমাকে কিছু ক্ষতি স্বীকারই করিতে হয়। ঐ ভার আমি চাই না, তাহাতে পেট ভরে না, কেবল বোঝা চাপে মাত্র। যাক, চাই আমি এক মণ বস্তু, কিন্তু দোকানদার আমাকে কিরূপে ঐ বস্তু মাপিয়া দেয়? দোকানদার ত বস্তু মাপে না, সে ভার মাপে। সে তুলদাঁড়িতে চাউল ওজন করিয়া দেয়; কিন্তু তুলদাঁড়ি বস্তু মাপিবার যন্ত্র নহে, উহা ভার মাপিবার যন্ত্র। তুলদাঁড়ির এক পাল্লায় চাউল, অন্য পল্লায় লোহার বাটখারা চাপাইয়া যখন দোকানদার বলে, এই লও এক মণ চাউল, তখন এ-পাল্লায় চাউলের ভার, ও-পাল্লায় বাটখারার ভারের সমান হইয়াছে বুঝিতে হয়; দুই পাল্লাই সমান ভাবে ভূপতনের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দাঁড়ির মাঝখানাটা আটকান থাকায় কোন পাল্লাই নামিতে পারিতেছে না, ইহাই বুঝিতে হয়। তবেই দেখ, আমি চাইলাম খানিকটা বস্তু, দোকানদার দিল আমাকে খানিকটা ভার। লোহার বাটখারায় যে বস্তু আছে, আমি সেই পরিমাণে চাউলের বস্তু চাই। কিন্তু দোকানী সে দিক্ দিয়া না গিয়া বাটখারার যে ভার আছে, সেই পরিমাণ ভারের চাউল দিয়া আমাকে বিদায় করিতে চাহে। আমি চাই খানিকটা বস্তু—যাহা উদর পূর্ত্তির জন্য আবশ্যক, সে দিল খানিকটা ভার—যাহাতে উদর পূরণের আরামের চেয়ে বোঝা বহার বিপত্তি অধিক। অথচ আমি বিনা আপত্তিতে মূল্য দিয়া সেই চাউল খরিদ করিতেছি ও তাহার বোঝা ঘাড়ে করিয়া বাড়ী আসিতেছি। আমি চাইলাম এক, পাইলাম আর এক, কিন্তু এ সংশয় আমার মনে কখনও উপস্থিত হয় না।

উপস্থিত হয় না কেন? বস্তু সমান হইলে ভার সমান হয়, ভার সমান হইলে বস্তু সমান হয়, ইহাই এই প্রশ্নের উত্তর। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। বৈজ্ঞানিকেরা এই উত্তর দিবেন। অবৈজ্ঞানিক মানুষ এই উত্তর দিতে জানে না। অথচ যে দিন হইতে চাউলের দোকান ধরাধামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে এই প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে মানিয়া আসিতেছে।

এই যে প্রাকৃতিক নিয়ম, ইহার মত ব্যাপক নিয়ম আর নাই। কঠিন, তরল, অনিল, যাবতীয় পদার্থ এই নিয়ম মানিয়া চলে ; এমন জিনিস এ পর্য্যন্ত গোচরে আসে নাই, যাহা এই নিয়ম মানে না। কিন্তু তাই বলিয়া কালি যদি এমন কোন নূতন জিনিস আবিষ্কৃত হয়, যাহার বস্তু এক সের, কিন্তু যাহার ভার এক সের সোনার ভারের সমান নহে, তাহা হইলে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। উহা যে একেবারে অসম্ভব, ঐরূপ যে হইতেই পারে না, তাহা বলিবার অধিকার আমাদের নাই। জগতে অসম্ভব কিছুই নাই।

এক সেরের যে ভার, অন্য এক সেরেরও যখন প্রকৃতির বিধানে ঠিক সেই ভার, তখন দুই সেরের ভার এক সেরের ভারের দ্বিগুণ, তিন সেরের ভার তিনগুণ হইবে। তা যে জিনিসই লও না কেন। বস্তুর সহিত ভারের এই যে গূঢ় সম্পর্ক, অনৈক্য মধ্যে এই যে ঐক্য, তাহা নিউটনের পূর্ব্বে কেহ স্পষ্ট জানিতেন না। গ্যালিলিও অনেকটা পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু নিউটনই নানাবিধ দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন, বস্তু সমান হইলে ভারও সমান হয়। ভার সোনা লোহা ভেদ জানে না। এক সের লোহা ও এক সের তূলার বস্তুও সমান, ভারও সমান, তাহা নিউটনের পূর্ব্বে জোর করিয়া বলিবার উপায় ছিল না, অথচ মানুষ নিউটনের কত কাল পূর্ব্ব হইতে অজ্ঞাতসারে ওজন দ্বারা ভার মাপিয়া বস্তু খরিদ করিয়া আসিতেছে।

দেখা গেল, ভূকেন্দ্রাভিমুখে পতনপ্রবৃত্তি হইতে দ্রব্য মাত্রের ভার উৎপন্ন হয়। এই পতনপ্রবৃত্তির নামান্তরই ভার। কিন্তু এই পতন-প্রবৃত্তি সর্ব্বত্র সমান বলবতী নহে, কাজেই স্থানভেদে একই দ্রব্যের ভারের তারতম্য বা ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। পতনপ্রবৃত্তি না থাকিলে ভার থাকিত না। ভূকেন্দ্রে অবস্থিত কোন দ্রব্যের ভার থাকিতে পারে না— সে দ্রব্যের পতনপ্রবৃত্তিই থাকিবে না ; যাহা ভূকেন্দ্রেই অবস্থিত, তাহা আর পড়িবে কোথায় ? যাইবে কোথায় ? কাজেই এই ভার একটা আগন্তুক ধর্ম্ম। কিন্তু যাহাকে বস্তু বলা গেল, তাহা আগন্তুক ধর্ম্ম নহে— তাহা স্থায়ী ধর্ম্ম। স্থানভেদে বস্তুভেদ হয় না ; কোন দ্রব্যকে যেখানেই লইয়া যাই, তাহার বস্তুর কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হইবে না। কাজেই বস্তুর সহিত ভারের কোন সম্পর্ক নাই। সম্পর্ক এইটুকু যে, কোন স্থানে দুই দ্রব্যের বস্তু সমান হইলে সেখানে ভারও সমান হয়। যাহাতে বস্তু যত অধিক, তাহার ভারও তত অধিক। সম্পর্ক এই পর্য্যন্ত। কোন দ্রব্যের

ভারের পরিমাণ মাপিতে হইলে তাহার পতনপ্রবৃত্তি মাপিতে হয়। পতনকালে তাহা কোথায় কত ফুট হিসাবে পড়ে, তাহাই মাপিতে হয়। কিন্তু কোন দ্রব্যের বস্তু মাপিবার সময় পতনপ্রবৃত্তি দেখিবার প্রয়োজন হয় না, সমান জোরে ধাক্কা দিলে কোন্‌টা কত বেগ অর্জ্জন করে, তাহাই দেখিয়া বস্তু নিরূপিত হয়। যে যত অধিক বেগ অর্জ্জন করে, তাহার বস্তু তত অল্প। পূর্ণ কুম্ভের চেয়ে শূন্য কুম্ভের বস্তু অল্প। এক ঘটি দুধের চেয়ে এক ঘটি জলের বস্তু অল্প ; এক ঘটি তেলের বস্তু আরও অল্প। ভার ও বস্তু যখন স্বতন্ত্র ধর্ম্ম, তখন উহাদের মাপিবার প্রণালীও স্বতন্ত্র হইবে, তাহাতে বিস্ময় কি ? তবে বস্তু সমান হইলে ভারও সমান হয়, বস্তু দ্বিগুণ হইলে ভারও দ্বিগুণ হয়, এই প্রাকৃতিক নিয়মটুকু আবিষ্কৃত হওয়ায় আমাদের এই সুবিধা হইয়াছে যে, দুইটা দ্রব্যের ভার সমান দেখিতে পাইলে তাহাদের বস্তু সমান, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া লই। তুলদাঁড়ি ও নিক্তি ভার মাপিবার যন্ত্র, বস্তু মাপিবার যন্ত্র নহে। তুলদাঁড়ি বলিয়া দেয়, এই দুই দ্রব্যের ভার সমান। বস্তু সমান কি না, তাহা জানিবার ক্ষমতা তুলদাঁড়ির নাই, অথচ আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া লই, উভয় পাল্লার বস্তু সমান। কেন না, প্রকৃতির খেয়ালে ভার সমান হইলে বস্তুও সমান হয়। বস্তুর সম্বন্ধে আরও কথা বলিতে হইবে। ভারের কথাও এখনও শেষ হয় নাই। যে ভূপতন-প্রবৃত্তি হইতে ভার, সেই ভূপতনপ্রবৃত্তি—যাহাকে গুরুগম্ভীর ভাষায় মাধ্যাকর্ষণ বলা হয়, তৎসম্বন্ধে আরও বলিবার আছে।

মাধ্যাকর্ষণ

গল্পে আছে, নিউটন একদিন আপেল ফল গাছ হইতে ভূপতিত হইতে দেখিয়া চিন্তাকুল হইলেন ও ভাবিতে ভাবিতে স্থির করিলেন যে, ফল পড়ে, কেন না, পৃথিবী উহাকে টানে। পৃথিবীর এই টানিবার শক্তির নাম দেওয়া হইল **মাধ্যাকর্ষণ**। এইরূপে ভূপতনের কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়াই না কি নিউটনের মহত্ত্ব !

এটা কোন কাজের কথাই নহে। আগে বলিয়াছি, পৃথিবী ফলকে টানে বলাও যা, ফল পৃথিবীর দিকে চলে বলাও তা ; উভয়ই আলঙ্কারিক ভাষা ; বিজ্ঞানের নিকট উভয়েরই এক অর্থ। আপেল ফল যে ঊর্দ্ধমুখে না চলিয়া পৃথিবীর দিকে চলে, তাহা নিউটনের পূর্ব্বেও সকলেই জানিত ;

মহামূর্খেও জানিত, পশুতেও জানিত। কাজেই আপেল পৃথিবীমুখে চলে বা পৃথিবী আপেলকে আপনার কাছে টানে, ইহা বলায় কাহারও কোন মহিমা বাড়ে না। আমাদের ভাস্করাচার্য্যও না কি বলিয়াছেন, মহীর আকর্ষণ-শক্তি আছে, তজ্জন্য আকাশের দ্রব্য ভূপতিত হয়। ভাস্করাচার্য্যও মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মহত্ত্ব এই কারণে প্রতিষ্ঠিত নহে। পৃথিবী ফলকে টানে বা আকর্ষণ করে, তাহা মূর্খেও যেমন জানিত, নিউটনও তেমনই জানিতেন। কেন এবং কিরূপে টানে, তাহা তখনও কেহ জানিত না, এখনও কেহ জানে না; নিউটনও তাহার কারণ বাহির করিতে পারেন নাই। তবে নিউটনের মহত্ত্ব কিসে? নিউটন করিয়াছেন কি?

নিউটনের একটা কাজ আগেই বলিয়াছি। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ, যাহার নামান্তর ভার, প্রাকৃতিক নিয়মে বা প্রকৃতির খেয়ালে তাহা কেবল বস্তুর অপেক্ষা করে,—সেই বস্তু সোনা কি লোহা, জল না বায়ু, তাহা দেখে না,—তাহা নিউটনই স্পষ্টরূপে নানাবিধ দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিয়া প্রতিপন্ন করেন।

মাধ্যাকর্ষণের জগদ্ব্যাপ্তিতা

আর করেন কি? নিউটন প্রতিপন্ন করেন যে, মাধ্যাকর্ষণ যে পৃথিবীর নিকটেই আবদ্ধ আছে, তাহা নহে; উহা বহুদূরব্যাপী; এমন কি, চন্দ্রের নিকটও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে পৃথিবীর পিঠ ৪০০০ মাইল দূরে; আর চন্দ্র তাহার ষাটি গুণ দূরে অর্থাৎ ২,৪০,০০০ মাইল দূরে; এত দূরেও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ রহিয়াছে।

কিসে জানিলে? মাধ্যাকর্ষণের কাজ কি? উহার কাজ বেগ বাড়ান,—পৃথিবীর কেন্দ্র অভিমুখে সকল দ্রব্যের পতনবেগ বাড়ান। বেগ বাড়ে দেখিয়াই আমরা বলি মাধ্যাকর্ষণ বল আছে। বেগ না বাড়িলে মাধ্যাকর্ষণের নামও করিতাম না। নিউটন দেখাইলেন যে, চাঁদমামা পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে চলিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিতেছেন। সেই চেষ্টা করিতেছেন বলিয়াই তিনি সাতাইশ দিনে পৃথিবীর চারি দিকে ভ্রমণ করিতে বাধ্য আছেন, নতুবা এত দিন পৃথিবী ছাড়িয়া তিনি কোথায় চলিয়া যাইতেন, তাহার স্থিরতা নাই। চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে চলিতেছেন,—

চলিতেছেন বলিয়াই তাঁহার বক্ররেখায় বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ ; নতুবা ঋজুরেখায় তিনি কোথায় যাইতেন কে জানে !

প্রশ্ন উঠিতে পারে, নারিকেল ত বোঁটা খসিলেই সোজা ভূপতিত হয়। চাঁদকে ত কখনও আকাশ হইতে খসিয়া কাহারও মাথায় পড়িতে দেখি না ; তবে চাঁদের পতনপ্রবৃত্তি আছে, কিরূপে মানিব ? মোটামুটি এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

একখানা ইট হস্তচ্যুত হইলে নীচে পড়ে, কিন্তু তাহাকে বেগে সম্মুখে ছুড়িয়া ফেলিলে ঠিক নীচে পড়ে না, সম্মুখে কিছু দূর চলিয়া অবশেষে কিছু দূরে ভূপতিত হয়। পতনপ্রবৃত্তি এড়াইতে পারে না বলিয়াই ভূপতিত হয় ; তবে যত বেগে সম্মুখে ছুড়িবে, তত অধিক দূরে যাইয়া ভূমি স্পর্শ করিবে। ছাদের জল পয়োনালী দিয়া পড়িবার সময় উহার পথ যেমন বাঁকা হয়, গাড়ুর মুখ হইতে জল যেরূপ বক্র পথে বাহির হইয়া ভূপতিত হয়, সম্মুখে প্রক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ডের পথও কতকটা সেইরূপ বাঁকা। পিস্তলের গুলি বেগে চলিয়া অনেক দূরে পড়ে, বন্দুকের গুলি আরও বেগে চলিয়া আরও দূরে পড়ে ; কামানের গোলা প্রচণ্ড বেগে চলিয়া বহু দূরে, কয়েক মাইল দূরে পড়ে—শেষ পর্য্যন্ত পড়িতেই হয়। তেমন কামান এখনও তৈয়ার হয় নাই, কিন্তু ইহা মনে করা অসম্ভব নহে যে, কলিকাতায় কামান ছুড়িয়া দিল্লীর কেল্লা ভাঙ্গিয়া দিলাম। ফলে ইহা বেশ কল্পনা চলিতে পারে যে, বাঙ্গলায় বসিয়া কামান ছুড়িলাম, সেই গোলা প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া দিল্লীতে পড়িল ; আরও বেগে ছুড়িলাম, দিল্লী ছাড়িয়া মক্কায় অথবা মক্কা ছাড়িয়া আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিতে পড়িল। এখানেই বা থামিবে কেন ? সমুচিত বেগে ছুড়িতে পারিলে আফ্রিকা পার হইয়া আটলান্টিক সমুদ্রে, অথবা আটলান্টিক ডিঙ্গাইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের কোন দ্বীপে গিয়া পড়িল। আরও কিছু বেগে ছুড়িতে পারিলে কামানের গোলা প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া মগের মুলুক অতিক্রম করিয়া পুনরায় বাঙ্গলা দেশে স্বস্থানে আসিয়া পড়িতে পারে। এইরূপে সেই গোলা পৃথিবীটাকে একচক্র ঘুরিয়া আসিতে পারে। আরও কিছু বেগ দিতে পারিলে গোলাটা বাঙ্গলা দেশে আসিয়াও মাটি ছুইবার অবকাশ পাইবে না, আবার দিল্লীমুখে বা মক্কামুখে ছুটিয়া আর একচক্র ঘুরিবে অথবা পুনঃ পুনঃ চক্র দিতে থাকিবে। পৃথিবীতে পড়িবেই না, কেবল ঘুরিয়া মরিবে মাত্র। বস্তুতই কত বেগে গোলা ছুড়িলে উহা

আর ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করিবার অবকাশ পাইবে না, কেবল পৃথিবীকে চক্র দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, তাহা হিসাব করিয়া বলা কঠিন নহে। পৃথিবী কত বড়, তাহা যখন জানা আছে, উহার ব্যাস যখন ৮০০০ মাইল মাত্র, তখন এই বেগ যে অপরিমেয়, তাহা মনে করিবার দরকার নাই। গোলাটা ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু পৃথিবী ছাড়িয়া একেবারে পলাইতে পারে না; কবির ভাষায় বলিতে গেলে গোলাটা যেন ঘানিগাছের বলদের মত পৃথিবীর আকর্ষণে বদ্ধ থাকিয়া পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। চাঁদও ঐরূপে পৃথিবীর আকর্ষণে বদ্ধ হইয়া ঘুরিতেছেন।

চন্দ্র ভূকেন্দ্রাভিমুখে চলিতেছেন, বেগে চলিতেছেন, বেগ অর্জ্জন করিতে করিতে চলিতেছেন, ইহা আপাততঃ বোধ হয় না; কিন্তু নিউটনের হিসাবে চন্দ্রের এই বেগার্জ্জন ব্যাপার ধরা পড়িয়াছিল। চন্দ্রের ভূকেন্দ্রাভিমুখ বেগ সেকেণ্ডে কতটুকু বাড়িতেছে, তাহা নিউটন হিসাব করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, প্রতি সেকেণ্ডে চন্দ্রের বেগবৃদ্ধি অতি অল্প; ভূপৃষ্ঠে সকল দ্রব্যের বেগবৃদ্ধি সেকেণ্ডে ৩২ ফুট; চন্দ্রের পৃথিবীমুখে বেগবৃদ্ধি সেকেণ্ডে উহার ৩৬০০ ভাগের এক ভাগ।

ভূকেন্দ্র হইতে চন্দ্রের দূরত্ব ভূপৃষ্ঠের দূরত্বের ৬০ গুণ, আর চন্দ্রের বেগবৃদ্ধির হার ৩৬০০ ভাগের এক ভাগ। ৩৬০০ = ৬০ × ৬০; কি বিচিত্র ব্যাপার! দূরত্ব যত অধিক, বেগবৃদ্ধির হার তাহার বর্গের অনুপাতে তত অল্প!

দ্রব্যের ভূপতন-চেষ্টার ফলে ভার জন্মে; মাধ্যাকর্ষণের নামান্তরই ভার। চন্দ্রের ভূপতন-চেষ্টা আছে, তখন চন্দ্রে অবস্থিত সকল দ্রব্যে এবং চন্দ্রের নিকটবর্ত্তী সকল দ্রব্যেও ভূপতন-চেষ্টার ফলে কিছু না কিছু ভার থাকিবে। তবে সেই ভার—সেই পৃথিবীমুখে পতনপ্রবৃত্তি—ভূপৃষ্ঠস্থিত দ্রব্যের তুলনায় নিতান্ত অল্প হইবে। ভূপৃষ্ঠে এক সের বস্তুর যে ভার, চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থিত এক সের বস্তুর পৃথিবীর অভিমুখে পতনপ্রবৃত্তি অর্থাৎ ভার তার ৩৬০০ ভাগের এক ভাগ হইবে। অথবা ভূপৃষ্ঠে এক সেরের যে ভার, চন্দ্রে ৩৬০০ সেরের বা ৯০ মণের সেই ভার। পৃথিবীর অভিমুখে ভার বলিলাম; কেন না, চন্দ্রের অভিমুখেও আবার চন্দ্রস্থ দ্রব্যের ভার আছে, তাহার পরিমাণ স্বতন্ত্র। ৯০ মণ লোহার বস্তুপরিমাণ চন্দ্রেও ৯০ মণ, পৃথিবীতেও ৯০ মণ; কিন্তু পৃথিবীতে এক সেরের যে ভার, চন্দ্রের ৯০ মণের ভার ততটুকু

মাত্র। নিউটন এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্যের আবিষ্কর্তা। নিউটন আর কি আবিষ্কার করেন ? চন্দ্র যেমন পৃথিবীর চারি দিকে বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে, পৃথিবীও সেইরূপ সূর্য্যের চারি দিকে বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে ; চন্দ্র যেমন পৃথিবীর মুখে পতনশীল, পৃথিবীও তেমনই সূর্য্যের মুখে পতনশীল। কেবল পৃথিবী কেন, বুধ শুক্র মঙ্গল বৃহস্পতি ও শনি গ্রহও ঠিক সেইরূপে সূর্য্যের চারি দিকে বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে। নিউটন দেখিলেন, প্রত্যেক গ্রহই সূর্য্যের অভিমুখে পতনশীল, বর্দ্ধমান বেগে পতনশীল। সূর্য্য হইতে উহাদের দূরত্ব নিউটনের জানা ছিল ; নিউটন হিসাব করিয়া দেখিলেন, বেগের বৃদ্ধি সর্ব্বত্রই দূরত্বের বর্গের অনুপাতে অল্প। যাহার দূরত্ব তিনগুণ অধিক, তাহাব বেগবৃদ্ধি নয় ভাগের এক ভাগ, এইরূপ হিসাব। অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া সর্ব্বত্র একই নিয়মের অধীন। জাগতিক ঘটনার বহু অনৈক্যের মধ্যে নিউটন এই ঐক্য খুজিয়া বাহির করিলেন। নিউটনের পূর্ব্বে কেহ এ সন্ধান পান নাই।

প্রকৃতির ইহা আর একটা খেয়াল ; কেন এই খেয়াল, তাহা নিউটনও জানিতেন না, তার পরেও এ পর্য্যন্ত কেহ বুঝাইতে পারেন নাই ; কিন্তু এই সৌরজগদ্ব্যাপী প্রাকৃতিক খেয়ালের আবিষ্কর্তা নিউটন।

কেবল যে পৃথিবীর অভিমুখে চন্দ্রের, আর সূর্য্যের অভিমুখে গ্রহগণের এই পতনপ্রবৃত্তি, এই বর্দ্ধমান বেগে পতনপ্রবৃত্তি, তাহা নহে ; নিউটন দেখিলেন, গ্রহগণের পরস্পরের মধ্যেও এই ভাবে একই নিয়মে একই বিধানে পরস্পরের অভিমুখে চলিবার প্রবৃত্তি আছে।

সূর্য্য হইতে মঙ্গল নিকটে, বৃহস্পতি দূরে ; উভয়ই সূর্য্যকে কেন্দ্রস্থল করিয়া ঘানিগাছের বলদের মত ঘুরিতেছে। মঙ্গলের ভ্রমণপথ ভিতরে, বৃহস্পতির ভ্রমণপথ বাহিরে। মঙ্গল সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণে সূর্য্যের চারি দিকে বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে ; কিন্তু বাহিরে বৃহস্পতি থাকায় তাহারও দিকে মঙ্গলের টান আছে ; তাই মঙ্গল ঠিক সেই বৃত্তাকার পথে চলিতে পারে না ; একটু বৃহস্পতির দিকে হেলিয়া চলে। এখানেও বেগবৃদ্ধির সহিত দূরত্বের সেই অনুপাত। কিঞ্চিৎ মাত্র হেলিয়া চলে ; কেন না, সূর্য্যের বস্তুর কাছে বৃহস্পতির বস্তুপরিমাণ অতি অল্প।

নিউটন দেখাইলেন, সৌর জগতের সর্ব্বত্রই এই একই নিয়মের রাজত্ব ;—একবার কবির ভাষার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। প্রত্যেক

দ্রব্য অপর দ্রব্যের অভিমুখে চলিতে চাহিতেছে, ঐ নিয়মে। নিউটন সৌরজগদ্ব্যাপী এই প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কর্ত্তা। এই জন্য নিউটনের মহত্ত্ব। এই মহত্ত্বের স্পর্দ্ধা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি করিতে পারেন না।

মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম

নিউটন কি আবিষ্কার করিয়াছিলেন? প্রথম, মাধ্যাকর্ষণ বস্তুধর্ম্মের অপেক্ষা করে। যে দ্রব্যের বস্তু যত অধিক, সেই দ্রব্যের মাধ্যাকর্ষণ তত অধিক। এক সের সোনার যে ভার, দুই সের সোনার ভার তাহার দ্বিগুণ, দুই সের লোহার বা তূলারও ভার সেই দ্বিগুণ। পার্থিব দ্রব্য মাত্রই এই নিয়মে ভূকেন্দ্রমুখে পতনশীল। দ্বিতীয়, চন্দ্র এবং তৎসন্নিহিত দ্রব্য এত অধিক দূরে থাকিয়াও ভূকেন্দ্রপ্রতি পতনশীল, তবে সেখানে দূরত্ব অধিক বলিয়া মাধ্যাকর্ষণ অল্প। দূরত্ব যত অধিক, মাধ্যাকর্ষণ তাহার বর্গানুসারে অল্প। তৃতীয়, নারিকেল যেমন ভূমিমুখে পতনশীল, চন্দ্র যেমন ভূমিমুখে পতনশীল, পৃথিবীও সেইরূপ সূর্য্যমুখে পতনশীল। পৃথিবী কেন, বুধ শুক্র হইতে শনি পর্য্যন্ত সমুদয় গ্রহ সূর্য্যের মুখে সেইরূপ পতনশীল; পতনশীল বলিয়াই তাহারা সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিতেছে; নতুবা সূর্য্যকে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া যাইত, কে জানে! আবার গ্রহগুলি যে যত দূরে আছে, তাহার পতনপ্রবৃত্তি দূরত্বের বর্গানুসারে তত অল্প; যে দ্বিগুণ দূরে, তাহার পতনশীলতা চতুর্থাংশ; যে দশগুণ দূরে, তাহার পতনশীলতা শতাংশ। এইরূপ নিয়ম। চতুর্থ, গ্রহগুলি যেমন সূর্য্যের অভিমুখে পতনশীল, তাহারা পরস্পরের অভিমুখেও তেমনই পতনশীল। মঙ্গল গ্রহ সূর্য্যে পড়িতে চায়, বৃহস্পতি সূর্য্যে পড়িতে চায়; আবার মঙ্গল বৃহস্পতির দিকেও পড়িতে চায়; ফলে মঙ্গল সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে বটে, তবে বৃহস্পতির দিকে একটু হেলিয়া একটু ঝুঁকিয়া চলে। সূর্য্যের দিকে ঝোঁকটাই প্রবল, বৃহস্পতির দিকে ঝোঁক যৎসামান্য—কেন না, এই পতনপ্রবৃত্তি—যাহাকে বলি মাধ্যাকর্ষণ, সেই পতনপ্রবৃত্তি বস্তুসাপেক্ষ। সূর্য্য প্রকাণ্ড বস্তু, বৃহস্পতি তাহার নিকট ক্ষুদ্র; পৃথিবীর সহিত তুলনায় দেখা যায়, সূর্য্যের বস্তু পৃথিবীর তিন লক্ষগুণ; বৃহস্পতির বস্তু পৃথিবীর তিন শতগুণ মাত্র। কাজেই মঙ্গলের ঝোঁক সূর্য্যের দিকেই অধিক, বৃহস্পতির দিকে অতি অল্প—অল্প বটে, কিন্তু একেবারে নগণ্য নহে। একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। সকল গ্রহের পক্ষেই এইরূপ; সকলেরই

পরস্পরের দিকে এক-আধটু ঝোঁক আছে, সেই ঝোঁক বা পতনপ্রবৃত্তি বা মাধ্যাকর্ষণ সর্ব্বত্রই প্রথমতঃ বস্তুসাপেক্ষ অর্থাৎ যাহার বস্তু যত অধিক, তৎপ্রতি পতনপ্রবৃত্তিও তত অধিক ; এবং দ্বিতীয়তঃ, দূরত্বসাপেক্ষ অর্থাৎ যাহার দূরত্ব যত অধিক, তাহার পতনপ্রবৃত্তি দূরত্বের বর্গানুসারে তত অল্প। নিউটন এতগুলি নিয়ম আবিষ্কার করিলেন, এবং দেখিলেন, এই বিশাল সৌর জগতের মধ্যে আম জাম নারিকেল হইতে গ্রহ উপগ্রহ, চন্দ্র সূর্য্য, ক্ষুদ্র বৃহৎ, সকল দ্রব্যের পরস্পর এই পতনোন্মুখতা রহিয়াছে, এই পতনশীলতা প্রত্যেক দ্রব্যের বস্তু অনুসারে বৃদ্ধি পায়, আব দূরত্বের বর্গ অনুসারে হ্রাস পায়। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। সৌর জগৎ ব্যাপিয়া এই নিয়ম বিদ্যমান ; চিরদিন ধরিয়াই এই নিয়ম আছে ; কেন আছে, কি উদ্দেশ্যে আছে, নিউটন তাহা জানিতেন না, নিউটনের পরেও কেহ জানেন নাই। কিন্তু এত বড় জগৎ ব্যাপিয়া এই যে একটা নিয়ম—এই যে একটা শৃঙ্খলা—এত অনৈক্যের মধ্যে এই ঐক্য—ইহা যে রহিয়াছে, তাহা নিউটনের পূর্ব্বে কেহ জানিত না। নিউটন দিব্য নেত্রে তাহা দেখিয়াছিলেন এবং অন্যকে দেখাইয়াছিলেন। এই নিয়ম হয়ত অনাদি—অর্থাৎ কত কাল হইতে ইহা বিদ্যমান, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু অন্যের চোখে ইহা পড়ে নাই। নিউটনের দৃষ্টিতে পড়িয়াছিল। নিউটন ইহার দ্রষ্টা—নিউটন ইহার ঋষি।

আগে বলিয়াছি, যাহা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষগোচর হয়, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। আড়াই শত বৎসরও এখনও হয় নাই, নিউটন পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেন, মাধ্যাকর্ষণের সহিত কেবল বস্তুর সম্পর্ক ; অন্য ধর্ম্মের সম্পর্ক নাই। যাহার বস্তু যত অধিক, তাহার ভার তত অধিক, তৎপ্রতি প্রযুক্ত মাধ্যাকর্ষণ তত অধিক। নিউটন সৌর জগতে গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধি অন্বেষণ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা মাধ্যাকর্ষণের সহিত দূরত্বের সম্পর্ক বাহির করেন। এখানে পরীক্ষা চলে না ; কেন না, গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধি ইচ্ছামত নিয়মিত করা যায় না।

কিন্তু এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কার নূতন জ্ঞান অর্জ্জনে সাহায্য করে ; ইহাতে পথ দেখাইয়া দেয় ; কোন্ দিকে চলিলে নূতন তথ্যের সংবাদ জানিব, সেই পথ দেখায়। কেবল অন্ধের মত হাতড়াইতে থাকিলে দৈবক্রমে জ্ঞান অর্জ্জিত হইতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির নিয়ম

আবিষ্কার দ্বারা দীপশিখা জ্বালিয়া নূতন জ্ঞান লাভের পন্থা দেখাইয়া দেন। মানুষ তখন জ্ঞানের সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়।

একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে। নিউটনের শত বর্ষ পরে ইংলণ্ডে হর্শেল নামে জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। তিনি স্বহস্তনির্ম্মিত বৃহৎ দূরবীন দ্বারা একটি নূতন গ্রহ আবিষ্কার করেন; উহার ভ্রমণপথ শনিরও বাহিরে। উহার ইংরেজী নাম উরেনস্। আমরা বলি বরুণগ্রহ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে দেবতাকে বরুণ বলিতেন, গ্রীকেরা না কি এক কালে সেই দেবতাকেই উরেনস্ বলিতেন; এই জন্যই বরুণ নাম সঙ্গত হইবে। উহার গতিবিধি আলোচনা করিয়া দেখা গেল, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহের সমীপে যে পথে চলা উচিত ছিল, সে পথে না চলিয়া ঐ গ্রহ একটু বাহির ঘেঁষিয়া চলিতেছে। নিউটনের আবিষ্কৃত নিয়মে এইরূপে বাহির ঘেঁষিয়া চলার কারণ অনুমিত হয়। অনুমান হয় যে, বরুণেরও বাহিরে আর একটি গ্রহ আছে, যাহার টানে—যাহার দিকে পতনপ্রবৃত্তির ফলে বরুণের পথ ঐ দিকে হেলিয়াছে। কোথায় কত দূরে একটা গ্রহ থাকিলে ভ্রমণপথের ঠিক সেই ব্যতিক্রমটুকু ঘটিবে, তাহার হিসাব করিতে পাকা গণিতজ্ঞ আবশ্যক। কিছু দিন পরে আডাম্স্ নামে ইংরেজ গণিতবিৎ হিসাব করিয়া বলিলেন, আকাশের অমুক স্থানে সেই গ্রহ থাকা উচিত। আডাম্স্ তাঁহার কাগজপত্র রাজকীয় মানমন্দিরের অধ্যক্ষ জ্যোতির্ব্বিৎ এয়ারির নিকট পাঠাইলেন। এয়ারি তাহা বাক্সতে ফেলিয়া রাখিলেন। এ দিকে ফরাসী জ্যোতিষী লেবেরিয়ে হিসাব করিয়া ঠিক সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া ফেলিলেন। এক জন জার্ম্মান জ্যোতিষী লেবেরিয়ের নির্দ্দিষ্ট নভঃস্থলের অভিমুখে দূরবীন ধরিয়া নূতন গ্রহটি আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। আডাম্সের কাগজপত্র তখনও এয়ারি সাহেবের বাক্সে। এই নবাবিষ্কৃত গ্রহের ইংরেজী নাম দেওয়া হইল নেপ্চুন। আমরা কি নাম দিব? একজন বড় দেবতার নাম দিতে হইবে। বরুণের সহচর ছিলেন মিত্র। 'মিত্রাবরুণৌ' এই যুগল দেবতা প্রসিদ্ধ। আমরা নেপ্চুনের নাম দিলাম মিত্র।

নেপ্‌চুনের বাহিরে আর কোন নূতন গ্রহ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। নেপ্‌চুনের ভ্রমণপথই এখন সৌর জগতের সীমা বলিয়া গৃহীত হয়। উহার বাহিরে তারাজগৎ; কত কোটি তারকা বিশ্বজগতে ছড়াইয়া আছে; এক

একটা তারকা এক একটা সূর্য্য। অনেকে সূর্য্যের চেয়েও বৃহৎ ও জ্যোতিষ্মান্; হয়ত তাহাদেরও গ্রহ উপগ্রহ আছে। প্রশ্ন উঠে, এই সকল তারকাসমূহের মধ্যেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়মানুযায়ী পরস্পরের অভিমুখে গতিবিধির প্রমাণ আছে কি না?

উত্তর দেওয়া কিছু কঠিন। উহাদের পরস্পরের দূরত্ব এত অধিক যে, তাহাদের পরস্পরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আমাদের গোচরই হয় না। অধিকাংশ তারার দূরত্ব আমরা জানি না। গোটাকয়েকের মোটামুটি জানা গিয়াছে; তাহার মধ্যে যেটা সব চেয়ে নিকটে আছে বলিয়া জানা গিয়াছে, আমরা তাহার আলো পাইতে সাড়ে চারি বৎসর অতীত হয়। আলো সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষ ক্রোশ বেগে চলে। সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় সাড়ে চারি কোটি ক্রোশ দূরে থাকে; উহার আলো পৃথিবীতে আসিতে আট মিনিট মাত্র লাগে। যাহার আলো আসিতে সাড়ে চারি বৎসর লাগে, তাহার দূরত্ব কি ভীষণ! সেই তারার গতিবিধির সহিত সূর্য্যের কোনও সম্পর্ক থাকিলেও সে সম্পর্ক এত ক্ষীণ যে, তাহা সম্প্রতি যন্ত্রযোগে মাপিয়া ধরিবার আশা নাই। এইরূপ তারায় তারায় সম্পর্ক।

তবে গোটাকতক উদাহরণ আছে; গোটাকতক জোড়া তারকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; জোড়ার মধ্যে একটা অন্যটার গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, পরস্পরের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। উহাদের ভ্রমণপথ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যায় যে, নিউটনের আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের সহিত উহাদের গতিবিধির সামঞ্জস্য আছে। ইহাই দেখিয়া বলিতে সাহস হয়, সৌর জগতের বাহিরেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বর্ত্তমান।

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে প্রায় দেখা যায়,—মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বিশ্বব্যাপী। এত বড় কথাটা বলিবার পূর্ব্বে একটু থামা উচিত; প্রথমেই ভাবা উচিত, বিশ্বজগৎ কি?

সহজ চোখে নির্ম্মল আকাশে হাজার পাঁচ ছয় তারা দেখা যায়।

উৎকৃষ্ট দূরবীনের সাহায্যে চক্ষুর অগোচর বহু লক্ষ তারকা দেখা যায়; অধিক দূরের তারা হইতে আলো আসিতে হয়ত কত সহস্র বা কত লক্ষ বৎসর অতিক্রান্ত হয়। আরও দূরে হয়ত আরও তারা রহিয়াছে, তাহারা এখনও দূরবীনেও ধরা পড়ে নাই। এই তারকাজগতের সীমা কোথায়, তাহা আমরা ঠিক জানি না; সীমা আছে কি নাই, তাহাও নিশ্চিত বলিতে পারি না।

বিশ্বজগতের যে অংশের সহিত আমাদের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়, তাহার মধ্যে সৌর জগতে ও সৌর জগতের বহিঃস্থিত গোটাকতক তারকার মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া দেখিতে পাই; ইহা লইয়া মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বিশ্বব্যাপী, এত বড় কথা এক নিশ্বাসে বলিবার পূর্ব্বে একটু থামা উচিত। হয়ত মাধ্যাকর্ষণ বিশ্বব্যাপী, হয়ত নহে। বিজ্ঞানের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর এই পর্য্যন্ত।

পৃথিবীর মত একটা বৃহৎ জড়পিণ্ডের সমীপে আম জাম আকৃষ্ট হয় বা অতিদূরবর্ত্তী চন্দ্র পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয়। আবার অতি বৃহৎ জড়পিণ্ড যে সূর্য্য, যাহার আয়তন বার লক্ষ পৃথিবীর সমান ও যাহার বস্তু তিন লক্ষ পৃথিবীর বস্তুর সমান, সেই প্রকাণ্ড সূর্য্যের অভিমুখে অতি দূরবর্ত্তী মিত্র গ্রহ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয়, ইহাও দেখা গেল। কিন্তু একটা নারিকেল ফল আর একটা নারিকেল ফলকে আকৃষ্ট করে কি না? নিউটন বলিয়াছিলেন, যাহার বস্তুপরিমাণ যত, তাহার আকর্ষণ তত। সূর্য্য নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহের তুলনায় নারিকেল ফলের বস্তু এত অল্প যে, একটা নারিকেলের অতি নিকটেও আর একটা নারিকেল রাখিয়া উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর করা সাধ্য বলিয়া মনে না হইতে পারে। কিন্তু এক সময়ে যাহা অসাধ্য থাকে, অন্য সময়ে তাহা সাধ্য হয়। নিউটনের বহু দিন পরে ক্যাবেণ্ডিশ সূক্ষ্ম কৌশল উদ্ভাবন করিয়া দেখাইলেন, একটা সীসার গোলা আর একটা সীসার গোলার দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

দুইটা গোলার মধ্যে কোন্‌টা আকৃষ্ট হয়? এটা ওটার দিকে, ওটা এটার দিকে আকৃষ্ট হয়। উপরে যুগল তারার কথা বলিয়াছি; এও কতকটা সেইরূপ। দুইটা তারার মধ্যে এটা ওটার দিকে আকৃষ্ট হয়। আকর্ষণটা পরস্পর। তবে দুইটার মধ্যে একটা তারা সেকেণ্ডে যে বেগ অর্জ্জন করে, অন্যটা সেকেণ্ডে ঠিক সেই বেগ অর্জ্জন না করিতে পারে। কোন্ তারার কতটা বস্তু, এই বেগবৃদ্ধির মাত্রা দেখিয়া তাহা সহজেই নির্দ্ধারিত হয়। বস্তু শব্দের আমরা যে পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তদনুসারে সমান ধাক্কায় যাহার বেগবৃদ্ধি অধিক, তাহার বস্তু অল্প,—যত অধিক, তত অল্প। মনে কর, ১ নং তারা সেকেণ্ডে যে বেগ অর্জ্জন করে, ২ নং তারা সেকেণ্ডে তাহার দশগুণ বেগ অর্জ্জন করিতেছে। ঘড়ি ধরিয়া দূরত্ব মাপিয়া হিসাব করিয়া ইহাই দেখা গেল। এখন পূর্ব্বদত্ত পারিভাষিক অর্থ অনুসারে ২ নং

তারার বস্তু অল্প, ১ নং তারার বস্তু অধিক। কত অধিক ? দশগুণ অধিক। ২ নং তারার বস্তু যদি এক সের হয়, ১ নং তারার বস্তু দশ সের। ২ নং তারার বস্তু যদি হয় কোটি মণ, ১ নং তারার বস্তু দশ কোটি মণ।

ইহার ফলে এই দাঁড়ায় যে, ১ নং তারার বেগবৃদ্ধির পরিমাণকে উহার বস্তুর পরিমাণ দিয়া গুণ করিলে যে গুণফল পাওয়া যায়, ২ নং তারার বেগ-বৃদ্ধির পরিমাণকে উহার বস্তুপরিমাণ দিয়া গুণ করিলেও সেই গুণফল পাওয়া যাইবে। প্রথমের গুণফলের নাম দাও ক্রিয়া, উহা দ্বিতীয়ের অভিমুখে ; দ্বিতীয়ের গুণফলের নাম দাও প্রতিক্রিয়া, উহা প্রথমের অভিমুখে। ফল হইল, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া উভয়ই সমান ও পরস্পর বিপরীতমুখ।

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার পূর্ব্বোক্ত সমানতা নিউটনের প্রণীত অন্যতম গতির নিয়ম নামে পরিচিত। নিউটন বলিয়াছেন,—যেখানে ক্রিয়া, সেইখানেই তাহার বিপরীতমুখে প্রতিক্রিয়া এবং ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া উভয়ের মাত্রা সমান।

এই নিয়মটিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিব কি না ? না, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। দুইটা বস্তুর পরস্পরের প্রতি গতিবিধি দেখিয়া কোন্‌টা কত বেগ অর্জ্জন করিল, কোন্‌টার বেগ কত বাড়িল, স্থির করি এবং যাহার বেগবৃদ্ধি যত অধিক, তাহার বস্তু তত অল্প, ইহাই স্থির করি। বস্তু শব্দের তাৎপর্য্য ইহাই ; বস্তু শব্দকে আমরা এই নির্দ্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়াছি। যাহার বেগ যত অধিক, তাহার বস্তু যদি তত অল্প বলা যায়, তাহা হইলে অর্জ্জিত বেগ ও বস্তুর পরিমাণ, এই উভয়ের গুণফল ত সমান থাকিবেই। ছেলেদের ডাকিয়া যাহার যত বয়স অধিক, তাহার হাতে যদি তত অল্প সন্দেশ দিই, তাহা হইলে প্রত্যেকের বয়সের বৎসরের সংখ্যাকে তাহার সন্দেশের সংখ্যা দিয়া গুণ করিলে গুণফল ত সমান হইবেই। ইহাতে প্রকৃতির খেয়াল চলিবে না। ইহা বরং আমার খেয়াল। ইহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা চলিবে না। ইহা আবিষ্কারের জন্য পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা আবশ্যক হইবে না। ঘরে বসিয়া চোখ বুজিয়া আমি ইহা বলিতে পারিব। বস্তু শব্দের যখন পারিভাষিক সংজ্ঞাই এই, তখন বস্তু শব্দটি ঐ অর্থে প্রয়োগ না করিয়া অন্য অর্থে প্রয়োগ করা সচ্ছন্দে চলিত। তাহা হইলে ক্রিয়ার

মাত্রা প্রতিক্রিয়ার মাত্রার সমান হইত না। কাজেই এই যে নিয়ম, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে ; উহা একটা পারিভাষিক সূত্র মাত্র।

কিন্তু এইখানে আর একটি কঠিন প্রশ্ন আসে। মনে কর, যুগল নক্ষত্রের বদলে ক্যাবেণ্ডিশের গোলাই লইলাম। দুইটি গোলার বদলে তিনটি গোলা লইলাম। একটি সীসার, একটি রূপার, একটি সোনার। সীসার গোলাটি এক সের। সীসার গোলার নিকট রূপার গোলা রাখিয়া দেখিলাম, রূপার বেগবৃদ্ধির পরিমাণ সীসার সমান। অতএব বলা গেল, রূপার গোলাটির বস্তুও এক সের। আবার সীসার গোলার নিকট সোনার গোলা রাখিয়া দেখিলাম, সোনার বেগবৃদ্ধির পরিমাণ সীসার সমান ; অতএব সোনার গোলাটিরও বস্তু এক সের।

এখন প্রশ্ন এই যে, রূপার গোলার কাছে সোনার গোলা রাখিলে উহার আচরণ, উহার গতিবিধি, উহার বেগবৃদ্ধি কিরূপ হইবে? সোনার বস্তু সীসার সমান ; রূপার বস্তু সীসার সমান ; সোনার বস্তু রূপার সমান বটে কি না?

সীসার নিকট রূপার গতিবিধি দেখিয়া বলিয়াছি যে, উভয়ের বস্তু সমান ; সীসার নিকট সোনার গতিবিধি দেখিয়া বলিয়াছি যে, উভয়ের বস্তু সমান ; তাহার উপর ভর করিয়া কি বলা যায়, রূপার নিকট সোনার গতিবিধি কিরূপ হইবে? কখনই না।

রামের সহিত শ্যামের বিবাদ ও রামের সহিত যদুর বিবাদ দেখিয়া কি বলা যায়, শ্যামের সহিত যদুর বিবাদ, না সদ্ভাব? বলিতে পার, রাম শ্যাম স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তি, কিন্তু সোনা রূপা জড় দ্রব্য ; কাজেই দুই ক্ষেত্রে তুলনা হইবে না। আচ্ছা, কয়লা বাতাসে পোড়ে ; গন্ধক বাতাসে পোড়ে ; গন্ধক কয়লাতে পুড়িবে কি না? উত্তর দেওয়া চলিবে না। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, গন্ধক কয়লায় পোড়ে কি না। পোড়ে তথাস্তু ; না পোড়ে, তথাস্তু।

সেইরূপ এখানেও বিনা পরীক্ষায় বলা যাইবে না যে, রূপার নিকট সোনার আচরণ কিরূপ হইবে। সীসার নিকট উভয়ের আচরণ দেখিয়া বলিয়াছি, রূপা এক সের আর সোনাও এক সের ; কিন্তু সোনা রূপার প্রতি কিরূপ আচরণ করিবে, তাহা প্রকৃতির বিধান, আমি বিনা পরীক্ষায় কিরূপে জানিব?

প্রকৃতির বিধান-বিচিত্র। পরীক্ষা করিলে বস্তুতই দেখা যাইবে যে, সেই সোনার গোলাটি রূপার গোলার নিকটে রাখিলে উভয়েই পরস্পরের অভিমুখে সমান বেগ অর্জ্জন করে। অতএব সোনার বস্তু রূপার সমান।

সীসার প্রতি উভয়ের আচরণ পৃথক্ ভাবে দেখিয়া ঠিক করিয়াছিলাম, রূপার বস্তু সীসার সমান, সোনার বস্তুও সীসার সমান। রূপা সোনা পরস্পরের আচরণ দেখিয়া ঠিক হইল, সোনার বস্তু রূপার সমান হইতেছে। দুই বস্তু প্রত্যেকে কোন তৃতীয় বস্তুর সমান হইলে তাহারা পরস্পর সমান হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য না হইলেও প্রকৃতির বিধানে ফলতঃ সত্য হইয়াছে। প্রকৃতির বিধানই এইরূপ।

প্রকৃতির বিধান যদি অন্যরূপ হইত, অর্থাৎ সোনার বস্তু ও রূপার বস্তু প্রত্যেকে সীসার সমান হইয়াও যদি সোনার বস্তু রূপার বস্তুর সমান না হইত, তাহা হইলে কোন দ্রব্যের বস্তুপরিমাণ স্থির ভাবে নির্দ্দেশ করা চলিত না। একই দ্রব্যের বস্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইত।

ফলে, প্রকৃতি এখানে করুণাময়ী। অর্থাৎ রূপার বস্তু সীসার সমান ও সোনার বস্তু সেই সীসার সমান হইলে, রূপার বস্তুও সোনার বস্তুর সমান হয়। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে; পরীক্ষালব্ধ সত্য। সীসার নিকট সোনা এক সের, রূপার নিকটও তাহা এক সের। অন্য দ্রব্যের নিকটও এক সের। ফল হইয়াছে এই যে, এক ক্ষেত্রে যে দ্রব্যের যে বস্তু, তাহা ঠিক করিয়া লইলে অন্য ক্ষেত্রেও সেই দ্রব্যের সেই বস্তুই থাকে। যে দ্রব্যের বস্তু এক সের, তাহা সর্ব্বত্র এক সেরই থাকে; যাহা দশ সের, তাহা দশ সেরই থাকে। ইহা তর্কে পাইবে না; ইহা পরীক্ষিত অবেক্ষণলব্ধ সত্য। ইহা সত্য বলিয়াই বস্তুর পরিমাণ সাধ্য হইয়াছে ও বস্তু মাপিয়া ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সমানতা নির্দ্ধারণও সম্ভবপর হইয়াছে।

বিজ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পদে পদে সাবধান হইয়া চলা উচিত। অর্জ্জিত জ্ঞানের কোন্‌টুকু বিচারলব্ধ, আর কোন্‌টুকু পর্য্যবেক্ষণে বা পরীক্ষায় লব্ধ, তাহা পদে পদে সাবধানে নির্ণয় করিয়া যাওয়া উচিত। নচেৎ বিজ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে না।

মিশ্র পদার্থ

কঠিন, তরল, অনিল, এই ত্রিবিধ পদার্থ লইয়া আমরা এত ক্ষণ বহু আলোচনা করিলাম। দেখিলাম, তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে সাদৃশ্য আর কোন্ কোন্ বিষয়ে পার্থক্য আছে। এখন অন্য কথার আলোচনা করা যাউক।

প্রশ্ন চলিতে পারে, কঠিনে কঠিনে, কঠিনে তরলে বা তরলে অনিলে একত্র মিশিয়া কিরূপ জিনিস হয়? উহারা পরস্পর মিশ্রিত হয় কি না? মিশ্রণ ক্রিয়ার তাৎপর্য্য কি?

কঠিনে কঠিনে মিশ্রিত হয়; তাহার বিস্তর দৃষ্টান্ত। সোনায় রূপায় তামা মিশাইয়া গহনা তৈয়ার হয়; তামায় দস্তায় পিতল হয়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ধাতু মিশাইয়া নানাবিধ উপধাতু তৈয়ার হয়। লোহাতে কয়লা মিশাইলে ঢালাই লোহা হয়, উহা লোহা অপেক্ষা ভঙ্গুর। আবার তরলে তরলে মেশার দৃষ্টান্ত গোয়ালার দুধ। গাইদুধে যত ইচ্ছা জল মিশাইলেই তাহার আনন্দ। অনিলে অনিলে মেশার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ—বায়ু; ইহা দুইটা অনিলের মিশ্রণে উৎপন্ন,—একটা এক ভাগ এবং অন্যটা প্রায় চারি ভাগ। উহার সঙ্গে আরও কয়েকটি অনিল অল্পবিস্তর মিশিয়া থাকে। বায়ুতে বিদ্যমান ঐ দুইটি অনিলের বাঙ্গলায় নামকরণ হইয়াছে—অম্লজান ও যবক্ষারজান। নাম দুইটা এমনই কর্কশ যে, উহার প্রয়োগে আমার আদৌ প্রবৃত্তি নাই। উহা এখনও কেতাবেই আছে; চলিত ভাষাতে যখন এত দিনে চলিল না, তখন আর চলিবে না। আমি এরূপ ক্ষেত্রে ইংরেজী নাম আবশ্যকমত মোলায়েম করিয়া লইব। অম্লজানকে বলিব অক্সিজন; আর যবক্ষারজানকে বলিব নাইট্রোজন। অন্ততঃ এই পুঁথিতে ঐ ইংরেজী নামই চলিবে।

তরলে অনিলে মিশ্রণের উদাহরণ সোডাওয়াটার; উহাতে একটা অনিল—কয়লা পোড়াইয়া যে অনিল পাওয়া যায়, সেই অনিল জলের সহিত মিশ্রিত থাকে। কঠিন পদার্থেও অনিল মিশ্রিত দেখা যায়; গরম করিলে বা গলাইলে ঐ অনিল বাহির হইয়া যায়।

সকল জিনিসেই যে সকল জিনিস মেশে, এমন নহে। জলের সহিত আলকহল (সুরাসার) মেশে; কিন্তু জলে তেলে মেশে না। ইথার নামে

তরল পদার্থ আছে, তাহা জলের সঙ্গে কতকটা মেশে, কতকটা মেশে না। অধিক মেশাইবার চেষ্টা করিলে অতিরিক্ত অংশটা জলের উপর ভাসিতে থাকে, যেমন জলের উপর তেল ভাসে। কেন না, ইথার জলের চেয়ে হাল্‌কা। কেবল অনিলে অনিলে মেশায় এরূপ কোনও বাধা ঘটে না। যে-কোনও অনিল অপর যে-কোন অনিলের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে, তা যতটাই লও না কেন। একটা চোঙার ভিতর যে-কোন অনিলে পূর্ণ কর; তার পর অন্য একটা অনিল যতটুকু ইচ্ছা, সেই চোঙায় প্রবেশ করাও; সেই দ্বিতীয় অনিলও চোঙার সমস্ত ভিতরটায় ব্যাপ্ত হইবে। উভয়ে মিশিয়া চোঙার সমুদায় অভ্যন্তর দেশ অধিকার করিয়া থাকিবে। একটা দিক্ এর ভাগে পড়িল, অন্য দিক্ ওর ভাগে পড়িল, এরূপ ঘটিবে না।

দ্রবণ

তরলে কঠিনে মিশ্রণের রীতিটা একটু বিচিত্র। জল তরল পদার্থ—উহাতে অনেক কঠিন জিনিস মেশে; যেমন নুন, চিনি, তুতে, হীরাকষ; আবার অনেক জিনিস মেশে না; যেমন বালি, কয়লা, সোনা, রূপা। যাহা জলে মেশে, তাহা গলিয়া দ্রব হয়; তাই তাহা দ্রাব্য। এই ক্রিয়ার নাম **দ্রবণ**। সেরখানেক জলে একটু একটু চিনি মেশাও; দেখিবে—চিনি মিশিতেছে, জলটা মিষ্ট হইতেছে। আরও মেশাও, আরও মেশাও; এমন সময় আসিবে, তখন আর একটু চিনি দিলে সেটুকু আর মিশিবে না বা গলিবে না। মানুষের ক্ষুধার যেমন একটা সীমা আছে, জলেরও ক্ষুধার তেমনই একটা সীমা আছে; উহার পেট ভরিলে আর চিনি খাইতে বা লইতে চায় না। তাহার উপর যেটুকু দেওয়া যাইবে সেইটুকু দ্রবীভূত না হইয়া কঠিন অবস্থায় নীচে পড়িয়া থাকিবে।

ঐ চিনি-মেশান জলটাকে রোদে শুকাইতে দাও; জলের খানিকটা বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যাইবে। জলের পরিমাণ ক্রমে কমিয়া যাইবে। মনে কর, এক সের জল ক্রমে আধ সেরে দাঁড়াইল। এক সের জলে যতটা চিনি ধরিয়া রাখিতে পারে, আধ সেরে তাহা পারে না। অতিরিক্ত চিনিটা, যাহা জলে এতক্ষণ মিশ্রিত ছিল, এখন তাহা কঠিন অবস্থা পাইয়া জলের নীচে জমিতে থাকিবে। এই সময়ে যদি অন্য কোনও কঠিন পদার্থের

আশ্রয় পায়, একগাছি সুতার বা এক টুকরা মিছরির আশ্রয় পায়, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া তাহার গায়ে জমিতে থাকিবে।

অর্ক

জল যত কমে, চিনিও তত জলের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া জমে। জমিবার সময় চিনিতে দানা বাঁধে। চিনির বড় বড় দানার নামই মিছরি। এই দানাগুলির আকার বেশ সুন্দর। উহার পিঠ সমতল মসৃণ। মিছরি ভাঙ্গিলে যে নূতন পিঠ বাহির হয়, তাহাও সমতল মসৃণ। দানার কিনারায় কোণগুলি মাপিলে দেখা যায়, বেশ একটা হিসাব আছে। অনেক জিনিসের এইরূপ দানা বাঁধিবার ক্ষমতা আছে; অনেক জিনিসের নাই। নুন ফট্‌কিরি তুতে হীরাকষ প্রভৃতির দানা সর্ব্বজনপরিচিত। আর মাটি কাঠ, ইহাদের দানা হয় না।

জল হইতে বাহির হইয়া জমিবার সময়ই যে দানা বাঁধে, এমন নহে। অনেক জিনিস, যাহা উত্তাপে তরল হয়, তাহা শৈত্যযোগে কাঠিন্যপ্রাপ্তির সময় দানা বাঁধিয়া ফেলে। গন্ধক উত্তাপ দিয়া গলান যায়; আবার ঠাণ্ডা করিলে উহার দানা বাঁধে। আমি যাহাকে দানা বলিতেছি, তাহার ইংরেজী নাম crystal; ভাল কথায় স্ফটিক বলা চলে, কিন্তু শব্দটা দাঁতভাঙ্গা। স্ফটিকের নামান্তর—অর্ক; অমরকোষে আছে, অর্কঃ স্ফটিক-সূর্য্যয়োঃ। আমি **অর্ক** নামই এই অর্থে গ্রহণ করিলাম।

কয়লাও দুই রূপে দানা বাঁধে; এক রকম দানাতে পেন্‌সিল তৈয়ার হয়; উহার নাম গ্রাফাইট বা কাল সীসা। সাদা কাগজের উপর উহার কাল দাগ পড়ে। আর এক রকম দানার নাম হীরা; যে হীরা মণির মধ্যে এত মহার্ঘ।

এই সকল অর্কের শ্রেণী বিভাগ করা চলে। অর্কের আকৃতি দেখিয়া শ্রেণী বিভাগ করা হয়। কোনও জিনিসের অর্ক ছোটই হউক, আর বড়ই হউক, তাহার আকৃতি একরূপই থাকে। অনেক সময় অর্কের আকার দেখিয়া জিনিসটা কি, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

রাস্তায় ইটের স্তূপ পড়িয়া থাকিলে লোকে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে না; কিন্তু সেই স্তূপের ইটগুলি সাজাইয়া একখানির উপর একখানি করিয়া রাখিয়া যখন অট্টালিকা তৈয়ার হয়, তখন তাহাতে লোকের নজর পড়ে।

ইটগুলি আপনা হইতে সজ্জীকৃত হইয়া অট্টালিকায় পরিণত হয় না। মিস্ত্রী উহাকে বুদ্ধিপূর্ব্বক সাজায়। তুতে বা ফটকিরি সুন্দর অর্ক বাঁধে। ঐ অর্কগুলির সুন্দর আকৃতি দেখিলে উহাতে নজর পড়ে; এবং স্বতই মনে প্রশ্ন আসে যে, এখানে কি কোনও কারিকর উহাব অংশগুলি থাকে থাকে বিন্যাস করিয়া ঐরূপ সৌন্দর্য্য দিয়াছে? আমাদের দেশে তুষার পড়ে না; হিমালয় অঞ্চলে বা হিমপ্রধান দেশে তুষার পড়ে। ঐ সকল তুষারকণায় কত বিচিত্র, কত সুন্দর দানা দেখা যায়; কত বৈচিত্র্য, অথচ এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা কারিগরি: দেখা যায় যে, একটি ষড়্ভুজ ষট্কোণ ক্ষেত্র, যাহার ভুজগুলি ও কোণগুলি সব সমান, যেন এইরূপ ক্ষেত্রের প্ল্যানটি বজায় রাখিয়া তাহার উপর নানারূপ নক্সা টানা হইয়াছে। একজন কারিকরের কারিগরি নহিলে জড় পদার্থের এমন কি ক্ষমতা আছে যে এমন সুন্দর নক্সা আঁকে?

এইরূপ প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতই উপস্থিত হয় এবং মনে নানারূপ চিন্তা আনয়ন করে। এখানে কেবল কথাটা ছুঁইয়া রাখিলাম। জগত্তত্ত্বের আলোচনায় এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার সর্ব্বদাই প্রয়োজন হয়। এ প্রশ্নটা এত গুরুতর যে, বড় বড় পণ্ডিতের মধ্যে এখনও ঐক্যমত্য নাই; বিজ্ঞানের ইতিহাসের আদিযুগ হইতে আজি পর্য্যন্ত ইহার চূড়ান্ত মীমাংসায় কেহ উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

শ্রেণীবিভাগ

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় জগৎ বিচিত্র জগৎ; কোনও দুইটা জিনিসে সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। দুইটা জিনিসে সম্পূর্ণ ঐক্য থাকিলে উহারা এক জিনিসই হইত। অন্তঃকরণ তাহাদিগকে দুইটা বলিয়া গ্রহণই করিত না। আবার কোন দুই জিনিসে সম্পূর্ণ অনৈক্যও নাই। সম্পূর্ণ অনৈক্য থাকিলে সেই জ্ঞান নিষ্ফল হইত। উহা দ্বারা জীবনযাত্রাই চলিত না। জীবনযাত্রা চলিবে কি, জীবন বলিয়া কোন পদার্থই হয়ত থাকিত না; কেন না, জীবনের অস্তিত্বও বস্তুর মধ্যে ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত।

এই অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের আবিষ্কার বিজ্ঞানের কাজ। প্রথমে যে ঐক্যের উপলব্ধি হয় না, ইন্দ্রিয়গণ আপনা হইতে যে ঐক্য মনের সমীপে উপস্থিত করে না, মন বুদ্ধি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া ক্রমশঃ বস্তুর মধ্যে সেই

ঐক্যের আবিষ্কার করে ও সেই ঐক্য দেখিয়া বহুকে কতকগুলি কোঠার মধ্যে সাজায়। এইরূপে পদার্থসমূহকে কতিপয় শ্রেণীতে বা জাতিতে বিভক্ত করা হয়। এই শ্রেণীবিভাগ কার্য্য বিজ্ঞানের সৌধে আরোহণের প্রথম সোপান; অথবা প্রত্যেক সোপানে উঠিতেই এই শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন।

আমরা যাবতীয় জড় পদার্থকে কঠিন, তরল ও অনিল, এই তিন শ্রেণীতে ফেলিয়াছি, বহু দ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য বা ঐক্য দেখিয়া। কিন্তু অন্যরূপ সাদৃশ্য বা ঐক্য দেখিয়া অন্যরূপ শ্রেণীবিভাগও চলিতে পারে। এখন তাহাই দেখিব।

মূল ও যৌগিক পদার্থ

নূতন রকমে জড়ের শ্রেণীবিভাগে প্রবৃত্ত হইব। কোন কোন জিনিস হইতে আমরা দুই তিন রকমের ভিন্ন ভিন্ন জিনিস বাহির করিতে পারি। সিন্দুর হইতে পারা ও গন্ধক পৃথক্ করা চলে। জল হইতে দুইটা অনিল বাহির করা চলে। এইগুলিকে **যৌগিক পদার্থ** বলিব; কতিপয় দ্রব্যের সংযোগে ইহারা উৎপন্ন। আবার পারা হইতে পারাই পাওয়া যায়; কয়লা হইতে কয়লাই পাওয়া যায়; গন্ধক হইতে গন্ধক ভিন্ন আর কিছুই মিলে না। বহু চেষ্টাতেও এই সকল জিনিস হইতে অন্য জিনিস বাহির হয় নাই। এই সকল পদার্থকে **মূল পদার্থ** বলিব।

একটা জিনিস বিশ্লেষণ করিয়া তাহা হইতে অন্যান্য জিনিস বাহির করিবার নানা উপায় আছে। তুতে জলে দ্রব করিয়া তাহাতে লোহার ছুরি ধরিলে ছুরির গায়ে তামা জমিতে থাকে। ঐ তামা তুতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। জলকে ঈষৎ অম্লাক্ত করিয়া উহার ভিতর তাড়িতস্রোত চালাইলে উহা হইতে দুই রকমের দুইটা অনিল বাহির হয়। মেটে সিঁদুরে কয়লার গুঁড়া মিশাইয়া বাঁকনলে ফুঁ দিয়া দীপশিখা দ্বারা তপ্ত করিলে তাহা হইতে সীসা বাহির হয়। অত্যধিক উত্তাপযোগে বহু দ্রব্য বিশ্লিষ্ট হইয়া দুই বা ততোধিক দ্রব্য বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপে দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ—কঠিন, তরল, অনিল, অধিকাংশই যৌগিক; কেবল গোটাকতক জিনিস মূল পদার্থ; এই মূল পদার্থ কয়টিকে বিশ্লেষণ করিয়া অন্য পদার্থ অদ্যাপি বাহির করিতে পারা যায় নাই। এই মূল পদার্থগুলির সংখ্যা প্রায় আশীটা।

মূল পদার্থগুলির মধ্যে যেগুলি সকলেরই পরিচিত, তাহার কতকগুলির নাম করিতেছি,—কয়লা, গন্ধক, দস্তা, পারা, সীসা, টিন, লোহা, সোনা, রূপা। ইহাদের মধ্য হইতে অন্য পদার্থ অদ্যাপি বাহির হয় নাই।

যে সকল জিনিসকে আমরা আজিকালি মূল পদার্থ বলিয়া জানি, তাহারা যে চিরকাল মূল পদার্থ বলিয়াই গৃহীত হইবে, তাহা মনে করা অনুচিত। এখন আমরা সোনা হইতে অন্য কোনও জিনিস বাহির করিতে পারি না বা অন্যান্য জিনিসের একত্র সংযোগে সোনা তৈয়ার করিতে পারি না; তাই বলিয়া কোন কালেও যে কেহ পারিবে না, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না। শতখানেক বৎসর পূর্ব্বে চুন মূল পদার্থ বলিয়া গৃহীত হইত; এখন চুন হইতে একটা ধাতুপদার্থ বাহির করিতে পারা যায়; সেই ধাতু পোড়াইয়া আবার চুন তৈয়ার হয়।

আমাদের প্রাচীন দার্শনিকেরা "ক্ষিত্যপ্‌তেজো মরুদ্ব্যোম" এই পঞ্চ মহাভূতের উল্লেখ করিতেন। কিন্তু আমাদের প্রাচীন কালের মহাভূত আর একালের বিজ্ঞানের মূল পদার্থ, এ দুয়ের এক অর্থ নহে। অতএব এ ক্ষেত্রে সেকালের বুড়া দার্শনিকদিগকে পরিহাস না করাই ভাল।

এই মূল পদার্থগুলির অধিকাংশ অল্প দিন মাত্র পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে; কাজেই ইহাদের বাঙ্গলা নাম নাই। বিদেশী নামগুলি বাঙ্গলা হরপে লিখিয়া চালান যাইবে, কি প্রত্যেকের জন্য নূতন নামের সৃষ্টি করা হইবে, ইহা বাঙ্গলা ভাষায় একটা বিষম সমস্যা হইয়া আছে। যাঁহারা বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা সকলেই ইংরেজীতে কৃতবিদ্য; আবার স্বদেশী বিদেশী দুই প্রস্থ নাম ব্যবহার করায় নানা অসুবিধা। কাজেই বিদেশী নামগুলি বাঙ্গলা হরপে চালানই মোটের উপর সুবিধা। বাঙ্গালীর বাগিন্দ্রিয়ের খাতিরে এক আধটু উচ্চারণ বদলাইলে শ্রুতিকটুতা দোষও দূর হইতে পারে, অথচ বুঝিবার গোল হইবে না।

এইরূপে সীলীনম তেলুরম স্বচ্ছন্দে বাঙ্গলায় চলিতে পারে। ক্লোরিন ব্রোমিন ফ্লুরিনও বেশ চলিতে পারে। টিন প্লাটিনম আলুমিনম, এই কয়টি বাঙ্গলা কথাবার্ত্তায় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, এই নামগুলি বাঙ্গলায় চালান একটু কঠিন; বাঙ্গলা ভাষার একটা ধাত আছে; সেই ধাতের সঙ্গে না মিলিলে ভাষাটাই কদর্য্য হইয়া পড়িবে ও লোকে বরং ইংরেজী পড়িবে, কিন্তু সেই কদর্য্য

বাঙ্গলা পড়িবে না। অম্লজান, যবক্ষারজান, উদজান, এই যে নামগুলি বাঙ্গলা কেতাবে দেওয়া হইয়াছে, তাহারও নানা দোষ; প্রধান দোষ উহাদের দীর্ঘতা। লেখা কেতাবে চলিতে পারে, কিন্তু মুখের কথায় চালান দুষ্কর। সেই জন্য কথিত ভাষায় উহা এত কালেও চলে নাই। এই নাম কয়টি এত পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিতে হয় যে, উচ্চারণে যাহাতে না ঠেকে, এইরূপ নাম হওয়া উচিত। যত দিন আপত্তির মীমাংসা না হয়, তত দিন ইংরেজী নামই ব্যবহার করা ভাল, ইহা এই বয়সে বুঝিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমি অক্সিজেনের ও নাইট্রোজেনের ইংরেজী নামই ব্যবহার করিব। অনেকে অনেক আপত্তি তুলিবেন, কিন্তু এ আপত্তির অন্ত নাই। হাইড্রোজেন বড় কর্কশ, কিন্তু উদজানও কেহ বলিতে চাহিবে বোধ হয় না। ডাক্তারদের কল্যাণে আজকাল অক্সিজেন পাড়াগাঁয়েও চলিয়াছে, অতএব ইংরেজীই আপাততঃ চলুক।

মূল পদার্থগুলির মধ্যে গোটাকতক অনিলাবস্থ :—অক্সিজন, নাইট্রোজন, হাইড্রোজন, ফ্লুরিন ও ক্লোরিন। আমাদের বায়ুসাগরের মধ্যে সম্প্রতি গোটাকতক অনিলের নূতন আবিষ্কার হইয়াছে; উহাদের পরিমাণ কিন্তু যৎসামান্য এবং আচরণও অনেকটা খাপছাড়া; উহাদের ইংরেজী নাম—আর্গন, নিয়ন, ক্রুপটন, জেনন।

মৌলিক তরল পদার্থ কেবল দুইটি—ব্রোমিন আর পারদ। অনিল ও তরল অবস্থাপন্ন, এই পদার্থ কয়টি বাদ দিলে অবশিষ্ট সমুদয় মূল পদার্থই কঠিন।

বলা বাহুল্য, কঠিন পদার্থ তাপযোগে তরল ও অনিল অবস্থা পায়; শৈত্যপ্রয়োগে অনিল তরল হয়; প্রায় সকল অনিলই তরল অবস্থায়, এমন কি, কঠিনাবস্থায় আনীত হইয়াছে।

কতিপয় মূল পদার্থের একাধিক রূপ। অক্সিজনের রূপান্তর ওজোন। উহাও অনিলাবস্থ; তাড়িততরঙ্গ প্রয়োগে অক্সিজনের কিয়দংশ ওজোন হইয়া যায়। কয়লার রূপান্তর গ্রাফাইট (কাল সীসা, যাহাতে পেন্সিল হয়) ও হীরা। গন্ধকের কয়েকটা রূপ। গন্ধককে গলাইয়া ঠাণ্ডা করিলে দানা বাঁধে; আবার তরল ফুটন্ত গন্ধককে জলে ফেলিলে আমড়ার আটার মত চিটেল গন্ধক হয়। ফস্ফরস দুই রকমের; এক রকম ফস্ফরস দিয়াশলাইয়ের লাল কাঠির মুখে থাকে, আর একরকম ফস্ফরস কাল কাঠির বাক্সের পিঠে মাখান থাকে।

গুপ্ত-কবি বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছিলেন,—

এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান ;
সকল প্রকার সুখ করিতেছে দান।
জীবনধারণ কিংবা আরামকারণ
যে যে বস্তু আমাদের হয় প্রয়োজন,
সকলই সুলভ এতে, অভাব ত নাই।

জীবনধারণের জন্য আবশ্যক জিনিস নিতান্ত দুর্লভ হইলে কাহারও জীবন টিকিত না। জীবনধারণের জিনিস নাই, অথচ জীবনযাত্রা চলিতেছে, ইহাই বরং আমাদের পক্ষে অধিকতর বিস্ময়ের হেতু হইত। আর আবশ্যক জিনিস সকলই যে সুলভ, তাহাও বলা যায় না। আমাদের কলেরার দেশে বিশুদ্ধ পানীয় জল একটু সুলভ হইলে মন্দ হইত না। অন্ততঃ জীবনধারণের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক অন্ন জিনিসটা সর্ব্বদা সুলভ হইলে এক একটা দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের ধ্বংস হইত না।

সে যাহা হউক, সকল মূল পদার্থ সমান পরিমাণে পৃথিবীতে বিদ্যমান নাই এবং আমাদের জীবনধারণে বা আরামকারণে যাহা যত আবশ্যক, তাহা তত সুলভ নহে। তবে গোটাকতক জিনিস, যাহা না হইলে জীবনযাত্রা একেবারে অচল হইত, তাহা কতকটা সুলভ বটে ; অথবা ঘুরাইয়া বলিলেই ঠিক হয়,—তাহারা সুলভ বলিয়াই জীবনযাত্রা সম্ভবপর হইয়াছে।

ধাতুভস্ম

আমাদের দেশের কবিরাজেরা ধাতুভস্ম করিয়া থাকেন। সীসা গরম করিলে তরল হয় ; এই তরল ধাতু ক্রমাগত বাতাসে নাড়িতে থাকিলে ঐ তরল চকচকে ধাতুর উপরে যেন একখানা ময়লা সর পড়ে ; এই সর ধাতুর উপরে ভাসিতে থাকে। ঐ ধাতু যে দ্রব্যে পরিণত হয়, তাহাতে ধাতুর চাকচিক্য থাকে না ; উহা ধাতু অপেক্ষা হাল্‌কা হয়। ধাতুকে বাতাসে গরম করা আবশ্যক ; বায়ুর অভাবে চলিবে না। এইরূপে প্রস্তুত জিনিসের নাম ধাতুভস্ম। সীসা হইতে সীসাভস্ম হয়। ঐরূপে বায়ুমধ্যে পারা গরম করিয়া পারাভস্ম তৈয়ার হইতে পারে। বাতাসে লোহা পোড়াইলে লোহাভস্ম হয়। আপাততঃ লঘু বলিয়া বোধ হইলেও ওজন করিলে দেখা যাইবে, ধাতুর চেয়ে তজ্জাত ধাতুভস্মের ভার

অধিক। দেখা যাইবে যে, ধাতুটাই ধাতুভস্মে পরিণত হইয়াছে, ধাতুটাই যেন বিকৃত হইয়া ভস্মে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু ঐ ধাতুর ভার চেয়ে তজ্জাত ভস্মের ভার কিছু অধিক। অর্থাৎ ধাতুতে একটা কিছু যোগ হইয়া ধাতুভস্ম হইয়াছে। নিক্তিরূপী চির-পরিচিত যন্ত্রটির সাহায্যে ওজন না করিলে এই তথ্যটি বাহির হইত না। সেকালের লোকে—এ দেশের ও ও পশ্চিমদেশের সেকালের লোকে ধাতুভস্ম করিতে জানিতেন; কিন্তু ভস্ম হইয়া ধাতুটা যে ওজনে বাড়ে এবং অন্য কোন জিনিসের সঙ্গে যুক্ত হওয়াতেই যে উহার ওজন বাড়ে, এই সহজ কথাটা স্পষ্ট ধরিতে পারেন নাই। লাবোয়াশিয়া নামক ফরাসী পণ্ডিত এই তথ্যটুকু স্পষ্ট ধরেন। তিনি নিক্তির মাহাত্ম্যটা খুব ভালই বুঝিতেন। তিনি নিক্তিতে ওজন করিয়া ভারবৃদ্ধি দেখিয়া ধরিয়া ফেলিলেন যে, বায়ুমধ্যে তপ্ত না করিলে যখন ধাতু ভস্মে পরিণত হয় না, তখন বায়ুরই কিয়দংশ ধাতুর সহিত যুক্ত হওয়ায় ধাতুর ওজন বাড়িয়া যায় এবং ধাতুভস্মের উৎপত্তি হয়।

সে আজ প্রায় দেড় শত বৎসরের কথা। সেই সময়ে প্রীষ্টলী নামে একজন ইংরেজ ছিলেন। তিনি সীসাভস্মকে গরম করিয়া দেখিলেন যে, তাহা হইতে একটা অনিল বাহির হইতেছে। এই অনিলটা কিছু নূতন ধরণের; এই অনিলে বাতি জ্বলে। বাতি বায়ুতেও জ্বলে; কিন্তু এই অনিলে আরও উজ্জ্বল হইয়া জ্বলে। বাতি কেন, কাঠকয়লা গন্ধক প্রভৃতি জিনিসও এই অনিলে জ্বলিয়া উঠে ও পোড়ে; বায়ুতে যেমন জ্বলে ও পোড়ে, তার চেয়ে খুব উজ্জ্বল হইয়াই পোড়ে।

প্রীষ্টলী এই অনিলটা আবিষ্কার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দহনক্রিয়ার তাৎপর্য্য তাঁহার মাথায় আসে নাই। লাবোয়াশিয়া দেখিলেন যে, ধাতুকে বায়ুমধ্যে উত্তপ্ত করিলে উহার ভার বাড়ে, উহা বায়ুর একটা অংশ টানিয়া লইয়া সেই অংশের সহিত যুক্ত হয়; ধাতুটা ভস্মে পরিণত হয়; আবার ঐ ভস্মকে গরম করিলে উহা হইতে একটা অনিল বাহির হইয়া আসে; উহার ধর্ম্ম বায়ুরই মত; তবে বায়ুর অপেক্ষাও উহা যেন তেজস্বী। অমনি লাবোয়াশিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এই নূতন অনিলটা বায়ুর মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। ধাতুটা বায়ুর অন্তর্গত ঐ অনিলটাকেই টানিয়া লইয়া উহার সহিত যুক্ত হইয়া ধাতুভস্মে পরিণত হইয়াছিল; সেই জন্য ধাতুর ভার চেয়ে ধাতুভস্মের ভার অধিক হইয়াছিল; আবার ধাতুভস্মকে তপ্ত

করায় সেই অনিল বাহির হইয়া আসিল; বায়ুর অন্তর্গত অনিল বায়ুতে ফিরিয়া আসিল; ধাতুভস্মও ধাতুতে পরিণত হইল। লাবোয়াশিয়া এই বায়ুমধ্যস্থ অনিলের নাম দিলেন অক্সিজন; উহাই বাঙ্গলা বহ্নির অম্লজান। উহাই প্রীষ্টলীর আবিষ্কৃত অনিল হইতে অভিন্ন। প্রীষ্টলী সীসাভস্ম তপ্ত করিয়া উহাই বাহির করিয়াছিলেন।

এই নবাবিষ্কৃত অনিলের ধর্ম্মই দাহ্য দ্রব্যকে পোড়ান; বায়ুতে উহা সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে বলিয়াই বায়ুরও ধর্ম্ম দাহ্য দ্রব্যকে পোড়ান; তবে বায়ুতে উহা অবিশুদ্ধ অবস্থায় আছে; অন্য অনিলের সহিত মিশিয়া আছে। এই জন্য কয়লা কাঠ বাতি বায়ুতে তত তেজে পোড়ে না, যত তেজে পোড়ে এই অনিলে।

স্থির হইল যে, ধাতুদ্রব্য বায়ুমধ্যে বিদ্যমান এই অক্সিজন অনিলের সহিত সম্মিলিত হইয়া ধাতুভস্মে পরিণত হয়। এই অক্সিজন অনিলই দাহ্য দ্রব্যকে পোড়ায় এবং অদাহ্য ধাতুকে ভস্ম করে। দাহ্য বস্তু কি? যাহা বায়ুতে পোড়ে—যেমন কয়লা, গন্ধক, তেল, বাতি, কাঠ। এই সকল জিনিস বায়ুতে পোড়ে—বায়ুশূন্য স্থানে যে পোড়ে না, তাহা বলাই বাহুল্য এবং পুড়িবার সময় আগুন উৎপাদন করে, অর্থাৎ উত্তাপের এবং আলোকের সৃষ্টি করে। ঐ সকল জিনিসই আবার ঐ বিশুদ্ধ অক্সিজন অনিলেও পোড়ে, বরং আরও উজ্জ্বলতর অগ্নিশিখা উৎপাদন করিয়া পোড়ে।

দহনক্রিয়া

এই **দহন**-ব্যাপারটা কি? লাবোয়াশিয়া কয়লা লইয়া বায়ুতে পোড়াইলেন, আবার অক্সিজনেও পোড়াইলেন; তাহার ফলে যাহা উৎপন্ন হইল, তাহাকে ধরিয়া আবার নিক্তিতে ওজন করিলেন। কয়লা পুড়িয়া অদৃশ্য হইল। উহা কোথায় গেল? কয়লা পুড়িয়া একটা অনিলের উৎপত্তি হইল; যে অনিলটা জন্মিল, তাহা ওজন করিয়া লাবোয়াশিয়া দেখিলেন যে, উহার ভার কয়লার ভার চেয়ে অধিক।

কি আশ্চর্য্য, কয়লাটা অদৃশ্য হইল, মনে হইল যেন উহা লুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহার স্থানে যে নূতন অনিল উৎপন্ন হইল, তাহার ভার কয়লার চেয়ে অধিক।

লাবোয়াশিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, কয়লা ঐ অক্সিজনের সহিত সম্মিলিত হইয়া এই নূতন অনিলের উৎপাদন করিয়াছে। কয়লার ভার আর অক্সিজনের ভার একযোগে নূতন অনিলের ভারের সমান, তাহাও দেখা গেল।

স্থির হইল যে, দহনব্যাপারটা আর কিছুই নহে, উহা অক্সিজনের সহিত দাহ্য দ্রব্যের সম্মিলনের ফল।

কয়লা গন্ধক প্রভৃতি দাহ্য দ্রব্য অক্সিজনের সহিত সম্মিলিত হইয়া নূতন জিনিসের সৃষ্টি করে; ফলে খানিকটা উত্তাপ জন্মে, খানিকটা আলোক জন্মে। আলোক আর উত্তাপ সেই সম্মিলনের আনুষঙ্গিক ঘটনা মাত্র; উহাই দহনকালে অগ্নি উৎপাদনের রহস্য।

রাঙ্, সীসা তামা প্রভৃতি ধাতুকেও বায়ুমধ্যে তপ্ত করিলে উহা অক্সিজনের সহিত যুক্ত হয়; কিন্তু এবার কোন অনিল জন্মে না; ধাতুটা অক্সিজনযোগে ধাতুভস্মে পরিণত হয়; এ ক্ষেত্রে অধিক উত্তাপ জন্মে না বা আলোক জন্মে না, তাই আগুন হয় না। অক্সিজনের সহিত সংযোগের আনুষঙ্গিক ফল উত্তাপ; উত্তাপ অল্প হইলে আগুন হয় না।

লাবোয়াশিয়া প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানবিদ্যায় যুগান্তর উপস্থিত করিলেন। যখন তিনি দহনক্রিয়ার স্বরূপ নির্ণয় করিলেন, তখন হইতেই রসায়নবিদ্যা নূতন ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল। আধুনিক রসায়নবিজ্ঞান এই দিনে জন্ম গ্রহণ করিল। একজন লোকের প্রতিভা মানুষকে কতটা ঊর্দ্ধে তুলিতে পারে, তাহার এই একটা দৃষ্টান্ত। প্রীষ্টলী অক্সিজনের আবিষ্কর্ত্তা; কিন্তু এই অনিলের সহিত দহনক্রিয়ার কি সম্পর্ক, তাহা তিনি ধরিতে পারেন নাই। লাবোয়াশিয়ার যে প্রতিভা ছিল, প্রীষ্টলী সে প্রতিভায় বঞ্চিত ছিলেন।

চোখ থাকিলেই যে দেখা যায়, এমন নহে। চোখ সকলেরই আছে, কিন্তু সকলে সমান দেখিতে পায় না; অনেকেই চোখ থাকিতে কাণা। চোখের উপর আরও কিছু চাই; সেটা যাহার প্রচুর পরিমাণে আছে, সে-ই প্রতিভাশালী।

দস্তায় গন্ধকদ্রাবক (সলফুরিক আসিড) ঢালিলে যে অনিল বাহির হয়, তাহার নাম হাইড্রোজন; প্রীষ্টলী এই অনিলে পাত্র পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে ধাতুভস্ম গরম করিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন যে, হাইড্রোজনের পরিমাণ

ক্রমেই কমিতেছে, আর ধাতুভস্মটা ক্রমে খাঁটি ধাতুতে পরিণত হইতেছে। ধাতুতে গন্ধকদ্রাবক ঢালিলে হাইড্রোজন বাহির হইয়াছিল ; ধাতুভস্ম যেন সেই হাইড্রোজন গ্রহণ করিয়া ধাতুতে পরিণত হইল : প্রীষ্টলী সিদ্ধান্ত করিলেন, ধাতুভস্মই মূল পদার্থ, এবং উহাতে এই হাইড্রোজনের যোগ হইলে উহা ধাতু হয় ; অর্থাৎ ধাতুভস্ম + হাইড্রোজন = ধাতু ; অতএব ধাতুটাই যৌগিক পদার্থ। পাত্রস্থিত হাইড্রোজনের লোপাপত্তির সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের গায়ে আর একটা জিনিস দেখা দিয়াছিল, বিন্দু বিন্দু জল দেখা দিয়াছিল ; তাহা প্রীষ্টলী দেখিলেন না, দেখিয়াও দেখিলেন না। দেখিলে তিনি হয়ত বুঝিতেন যে, তাঁহার সিদ্ধান্ত ঠিক হয় নাই।

আর একজন তাৎকালিক বৈজ্ঞানিক ক্যাবেণ্ডিশ , ইনি যে-সে লোক ছিলেন না। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইঁহার স্থান অতি উচ্চে। ক্যাবেণ্ডিশ হাইড্রোজন ও অক্সিজন মিশাইয়া তাড়িতস্ফুলিঙ্গযোগে জ্বালাইয়া অনেকটা জল তৈয়ার করিলেন। অথচ হাইড্রোজন হইতে এই জলোৎপত্তির তাৎপর্য্য তিনিও সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

ইহার তাৎপর্য্য বুঝিলেন লাবোয়াশিয়া। তিনি স্পষ্ট দেখিলেন ও অন্যকে দেখাইলেন, হাইড্রোজন ও অক্সিজনের সম্মিলন-ফল জল। কয়লা যেমন পুড়িয়া যায় এবং অক্সিজনের সহিত সম্মিলিত হইয়া একটা নূতন অনিলের উৎপাদন করে, হাইড্রোজনও তেমনই দাহ্য পদার্থ ; উহাও অক্সিজনে পোড়ে এবং পুড়িবার সময় অক্সিজনে সম্মিলিত হইয়া জলের উৎপাদন করে। অতএব জল যৌগিক পদার্থ।

প্রীষ্টলীর আবিষ্কারের সহিত এই সিদ্ধান্ত মিলিল। হাইড্রোজনের সহিত ধাতুভস্ম তপ্ত করিলে হাইড্রোজন ঐ ধাতুভস্ম হইতে অক্সিজনকে টানিয়া লয়, আর তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়া জলের উৎপাদন করে ; পাত্রের গায়ে জলবিন্দু দেখা দেয়। সিদ্ধান্ত হইল, জল অক্সিজন ও হাইড্রোজনের সম্মিলন-ফল। জল যৌগিক পদার্থ। ধাতুভস্মও যৌগিক পদার্থ ; জল যেমন হাইড্রোজন ও অক্সিজনযোগে উৎপন্ন, ধাতুভস্মও তেমনই ধাতু ও অক্সিজনযোগে উৎপন্ন।

এই আবিষ্কারের কিছু দিন পরে ফরাসীদেশে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিল ; প্রজারা ক্ষিপ্ত হইয়া রাষ্ট্রতন্ত্র উল্‌টাইয়া দিল। সমাজের আচারব্যবহার বিপর্য্যস্ত করিল, প্রচলিত ধর্ম্ম পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিল। রাজা-রাণীকে বধ করিয়া

প্রজাগণ পরস্পরের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে লাগিল এবং একদিন লাবোয়াশিয়ার ছিন্ন মুণ্ড ভূলুণ্ঠিত হইল। লাবোয়াশিয়া যে দিন জন্মিয়াছিলেন, সে দিন মানবজাতির ইতিহাসে এক দিন। আর যে দিন তিনি গিলোটিন আঘাতে মুণ্ড দিলেন, সে দিন মানবের নিয়তি মানবের ইতিহাসের দিকে চাহিয়া অট্টহাস্য করিল।

জড়ের নিত্যতা

পূর্ব্বে বলিয়াছি, লাবোয়াশিয়া নিক্তির মাহাত্ম্য খুব বুঝিতেন। নিক্তি যন্ত্রটা দেখিতে যেন অধিক কিছুই নয়; কিন্তু রাসায়নিকদের সমস্ত বিদ্যা ইহার উপরে প্রতিষ্ঠিত। বায়ুপূর্ণ বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া তাহাতে বাতি পোড়াইলে বাতিটা ক্রমে অদৃশ্য হয়। কিন্তু বাতিসমেত বায়ুপূর্ণ পাত্রেরও ঠিক সেই ভারই থাকে। ইহার অর্থ এই যে, বাতিটা অদৃশ্য হইয়াছে বটে; উহার উপাদানমধ্যে ছিল কয়লা আর হাইড্রোজন আর বায়ুমধ্যে ছিল অক্সিজন; কয়লা অক্সিজনে সম্মিলিত হইয়া সেই নূতন অনিলটা জন্মাইয়াছে। হাইড্রোজন ও অক্সিজনযোগে জল হইয়াছে; কিন্তু মোটের উপর ভার কমে নাই বা বাড়ে নাই।

নিউটন সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, ভার বস্তুর সমানানুপাতিক, বস্তু বাড়িলেই ভার বাড়ে। এখানে ভার যখন বাড়ে নাই বা কমে নাই, তখন বস্তুর পরিমাণেরও তারতম্য হয় নাই।

স্থির হইল যে, রাসায়নিক সম্মিলনে পদার্থের রূপান্তর ঘটে, কিন্তু বস্তুর তারতম্য হয় না। বস্তুর হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই।

বস্তুর আর একটি নাম দেওয়া গিয়াছে জড়ত্ব, কেন না, ইহা জড় মাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম। দেখা গেল যে, রাসায়নিক সম্মিলনে বস্তুর তারতম্য হয় না, জড়ের জড়ত্ব পূর্ণ মাত্রায় থাকে। বস্তু আমরা বাড়াইতে বা কমাইতে পারি না। নিক্তিযন্ত্রের সাহায্য-লব্ধ এই তত্ত্বটিকে ঘুরাইয়া বলা হয়, জড় পদার্থের ধ্বংসও নাই, সৃষ্টিও নাই। অতএব জড় অনাদি ও অবিনাশী নিত্য পদার্থ।

এই ভাষাটা বিজ্ঞানের ভাষা, না কবিতার ভাষা? এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, তাঁহারা বলেন, অসৎ হইতে সৎ জন্মে না ও সতের পরিণতিতেও অসৎ হয় না। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" প্রভৃতি

বাক্য আমাদের দেশেই প্রচলিত আছে। ইহার অর্থ—যাহা ছিল না, তাহা আপনা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। এবং যাহা আছে, তাহা একবারে নাস্তিতে পরিণত হইতে পারে না। আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত হর্বার্ট স্পেন্সার, তিনিও বলিয়াছেন, সতের অসতে পরিণতি বা অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি আমরা কল্পনা করিতেও পারি না, এবং যাহা কল্পনা করিতে পারি না, তাহা অসত্য।

বৈজ্ঞানিকের নিকট এই কথাগুলি একটু গায়ের জোর বলিয়া বোধ হয়। কে কি কল্পনা করিতে পারে বা না পারে, বলা কঠিন। আমি নিজে এটা কল্পনা করিতে পারি না, ইহা জোর করিয়া বলিতে পারি; কিন্তু ঐরূপ কল্পনা অপরের অসাধ্য কি না, তাহা বলিবার আমার কি অধিকার আছে? হর্বার্ট স্পেন্সার অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কল্পনায় আনিতে পারেন নাই; কিন্তু অধিকাংশ খ্রীষ্টানই অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অনায়াসে কল্পনা করেন; বলা বাহুল্য, তাঁহাদের মধ্যে অনেক ধীমান্ ব্যক্তি আছেন। খ্রীষ্টানদের মত এই যে, এক সময়ে জগৎ ছিল না; একজন ইচ্ছা করিলেন, জগৎ হউক, আর জগৎ হইল; অর্থাৎ অসৎ হইতে সৎ জন্মিল। সেই এক জনের শক্তিমত্তাকে কোনরূপে সীমাবদ্ধ করিতে খ্রীষ্টানেরা চাহেন না। তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই; তিনি অসৎ হইতে সতের উৎপাদনে সমর্থ; তাঁহার সামর্থ্যের সীমা কল্পনা ইঁহাদেরই নিকট অসাধ্য। বড় বড় পণ্ডিতদের ঐরূপ বিসংবাদ দেখিয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কোন একটা দার্শনিক তথ্যের দোহাই দিতে একটু কুণ্ঠিত হইতে হয়।

দার্শনিক তত্ত্বটা ঠিক হউক আর না হউক, উহার উপরে নির্ভর করিয়া কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা চলে না। জড়ের ধ্বংস আছে কি না অর্থাৎ রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে বা অন্যরূপ পরিবর্ত্তনে বস্তুর তারতম্য ঘটে কি না, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য উক্ত দার্শনিক তত্ত্বের দোহাই দিলে বৈজ্ঞানিকের চলিবে না; তাঁহাকে নিক্তিযন্ত্রের সাহায্য লইতে হইবে। লাবোয়াশিয়ার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি নিক্তি হাতে ওজন করিয়া দেখাইতে বসেন নাই যে, ঐরূপ তারতম্য প্রকৃতপক্ষে ঘটে কি না। কাজেই লাবোয়াশিয়ার পূর্ব্বে যদি কেহ বলিতেন, বস্তুর ধ্বংস হয় না, তাহা মানিয়া লইতে কেহ বাধ্য হইত না। লাবোয়াশিয়া যখন নিক্তির ওজনে দেখাইলেন যে, বাতি পুড়িয়া যখন অদৃশ্য হয়, উহা তখন রূপান্তরিত হয় মাত্র, কিন্তু

উহার বস্তুর তারতম্য ঘটে না, তখনই আমরা মানিতে বাধ্য হইলাম যে, কথাটা সত্য, উহা প্রকৃতির বিধান, উহার উপর আমাদের হাত নাই।

ফলে জড় পদার্থ নিত্য বা অনাদি ও অনশ্বর, এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কেবল মাথা ঘামাইয়া আবিষ্কৃত হয় নাই; যত বড় পণ্ডিতই হউন, ঐরূপ কথা বলিলে আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য হইব না। তবে যখন প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নিক্তির ওজনে দেখা যাইতেছে, জড়ের বস্তুপরিমাণ সর্ব্ববিধ বিকার সত্ত্বেও সমান থাকে, তখন উহা স্বীকার করিতেই হইবে। কেন না, পদার্থবিদ্যায় প্রত্যক্ষের উপর আর প্রমাণ নাই; বিজ্ঞানবিদ্যা উহার অপেক্ষা বলবত্তর প্রমাণ জানে না।

পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি, মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম—যাহা নিউটন আবিষ্কার করেন, তাহা বিশ্বব্যাপক, এই কথাটায় একটু বাড়াবাড়ি আছে। উহা সৌর জগতে ব্যাপক; যুগল তারকার গতিবিধি দেখিয়া ঐ নিয়ম সৌর জগতের বাহিরেও প্রত্যক্ষ হয়; কিন্তু উহা অসীম বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান, ইহা বলা দুঃসাহসের কাজ। কেন না, সমস্ত বিশ্বজগৎ এখনও প্রত্যক্ষগোচর হয় নাই; ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় কি আছে, আমরা তাহা জানি না। হয়ত এমন স্থান রহিয়াছে, সেখানে মাধ্যাকর্ষণ অবিদ্যমান। যাহা প্রত্যক্ষ সীমার বাহিরে, সেখানে বিজ্ঞানের জোর করিয়া কথা কহা নিষিদ্ধ।

নিক্তির ওজনের উপর নির্ভর করিয়া জড় পদার্থ অবিনাশী, এত বড় কথাটা বলা চলে কি? একালের রাসায়নিক পণ্ডিতেরা যে নিক্তি ব্যবহার করেন, তাহাতে অতি সূক্ষ্ম ওজন হয়; এক ধানের ওজনের সহস্রাংশও হয়ত ধরা পড়ে; কিন্তু তাহার সূক্ষ্মতার একটা ত সীমা আছে। সহস্রাংশ না হয় ধরা পড়িল, কিন্তু লক্ষাংশের বেলায় বা কোটি অংশের বেলা নিক্তি নিরুত্তর। অতটুকু ভার বাড়িলে বা কমিলে নিক্তি তাহা ধরিতে পারিবে না। এখন যদি কেহ বলিয়া বসেন, বাতি পুড়িলে বস্তুর একটু ধ্বংস হয়, এত অল্পাংশের ধ্বংস হয় যে, কোন নিক্তিতে তাহা ধরিতে পারা যায় না, তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদ অসাধ্য হয়।

বস্তুতই একালের পণ্ডিতেরা জড় পদার্থ অবিনাশী, এই তত্ত্বের উপর গা ঢালা দিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিতে সাহস করেন না। সৎ কখনও অসৎ হয় না, অতএব বস্তুর নাশ নাই, বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে সাহস ত করেনই না; এমন কি, ঘটনাক্রমে বস্তুর উৎপত্তি বা ধ্বংস হইতে পারে

কি না, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক সমাজে চেষ্টা এখনও চলিতেছে। হয়ত কোন দিন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে, অমুক ক্ষেত্রে অমুক বস্তুর এতটুকু লোপ হইয়া থাকে।

যদি সেইরূপই ঘটে, যদি কখনও প্রমাণ উপস্থিত হয় যে, ঘটনাক্রমে বস্তুর পরিমাণে তারতম্য ঘটে, দার্শনিক পণ্ডিতেরা তৎক্ষণাৎ বলিয়া বসিবেন, তাহা হইলই বা? আমরা ত বলিয়াছি যে, সৎ হইতে অসৎ হয় না; অভাব হইতে ভাব হয় না, আবার ভাব হইতেও অভাব হয় না; তোমাদের (অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকদের) নূতন আবিষ্কারে এই পর্য্যন্ত বুঝিলাম, তোমরা যাহাকে বস্তুসংজ্ঞা দাও, জড়ের যে ধর্ম্মকে তোমরা জড়ত্ব আখ্যা বা বস্তু আখ্যা দাও, সেই বস্তু কোন সৎ পদার্থ নহে, উহা কোন ভাবপদার্থ নহে; অতএব উহা নিত্যও নহে; উহা কোন আগন্তুক আনুষঙ্গিক ধর্ম্ম মাত্র। উহার উৎপত্তিতে বা লোপে আমাদের বিচলিত হইবার হেতু নাই; যাহা সৎ পদার্থ, তাহা অসৎ হইবে না, ইহা কিন্তু স্থির।

ঠিক কথা, আমরা যাহাকে বস্তু বলিতেছি, তাহা সৎ পদার্থ না হইতে পারে; উহাকে সৎ পদার্থ মনে করাই ভুল হইয়াছিল। দার্শনিক নিজের পথে ঠিক আছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক তুমি সাবধানে তাঁহার পথে চলিবে। নিউটন স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন, Physics, Beware of Metaphysics,—বৈজ্ঞানিক, দার্শনিকের পথ তোমার পথ নহে।

ঘটনাক্রমে অথবা অতি সূক্ষ্ম ওজনে বস্তুর তারতম্য ঘটে কি না, তাহা বর্ত্তমান কালে জোর করিয়া বলা চলে না; তবে মোটামুটি আমরা উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি ও সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা জীবনযাত্রা চালাই। বাজার হইতে এক মণ চাউল বাড়ীতে আনিয়া যদি দেখিতাম, তাহার বস্তুপরিমাণ অকস্মাৎ সেরখানেক কমিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে জীবনযাত্রা কঠিন হইত। বিধির বিধানে তাহা ঘটে না, তাই রক্ষা। তেমনই চাউলের গোলায় আগুন লাগিয়া যদি চাউল অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে, উহা লুপ্ত হয় নাই, রূপান্তরিত হইয়া অদৃশ্য অনিলাবস্থায় বায়ুসাগরে লীন হইয়াছে মাত্র। যদি এই সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নির্ব্বিবাদে স্বীকৃত না হইত, তাহা হইলে মনুষ্যের জীবনযাত্রার প্রণালী সমস্ত সমাজতন্ত্র কিরূপ বিশৃঙ্খল ও বিপর্য্যস্ত হইত, তাহা মনে করিলে গায়ে কাঁটা দেয়।

কয়লাপোড়া অনিল

কয়েকটা অনিলের সহিত আমাদের এতক্ষণ পরিচয় ঘটিয়াছে। প্রথম অক্সিজন, ইনি দহনক্রিয়ার মূলে এবং ভস্মীকরণের মূলে। কয়লা বা গন্ধক দহনকালে অক্সিজন সহিত সম্মিলিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপ ও আলোক দেখা দেয়; অর্থাৎ আগুন উঠে। সীসা অথবা পারা বায়ুতে তপ্ত করিলে অক্সিজন সহিত ধীরে ধীরে সম্মিলিত হইয়া ভস্মে পরিণত হয়; এবার আগুন উঠে না। অক্সিজন বায়ুসাগরে বিদ্যমান; তাই দাহ্য দ্রব্য বায়ুতে পোড়ে; তাই উনানে হাওয়া দিলে কয়লা শীঘ্র জ্বলে; হাপরে হাওয়া দিয়া স্বর্ণকার বা কর্ম্মকার কয়লা পোড়ায়। এই অক্সিজন বড় মিশুক স্বভাবের জিনিস; প্রায় সমুদায় মূল পদার্থের সহিত ইনি সম্মিলিত হইয়া বিবিধ যৌগিক পদার্থের উৎপাদন করেন। বায়ুর প্রায় পঞ্চমাংশ এই অক্সিজন, বাকিটা নাইট্রোজন। এই নাইট্রোজনের স্বভাব বিপরীত; ইনি অক্সিজনের সঙ্গে মিশিয়া আছেন, কিন্তু মিলেন নাই। তবে বায়ুতে ইনি আছেন, তাই রক্ষা; তাহা না হইলে অক্সিজনের প্রতাপে এত দিন আমাদের টেকা কঠিন হইত। তৃতীয় অনিল হাইড্রোজন; ইহাকে অমিলিত অবস্থায় বড় দেখা যায় না; তবে ইনি অক্সিজনের সহিত মিলিত হইয়া জল প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই জল সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। অক্সিজন দাহ্য পদার্থ; অক্সিজন পোড়াইলেই জল হয়। জলে তাড়িতস্রোত চালাইলে অক্সিজন ও হাইড্রোজন পৃথক্ হইয়া যায়। নয় ছটাক ওজনের জলে এক ছটাক হাইড্রোজন পাওয়া যায়, আর আট ছটাক অক্সিজন পাওয়া যায়। গরম বাষ্পকে তপ্ত লোহার নলে চালাইলে তপ্ত লোহার অক্সিজনকে টানিয়া লইয়া ভস্ম হয়, আর হাইড্রোজন বাহির হইয়া যায়। হাইড্রোজন তৈয়ার করিবার সব চেয়ে সহজ উপায়, লোহা কিংবা দস্তার মত ধাতুতে গন্ধকদ্রাবক ঢালা। গন্ধকদ্রাবকে হাইড্রোজন লুকাইয়া মিলিত আছে। ধাতু পদার্থ সেই হাইড্রোজনকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার স্থান গ্রহণ করে।

হাইড্রোজন পুড়িলে জল হয়, আর কয়লা পুড়িলে কি হয়? কয়লার সহিত অক্সিজনের বেশ সদ্ভাব; ঠাণ্ডা কয়লা অক্সিজনে মিলিতে চাহে না; তবে উহাকে গরম করিয়া, উত্তাপে রাঙা করিয়া, বায়ুমধ্যে রাখিলেই উহা দ্রুত পুড়িতে থাকে, আর অদৃশ্য হইতে থাকে। কয়লা জীবদেহে বিদ্যমান,

আর জীবদেহ হইতে, অর্থাৎ প্রাণিদেহ বা উদ্ভিদদেহ হইতে উৎপন্ন প্রায় সকল পদার্থেই বিদ্যমান। কাঠে পাতায় খড়ে তেলে বাতিতে সর্ব্বত্র কয়লা বিদ্যমান। অধিক উত্তাপ দিলে এই সকল পদার্থ পোড়ে, অর্থাৎ উহাদের কয়লা বায়ুর অন্তর্গত অক্সিজনে সম্মিলিত হইতে থাকে। সম্মিলিত হইয়া কি হয়? একটা অনিল হয়। উহা বায়ুর মতই বর্ণহীন ও অদৃশ্য। এই অনিলটার একটি বাঙ্গলা নাম চাই; কেহ নাম দেন অঙ্গারাম্ল: কেহ বলেন দ্ব্যম্লাঙ্গার বায়ু। উভয় নামই উৎকট; ভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা একটা ভাল নাম রাখিবেন। আমরা উহাকে কয়লাপোড়া অনিল বলিব।

ব্ল্যাক নামে একজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক—সে প্রীষ্টলীরও আগে—এই অনিলকে প্রথম প্রকাশ করেন। সেকালে যাঁহারা রসায়ন আলোচনা করিতেন, তাঁহারা কতকগুলি জিনিসের নাম দিতেন তীক্ষ্ণক্ষার ও কতকগুলি জিনিসের নাম দিতেন মৃদুক্ষার। চুন জিনিসটা তীক্ষ্ণক্ষার; কিন্তু কাঠ পাতা পোড়াইলে যে ছাই অবশিষ্ট থাকে, তাহা মৃদুক্ষার। এই মৃদুক্ষার ধোবার কাজে আজিও ব্যবহৃত হয়। বাজারে যে সোডা পাওয়া যায়, তাহাও মৃদুক্ষার। এমন কি, চাখড়িকেও আমরা মৃদুক্ষার বলিতে পারি; উহার দোষ এই যে, উহা জলে গলে না। এই সকল মৃদুক্ষারে কোন অম্লরস প্রয়োগ করিবা মাত্র উহা ফোঁস ফোঁস করিয়া গর্জ্জাইতে থাকে; উহাতে ফেনা উঠে ও বুদ্বুদ উঠে। উহা হইতে সবেগে একটা অনিল বাহির হয়। ব্ল্যাক সাহেব এই অনিলের আলোচনা করেন। মৃদুক্ষারের মধ্যে ইহা বদ্ধ ছিল, অম্লযোগে তাহা বাহির হইল, ইহা দেখিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন বদ্ধ অনিল। অম্বলের রোগী ডাক্তারখানা হইতে সোডা আনিয়া তাহাতে অম্লরস—'আসিড' মিশাইয়া উদরস্থ করেন; আর ফোঁস ফোঁস শব্দে যে অনিল নির্গত হয়, উহাই এই বদ্ধ অনিল, কয়লাপোড়া অনিল। সোডা ও লেমনেড জলেও এই অনিল থাকে; ছিপি খুলিবা মাত্র উহা সবেগে বাহির হয়। এই কয়লাপোড়া অনিল কাঠ পাতা তেল বাতি প্রভৃতির দহনেও উৎপন্ন হয়; কেন না, ঐ সকল পদার্থেও কয়লা আছে ও সেই কয়লাই পোড়ে। এই কয়লাপোড়া অনিলের কয়েকটা গুণ আছে, তাই দেখিয়া অনিলটা চেনা যায়।

প্রথম, উহা আগুন নিবাইতে পারে। অক্সিজনের ক্ষমতা আগুন জ্বালা; কিন্তু কয়লা অক্সিজনে সম্মিলিত হইয়া যে অনিল হয়, তাহার ক্ষমতা আগুন

নির্বান। দ্বিতীয়, উহা চুনের জলকে ঘোলাটে করে। চুনের জলে যে চুন দ্রব অবস্থায় থাকে, ঐ চুন কয়লাপোড়া অনিলে সম্মিলিত হইয়া শাদা চাখড়িতে পরিণত হয়; সেই চাখড়ি চুনের জলকে ঘোলাটে করে।

মানুষের নিশ্বাসের বায়ু নলদ্বারা চুনের জলে প্রবেশ করিলে চুনের জল ঘোলাটে হয়। নিশ্বাসে পরিত্যক্ত বায়ুতেও কয়লাপোড়া অনিল থাকে, তাই এরূপ হয়। এই অনিল মনুষ্যদেহে কিরূপে আসিল? মনুষ্যদেহের একটা প্রধান উপাদান, এক হিসাবে সর্ব্বপ্রধান উপাদান কয়লা। মনুষ্যদেহের রক্তে মাংসে, হাড়ে পর্য্যন্ত, প্রত্যেক অংশে কয়লা বিদ্যমান। আমরা যে বায়ু টানিয়া লই, তাহাতে অক্সিজন আছে। সেই অক্সিজন ফুসফুসে প্রবেশ করে, সেখানে গিয়া শোণিতস্থিত কয়লার সহিত সম্মিলিত হয় ও কয়লাকে ধীরে পোড়াইয়া কয়লাপোড়া অনিলে পরিণত করে; সেই অনিলটা আবার শ্বাস ত্যাগ করিবার সময় বাহির হইয়া আসে। শোণিত ধীরে পোড়ে; এত ধীরে পোড়ে যে, আগুন হয় না, তবে উত্তাপ হয়। মনুষ্যদেহ সর্ব্বদাই একটু উত্তপ্ত; বাহিরের জিনিসের তুলনায় একটু উত্তপ্ত। থার্ম্মোমিটার বগলে দিলে উহা জানা যায়। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, মনুষ্যদেহে বিদ্যমান কয়লা দিবারাত্রি পুড়িতেছে ও প্রশ্বাসকালে বাহির হইয়া যাইতেছে। দেহ যেন একটা গরম উনান; গরম বটে, তবে জ্বলন্ত নহে; উহাতে কয়লা অবিশ্রাম ধীরে ধীরে পুড়িতেছে। কয়লা যত পুড়িতেছে, বাহির হইতে ততই নূতন কয়লা যোগাইতে হইতেছে। নতুবা এই অবিরাম দহনে শরীরের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য আমাদিগকে খাইতে হয়। প্রত্যেক গ্রাস অন্নের সহিত, ভাত রুটি মাছ মাংস ডাল তরকারি দুগ্ধ মিষ্টান্নের সহিত আমরা কতকটা কয়লা উদরসাৎ করি; কেন না, কয়লা ঐ সকল খাদ্য দ্রব্যে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। এইরূপে প্রতিদিন দুই চারি বার ভোজন করিয়া আমরা দেহের ক্ষয় পূরণ করি। জীবদেহ নিত্য নূতন কয়লায় গঠিত হয়। ফুসফুসও ক্রমাগত অক্সিজন আনিয়া পুরান কয়লাকে পোড়াইয়া বাহির করিয়া দিতেছে, আর অন্নের সহিত আমরা নূতন কয়লা যোগাইয়া ক্ষয় পূরণ করিতেছি। মনুষ্যদেহেও যে কাজ, অন্যান্য জন্তুর দেহেও সেই কাজ।

উদ্ভিদের দেহে কিন্তু উল্‌টা ব্যবস্থা। জন্তুর দেহ পোড়াইয়া যে কয়লাপোড়া অনিল জন্মে, তাহা যায় কোথায়? তাহা বায়ুসাগরে মেশে।

বায়ুতে অক্সিজন ও নাইট্রোজন প্রচুর বিদ্যমান; অল্প পরিমাণ কয়লাপোড়া অনিলও বায়ুতে আছে। দশ হাজার ভাগ আয়তনের বায়ুমধ্যে চারি ভাগেরও কম কয়লাপোড়া অনিল আছে। উদ্ভিদের উহাই আহার। উদ্ভিদ্ এই অনিল হইতে কয়লা সংগ্রহ করে; নিজের ক্ষমতায় পারে না; সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে কয়লাপোড়া অনিলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া কয়লাটুকু পাতার গায়ে সঞ্চিত করে; পাতা হইতে উহা অন্যত্র চালিত হয়। গাছগুলি তাহাদের শত শত সবুজ রঙের চেপ্‌টা পাতা বায়ুসাগরের মধ্যে বিছাইয়া রহিয়াছে; ঐ পাতার গায়ে কয়লা জমে ও তাহাতেই উদ্ভিদের দেহ নির্ম্মিত হয়; ঐ পাতাগুলিই যেন গাছের পেট। উদ্ভিদের খাদ্য বায়ুসাগরে অনিলরূপে বিদ্যমান; উদ্ভিদ্ সেই খাদ্য অনিল হইতে টানিয়া লইয়া আত্মসাৎ করে। উদ্ভিদের দেহের প্রধান উপাদান ঐ কয়লা। আবার উদ্ভিজ্জ দ্রব্যই জন্তুর খাদ্য। ছাগলে ঘাসপাতা খায়; মানুষে ঘাসপাতা ফলমূল ছাগল পর্য্যন্ত খায়। আর বাঘে মানুষও খায়, ছাগলও খায়। যেন তেন কয়লা উদরস্থ করা চাই।

কয়লা থাকে বায়ুসাগরে; সেখান হইতে গেল উদ্ভিদে, উদ্ভিদ্‌দেহ হইতে গেল জন্তুদেহে। জন্তুদেহ দিবারাত্রি দগ্ধ হইতেছে; বায়ুর কয়লা বায়ুতে ফিরিয়া আসিতেছে।

কাঠ পাতা যখন পোড়ান যায়, তখন বায়ুর কয়লা বায়ুতে ফিরিয়া আসে। মনুষ্যদেহ যখন চিতানলে দগ্ধ হয়, তখনও বায়ুর কয়লা বায়ুতে ফিরে।

বায়ুসাগরে যে যৎকিঞ্চিৎ কয়লাপোড়া বায়ু আছে, তাহাতেই সমস্ত জীবের দেহরক্ষা চলিতেছে।

মূল পদার্থ

যে কয়টা মূল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে পাওয়া যায়, অথবা যেগুলি আমাদের অধিক পরিচিত, তাহাদের নাম জানা উচিত।

হাইড্রোজন	(অনিল)	পটাশিয়ম
অক্সিজন	(অনিল)	সোডিয়ম
নাইট্রোজন	(অনিল)	মগ্নীশম
ক্লোরিন	(অনিল)	দস্তা

ব্রোমিন (তরল)	আলুমিনম
আয়োডিন	লোহা
কয়লা	পারা (তরল)
গন্ধক	তামা
সিলিকন	টিন
বোরন	সীসা
ফস্ফরস	রূপা
আর্সেনিকম	সোনা

যেগুলিকে অনিল বা তরল বলিয়া চিহ্নিত করা গেল, তদ্ব্যতীত অন্য মূল পদার্থগুলি কঠিন অবস্থাতেই দেখা যায়।

ধাতু ও অপধাতু

উল্লিখিত মূল পদার্থগুলিকে দুইটা থাকে সাজাইয়াছি, উহার একটু তাৎপর্য্য আছে। দ্বিতীয় থাকের পদার্থগুলির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় উহারা ঝক্ ঝক্ চক্ চক্ করে। সোডিয়ম ও পটাশিয়ম ছাড়া অন্যগুলি দমে ভারী ও জলে ডুবে। উহারা হাতুড়ির ঘা সহে ও টান সহে। কেবল পারদ তরল পদার্থ, উহা ঘাও সহে না, টানও সহে না। আর উহাদের একটা দিক্ গরম করিলে অন্য দিক্‌টা খুব শীঘ্র গরম হইয়া উঠে, অর্থাৎ উহারা উত্তাপের পরিচালক। এইরূপ লক্ষণ দেখিয়া উহাদের ধাতু নাম দেওয়া হইয়াছে। কয়লা গন্ধক প্রভৃতিতে ঐ সকল লক্ষণ না থাকায় উহাদিগকে ধাতু বলা যায় না। প্রথম থাকের পদার্থগুলিকে **অপধাতু** ও দ্বিতীয় থাকের পদার্থগুলিকে **ধাতু** বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ধাতু ও অপধাতুর মধ্যে যে একটা স্পষ্ট ভেদ আছে, তাহা নহে। কতিপয় মূল পদার্থ আছে, ঐ তালিকায় তাহার নাম দেওয়া হয় নাই; তাহাদের ধাতুর লক্ষণ কিছু কিছু আছে, সমস্ত নাই।

অপধাতুর মধ্যে হাইড্রোজন, গন্ধক, অক্সিজন ও নাইট্রোজন এবং কয়লার সম্বন্ধে আলোচনা কিছু কিছু করিয়াছি। আগ্নেয় গিরির উৎপাতে ভূগর্ভ হইতে গন্ধক বাহির হয়; যে সকল দেশে আগ্নেয় গিরি বর্ত্তমান, সেই সকল দেশে গন্ধক পাওয়া যায়। গন্ধক ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া খনিমধ্যে থাকে। ফস্ফরস্ মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায় না। জীবজন্তুর হাড়ে

উহা যৌগিক অবস্থায় থাকে, হাড় পোড়াইয়া তাহার ছাই হইতে উহা নিষ্কাশিত করা হয়। ধাতুর মধ্যে সোনা মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায়। রূপা সীসা এবং পারা মুখ্যতঃ অন্য পদার্থে যুক্ত হইয়া খনিতে থাকে। অন্যান্য ধাতু ও অপধাতু পৃথিবীতে মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায় না।

প্রথম থাকের জিনিসগুলির মধ্যে অক্সিজন গন্ধক এবং ক্লোরিন, এই তিনটার বড় মিশুক স্বভাব; উহারা ধাতুপদার্থের সহিত মিলিত হইবার জন্য যেন ব্যগ্র। হাইড্রোজন অক্সিজনে মিলিত হইয়া জলে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। কয়লাও অক্সিজনে মিলিত হইয়া বায়ুর মধ্যে বিদ্যমান আছে। নদীর ও সমুদ্রের ধারে যত বালি আছে, ঐ বালির মধ্যে সিলিকন আছে; সিলিকন অক্সিজনে যুক্ত হইয়া বালুকা প্রস্তুত করিয়াছে। গন্ধক ও অক্সিজন মিলিত হইয়া গন্ধকপোড়া অনিল হয়; গন্ধক পোড়াইলে নাকে যে তীব্র গন্ধ লাগে, তাহা এই অনিলের।

ধাতুর মধ্যে সোনা আর রূপা অক্সিজনে মিলিতে পারে না। অন্যান্য ধাতু অক্সিজনে মিলিয়া ভস্ম হইযা যায়; অক্সিজনে মিলিত হওয়ার পর উহারা আবার কয়লাপোড়া বা গন্ধকপোড়া অনিলে মিলিত হইয়া নানাবিধ যৌগিক দ্রব্য প্রস্তুত করে। ঐ সকল যৌগিক দ্রব্য নানা আকরিকের মধ্যে পাওয়া যায়। ঐ সকল ধাতুভস্ম আবার বালুকাতে মিলিত হইয়া বিবিধ পাষাণের উৎপত্তি করিয়াছে। ধাতুভস্মের মধ্যে আলুমিনমের ভস্মটাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; আলুমিনম-ভস্ম বালুকাযোগে যে পাষাণের উৎপাদন করে, তাহারই পরিমাণ সব চেয়ে অধিক; এইরূপে যে আকরিক উৎপন্ন হইয়াছে, উহাই কালসহকারে চূর্ণ হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে।

রূপা তামা টিন লোহা পারা প্রভৃতি যাবতীয় ধাতুর সহিত গন্ধক সহজে মিলিত হয়। খনিতে মূল ধাতু প্রায় পাওয়া যায় না। গন্ধক বা অন্য পদার্থের সহিত মিলিত অবস্থায় পাওয়া যায়। অনেক চেষ্টায় সেই গন্ধকাদিকে অপসৃত করিয়া মূল ধাতু বাহির করিতে হয়।

ক্লোরিন নামক অনিলটা কোথাও মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায় না। যে লবণ আমরা খাই, সাগরের জলে যাহা বিদ্যমান, সেই নুনের মধ্যে ক্লোরিন বর্ত্তমান। নুনের ভিতর হইতে বাহির করিলে দেখা যায়, ক্লোরিনের বর্ণ হরিদাভ, ঘ্রাণ তীব্র। ক্লোরিন এত তেজে ধাতুপদার্থে সম্মিলিত হয়

যে, উহাতে উত্তাপ জন্মে ; এমন কি, আলোকও জন্মে। অক্সিজনে যেমন নানা দ্রব্য দগ্ধ হয়, ক্লোরিনেও সেইরূপ নানা দ্রব্য দগ্ধ হয়। সোডিয়ম নামক ধাতু ক্লোরিনে সম্মিলিত অর্থাৎ ক্লোরিনে দগ্ধ হইয়াই নুনের উৎপাদন করিয়াছে ; সেই লবণে সমুদ্রজল এমন লোণা হইয়া গিয়াছে। এক মণ সমুদ্রের জলে সের তিনেক নুন পাওয়া যায়। ব্রোমিন ও আয়োডিন এই দুই পদার্থও অনেকাংশে ক্লোরিনের সমানধর্ম্মী। উহারাও লাবণিক পদার্থের উৎপাদন করে।

আমরা পৃথিবীবাসী, ভূপৃষ্ঠে যে সকল দ্রব্য লইয়া সর্ব্বদা কারবার করি, জীবনযাত্রা চালাই, তাহার মোটামুটি একটা বিবরণ দিলাম। দেখা গেল, গোটাকতক মূল পদার্থের—গোটাকতক ধাতু আর অপধাতুর নানাভাগ মিলনে ও মিশ্রণে প্রায় যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। অক্সিজন ও নাইট্রোজেন, এই দুই অনিল মিশিয়া সমস্ত বায়ু হইয়াছে। হাইড্রোজন পুড়িয়া অর্থাৎ অক্সিজনে মিলিয়া সমস্ত জল প্রস্তুত হইয়াছে। এই জলের অধিকাংশই সমুদ্রে সঞ্চিত ; কিঞ্চিৎ বাষ্পীয় অবস্থায় বায়ুতে মিশিয়া আছে। সমুদায় জীবদেহে—জন্তুর ও উদ্ভিদের দেহে কয়লা বিদ্যমান। কয়লা নহিলে জীবজন্তুর দেহের কাঠামটাই হইত না। কয়লা নিজে কঠিন ; কিন্তু উহা অক্সিজনে পুড়িলে অনিল হয় ; ঐ অনিলের যৎকিঞ্চিৎ বায়ুতে মিশিয়া আছে। বায়ুর পক্ষে উহা যৎকিঞ্চিৎ ; কিন্তু উহা হইতেই সমুদায় জীবজন্তুর দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। চা'ল ডা'ল ঘি চিনি ইত্যাদি সমুদায় জৈব পদার্থে কয়লা বিদ্যমান। যে মাটিতে ভূপৃষ্ঠ ঢাকিয়া আছে, যে মাটিতে ফসল জন্মে, উহা পাষাণ ভাঙিয়া উৎপন্ন ; আলুমিনম ধাতুর ভস্মে অধিকাংশ পাষাণ গঠিত। আলুমিনম ভস্মে বালুকাযোগে পাষাণ গঠিত হইয়াছে। বালুকা আবার সিলিকন হইতে উৎপন্ন। কোন্ কালে সিলিকন পুড়িয়া অর্থাৎ অক্সিজনে যুক্ত হইয়া বালুকাবৎ হইয়াছিল ; তাহাই আবার আলুমিনম ভস্মে যুক্ত হইয়া নানা পাষাণ—পর্ব্বত-কলেবর গঠন করিয়াছে। পৃথিবীর পাষাণ-কলেবরে স্থানে স্থানে অন্যান্য ধাতুপদার্থ পাওয়া যায়।

পৃথিবীর পৃষ্ঠে আমরা বাস করি ; ভূপৃষ্ঠের নানা দ্রব্য লইয়া আমরা জীবন চালাই। অধিকাংশই যৌগিক দ্রব্য এবং কতিপয় ধাতু ও অপধাতুর মিলনে জাত। প্রধান প্রধান ধাতু ও অপধাতুগুলির কিঞ্চিৎ বিবরণ দিলাম। কিন্তু গোটা পৃথিবীটাই বা কিরূপ দ্রব্য ?

পৃথিবী

পৃথিবী যে গোলাকার, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীদের এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না; এমন কি, পৃথিবী কত বড়, তাহারও একটা মোটামুটি মাপ তাঁহাদের জানা ছিল। একালের মাপ তার চেয়ে সূক্ষ্ম। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গোলাকার পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দূরত্ব প্রায় ৪০০০ মাইল। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের ৪০০০ মাইল নিম্নে পৃথিবীর কেন্দ্র বর্ত্তমান; পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৫০০০ মাইল অর্থাৎ রেলওয়ে গাড়ী ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে একটানা চলিতে পারিলে ১০০০ ঘণ্টায় অর্থাৎ প্রায় ৪২ অহোরাত্র কাল অবিরাম চলিলে পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে পারিবে।

পৃথিবীর মত বৃহৎ বর্ত্তুলটার বস্তুপরিমাণ আপাততঃ বাতুলের প্রলাপ মনে হইতে পারে। তুলদাঁড়িতে বা নিক্তিতে ওজন করিয়া আমরা সকল দ্রব্যের বস্তুর পরিমাণ করি। কোন্ নিক্তিতে পৃথিবী ওজন করিব? ক্যাবেণ্ডিশের নাম পূর্ব্বে করিয়াছি,—তিনি পৃথিবী ওজনের উপায় বাহির করেন। একটা সীসার গোলার মাধ্যাকর্ষণের সহিত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের তুলনা করিয়া পৃথিবীর বস্তু সীসার গোলকের বস্তুর কত গুণ অধিক, তাহা তিনি স্থির করেন। নিউটন মাধ্যাকর্ষণের যে নিয়ম বাহির করিয়াছিলেন, তাহার জোরেই এই তুলনা সাধ্য হইয়াছিল। কোন দ্রব্যকে এক দিক্ হইতে পৃথিবী টানিতেছেন, অন্য দিক্ হইতে সীসার গোলক টানিতেছেন; উভয়ের অভিমুখে ঐ দ্রব্যের গতিবিধি দেখিয়া এই তুলনা হইয়াছিল। স্থির হইয়াছিল, সীসার গোলার কতগুণ বস্তু পৃথিবীতে আছে। এই পরিমাপ কার্য্য ক্যাবেণ্ডিশের পরেও কয়েক জনে আরও সূক্ষ্ম যন্ত্র সাহায্যে সম্পাদন করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে, পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের গুরুত্বের প্রায় ৫।০ গুণ।

পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল, ব্যাসার্দ্ধ ৪০০০ মাইল ও পরিধি প্রায় ২৫০০০ মাইল। ব্যাসার্দ্ধের বর্গ ১,৬০,০০,০০০কে পরিধির পরিমাণ ২৫০০০ দিয়া গুণ করিয়া তাহার দুই-তৃতীয়াংশ লইলে পৃথিবী কত বড়, পৃথিবীর ঘনফল কত ঘন মাইল, তাহা পাওয়া যায়। পৃথিবীর বস্তু বাহির করা ত্রৈরাশিকের আঁক। এক ঘনফুট জলের বস্তু ওজনে ত্রিশ সের মাত্র; এত

ঘন মাইল পৃথিবীর ওজন কত হইবে, পাঠশালার ছেলেতে আঁক কষিয়া বলিয়া দিবে। মনে রাখিতে হইবে, জলের তুলনায় পৃথিবী ৫॥০ গুণ গুরু।

যাহা হউক, এত বড় পৃথিবীটা মোটের উপর কোন্ জিনিসে গঠিত, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। পৃথিবীর অভ্যন্তর যে কঠিন অবস্থায় আছে, তাহাই অনেকে অনুমান করেন। আমরা মাটি খুঁড়িয়া ভূগর্ভে অতি অল্প দূরে নামিতে পারি। পৃথিবীর যাহা ব্যাস, তাহার তুলনায় সেটা কিছুই নহে। উহাতে পৃথিবীর পিঠের চামড়াটার যৎকিঞ্চিৎ খবর পাওয়া যায় মাত্র। মাটি খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিয়া বা খনির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই চামড়াটারও কয়েক ফুটের অধিক দেখা যায় না। তবে পৃথিবীর পিঠের চামড়াটা জায়গায় জায়গায় উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও বা নামিয়া গিয়া গভীর গর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে। পৃথিবীর পিঠ যেখানে উঠিয়া আছে, তাহাকে বলি মহাদেশ, আর যেখানে নামিয়া গিয়া গর্ত্ত হইয়াছে, তাহাকে বলি মহাসাগর। ঐ গর্ত্ত লোণা জলে পূর্ণ। মহাদেশের পিঠে পাহাড়-পর্ব্বতগুলি কয়েক মাইল পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে ঠেলিয়া উঠিয়াছে। আমাদের হিমালয়ের এক একটা শৃঙ্গ নিম্নস্থিত ভূপৃষ্ঠে ভারতবর্ষের জমি ছাড়িয়া পাঁচ মাইলের উপর উঠিয়াছে। চামড়াটা ঐরূপ উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, এবং স্থানে স্থানে আবার ফাটিয়া গিয়া বা ক্ষয় হইয়া উহার অভ্যন্তর প্রকাশ করিতেছে, কাজেই সেই চামড়াটার অবস্থা কতক বুঝা যায়।

এই চামড়াটা বস্তুতই পাষাণ-নির্ম্মিত। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যাহাই থাকুক, পৃথিবীর পিঠ যে চামড়ায় ঢাকা আছে, তাহা পাষাণের চামড়া। সেই পাষাণই স্থানে স্থানে পাহাড়-পর্ব্বত নামে অভিহিত। নানাবিধ ধাতু, বিশেষতঃ আলুমিনম ধাতু, কি জানি কোন্ কালে অক্সিজনে দগ্ধ হইয়া ভস্ম হইয়াছিল, এবং পরে সেই আলুমিনম-ভস্ম বালুকার সহিত মিলিত হইয়া এই পাষাণের উৎপত্তি করিয়াছে। যুগ ব্যাপিয়া, কত লক্ষ বৎসর ধরিয়া, জলে বাতাসে নীহারে, সেই পাষাণ ভগ্ন চূর্ণ শিথিল হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে এবং সেই মৃত্তিকা উচ্চ ভূমি হইতে জলস্রোতে নিম্ন ভূমিতে আনীত হইয়া সমতল দেশের গঠন করিয়া উহাকে শস্যশালী ও জীব-জন্তুর আবাস-যোগ্য করিয়াছে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ কোমল মৃত্তিকায় নির্ম্মিত, এরূপ মনে করা ভুল; উহা কঠিন পাষাণে নির্ম্মিত। বসুন্ধরার পিঠ পাষাণের পিঠ; ঐ পাষাণের পিঠের উপর স্থানে স্থানে মৃত্তিকার একটু প্রলেপ আছে মাত্র।

যেখানে মৃত্তিকা দেখিবে, তাহার নীচে পাষাণ আছে বুঝিতে হইবে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে মাটির স্বল্প নীচেই পাষাণ পাওয়া যায়; এমন কি, বহু স্থলে মাটি ছাড়িয়া পাষাণ বাহির হইয়া রহিয়াছে; উহাই পাহাড়। ঐ পাষাণও ক্রমে মাটিতে পরিণত হইতেছে; কিন্তু সেই মাটি অত উঁচুতে দাঁড়াইতে পারে না, জলস্রোতে, নদীস্রোতে নিম্নতর ক্ষেত্রে নামিয়া আসে। বাঙ্গলা দেশের মাটির নীচেও পাষাণ আছে; তাহা এত নীচে পড়িয়া আছে যে, এ পর্য্যন্ত মাটি খুঁড়িয়া পাষাণটা কেহ বাহির করিতে পারেন নাই।

মোটামুটি এখন বলিতে পারি, পৃথিবীর ভিতর কেমন জানি না, কিন্তু ভূপৃষ্ঠের বাহিরটা পাষাণময়। সেই পাষাণ পিঠের বার আনা ভাগ লোণা জলে আবৃত। সমুদ্রের এই জলটা কোন কালে হাইড্রোজন দহনে উৎপন্ন হইয়াছে। আর উহার নুনটা সোডিয়ম ধাতুর সহিত ক্লোরিনের মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে। নুনটা জলে গলিয়া গিয়া জল লোণা হইয়াছে। এইরূপে জলাবৃত ভূপৃষ্ঠের উপরে আবার অনিলের আবরণ। তাহাই বায়ুসমুদ্র। উহার চারি ভাগ নাইট্রোজন, এক ভাগ অক্সিজন, আর যৎকিঞ্চিৎ কয়লাপোড়া অনিল ও জলীয় বাষ্প।

হয়ত এককালে বায়ুসমুদ্রে অক্সিজনের ভাগ আরও ছিল। হাইড্রোজন অনিল ও নানা ধাতুপদার্থ কালে সেই অক্সিজনে যুক্ত হইয়া মহাসমুদ্র ও ভূপৃষ্ঠ প্রস্তুত করিয়াছে। সেই দহন ঘটনার পরে যে অক্সিজনটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহাই এখন বায়ুসাগরে বর্ত্তমান। যদি সমস্ত অক্সিজনটাই দহন ক্রিয়ায় ফুরাইয়া যাইত, তাহা হইলে আমাদের নিশ্বাস ফেলিবার জন্য বায়ু থাকিত না; তাহা হইলে পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি ও উপদ্রব সম্ভবপর হইত না।

রাসায়নিক সম্মিলন

মেলা আর মেশা, এই দুটি শব্দ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছি। দুইটা জিনিস যেখানে যে-কোন ভাগে মিশ্রিত হয়, সেখানে বলা যায় মেশা; আর ভাগের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকিলে বলা যায় মেলা বা রাসায়নিক সম্মিলন। এক সের হাইড্রোজন আট সের অক্সিজনে মিলিত হইয়া নয় সের জল হয়; বার সের কয়লা বত্রিশ সের অক্সিজনে মিলিত হইয়া চুয়াল্লিশ সের কয়লাপোড়া অনিল হয়। অক্সিজনের ভাগ অধিক থাকিলে, উহারও অতিরিক্ত

ভাগটা পড়িয়া থাকে, কাজে লাগে না; মিলিত হয় না। হাইড্রোজন বা কয়লার ভাগ অধিক থাকিলে উহারও অতিরিক্ত অংশ অবশেষ থাকে।

দুধে জল যত ইচ্ছা তত মিশিতে পারে, ঘিয়ে চর্ব্বি যত ইচ্ছা তত মেশান যায়। ভেজাল মেশানর জ্বালায় গৃহস্থ অস্থির। সেইরূপ অক্সিজনে হাইড্রোজন যত ইচ্ছা মেশান যাইতে পারে; কিন্তু মেলান যায় না। এক ভাগ হাইড্রোজনে দশ ভাগ অক্সিজন মেশাইয়া রাখ; যত কাল ইচ্ছা রাখিতে পার—উহারা মিলিয়া জলে পরিণত হইবে না। কিন্তু অগ্নিস্পর্শ মাত্র হাইড্রোজন জ্বলিয়া উঠিবে; হাইড্রোজনে অক্সিজন সম্মিলিত হইবে; হাইড্রোজন পুড়িয়া জল হইবে। দেখ, সমস্ত অক্সিজন খরচ হয় নাই; দশ ভাগের মধ্যে আট ভাগ মাত্র লুপ্ত হইয়াছে; দুই ভাগ অক্সিজন অবশিষ্ট আছে। ইহারই নাম মেলা। কাজেই মেলা আর মেশা পৃথক্ অর্থে প্রয়োগ করিতে হয়। মেলার ভাল কথা সম্মিলন—আমরা বলি যে, হাইড্রোজন অক্সিজনে যুক্ত হইয়া, মিলিত হইয়া, জলের উৎপত্তি হইয়াছে—উহা সম্মিলন। উহা মিশ্রণ নহে। আর দুধে জল মেশান বা ঘিয়ে চর্ব্বি মেশান,—এমন কি, জলে চিনি মেশান বা নুন মেশান, উহা মিশ্রণ মাত্র; যত ইচ্ছা তত মিশাইতে পারা যায়। তেমন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। রসায়ন-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ঐ সম্মিলন ঘটনা। কাজেই এই সম্মিলন ঘটনাকে ঘোরাল নাম দেওয়া হয় **রাসায়নিক সম্মিলন**।

যেখানে দেখিব যে, দুইটা পদার্থ মিলিয়া ভিন্নরূপ তৃতীয় পদার্থ হইয়াছে, অথচ কোন্‌টা কত ভাগ লইতে হইয়াছে, তাহার একটা ধরাবাঁধা নিয়ম আছে, সেখানেই বলিব, ঘটনাটা রাসায়নিক সম্মিলন। বিবিধ মূল পদার্থ রাসায়নিক সম্মিলনে মিলিত হইয়া বিবিধ যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে; কিন্তু সর্ব্বত্রই ভাগের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে।

তামা গন্ধকে মিলিত হয়। ভাগের বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। ৬৩ ভাগ তামা ৩২ ভাগ গন্ধকে মিলিত হয়, তাহার কম বেশী হয় না। তামা ৬৫ ভাগ হইলে ২ ভাগ পড়িয়া থাকিবে—কাজে লাগিবে না। গন্ধক ৩৩ ভাগ হইলে ১ ভাগ পড়িয়া থাকিবে—কাজে লাগিবে না। ঠিক ৬৩ ভাগ তামা ও ৩২ ভাগ গন্ধক হওয়া চাই। অধিক লওয়া অনাবশ্যক। ইহার মানে কি?

রও, আর একটু কথা আছে। তামা গন্ধকে মিলিত হইয়া দুই রকমের যৌগিক পদার্থের উৎপাদন করে। প্রথম পদার্থে ভাগের নিয়ম, ৬৩ ভাগ

তামা, ৩২ ভাগ গন্ধক; দ্বিতীয় পদার্থে ভাগের নিয়ম, ৬৩ ভাগ তামা, ১৬ ভাগ গন্ধক। প্রথমটায় গন্ধকের ভাগ ৩২; দ্বিতীয়টায় ১৬। ধারাপাতের নামতা মনে আছে? ১৬ দু-গুণে ৩২।

কয়লা হাইড্রোজনে যুক্ত হইয়া নানাবিধ অনিল প্রস্তুত হয়; নানাবিধ অর্থাৎ সংখ্যা করা কঠিন। যে গ্যাসের আলোতে শহরের রাস্তায় আলো দেওয়া হয়, সেই গ্যাসের মধ্যে এই সকল অনিল আছে। কয়লা দাহ্য পদার্থ; হাইড্রোজন দাহ্য পদার্থ; আর উভয়ের মিলনে উৎপন্ন এই অনিলগুলাও দাহ্য পদার্থ; সেই জন্যই এই গ্যাস জ্বালাইয়া শহরের পথে আলো দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়। এই সকল অনিলের ইংরেজী নাম আছে, একটার নাম মার্শ গ্যাস; উহা পচা পাঁকে জন্মে। একটার নাম ইথিলীন—উহার আলো উজ্জ্বল: একটার নাম আসিটিলীন—ইহার আলো এত উজ্জ্বল যে, আজকাল রোশনাই জন্য আসিটিলীনের ছড়াছড়ি; উহা না হইলে বিবাহের বরযাত্রা হয় না। আর নাম করিব না। এই তিনটা অনিলেই কয়লা আর হাইড্রোজন বিদ্যমান। ভাগের নিয়ম কিরূপ দেখা যাউক। মার্শ গ্যাসে হাইড্রোজন ১ ভাগ, কয়লা ৩ ভাগ; ইথিলীনে হাইড্রোজন ১ ভাগ, কয়লা ৬ ভাগ; আর আসিটিলীনে হাইড্রোজন ১ ভাগ, কয়লা ১২ ভাগ। আবার নামতা আওড়াও—তিন একে তিন; তিন দু-গুণে ছয়; তিন চারি বারো। এ কি ব্যাপার?

তামার সহিত রাসায়নিক সম্মিলনে গন্ধকের ভাগ হয় ১৬, না হয় ৩২; ১৭ নয়, ১৮ নয়, ২০ নয়, ৩১ নয়, ৩৩ নয়, ৩২ মাত্র; ঠিক ১৬র দ্বিগুণ। হাইড্রোজনের সহিত রাসায়নিক সম্মিলনে কয়লার ভাগ ৩ অথবা ৬ অথবা ১২; ৩এর দ্বিগুণ ৬; আবার ৩এর চারিগুণ ১২; ৫ নয়, ৭ নয়, ১১ নয়, ১৩ নয়, ৩ অথবা তাহারই কোন গুণফল। ইহার মানে কি?

গন্ধকের সহিত ১৬র সম্পর্ক কি? কয়লার সঙ্গে ৩এর সম্পর্ক কি?

সর্ব্বত্র এইরূপ। অক্সিজনের সহিত রাসায়নিক সম্মিলনে মিলিত না হয়, এমন মূল পদার্থ পাওয়া কঠিন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সোনা আর রূপা ছাড়া প্রায় যাবতীয় পদার্থই অক্সিজনে মিলিত হইয়া নানা সংখ্যাতীত যৌগিক পদার্থের উৎপাদন করে। কিন্তু এই সমুদায় যৌগিক পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, অক্সিজনের ভাগ ৮ অথবা ৮এর কোন গুণফল, —১৬, ২৪, ৩২, ৪০ ইত্যাদি। ৭, ৯, ১১, ১৩, ইত্যাদি ভাগ হয় না।

এমন কি, ৮এর দেড়গুণ ১২ কিংবা ৮এর আড়াইগুণ ২০, এরূপ ভাগও পাওয়া যায় না। ৮এর সঙ্গে অক্সিজনের সম্পর্ক কি? এই এক সমস্যা। এই সমস্যার পূরণ আবশ্যক। বুদ্ধিবলে ইহা পূরণ করিতে হইবে—বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।

সমস্যা কি? হাইড্রোজনের ভাগ সর্ব্বত্র ১ ধরা বিধি। তাহার তুলনায় অন্যান্য মূল পদার্থের ভাগ নিরূপণ করিতে হয়। ১ ভাগ হাইড্রোজনে কত ভাগ অক্সিজন মিলিত হয়, দেখিয়া অক্সিজনের ভাগ স্থির হয়। আবার ১ ভাগ হাইড্রোজনে কয় ভাগ কয়লা মিলিত হয়, এই দেখিয়া কয়লার ভাগ স্থির হয়; আবার ১ ভাগ হাইড্রোজনে কয় ভাগ গন্ধক মিলিত হয়, তাহা দেখিয়া গন্ধকের ভাগ স্থির হয়। অথবা ১ ভাগ হাইড্রোজনে ৮ ভাগ অক্সিজন মিলিত হয়, ইহা আগে দেখিয়া লও; পরে ৮ ভাগ অক্সিজনে কয় ভাগ কয়লা, কয় ভাগ গন্ধক, কয় ভাগ নাইট্রোজন, কয় ভাগ তামা, কয় ভাগ দস্তা, কয় ভাগ লোহা মিলিত হয়, তাহা দেখিয়া ঐ ঐ মূল পদার্থের ভাগ নিরূপিত হইতে পারে। দেখা যাইবে যে, রাসায়নিক সম্মিলন ঘটনায় সর্ব্বত্র ভাগের ঐরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে; আর দেখিবে যে, কোন দুই মূল পদার্থ মিলিয়া একাধিক যৌগিক পদার্থ যখন উৎপাদন করে, তখনই ঐরূপ নামতা আওড়াইতে হইবে। কয়লার ভাগ ৩ অথবা ৬, অথবা ১২ বা ৩এর কোন একটা গুণফল; ৩এর কোন ভগ্নাংশ নহে। গন্ধকের ভাগ ১৬ অথবা ৩২ অথবা ৪৮; ১৬র কোন ভগ্নাংশ নহে। নাইট্রোজনের ভাগ ১৪ অথবা ২৮ অথবা ৪২; ১৪র কোন ভগ্নাংশ নহে। ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহার মানে কি?

মনে কর, আমি দান করিতে বসিয়াছি; আমার বাক্সের ভিতর রৌপ্যখণ্ড বোঝাই করা আছে, এবং যে আসিতেছে, তাহাকেই কিছু না কিছু দিতেছি। কাহাকেও অল্প, কাহাকেও অধিক দিতেছি। বাক্সে যদি কেবল টাকা থাকে, আধুলি সিকি দুয়ানি বা পয়সা না থাকে, তাহা হইলে দান করিতে হইলে আমাকে অন্যূন একটা টাকা দিতে হইবে; তাহার অল্প দান অসাধ্য হইবে। দুই টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা—গোটা গোটা টাকা দিতে পারিব, কিন্তু দেড় টাকা, আড়াই টাকা, সওয়া তিন টাকা দান আমার পক্ষে অসাধ্য হইবে; কেন না, টাকার ভগ্নাংশ আমার কাছে নাই। একটা টাকাকে কাটিয়া বা ভাঙ্গিয়া রূপার টুকরা করিয়া লইতে পারি, কিন্তু তাহা টাকা

থাকিবে না, তাহা রূপার দরে বিক্রয় হইবে; বাজারে তাহা মুদ্রা বলিয়া চলিবে না। সেইরূপ বাক্সে যদি সিকি বোঝাই থাকে, দুয়ানি, আধুলি বা টাকা পয়সা না থাকে, তাহা হইলে আমাকে ন্যূন পক্ষে এক সিকি বা চারি আনা দান করিতে হইবে; এবং চারি আনার গুণফল আট আনা, বার আনা, ষোল আনা, বিশ আনা, বত্রিশ আনা দান করা চলিবে; কিন্তু পাঁচ আনা, ছয় আনা, নয় আনা, দশ আনা, বাইশ আনা বা চৌত্রিশ আনা কিছুতেই দেওয়া চলিবে না। কেন না, সিকিকে কাটিয়া দেওয়া চলিবে না; কাটিলে উহা সিকি থাকিবে না।

এখন ভিক্ষুকেরা দাতার নিকটে হাত পাতিয়া যদি দেখিতে পায় যে, তিন চারি আনা, আট আনা, বার আনা, ষোল আনা, এইরূপই দান করিতেছেন, পাঁচ আনা, ছয় আনা দিতেছেন না, ইচ্ছা থাকিলেও দিতে পারিতেছেন না, চাহিলেও দিতে পারিতেছেন না, তখন ভিক্ষুকেরা কি অনুমান করিবে? তাহারা বুঝিয়া লইবে যে, দাতার ভাণ্ডারে সিকি ভিন্ন অন্য কোন মুদ্রা নাই; সিকির ভগ্নাংশ দুয়ানি, একআনি বা পয়সা তাঁহার তহবিলে নাই—থাকিলে অনায়াসে দিতে পারিতেন। তাঁহার সমস্ত তহবিল কেবল সিকিতে গঠিত। এই সিকি অবিভাজ্য; উহার ভগ্নাংশ হয় না। কাজেই উনি সিকি অর্থাৎ চারি আনা এবং সিকির অর্থাৎ চারি আনার দুইগুণ তিনগুণ চারিগুণ ইত্যাদি দান করিতে বাধ্য হইতেছেন। তাহার দেড়গুণ, আড়াইগুণ, পৌনে তিনগুণ দিতে পারিতেছেন না। ন্যূন পক্ষে তাঁহাকে চারি আনা দিতে হইতেছে; চারি আনার কম দিবার তাঁহার ক্ষমতাই নাই।

ঐরূপ যদি দেখা যাইত যে, তিনি দুই আনা অথবা দুই আনার গুণফল চারি আনা, ছয় আনা, আট আনা, দশ আনা দান করিতেছেন, এক আনা, তিন আনা, পাঁচ আনা, সাত আনা দিতে পারিতেছেন না; তখন বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার তহবিল কতিপয় দুআনির সমষ্টি মাত্র, দুআনির ছোট কোন রৌপ্যখণ্ড তাঁহার তহবিলে নাই। বাক্সের ভিতরে কি আছে, চোখে দেখিতে পাইলে কোন সংশয় থাকিত না; কিন্তু দেখিতে না পাইলেও আমরা স্বচ্ছন্দে এরূপ অনুমান করিয়া লইতে পারিতাম; এবং বলা বাহুল্য যে, ঐরূপ অনুমান অনুচিত হইত না।

হাইড্রোজনের ভাগকে আমরা এক ভাগ ধরিয়া লইয়া দেখিতে পাই যে, অক্সিজন কোন দ্রব্যে মিলিত হইলে ৮, ১৬, ২৪, ৩২ ইত্যাদি ভাগে মিলিত হয়, নাইট্রোজন কিন্তু ১৪ অথবা ১৪র গুণফল ২৮, ৪২, ইত্যাদি ভাগে মিলিত হয়; কয়লার ভাগ হয় ৩, অথবা ৩এর গুণফল ৬, ৯, ১২ ইত্যাদি; গন্ধকের বেলায় দেখি ১৬ অথবা ৩২। এখানেও আমরা ঐরূপ অনুমান করিয়া লই। মনে করিতে হয়, উল্লিখিত দাতার তহবিল যেমন রৌপ্যখণ্ডে গঠিত, সেই রৌপ্যখণ্ডগুলির ভগ্নাংশ হয় না, সেইরূপ অক্সিজন কতিপয় অক্সিজন-খণ্ডের সমষ্টি, কয়লা কতিপয় কয়লাখণ্ডের সমষ্টি, গন্ধক কতিপয় গন্ধক-খণ্ডের সমষ্টি; সেই ক্ষুদ্র খণ্ডগুলির ভগ্নাংশ হয় না; সেই খণ্ডগুলিকে কাটিয়া ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া কোনরূপে ক্ষুদ্রতর ভগ্নাংশে পরিণত করা চলে না। সিকিকে কাটিয়া টুকরা করিলে উহা যেমন সিকি থাকে না, সেইরূপ কয়লার সেই ক্ষুদ্রতম খণ্ডকে যদিই বা কোনরূপে ভাগ করা যায়, তাহা আর কয়লা থাকিবে না। অক্সিজনের সেই ক্ষুদ্রতম খণ্ডকে কাটিয়া টুকরা করিতে পারিলেও উহা আর অক্সিজন বলিয়া গৃহীত হইবে না। এইরূপ অনুমান চলিতে পারে। এইরূপ অনুমান সঙ্গত এবং উচিত। মূল পদার্থের এই সকল সূক্ষ্মতম খণ্ডের নাম দেওয়া হইয়াছে **পরমাণু**। নব্য রাসায়নিকেরা অনুমানবলে এই পরমাণুর কল্পনা করিয়া রাসায়নিক সম্মিলন-ঘটিত উল্লিখিত সমস্যার পূরণ করিয়া থাকেন। ডাল্‌টন নামক ইংরেজ পণ্ডিত শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এই পরমাণুর কল্পনা প্রতিষ্ঠিত করেন।

বস্তুতই উপরে যে সমস্যার উল্লেখ করিয়াছি, এইরূপ অনুমানে সেই সমস্যার পূরণ হয়। মনে কর, একখানা কয়লা বহুসংখ্যক অতিক্ষুদ্র অবিভাজ্য কয়লাখণ্ডের সমষ্টি—এক একটা খণ্ড অতি ক্ষুদ্র—চক্ষুর অগোচর। এই অতি ক্ষুদ্র কয়লাখণ্ডের নাম দেওয়া হয় কয়লার পরমাণু। কয়লার পরমাণু কয়লার ক্ষুদ্রতম খণ্ড। উহাকে আর ভাগ করা চলে না; উহা অবিভাজ্য। যদিই বা ভাগ চলে, তাহা হইলে উহা আর কয়লা থাকিবে না। কাজেই কয়লা লইতে হইলে ন্যূনপক্ষে একটা পরমাণু লইতে হইবে; অথবা দুইটা, তিনটা, পাঁচটা, দশটা, লক্ষটা, কোটিটা লওয়া চলিবে;—কিন্তু একটার কম—আধখানা পরমাণু বা সিকিখানা পরমাণু লওয়া চলিবে না। লইতে হইলে গোটা পরমাণু—একটাই হউক আর

অনেকগুলি হউক, লইতে হইবে। দেড়খানা, আড়াইখানা, সাড়ে তিনখানা, পৌনে পাঁচখানা পরমাণু লওয়া চলিবে না।

এখন মনে কর, এই ক্ষুদ্রতম কয়লাখণ্ড অর্থাৎ কয়লার পরমাণুর নির্দ্দিষ্ট বস্তু আছে; তাহা ওজনে ৩। হাইড্রোজনের ক্ষুদ্রতম খণ্ড, অর্থাৎ হাইড্রোজনের পরমাণু ওজনে এক ধরা হয়; কয়লাপরমাণু ওজনে তাহার তিনগুণ, অতএব কয়লাপরমাণুর বস্তু ৩। কাজেই হাইড্রোজনে কয়লা মিলিত হইলে, ন্যূনপক্ষে হাইড্রোজনের একটা পরমাণুর সহিত কয়লার একটা পরমাণুর যোগ হইবে, হাইড্রোজন ১ ভাগ লইলে কয়লা অন্ততঃ ৩ ভাগ লইতে হইবে। কয়লার দুইটা পরমাণু যুক্ত হইলে কয়লার ভাগ ৬ ভাগ হইবে; তিনটা পরমাণু লইলে ৯ ভাগ; চারিটা লইলে ১২ ভাগ হইবে। কাজেই কয়লার ভাগ ৩, ৬, ৯, ১২, এইরূপই হইবে। ঐরূপ মনে কর, অক্সিজনের পরমাণু হাইড্রোজন পরমাণুর তুলনায় ৮। কাজেই এক ভাগ হাইড্রোজনে ন্যূন পক্ষে ৮ ভাগ অক্সিজন মিলিত হইবে। অধিক পরমাণু লইলে ১৬, ২৪, ৩২ ভাগ অক্সিজন লওয়া চলিবে। কিন্তু ৮এর কম কিছুতেই লওয়া চলিবে না; অপিচ ১৫ বা ১৭ বা ২২ বা ২৩ ভাগ কিছুতেই লওয়া চলিবে না। এইরূপ অন্যান্য মূল পদার্থ সম্বন্ধেও অনুমান চলিতে পারে।

একখানা কয়লাতে কত পরমাণু আছে? ঐ যে দাতা বাক্সে সিকি বোঝাই করিয়া দান করিতে বসিয়াছেন এবং কেবল সিকিই খয়রাত করিতেছেন, কাহাকেও এক সিকি, কাহাকেও দুই সিকি, কাহাকে পাঁচ সিকি, কাহাকেও বা পঞ্চাশ সিকি দান করিতেছেন, তাঁহার বাক্সের ভিতর কত সিকি আছে, তাহা আমি জানি না; বাক্সের ভিতরে চোখ দিতে না পারিলে, তাঁহার তহবিলে কত সিকি আছে, তাহা জানিতে পারিব না। তাহা জানিয়াও আমার দরকার নাই। তাহা না জানিলেও আমি অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, তাঁহার বাক্সে কেবল সিকিই আছে, দুআনি বা একআনি বা পয়সা নাই। সেইরূপ ঐ কয়লাখানাতে কত কয়লার পরমাণু আছে, তাহা না জানিলেও আমি অনুমান করিতে পারি যে, ঐ কয়লাখানা বহুসংখ্যক পরমাণুতে গঠিত; উহাতে সম্ভবতঃ কোটি কোটি পরমাণু আছে। যত কোটিই থাকুক, সেই চক্ষুর অগোচর ক্ষুদ্র পরমাণু এক একটা গোটা জিনিস—অবিভাজ্য। ঐ যে পরমাণুরাশি, উহাই ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া কয়লাখানিকে নির্ম্মাণ করিয়াছে।

ধান্যের স্তূপ ছোট ছোট গোটা গোটা ধান্যের সমষ্টি ; এক একটি ধান এক একটা গোটা জিনিস, ইহার ভগ্নাংশ হয় না ; ভাঙ্গিতে গেলেও ধান থাকে না—তুষ আর চাউল আর ক্ষুদ হইয়া যায় ; সেইরূপ কয়লাখানা ছোট ছোট গোটা গোটা কয়লার পরমাণুর স্তূপ। ঐ বালুকার স্তূপ লক্ষ লক্ষ বালুকাকণার সমষ্টি ; উহাতে কত বালুকাকণা আছে, কে গণিতে পারে ? কিন্তু তথাপি লক্ষ লক্ষ বালুকাকণা ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া বালুকাস্তূপে—ঢিপিতে পরিণত হইয়াছে—কয়লাও তদ্রূপ। কত পরমাণু আছে, কে জানে ? তাহা বলা অসাধ্য। তবে এক মুঠা বালু লইতে হইলে সংখ্যাতীত বালুকা-কণিকাই লইতে হইবে। সেইরূপ একখানা কয়লা লইতে হইলে অসংখ্যেয় কয়লাপরমাণুই লইতে হইবে।

এইখানে একটা খুব সূক্ষ্ম কথা উপস্থিত হয়। গণা আর মাপা, দুইটি কথা চলিত আছে। কোন কোন জিনিস আমরা গণিতে পারি ও গণিয়া থাকি, আবার কোন কোন জিনিস মাপিতে পারি ও মাপিয়া থাকি—গণিতে পারি না। গাছে কয়টা ফুল আছে, গোয়ালে কয়টা গরু আছে, আকাশে কত তারা আছে, ইহা গণনার বিষয়—উহা **সংখ্যা** দ্বারা প্রকাশ করি। কিন্তু ঘটিতে কত দুধ আছে, পুকুরে কত জল আছে, একখানা কয়লার ওজনে কত বস্তু আছে, তাহা গণিবার উপায় নাই, তাহা মাপিয়া বলিতে হয়। উহার নাম **পরিমাণ** কর্ম্ম। এখন জিজ্ঞাস্য, কোন্ জিনিস গণা যায়, আর কোন্ জিনিস মাপা যায় ? যাহার খণ্ডগুলি অবিভাজ্য, যাহার ভগ্নাংশ হয় না, তাহাই গণনার বিষয়। বলা বাহুল্য যে, গোয়ালের গরুর ভগ্নাংশ হয় না ; প্রত্যেক গরু একটা গোটা গরু ; উহার ভগ্নাংশ হিন্দুর পক্ষে অকল্পনীয়, অন্যের পক্ষেও অসাধ্য। একটা গরুকে ভাগ করা না চলিতে পারে, এমন নহে, তবে ভাগ করিলে উহা আর গরু থাকিবে না। এইরূপ একটা ফুলকে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিলে উহা আর ফুল থাকিবে না। গোয়ালে গরুর সংখ্যা, গাছে ফুলের সংখ্যা, আকাশে তারার সংখ্যা, বাক্সে সিকির সংখ্যা, একটারও কম হইতে পারে না ; আধখানা গরু, আধখানা ফুল, আধখানা তারা, আধখানা সিকি অকল্পনীয়। সেইরূপ আড়াইটি গরু, দেড়খানা ফুল, পৌনে তিনটা সিকি, সাড়ে ছয়টা তারাও অকল্পনীয়। কিন্তু জল তেল দুধ মাটি কয়লা সোনা রূপা প্রভৃতি বিভাজ্য ; যত ইচ্ছা, ততই বিভাগ করা যাইতে পারে। এক সের জল, আধ সের জল, এক ছটাক,

এক কাঁচ্চা, এমন কি, কাঁচ্চার যে কিছু ভগ্নাংশ, সবই হইতে পারে। জল তেল দুধ মাপিবার বিষয়, গণিবার নহে। আমরা পাঁচ সের জল বলি, আমরা সাড়ে পাঁচ ছটাক, কি পৌনে পাঁচ কাঁচ্চা জল বলি; কিন্তু পাঁচটা জল, দশটা জল, এরূপ বলিতে পারি না।

তবেই দাঁড়াইল এই যে, সকল জিনিসের ভগ্নাংশ হয় না। যাহা অবিভাজ্য, তাহাই গণনার বিষয় এবং সাবধানে গণিলে, সময় থাকিলে ও পরিশ্রমে কাতর না হইলে, সংখ্যা যতই অধিক হউক না কেন, তাহার গণনা অসাধ্য হয় না এবং গণনাতে ভুল হইবারও আশঙ্কা থাকে না। এমন কি, মানুষের যদি সময়ে কুলাইত ও ইন্দ্রিয় সমর্থ হইত, তাহা হইলে গোলার ধান, নদীর বালি ও আকাশের তারা, এমন কি, কয়লার পরমাণু পর্য্যন্ত সূক্ষ্মভাবে গণিয়া দিতে পারিত,—একটি একটি করিয়া গণিতে পারিত। তবে গোলার ধান আমরা গণি না, ধান মাপিয়া বিক্রয় করি ; কেন না, গণিতে অত্যন্ত মেহনত। কয়লার পরমাণুও আমরা গণি না ; উহা এত ছোট যে, চোখে দেখা যায় না ; দেখিতে পাইলেও মেহনত পোষাইত না।

পরমাণুবাদ

স্বীকার করিলাম যে, যাবতীয় মূল পদার্থ অবিভাজ্য পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। হাইড্রোজনের একটি পরমাণু ওজনে এক হইলে দশ পরমাণু ওজনে ১০, দেড় শত পরমাণু ওজনে ১৫০ হইবে। কয়লার প্রত্যেক পরমাণু ওজনে ৩ হইলে, দুই পরমাণু ওজনে ৬, তিন পরমাণু ওজনে ৯, চারি পরমাণু ওজনে ১২ হইবে। ঘটেও তাহাই। কয়লার ভাগ ৩, ৬, ৯, ১২ ইত্যাদি হয়, কিন্তু ৭, ৮, ১১ হয় না। কয়লা যখন হাইড্রোজনে মিলিত হয়, তখন কয়লার গোটাকতক পরমাণু, এক বা একাধিক পরমাণু হাইড্রোজনের গোটাকতক পরমাণুর সহিত মিলিত হয়।

এই পরমাণুগুলি তবে কত বড়? উহারা অবিভাজ্য হওয়া চাই। কিন্তু কয়লা ত বিভাজ্য। একখানা কয়লাকে ভাঙ্গিয়া দুখানা, দশখানা, হাজারখানা অক্লেশে করা যায় ; এমন কি, উহাকে গুঁড়া করিলে অতি ক্ষুদ্র কণিকায় পরিণত হইতে পারে ; সেই এক কণিকাকেও আরও ছোট গুঁড়ায় পরিণত করা চলিতে পারে ; এত ছোট হইতে পারে যে, চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য হইয়া যায়, অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়ে না।

ডাল্‌টন বলিলেন, হউক না কেন চক্ষুর অগোচর ; সেই চক্ষুর অগোচর কণিকাতেও কোটি কোটি পরমাণু আছে ; তাহারা চক্ষুর অগোচর হইলেও কল্পনাগোচর ত হইতে পারিবে। চক্ষুর অগোচর, কিন্তু কল্পনার গোচর সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকাটুকুই কয়লার পরমাণু। মনে কর না কেন, তাহারই ওজন ৫, হাইড্রোজনের পরমাণুর তুলনায় ৩।

প্রত্যেক মূল পদার্থ কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি ; যত মূল পদার্থ, তত রকমের পরমাণু। হাইড্রোজনের পরমাণু, অক্সিজনের পরমাণু, কয়লার পরমাণু, গন্ধকের পরমাণু, সোনা রূপা লোহা পারা প্রভৃতি সকলেরই পরমাণু আছে। এই পরমাণুই প্রত্যেক মূল পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ।

হাইড্রোজনের পরমাণুর সহিত অক্সিজনের পরমাণুর পার্থক্য আছে ; রূপার পরমাণুর সহিত সোনার পরমাণুব পার্থক্য আছে। কিসের পার্থক্য ? বৃহত্ত্বে, না আকারে ? তাহা বলিতে পারি না। আয়তনগত বা আকারগত পার্থক্য থাকিতে পারে বা না পারে। ডাল্‌টন কেবল বলিতে চাহেন যে, উহাদের একটা পার্থক্য আছে, উহা বস্তুগত। হাইড্রোজনের পরমাণুর বস্তু যত, অক্সিজনের পরমাণুর বস্তু তাহার আটগুণ ; কয়লার বস্তু তাহার তিনগুণ ইত্যাদি। আর বস্তুগত পার্থক্য থাকিলেই ওজনে পার্থক্য থাকিবে।

এইরূপ অনুমান কেন ? না, ঐরূপ অনুমান করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, কেন একভাগ হাইড্রোজনের সঙ্গে ৮ ভাগ, ১৬ ভাগ অক্সিজন যুক্ত হয় ; ৩, ৬, ১২ ভাগ কয়লা মিলিত হয় ; আর কয়লা যখন অক্সিজনে মিলে, তখন ৩ ভাগ কয়লার ৮ ভাগ বা ১৬ ভাগ অক্সিজনই মিলিত হয়।

অর্থাৎ যে সমস্যা পূরণের দরকার, সেই সমস্যার পূরণে ইহার অধিক অনুমান করিতে হয় না।

ঐ সমস্যাটা প্রাকৃতিক নিয়ম ; প্রকৃতির খেয়াল। ঐ খেয়ালের তাৎপর্য্য ঐরূপ অনুমানে বুঝা যায়। অক্সিজনের ভাগ ৮ বা ১৬ হয় কেন ; ১৩, ১৪ হয় না কেন ? ইহা প্রকৃতির খেয়াল বৈ কি ? ১৩ বা ১৪ হইলে আমাদিগকে তাহাই মানিয়া লইতে হইত।

দানকর্ম্ম দাতার খেয়াল ; তিনি চারি আনা, আট আনা, বার আনা, ইচ্ছামত দান করিতে পারেন। কিন্তু যদি দেখিতে পাই যে, তিনি চারি আনা, আট আনা, বার আনাই দিতেছেন; কিন্তু পাঁচ আনা, দশ আনা দিতে

পারিতেছেন না, তখন মনে করিতে হয়, তাঁহার তহবিলে কেবল সিকি আছে, একআনি দুয়ানি নাই। সেইরূপ অক্সিজনের ভাগ ৮ হয়, ১৬ হয়, ১৩ বা ১৪ হয় না; এই খেয়াল দেখিয়া মনে করি যে, অক্সিজনের তহবিলে প্রত্যেক অক্সিজনখণ্ডের ওজন ৮; উহার ছোট খণ্ড লইবার উপায় নাই।

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও কল্পনা

এইখানে একবার দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, ডাল্‌টন যে এই আন্দাজ করিয়া বসিলেন, ইহাতে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িল কি না? বলা বাহুল্য, এই পরমাণুতত্ত্বটা নিছক অনুমানের—আন্দাজের ব্যাপার। ডাল্‌টন বা তাঁহার পরবর্ত্তী কোন পণ্ডিত এই পরমাণু প্রত্যক্ষগোচর করেন নাই; করিবার আশাও রাখেন না। পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা এই পরমাণুর আকার অবয়ব সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, এই পরমাণু কখনও মানুষের প্রত্যক্ষসীমায় আসিবে কি না সন্দেহ। যে আলোর ঢেউ চোখে পড়িলে আমাদের দৃষ্টিশক্তি জন্মে, এই পরমাণু সম্ভবতঃ সেই এক একটি আলোর ঢেউয়ের চেয়েও ছোট; পরমাণু কাজেই দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর, অন্য ইন্দ্রিয়ের ত কথাই নাই।

তবে এই নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক অনুমানে জ্ঞানের পরিসর বাড়িল কি?

এই লইয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে একটা বিতণ্ডা প্রচলিত আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, জ্ঞান মাত্রই প্রত্যক্ষমূলক; অন্য জ্ঞান, জ্ঞানই নহে।

উহা এক হিসাবে সত্য; আমরা ধূম দেখিলে অগ্নির অস্তিত্ব আর গোবর দেখিলে গরুর অস্তিত্ব অনুমান করি; নয় কি? কেন না, পূর্ব্ব-প্রত্যক্ষ হইতে আমরা জানি যে, অগ্নি হইতেই ধূম, আর গরু হইতেই গোবর পাওয়া যায়। কাজেই অনুমানের ভিত্তি পূর্ব্বকালের প্রত্যক্ষ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহাও সত্য যে, আমরা প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান লইয়া যেমন জীবনযাত্রা চালাই, সেইরূপ প্রত্যক্ষ ভিত্তির উপর স্থাপিত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াও জীবনের অনেক কাজ করিতে বাধ্য হই। অনুমানের উপর নির্ভর করিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলে জীবনযাত্রা অচল হইয়া যাইত। কাজেই অনুমানকে বর্জ্জন করিবার উপায় নাই।

অনুমানের উপর নির্ভর করিলে মাঝে মাঝে যে ঠকিতে হয় না, এমন নহে। অগ্নি হইতে ধূম উঠে, ইহা প্রত্যক্ষলব্ধ সত্য ; কিন্তু অগ্নি ভিন্ন অন্য কিছু হইতে ধূম হইতে পারে না, ইহা বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। যেটা প্রাকৃতিক ব্যবস্থা, তাহা আমরা প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া মানিতে বাধ্য ; কিন্তু প্রকৃতির ব্যবস্থা অন্যরূপ হইতে পারে না, ইহা বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। অশ্বীকে এ পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করিতে দেখা যায় নাই ; কিন্তু অশ্বডিম্বেরও সম্পূর্ণ অসম্ভাব্যতা নাই। যাহা অনুমান করিতেছি, তাহা ঠিক হইতেও পারে, না হইতেও পারে ; উহার উপর ষোল আনা নির্ভর করা চলে না। প্রত্যক্ষের উপর আমরা যতটা ভর দিতে পারি, অনুমানের উপর কখনই ততটা ভর দিতে পারি না।

ডাল্‌টনের পরমাণু অনুমান মাত্র ; অনুমান না বলিয়া বরং কল্পনা বলিলে চলে। পরমাণু এপর্য্যন্ত কাহারও ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই, হইবার আশাও নাই। কাজেই পরমাণুকে পণ্ডিতদের কল্পনা মাত্র বলিতে পারি। রাসায়নিক সম্মিলন সম্বন্ধে প্রকৃতির বিচিত্র ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া ডাল্‌টন এইরূপ পরমাণুর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন। যদি কোন পণ্ডিত অন্য কল্পনার দ্বারা সেই ব্যবস্থার সঙ্গতি আরও উৎকৃষ্টরূপে বুঝাইতে পারেন, তখন আমরা পরমাণুবাদ ত্যাগ করিয়া সেই নূতন তত্ত্ব গ্রহণ করিব, ইহাতে সন্দেহ নাই। কেন না, এইরূপেই মনুষ্যের জীবনযাত্রাটাই চলিতেছে। অনেক সময় আমাদের অনুমান ষোল আনা সন্তোষ উৎপাদন করায় না। তদপেক্ষা সঙ্গত অনুমান যত দিন না আসে, তত দিন উহাই লইয়া কাজ চালাইতে হয়। পরে হয়ত প্রমাণ পাইলে পূর্ব্বের অনুমানটা ত্যাগ করিয়া পরের অনুমানটার আশ্রয় করিতে হয়। নতুবা জীবনযাত্রা চলিত না।

ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতি সাক্ষীর নিকট প্রমাণ গ্রহণ করিয়া অপরাধীকে দণ্ড দিয়া থাকেন। সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেখানে অনুমানেরই উপর নির্ভর করিয়া কাজ চালাইতে হয়। ফলে বহু স্থলে নির্দ্দোষেও দণ্ড পায়। ভুল হয় না এমন নহে, কিন্তু অনুমানের আশ্রয় একবারে লইব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলে জজের জজিয়তি চলিবে না, সমাজে লোকস্থিতি চলিবে না।

আবার বলিতেছি, বিজ্ঞানের পন্থা জীবনযাত্রার পন্থা হইতে ভিন্ন নহে। আমরা দিন দিন কাজকর্ম্মে যে পথ অবলম্বন করিয়া চলি, বৈজ্ঞানিকও

ঠিক সেই পথ অবলম্বন করিয়া চলেন। আমরা অসাবধান, বৈজ্ঞানিকেরা সাবধান ; আমরা সূক্ষ্ম দর্শনের ও সূক্ষ্ম পরিমাণের কষ্ট স্বীকারে কুণ্ঠিত, বৈজ্ঞানিকেরা তাহাতে কাতর নহেন। এই মাত্র প্রভেদ।

কাজেই ডাল্‌টনের পরমাণুবাদ আমরা আপাততঃ মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি ; কিন্তু চিরকালই যে উহা ধরিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব, উহা নহে। কালে যদি অন্য প্রকৃষ্টতর অনুমানের বা কল্পনার সাহায্যে প্রাকৃতিক নিয়মের সমস্যাগুলির উৎকৃষ্টতর মীমাংসা পাওয়া যায়, তখন দ্বিধা না করিয়া ডাল্‌টনের পরমাণুবাদকে বর্জ্জন করিয়া সেই নূতন অনুমানের বা কল্পনার আশ্রয় লইব।

প্রকৃতির ব্যবস্থা বদলাইবে না, কিন্তু তাহার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকের অনুমান বা কল্পনা বদলাইতে পারে। তাহাতে বিস্মিত বা দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইহা পুনঃ পুনঃ ঘটিয়াছে।

মনুষ্যের জ্ঞানের অর্থাৎ যে জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ জীবনযাত্রা চালায়, জড় জগতের সহিত আদানপ্রদান ও কারবার চালায়, সেই জ্ঞানের কিয়দংশ প্রত্যক্ষলব্ধ, কিয়দংশ অনুমানলব্ধ এবং কল্পনালব্ধ ; সেই অনুমান ও কল্পনা আবার পূর্ব্বগত প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই উভয় অংশের মূল্য সমান নহে। প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান স্পষ্ট জ্ঞান ; ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধি যদি প্রতারিত না করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান আর নাই। আর অনুমানলব্ধ জ্ঞান তেমন সুপ্রতিষ্ঠ নহে ; উহা অস্পষ্ট এবং পরিবর্ত্তনসহ। কাজেই উভয়ের মূল্য সমান নহে। কিন্তু তাই বলিয়া অনুমানকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। কেন না, উহাই জ্ঞানের পরিধি প্রসারের বোধ করি সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। উহা আঁধারে আলো জ্বালিয়া দেয় ; উহা জ্ঞানমার্গের পথিককে পথ দেখায় : কোন্ পথে চলিলে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে, তাহা দেখাইয়া দেয় ; কাজেই অনুমানকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না।

প্রাচীন ও আধুনিক পরমাণুবাদ

দুই সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে বৈশেষিক দর্শন বর্ত্তমান ছিল। কণাদ ঋষি ঐ দর্শনের স্থাপনকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৈশেষিক দর্শনের মত যে, যাবতীয় জড় পদার্থ পরমাণুর যোগে উৎপন্ন। এই পরমাণু

অনাদি ও অবিভাজ্য, অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। এই পরমাণুগুলি যেন ইষ্টক ; এই ইষ্টকগুলি গাঁথিয়া বিশ্বজগতের অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে।

গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যেও এইরূপ একটা মত প্রচলিত ছিল। পরমাণুর সমবায়ে জগতের উৎপত্তি হয়, তাঁহারাও এই অনুমান করিয়াছিলেন।

ডাল্‌টনের পরমাণুবাদের সহিত এই সকল প্রাচীন পরমাণুবাদের প্রভেদ আছে। ডাল্‌টন একটা বিশিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম বুঝাইবার জন্য পরমাণুর কল্পনা করিয়াছিলেন। দুইটা দ্রব্য যখন সম্মিলিত হইয়া তৃতীয় দ্রব্য উৎপন্ন করে, তখন সেই দুই দ্রব্যের ভাগের একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে। প্রথমটার যে-কোন ভাগ দ্বিতীয়টার যে-কোন ভাগে মিলিত হয় না। হাইড্রোজনের ভাগ ১ ধরিলে, অক্সিজনের ভাগ ৮ ও কয়লার ভাগ ৩ হয়, অথবা তাহার কোন গুণফল হয়। ঐ ঐ মূল পদার্থ যে-কোন যৌগিক পদার্থেই বিদ্যমান থাক, উহাদের ভাগ ঐরূপই থাকে। এই প্রাকৃতিক নিয়মটি দেখিয়াই নব্য রসায়নের পরমাণুর কল্পনা। যত রকমের মূল পদার্থ, তত রকমের পরমাণু। অক্সিজনের পরমাণু ওজনে হাইড্রোজন পরমাণুর আটগুণ ; কয়লার পরমাণু ওজনে হাইড্রোজন পরমাণুর তিনগুণ। নব্য রসায়ন একটা বিশিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া পরমাণু কল্পনা করিয়াছেন ও নানা উপায়ে কোন্ জিনিসের পরমাণুর কি ওজন, তাহা নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পরমাণু প্রত্যক্ষগোচর নহে, উহা নিক্তিতে ওজন করিবার উপায় নাই। কোন্ পরমাণুর কত ওজন, তাহা বলিতেও রাসায়নিক পণ্ডিতেরা সাহস করেন না ; তবে এই জিনিসের পরমাণু ঐ জিনিসের পরমাণু অপেক্ষা এতগুণ ভারী, ইহা বলিয়া তাঁহারা নিরস্ত হন।

প্রাচীন দার্শনিকেরা পরমাণুর কল্পনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উক্ত প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব তাঁহারা জানিতেন না। ঐ নিয়ম নব্য রাসায়নিক পণ্ডিতদের আবিষ্কৃত। প্রাচীনেরা তখন নিক্তি লইয়া তৌল করিয়া দেখেন নাই যে, রাসায়নিক সম্মিলনে এইরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। কাজেই নব্য রসায়ন জড়ের যে ধর্ম্ম বুঝাইতে পরমাণু কল্পনা করিয়াছেন, প্রাচীন পণ্ডিতেরা সে ধর্ম্ম বুঝাইতে সে কল্পনা করেন নাই।

প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের উপর যে অনুমান প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গত ব্যাখ্যার জন্য যে অনুমানের উৎপত্তি, তাহারই ভিত্তি দৃঢ় ও সেই

অনুমানই সার্থক। নতুবা যাহা বিশুদ্ধ কল্পনামাত্র, প্রত্যক্ষে যাহার ভিত্তি স্থাপিত নহে, পদার্থ বিদ্যায় সে অনুমানের কোন সার্থকতাই নাই।

প্রাচীন দার্শনিকদের অনুমান যে অমূলক কল্পনা, উহা কেবল তাঁহাদের গায়ের জোর, ইহা বলা উচিত নহে। জড়ের কোন না কোন ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্যই তাঁহারা ঐ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে সেই ধর্ম্ম বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য অন্য প্রকৃষ্টতর অনুমান ছিল না। কাজেই তাঁহাদের পরমাণুবাদ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, এরূপ বলা চলে না। তবে প্রাচীন পরমাণুবাদের অপেক্ষা আধুনিক পরমাণুবাদের ভিত্তি দৃঢ়তর, এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

একালের অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত প্রাচীন দার্শনিকদিগকে গালি দিয়া আনন্দ ভোগ করেন। প্রাচীনেরা প্রত্যেক্ষের সাহায্য লইতেন না, অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা প্রকৃতির ব্যবস্থা কিরূপ, তাহা নির্ণয় করিতে চাহিতেন না; তাঁহাদের ভিত্তিহীন কল্পনাগুলিকে দৈববাণীর মত প্রচার করিতেন এবং শিষ্যবর্গকে অসঙ্কোচে মানিয়া লইতে বলিতেন; ইত্যাদি কতই অপবাদ শোনা যায়। ফলে, এইরূপ নিন্দাবাদ অবৈজ্ঞানিক। অবেক্ষণ ও পরীক্ষণই সত্য নির্ণয়ের একমাত্র উপায়, তাহা মানবজাতির উৎপত্তি অবধি মানবজাতি মানিয়া চলিতেছে। তদ্দ্বারাই সত্য নির্ণয় করিয়া পরে প্রত্যক্ষমূলক অনুমানের দ্বারা ও কল্পনার দ্বারা জ্ঞানের পরিধি বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। সেকালেও যে পদ্ধতি ছিল, একালেও সেই পদ্ধতি। প্রভেদ কেবল মাত্রাগত। সেকালের চেয়ে একালের লোকে অধিক সাবধান হইয়াছে, সূক্ষ্ম পরিমাণ কর্ম্মে সমর্থ হইয়াছে; আর পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার আনুকুল্য পাইয়া জ্ঞানের উচ্চতর সোপান আশ্রয়ে সুবিধা পাইয়াছে, এই পর্য্যন্ত প্রভেদ।

পরমাণু ও অণু

রাসায়নিকের মতে পরমাণু মূলপদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ; কেন না, উহা অবিভাজ্য। প্রত্যেক পরমাণুর নির্দ্দিষ্ট বস্তু আছে; সেই বস্তু কত জানি না; তবে এই পরমাণুর বস্তু ঐ পরমাণুর বস্তুর কতগুণ, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি। হাইড্রোজনের পরমাণুর বস্তু ১ ধরিলে, কয়লার পরমাণু ৩ ও অক্সিজনের পরমাণু ৮ হয়।

সম্মিলন কালে এক মূল পদার্থের এক বা একাধিক পরমাণু অন্য মূল পদার্থের এক বা একাধিক পরমাণুর সহিত যুক্ত হইয়া যৌগিক পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ প্রযুক্ত করে। যৌগিক পদার্থের এই সূক্ষ্মতম অংশের নাম দেওয়া হয় **অণু**। মূল পদার্থের ক্ষুদ্রতম খণ্ডের নাম হইল পরমাণু, আর যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম খণ্ডের নাম হইল অণু। পরমাণু যেমন অতীন্দ্রিয় ও কল্পনাগোচর, অণুও তেমনি অতীন্দ্রিয় ও কল্পনাগোচর। জলের একটি অণুতে কতিপয় হাইড্রোজনের পরমাণু ও কতিপয় অক্সিজনের পরমাণু আছে। এক ফোঁটা জলে কোটি কোটি জলের অণু আছে; আর জলের প্রত্যেক অণুতে কতকগুলি হাইড্রোজনের পরমাণু ও কতকগুলি অক্সিজনের পরমাণু রহিয়াছে। জলের অণু ভাঙ্গিলে উহা আর জল থাকে না; অক্সিজনের আর হাইড্রোজনের পরমাণু পৃথক্ হইয়া পড়ে। রাসায়নিক সম্মিলনের সময় হাইড্রোজনের পরমাণুতে অক্সিজনের পরমাণুতে মিলন ঘটিয়া জলের অণু নির্ম্মিত হয়, আর বিশ্লেষণকালে জলের অণুগুলি ভাঙ্গিয়া হাইড্রোজনের পরমাণু এবং অক্সিজনের পরমাণু পৃথক্ হইয়া পড়ে।

কাজেই দাঁড়াইল যে, যৌগিক পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ অণু, আর মূল পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ পরমাণু।

একটা জলের অণুতে হাইড্রোজনের এবং অক্সিজনের কয়টা পরমাণু আছে, তাহা নিরূপণের কোন উপায় আছে কি না? এইখানে একটু সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন।

জল বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, উহাতে কেবল দুইটা মূল পদার্থ বিদ্যমান, হাইড্রোজন আর আর অক্সিজন। কোন তৃতীয় পদার্থ নাই। আর দেখা যায় যে, এক ভাগ হাইড্রোজনের সহিত আট ভাগ অক্সিজনের যোগে নয় ভাগ জল হয়। এক ছটাকে আট ছটাক, এক সেরে আট সের, এক মণে আট মণ—হাইড্রোজনের ও অক্সিজনের মিলনকালে ভাগের অনুপাত এইরূপ। এই প্রাকৃতিক নিয়মটি বুঝাইবার জন্য অণুর ও পরমাণুর কল্পনা; কল্পনার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। কল্পনা করিতে হয় যে, হাইড্রোজনের ও অক্সিজনের সূক্ষ্মতম অংশগুলিতে, অর্থাৎ পরমাণুগুলিতে, ওজনের এই তারতম্য বর্ত্তমান।

এখন আমরা মনে করিতে পারি, হাইড্রোজনের পরমাণু ওজন ১, আর অক্সিজনের পরমাণুর ওজন ৮; অপিচ হাইড্রোজনের একটি পরমাণু

অক্সিজনের একটি পরমাণুতে যুক্ত হইয়া জলের একটি অণু গঠিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আমরা মনে করিতে পারি যে, হাইড্রোজনের দশটি পরমাণু অক্সিজনের দশটি পরমাণুতে যুক্ত হইয়া জলের একটি অণু গঠিত হইয়াছে। উভয় অনুমানেরই এক ফল। কেন না, দশটি হাইড্রোজন পরমাণুর ওজন ১০, ও ১০টি অক্সিজন পরমাণুর ওজন ৮০, অতএব একটি জলের অণুর ওজন ৯০ ; তাহা হইলেও নয় ভাগ জলের মধ্যে এক ভাগ হাইড্রোজন ও আট ভাগ অক্সিজন পাওয়া যাইবে।

আবার ভিন্নরূপ অনুমান চলিতে পারে। ধরিয়া লও, হাইড্রোজনের পরমাণুর ওজন ১, কিন্তু অক্সিজনের পরমাণুর ওজন ১৬ ; আর জলের প্রত্যেক অণুতে হাইড্রোজনের দুইটি পরমাণু ও অক্সিজনের একটি মাত্র পরমাণু বিদ্যমান। দুইটি হাইড্রোজন পরমাণুর ওজন ২, আর একটি অক্সিজন পরমাণুর ওজন ১৬ ; অতএব জলের প্রত্যেক অণু ওজনে ১৮। অতএব ১৮ ভাগ জলের মধ্যে ২ ভাগ হাইড্রোজন এবং ১৬ ভাগ অক্সিজন থাকিল, অর্থাৎ ৯ ভাগ জলের মধ্যে ১ ভাগ হাইড্রোজন ও ৮ ভাগ অক্সিজন থাকিল। অতএব এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে।

এখন নূতন সমস্যা দাঁড়াইল। অক্সিজন পরমাণুর ওজন ৮ ধরিলেও চলে, ১৬ ধরিলেও চলে। কোন্‌টা ধরিব ?

ঐরূপে কয়লার পরমাণুর ওজন ৩ ধরিলেও চলে, ৬ ধরিলেও চলে। কোন্‌টা ধরিব ?

ডাল্‌টনের পরমাণুবাদ ইহার মীমাংসা করিতে অক্ষম। বস্তুতঃ ডাল্‌টন উহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই।

ডাল্‌টনের পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা ডাল্‌টনের কল্পনায় আরও কতিপয় নূতন কল্পনার যোগ দিয়াছেন। তবে ইহার মীমাংসা সাধ্য হইয়াছে।

যৌগিক পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশকে আমরা অণু বলিয়াছি ; আর মূল পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশকে পরমাণু বলিয়াছি। এখন মনে করিতে হইবে যে, মূল পদার্থের অণু আছে। মনে করিতে হইবে যে, মূল পদার্থের পরমাণুও আছে, অণুও আছে ; কিন্তু যৌগিক পদার্থের পরমাণু নাই, অণু আছে। সে কিরূপ ? হাইড্রোজন ও অক্সিজন মূল পদার্থ ; উভয়ের মিলনে উৎপন্ন জল যৌগিক পদার্থ। মনে করিতে হইবে, হাইড্রোজনের কতিপয় পরমাণু পরস্পর যুক্ত হইয়া হাইড্রোজনের অণু হয় ; আর অক্সিজনের

কতিপয় পরমাণু পরস্পর যুক্ত হইয়া অক্সিজনের অণু হয়, অপিচ হাইড্রোজনের পরমাণু অক্সিজনের পরমাণুতে যুক্ত হইয়া জলের অণু হয়। জল যৌগিক পদার্থ, উহার প্রত্যেক অণুতে অক্সিজন হাইড্রোজন উভয় বর্ত্তমান, অতএব জলের পরমাণু হইতে পারে না। পরমাণু কেবল মূল পদার্থেরই সম্ভব; আর অণু মূল ও যৌগিক উভয় পদার্থের সম্ভব। এখন প্রশ্ন হইল যে, হাইড্রোজনের একটা অণুতে হাইড্রোজনের কয়টা পরমাণু আছে? অক্সিজনের একটা অণুতে অক্সিজনের কয়টা পরমাণু আছে? এবং জলের একটা অণুতে হাইড্রোজনের পরমাণু কয়টা ও অক্সিজনের পরমাণুই বা কয়টা আছে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ডাল্টনের কল্পনায় কুলায় না; নূতন কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। আবোগাড্রো নামক ইটালির পণ্ডিত ডাল্টনের কয়েক বৎসর পরে এই নূতন কল্পনার আশ্রয় লইয়াছিলেন।

আবোগাড্রো কল্পনা করিলেন যে, জড় পদার্থ মাত্রই যখন অনিলাবস্থায় থাকে, তখন এক ঘন ইঞ্চি পরিমিত স্থানে সকল পদার্থেরই—মূল বা যৌগিক দ্বিবিধ পদার্থেরই অণুর সংখ্যা সমান থাকে। মনে রাখিও যে, অনিলাবস্থায় থাকা চাই, কঠিন বা তরল অবস্থা হইলে হইবে না; অনিল অবস্থা হওয়া চাই।

কথাটা ভাল কবিয়া বুঝিতে হইবে। হাইড্রোজন মূল পদার্থ; উহা স্বভাবতঃ অনিল অবস্থায় থাকে। কিন্তু জল যৌগিক পদার্থ; উহা স্বভাবতঃ তরল অবস্থায় থাকে। জল গরম করিলে উহা বাষ্প হয়; তখন উহা অনিলাবস্থ হয়। জল তরল, কিন্তু জলীয় বাষ্প অনিল। আবোগাড্রো কল্পনা করিলেন যে, এক ঘন ইঞ্চি হাইড্রোজনে যতগুলি হাইড্রোজনের অণু আছে, এক ঘন ইঞ্চি জলের বাষ্পে জলের অণুও ততগুলি আছে।

আর একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিতে হইবে। অনিল মাত্রই গরমে প্রসার লাভ করে, আবার চাপে সঙ্কুচিত হয়। হাইড্রোজনই বল, আর জলীয় বাষ্পই বল, এক ঘন ইঞ্চি অনিলকে গরম করিয়া তুই ঘন ইঞ্চি করা চলে, আবার চাপ দিয়া আধ ঘন ইঞ্চি জায়গায় ঠেসিয়া ধরা চলে। আবোগাড্রো বলিলেন যে, এক ঘন ইঞ্চি হাইড্রোজনে যত অণু আছে, এক ঘন ইঞ্চি জলীয় বাষ্পেও তত অণু আছে, কিন্তু কখন? যখন উভয়ে সমান গরম ও উভয়ের সমান চাপ।

তাহা যেন হইল। তাহা হইলে আবোগাড্রোর মতে এক ঘন ইঞ্চি হাইড্রোজনে অণুর সংখ্যা এক ঘন ইঞ্চি জলীয় বাষ্পের অণুর সংখ্যার সমান।

কিরূপে তিনি জানিলেন যে, উভয়ত্র অণুর সংখ্যা সমান? অণু কতগুলি আছে, তাহা কি তিনি গণিয়া দেখিয়াছিলেন? অণু অতি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় দ্রব্য; তাহা গণা অসম্ভব। তিনি গণিবেন কিরূপে? তিনিও গণেন নাই, তাঁহার পরেও কেহ গণিতে পারে নাই। তবে উভয়ত্র অণুর সংখ্যা সমান, তাহা তিনি কিরূপে জানিলেন? উত্তরে বলিব যে, তিনি কল্পনাবলে জানিলেন। উভয় স্থলে অণুর সংখ্যা সমান, ইহা তাঁহার কল্পনা—খাঁটি কল্পনা। এই কল্পনায় তাঁহার অধিকার ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈজ্ঞানিকেরা এই কল্পনায় অধিকারী। এইরূপ কল্পনা মাঝে মাঝে না করিলে বিজ্ঞানের আঁধার পথে আলো পাওয়া যায় না।

আচ্ছা, মানিয়া লইলাম যে, এক ঘন ইঞ্চি হাইড্রোজনে যত অণু, এক ঘন ইঞ্চি জলীয় বাষ্পে ঠিক ততগুলি অণু। শত কোটি, কি সহস্র কোটি, কি কোটি কোটি, তাহা জানিবার উপায় নাই; তবে উভয়ত্র অণুর সংখ্যা ঠিক সমান।

মাপিয়া দেখা গিয়াছে, এক ঘন ইঞ্চি হাইড্রোজন আধ ঘন ইঞ্চি অক্সিজনে যুক্ত হইয়া ঠিক এক ঘন ইঞ্চি জলীয় বাষ্প হয়। মাপের কথা, ওজনের কথা নহে। এখন উল্লিখিত কল্পনা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কতিপয় জলের অণু প্রস্তুত করিতে ঠিক ততগুলি হাইড্রোজনের অণু আবশ্যক হইবে, আর অক্সিজনের অণু তাহার ঠিক অর্দ্ধেকগুলি আবশ্যক হইবে।

অর্থাৎ দুইটা জলের অণু প্রস্তুত করিতে হইলে দুইটা হাইড্রোজনের অণুর আর একটি মাত্র অক্সিজন অণুর প্রয়োজন হইবে।

দুইটা হাইড্রোজনের অণুতে দুইটা জলের অণু হয়; একটা জলের অণু প্রস্তুত করিতে একটা হাইড্রোজন অণু আবশ্যক হইবে।

অতএব প্রত্যেক হাইড্রোজনে যতটি হাইড্রোজন পরমাণু ছিল, সবগুলিই জলের অণুতে প্রবেশ করিবে।

দাঁড়াইল এই,—উক্ত অনুমান সত্য হইলে এক জলের অণুতে যতগুলি হাইড্রোজন পরমাণু আছে, এক হাইড্রোজন অণুতেও ততগুলি হাইড্রোজন

পরমাণু আছে। জলের অণুতে কয়টি হাইড্রোজন পরমাণু আছে, তাহা জানিবার কোন উপায় আছে কি? দেখা যাক, আছে কি না।

জলের হাইড্রোজন আমরা তাড়াইয়া বাহির করিতে পারি। সোডিয়ম পটাশিয়ম প্রভৃতি ধাতু জলে ফেলিলে জলের হাইড্রোজন বাহির হইয়া যায়; ধাতু গিয়া হাইড্রোজনের স্থান গ্রহণ করে ও জলস্থিত অক্সিজনের সহিত মিলিত হয়। কিন্তু এই হাইড্রোজন দুই বারে বাহির করা চলে। এক ছটাক জলে যতটা হাইড্রোজন আছে, তাহার অর্দ্ধেকটা প্রথম বারে তাড়াইলাম; বাকি অর্দ্ধেক থাকিয়া গেল, সেই অর্দ্ধেক আর একবারে তাড়ান চলে; ইচ্ছা করিলে তাহা রাখাও চলে।

জলের অণুতে যদি একটি মাত্র হাইড্রোজন পরমাণু থাকিত, তাহা হইলে উহার অর্দ্ধেক তাড়ান অসম্ভব হইত। একটা গরুর যেমন অর্দ্ধেক গোহালে রাখিয়া অর্দ্ধেক বাহিরে আনা চলে না, একটা সিকির যেমন অর্দ্ধেক রাখিয়া অর্দ্ধেক খয়রাত করা চলে না, তেমনই একটা পরমাণুর অর্দ্ধেক রাখা ও অর্দ্ধেক বাহির করা চলে না। কেন না, পরমাণুকে অবিভাজ্য ধরিয়া লইয়াছি। অতএব জলের অণুতে একাধিক হাইড্রোজন পরমাণু রহিয়াছে। যখন দুই বারে তাড়াইতে পারি, তখন দুইটা আছে। তিন বারে তাড়ান যায় না; নতুবা তিনটা আছে মনে করিতে হইত।

জলের অণুতে তবে হাইড্রোজনের পরমাণু দুইটা আছে; একটা নাই, একটামাত্র হাইড্রোজন পরমাণু থাকিলে উহাকে হয় রাখিতে হইত, নয় তাড়াইতে হইত; অর্দ্ধেক রাখা, অর্দ্ধেক তাড়ান কখনই চলিত না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জলের অণুতে যতটি হাইড্রোজন পরমাণু, হাইড্রোজন অণুতেও ততটি হাইড্রোজন পরমাণু। দেখা গেল, জলের অণুতে দুইটি হাইড্রোজন পরমাণু আছে, অতএব স্থির হইল, হাইড্রোজনের অণুতেও অন্ততঃ দুইটি পরমাণু আছে।

এই রকমের বিচারে স্থির হইয়াছে যে, জলের একটি অণুতে অক্সিজনের একটি পরমাণু বিদ্যমান আছে। অতএব জলের প্রত্যেক অণু ভাঙ্গিলে হাইড্রোজনের দুই পরমাণু ও অক্সিজনের এক পরমাণু পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি যে, এক ভাগ ওজনের হাইড্রোজন ৮ ভাগ ওজনের অক্সিজনে যুক্ত হইয়া ৯ ভাগ জল হয়। তাহা হইলে একটি অক্সিজন পরমাণুর ওজন দুইটি হাইড্রোজনের পরমাণুর ওজনের আটগুণ হয়। একটি

হাইড্রোজন পরমাণুর ওজন ১ ধরাই প্রথা, দুইটি হাইড্রোজন পরমাণুর ওজন ২ ; অতএব একটি অক্সিজন পরমাণুর ওজন ২এর আটগুণ ১৬।

গোড়ায় প্রশ্ন উঠিয়াছিল, অক্সিজনের পরমাণু ওজনে ৮ ধরিব, না ১৬ ধরিব ? ডাল্‌টন এই প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর দিতে পারেন নাই। তার পরে বহু পণ্ডিতে তর্কবিতর্কের পর স্থির করিয়াছেন যে, অক্সিজনের পরমাণুর ওজন ৮ নহে, ১৬ই বটে। জলের প্রত্যেক অণুতে হাইড্রোজনের দুইটি আর অক্সিজনের একটি পরমাণু বর্ত্তমান আছে। আবোগাড্রোর কল্পনার সাহায্যে ঐরূপ স্থির হইয়াছে। স্থির হইয়াছে বলা অনুচিত ; ঐরূপ কল্পিত হইয়াছে, বলা উচিত।

পাঠকেরা উক্ত বিচারে প্রীতি লাভ করিয়াছেন কি না, জানি না। সকল কথা বলিতে পারি নাই ; যে কয়টা কথা বলিয়াছি, তাহাই সম্ভবতঃ অনেকের পক্ষে বিরক্তিকর হইয়াছে। এরূপ বিচারের নমুনা আর দিব না।

এখানে এই জটিল বিতর্কের অবতারণার একটু উদ্দেশ্য আছে। বিজ্ঞানবিদ্যা কিরূপ বিচারে জ্ঞানের পরিধি বাড়াইবার চেষ্টা করেন, তাহা দেখানই এ স্থলে উদ্দেশ্য। প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, তাহা খাপছাড়া ঠেকে ; পরস্পর সঙ্গতি দেখা যায় না ; পরস্পর সম্পর্ক দেখা যায় না। অনুমান ও কল্পনাবলে সঙ্গতি ও সম্পর্ক স্থির করিতে হয়। প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান তাতে আরও স্পষ্ট হয় ; যাহা অস্পষ্ট ছিল, তাহা উজ্জ্বল হয় ; যাহা আঁধারে ছিল, তাহা আলোতে আসে ; যেখানে সম্বন্ধ দেখিতাম না, সেখানে সম্বন্ধ দেখিতে পাই ; যেখানে অব্যবস্থা ছিল, সেখানে ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সর্ব্ববিধ অনুমানের ও কল্পনার এক মাত্র ভিত্তি এই প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের এক মাত্র দ্বার ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় যাহা বুদ্ধির নিকট আনিয়া দেয়, বুদ্ধি তাহাই গ্রহণ করে। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়কে যথাস্থানে নিযুক্ত করিতে পারে ; স্বকর্ম্মসাধনে অবহিত ও সচেষ্ট করিতে পারে, উপযুক্ত কৌশল উদ্ভাবনা করিয়া ইন্দ্রিয়কে সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু স্বয়ং জ্ঞান আহরণ করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় যাহা আনিয়া দেয়, বুদ্ধি তাহাই গ্রহণ করে। বুদ্ধি তাহাকে সাজাইয়া গোছাইয়া তাহার মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া বিভাগ করিয়া, কোথায় ব্যবস্থা, কোথায় অব্যবস্থা, কোথায় নিয়ম, কোথায় অনিয়ম, তাহা নির্দ্ধারণ করে। কিন্তু গোড়ায় বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের অধীন।

তার পর বুদ্ধি নিজশক্তি পরিচালনা করিয়া জ্ঞানের সীমা বাড়াইতে চেষ্টা করে; নূতন জ্ঞান—ইন্দ্রিয় যাহার তত্ত্ব আনে না, সেইরূপ জ্ঞানের সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়। এই নূতন জ্ঞান সঞ্চয়ের দুইটা উপায়।

প্রথম—বুদ্ধি জোর করিয়া বলে, প্রত্যক্ষ দর্শনে যখন এই নিয়ম পাইলাম, তখন ঐখানে ঐ ঘটনা ঘটিবেই ঘটিবে; ইন্দ্রিয় হয়ত তাহার খবর রাখে না, কিন্তু পাঠাও ইন্দ্রিয়কে সেই সংবাদ আনিতে,—ইন্দ্রিয় সংবাদ আনিতে সমর্থ হউক, আর না হউক, ঐখানে ঐ ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিব না। নেপচুন বা মিত্রগ্রহের আবিষ্কার ইহার দৃষ্টান্ত। পূর্ব্বে ইহার উল্লেখ করিয়াছি।

প্রতিভার আলোক জ্বালিয়া নিউটন মাধ্যাকর্ষণঘটিত প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব দেখিলেন। তার পর তাঁহার শিষ্যগণের বুদ্ধি নূতন জ্ঞান আহরণে ধাবিত হইল।

লেবেরিয়ার বুদ্ধি গণনা করিয়া বলিল, নিউটন-দৃষ্ট মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম যদি সত্য হয়, তবে বরুণ গ্রহের গতিবিধিতে যে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে, উহার হেতু পাইয়াছি। ঐখানে আর একটা গ্রহ আছে; নিশ্চিত তাহার সান্নিধ্যই, তৎপ্রযুক্ত আকর্ষণই এই ব্যতিক্রমের হেতু। নিশ্চয়, নিশ্চয়। ইন্দ্রিয় সে গ্রহের খোঁজ পাইতেছে না। উহা চক্ষুর অদৃশ্য। পাঠাও ইন্দ্রিয়কে খোঁজ লইতে। চক্ষু প্রেরিত হইল। মিত্র গ্রহ ধরা পড়িল। নূতন জ্ঞান অর্জ্জিত হইল। মিত্র গ্রহ আবিষ্কৃত হইল। বুদ্ধির এখানে বাহাদুরি; বুদ্ধি এখানে ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা করে নাই। নিজের বলে নূতন জ্ঞান আহরণ করিয়াছে।

দ্বিতীয়—জ্ঞানবর্দ্ধনের দ্বিতীয় উপায় অনুমান ও কল্পনা। প্রত্যক্ষ দর্শন হইতে জানা গেল, এক মূল পদার্থ অন্য মূল পদার্থে মিলিত হইবার সময় নির্দ্দিষ্ট ভাগে মিলিত হয়। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম, প্রত্যক্ষলব্ধ। ইহার ভিতরে অবশ্য গূঢ় রহস্য আছে। সেই রহস্য প্রত্যক্ষের অতীত; সেই অন্ধকার ভেদ করিবার কোন উপায় নাই। ডাল্‌টন প্রতিভার আলোক জ্বালিলেন। আঁধারে কি আছে, তাহা প্রত্যক্ষগম্য হইল না বটে, তবে চিত্রপটে তাহার একটা ছবি অঙ্কিত হইল। ডাল্‌টন কল্পনানেত্রে দেখিলেন, জড় পদার্থ অবিভাজ্য পরমাণুর সমষ্টি; যত মূল পদার্থ, তত শ্রেণীর পরমাণু; একের ওজন অন্যের সমান নহে; এক শ্রেণীর গোটাকতক পরমাণু অন্য

শ্রেণীর কতিপয় পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া মৌলিক পদার্থের অণু নির্ম্মাণ করে। এই অনুমানে এই প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গত তাৎপর্য্য পাওয়া গেল। কিন্তু যে ছবি ডাল্টনের চিত্তে কল্পিত হইল, তাহা তত স্পষ্ট নহে। কোন্ অণুতে কোন্ পরমাণু কত আছে, তাহা তিনি স্পষ্ট দেখিলেন না। পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা কল্পনার উপর কল্পনা চড়াইলেন। ক্রমে ছবিটা স্পষ্ট হইয়া আসিল। জলের অণুর ভিতর কোন্ পরমাণু কয়টা আছে, তাহা কল্পিত হইল। কিন্তু ব্যাপারটা কল্পিতই থাকিয়া গেল। প্রত্যক্ষ বিষয় হইল না, হইবার আশাও থাকিল না। জ্ঞান অর্জ্জিত হইল বটে, কিন্তু সেই জ্ঞান অস্পষ্ট। তাহার উপর পুরা ভর দেওয়া চলে না।

বিজ্ঞানবিদ্যা যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার সকলগুলির মূল্য সমান নহে, সকলের ভিত্তি সমান দৃঢ় নহে। বিজ্ঞান আলোচনার সময়ে কোন্‌টার ভিত্তি কতটুকু দৃঢ়, তাহা জানিয়া লওয়া আবশ্যক। নতুবা বৈজ্ঞানিকের হাতের ছাপ দেখিয়াই উহাকে অভ্রান্ত খাঁটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে প্রতারিত হইবার আশঙ্কা থাকে।

ক্ষার, অম্ল, লবণ

পণ্ডিতেরা যৌগিক পদার্থগুলিকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। ধর্ম্মসামান্য দেখিয়া এইরূপ শ্রেণীবিভাগ হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত আছে। একটা দৃষ্টান্ত লইব।

মনে কর চুন। চুন জিনিসটা আমরা পানে খাই, গৃহনির্ম্মাণে লাগাই। চুনের কি গুণ? তাম্বুলভোজী বিলক্ষণ জানেন, গালের পাতলা চামড়ার সহিত চুনের কি সম্বন্ধ; আঙুলের মোটা চামড়াকেও চুনে আক্রমণ করে। চুন হরিদ্রার হলুদে রঙকে রাঙা করিয়া দেয়। চুনের গুণ তীব্র; এইরূপ তীব্র গুণ যে জিনিসে আছে, তাহার সাধারণ নাম ক্ষার।

ক্ষারের সহিত অম্লের কতকটা অহি-নকুল সম্পর্ক। অম্লরোগী চুনের জল পান করে। চুনের জলে অম্লজল মিশাইলে ক্ষারের তীব্রতা নষ্ট হয়। অম্লের আস্বাদন সর্ব্বজনবিদিত। কাগজে জবাফুল ঘসিলে যে নীল রঙ হয়, অম্লরসে উহা রাঙা হয়।

আর মনে কর লবণ। সামুদ্রিক লবণের আস্বাদনও সর্ব্বজনবিদিত। উহার আস্বাদনও চুনের মত নহে, অম্লের মতও নহে।

ক্ষার, অম্ল আর **লবণ**, এই তিনটি শব্দ রসায়নশাস্ত্রে কিছু ব্যাপকতর অর্থে প্রযুক্ত হয়।

চুন ক্ষার। চুন আমরা প্রস্তুত করি কিরূপে? ঘুটিং, ঝিনুক, শামুক, খড়ি, মার্ব্বেল পাথর, ভাটির ভিতর প্রখর তাপে গরম করিলে চুন প্রস্তুত হয়। উত্তাপে একটা অনিল বাহির হইয়া যায়। পড়িয়া থাকে চুন।

উত্তাপে যে অনিল বাহির হইয়া যায়, সেই অনিলটা আমাদের পরিচিত অনিল। কয়লা পোড়াইলে যে অনিল হয়, ইহা সেই অনিল। সোডা-ওয়াটারে যে অনিল থাকে, সেই অনিল।

এই অনিল জলে দ্রব হয়; জলটা অম্লধর্ম্মাক্রান্ত হয়। নির্ম্মল চুনের জলে দিলে নির্ম্মল জল ঘোলাটে হয়। সেই ঘোলা জল দাঁড়াইয়া রাখিলে সাদা রঙের গুঁড়া থিতাইয়া পড়ে।

এই সাদা রঙের গুঁড়া আর কিছুই নহে। উহা চক বা চাখড়ির গুঁড়া।

খড়ি উত্তপ্ত করিলে চুন পড়িয়া থাকে, আর কয়লাপোড়া অনিল বাহির হইয়া যায়। কয়লাপোড়া অনিল চুনের জলে প্রবেশ করিলে উহা চুনে যুক্ত হইয়া আবার খড়ি হয়।

চুন হইল ক্ষার; আর কয়লাপোড়া অনিল যে জলে দ্রব হইয়া আছে, সেই জল হইল অম্ল; আর ঐ যে খড়ি, যাহা ক্ষারধর্ম্মী চুন আর অম্লধর্ম্মী জলের মিলনে উৎপন্ন হইল, উহা রসায়ন শাস্ত্রের পরিভাষা অনুসারে লবণ।

কয়লা, গন্ধক, ফস্ফরাস প্রভৃতি অপধাতু পোড়াইলে উহারা অক্সিজনে মিলিত হইয়া যে পদার্থ উৎপাদন করে, তাহা অম্লধর্ম্মী। আর সোডিয়ম, পটাশিয়ম, মগ্নীশম, দস্তা প্রভৃতি ধাতু পোড়াইলে উহারা অক্সিজনে মিলিত হইয়া যে সকল ভস্মবৎ পদার্থের উৎপাদন করে, তাহারা ক্ষারধর্ম্মী। ব্যাপক অর্থে অক্সিজনে দগ্ধ ধাতুভস্ম মাত্রকেই ক্ষার বলা যাইতে পারে। ক্ষারধর্ম্মী পদার্থে অম্লধর্ম্মী পদার্থ যোগ করিলে উহার সম্মিলনে যে পদার্থ জন্মে, তাহা লবণধর্ম্মী।

অম্লধর্ম্মী পদার্থের মধ্যে কতকগুলি তীব্রগুণবিশিষ্ট। গন্ধক, দ্রাবক, মহাদ্রাবক প্রভৃতি দ্রাবকের নাম বৈদ্যক শাস্ত্রে পাওয়া যায়। আজকাল বাজারে ঐ সকল জিনিস খুব সস্তা। উহারা তীব্র অম্লধর্ম্মী। গন্ধক পোড়াইয়া গন্ধকদ্রাবক হয়। গন্ধকদ্রাবক সহিত সোরা চোঁয়াইয়া মহাদ্রাবক হয়। উহাদের মধ্যে অক্সিজন প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। উহারা

ক্ষার মাত্রকে লবণে পরিণত করে। কেবল তাহাই নহে, ধাতু দ্রব্যকেও আক্রমণ করিয়া লবণে পরিণত করে। ধাতুকে দ্রবীভূত করিয়া রূপান্তরিত করে বলিয়াই এই সকল অম্ল দ্রব্যের নাম দ্রাবক হইয়াছে।

রাসায়নিক পরিভাষানুসারে লবণ শব্দটির তাৎপর্য্য বুঝা উচিত। কাঠ পাতা পোড়াইলে যে ছাই পড়িয়া থাকে, তাহাতে প্রচুর লবণ আছে। বাজারের সোডা বা সাজিমাটি লবণ; সোরা ফটিকারি সোহাগা হীরাকষ তুঁতে, এই সকলই লবণ; এমন কি, রাসায়নিকের নিকট খড়ি, মাটি, কাচ পর্য্যন্তও লবণ অথবা বিবিধ লবণবৎ পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন। মোটামুটি বলা চলিতে পারে, ধাতু দ্রব্যকে অক্সিজনে দগ্ধ করিলে উহা অম্লে পরিণত হয়, আর অপধাতুতে অক্সিজনে যুক্ত করিলে উহা ক্ষারে পরিণত হয়, আর ক্ষার ও অম্ল একত্রযোগে লবণ প্রস্তুত হয়। বলা বাহুল্য যে, এস্থলে ক্ষার, অম্ল, লবণ, এই তিনটি শব্দ ব্যাপক পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কয়লা গন্ধক প্রভৃতি দগ্ধ করিলে উহারা অক্সিজনে যুক্ত হইয়া অম্লদ্রব্যে পরিণত হয়, লাবোয়াশিয়া ইহা দেখিয়াই অক্সিজনের নামকরণ করিয়াছিলেন; ইংরেজী অক্সিজন অর্থই অম্লজনক।

কিন্তু ঐ নামটি ঠিক হয় নাই। কেন না, ধাতুদ্রব্য দগ্ধ হইলে ক্ষার হয়, ঐ ক্ষারেও অক্সিজন বর্ত্তমান থাকে; ক্ষারে অম্লে মিলিত হইয়া লবণ হয়, উহাতেও প্রচুর অক্সিজন থাকে। কাজেই অক্সিজনযুক্ত দ্রব্য মাত্রই অম্ল নহে।

আবার এমন তীব্র অম্ল পদার্থ আছে, তাহাতে অক্সিজনের কণিকা মাত্র নাই। মিউরিয়েটিক এসিড নামক যে দ্রাবক সুপরিচিত, উহা সামুদ্রিক লবণ হইতে প্রস্তুত হয়। উহাতে অক্সিজনের কণিকা মাত্র নাই। প্রুসিক এসিড নামক পদার্থ অম্লমধ্যে গণ্য; উহার মত মারাত্মক বিষ আর নাই; উহাতেও অক্সিজন নাই। কাজেই অক্সিজনের বিদ্যমানতা অম্লত্বের কারণ নহে।

ঐ মিউরিয়েটিক এসিড বা লবণ দ্রাবকও ধাতুদ্রব্যকে আক্রমণ করে। দস্তায় লবণ দ্রাবক দিলে লবণ দ্রাবক হইতে হাইড্রোজন বাহির হয়, আর দস্তা তাহার স্থানে গিয়া বসে; যে জিনিসটা হয়, তাহা লবণ।

সামুদ্রিক লবণ বা সৈন্ধব লবণ, যাহা আমরা রন্ধনকর্ম্মে ব্যবহার করি, তাহাতেও অক্সিজন নাই।

অক্সিজনের অস্তিত্ব অম্লত্বের কারণ নহে, বরং হাইড্রোজনের অস্তিত্বই অম্লত্বের কারণ বলা যায়। এ পর্য্যন্ত যত অম্ল দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সকলেতেই হাইড্রোজন বিদ্যমান আছে। ঐ হাইড্রোজনকে দস্তার মত ধাতু পদার্থে তাড়াইয়া দিতে পারে; তাড়াইয়া দিয়া তাহার স্থানে বসিতে পারে। যে সকল যৌগিক পদার্থে হাইড্রোজন বর্ত্তমান, এবং ঐ হাইড্রোজন ধাতুদ্রব্য কর্ত্তৃক অপসার্য্য, তাহার নাম অম্ল। ধাতু যখন হাইড্রোজনকে অপসারণ করিয়া তাহার স্থানে বসে, তখন অম্লের আর অম্লত্ব থাকে না; উহা তখন লবণে পরিণত হয়।

দুইটি দৃষ্টান্ত দিলে স্পষ্ট হইবে। গন্ধককে পোড়াইলে শাদা রঙের যে ধূঁয়া হয়, তাহা সকলেই জানে। গন্ধক পোড়ার এই ধূমের একটা তীব্র গন্ধ আছে, উহা শ্বাসরোধের উপক্রম করে। এই তীব্রগন্ধী পদার্থে গন্ধকও আছে; অক্সিজনও আছে; ৩২ ভাগ গন্ধকে ৩২ ভাগ অক্সিজন আছে। কোনরূপে উহার সহিত আরও ১৬ ভাগ অক্সিজন যোগ দিলে যে পদার্থ জন্মে, উহাতে ৩২ ভাগ গন্ধকের সহিত ৪৮ ভাগ অক্সিজন থাকে। এই পদার্থে জল দিলে উহা ১৬ ভাগ জলের সহিত মিলিত হইয়া ৩২+৪৮+১৮ অর্থাৎ ৯৮ ভাগ গন্ধক দ্রাবক হয়। ১৮ ভাগ জলে ছিল দুই ভাগ হাইড্রোজন আর ১৬ ভাগ অক্সিজন। ৯৮ ভাগ গন্ধক দ্রাবকে থাকিল ২ ভাগ হাইড্রোজন, ১৬+৪৮ অর্থাৎ ৬৪ ভাগ অক্সিজন, আর ৩২ ভাগ গন্ধক।

২ হাইড্রোজন+৩২ গন্ধক+৬৪ অক্সিজন=৯৮ গন্ধক দ্রাবক; এই গন্ধক দ্রাবকে তামা তপ্ত করিলে উহার ২ ভাগ হাইড্রোজন বাহির হইয়া যায়, তাহার স্থানে ৬৩ ভাগ তামা আসিয়া বসে। যে লবণটা প্রস্তুত হয়, তাহা তুতিয়া। উহার ভাগ এইরূপ: ৬৩ তামা+৩২ গন্ধক+৬৪ অক্সিজন=১৫৯ তুতিয়া। এই তুতিয়া অন্যতম লবণ। লবণ শব্দের পারিভাষিক অর্থ এখন বুঝা যাইবে। অম্লদ্রব্যে হাইড্রোজন থাকে, ঐ হাইড্রোজন ধাতু কর্ত্তৃক অপসারিত হয়। ধাতু যখন হাইড্রোজনের স্থানে গিয়া বসে, তখন ঐ অম্লদ্রব্য রূপান্তরিত হইয়া লবণে পরিণত হয়। অম্লে ছিল হাইড্রোজন; সেই হাইড্রোজন গেল; আসিল ধাতু; হইল লবণ। এই হিসাবে আমাদের সামুদ্রিক লবণও লবণ; সোরাও লবণ, হীরাকষ লবণ, তুঁতে লবণ, খড়ি লবণ, মাটি লবণ; এমন কি, কাঠ পোড়াইয়া যে ছাই থাকে, উহাও নানা লবণের সমষ্টি।

দহনক্রিয়া

দহনক্রিয়ার ব্যাপারটা এখন ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। দহনের ফল অগ্নি ; অগ্নির স্বরূপটাও তাহা হইলে বুঝা যাইবে।

অগ্নির সহিত উত্তাপের ও আলোকের চিরন্তন সম্বন্ধ। আগুনে হাত পোড়ে, আগুনের দীপ্তি আঁধার দূর করে। উত্তাপ আর আলোকের স্বরূপ কি, তাহা পরে আলোচ্য। এখন আগুনের স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে হইবে।

কেবল উত্তাপে আগুন হয় না। গরম জলে, গরম ভাতে, উত্তাপ আছে, কিন্তু আগুন নাই। কেবল আলোকেরও আগুন হয় না। জোনাকি পোকায় আলো দেয়, কিন্তু উহাতে আগুন হয় না। আগুনে উত্তাপ আর আলোক, দুই থাকা চাই।

উত্তাপ আর আলোক দুই থাকিলেও আগুন হয় না। স্বর্ণকারের মুচির ভিতর তরল সোনা টল টল করে ; উহা তপ্ত হয়, উহা দীপ্তি দেয়, কিন্তু উহাকে আগুন বলি না।

কিন্তু ঐ মুচির বাহিরে যে তপ্ত জ্বলন্ত দীপ্তিমান্ অঙ্গার আছে, যাহার উত্তাপে স্বর্ণ দ্রবীভূত হইয়াছে, সেই অঙ্গারে আগুন আছে। কাজেই উত্তাপ থাকিলেই আগুন হয় না ; দীপ্তি থাকিলেই আগুন হয় না। আগুনে আরও কিছু চাই।

তপ্ত দীপ্ত স্বর্ণখণ্ড তপ্ত দীপ্ত অবস্থায় বহু ক্ষণ থাকিতে পারে, উহার ভার কমে না। স্বর্ণকার তাহা জানে, গৃহস্থও জানেন। ভার যদি কমে, গৃহস্থ যেন বুঝেন যে, স্বর্ণকার সোনা চুরি করিয়াছে। উত্তাপে সোনার ক্ষয় হয় না। কিন্তু অঙ্গার যতক্ষণ ধরিয়া দীপ্ত তপ্ত থাকে, ততই উহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। উহা ক্ষীণ হইয়া বায়ুতে মিলিয়া যায় ; উৎপন্ন হয় একটা অনিল। ঐ অনিলের কথা পূর্ব্বে কত বার বলিয়াছি।

অঙ্গার যত ক্ষণ তপ্ত থাকে ও দীপ্ত থাকে, ততই ক্ষীণ হইয়া যায়। অঙ্গার ক্ষয় হইয়া যাহা অবশেষ থাকে, তাহাকে অঙ্গার বলে না। তাহাকে বলে ছাই ; উহা অঙ্গারের ধ্বংসাবশেষ।

এই ক্রিয়ার নাম **দহন**। তপ্ত সোনা দগ্ধ হয় না ; উহার ভার কমে না। তপ্ত অঙ্গার দগ্ধ হয়, উহার ভার ক্রমে কমিয়া যায় ; শেষে অঙ্গারের অবশেষ কিছুই থাকে না ; যাহা থাকে, তাহা ছাই।

স্বর্ণ দাহ্য নহে, অঙ্গার দাহ্য। অঙ্গারের যে অংশ দহনের পর অবশিষ্ট থাকে, তাহা অঙ্গার নহে, ছাই। এই ছাই দাহ্য নহে।

জ্বলন্ত সোনা তাপ দেয়, আলো দেয়, কিন্তু পোড়ে না। জ্বলন্ত কয়লার যেটুকু খাঁটি কয়লা, সেইটুকু তাপ দেয়, আলো দেয়, আর পোড়ে; আর ক্ষয় পায়। যেটুকু পোড়ে না, ক্ষয় পায় না, সেটুকু অবশেষ থাকে, তাহা কয়লা নহে, তাহা ছাই।

দহনকালে কয়লা ক্ষয় পায়, কিন্তু একেবারে লোপ পায় কি? লাবোয়াশিয়ে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। দহনকালে একটা অনিল জন্মে; সেই অনিল সেই কয়লা হইতে উৎপন্ন। যে কয়লাটা অদৃশ্য হইয়াছে, তাহা সেই অনিলে বিদ্যমান আছে। কয়লার কণিকা মাত্র ধ্বংস পায় নাই; তাহা রূপান্তর গ্রহণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া বর্ত্তমান আছে।

এই অনিল কয়লাপোড়া অনিল—কয়লার ও অক্সিজনের মিলনের ফল। কয়লার যে ভার ছিল, এই অনিলের ভার ওজনে তার চেয়ে বেশী। বারো ভাগ ওজনের কয়লা পোড়াইয়া চুয়াল্লিশ ভাগ ওজনের অনিল জন্মে। এইরূপে ভাগ দেখান চলে।

১২ কয়লা + ৩২ অক্সিজন = ৪৪ কয়লাপোড়া অনিল। ১২ ভাগ কয়লা ৩২ ভাগ অক্সিজনে যুক্ত হইয়া ৪৪ ভাগ অনিল জন্মিয়াছে; কয়লা অদৃশ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু লোপ পায় নাই; বলা হয় যে, উহার প্রত্যেক পরমাণু এই নবজাত অনিলে বর্ত্তমান আছে।

সোনা গরম করিলে সোনাই থাকে। কয়লা পোড়াইলে তাহা কয়লা থাকে না। উহা অক্সিজনযুক্ত হইয়া অনিলে পরিণত হয়।

এই অক্সিজনের সহিত কয়লার সম্মিলনের নাম দহনক্রিয়া। কয়লা দাহ্য পদার্থ। অক্সিজন দহন-সহায়। কয়লা ও অক্সিজনের পরস্পর সম্মিলনে দহনক্রিয়া; দহনক্রিয়ার ফল তাপের উদ্ভব ও আলোকের উদ্ভব; অর্থাৎ আগুনের উৎপত্তি।

দহনক্রিয়ার সময়ে তাপের ও আলোকের উদ্ভব হইলে তবে আগুন হয়।

কয়লাতে ও অক্সিজনে রাসায়নিক সম্মিলন ঘটে; সেই সম্মিলনে তাপ জন্মে, আর আলোক জন্মে; আমরা বলি, আগুন হইল।

সোনার বেলায় এইরূপ সম্মিলন ঘটে না, আগুনও হয় না।

জ্বলন্ত কয়লা দহনকালে আগুন জন্মায়; কিন্তু সেই আগুনে কয়লা ধীরে ধীরে ধিকি ধিকি জ্বলে; জ্বলে আর ক্ষয় পায়, আর অদৃশ্য হইয়া অনিলে পরিণত হয়। আগুন হয়, কিন্তু সেই আগুনের শিখা থাকে না। শিখাহীন অগ্নির শোভা সুন্দর; কিন্তু অগ্নির শিখা বুঝি সুন্দরতর। কাঠ পুড়িলে, তেল, ঘি, কেরোসিন বাতি পুড়িলে যে আগুন হয়, তাহার শিখা থাকে। উহার মধ্যে একটাকে দৃষ্টান্ত লইব; কেরোসিন লওয়া যাক।

কেরোসিন দ্রব পদার্থ। উহা কয়লা আর হাইড্রোজনের মিলনে উৎপন্ন। উহাতে অন্য কোন মূল পদার্থ নাই।

কয়লাও দাহ্য, হাইড্রোজনও দাহ্য; উভয়ই অক্সিজনে দগ্ধ হয়। কয়লা অক্সিজন-যুক্ত হইয়া একটা অনিল হয়। হাইড্রোজন অক্সিজন-যুক্ত হইয়া জল হয়। কেরোসিন যখন পোড়ে, তখন উহার অন্তর্নিহিত কয়লা পুড়িয়া সেই অনিলে পরিণত হয়, আর হাইড্রোজন পুড়িয়া জলে পরিণত হয়। বায়ুমধ্যে অক্সিজন আছে; সেই অক্সিজন দহনের সহায়। দহনকালে কেরোসিন ক্রমে ক্ষয় পায়, কিন্তু লোপ পায় না। উহা অনিলে আর জলে পরিণত হয়।

* * * *

দহনকালে তাপ জন্মে ও আলোক জন্মে। দহনকালে তাপ ও আলোক জন্মিলে আমরা বলি আগুন হইয়াছে। কেরোসিনের দহনে আগুন হয়।

কেরোসিন তৈলের দহনফল খানিকটা অনিল আর খানিকটা জল। জলটাও গরম হইয়া বাষ্পাকারে অনিল হইয়া যায়। কয়লাপোড়া অনিল ও জলের বাষ্পের অনিল, দুই অনিল মিশিয়া থাকে।

দুই অনিলই উত্তপ্ত; উত্তপ্ত ও হাল্‌কা। উত্তপ্ত অনিলদ্বয়ের প্রবাহ ঊর্দ্ধমুখে উঠিতে থাকে। উত্তপ্ত অনিলপ্রবাহ দগ্ধাবশেষ কয়লার কণিকা জ্বলন্ত ও দীপ্ত অবস্থায় ভাসিতে থাকে। অনিলপ্রবাহকেও দীপ্ত ও তপ্ত করিয়া রাখে। উহাই আগুনের শিখা।

কয়লার অদগ্ধ কণিকা শিখামধ্যে থাকে; তাহার প্রমাণ ধূম। কেরোসিনের শিখা হইতে যে ধূম উঠে, উহা অঙ্গারকণিকা মাত্র।

কেরোসিনের দহনে, তেল বাতি প্রভৃতির দহনে আগুনের শিখা হয়। তপ্ত-দীপ্ত ঊর্দ্ধমুখ অনিলপ্রবাহ ঐ অগ্নিশিখার উৎপাদন করে। দহনে অবশেষে যাহা থাকে, তাহা ধূম। উহা অদগ্ধ অঙ্গারকণিকা মাত্র; উহা দহনক্রিয়ার অসমাপ্তির পরিচায়ক।

কাঠের দহনেও শিখা হয় ঐ কারণে। কাঠেও কয়লা আছে, হাইড্রোজন আছে; উহারা পুড়িবার সময় শিখা জন্মায়। কাঠের মধ্যে যে অঙ্গার ও হাইড্রোজন থাকে, তাহা নিঃশেষে দগ্ধ হইলে যাহা অবশেষ থাকে, তাহা অদাহ্য লাবণিক পদার্থ—ছাই।

উত্তাপ

দহনক্রিয়ায় উত্তাপ জন্মে। কোন দাহ্য বস্তু, যথা—কয়লা, গন্ধক, হাইড্রোজন যখন অক্সিজনে যুক্ত হয়, তখন **উত্তাপ** জন্মে। ফলে রাসায়নিক সম্মিলন ঘটিলে প্রায় উত্তাপ জন্মে।

তবে সর্ব্বত্র রাসায়নিক সম্মিলনে সমান উত্তাপ জন্মে না; কোথাও অধিক, কোথাও অল্প। কোথাও তাপের সহিত আলো বাহির হয়; কোথাও উত্তাপ হয়, কিন্তু দীপ্তি হয় না। কোথাও সহসা প্রচুর তাপ নির্গত হয়; কোথাও বা বহু ক্ষণ অতি ধীরে তাপ বাহির হয়, তাহা বুঝা যায় বা বুঝা যায় না। তাপ জন্মানর প্রধান উপায় রাসায়নিক সম্মিলন। দহনক্রিয়া তাহার একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। প্রদীপে, উনানে, এঞ্জিনে এই উপায়ে তাপ উৎপন্ন করা হয়।

তদ্ভিন্ন তাপ জন্মানর অন্য উপায় আছে, যথা—ঘর্ষণ। হাতে হাতে ঘষিলে হাত তপ্ত হয়। কাঠে কাঠে ঘষিলে তাপ হয়; এমন কি, আগুন জন্মে। সেকালে এইরূপে কাঠে কাঠে ঘষিয়া উত্তাপের উৎপাদন হইত। বরফে বরফে ঘষিয়া তদুৎপন্ন তাপে বরফ গলাইতে পারা যায়।

আর একটা উপায় সংঘট্ট-ঠোকাঠুকি। নেহাই হাতুড়ির আঘাতে তপ্ত হয়; চকমকির আঘাতে পাথর হইতে অগ্নিকণা বাহির হয়। তলোয়ারে তলোয়ারে ঠোকাঠুকিতে আগুন বাহির হয়। আর একটা উপায় সঙ্কোচন। জলে আল্‌কোহল ঢালিলে সঙ্কোচন ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ উত্তাপ জন্মে। বাতাসকে হঠাৎ চাপ দিয়া সঙ্কুচিত করিলে বাতাস গরম হয়।

আলোকে উত্তাপ জন্মে। সূর্য্যের আলোকে ভূমি উত্তপ্ত হয়, জল গরম হয়, বাতাস গরম হয়। আলোক উত্তাপ নহে; তবে আলোক তাপ জন্মায়, তাপে পরিণত হয়। সূর্য্যের আলোক কাচের পরকলা দিয়া ঘনীভূত করিলে তাহাতে আগুন জ্বলিতে পারে। চাঁদের আলোতেও তাপ জন্মান যায়। বিজ্ঞানবিদ্যা চাঁদকে হিমাংশু বলিতে চাহিবেন না।

উত্তাপ জন্মাইবার আরও অনেক উপায় আছে ; ক্রমশঃ প্রকাশ্য। এখন বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক, উত্তাপ পদার্থটা কি ?

উত্তাপ আলোক নহে ; উহা দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। উহা ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়। স্পর্শ দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি—এটা তপ্ত, এটা শীতল।

উষ্ণতা

বিজ্ঞানশাস্ত্রে তাপ নামটার পারিভাষিক অর্থ আছে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে তাপ ঠিক ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, যাহা ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়, তাহার নাম **উষ্ণতা**—গরমি—ঘর্ম্ম। আজি কালি ঘর্ম্ম বলিতে ঘাম বুঝায় ; ঘর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ গরমি বা উষ্ণতা। পদার্থবিদ্যায় যাহাকে উত্তাপ বলে, তাহা উষ্ণতা নহে। উষ্ণতা তাহার একটা লক্ষণ মাত্র।

স্পর্শেন্দ্রিয় উষ্ণতার পরিচয় দেয়। আমাদের হাতের একটা উষ্ণতা আছে ; যে জিনিস হাতের চেয়ে উষ্ণ, তাহাই গরম ঠেকে ; যাহা হাতের চেয়ে কম উষ্ণ, তাহা ঠাণ্ডা ঠেকে।

এক হাত খুব ঠাণ্ডা জলে, অন্য হাত খুব গরম জলে কিছু ক্ষণ রাখিয়া দুই হাত একসঙ্গে অল্প গরম জলে রাখিলে সেই একই জল এক হাতে গরম, অন্য হাতে উষ্ণ বোধ হয়। কাজেই উষ্ণতা ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়। কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করিবার জো নাই।

অথচ উষ্ণতা মাপিয়া দেখিতে হইবে। কোন্ জিনিসটা কত উষ্ণ, তাহা মাপিবার একটা উপায় চাই ; নহিলে বৈজ্ঞানিকোচিত সূক্ষ্ম বিচার চলিবে না। উষ্ণতা মাপা যাইবে কিরূপে ?

উত্তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা পদার্থে নানা বিকার ঘটে। কঠিন, তরল, অনিল, প্রায় যাবতীয় পদার্থই যত উষ্ণ হয়, ততই একটু-না-একটু আয়তনে বাড়ে। এই আয়তনের বৃদ্ধি দেখিয়া উষ্ণতার পরিমাণ চলিতে পারে।

একটা পিতলের গোলা পিতলের আংটির ভিতর দিয়া ঠিক গলিয়া পড়ে ; আংটির পরিধিটা গোলার পরিধির প্রায় সমান হইলে ঐরূপ হয়। গোলাটাকে গরম করিলে আর আংটির ভিতর যায় না।

একটা কাচের বোতল,—তাহার গলাটা খুব লম্বা আর খুব সরু ; গলার কিছু দূর পর্য্যন্ত জলে পূর্ণ করিয়া উহাকে যদি গরম করা যায়, তাহা

হইলে ঐ জল গলায় উঠিতে থাকে। উত্তাপবৃদ্ধিতে বোতলের আয়তনটা একটু বাড়ে। জলের আয়তন তার চেয়ে অধিক বাড়ে। কাজেই গলা বাহিয়া জল উঠে। উষ্ণতা যত বাড়ে, জল তত উঠে। জল কতটা উঠিল দেখিয়া উষ্ণতাবৃদ্ধির একটা মোটা হিসাব চলিতে পারে।

ঘর্ম্মমান

এইরূপ খুব ছোট একটা কাচের বোতল—অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ অথবা আরও ছোট কাচের শিশি—তাহার গলাটা আবার খুব লম্বা ও খুব সরু—চুলের মত সরু—তাহাকে পারায় পূর্ণ করিয়া, উষ্ণতা মাপিবার যন্ত্র তৈয়ার হয়। এই যন্ত্রের ইংরাজী নাম থার্ম্মোমিটার। ডাক্তারেরা ইহা জ্বর-রোগীর বগলে দিয়া দেহের উষ্ণতা দেখেন। কুক্ষণে বাঙ্গলায় ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে তাপমান; কেন না, এই যন্ত্রে তাপ মাপা হয় না। যাহা মাপ হয়, তাহা উষ্ণতা। তাপ মাপিবার স্বতন্ত্র যন্ত্র আছে।

কাজেই তাপমান নামটি অতি সুন্দর হইলেও উহার মায়া কাটাইতে হইবে। আমি পূর্ব্বে উষ্ণতামান নামের প্রস্তাব করিয়াছিলাম, উহাও বড় লম্বা হয়। থার্ম্মোমিটার নামই একরকম চলিয়াছে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে উহা দুরুচ্চার্য্য। ঘর্ম্মমান বলিলে—চলিত ভাষায় গরমিমান বলিলে কেমন হয়?

ঘর্ম্মমানের সরু গলায় দুইটা অঙ্ক থাকে। বরফজলে ডুবাইলে পারা গলার যে স্থানে দাঁড়ায়, সে স্থানে একটা চিহ্ন দেওয়া হয়, উহার শূন্য অঙ্ক। আর ফুটন্ত জল হইতে যে বাষ্প বাহির হয়, সেই বাষ্পে ধরিলে পারা যেখানে দাঁড়ায়, সেখানে আর একটা অঙ্ক দেওয়া হয় ১০০।

এই দুই অঙ্কের মাঝে গলাটা ১০০ সমান ভাগে ভাগ করা হয়। এক এক ভাগের নাম দেওয়া হয় এক এক ডিগ্রি।

উত্তাপবৃদ্ধির সহিত পারা এক এক ডিগ্রি উঠে। ডিগ্রি শব্দটি ইংরাজী হইতে পাওয়া গিয়াছে। উহা বাঙ্গলা ভাষার ধাতের সঙ্গে বেশ মিশিয়াছে।

পারার বদলে তেল পুরিয়াও ঘর্ম্মমান তৈয়ার হইতে পারে। বরফ-জলের অঙ্ক ০, আর ফুটন্ত জলের অঙ্ক ১০ ; এই দুই স্থানে দ্বিবিধ ঘর্ম্মমানে মিল থাকিবে। কিন্তু পারার ঘর্ম্মমান অনুসারে যে জলের উষ্ণতা ২০ ডিগ্রি দেখায়, তেলের ঘর্ম্মমান অনুসারে সে জল ঠিক ২০ ডিগ্রি দেখাইবে না।

কেন না, পারার ঘর্ম্মমানে ডিগ্রি চিহ্ন দিবার সময় আমি এই ০ অঙ্ক ও ১০০ অঙ্ক, উভয়ের মাঝে গলাটাকে ১০০ সমান ভাগে ভাগ করিয়াছি ; সে ভাগ আমার ইচ্ছাধীন। কিন্তু তেল আমার অধীন নহে। পারা আমার অঙ্কিত ২০ দাগে উঠিয়াছে বলিয়া তেলও যে ঠিক সেই দাগে উঠিবে, প্রকৃতির বিধান এমন নহে। উভয়ের প্রসারণ নিয়ম বিভিন্ন ; কাজেই পারার ঘর্ম্মমানের ডিগ্রির সহিত তেলের ঘর্ম্মমানের ডিগ্রির মিল হয় না।

এখন দ্রব্যভেদে যদি ডিগ্রির অঙ্কভেদ হয়, তবে কোন্ দ্রব্য ব্যবহার করিব ? পারাই হউক, আর তেলই হউক, একটাকে মানিয়া লইয়া সর্ব্বত্র তাহার সাহায্যে উষ্ণতা মাপিলে ঠকিতে হইবে না। কিন্তু পারার ঘর্ম্মমানের ৫০ ডিগ্রির উষ্ণতা, তেলের ঘর্ম্মমানের ৫০ ডিগ্রির সমান, কি কম, কি বেশী, তাহা বলা চলিবে না। ঘর্ম্মমান নির্ম্মাণের সময় সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া এক জিনিসেরই ব্যবহার করিতে হইবে, উহা পারাই হউক, আর তেলই হউক, আর অন্য কোন পদার্থই হউক।

পারায় নানা সুবিধা আছে। থাকিলেও উহার প্রধান অসুবিধা এই যে, কিছু ঠাণ্ডা হইলেই পারা জমিয়া কঠিন হয়, আর কিছু গরম হইলে অনিল হয়। তখন আর পারা দ্বারা ঘর্ম্মমানের কাজ চলে না।

কাজেই মোটা কাজ পারার ঘর্ম্মমানে চলিতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম কাজ চলে না ; খুব ঠাণ্ডা বা খুব গরমের মাপেও চলে না। তখন এমন কোন জিনিসে ঘর্ম্মমান তৈয়ার করিতে হয়, যাহা ঠাণ্ডায় অথবা গরমে বিকৃত হয় না।

বায়ু অনিল পদার্থ ; বায়ু ঠাণ্ডায় সহজে জমে না ; আর গরমেও অনিলই থাকে। তাই পারার পরিবর্ত্তে বোতলে বায়ু পুরিয়া বায়ুর ঘর্ম্মমান তৈয়ার হয়। বায়ুকে আটকাইয়া রাখিতে অন্য জিনিসের চাপ দিতে হয় এবং সেই চাপটা আবার কোন ক্রমে সমান রাখিতে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, চাপ বাড়িলে বায়ুর আয়তন কমে, চাপ কমিলে আয়তন বাড়ে ; উষ্ণতা-বৃদ্ধিতে বায়ুর আয়তন বাড়ে। বায়ুর আয়তনের বৃদ্ধি দেখিয়া যেখানে উষ্ণতা কত বাড়িল বুঝিতে হইবে, সেখানে চাপ সমান রাখা চাই, নতুবা চাপেও যদি পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে আয়তনের বৃদ্ধি কি কারণে হইল, তাহা ধরা কঠিন হয়।

বায়ুর আর একটা সুবিধা আছে। বায়ু অনিল পদার্থ ; আর যাবতীয় অনিল পদার্থের প্রসারণের হার সমান।

বরফজলে যে বায়ুটার আয়তন ২৭৩ ঘন ইঞ্চি, ফুটন্ত জলে সেই বায়ুর আয়তন ৩৭৩ ঘন ইঞ্চি। বরফজলের অঙ্কে ০ ও ফুটন্ত জলের অঙ্কে ১০০ চিহ্ন দিয়া মাঝের স্থানটা ১০০ ভাগে ভাগ করিলে বায়ুর ঘর্ম্মমানের অঙ্কপাত হইবে। এই ঘর্ম্মমানে বায়ু এক এক দাগে উঠিলে উষ্ণতা এক এক ডিগ্রি বাড়িল, এইরূপ ধরা যাইবে।

সকল অনিলের প্রসারণমাত্রা সমান। তাহার ফল এই যে, বায়ুর ঘর্ম্মমানে যে উষ্ণতা ১০ ডিগ্রি, হাইড্রোজনের ঘর্ম্মমানেও তাহা ১০ ডিগ্রি। তরলে তরলে, তেলে জলে পারায় যে অমিল ছিল, অনিলে অনিলে সে অমিল থাকে না।

বৈজ্ঞানিকদের সূক্ষ্ম পরিমাণকর্ম্মে বায়ুর ঘর্ম্মমানই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উহা ব্যবহারে নানা অসুবিধা। যেখানে পারার ঘর্ম্মমান ব্যবহার করিতে হয়, সেখানে পারার ঘর্ম্মমানের কোন্ ডিগ্রি বায়ু-ঘর্ম্মমানের কোন্ ডিগ্রির সমতুল্য, তাহা পূর্ব্বে মিলাইয়া রাখিলে আর সে অসুবিধা থাকে না।

বৈজ্ঞানিকেরা পরিমাণকর্ম্মে কত ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাব করিয়া চলেন, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ উষ্ণতাপরিমাণের সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম নতুবা পাঠককে বিরক্ত করিতাম না।

তাপমান

এই পর্য্যন্ত গেল উষ্ণতা মাপিবার কথা। তার পরে বুঝিতে হইবে উত্তাপ মাপিবার কথা। উষ্ণতা কি, তাহা মোটামুটি বুঝা হইয়াছে, কিন্তু উত্তাপটা কি, তাহা এখনও বুঝান হয় নাই। বুঝান না হউক, তাহাতে পরিমাণ-কর্ম্ম আটকাইবে না। বিজ্ঞানবিদ্যার এই একটা রহস্য যে, যে পদার্থটা মাপিতে চাহিতেছি, তাহা কি পদার্থ, তাহা ঠিক না জানিয়াও তাহার মাপ চলে, তাহাকে কাজে লাগান চলে, তাহাকে আমাদের হিতকল্পে নিয়োগ করা চলে। তাড়িত নামক অদ্ভুত পদার্থটা যে কি, তাহা আজও ঠিক হয় নাই, অথচ উহার ব্যবহার এত সূক্ষ্মভাবে জানা গিয়াছে যে, উহার মত আজ্ঞাকারী সেবক আর কেহ নাই।

উত্তাপের স্বরূপ কি, তাহা না জানিয়াও আমরা উত্তাপের পরিমাণ করিতে পারি। উত্তাপের ফল উষ্ণতা বৃদ্ধি। কোন জিনিসে উত্তাপ প্রবেশ করিলে তাহার উষ্ণতা বাড়ে, আর উত্তাপ যে জিনিস হইতে বাহির হইয়া

আসে, তাহার উষ্ণতা কমে। মনে কর, এক সের তেলে খানিকটা উত্তাপ প্রবেশ করায় উহার উষ্ণতা ১০ ডিগ্রি বাড়িল। আর এক সের তেলে ঠিক ততটা উত্তাপ দিলে, ঠিক ততটা উষ্ণতা বাড়িবে। অর্থাৎ দশ ডিগ্রি গরম করিতে এক সের তেলে যতটা উত্তাপ লাগিবে, দুই সেরে তাহার দ্বিগুণ লাগিবে, তিন সেরে তার তিনগুণ লাগিবে। কাজেই এক সের তেলকে দশ ডিগ্রি গরম করিতে যে উত্তাপ লাগে, তাহাকে তাপের এক মাত্রা ধরিলে দুই সেরকে দশ ডিগ্রি গরম করিতে দুই মাত্রা, তিন সেরকে দশ ডিগ্রি গরম করিতে তিন মাত্রা, এইরূপে উত্তাপের মাত্রা নিরূপণ চলিবে।

এখন জিজ্ঞাস্য, এক সের পারাকে ০ হইতে ১০ ডিগ্রি তুলিতে যে তাপ লাগে, ১০ হইতে ২০ ডিগ্রি তুলিতে সেই তাপ লাগিবে কি না? উষ্ণতার বৃদ্ধি সমান হইল; তাপের বৃদ্ধি সমান হইবে কি না? উত্তর—হইতে পারে, না হইতেও পারে। এখানে পারার ঘর্ম্মমান ব্যবহার করিতেছি। পারার ঘর্ম্মমানে প্রসারণ দেখিয়াই উষ্ণতার পরিমাণ হয়। ঘর্ম্মমানের গলায় আঁক কাটিয়া গলাটাকে ১০০ সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছি। কাজেই ০ অঙ্ক হইতে ১০ অঙ্ক পর্য্যন্ত যে প্রসারণ, ১০ অঙ্ক হইতে ২০ অঙ্ক পর্য্যন্ত ঠিক সেই প্রসারণ। আর প্রসারণ যেখানে সমান, উষ্ণতাও সেখানে সমান পরিমাণে বাড়িয়াছে। কিন্তু যতটা তাপে পারা ০ অঙ্ক ছাড়িয়া ১০ অঙ্কে উঠিয়াছে, ঠিক সেই তাপেই যে ১০ অঙ্ক ছাড়িয়া ২০ অঙ্ক পর্য্যন্ত উঠিবে, তাহার কোন হেতু নাই।

এক সের জলকে ০ হইতে ১ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তুলিতে যে উত্তাপ লাগে, তাহাকেই উত্তাপের এক মাত্রা বলিয়া ধরা হয়। এক সের বরফজল লও; উহার উষ্ণতা ০ ডিগ্রি। এক সের তামা লও; মনে কর, উহা ফুটন্ত জলের মত উষ্ণ, অর্থাৎ উহার উষ্ণতা ১০০ ডিগ্রি। তপ্ত তামাকে ঐ ঠাণ্ডা জলে ফেলিয়া দাও, দেখিবে—কিছু ক্ষণ পরে দুইয়েরই উষ্ণতা সমান হইয়াছে; জল একটু গরম হইয়াছে, তামা একটু ঠাণ্ডা হইয়াছে। খানিকটা উত্তাপ তামা হইতে বাহির হইয়া জলে প্রবেশ করায় তামা ঠাণ্ডা হইয়াছে।

জল গরম হইয়াছে এবং পরিশেষে জল ও তামা উভয়ের উষ্ণতা সমান দাঁড়াইয়াছে। এরূপ স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, জলের উষ্ণতা বাড়ে যৎসামান্য—তামার উষ্ণতা কমে তার চেয়ে অনেক বেশী।

অর্থাৎ যে তাপ বাহির হওয়ায় তামার উষ্ণতা ১০০ ডিগ্রি হইতে ০ ডিগ্রিতে নামিয়া পড়িল, সেই তাপে এক সের জলের উষ্ণতা ততটা বাড়িল না। তার চেয়ে অল্প বাড়িল। ইহাতে কি বুঝায়? একই তাপে ভিন্ন ভিন্ন জিনিসে ভিন্ন ভিন্ন উষ্ণতা বাড়ায়। যে তাপে জল অতি সামান্য গরম করে, সেই তাপে তামা, লোহা, সোনা, রূপা প্রভৃতিকে তার চেয়ে অনেক বেশী গরম করে। কোন্ জিনিসকে কত গরম করে, তাহা বিনা পরীক্ষায় জানিবার উপায় নাই।

ফলে পদার্থবিদ্যার ভাষায় উত্তাপ আর উষ্ণতা যে একই পদার্থ নহে, তা বুঝা গেল। উষ্ণতা তাপের একটা লক্ষণ মাত্র, উহা তাপ নহে। তাপ প্রবেশে উষ্ণতা বাড়ে, কিন্তু দ্রব্যভেদে কম বেশী বাড়ে। রূপা, সোনা অল্প তাপেই অধিক উষ্ণ হয়; তাহার তুলনায় জলে অধিক তাপ না দিলে তেমন উষ্ণ হয় না।

কাজেই উষ্ণতা মাপিবার রীতি ও তাপ মাপিবার রীতি স্বতন্ত্র। তাপের সহিত উষ্ণতার সম্পর্ক আছে; কিন্তু তাপ আর উষ্ণতা এক নহে। কাজেই বিজ্ঞানশাস্ত্রে যাহাকে তাপ বলে, কেবল স্পর্শক্রিয়ার সাহায্যে তাহাকে জানিবার উপায় থাকে না। স্পর্শক্রিয়া উষ্ণতার বৃদ্ধি ধরিতে পারে, তাহাও সকল সময়ে ঠিক ধরে না, কিন্তু তাপ অধিক লাগিল, কি অল্প লাগিল, তাহা স্পর্শক্রিয়া বলিতে পারে না।

কোন্ দ্রব্যে কত তাপ আছে, তাহা বলিবার উপায় নাই। যতই শীতল হউক না, বরফের চেয়েও শীতল হউক না, তাহাতেও কিছু না কিছু তাপ আছে। তাপহীন অবস্থায় কোন দ্রব্যকেই এখনও লইয়া যাইতে পারা যায় নাই। কাজেই কিসে কত তাপ বিদ্যমান, তাহা পরিমাণের উপায় অদ্যাপি বাহির হয় নাই। তবে কোন দ্রব্যে যদি তাপ প্রবেশ করে বা তাহা হইতে খানিকটা তাপ বাহির হইয়া যায়, তখন এই তাপের বৃদ্ধি বা হ্রাস পরিমাণ করা চলিতে পারে।

তাপের ধর্ম্ম

তাপ আর উষ্ণতা এক নহে, তাহা দেখা গেল। তাপ এমন একটা কিছু—যাহার ফলে উষ্ণতা বাড়ে। আর উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কঠিন, তরল, অনিল, যাবতীয় পদার্থেরই প্রসার ঘটে। এই নিয়মটার দুই এক

স্থলে ব্যভিচার আছে। একটা ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত—জল। বরফের মত ঠাণ্ডা জল গরম হইলে প্রসারিত না হইয়া বরং একটু সঙ্কুচিত হয়। ০ ডিগ্রি হইতে ৪ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিতে একটু সঙ্কুচিত হয়। তাহার পরে আবার ক্রমশঃ প্রসারিত হইতে থাকে; কাজেই জল সাধারণ নিয়মের বাহিরে।

তাপের আর একটা ফল দশান্তর-প্রাপ্তি। কঠিন পদার্থ তাপ পাইয়া তরল হয়, আর তরল পদার্থ তাপ পাইয়া অনিল হয়। বরফ তাপ পাইয়া জল হয়, আর জল তাপ পাইয়া বাষ্প হয়। এইরূপ অন্যান্য জিনিসের পক্ষেও। যে-কোন অনিলকে ঠাণ্ডা করিলে তরল হয়, আর তরলকে ঠাণ্ডা করিলে কঠিন হয়। ইহার সর্ব্বজনবিদিত দৃষ্টান্ত এত আছে যে, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কঠিন দ্রব্য তরল হইবার সময় খানিকটা তাপ লুপ্ত হয়। এক সের বরফকে জল করিতে হইলে অনেকটা তাপের দরকার হয়; যে তাপে অন্ততঃ দুই মণ জল এক ডিগ্রি গরম হইত, ততটা তাপে এক সের মাত্র বরফ জল হয়, অথচ সেই জলের উষ্ণতা বরফের উষ্ণতার সমানই থাকে। তাপ প্রবেশের স্পষ্ট ও মুখ্য ফল যে উষ্ণতাবৃদ্ধি, তাহা এখানে দেখা যায় না। তাপটা যেন কোথায় লুকাইয়া যায়; উহা উষ্ণতা না বাড়াইয়া কঠিন বরফকে তরল জলে পরিণত করে মাত্র। এ ক্ষেত্রে তাপটা বস্তুতই লুপ্ত হয়।

বরফটা একবার জল হইলে পর, তার পর যত তাপ দাও, ততই ক্রমশঃ তাহার উষ্ণতা বাড়িতে থাকে। ১০০ ডিগ্রিতে পৌঁছিবা মাত্র জল ফুটিতে থাকে। প্রথমে ছোট ছোট, পরে বড় বড় বাষ্পের বুদ্বুদগুলি জল ভেদ করিয়া উঠে ও উপরিস্থ বায়ুসাগরে মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। ক্রমে সমস্ত জলটা বাষ্পে পরিণত হইয়া বায়ুতে মিলিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। তরল জল অনিলে পরিণত হয়। অনিল হইবার সমকালেও খানিকটা তাপ লুপ্ত হয়; সেও অল্প নহে। এক সের জলকে বাষ্প করিতে যে তাপ লাগে, তাহাতে ১৩৷৷. মণ জল এক ডিগ্রি গরম হইতে পারিত; বাষ্পীভবনে এতটা তাপ লাগে, অথচ উষ্ণতা বাড়ে না; ঘর্ম্মমানে দেখা যায়, ফুটন্ত জলেরও যে উষ্ণতা, তদুদ্ভূত বাষ্পের সেই উষ্ণতা। এখানেও খানিকটা তাপের বস্তুতই লোপাপত্তি ঘটে। তার পর সেই বাষ্পে আরও তাপ দিলে, তখন উহার উষ্ণতা ক্রমে বাড়িয়া যায়।

১০০ ডিগ্রি উষ্ণতায় জল ফুটিতে থাকে। কিন্তু এইখানে একটু গোল আছে। উপরে বাতাসের চাপের সহিত এই জলের ফোটার একটু সম্পর্ক আছে। বাতাসের চাপ বাড়াইলে জল ১০০ ডিগ্রিতে ফুটে না, ১০০ ডিগ্রি ছাড়াইয়া একটু উঠিয়া তবে ফুটিতে আরম্ভ করে। চাপ কমাইলে ১০০ ডিগ্রিতে উঠিবার আগেই ফুটিতে আরম্ভ করে।

উঁচু পাহাড়ের উপর বাতাসের চাপ অল্প। সেখানে জল ১০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত গরম হয় না, তাহার চেয়ে একটু অল্প গরমিতেই জল ফুটিতে থাকে।

জলের হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া, জল গরম করিলে, হাঁড়ির ভিতরে যে বায়ু ছিল, তাহাতে আরও খানিকটা বাষ্প মিলিয়া যায়, তজ্জন্য চাপ বাড়িয়া যায়; তখন জল ১০০ ডিগ্রি ছাড়াইয়া উঠে; জলকে ফুটিতে দেয় না। গরম জলে খাদ্য দ্রব্য সিদ্ধ হয়; জল যত গরম, সিদ্ধ করিতে তত অল্প সময় লাগে। হাঁড়ির মুখ বন্ধ রাখিলে রন্ধনকর্ম্মে এই জন্য সুবিধা হয়।

বাষ্প

জল ফুটিবার সময় বাষ্প হয়। ফুটিবার সময় বড় বড় বাষ্পের বুদ্বুদ্ টগবগ শব্দ করিয়া জল ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু জল যে কেবল ফুটিবার সময়েই বাষ্প হয়, এমন নহে। জল সকল সময়েই বাষ্প হইয়া যায়। খুব ঠাণ্ডা জলের পিঠ হইতেও নিঃশব্দে বাষ্প উঠিয়া থাকে। নিঃশব্দে উঠিতেছে বলিয়া আমরা তাহার খোঁজ রাখি না। ফুটিবার সময় শব্দ করিয়া, জলকে তোলপাড় করিয়া বাষ্প উদ্গত হয়, তাহাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুষ্করিণীর জল সারা বৎসর নিঃশব্দে শুকাইতেছে। ভিজা কাপড় ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া যায়। ইহাতেই বুঝা উচিত যে, জল যেমন উষ্ণই হউক না কেন, সর্ব্বদাই উহা বাষ্প হইতেছে। সেই বাষ্প বায়ুসাগরে মিলিতেছে।

জলোদ্গত এই বাষ্পের চাপের একটা অবধি আছে; বাষ্প সেই অবধির অধিক চাপ দিতে পারে না। উষ্ণতাভেদে এই অবধিরই আবার ভিন্ন ভিন্ন ভেদ হয়। গরম জলেও বাষ্প উঠে, ঠাণ্ডা জলেও বাষ্প উঠে। গরম জলের বাষ্প গরম, ঠাণ্ডা জলের বাষ্প ঠাণ্ডা। গরম বাষ্পের চাপ যে পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, ঠাণ্ডা বাষ্পের চাপ সে পর্য্যন্ত উঠিতে পারে না।

কোন পাত্রের ভিতরে যথেচ্ছ পরিমাণে বাষ্প প্রবেশ করান যাইতে পারে না, যত ইচ্ছা তত বাষ্প উহার মধ্যে ধরান যায় না। বাষ্পের চাপের যে সীমা বা অবধি আছে, সেই অবধিতে পৌঁছিবা মাত্র, আর বাষ্প সে স্থানে ধরিবে না। তখন জল দাও, জলই থাকিবে, বাষ্প দাও, সে বাষ্পও জল হইয়া যাইবে।

পৃথিবীর এই বায়ুসাগরে জলের বাষ্প সকল সময়েই কিছু না কিছু বিদ্যমান আছে। নদী, খাল, বিল, পুষ্করিণীর জলের পিঠ হইতে বাষ্প ত উঠিতেছেই; তা ভিন্ন বিশাল মহাসাগরের পিঠ হইতে অবিশ্রাম বাষ্প উঠিয়া বায়ুপ্রবাহ কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র নীয়মান হইতেছে। আমাদের বাঙ্গলা দেশের দক্ষিণেই মহাসাগর, সেই মহাসাগর হইতে বাষ্প উঠিয়া বাঙ্গলার বায়ুকে সর্ব্বদাই বাষ্পসিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গলার উত্তরে উচ্চ হিমালয়ের প্রাচীর। সেই প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া বাষ্প যাইতে পারে না। এই জন্য হিমালয়ের উত্তরে তিব্বত দেশে ও মধ্য এসিয়াতে বায়ু তেমন বাষ্পসিক্ত নহে।

বাঙ্গলার বায়ু সর্ব্বদাই বাষ্পসিক্ত অর্থাৎ অদৃশ্য বাষ্পে পূর্ণ। বর্ষাকালে সূর্য্যের উত্তাপে প্রচুর বাষ্পের রাশি দক্ষিণা হাওয়ায় মহাসাগর হইতে এত প্রচুর পরিমাণে চলিয়া আসে যে, উহার চাপ অবধি ছাড়াইয়া উঠিতে চায়। কিন্তু বাষ্প যতই থাকুক, উহার চাপ নির্দ্দিষ্ট অবধি ছাড়াইতে পারে না। তখন সেই অতিরিক্ত বাষ্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণিকা হইয়া বায়ুতে ভাসিতে থাকে। ঐ জলকণিকার সমবায়ে মেঘ। জলকণিকা জমাট বাঁধিয়া বৃষ্টি নামে। প্রচুর বৃষ্টি নামে। তাই বঙ্গভূমি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা।

গরম বাষ্পের চাপের যে অবধি, ঠাণ্ডা বাষ্পের অবধি তার চেয়ে অল্প। ইহার ফলে এই ঘটে যে, গরম বাষ্প কোন কারণে হঠাৎ শীতল হইলে আর পূর্ব্বের মত চাপ দিবার ক্ষমতা রাখে না, তখন খানিকটা বাষ্প তরল হইয়া জলে পরিণত হয়। শিশির উৎপত্তির এই কারণ। রাত্রিকালে ভূপৃষ্ঠ শীতল হয়, তাহার সংযোগে বাষ্পও শীতল হয়, যে বাষ্প ছিল, তাহার চাপও অধিক ছিল; ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে চাপ সম্ভবে না। খানিকটা বাষ্প জলবিন্দুর আকারে ভূপৃষ্ঠে লগ্ন হয়।

কুয়াসা উৎপত্তিরও সেই কারণ। বায়ু কোন কারণে শীতল হইলে সেই বায়ুতে স্থিত বাষ্পও শীতল হয় ও তাহার অতিরিক্ত হইলে অংশটা ক্ষুদ্র জলবিন্দুতে পরিণত হয় ও বায়ুমধ্যে ভাসিতে থাকে।

বাষ্প জমিয়া জলবিন্দুতে পরিণত হয় বটে, কিন্তু একটা অবলম্বনের অপেক্ষা করে। বায়ুতে শত সহস্র ধূলিকণা সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। এক একটা ধূলিকণাকে আশ্রয় করিয়া এক একটা জলবিন্দু প্রস্তুত হয়। যত ধূলিকণা, তত জলবিন্দু। ধূলিকণাগুলি অতি ক্ষুদ্র ও প্রায় অদৃশ্য। জলবিন্দুগুলি গণিয়া কতটা বায়ুতে কত ধূলিকণা আছে, তাহা গণিবার একটা উপায় হইয়াছে।

বাষ্প ও অনিল

এ পর্য্যন্ত আমরা জলীয় বাষ্পকে এক রকম অনিল বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছি। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, উহার একটু বিশিষ্টতা আছে। অনিলের আয়তন যত কমান যায়, চাপ তত বাড়ে। আয়তন অর্দ্ধেক করিলে চাপ দুই গুণ, আয়তন দশমাংশ করিলে চাপ দশ গুণ হয়। এইরূপ আয়তন যতই কমাইবে, চাপ ততই বাড়িবে। কিন্তু বাষ্পের চাপের সম্বন্ধে এই কথা খাটে না। বাষ্পকে চাপিলে উহার আয়তন কমে। আবার বাষ্প যে পাত্রে আছে, বাষ্পের সেই পাত্রের আয়তন কমাইলে উহার চাপ বাড়ে, কিন্তু এই চাপ বৃদ্ধির একটা অবধি আছে। সেই অবধিতে পৌঁছিলে আর চাপ বাড়িতে চায় না, তখন চাপ বাড়ে না, খানিকটা বাষ্প জলে পরিণত হয়। আরও আয়তন কমাও, আরও বাষ্প জল হইয়া যাইবে। এইরূপে সমস্ত বাষ্পটাই ক্রমে জলে পরিণত হয়। কিন্তু চাপ সেই অবধি ছাড়াইয়া উঠিতেই পারে না।

কাজেই বায়ুর মত পদার্থের সহিত বাষ্পের মত পদার্থের ঠিক মিল নাই, উভয়কে এক শ্রেণীতে ফেলা উচিত হয় না।

কয়লা পোড়াইয়া যে অনিল হয়, উহার সম্বন্ধে আমরা নানা কথা কহিয়াছি। এই অনিলটার উষ্ণতা যত ক্ষণ ৩১ ডিগ্রির অধিক থাকে, তত ক্ষণ উহার আচরণ বায়ুর মত, অর্থাৎ উহার আয়তন যত কমাইবে, চাপ ততই বাড়িবে। কিন্তু উহার উষ্ণতা ৩১ ডিগ্রির নীচে নামিলে উহার আচরণে বাষ্পের মত হয়। তখন আয়তন কমাইলে চাপ বাড়ে বটে, কিন্তু কিছু দূর বাড়িয়া আর বাড়ে না। তখন উহার কিয়দংশ তরল পদার্থে পরিণত হয়। ৩১ ডিগ্রির উপরে উহার এক রকম দশা; তখন উহার চাপ যতই বাড়ুক, কিছুতেই তারল্য ঘটিবে না। ৩১ ডিগ্রির নীচে উহার

অন্য দশা—তখন চাপ বাড়াইলে তরল হইবে। এই দুই দশার মধ্যে যখন পার্থক্য আছে, তখন দুই অবস্থার দুই রকম নাম দেওয়া ভাল। প্রথম অবস্থাকেই অনিলাবস্থা বলা উচিত। আর দ্বিতীয় অবস্থাকে অনিলাবস্থা না বলিয়া বাষ্পাবস্থা বলা উচিত। যেটা প্রকৃত অনিল, তাহার চাপ যত ইচ্ছা বাড়ান চলিবে, কিন্তু তরলতাপাদন চলিবে না; যাহা বাষ্প, তাহার চাপবৃদ্ধি দ্বারা তরলতাপাদন চলিবে। কয়লার অনিল যত ক্ষণ ৩১ ডিগ্রির উপর থাকে, তত ক্ষণ উহা অনিল, ৩১ ডিগ্রির নীচে আসিলেই উহা বাষ্প।

* * * * *

সম্প্রতি হাইড্রোজন অক্সিজন প্রভৃতি অনিলকে খুব শীতল করিবার উপায় বাহির হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে সেরূপ শৈত্যের উৎপাদন অসাধ্য ছিল। এখন হাইড্রোজন অক্সিজন বায়ু প্রভৃতি সকল জিনিসকে প্রথমে খুব ঠাণ্ডা করিয়া বাষ্পে পরিণত করা হয়; তার পরে কিছু চাপ দিলেই তরল হাইড্রোজন, তরল অক্সিজন, তরল বায়ু পাওয়া যায়। এইরূপ তরল বায়ু আজিকালি সের-দরুনে প্রস্তুত হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত আমরা জড় পদার্থের তিন অবস্থার কথাই বলিয়াছি, এখন হইতে চারি অবস্থা বলা উচিত। কঠিন, তরল, বাষ্পীয় ও অনিল। বাষ্প আর অনিলের মধ্যে ভেদ কেবল উষ্ণতাসাপেক্ষ। একটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতা আছে—তাহার নীচে থাকিলেই উহা বাষ্প, তখন চাপ দ্বারা উহার তরলতা-সম্পাদন সাধ্য থাকে, আর সেই উষ্ণতার উপরে গেলেই চাপ দ্বারা তরলতাপাদন অসাধ্য হয়। তখনই উহাকে প্রকৃত অনিল বলা যায়। অনিলকে যদি তরল করিতে চাও, আগে ঠাণ্ডা করিয়া উহাকে বাষ্পে পরিণত করিতে হইবে, পরে চাপ দিলে সেই বাষ্প তরল হইবে।

মানুষের দশ দশার কথা শোনা যায়। জলের দশ দশা না হউক, অন্ততঃ চারি দশা হইতে পারে দেখিতে পাইতেছি। তাপযোগে জলের এই দশা-বিপর্য্যয় ঘটে।

জলের অবস্থাবিকার

তাপযোগে জলের দশা-বিপর্য্যয়টা এখন আর একবার ভাল করিয়া আলোচনা করা যাইতেছে। তাহা হইলে যাহা অস্পষ্ট আছে, তাহা স্পষ্ট হইবে।

১। যত ক্ষণ উষ্ণতা ০ ডিগ্রির নীচে থাকে, তত ক্ষণ জল কঠিন দশায় থাকে। তাপ দিলে উহা ক্রমে উষ্ণ হইয়া যখন ০ ডিগ্রিতে পৌঁছায়, তখন উহা গলিয়া জল হইতে আরম্ভ করে।

২। বরফ একবার গলিতে আরম্ভ করিলে আর উষ্ণতা বাড়ে না। যত তাপ দাও, সে তাপটা যেন লুপ্ত হইয়া যায়, আর বরফ গলিতে থাকে। এই তাপের পরিমাণ এত অধিক যে, এক সের বরফকে গলাইতে যে তাপের প্রয়োজন হয়, তাহাতে ২।০ মণ জল ১ ডিগ্রি গরম করা চলিত। বরফ গলিলে উহার আয়তন কমে, ১২ ঘন ফুট বরফ হইতে ১১ ঘন ফুট জল হয়। বরফ জল চেয়ে হাল্‌কা, কাজেই উহা জলে ভাসে।

৩। ঐ জলের উষ্ণতা ঠিক বরফের উষ্ণতার সমান অর্থাৎ ০ ডিগ্রি। তার পরে তাপ দিলে ক্রমে উষ্ণতা বাড়ে আর জলের পিঠ হইতে ক্রমাগত বাষ্পোদ্গম হইতে থাকে। ০ হইতে ৪ ডিগ্রি পর্য্যন্ত জলের আয়তন কিঞ্চিৎ কমে, তার পর বাড়িতে আরম্ভ হয়।

৪। ১০০ ডিগ্রি গরম হইতে তখন বড় বড় বাষ্পের বুদ্বুদ জলকে তোলপাড় করিয়া জল ঠেলিয়া বাহির হইতে থাকে ও অচিরে সমস্ত জল বাষ্প হইয়া যায়। এই ব্যাপারের নাম জল ফোটা। জল ফুটিতে আরম্ভ হইলে উহার উষ্ণতা আর বাড়ে না। যে তাপটা দেওয়া যায়, তাহা বাষ্পীকরণেই লুপ্ত হয়। এক সের জলকে বাষ্প করিতে যে তাপ লাগে, তাহাতে ১৩॥ মণ জল এক ডিগ্রি গরম হইতে পারিত। এক ঘন ফুট জল হইতে ১৭০০ ঘন ফুট বাষ্প জন্মে। চাপের ইতরবিশেষে জল ফোটায় বিলম্ব ঘটিতে পারে। চাপ অধিক হইলে ১০০ ডিগ্রি ছাড়িয়া উঠিলে তবে জল ফুটিতে থাকে।

বরফ, জল আর জলের বাষ্প, তিনটাই জলেরই দশাভেদ। আমরা বলি, তিনই জল, অথচ এই তিন অবস্থায় কত পার্থক্য। এই প্রভেদ সত্ত্বেও আমরা তিনটা জিনিসকে একই জলের অবস্থাভেদ বলিয়া থাকি।

তাপের পরিচালন

তাপের ফলাফল কতক বলা গেল, কিন্তু তাপ পদার্থটা কি, তাহা এখনও বুঝান হয় নাই। এখনও তাহার সময় আসে নাই। তাপ যাহাই হউক, উহাকে আটকাইয়া রাখা কঠিন। কোন জিনিস যতই গরম হউক না কেন,

উহা ক্রমে ঠাণ্ডা হয়, উহার উষ্ণতা কমে, তাপ বাহির হইয়া যায়। গরম ভাত, গরম ডাল, গরম জল যদি চিরকাল গরম থাকিত, তাহা হইলে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের পক্ষে নানা ব্যাঘাত ঘটিত। তপ্ত লৌহপিণ্ড বা স্বর্ণপিণ্ডও অচিরে শীতল হয়। ভূপৃষ্ঠ দিনের বেলায় গরম, রাত্রে ঠাণ্ডা হয়। তরল, কঠিন, বাষ্প, অনিল—কোন পদার্থেই আমরা তাপ ধরিয়া আটকাইয়া রাখিতে পারি না।

কিরূপেই বা আটকান যাইবে? লৌহখণ্ডের এক প্রান্ত দীপশিখায় উত্তপ্ত করিলে সেখানকার তাপ লৌহখণ্ডের ভিতর দিয়া চলিয়া অচিরে অপর প্রান্তকে উষ্ণ করিয়া তোলে। যেন নিরেট লৌহদণ্ডের ভিতরও তাপের অবারিত দ্বার। বরং কাচ, কাঠ, কাগজ, তূলা, রেশম, পশম—এই সকল জিনিসের ভিতর দিয়া তাপ চলিতে বিলম্ব করে; কিন্তু ধাতুপদার্থের ভিতর দিয়া অক্লেশে চলে। কোন পদার্থের ভিতর দিয়া তাপের এইরূপ গতিকে পরিচালন বলা যায়। ধাতু দ্রব্য উত্তম পরিচালক, উহা তাপের গতিকে বাধা দেয় না। কাচের পরিচালকতা অল্প। কাচের এক দিক্ গরম হইলেও অপর দিক্ বহু ক্ষণ ঠাণ্ডা থাকিতে পারে।

সম্পূর্ণ অপরিচালক অর্থাৎ তাপকে একবারে আটকাইতে পারে, এমন জিনিস বোধ করি নাই।

বাহিরের তাপ বরফে প্রবেশ করিয়া বরফকে গলাইয়া দেয়। পশমী কম্বল বা কাঠের গুঁড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে বাহিরের তাপ তত শীঘ্র চলিতে পারে না; বরফও শীঘ্র গলে না। শীতকালে আমরা পশমী কাপড় বা তূলার লেপ গায়ে দিয়া শরীরের তাপের বহির্গমন কতকটা নিবারণ করি।

তাপ কোথা হইতে কোথায় যায়? উত্তরে বলিব, উষ্ণ স্থান্ হইতে শীতল স্থানে যায়। একটা গরম জিনিস ও একটা ঠাণ্ডা জিনিস পাশাপাশি রাখিলে, তাপ গরম জিনিস হইতে বাহির হইয়া ঠাণ্ডা জিনিসেই যায়; কাজেই গরম জিনিসটা একটু ঠাণ্ডা হয়, আর ঠাণ্ডা জিনিসটা একটু গরম হয়। পরিশেষে যখন উভয়েই সমান উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাপের চলাচলও থামিয়া যায়।

তাপের স্বভাবই এই। জল যেমন উঁচু জায়গা হইতে নীচেই যায়, আপনা হইতেই ঊর্দ্ধমুখে যায় না, তাপও সেইরূপ কখনও আপনা হইতে

ঠাণ্ডা জায়গা হইতে গরম জায়গায় যায় না। গরম জায়গা হইতে ঠাণ্ডা জায়গার দিকেই যায়। ইহাই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা।

যদি অন্যরূপ ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে কি সুখের হইত! জলও যদি আপনা হইতে ঊর্দ্ধে উঠিবার ক্ষমতা রাখিত, তাহা হইলে জল তুলিবার জন্য মজুর লাগাইতে হইত না; বৃষ্টিপাত না হইলেও জমি সেচিবার জন্য ভাবিতে হইত না। ইচ্ছামাত্রেই বঙ্গসাগরের জলে বঙ্গভূমিকে ডুবাইয়া দেওয়া চলিত। অনাবৃষ্টির ভয় থাকিত না। সেইরূপ তাপের পক্ষেও উল্টা ব্যবস্থা হইলে, একখানা বরফের গায়ে টিকা বসাইয়া, সেই টিকা ধরাইয়া তামাক খাওয়া চলিত। বরফের তাপ টিকায় সঞ্চালিত হইয়া টিকায় আগুন ধরাইত। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় টিকা ধরাইতে হইলে, উহা ঠাণ্ডা বরফে না ধরিয়া তপ্ত দীপশিখাতেই ধরিতে হয়।

এঞ্জিন চালাইতে হইলে কয়লা পোড়াইয়া তাপের উৎপাদন করিতে হয়, এবং সেই তপ্ত কয়লার তাপে জল গরম করা হয়। তপ্ত কয়লার তাপেই লোকে জল গরম করিয়া ভাত রাঁধে, বরফের তাপে জল গরম হয় না।

যাক, তাপ স্বভাবতঃ উষ্ণ স্থান হইতে শীতল স্থানে যায়; কোন পদার্থের নিষেধ মানে না। দ্রুতই হউক আর বিলম্বেই হউক, নিরেট কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়াও তাপ পরিচালিত হয়। তরল বা অনিলের ভিতর দিয়াও তাপ পরিচালিত না হয় এমন নহে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আবার একটা নূতন উৎপাত ঘটে, তরল দ্রব্যের ভিতর তাপ আসিবা মাত্র উহা একটু গরম হয়, গরম হইলেই একটু প্রসারিত হয়, প্রসারিত হইলেই হাল্‌কা হয়, হাল্‌কা হইলেই ঊর্দ্ধে উঠিতে চাহে। একপাত্র জলের নিম্নে তাপ দিলে, নিম্ন স্তরের জল উষ্ণ হয় ও লঘু হয়, লঘু হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয় ও উপরের স্তরের শীতল ও গুরু জল স্বস্থানচ্যুত হইয়া নীচে নামিতে বাধ্য হয়; সেও আবার গরম হইয়া উপরে উঠে। এইরূপে জলের মধ্যে একটা জলের প্রবাহ বা স্রোত জন্মে, এবং সেই স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে তাপও সমস্ত জলে ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত জলটাকে অতি শীঘ্র গরম করিয়া তোলে।

তরল পদার্থের যেমন স্রোত জন্মে, অনিলেও তেমনই। গ্রীষ্মকালে তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সংলগ্ন বায়ুস্তর গরম হইয়া প্রসারিত হয় ও হাল্‌কা হয়, হাল্‌কা হইয়া ঊর্দ্ধে উঠে। কেরোসিন দীপের চিমনির উপরে বা দীপশিখার উপরে সূতা ধরিলেই দেখা যাইবে, সেখানে ঊর্দ্ধমুখে বায়ুর স্রোত উঠিতেছে।

ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানে এইরূপ তপ্ত ভূমি হইতে উর্দ্ধমুখে বায়ুপ্রবাহ উঠিতে লাগিলে, উহার চতুঃপার্শ্বস্থ শীতল বায়ু উহার স্থান অধিকার করিতে আইসে। এইরূপে বায়ুপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। এইরূপ বায়ুপ্রবাহই মন্দবেগে বহিলে হয় হাওয়া, আর প্রবল বেগে বহিলেই হয় ঝড়।

পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের নিকট প্রদেশটা খুব গরম; সেখানে বায়ুপ্রবাহ উর্দ্ধমুখ, তাই উত্তর ও দক্ষিণ হইতে নিরক্ষবৃত্তের অভিমুখে সারা বৎসর বায়ু বহে। এই হাওয়া ধরিয়া মহাসাগরে পাল-তোলা জাহাজের যাতায়াতে সুবিধা ঘটে। গ্রীষ্মকালে আমাদের বাঙ্গলার জমি উত্তপ্ত হওয়ায় দক্ষিণের সমুদ্র হইতে বায়ুর প্রবাহ আসিতে আরম্ভ হয়। সেই বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রের বাষ্প বহিয়া আনে; গ্রীষ্মের পরেই বর্ষা উপস্থিত হয়।

আগেই বলিয়াছি, তাপ কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া পরিচালিত হয়, কঠিন পদার্থে কিন্তু স্রোত জন্মিতে পারে না। কিন্তু তরল বা অনিলের ভিতর তাপ যাইবার সময় উহাতে স্রোত জন্মাইয়া যায়। ফলে কঠিন, তরল, অনিল, তাপকে আটকাইবে কি, তাপ উহাদিগের মধ্য দিয়াই চলে। তাপ উহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই চলে।

আপাততঃ মনে হইতে পারে, যেখানে কঠিন, তরল, অনিল, কোন পদার্থই নাই, যে স্থান একেবারে শূন্য, সেই স্থান দিয়া বুঝি তাপ চলিবে না; কেন না, তাপ যে আশ্রয় ধরিয়া চলিবে, সেই আশ্রয় যেখানে নাই, সেখানে তাপ চলিবে কিরূপে? কিন্তু তাহা ত ঠিক নহে। কোন পাত্রের অভ্যন্তর বায়ুশূন্য করিয়া তন্মধ্যে তপ্ত দ্রব্য রাখিলে দেখা যাইবে যে, সেই তপ্ত দ্রব্য হইতে তাপ শূন্যপথেই বাহির হইতেছে। ওরূপ পরীক্ষাতেই বা দরকার কি? এই সূর্য্য আর পৃথিবীর মধ্যে ব্যবধান নয় কোটি মাইলেরও অধিক। এই সমস্ত ব্যবধানটা ত একেবারে শূন্য। ভূপৃষ্ঠের উপরে যে বায়ুর আবরণ আছে, উহার স্থূলতা ৪০।৫০ মাইলের বড় অধিক নহে। ৫০।৬০ মাইলের পরেও যদি বায়ু থাকে, সে এত বিরল যে, থাকা না থাকা সমান। ফলে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে নয় কোটি মাইল পথ শূন্যপথ, সেখানে তাপ চালাইতে পারে, এমন কোন পদার্থই নাই। অথচ ঐ সূর্য্যের তাপ ত এই মহাশূন্য অতিক্রম করিয়া পৃথিবীতে আসিতেছে? সেই মহাশূন্য পথে কঠিন, তরল, অনিল, সকল পদার্থেরই অভাব; তবে কি আশ্রয় করিয়া তাপ আসিতেছে? তাপও আসে, আলোকও আসে, তাপ কি তবে আলোকের মূর্ত্তি ধরিয়া

আসে ? এ প্রশ্নের উত্তরের এখনও সময় আসে নাই। যথাসময়ে উত্তরের চেষ্টা করা যাইবে, এখন ধরিয়া রাখা আবশ্যক, তাপকে আটকান যায় না। উহা যে-কোন পদার্থের আশ্রয় ধরিয়া চলিতে পারে ; কোন আশ্রয় না পাইলেও কোন-না-কোনরূপে হয়ত মূর্ত্ত্যন্তর পরিগ্রহ করিয়া চলিয়া আসে।

তাপের স্বরূপ

তাপের স্বরূপ কি, আলোচনা না করিয়া আর থাকা যায় না। তাপ উষ্ণতা বাড়ায় ; পদার্থের প্রসার বৃদ্ধি করে, অবস্থার পরিবর্ত্তন করে, বাষ্পাবহ ও অনিলাবহ পদার্থের চাপ বাড়ায় এবং যৌগিক পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করিয়া অন্যান্য মূলপদার্থে পরিণত করে। কোন জিনিসই তাপের সঞ্চালনে বাধা দিতে পারে না ; বরং ধাতুর মত নিরেট কঠিন জিনিস, উহার সঞ্চালনে সহায় হয়। এই তাপ কি পদার্থ ? বলা বাহুল্য, তাপ কঠিন, তরল বা অনিল পদার্থ নহে ; তবে কঠিন, তরল, অনিল পদার্থ মাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে তাপ বিদ্যমান আছে।

শত বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন, উহা এক রকমের অতি সূক্ষ্ম জড় পদার্থ। উহা এত সূক্ষ্ম যে, পদার্থ মাত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশে সমর্থ। এই অনুমানে একটা আপত্তি উঠে। ঠাণ্ডা জিনিসকে যতই উষ্ণ কর, উহার ভার বাড়ে না। তাপের ওজন নাই, অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত কোন নিক্তিতে তাপের ভার ধরা যায় নাই। এ আপত্তিটা কোন কাজের নহে। মনে করিলেই হইল, এই সূক্ষ্ম পদার্থ টা ভারহীন। উহার বস্তু থাকিতে পারে, কিন্তু বস্তু থাকিলেই যে ভার থাকিবে, তাহার মানে কি ? একই বস্তুর ভার স্থানভেদে দেশভেদে কম-বেশী হইয়া থাকে। একবারে ভার নাই, এ রকম জিনিস থাকিতে পারে না, কে বলিল ? বলিবে—নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ ত সকল পদার্থে ই খাটে, মাধ্যাকর্ষণ থাকিলেই ভারও থাকিবে। কিন্তু উত্তরে বলিব যে, মাধ্যাকর্ষণ—কঠিন, তরল, বাষ্পীয়, অনিল, এ সকল অবস্থাতেই খাটে ; ঐ সকল স্থানে খাটিতে দেখা যায়, তাই খাটে। এমন জিনিস যদি কিছু থাকে, যাহাতে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম খাটে না, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কাজেই ভারহীন জড় পদার্থ থাকিতে পারে না, এ কথা চলিবে না। যাঁহারা তাপকে জড় পদার্থ বলিতেন, তাঁহারা জোরের সহিতই বলিতেন, এই ত একরকম জড় পদার্থ রহিয়াছে, ইহা গতায়াত

করিতে পারে, কিন্তু ইহার ভার নাই। ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণে স্পষ্ট, আপত্তি মানিব কেন? ভার নাই, অতএব তাপ জড় পদার্থ নহে, এরূপ আপত্তি টিকিবে না। বস্তুতই সে যুক্তি খাটিবে না।

এখন অন্য যুক্তির সন্ধান করা যাউক। কাউণ্ট রম্ফোর্ড নামক এক জন বিখ্যাত লোক শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রমাণ করেন, যথেচ্ছ পরিমাণে আমরা তাপের সৃষ্টি করিতে পারি। তার কিছু দিন পরে সার্ হাম্ফ্রী ডেভী আর এক জন বিখ্যাত লোক পরীক্ষা করিয়া দেখান, দুইখানা বরফ পরস্পর ঘর্ষণে এত তাপ জন্মে যে, বরফ দুইখানা গলিয়া যায়। পরীক্ষাটা এরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল যে, বাহির হইতে তাপ আসিয়া বরফ গলাইবার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না। বাহির হইতে তাপ আসিতেছে না, ভিতরেও কোথাও তাপ যাতায়াতের প্রমাণ পাওয়া গেল না, অথচ বরফ গলিয়া গেল; বরফ গলাইতে যে প্রচুর তাপের আবশ্যক হয়, সে তাপ কোথা হইতে আসিল? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এখানে তাপের সৃষ্টি হইয়াছে; তাপ পূর্ব্বে ছিল না, নূতন আবির্ভূত হইয়াছে।

এখন সেই দার্শনিক তত্ত্ব; অভাব হইতে ভাব পদার্থ আসিতে পারে না। যাহা ছিল না, তাহা আসিল, ইহা অসম্ভব! অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, তাপ জড় পদার্থ নহে।

বস্তুত লাবোয়াশিয়ার তৎপূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন যে, জড় পদার্থের সৃষ্টিও নাই, ধ্বংসও নাই। তাপের যখন সৃষ্টি দেখিতেছি, তখন উহা জড় নহে। কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে, লাবোয়াশিয়ারের প্রমাণের দৌড় কত? তিনি সাধারণ, কঠিন, তরল ও অনিল পদার্থেরই সৃষ্টি নাই, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, আর তাহাও তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন নিক্তির ওজনে। নিক্তির ওজনে কঠিন, তরল ও অনিলাবস্থ পদার্থের ভার বাড়ে না, ইহাই তিনি দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাপকে যখন কঠিন, তরল, অনিল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ বলিতেছি এবং ইহাকে যখন ভারহীন জড় পদার্থ বলিয়াই ধরিতেছি, তখন লাবোয়াশিয়ারের নিক্তির ওজনের প্রমাণ এখানে মানিব কেন?

বলিতে পার, তাপের ভার না থাকিলেও বস্তু থাকিবে ত? ভার হ্রাসবৃদ্ধিহীন, কিন্তু বস্তু ক্ষয়বৃদ্ধিহীন। তাপের ভার না থাকিতে পারে, কিন্তু উহার বস্তু আছে কি না, তাহা দেখিলেই ত চলিবে। তাপে যদি

বস্তু না থাকে, তবে উহা জড় পদার্থ নহে, আর যদি বস্তু থাকে, তাহা হইলে উহাকে জড় পদার্থ বলিতেই হইবে। কেন না, এই বস্তুতেই জড়ের জড়ত্ব।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—তাপের বস্তু আছে কি না? ভার না থাকিলেও বস্তু থাকিতে পারে, ভার না মাপিয়াও বস্তুর পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা চলে, তাপের বস্তু আছে কি? দেখা গিয়াছে, তাপের বস্তু পর্য্যন্ত নাই; তাপের ভার নাই, বস্তুও নাই। বস্তুতেই যখন জড়ত্ব বলিয়াছি, তখন যাহার বস্তু নাই, তাহাকে জড় বলিব কিরূপে? অতএব তাপকে জড় পদার্থ বলিতে পারি না।

তবে তাপের স্বরূপ কি? তাপের ভারও নাই, বস্তুও নাই, অথচ দেশব্যাপকতা আছে; তাপ খানিকটা দেশ অধিকার করিয়া থাকে এবং এক দেশ হইতে অন্য দেশে চলিতে পারে। সাধারণতঃ তাপ জড় পদার্থের আশ্রয় লইয়াই থাকে। এবং জড় পদার্থের আশ্রয়েই যাতায়াত করে; কিন্তু জড় পদার্থের আশ্রয় না পাইলেও ইহা শূন্যপথে কোনরূপে চলিতেও সমর্থ। নতুবা সূর্য্যের তাপ পৃথিবীতে আসে কিরূপে? আবার কঠিন, তরল, অনিল, কোন জড় পদার্থের সৃষ্টিও নাই, ধ্বংসও নাই। কিন্তু তাপের সৃষ্টি আছে। যত ইচ্ছা, তাপ আমরা জন্মাইতে পারি।

এই তাপের স্বরূপ কি বলিব? বিজ্ঞানবিদ্যা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তজ্জন্য বিজ্ঞানবিদ্যাকে জড় পদার্থ হইতে ভিন্ন, জড় পদার্থ হইতে অতিরিক্ত আর একটি পদার্থের কল্পনা করিতে হইয়াছে। সেই পদার্থের নাম দিয়াছেন শক্তি। এই শক্তি পদার্থ কি, বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

শক্তি ও তাপ

কামার সবেগে নেহাইএর উপর হাতুড়ির ঘা দিল। আঘাতের অব্যবহিত পূর্ব্বে নেহাইএর প্রচণ্ড যানশক্তি ছিল। উহার যখন বেগও ছিল, ঝোঁকও ছিল, তখন যানশক্তি ছিল বৈ কি? কিন্তু আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে উহার স্থিরত্বপ্রাপ্তি, তবে ঐ যানশক্তি গেল কোথায়?

এবার ত বলা চলিবে না যে, উহা স্থানশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে? ঊর্দ্ধে উঠিবার সময় স্থানশক্তি বাড়ে, কিন্তু নীচে নামিবার সময় ত স্থানশক্তি কমে বৈ বাড়ে না। হাতুড়ি ত ঊর্দ্ধে উঠে নাই, উহা নীচে নামিয়া নেহাইএর উপর পতিত হইয়াছে। উহার যানশক্তি গেল কোথায়? এবার

ত উহার যানশক্তির ধ্বংস হইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় ত এবারও একটা কল্পনার আশ্রয় লইতে পারিতেন ; কিন্তু তাহা লইতে হয় না। এ ক্ষেত্রে যানশক্তির ধ্বংস হয় বটে, কিন্তু একটা নূতন পদার্থের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ-গোচর হয়। নেহাইটা গরম হইয়া উঠে। খানিকটা তাপের আবির্ভাব হয়, এই তাপ পূর্ব্বে ছিল না, ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে, যানশক্তির তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা তাপের আবির্ভাব হইয়াছে।

একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম, এরূপ সহস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। আঘাতের ফলে তাপোদ্ভব প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, চক্‌মকি উত্তম দৃষ্টান্ত।

যানশক্তির তিরোভাবের সঙ্গে তাপের আবির্ভাব ঘটে ; পরীক্ষার দ্বারা দেখা যায়, যানশক্তির তিরোভাব যত অধিক হয়, তাপের আবির্ভাবও তত অধিক হয়। ইংরাজ বৈজ্ঞানিক জুল মাপিয়া দেখেন, এক সের জিনিসের পৌনে সাত-শ ফুট অধঃপতনে যে যানশক্তির উদ্ভব হয়, তাহার তিরোধানে যে তাপ জন্মে, তাহাতে এক সের জল এক ডিগ্রি গরম হইতে পারে।

তাপের সঙ্গে শক্তির এই সম্পর্ক আবিষ্কৃত হইবা মাত্র তাপের স্বরূপ সম্বন্ধে একটা নূতন কথা বলিবার সময় উপস্থিত হইল। জুল যে দিন জল মাপিয়া ঐ সম্পর্কটা বাহির করিলেন, সে দিন বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা দিন। তাপ জড় পদার্থ বটে কি না, তাহা লইয়া গণ্ডগোল ত ছিল, জড় পদার্থ হইলেই আমাদের পরিচিত অন্যান্য জড় পদার্থের সহিত উহার কোন বিষয়েই মিল নাই, ইহাও স্বীকৃত ছিল। কিন্তু আজ দেখা গেল, উহার সহিত শক্তি নামক কল্পিত পদার্থের একটা গূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে। শক্তি লুপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাপের সৃষ্টি হয়। আবার শক্তি লোপ যত অধিক, উৎপন্ন তাপও তত অধিক। বল না কেন, তাপটা শক্তিরই রূপান্তর। শক্তি নষ্ট হয় নাই, উহা রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া তাপে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বে কল্পিত হইয়াছে, লোষ্ট্রখণ্ডের উৎপতনের সময় উহার যানশক্তি স্থানশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আবার অধঃপতনের সময় সেই স্থানশক্তি যানশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। এখানে একটা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, অধঃপতিত লোষ্ট্রখণ্ড ভূমিতে আঘাত করিয়া স্থিরত্ব পাইলে তাহার যানশক্তি নষ্ট হইল বটে, কিন্তু খানিকটা তাপের উৎপত্তি হইল, এখন জোর করিয়া বলা চলিতে পারে—শক্তির ধ্বংস নাই, তবে রূপান্তর-পরিগ্রহ আছে। তাপ শক্তিরই মূর্ত্ত্যন্তর।

একবার এই মূর্ত্তিভেদের কল্পনাটা স্পষ্ট হইলে তখন আর বৈজ্ঞানিককে সংকোচ করিতে হয় না।

শক্তির রূপভেদ ও অবিনাশিতা

যানশক্তির লোপে তাপের উদ্ভব হয়, তদ্ভিন্ন অন্য স্থানেও অন্য কারণে তাপের আবির্ভাব দেখা যায়। ধাতুদ্রব্যের ভিতর দিয়া তাড়িতপ্রবাহ চলিতে থাকিলে, সেই ধাতুদ্রব্য তপ্ত হয়। সূর্য্যের আলো পড়িয়া ভূপৃষ্ঠ তপ্ত হয়। এইরূপ যেখানে তাপের উৎপত্তি দেখা যাইবে, সেইখানেই শক্তির কোন না কোন একটা মূর্ত্তি তাপে পরিণত হইতেছে, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। তাহার ফলে এই দাঁড়ায় যে, বিশ্বজগতে শক্তিনামক কল্পিত পদার্থ নানারূপে নানা মূর্ত্তি ধরিয়া বিদ্যমান আছে। শক্তি এক মূর্ত্তি ছাড়িয়া অন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া থাকে। উহার রূপভেদ ঘটে, কিন্তু ধ্বংস ঘটে না বা সৃষ্টি ঘটে না।

শক্তির সৃষ্টিও নাই, ধ্বংসও নাই; এই তত্ত্বটি উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান আবিষ্কার বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। কোন এক জন পণ্ডিতে এই তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন বলা চলে না। ষাটি সত্তর বৎসর পূর্ব্বে কল্পনাটা অস্পষ্টভাবে কিছু দিন হইতেই অনেকের মনে উদিত হইতেছিল। জুল যে দিন তাপের সহিত যানশক্তির ঐ সম্পর্ক আবিষ্কার করিলেন, সেই দিন এই তত্ত্বের ভিত্তির দৃঢ়প্রতিষ্ঠা হইল মনে করা যাইতে পারে। জুলের কিছু দিন পূর্ব্বে মেয়ার নামক এক জন জার্ম্মান ডাক্তারের মনেও কল্পনাটার অনেকটা স্পষ্ট আভাস আসিয়াছিল। অধঃপতনকালে লোষ্ট্রখণ্ড যখন কাজ করে, বায়ুকে চাপিয়া সঙ্কুচিত করিলে সেইরূপ কাজ করা হয়। এই কাজের সঙ্গে তাপ জন্মিয়া থাকে। মেয়ার এই ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ ও তাপের পরিমাণ নির্ণয় করিয়া উভয়ের সম্পর্ক বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে মেয়ারের কথা বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী বড় কানে তুলেন নাই। জুলের কথাটাকে কানে তুলিতে হইয়াছিল, এবং তাহার অল্প পরেই হেল্‌মহোলৎজ নামক দিগ্বিজয়ী পুরুষশ্রেষ্ঠ শক্তির অবিনাশিতা সম্বন্ধে তত্ত্বটিকে পরিস্ফুট করিয়া তুলেন।

বস্তুতঃ এই শক্তিতত্ত্ব বর্ত্তমান বিজ্ঞানশাস্ত্রের ভিত্তিরূপে গৃহীত হয়। ইহার তাৎপর্য্যটা আরও স্পষ্টভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

কেন না, যাঁহারা স্বয়ং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লাঙ্গল ধরেন নাই, কেবল পাছে দাঁড়াইয়া কৃষিকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাঁহারা এই শক্তিতত্ত্ব লইয়া অনেক অবৈজ্ঞানিক কথা বলিয়া থাকেন। অনেক বৈজ্ঞানিকের মুখেও অবৈজ্ঞানিক বাক্যবিন্যাস শুনিয়া অনেক সময়ে মবমে আঘাত লাগে।

শক্তির বিবিধ মূর্ত্তি—তাড়িতশক্তি, চৌম্বকশক্তি, তাপশক্তি, আলোকশক্তি, চলন্ত দ্রব্যের যানশক্তি ও স্থির দ্রব্যের স্থানশক্তি ইত্যাদি। শক্তি এক মূর্ত্তি ছাড়িয়া অন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করে; একটা মূর্ত্তিতে শক্তির অন্তর্দ্ধান হয় ও সঙ্গে সঙ্গে শক্তির অন্য মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। এই দেখিয়া বলা হয়, জগতে শক্তির পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধিহীন; উহা মূর্ত্ত্যন্তর গ্রহণ করে, কিন্তু কখনও নষ্ট হয় না। জগতে শক্তির পরিমাণ সর্ব্বদা সমান অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধিহীন রহিয়াছে।

হাতুড়ি যখন নেহাইয়ে আঘাত দেয়, তখন খানিকটা যানশক্তির লোপ হইল বা নষ্ট হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা তাপের আবির্ভাব বা সৃষ্টি হইল। কিন্তু মোটের উপর শক্তির নাশ বা সৃষ্টি হইল না; উহা একরূপে প্রত্যক্ষগোচর ছিল, অন্যরূপে প্রত্যক্ষগোচর হইল। উহার পরিমাণ সমান থাকিল। যে যানশক্তির লোপ হইল, তাহার পরিমাণ, যে তাপের উদ্ভব হইল, তাহার পরিমাণের সমান।

সমানতা ও তুল্যতা

পূর্ব্বের সমান শব্দটার অর্থ কি? পাঁচটা গরুর সংখ্যা পাঁচটা ঘোড়ার সংখ্যার সমান। কিন্তু অন্য কোন বিষয়ে সমান নহে। গোয়ালের পাঁচটা গরু কমিয়া আস্তাবলে পাঁচটা ঘোড়া বাড়িলে আমি বলিতে পারি—আমার পশুসংখ্যা সমান আছে; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। আমার ধনবত্তা বা ঐশ্বর্য্য যে সমান আছে, তাহা বলা যায় না। একটা টাকা ষোল গণ্ডা পয়সার সমান, কিসে সমান? মূল্যে সমান। একটা টাকাতে যত চাউল পাই, ষোল গণ্ডা পয়সাতেও তাহাই পাইব। তদ্ভিন্ন আকারে, আয়তনে, ওজনে, সৌন্দর্য্যে, কোন বিষয়ে একটা টাকার সহিত ষোল গণ্ডা পয়সার মিল নাই। আমার বাক্সে দুইটা টাকার বদলে ৩২ গণ্ডা পয়সা রাখিলে আমার ধনবত্তার কোন হানি হয় না, কিন্তু আমার যে ভৃত্যকে ঐ বাক্স বহন করিতে হয়, তাহার পক্ষে বাক্স-বহনপ্রীতি সমান হয় না। এক গামলা জলো

দুধকে এক গামলা খাঁটি দুধের সমান করিয়া চালাইতে গোয়ালা খুবই ব্যগ্র হইতে পারে, কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে ঐ সমানতা কিছুতেই প্রীতির হেতু হইতে পারে না। এক গামলা খাঁটি জল কিন্তু প্রায় সর্ব্বতোভাবে আর এক গামলা খাঁটি জলের সমান হয়, যদি গামলা দুটির আয়তনে কোন ভেদ না থাকে। রাম বয়সে শ্যামের সমান, কিন্তু আর কিছুতেই সমান নহে। বিধাতার বিধানে কালা-ধলার জীবনের মূল্য সমান হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ধলার বিধানে নহে।

এই কয়টি উদাহরণেই বুঝা যাইবে, সমান বলিলেই যে সর্ব্বতোভাবে সকল বিষয়ে সমান বুঝায়, তাহা নহে ; সমানতারও প্রকারভেদ আছে।

হাতুড়ির ধাক্কা নেহাইএর উপর পড়িল, খানিকটা স্থানশক্তির বদলে খানিকটা তাপ বাড়িয়া গেল। উভয়ে সমান কিসে? বলা যায়, উভয়ের পরিমাণ সমান। প্রায় যে-কোন বিজ্ঞানের পুঁথি বাহির কর, সর্ব্বত্রই লেখা আছে দেখিবে যে, উভয়ের পরিমাণ সমান। কিন্তু উভয়ের পরিমাণ সমান জানিলাম কিরূপে? স্থানশক্তির পরিমাণ স্থির হয় উহার ঝোঁকের মাত্রার ও বেগের মাত্রার গুণফলের অর্দ্ধেক লইয়া ; আর তাপের পরিমাণ হয় কতটা জল এক ডিগ্রি গরম করিতে পারে দেখিয়া। উভয়ত্র মাপিবার প্রণালীই স্বতন্ত্র।

কাপড় মাপিলাম গজকাঠি দেখিয়া এবং সময় মাপিলাম ঘড়ির কাঁটা কতটুকু সরিয়াছে দেখিয়া। এই দুই পরিমাণ তুলনা করিয়া কতটা কাপড়, কয় ঘণ্টা কয় মিনিট সময়ের সমান, যদি স্থির করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে কতটা যানশক্তি কতটা তাপের সমান, তাহাও নির্ণীত হইতে পারে।

ফলে যানশক্তি গণিতবেত্তার একটা কল্পিত পদার্থ মাত্র। আর তাপ পদার্থটার স্বরূপ যাহাই হউক, উহার একটা ফল, অন্ততঃ যাহাকে আমরা উষ্ণতা বলি, সেটা মনুষ্য সাধারণের স্পর্শেন্দ্রিয়গম্য। একের পরিমাণ অন্যের পরিমাণের সমান কি না কিরূপে স্থির করিব?

একটা টাকাকে ষোল গণ্ডা পয়সার সমান না বলিয়া তুল্যমূল্য বলাই সঙ্গত। তুল্যমূল্য বলিলে এই বুঝাইবে যে, ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একটা টাকাতেও যে ফল পাওয়া যায়, ষোল গণ্ডা পয়সাতেও ঠিক সেই ফল পাওয়া যায়। আর একটা টাকার বদলে ষোল গণ্ডা পয়সা বা ষোল গণ্ডা পয়সার বদলে একটা টাকা লইতে কেহ দ্বিধা করে না। উভয়ের এই

তুল্যমূল্যতা বিধাতার বিধান নহে, উহা রাজসরকারের বিধান। বিধাতার বিধানে এক টাকা ও ষোল গণ্ডা পয়সা কোন বিষয়েই সমান নহে, সকল বিষয়েই ভিন্ন।

যানশক্তিকে সেইরূপ তাপের সমান না বলিয়া তুল্য বা তুল্যমূল্য বলাই সঙ্গত। উভয়েরই ফল সমান। খানিকটা যানশক্তির বদলে যতটা তাপ পাওয়া যায়, সেই তাপটুকুর বদলে আবার ঠিক ততটুকু যানশক্তি পাওয়া যাইতে পারে। ইহা অহরহ ঘটিতেছে! এঞ্জিনে কয়লা পোড়াইয়া তাপ জন্মে, সেই তাপের বদলে রেলের গাড়ীতে যানশক্তির উদ্ভব হয়। খানিকটা তাপের লোপ ও তাহার তুল্যমূল্য যানশক্তির আবির্ভাব হয়; তুল্যমূল্য—কেন না, সেই চলন্ত গাড়ীকে থামাইয়া ঠিক সেই লুপ্ত তাপটুকু ফেরত পাওয়া যাইতে পারে। টাকা-পয়সাতে ক্রয়-বিক্রয় চলে; শক্তি হইতে কাজ পাওয়া যায়। "কাজ" কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কোন ভারী জিনিসকে উপরে তুলিতে হইলেই গণিতবেত্তার ভাষায় খানিকটা "কাজ" করা হয়। বেগে উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ড আপনাকে আপনি উপরে তোলে ও কাজ করে। আবার এঞ্জিনে কয়লা পোড়াইয়া তদ্গত তাপের কিয়দংশ খরচ করিয়া বা নষ্ট করিয়া কূপের ভিতর হইতে জল তোলা যায়, জল তুলিতেও কাজ হয়। এখানে তাপের বলে কাজ হইল। একটা টাকাতে য'-গণ্ডা আম পাওয়া যায়, ষোল গণ্ডা পয়সাতেও ত'-গণ্ডা আম পাওয়া যায় বলিয়াই যেমন টাকা ও ষোল আনা পয়সা তুল্যমূল্য, খানিকটা যানশক্তি হইতেও যতটা কাজ পাওয়া যায়, খানিকটা তাপ হইতেও ঠিক ততটুকু কাজ পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া ঐ যানশক্তি ও ঐ তাপ তুল্যমূল্য।

ঐরূপে কতটা তাড়িতশক্তি, কতটা চৌম্বকশক্তি, কতটা আলোকশক্তি হইতে এক সের জলকে এক ডিগ্রি গরম করা যাইতে পারে, তাহা পরীক্ষা ও পরিমাপ দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়া আমরা বলিতে পারি, এতটা তাড়িতশক্তি, এতটা চৌম্বকশক্তি ও এতটা তাপশক্তি, ইহারা পরস্পর তুল্যমূল্য। সমান ফল দেয় বলিয়া ইহারা তুল্যমূল্য। আবার ক-য়ের বদলে যতটা খ পাওয়া যায়, খ-য়ের বদলেও ঠিক ততটা ক পাওয়া যায় বলিয়া উভয়ে তুল্যমূল্য। তুল্য বা তুল্যমূল্য (equivalent) বলা উচিত। সমান (equal) বলা উচিত নহে।

অবশ্য এ স্থলে এই তুল্যমূল্যতা বিধাতার বিধান, ইহা প্রত্যক্ষ দর্শনে লব্ধ, ইহার উপর রাজসরকারের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই।

কাজেই যখন বলা যায়—জগতে শক্তির পরিমাণ সর্ব্বদা সমান রহিয়াছে, উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, তখন যে ভাষার প্রয়োগ হইতেছে, তাহা অনেকটা অলঙ্কৃত ভাষা ও কবিতার ভাষা। বৈজ্ঞানিকের উচিত ঐ ভাষা পরিহার করা। যদি না করেন, তিনি কি অর্থে ব্যবহার করিতেছেন, তাহা বুঝাইয়া বলিয়া সাধারণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত। নতুবা তাঁহার অলঙ্কৃত বাক্যে মুগ্ধ হইয়া এখনই কে কোন্ মহাকাব্য রচনা করিয়া বসিবে।

শক্তি অনাদি ও অবিনাশী, উহার সৃষ্টি নাই, ধ্বংস নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, এই সকল বাক্য লইয়া কাব্যরচনা বেশ চলিতে পারে, অনেক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতেও কাব্যরচনা না করিয়াছেন এমন নহে, কিন্তু সাধু সাবধান!

অভাব হইতে ভাব উৎপন্ন হয় না, অসৎ হইতে সৎ জন্মে না, এই দার্শনিক তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়াও অনেকে উক্ত শক্তিতত্ত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হার্ব্বর্ট স্পেনসারের মত সর্ব্বজনপূজ্য গভীরবিদ্যাশীল দার্শনিক ত এই স্থানে হাবুডুবু খাইয়াছেন দেখিয়া ইতরকে শঙ্কিত হইতে হয়।

বস্তুতঃ শক্তির বিভিন্ন রূপের পরস্পর তুল্যমূল্যতা প্রত্যক্ষলব্ধ তত্ত্ব। কাল যদি বৈজ্ঞানিক কোন স্থানে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখেন যে, খানিকটা তাপের লোপ হইল, অথচ তাহার স্থানে অন্য কোনও মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল না; বৈজ্ঞানিককে ঘাড় পাতিয়া উহা মানিয়া লইতে হইবে। তখন কোন দার্শনিক তত্ত্বের দোহাই দিলে চলিবে না।

জড়ের অবিনাশিতা যখন প্রত্যক্ষলব্ধ তত্ত্ব, শক্তির অবিনাশিতাও ঠিক সেইরূপ প্রত্যক্ষলব্ধ তত্ত্ব। জড়ের অবিনাশিতার অর্থ কি, পূর্ব্বে স্পষ্ট করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, শক্তির অবিনাশিতার কি অর্থ, তাহাও এ স্থলে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিলাম। ঝোঁকের ও বেগের গুণফলের অর্দ্ধেক লইয়া যানশক্তি পরিমিত হয়। আর কতটা জল এক ডিগ্রি গরম করে দেখিয়া তাপের পরিমাণ হয়। কাজেই যানশক্তির সহিত তাপের সমানতা নিরূপণ করা চলে না। তবে উভয়ের তুল্যতা বা তুল্যমূল্যতা স্থির করা চলে। জুল সাহেব তাহাই করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উভয়ের তুল্যমূল্যতার নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।

জড়ের গঠনপ্রণালী

বৈজ্ঞানিক কেবল প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চাহেন না। অন্তরালে যে স্থান প্রত্যক্ষের অগোচর, সেখানেও তিনি মনশ্চক্ষুকে প্রেরণ করিয়া অবস্থাটা অনুমান করিতে চাহেন। এ ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক একটা অনুমানের আশ্রয় লইয়াছেন। সেই বৃত্তান্তের এবার অবতারণা করিব। জল মথিয়া খানিকটা যানশক্তির বদলে জুল খানিকটা জল গরম করিলেন ও প্রত্যক্ষদর্শনে বলিলেন, এই তাপটা এই যানশক্তির তুল্যমূল্য। তার পরেই সেই জুল আর তাঁহার সহবর্ত্তীরা বলিলেন, আচ্ছা, প্রত্যক্ষগোচর নাই বা হইল, মনে কি করা যায় না, তাপ যানশক্তির কেবল তুল্যমূল্য নহে, উহাও যানশক্তি? মনে কর না কেন, ঐ জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি বেগে ছুটাছুটি করিতেছে? প্রত্যেক কণারই কিঞ্চিৎ বস্তু আছে, আর যদি উহা খানিকটা বেগে ছুটাছুটি করে, তাহা হইলে প্রত্যেক কণার ঝোঁকও আছে, কেন না, বস্তুর মাত্রার সহিত বেগের মাত্রার গুণফলের নামই ত ঝোঁক। আর ঝোঁকের বেগের গুণফলের অর্দ্ধেক যদি যানশক্তি হয়, তবে প্রত্যেক জলকণারই যানশক্তি রহিয়াছে। আর ঐ জলরাশি যখন ঐরূপ কোটি কোটি জলকণার সমষ্টি মাত্র, তখন মনে কর না কেন যে, উহার তাপ সেই জলকণাসমূহের যানশক্তির সমষ্টি মাত্র। তাহা হইলে তাপকে আমরা যানশক্তির তুল্যমূল্য মনে না করিয়া, উহাকে প্রকৃতই যানশক্তি বলিয়া মনে করিতে পারি। উহা জলরাশির যানশক্তি নহে; উহা জলকণার যানশক্তির সমষ্টি। জলরাশি প্রত্যক্ষগোচর, কিন্তু সেই অদৃশ্য জলকণা প্রত্যক্ষবিষয় নহে; কিন্তু উহা অনুমানগোচর করিয়া লইতে পারি।

চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় যেখানে প্রবেশে অক্ষম, বুদ্ধি সেইখানে অন্তরিন্দ্রিয় মনকে প্রেরণ করে। মন সেখানে একটা কল্পনা করিয়া বুদ্ধির সমীপে প্রত্যক্ষের অগোচর অবস্থার একটা চিত্রপট ধরিয়া দেয়। এই ব্যাপারের নাম অনুমান, ইহা বৈজ্ঞানিকের একটা অবলম্বন।

হাতুড়ি বেগে নেহাইএর উপর আপতিত হইল। হাতুড়ি বেগে চলিতেছিল, উহার গতিবিধি প্রত্যক্ষবিষয় ছিল আঘাতের পর যানশক্তি লোপ হইল, আবির্ভাব হইল তাপের। নেহাইটা গরম হইল; উহার উষ্ণতাও প্রত্যক্ষবিষয় ত্বগিন্দ্রিয়ের গম্য।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুমান করিলেন, নেহাই বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র অদৃশ্য লৌহকণিকার সমষ্টি মাত্র। সেই অদৃশ্য কণিকাগুলি এখন বেগে ছুটিতে লাগিল। প্রত্যেক কণিকার কিঞ্চিৎ যানশক্তি সঞ্চারিত হইল। যে যানশক্তি হাতুড়িতে নিহিত ছিল, তাহাই এখন নেহাইএর লৌহকণিকাতে সংক্রান্ত ও সঞ্চারিত হইল। উক্ত অদৃশ্য সঞ্চরণের প্রত্যক্ষ ফল উষ্ণতাবৃদ্ধি। হাতুড়ির সমস্ত শরীরটা একই বেগে, একই মুখে ছুটিতেছিল। কিন্তু নেহাইএর কণিকাগুলি হয়ত বিভিন্ন বেগে বিভিন্ন মুখে ছুটিতেছে। কিন্তু যানশক্তি মূর্ত্ত্যন্তর গ্রহণ করে নাই, উহা যানশক্তিই রহিয়াছে, এইখানে রসায়নবেত্তা পণ্ডিতের সহিত পদার্থবিত্যাবিৎ পণ্ডিতের মহাহর্ষে সন্ধিমিলন ঘটিল। রসায়নবেত্তারাও জড় পদার্থের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, মৌলিক ও যৌগিক যাবতীয় পদার্থ বহুসংখ্যক অণুর সমাবেশে গঠিত। ঐ অণুগুলিই জড়ের সূক্ষ্মতম অংশ, অণুগুলিকে ভাঙ্গিলে পরমাণু পাওয়া যায়; কিন্তু পরমাণুকে আর বিভাগ করা চলে না।

এক ফোঁটা জলে কোটি কোটি অণু রহিয়াছে; প্রত্যেক অণু জলেরই অণু। কিন্তু সেই অণুকে ভাঙ্গিলে **হাইড্রোজন ও অক্সিজনের** পরমাণু পাওয়া যায়, সেই পরমাণুতে জলধর্ম্ম কিছু থাকে না। কাজেই জলের অণু জলের সূক্ষ্মতম অংশ।

পদার্থবিত্যাবিৎ পণ্ডিতেরাও এইখানে রসায়নবিদের মতে সায় দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, এক ফোঁটা জলে কোটি কোটি অণু রহিয়াছে। সেই অণুই জলের সূক্ষ্মতম অংশ। উহাকে ভাঙ্গিলে পরমাণু পাওয়া যায় যাউক, ক্ষতি নাই; কিন্তু সেই পরমাণুতে যখন আর জলধর্ম্ম থাকিবে না, তখন জলের অণুকেই জলের সূক্ষ্মতম অংশ বলিয়া গ্রহণ করা চলিতে পারে।

পদার্থবিত্যাবিৎ পণ্ডিতের মতে এই অণুগুলি চলন্ত। উহারা এক স্থানে স্থির থাকে না। উহারা স্থির না থাকিয়া বেগে ছুটাছুটি করিতেছে, এইরূপ অনুমান করিলে তাপ যে যানশক্তির মূর্ত্ত্যন্তর নহে, উহাই যানশক্তি, তাহা বেশ বুঝা যাইতে পারে।

তাপের পরিমাণভেদে জলের ত্রিবিধ অবস্থা; কঠিন জল বরফ; উহাতে খানিকটা তাপ প্রবেশ করিলে উহা তরল জল হয়; আরও খানিকটা তাপের যোগে তরল জল বাষ্পাবস্থা পায়। এখন তাপ যদি একটা ছুটাছুটির ব্যাপার হয়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, তাপের

অণুগুলিতে ছুটাছুটিটাও সব চেয়ে বেশী, তরলে তার চেয়ে কম, কঠিনে আরও কম। এইরূপ অনুমানের বলে কঠিন, তরল, বাষ্প ও অনিল, এই চতুর্ব্বিধ অবস্থারই একরকম ব্যাখ্যার চেষ্টা হইতে পারে। এখন কোন্ অবস্থার ছুটাছুটিটা কিরূপ, তৎসম্বন্ধে পদার্থবিদ্যাবিৎ কি বলেন, তাহা দেখা যাক।

মনে কর, একটা বাক্সের ভিতরে খানিকটা জলের বাষ্প পোরা আছে। ঐ বাষ্প বাক্সের সমস্ত অভ্যন্তরদেশটা ব্যাপিয়া আছে; বাক্সটার ভিতরের যে আয়তন, বাষ্পেরও সেই আয়তন; বাক্সের গায়ে বাষ্পের চাপ পড়িতেছে, বাক্সের গায়ে প্রতি বর্গ ইঞ্চি জায়গার উপর কত চাপ, তাহা সহজেই জানা গেল; আর ঘর্ম্মমান দ্বারা ঐ বাষ্পের উষ্ণতা কত, তাহাও বলা যাইতে পারে।

পদার্থবিৎ অনুমান করেন, ঐ বাক্সের ভিতরে জলের কোটি কোটি অণু ছুটিয়া বেড়াইতেছে; প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এদিক্, ওদিক্, ঊর্দ্ধমুখে অধোমুখে, এপাশে ওপাশে, দিগ্বিদিকে, যে যে-মুখে পাইতেছে ছুটিতেছে, আর বাক্সের গায়ে ধাক্কা দিতেছে। রবরের বল যেমন দেওয়ালে ধাক্কা দিয়া ঠিকরিয়া পড়ে ও অন্য মুখে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ বাক্সের দেওয়ালেও ধাক্কা দিয়া অণুগুলি ঠিকরিয়া পড়িতেছে ও ফিরিয়া অন্য পথে চলিতেছে। আবার মাঝে মাঝে অণুতে অণুতে ধাক্কা লাগিয়া উভয়েরই গতি অন্য মুখে ফিরিতেছে। যত ক্ষণ দেওয়ালের গায়ে বা অন্য অণুর গায়ে ধাক্কা না লাগে, তত ক্ষণ অণুগুলি একমুখে সরল পথে ছুটিতে থাকে।

এই অণুগুলি যদি আমাদের চক্ষুর গোচর হইত, তাহা হইলে কিরূপ দৃশ্য দেখিতাম? রাত্রিকালে ঘরের ভিতরে লক্ষ লক্ষ মশা উড়িতে থাকিলে যে রকম দেখায়, কতকটা সেইরূপ। অথবা অভিমন্যুকে সপ্ত রথীতে ঘিরিয়া যখন ব্যূহমধ্যস্থ স্থানটাকে বাণে বাণে ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তখন সেই স্থানের অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল, কতকটা সেইরূপ। ঐ মশাগুলি বা বাণগুলি যেন আমাদের অণু।

বাক্সটার মধ্যে বহু কোটি অণু ছুটাছুটি করিতেছে বটে, কিন্তু এক একটা অণু এতই ছোট যে, বস্তুতঃ বাক্সটা অণুতে পরিপূর্ণ হয় নাই। অণুগুলি যদি গায়ে গায়ে লাগিয়া থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের বেগে ছুটাছুটি সুকর হইত না। কিন্তু দুই দুইটা অণুর মধ্যে প্রচুর স্থান ফাঁক রহিয়াছে, প্রচুর ফাঁক আছে বলিয়াই উহারা বেগে ছুটিবার অবকাশ পাইতেছে। তবে

বহুসংখ্যক অণু আছে বলিয়াও তাহারা দশ দিকেই ছুটিতেছে বলিয়া মাঝে মাঝে অণুতে অণুতে ঠোকাঠুকি হইতেছে মাত্র। অণুগুলি বাক্সের ভিতরটা দখল করিয়া আছে মাত্র, অর্থাৎ সেই ভিতরের মধ্যেই উহাদের ছুটাছুটি, সেখানে যে প্রবেশ করিতে চাহিবে, তাহাকেই সেই অণুগুলির ধাক্কা খাইতে হইবে এই পর্য্যন্ত। কিন্তু অণুতে সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া নাই। কেন না, অণুগুলির নিজের আয়তন অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র।

এখন দেখা যাউক, এই অদ্ভুত অনুমানে জলীয় বাষ্পের অবস্থার কিরূপ ব্যাখ্যা হয়।

১। অণুগুলির মাঝে প্রচুর অবকাশ বা ফাঁক আছে বলিয়াই আমরা ইচ্ছা করিলে আরও বিস্তর অণু ঐ বাক্সের মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারি। যে বাষ্পটা বাক্সে রহিয়াছে, আমরা আরও বাষ্প উহার মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারি। বাক্সটা যদি তরল জলে পূর্ণ থাকিত, তাহা হইলে উহাতে আর খানিকটা জল বা অন্য কোন দ্রব্য প্রবেশ করান অসাধ্য হইত। কিন্তু বাষ্পে পূর্ণ থাকিলে আরও বাষ্প—আর বাষ্পই বা কেন, উদান, অম্লান, জবান, যে-কোন অনিল প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করান চলে। মাঝে ঐরূপ স্থান আছে বলিয়াই চলে।

২। বাক্সের কোন এক জায়গাতে ফুটা করিলে সেই দিক্ দিয়া বাষ্প বাহির হইয়া আসিবে। তা উপরেই কর, আর নীচের তলেই কর, আর পাশেই কর। বাষ্পাবস্থ বা অনিলাবস্থ পদার্থকে খোলামুখ পাত্রে রাখা চলে না। খোলা জানালা পাইলেই সেই পথে পলাইয়া আসে। কিন্তু তরল বা কঠিন দ্রব্য সে রকম পলায় না। উহা খোলামুখ পাত্রে রাখা চলে।

ইহাতে বুঝা গেল, অণুগুলি সকল দিকেই সকল মুখেই বেগে ছুটিতেছে। দেওয়ালের ধাক্কা পাইয়া সেখান হইতে ঘুরিয়া আইসে; কিন্তু দেওয়ালে ফুটা থাকিলে সেই পথ দিয়া বেগে বাহির হইয়া আসিবে।

৩। সকল দিকেই বেগে ঘুরিতেছে বলিয়াই বাষ্পাবস্থ বা অনিলাবস্থ পদার্থ সকল দিকেই চাপ দেয়। বাক্সের ভিতরে যে বাষ্প আছে, তাহা বাক্সের ছয়টা দেওয়ালেই, অর্থাৎ উপরের ডালায়, নীচের তলে ও চারি পাশে, এই ছয় দেওয়ালেই চাপ দেয়। প্রত্যেক অণু বেগে ছুটিয়া আসিয়া দেওয়ালে ধাক্কা দিতেছে, আবার ঠিকরিয়া পড়িতেছে। প্রত্যেক অণুরই একটা ঝোঁক আছে; সেই ঝোঁকের সহিত ধাক্কা, আবার সেই ঝোঁকের সহিত

প্রত্যাবর্ত্তন। এক একটা অণু অতিক্ষুদ্র ও উহার ঝোঁক যৎসামান্য হইলেও কোটি কোটি অণু যেখানে প্রতি সেকেণ্ডে প্রতি বর্গ ইঞ্চি দেওয়ালে ধাক্কা দিতেছে, তখন মোটের উপর দেওয়ালে ঝোঁক সামান্য পাইতেছে না। প্রত্যেক অণুর বস্তুর মাত্রাকে উহার বেগ দিয়া গুণ করিলে উহার ঝোঁকের মাত্রা পাওয়া যায়। আমরা প্রত্যেক অণুর বস্তুপরিমাণ কত, তাহা জানি না, তবে সমস্ত অণুর বস্তুপরিমাণের সমষ্টি জানি। কেন না, সমুদায় অণুর সমষ্টিটাই ত বাক্সের ভিতরে বাষ্প ; আবার বাক্সের গায়ে কত চাপ পড়িতেছে, সেটা ত মাপিয়া বাহির করিতে পারি ; এখন কত বেগে ধাক্কা দিলে ঐ চাপটুকু ঠিক পাওয়া যাইবে, তাহা গণনা করিতে পারা যায়। বাষ্পটা মাপিয়া, আর বাষ্পটার বস্তুপরিমাণ স্থির করিয়া এই বেগের মাত্রা কত, গণিয়া দেখা হইয়াছে। তাহাতে যে ফল পাওয়া যায়, তাহা বিস্ময়কর। অণুগুলির ছুটাছুটির বেগ সামান্য নহে। বাষ্পটা যদি ফুটন্ত জলের বাষ্প হয়, অর্থাৎ উহার উষ্ণতা ১০০ ডিগ্রী হয়, তাহা হইলে গণিয়া দেখা যায়, প্রত্যেক অণুর বেগ অতি প্রচণ্ড। রেলওয়ের ট্রেনের বেগ ইহার নিকট বেশী নহে।

কোটি কোটি অণু এই প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিলে দেওয়ালের গায়ে যে চাপ পড়িবে, তাহা বিচিত্র কি ? দেওয়াল কেন, যে-কোন দ্রব্য কোন বাষ্প বা অনিলের মধ্যে অবস্থান করে, তাহার পিঠেও ঐরূপ অবিরত ধাক্কা পড়িবে ও তাহার দরুণ চাপ পড়িবে।

বাক্সের ভিতরে যে বাষ্পটা আছে, তাহার উপর আরও খানিকটা বাষ্প প্রবেশ করান যায়, তাহাতে অণুর সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হইল, কয়েক কোটি অণু আগেই ছিল, তাহার উপর আরও কয়েক কোটি প্রবেশ করিল। ইহারাও ধাক্কা দিতে থাকিবে, চাপের মাত্রা আরও বাড়িবে। ফলেও তাহাই দেখা যায়।

বাষ্পের পরিমাণ না বাড়াইয়া যদি বাক্সটাকে ছোট করা যায় ; অর্থাৎ যে বাষ্পটুকু বৃহৎ বাক্সে ছিল, সেই বাষ্পটুকু ছোট বাক্সে রাখা যায়, তাহা হইলে কি হইবে ? এবার সেই সমুদায় অণু আরও অল্প জায়গাতে ছুটিতে লাগিল। অল্প জায়গাতে অধিক অণু থাকিলে ঠোকাঠুকিও বাড়িয়া যাইবে। খোলা জায়গা কম পাওয়াতে অণুতে অণুতে ঠোকাঠুকি ও অণুতে দেওয়ালে ঠোকাঠুকি বাড়িয়া যাইবে। আগে যেখানে যে সময়ে একটা

ধাক্কা পড়িত, এখন সেইখানে সেই সময়ে হয়ত পাঁচটা ধাক্কা পড়িবে। অণুর সংখ্যা মোটের উপর বাড়ে নাই বটে, কিন্তু ধাক্কার সংখ্যা বাড়িয়াছে। কাজেই চাপও বাড়িয়া যাইবে।

ফলেও তাহাই দেখা যায়। অনিলই বল, আর বাষ্পই বল, উহাকে সঙ্কুচিত করিলে, উহার আয়তন কমাইলে, অর্থাৎ বড় জায়গা হইতে ছোট জায়গায় আবদ্ধ করিলে চাপ বাড়ে। তাহা স্পষ্ট রবার্ট বয়েল প্রথম প্রত্যক্ষ দর্শনে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

৪। তার পর উষ্ণতা। উষ্ণতা বাড়িলে চাপ বাড়ে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহা প্রত্যক্ষলব্ধ তত্ত্ব,—ইহার উপরে কথাটি বলিবার জো নাই। এখন এই চাপ বাড়িবার কারণ কি, বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

এক একটি অণু যতই ছোট হউক, উহার কিঞ্চিৎ বস্তু আছে, আর বেগও আছে; অতএব ঝোঁকও আছে। বস্তু আর ঝোঁকের গুণফলের অর্দ্ধেকের নাম যানশক্তি। অতএব প্রত্যেক অণুরই একটু যানশক্তি আছে। বাক্সের ভিতরে যে কয় কোটি অণু রহিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের যানশক্তি রহিয়াছে। ঐ যানশক্তির সমষ্টিটাই হইল ঐ বাষ্পে নিহিত তাপ।

এখন যদি বাষ্পে আরও খানিকটা তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক অণুরই যানশক্তি একটু করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। বস্তুর বৃদ্ধি হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। অতএব বেগের বৃদ্ধি হয়, ঝোঁকের বৃদ্ধি হয়। আর প্রত্যেক অণুর ঝোঁক বাড়িলে শত কোটি অণুর ঝোঁকের ধাক্কার ফল যে চাপ, সেই চাপও বাড়িয়া যাইবে।

বাষ্পাবস্থ ও অনিলাবস্থ পদার্থ কিরূপে চাপ দেয়, আয়তনের হ্রাস ও উষ্ণতার বৃদ্ধি ঘটিলে সেই চাপ কিরূপে বাড়িয়া যায়, যানশক্তি কিরূপে তাপে পরিণত হয়, এই কয়েকটি বিষয়ের একরকম সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। কাজেই পদার্থবিৎ পণ্ডিতের এই অনুমান অগ্রাহ্য করিবার নহে; বরঞ্চ শ্রদ্ধার বিষয়। বস্তুতই এখন আমরা বিশ্বাস করি যে, বাষ্পাবস্থায় ও অনিলের অবস্থায় অণুগুলি ঐরূপেই ইতস্ততঃ ভীম বেগে ছুটাছুটি করিয়া থাকে। অণুগুলি পরস্পর দূরে থাকিয়া আপন আপন পথে ছুটিয়া বেড়ায়, তবে মাঝে মাঝে তাহাদের ঠোকাঠুকি হয়। ঠোকাঠুকির সময় উহাদের পরস্পর একটা সম্পর্ক ঘটে; দুইটা অণু আপন পথে চলিতেছিল, হঠাৎ ধাক্কা লাগিয়া এটা গেল এ-পথে, ওটা গেল ও-পথে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে যে,

এই ঠোকাঠুকির সময় ব্যতীত অন্য সময় উহাদের পরস্পরের কোন সম্পর্ক থাকে কি না? একটা অণু আর একটা অণু হইতে দূরে থাকিয়াও উহার গতিবিধি কোনরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে কি না? চাঁদ পৃথিবী হইতে এত দূরে থাকিয়াও যখন পৃথিবীর সম্পর্ক ছাড়িতে পারে না, পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ একটা অণু দূরস্থ অন্য অণুর গতিবিধির উপর কোন প্রভুত্ব রাখে কি না? পৃথিবীর ও চাঁদের ক্ষেত্রে বলা যায়, উহারা এত দূরে থাকিয়াও পরস্পরকে আকর্ষণ করে, ঐরূপ অণুদের পরস্পর কোন আকর্ষণ বা বিকর্ষণ আছে কি না? এক কালে কোন কোন পণ্ডিত বলিতেন, অনিল পদার্থের অণুগুলির মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ নাই, বরং বিকর্ষণ আছে এবং তাহার ফলেই এ উহার কাছ হইতে দূরে পলাইতে যায়, কেহ কাহারও নিকটে যাইতে চায় না। এইরূপ পলায়নপ্রবণতা আছে বলিয়াই অনিল পদার্থকে কোন পাত্রমধ্যে আটকান এত কঠিন। মুখ খোলা পাইলেই সেই পথে বাহির হইয়া আসে। এই বিকর্ষণের কথা অনেক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থেও একালে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বস্তুতঃ এরূপ বিকর্ষণের অস্তিত্ব অনুমান আবশ্যক নাই। উপরে বলা গিয়াছে, অণুগুলি বেগে ভ্রমণশীল, উহারা বেগে ছুটিতেছে বলিয়াই উহাদের পলায়নে প্রবৃত্তি। এই ভ্রমণশীলতার জন্য যে যানশক্তি আবশ্যক, তাহা উহাদের আছে। গ্রহ উপগ্রহগণ যেমন আপন আপন বেগে গগনমার্গে ভ্রমণশীল, উহারাও তেমনই আপন আপন বেগে ভ্রমণশীল। কোন পদার্থ যতই শীতল হউক, উহাতে কতকটা তাপ আছেই; আর সেই তাপ যখন অণুসমূহের যানশক্তি মাত্র, তখন ত এই বেগে ভ্রমণশীলতা থাকিবেই। ইহার জন্য কোনরূপ বিকর্ষণের অস্তিত্ব কল্পনার প্রয়োজন নাই।

বরং এক আধটু আকর্ষণের পক্ষে প্রমাণ আছে। সূক্ষ্ম পরিমাপ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, বাষ্পসকল ও অনিলসকল বয়েলের আবিষ্কৃত নিয়মটা ষোল আনা মানিয়া চলে না। প্রত্যেকেরই ক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম হইতে এক আধটু ব্যত্যয় আছে। সেই ব্যত্যয়টুকু বুঝাইতে বরং আকর্ষণের অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয়; বিপ্রকর্ষণের অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয় না। বান্‌দার ওয়ালস্ নামক ওলন্দাজ পণ্ডিত এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। এখানে তাহা তুলিলে পাঠকের প্রীতিকর হইবে না।

তবে আকর্ষণের মাত্রা যৎসামান্য। অণু দুইটি যখন খুব নিকটে আইসে, তখনই এই আকর্ষণের কাজ কতকটা বুঝা যায়। একটু দূরে গেলেই সে আকর্ষণ একেবারে নগণ্য হইয়া পড়ে। দুইটা অণু খুব কাছাকাছি আসিয়াছে ; স্পর্শ করে নাই, স্পর্শ করে-করে হইয়াছে, তখনই এই আকর্ষণের মাত্রাটা গণনার আমলে আসে, তখন এ উহাকে আটকাইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়।

বাক্সের ভিতর বাষ্পের পরিমাণ যদি ক্রমেই বাড়ান যায়, ভিতরে চাপ ক্রমেই বাড়ে। আর এই অণুর সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়ায় অণুদের পরস্পর দূরত্ব ক্রমেই কমিতে থাকে। অবশেষে এমন সময় আসে, যখন সেই স্থানের মধ্যে এত অণুর সমাবেশ হইয়াছে যে, তখন আর পরস্পরের মধ্যে অধিক ব্যবধান নাই। এক বিঘা জমিতে যদি দশ জন লোক চোখ বাঁধিয়া ছুটাছুটি করে, তখন তাহাদের পরস্পর ব্যবধানও মোটের উপর বেশী থাকে ও ছুটিবার সময় পরস্পর ধাক্কার সম্ভাবনাও কম থাকে। কিন্তু সেই জমিতে হাজার লোককে চোখ বাঁধিয়া ছুটিতে বলিলে উহাদের পরস্পর ব্যবধানও থাকে না ও দুই পা অগ্রসর হইতেই অন্যের সহিত ধাক্কার সম্ভাবনা ঘটে। এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ। অণুর সংখ্যা খুব অধিক হইলে পরস্পর সান্নিধ্য হেতু পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণের মাত্রাটাও গণনার বিষয় হয়, আর স্বাধীন ভাবে সোজা পথে অধিক দূর ছুটিবার উপায় থাকে না। তখন কেবলই ঠোকাঠুকি ঘটে। অণুর সংখ্যা বৃদ্ধিতে যখন উহারা গায়ে গায়ে লাগিবার উপক্রম করে, তখন ঐরূপ স্বাধীন গতির অবকাশ থাকেই না, তবে একটা ভিড়ের মধ্যে লোকগুলিকে যেমন ভিড় ঠেলিয়া এদিক্ ওদিক্ চলিতে হয়, দশ বারে দশ জায়গায় ধাক্কা খাইয়া অনেক চেষ্টার পরে খানিকটা অগ্রসর হইতে হয়, অণুদেরও অবস্থা সেইরূপ ঘটে।

অণুগুলির এই অবস্থা ঘটিলে আমরা বলি—জিনিসটা আর অনিলাবস্থায় বা বাষ্পাবস্থায় নাই, উহা এখন তরলাবস্থা পাইয়াছে। বাক্সের ভিতর বাষ্পের পরিমাণ বাড়াইতে বাড়াইতে এমন সময় আসে, তখন আর নূতন বাষ্প কুলায় না, তখন যেটা প্রবেশ করান যায়, সেটা তরল অবস্থায় যায়। বাষ্পের তখন তরলতাপাদন ঘটে।

বাষ্পকে ক্রমে সঙ্কুচিত করিয়া অল্প স্থানে আবদ্ধ করিলে কেন পরিশেষে তাহার তরলতাপ্রাপ্তি ঘটে, এখন বুঝা গেল। ১৭০০ ঘন ফুট জলের

বাষ্পকে ক্রমে সঙ্কুচিত করিয়া এক ঘন ফুটে আবদ্ধ করিলে অণুগুলি প্রায় গায়ে গায়ে ঠেকিয়া পড়ে, তখন উহাদের আর বেগে বহু দূর ছুটিবার অবকাশ থাকে না; কেবল ভিড় ঠেলিয়া বহু ক্ষণে অল্প দূর চলিতে পারে মাত্র।

লোকের ভিড়ের যে অবস্থা, তরল পদার্থের অণুগুলির সেই অবস্থা। ভিড়ের মধ্যে লোকের মাঝে মাঝে কিছু কিছু ব্যবধান না থাকে এমন নহে, একবারে হাত পা বাঁধা হইয়া থাকিতে হয় না। তরল পদার্থের অণুদের মাঝেও কিঞ্চিৎ ব্যবধান থাকে। নতুবা তরল পদার্থকে চাপ দিয়া সঙ্কুচিত করা অসাধ্য হইত। প্রবল চাপ দিলে সকল তরল পদার্থই একটু না একটু সঙ্কুচিত না হয়, এমন নহে। স্থিতিস্থাপকতা বিচারের কালে বলা গিয়াছে, তরল পদার্থ মাত্রেরই সঙ্কোচ্যতা আছে। আবার এইরূপ যৎকিঞ্চিৎ ফাঁক থাকে বলিয়াই অণুগুলিকে একবারে নিশ্চল থাকিতে হয় না। উহারা ভিড় ঠেলিয়া এদিক্ ওদিক্ চলিতে পারে। জলের মধ্যে কোথাও এক ফোঁটা আলতা দিলে ঐ আলতা জলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তরল পদার্থের অণু একেবারে নিশ্চল নহে, উহাদেরও বেগ আছে; অতএব চলৎশক্তি বা যানশক্তি আছে; সে বেগও নিতান্ত সামান্য না হইতে পারে, কিন্তু স্থানাভাবে সেই বেগ সত্ত্বেও উহারা এক-মুখে অধিক দূর চলিতে পারে না। কেবলই ধাক্কা খাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া অধিক সময়ে অল্প দূর যাইবার অবকাশ পায় মাত্র।

একটা বোতলে বায়ু পুরিলে, উহা বোতলের সমস্তটা অধিকার করিয়া বসে, তা যত অল্প বায়ু হউক না, কিন্তু জল পুরিলে উহা বোতলের কিয়দংশ মাত্র অধিকার করে। বোতলের অধোভাগটা মাত্র অধিকার করে; কাজেই তরল দ্রব্যের একটা নির্দ্দিষ্ট আয়তন থাকে। উহার একটা সমতল পিঠ দেখা যায়, সেই পিঠের উপর আর তরল জল থাকে না। এই জন্যই নদীতে, কূপে, তড়াগে জল সঞ্চিত থাকে। বায়ু কিংবা বাষ্প কোন পুষ্করিণীতে ওরূপে সঞ্চয় রাখা চলিত না। তরল পদার্থের অণু খুব কাছাকাছি থাকে ও কাছাকাছি থাকিলেই পরস্পরের আকর্ষণের মাত্রাটাও কতকটা প্রবল হয়, তাই পরস্পরকে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আটকাইয়া রাখিতে চায়। পরস্পরের মধ্যে এই জড়াজড়ি আটকা-আটকি ব্যাপার আছে বলিয়াই তরল পদার্থের নির্দ্দিষ্ট আয়তন; জলাশয়ে জল সঞ্চয়ের সম্ভাব্যতা। কিন্তু তাই বলিয়া

সমস্ত জলটাকেই যে এরূপে আটকান চলে, জলের অণুগুলির পলায়নে প্রবৃত্তি নাই, এরূপ বলা চলে না। জলের অণুরা ত নিশ্চল নহে, উহাদেরও বেগ আছে, যানশক্তি আছে, পলাইবার প্রবৃত্তি আছে। তবে ভিড় ঠেলিয়া চলিবার অবকাশ পায় না, তাই জড়াজড়ি ছাড়াইয়া ঠেলাঠেলি করিয়া চলে। জলের পিঠের নিকট অণুগুলি অনেকটা স্বাধীন; তাহাদের নিম্নে অধোভাগে ভিড়, কিন্তু ঊর্দ্ধভাগে খোলা জায়গা, সেখানে ভিড় নাই। তাই সেই খোলা জায়গাতে অণু ক্রমাগত ঊর্দ্ধগামী হইতে চাহে। জল যত গরম বা যত ঠাণ্ডাই হউক না কেন, উহার পিঠ হইতে বাষ্প উঠে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। জলাশয়ের পৃষ্ঠ, নদী-পৃষ্ঠ, সাগর-পৃষ্ঠ হইতে ক্রমাগত বাষ্প উঠিতেছে। বোতলের অধোভাগে জল থাকিলেও উহার ঊর্দ্ধভাগে জলের বাষ্প থাকে, একেবারে শূন্য থাকে না। তাহার কারণই উহাই। পিঠ ছাড়িয়া অণুগুলি ছুটিয়া বাহিরে আসিতেছে; তখন আর তাহাদিগকে কে পায়। বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিতে পার, তাহা নহিলে খোলা মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিবে ও কালে সমস্ত জলই বাষ্পীভূত হইয়া যাইবে। বাস্তবিকই একখানা থালায় জল রাখিয়া দিলে, উষ্ণতাভেদে কয়েক ঘণ্টায় বা কয়েক দিনে সমস্ত জলটাই বাষ্পীভূত হইয়া ঊর্দ্ধে বায়ুসাগরে মিশিয়া যায়; এক ফোঁটা জলও শেষ পর্য্যন্ত অবশেষ থাকে না। গরম জলের অণুর বেগ বেশী, তাই অণুসকল পিঠ হইতে শীঘ্র শীঘ্র পলায়; ঠাণ্ডা জলের অণুর বেগ তদপেক্ষা কম, তাই কিছু বিলম্ব হয়, এই প্রভেদ।

বোতলে ছিপি দিয়া রাখিলে কাকের সচ্ছিদ্র ছিপি না হইয়া কাচের নিরেট ছিপি হইলে কিন্তু সমস্ত জলের বাষ্প হওয়া ঘটে না। কতকটা জল বাষ্প হইয়া বোতলের ঊর্দ্ধ ভাগটায় সঞ্চিত হয়, উহার অণুগুলি সেইখানে ছুটাছুটি করে; কিন্তু একটা সীমা আছে; সেই ঊর্দ্ধভাগে অণুর সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে শেষে এমন সময় আসে, যখন সেই জায়গায় আর অধিক অণু স্থান পায় না। কেন না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাষ্পের অণুর ঘনসন্নিবেশের একটা সীমা আছে, সেই সীমায় পৌছিলে অণুগুলি পরস্পর প্রবল আকর্ষণের আমলে আসে ও বাষ্পের তখন তরলতাপ্রাপ্তি ঘটে।

যখন এই সীমায় পৌছায়, তখন বাষ্পীভবন কাজেই ক্ষান্ত হয়। ক্ষান্ত হয় বলিয়া জলের পিঠ ছাড়িয়া কোন অণুই আর ছুটিয়া পলাইয়া যাইতেছে

না, ইহা মনে করিবার কারণ নাই। কতক অণু জল ছাড়িয়া উর্দ্ধে ছুটিয়া আসিতেছে, তেমনই উর্দ্ধভাগে বাষ্পের অন্তর্গত কতক অণু নিম্নমুখে ছুটিয়া গিয়া জলের পিঠের সমীপে আসিয়া, সেই অণুর আকর্ষণে আটকা পড়িয়া তরল জলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতেছে। যত অণু জলের বাহিরে আসিতেছে, তত অণুই আবার জলের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে এইরূপ অনুমানই সঙ্গত। মোটের উপর বোতলের উর্দ্ধ সংখ্যা বাড়িতে পাইতেছে না। আমরা ত অণুগুলি দেখি না, আমরা মোট বাষ্পের পরিমাণ দেখি। বাষ্পের পরিমাণ আর বাড়িতে দেখি না।

বোতলের মুখে ছিপি দেওয়ার এই ফল। ছিপি না দিলে অবশ্য বোতলের সমস্ত অণুই কালক্রমে খোলা মুখ দিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িত। বাহিরে এত জায়গা যে, সেখানে প্রচুর অণুর সমাবেশেও ভিড় ঘটে না। যখন ঘটে, তখন মেঘ হয়, কুয়াসা হয়, শিশির হয়।

তরলের সহিত বাষ্পের আর অনিলের প্রভেদ কিরূপ, তাহা বুঝা গেল। বাষ্পে আর অনিলে প্রচুর অবকাশ বা স্থান থাকায় অণুগুলি স্বাধীন বিচরণের সুবিধা পায়, তাই মাঝে মাঝে ঠক্কর খাইয়াও প্রবল বেগে বহু দূর ছুটিতে যায়, আর তরলের অণুগুলিকে পরস্পরের জড়াজড়ি ছাড়াইয়া ভিড় ঠেলিয়া প্রবল বেগ সত্ত্বেও ধীরে চলিতে বাধ্য হইতে হয়। তরলের পিঠের নিকট অনেকটা স্বাধীনতা থাকায় সেখানে বাষ্পীভবন ঘটে। আর উষ্ণতা-বৃদ্ধির সহিত অণুগুলির বেগবৃদ্ধি ঘটে। শেষে এত ঘটে যে, তখন অণুগুলি আর কোন বন্ধন মানিতে চায় না। তরলের ভিতর হইতেও জল ঠেলিয়া ও উপরের অণুসমূহের চাপ ঠেলিয়া বাহিরে বেগে বাহির হইতে থাকে, তখন জল ফুটিতে আরম্ভ করে।

বাষ্পের অবস্থা অনেকটা অনিলেরই সমান, তবে একটু প্রভেদ আছে। বাষ্পকে সঙ্কোচন দ্বারা তরল পদার্থে পরিণত করা চলে, কিন্তু অনিলকে যতই সঙ্কোচ কর, উহা তরলে পরিণত হইবে না।

একই জিনিস উষ্ণতাভেদে বাষ্প হয় বা অনিল হয়। প্রত্যেকের পক্ষেই একটা উষ্ণতার সীমা আছে, উষ্ণতা তাহার উপর থাকিলে অনিল, তখন তরলতাপাদন ঘটে না। আর নীচে থাকিলেই বাষ্প, তখন তরলতাপাদন সম্ভাব্য।

উষ্ণতাবৃদ্ধির অর্থ অণুগুলির বেগের বৃদ্ধি। অতি অধিক বেগ থাকিলে অণুগুলি যে-কোন বাঁধনেই ধরা দিবে না, বাঁধন ছাড়িয়া পলাইবে, আর অল্প বেগ থাকিলে ধরা দিয়া ভিড়ে প্রবেশ করিবে, ইহা বোঝা কঠিন নহে।

এইবার কঠিনের কথা। তরল পদার্থ ঠাণ্ডা হইলে শেষ পর্য্যন্ত কঠিন হয়। তখন আয়তন আরও কমে। জলের ব্যবহারটা বিপরীত, তাহা আগেই বলিয়াছি। তবে সাধারণ নিয়ম এই যে, তরল পদার্থ কঠিন হইয়া সংহত হইলে তখন আয়তন একটু কমে। কাজেই বুঝিতে হইবে, অণুর ভিড়টা তখন আরও জমাট হইয়াছে; অণুগুলি পরস্পর আরও সন্নিহিত হইয়াছে। মাঝে ফাঁক আছে, না একেবারে লোপ পাইয়াছে? আছে বৈ কি; কেন না, অত্যধিক চাপে কঠিন পদার্থ মাত্রই,—লোহাই হউক, আর সোনাই হউক, কিছু না কিছু সঙ্কুচিত হয়। কঠিন পদার্থেরও আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা আছে বলা গিয়াছে। আবার কঠিন পদার্থের সচ্ছিদ্রতা অনেক সময় প্রত্যক্ষগোচর। নিরেট দেখাইলেও উহার ভিতর ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। মাটির কলসীর বা কয়লার সচ্ছিদ্রতা ত একরকম চোখেই দেখা যায়, উহার ভিতর দিয়া বায়ুর ত কথাই নাই, তরল পদার্থও বাহির হইয়া আসে। কাজেই ছিদ্রও বড় বড়। সোনার মত, সীসার মত নিরেট জিনিসও সচ্ছিদ্র, তাহার ভিতর দিয়াও জল গলিয়া আসিতে পারে, তাহা দেখান যাইতে পারে। এ সব ছোট বড় ছিদ্রের কথা থাক, ইহা কঠিন পদার্থের সঙ্কোচ্যতাই সপ্রমাণ করিতেছে; অণুগুলি যতই ঘনসন্নিবিষ্ট হউক, উহাদের মধ্যে সামান্য অবকাশ আছে। বস্তুতঃ উহারাও একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া নাই।

তার পর কথা উঠে, অণুগুলি সেই ভিড় ঠেলিয়া চলিতে পারে কি না? উহাদের গতি আছে কি না?

এইখানে তরলে কঠিনে ব্যবহারের প্রভেদ দেখা আবশ্যক। অনিল বা বাষ্প যে পাত্রে থাকে, সেই পাত্রের গায়ে চাপ দেয়। তরল পদার্থও যে পাত্রে থাকে, সেই পাত্রের গায়ে চাপ দেয় এবং সেই চাপ সর্ব্বতোমুখ চাপ—ঊর্দ্ধমুখ, নিম্নমুখ, পার্শ্বমুখ। শুধু পাত্রের গায়ে কেন, কোন কঠিন দ্রব্য অনিলে, বাষ্পে বা তরলে নিমগ্ন করিলে, সেই দ্রব্যের আশে পাশে, উপরে নীচে, সকল দিকেই চাপ পড়ে ও সেই চাপের ঠেলে কঠিন দ্রব্যটা একটু ঊর্দ্ধগামী হইবারই চেষ্টা করে। প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে উহার ভার যেন কমিয়া

যায়। অনিলের, বাষ্পের, তরলের এই সর্ব্বতোমুখ চাপ বেশ বুঝা যায়। অণুগুলির বেগে গতিমত্তাই এই চাপের কারণ। প্রত্যেক অণু ঝোঁকের সহিত গিয়া ধাক্কা দেয় ও ধাক্কা খাইয়া ঝোঁকের সহিত ফিরিয়া আইসে, সেই জন্যই এই চাপ। অনিল, বাষ্প ও তরল, সকলেরই অণু গতিশীল ; তাই সকলেই চাপ দেয়। কিন্তু কঠিনের এইরূপ চাপ দিবার ক্ষমতা আদৌ নাই। একটা পাত্র লোহাচূরে বা বালিতে বা মাটিতে পূর্ণ করিলে পাত্রের তলদেশে চাপ পড়ে বটে, সে চাপ ভারের দরুন চাপ। সে চাপ সকল পদার্থেরই আছে। উহার সহিত মাধ্যাকর্ষণের সম্বন্ধ। পৃথিবীর সান্নিধ্য উহার হেতু। পৃথিবী ছাড়িয়া বহু দূরে গেলে এই চাপের মাত্রা কমিয়া যায় ; চন্দ্রের নিকটে গেলে নব্বই মণের চাপ এক সেরের চাপের সমান হইয়া দাঁড়ায়। আর আশে পাশে বা ঊর্দ্ধমুখে চাপ দিবার ক্ষমতা কঠিন পদার্থের আদৌ নাই। তরলের আর অনিলের যে চাপের ক্ষমতা আছে, কঠিনের সে ক্ষমতা আদৌ নাই। তরলের বা অনিলের অণুগুলিকে চলন্ত অণু মনে করা গিয়াছে, উহারা চলিতে চলিতে ঝোঁকের সহিত ধাক্কা দেয় বলিয়া চাপ দেয়। কঠিন পদার্থ যখন চাপ দেয় না, তখন উহার অণুগুলিকে আর চলন্ত মনে করা চলে না। উহারা স্বস্থানে স্থির আছে। আপন আপন স্থান ছাড়িয়া উহারা অন্যত্র চলে না। অনিলের, বাষ্পের ও তরলের অণুগুলির বৈশিষ্ট্য যে চাঞ্চল্য, ছুটাছুটি, কঠিনের অণুগুলি সেই চাঞ্চল্যে বর্জ্জিত। তাই তাহারা এদিকে ওদিকে ছুটিয়া ধাক্কা দিতে পারে না ও চাপ দিতে পারে না। তবে পৃথিবীর সান্নিধ্যে পৃথিবীর কেন্দ্রমুখে অন্যান্য জিনিসের মত চলিতে পারে ও তজ্জন্য অধোমুখে একটা চাপ দেয় বটে। একখানা সীসার ফলকের উপর একটা খাঁটি সোনার স্তম্ভ কয়েক বৎসর ধরিয়া চাপাইয়া রাখিয়া, পরে সেই সোনা বিশ্লেষণ করিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ সীসা পাওয়া গিয়াছিল। সীসার অণুগুলি ঊর্দ্ধমুখে আপনা হইতে উঠিয়া সোনার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, ইহাতে কঠিন পদার্থের অণুগুলির চাঞ্চল্যের কিঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বহু বৎসরে অল্প মাত্রায় যে সীসক স্বর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার পরিমাণ এত সামান্য যে, উহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। কঠিন পদার্থের অণু একেবারে স্থির—একেবারে চাঞ্চল্যবর্জ্জিত বলিলে বোধ করি ঠিক হয় না, তবে সেই চাঞ্চল্য এত সামান্য যে, তাহার দরুণ চাপ

ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। মোটামুটি কঠিন পদার্থের অণুকে স্থিরস্বভাব মনে করিলে ভুল হইবে না।

একেবারে যে স্থিরস্বভাব নহে, তাহা মনে করিবার আরও কারণ আছে। তরল পদার্থের পিঠ হইতে যেমন বাষ্প নির্গত হয়, কঠিনের পিঠ হইতেও অল্পবিস্তর মাত্রায় বাষ্প উঠে। বরফের পিঠ হইতে অবিরত বাষ্প উঠে। কর্পূরের মত কঠিন দ্রব্য কালক্রমে অদৃশ্য হয়, ইহার অর্থ—উহার পিঠ হইতে ক্রমাগত বাষ্প নির্গত হইতেছে। কঠিন পদার্থ প্রথমে তরল ও তরল পদার্থ বাষ্প হয়, ইহাই সর্ব্বদা পরিচিত ঘটনা, কিন্তু কঠিন পদার্থ তারল্য না পাইয়াও একেবারে বাষ্পীভূত হইতেছে, ইহাও নিতান্ত অপরিচিত ঘটনা নহে; এই ঘটনাকে উবিয়া যাওয়া বলে। অতএব মনে করিতে হইবে, কঠিন পদার্থের পিঠের কাছের অণুগুলি অন্ততঃ চঞ্চল, তাহারা ছুটিয়া বাহিরে যাইতেছে। তবে ভিতরের অণুতে ততটা চাঞ্চল্য না থাকিতেও পারে।

কর্পূর প্রভৃতি দ্রব্যের গন্ধ দূরে হইতে পাওয়া যায়, তাহারও এই কারণ। উহার অণুগুলি ছুটিয়া আসিয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে তবে ত গন্ধ পাওয়া যায়। তামা, লোহা প্রভৃতি ধাতুদ্রব্যেরও না-কি কিরূপ একটা মৃদু গন্ধ আছে। যাঁহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ, তাঁহারা গন্ধদ্বারা ধাতুও চিনিতে পারেন। তাহা হইলে ঐ সকল ধাতুর পিঠ হইতেও অণুগুলি ছুটিয়া আসিতেছে অনুমান চলিতে পারে।

পিঠের কাছে যাহাই হউক, কঠিন পদার্থের অভ্যন্তরে অণুগুলি স্থিরস্বভাব মনে করা চলে। যদি বা কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য থাকে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। তাহারা শুধুই যে স্থিরস্বভাব, তাহারা যে স্বস্থানে প্রায় অবিচলিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা নহে। স্থানবিশেষে তাহাদের দাঁড়াইবার একটা প্রথা বা প্রণালী আছে।

অনেক কঠিন পদার্থ দানা বাঁধে। সকলে না বাঁধিলেও অনেকে বাঁধে, তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। চিনির মত জীবজ পদার্থ দানা বাঁধে। তুঁতে, হীরাকস, সোরার মত লাবণিক পদার্থ দানা বাঁধে, গৈরিক আকরিক পদার্থ অনেকে দানা বাঁধিয়া থাকে। সীসা, তামা, লোহার মত ধাতুতেও দানা বাঁধে। বরফের দানা আপাততঃ দেখা যায় না, কিন্তু উহার কণিকাগুলিও সুন্দর ষট্‌কোণ দানার আকারে সাজান, তুষার-কণিকায় তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। এই সকল দানাদার পদার্থের অণুগুলি কেবল যে দাঁড়াইয়া আছে,

তাহা নহে, বেশ একটা প্রণালীক্রমে সাজান আছে মনে করিতে হয়। এলোমেলো হইয়া থাকিলে ওরূপ দানা বাঁধিত না। ত্রিকোণ জমির উপর একটা পিরামিড তুলিয়া এইরূপ দুইটা পিরামিড একই জমির দুই দিকে সংলগ্ন করিলে যেমন দেখায়, হীরকের দানাও দেখিতে সেইরূপ। হীরা কয়লারই রূপান্তর, পোড়াইলে হীরা ও কয়লা উভয় জিনিসই অম্লানযুক্ত হইয়া একই অনিলে পরিণত হয়। ঐ অনিল চুনের জলকে ঘোলা করে। কাজেই হীরা ও কয়লা একই জিনিসের রূপান্তর। তবে কয়লা দানা বাঁধে না। উহার অণুগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এলোমেলো হইয়া বর্ত্তমান, কোনরূপ একটা সজ্জা বা শৃঙ্খলা নাই। কিন্তু হীরক অতি সুন্দর দানা বাঁধে। উহার অণুগুলি বেশ প্রণালীমত সাজান রহিয়াছে :

কতকগুলি লোক এক জায়গায় ভিড় করিয়া থাকিতে পারে ; আবার তাহারাই একটা শৃঙ্খলাক্রমে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইলেই বা কেমন দেখায়। সেনাপতি যুদ্ধের সময় সৈন্যদিগকে একটা বিশেষ রকমে সাজাইয়া ব্যূহ রচনা করেন। থিয়েটার গ্যালারিতে দর্শকেরা থাকে থাকে বসিয়া থাকে। ক্লাসে ছাত্রেরা সারি বাঁধিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের সম্মুখে ও দুই পাশে বেঞ্চের উপর বসে। ঐরূপ সাজানই প্রণালীমত সাজান। ঐরূপ সাজাইলে অবশ্য আর যার যেখানে ইচ্ছা, তার সেখানে থাকা চলে না। মাঠের মধ্যে ইষ্টকরাশি স্তূপাকার করিয়া রাখিলে এক রকম দেখায়, আর সেই ইষ্টকগুলি একখানির পাশে একখানি, একখানির উপরে একখানি, প্রণালী-মত সাজাইলে তাহাতেই সুরম্য অট্টালিকা হয়, তাহা কেমন সুন্দর। কিন্তু প্রত্যেক ইষ্টক যথাস্থানে বিন্যস্ত করা চাই। যিনি সাজাইয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায়মত গাঁথা চাই, যেখানে সেখানে রাখা চলিবে না। সেইরূপ ব্যূহমধ্যে সৈন্যেরা নিজের ইচ্ছামত দাঁড়াইতে পারে না, সেনাপতির ইচ্ছামত দাঁড়ায় ; ক্লাসের ছেলেরা মাষ্টার মহাশয়ের অভিপ্রায়মত বসে। দানাদার পদার্থের অণুগুলিও ঐরূপ যেন কোন একটা অভিপ্রায়মত সাজান হইয়াছে। অণুগুলির আর স্বাধীনতা নাই। তরল ও অনিলের অণুগুলি যেমন যথেচ্ছভাবে অসংযতভাবে এদিকে ওদিকে ছুটিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেছে, দানাদার কঠিন পদার্থের অণুগুলির সেই স্বাধীনতা নাই ; উহারা ইচ্ছামত ছুটাছুটি করিতে অসমর্থ। উহাদের উপর যেন একটা কঠিন হুকুম কোথা হইতে আসিয়াছে। সেই হুকুমের প্রতিপালনে উহারা বাধ্য।

অণুগুলির কি নিজেরই এমন একটা ক্ষমতা আছে যে, আপন আপন স্থান পছন্দ করিয়া নির্ব্বাচন করিয়া আপনাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া লইতে পারে, অথবা বাহিরের কোন কর্ত্তার বা বিধাতার আদেশক্রমে বা অভিপ্রায়ক্রমে উহারা ঐরূপ সজ্জিত থাকে, তাহা একটা দর্শনশাস্ত্রের সমস্যা। এ স্থানে ঐ সমস্যাটার উল্লেখ মাত্র করিয়া নিরস্ত থাকিলাম। স্থানান্তরে পুনরায় ইহার আলোচনা করা যাইবে। যাঁহারা অধিক মাত্রায় কাব্যরস-পিপাসু, তাঁহারা এই স্থলে নানা কাব্যরসের অবতারণার অবকাশ পাইবেন।

কঠিন পদার্থের এই দানা বাঁধিবার প্রকৃতিতে স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে যে, উহাদের সম্পূর্ণ চাঞ্চল্য, সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নাই। প্রত্যেক অণুকে তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী অণুর মুখ চাহিয়া দাঁড়াইতে হয়। ছুটাছুটি করিবার অবকাশ থাকে না। অর্থাৎ মোটের উপর কঠিন পদার্থের অণু স্থিরস্বভাব।

কিন্তু এইখানে আর একটা প্রশ্ন আইসে। তরল পদার্থের, বাষ্পের ও অনিলের উষ্ণতা বুঝিবার জন্য উহাদের অণুগুলির গতিশীলতা অনুমান করিতে হইয়াছে। খানিকটা তাপ প্রবেশে উষ্ণতা বাড়ে; তাপ পদার্থটা যানশক্তির রূপান্তর; অতএব অণুগুলির যানশক্তি বৃদ্ধি হয়। উহাদের বেগ বাড়ে, চাঞ্চল্য বাড়ে। যে যত উষ্ণ, তাহার অণু ততই চঞ্চল, তত অধিক বেগে বিচরণশীল। কিন্তু কঠিন পদার্থে ত উষ্ণতাভেদ আছে। তাপযোগে সোনা, লোহা, কাঠ, পাথর, তুঁতে, হীরাকস, কয়লা, হীরা, সবই ত উষ্ণ হয়, কিন্তু উহাদের অণুগুলি যদি স্থিরস্বভাবই ধরা গেল, তাহা হইলে আর বেগবৃদ্ধির অবসর কোথায়? এ স্থানে তবে তাপটা কি হইল? যে তাপটা ভিতরে প্রবেশ করায় উষ্ণতাবৃদ্ধি ঘটিল, সে তাপ ত যানশক্তিরই রূপান্তর, কিন্তু অণুগুলি যদি স্থিরস্বভাব হয়, উহারা যদি অচল হইয়াই দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাদের অন্তর্গত তাপের পরিণতি কিরূপে বুঝা যাইবে?

ইহার উত্তর এইরূপে দেওয়া যায়। কঠিন পদার্থের অণুগুলি চলে না, কিন্তু উহারা কাঁপে। উহারা স্বস্থানে দাঁড়াইয়া কাঁপে। কম্পনও একরূপ গতি; তবে উহাকে চলন বা বিচলন বলা যায় না। চলন, সঞ্চলন, বিচরণ অর্থে এক স্থান হইতে দূরে যাওয়া, আর কম্পন অর্থে এক স্থানে দাঁড়াইয়া

এদিকে ওদিকে আন্দোলিত হওয়া। জ্বরের রোগী শয্যাতে শুইয়া কাঁপিয়া থাকে। ঝড়ের সময় গাছের বড় বড় ডাল কাঁপে, মৃদু হাওয়ায় গাছের পাতাগুলি কাঁপে। কিন্তু উহারা স্বস্থান ছাড়িয়া অধিক দূর যায় না। স্বস্থানেরই একবার ডাহিনে, একবার বামে, একবার উপরে, একবার নীচে যায় মাত্র।

তরল ও অনিলের অণু যেমন সঞ্চরণশীল, ছুটিয়া বেড়াইতে সমর্থ, কঠিনের অণু তেমন সঞ্চরণশীল নহে; তেমন ছুটিয়া বেড়ায় না; উহারা আপন স্থানে দাঁড়াইয়া কাঁপে। থিয়েটারের গ্যালারির দর্শকবৃন্দও তামাসা-কৌতুক দেখিয়া হর্ষভরে শরীর আন্দোলন করিতে পারেন, ক্লাসের ছাত্রেরা বেঞ্চে বসিয়া মাষ্টার মহাশয়ের বেতের ভয়ে কাঁপিতে পারেন, এই স্বাতন্ত্র্যটুকু তাঁহাদের আছে। সেইরূপ কঠিন পদার্থের অণুগুলিও স্বস্থানে দাঁড়াইয়া, এমন কি, দানাদার পদার্থের অণুগুলিও আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া হেলিতে বা কাঁপিতে পারে। চলার নাম ছোটা, আর কাঁপার নামান্তর ছট্‌ফটানি। তরলের ও অনিলের অণু ছোটে, আর কঠিনের অণু ছট্‌ফট্‌ করে। এই ছট্‌ফটানিটাও যানশক্তির ফল। যানশক্তি বাড়িলে ছট্‌ফটানিও বাড়িবে। তাপ যানশক্তির রূপান্তর; তাপাধিক্যে অণুদিগের ছট্‌ফটানি বাড়িয়া যায়, এরূপ অনুমান চলিতে পারে।

অনুমান ত চলিতে পারে, কিন্তু সেই অনুমান সঙ্গত কি না? বৈধ কি না? সেই অনুমানের অনুকূলে আর কোন কথা বলিবার আছে কি না? আছে বৈ কি! বাস্তবিকই কঠিন পদার্থের অণুগুলি কম্পনশীল, এইরূপ অনুমান করিবার আরও হেতু আছে। কেবল যে তাপ যানশক্তির রূপান্তর, এই তথ্য বাহাল রাখিবার জন্যই ঐরূপ কল্পনা আবশ্যক, তাহা নহে; ঐরূপ কল্পনার আরও স্বতন্ত্র কারণ আছে।

সেই হেতুগুলি এখন আলোচ্য। আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কেবল যে কঠিন পদার্থের অণুই কম্পনশীল, তাহা নহে। তরলের, বাষ্পের, অনিলেরও অণুসকল কম্পনশীল। কঠিনের অণু স্বস্থানে বসিয়া কাঁপে, আর তরলের, বাষ্পের ও অনিলের অণু কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটে। কঠিনের অণু কেবল ছট্‌ফট্‌ করে, তরলের, বাষ্পের ও অনিলের অণু ছোটে এবং ছট্‌ফট্‌ করে অথবা ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ছোটে। গায়ে মৌমাছির পাল বসিয়া হুল বিঁধিতে আরম্ভ করিলে যেমন ছট্‌ফট্‌ করিয়া হাত পা

ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে ছুটিতে হয়, উহারা সেইরূপ ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ছোটে। বঙ্কিম বাবু "রজনী" নামক কাব্যে মুগ্ধ মানসনেত্র বিস্ফারণ করিয়া লিখিয়াছেন, "ললিত-লবঙ্গলতা ললিত-লবঙ্গলতার ন্যায় দুলিতে দুলিতে দুলিতে বলিল।" বৈজ্ঞানিকের সেরূপ মোহ ঘটে কি না জানি না ; কিন্তু তিনিও মানসনেত্রে দেখেন, কঠিনের অণুগুলি দোলে মাত্র, কিন্তু তরলের ও অনিলের অণুগুলি দুলিতে দুলিতে চলিতে থাকে।

এই তথ্যটি বড় গুরুতর তথ্য। ইহার আলোচনা করিতে গিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রের নূতন পর্য্যায়ে আমাদিগকে নামিতে হইবে। কম্পন-গতি একপ্রকার বিশেষরূপ গতি, উহার স্বরূপ ও উহার ফলাফল বিশেষরূপে বিবেচ্য। উহার স্পষ্ট ধারণা না জন্মিলে অণুসকলের ছট্‌ফটানি তত্ত্বটা ঠিক বোঝা যাইবে না। জড় পদার্থের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধেও জ্ঞান অস্পষ্ট থাকিবে। কাজেই জড় পদার্থের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনাও এইখানে ক্ষান্ত করা যাক এবং কম্পনতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

কম্প-গতি

কম্প-গতির স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। কম্পন, স্পন্দন, আন্দোলন, নর্ত্তন প্রভৃতি বিবিধ নামে এই গতি অভিহিত হইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্তের এত বাহুল্য যে, দৃষ্টান্ত স্থলে ভগবানের হিন্দোল দোলের বা রাসনৃত্যের উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে। যেখানে কোন বস্তু পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়, সেইখানেই কম্প-গতি। কম্প-গতি কাহাকে বলে, জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, যে গতি নির্দ্দিষ্ট কাল পরে পরে পুনরাবৃত্ত হয়, তাহাই কম্প-গতি। হাতের কাছে প্রকৃষ্ট উদাহরণ ঢেঁকি যন্ত্র। পৃথিবীতে যাহার সৌভাগ্যের ইয়ত্তা নাই, যে যাবজ্জীবন সুন্দরী তরুণীর চরণ-তাড়না অকাতরে সহ্য করে, যাহার সৌভাগ্য দেখিয়াই বোধ করি, দেবর্ষি তাহাকে বাহনরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। তরুণী যেমন তালে তালে নির্দ্দিষ্ট কাল অন্তরে চরণক্ষেপ করেন, ঢেঁকিও তেমনই পুনঃ পুনঃ গর্ব্বভরে মাথা কুটিয়া আপনার সৌভাগ্যের কথা বিশ্ববাসীকে সশব্দে জানায়। উহার এই উঠা-নামাই কম্প-গতির উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

উদাহরণের অভাব নাই। জল পড়ে, পাতা কাঁপে, হৃৎপিণ্ড কাঁপে, শ্বাসযন্ত্র কামারের হাতিনার মত সঙ্কোচ প্রসার প্রাপ্ত হয়। সমুদ্রের জল জোয়ার-ভাঁটায় দিনে দুই বার যথাকালে উঠে নামে। এমন কি, ঘানি-গাছের বলদের ঘূর্ণন-গতিকেও কম্প-গতির প্রকারভেদ বলিতে পারা যায়; কেন না, বলদ ঘুরিয়া ফিরিয়া যথাকালে যথাস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়। নির্দ্দিষ্ট কাল ব্যবধানে যেখান হইতে বাহির হইয়াছিল, সেখানে ফিরিয়া আইসে। এই হিসাবে গ্রহ, উপগ্রহ, জ্যোতিষ্কের কক্ষাভ্রমণও কম্প-গতির উদাহরণ। চন্দ্র প্রায় ঊনত্রিশ দিন পরে পরে সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝে আসিয়া দাঁড়ায়—তখন অমাবস্যা। অমাবস্যা হইতে অমাবস্যা, এই নির্দ্দিষ্ট কাল চান্দ্র মাস। পৃথিবী ৩৬৫ দিন পরে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রাস্থলে প্রত্যাবৃত্ত হয় ও আবার সেই পথে যাত্রারম্ভ করে, আবার ঘুরিবার জন্য।

কিন্তু এক হিসাবে কম্প-গতির সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উদাহরণ ঘড়ির পেণ্ডুলাম বা পরিদোলক। দোলে বলিয়াই উহার নাম পরিদোলক। একগাছি সুতা বা তারের এক প্রান্তে একটা লোষ্ট্রখণ্ড বাঁধিয়া অন্য প্রান্ত ধরিয়া দোলাইয়া দিলেও উহা ঠিক পেণ্ডুলামের মত দোলে, অথবা উহাই পেণ্ডুলাম।

এই পরিদোলকের গতিটা কিরূপ, একবার আলোচনা করা উচিত। পরিদোলক একবার ডাহিনে যায়, একবার বামে যায়। দোলন আরম্ভের পূর্ব্বে যে স্থানে লোষ্ট্রখণ্ডটা স্থির ছিল, ঐ স্থানকেই উহার স্বস্থান বলিব। স্বস্থান ছাড়িয়া উহা ডাহিনে চলে, চলিতে চলিতে কিছু দূর পর্য্যন্ত গিয়া থামে, আর যায় না, তার পর ফিরিয়া আবার স্বস্থানে আসে। স্বস্থান ছাড়িয়া যত দূর পর্য্যন্ত যায়, যাহার অধিক আর যায় না, সেই দূরত্বকে উহার কম্পের পরিসর বলা যাউক।

স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া দোলক থামে কি? না; তখন উহার বামে গতির আরম্ভ হয়। তখন বামে কিছু দূর পর্য্যন্ত গিয়া আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। তবেই উহার গতি হইল—(১) স্বস্থান হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত, (২) সেই দক্ষিণ প্রান্ত হইতে স্বস্থান পর্য্যন্ত, (৩) স্বস্থান হইতে বাম প্রান্ত পর্য্যন্ত, (৪) বাম প্রান্ত হইতে আবার স্বস্থান পর্য্যন্ত। এই চারিটি গতির সমন্বয়ে উহার একবার আন্দোলন বা একবার কম্পন সমাপ্ত হয়। তৎপরে আবার সেইরূপ আন্দোলন বা কম্পন পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত

হইতে থাকে। একটা আন্দোলনের মধ্যে চারিটি পাদ যথাক্রমে (১) (২) (৩) (৪) দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (১) ও (২) পাদ একত্রযোগে আন্দোলনের পূর্ব্বার্দ্ধ। (৩) ও (৪) একত্রযোগে অপরার্দ্ধ। পূর্ব্বার্দ্ধে পরিদোলক স্বস্থানের ডাহিনে থাকে, অপরার্দ্ধে বামে থাকে। পূর্ব্বার্দ্ধেও যতটা সময় লাগে, অপরার্দ্ধেও ঠিক ততটা সময় লাগে। পূর্ব্বার্দ্ধে স্বস্থান ছাড়িয়া ডাহিনে যত দূর যায়, অপরার্দ্ধেও স্বস্থান ছাড়িয়া বামে ঠিক তত দূরই যায়। অপরার্দ্ধ সর্ব্বাংশে ঠিক পূর্ব্বার্দ্ধেরই প্রতিরূপ; যেন পূর্ব্বার্দ্ধকে উল্‌টাইয়া দিলেই অপরার্দ্ধ হয়। তরুণীর বদনচন্দ্রের সহিত দর্পণগত বদনচন্দ্র-প্রতিবিম্বের যে সম্পর্ক, পরিদোলকের কম্প-গতির পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত অপরার্দ্ধেরও কতকটা সেইরূপ সম্পর্ক। একবার কম্পে যদি বার সেকেণ্ড সময় লাগে, পূর্ব্বার্দ্ধে সময় লাগিবে ছয় সেকেণ্ড; অপরার্দ্ধেও সময় লাগিবে ছয় সেকেণ্ড।

শুধু তাহাই নহে, কম্পের প্রথম পাদে ও দ্বিতীয় পাদেও সেইরূপ সম্পর্ক। প্রথম পাদে স্বস্থান ছাড়িয়া দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছিতে যে সময়, দক্ষিণ প্রান্ত হইতে স্বস্থানে পুনরাগমনে সেই সময়; প্রথম পাদে তিন সেকেণ্ড হইলে দ্বিতীয় পাদেও তিন সেকেণ্ড।

আবার তৃতীয় পাদও চতুর্থ পাদের ঠিক প্রতিরূপ। তৃতীয় পাদে স্বস্থান হইতে বাম প্রান্ত পৌঁছিতে তিন সেকেণ্ড লাগিলে, চতুর্থ পাদে বাম প্রান্ত হইতে স্বস্থান প্রাপ্তিতে সেই তিন সেকেণ্ড লাগিবে। একবার পূর্ণ কম্পে বার সেকেণ্ড; অর্দ্ধ কম্পে ছয় সেকেণ্ড; পাদ কম্পে তিন সেকেণ্ড।

এই কম্পের সহিত ঢেঁকির কম্পের তুলনা করা যাক। ঢেঁকি উঠে নামে, স্বস্থান ছাড়িয়া উপরে উঠে, আর ঊর্দ্ধ প্রান্ত হইতে নীচে নামে। এই দুই অর্দ্ধ লইয়া হইল এক পূর্ণ কম্প। তার পর আবার উঠে নামে, আবার উঠে নামে, অর্থাৎ কম্প পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হয়। কিন্তু এ স্থলে এক পূর্ণ কম্পের প্রথম অর্দ্ধ ও দ্বিতীয় অর্দ্ধ তুলনা করিলে দেখা যায়, উভয় ঠিক সমকালব্যাপী নহে। উঠিবার সময় ধীরে উঠে, কেন না, তরুণীর চরণ বরাবর যন্ত্রে সংলগ্ন থাকে; তার পর তরুণী সহসা চরণ সরাইয়া লন, আর ঢেঁকি ধপ্‌ করিয়া পড়ে, অপরার্দ্ধ কাজেই দ্রুত নামে। এখানে পূর্ব্বার্দ্ধ অপরার্দ্ধের সমকালব্যাপীও নহে, ঠিক প্রতিরূপও নহে।

পরিদোলকের কম্পকে দুই অর্দ্ধে ও চারি পাদে ভাগ করা চলে। পূর্ব্ব অর্দ্ধেও যে সময়, অপর অর্দ্ধেও সেই সময়। ঢেঁকির কম্পকে দুই অর্দ্ধে ভাগ করিলে দেখা যায়, পূর্ব্বার্দ্ধ অপরার্দ্ধের সমকালব্যাপী নহে। আর ঢেঁকির বেলায় চারি পাদে ভাগের কথাই উঠে না। প্রত্যেক অর্দ্ধকে আবার দুই সমান ভাগে ভাগ করিবার কোনও সুবিধা দেখা যায় না।

কাজেই পরিদোলকের কম্পে যে শৃঙ্খলা আছে, ঢেঁকির কম্পে সে শৃঙ্খলা নাই। সেই জন্যই বলিয়াছি যে, পরিদোলকের গতি এক হিসাবে কম্প-গতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। উহা সহজবোধ্য; কেন না, উহাতে এই শৃঙ্খলা আছে, এই ব্যবস্থাটুকু আছে। ঢেঁকির কম্প উহা অপেক্ষা জটিল। ফলে কম্প-গতির স্বরূপ আলোচনায় ঐ সুনিয়ত সহজবোধ্য পরিদোলকের গতি লইয়াই আরম্ভ করিতে হয়। ঢেঁকির কম্প সহজ না হইলেও উহা কম্প; কেন না, কম্প-গতির যে লক্ষণ,—নির্দ্দিষ্ট কাল পরে পরে পুনরাবৃত্তি, তাহা পরিদোলকেও আছে, ঢেঁকিতেও আছে।

পরিদোলকে কম্পের পর কম্প, তার পর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, এইরূপ কম্প নির্দ্দিষ্ট কাল পরে পরে ঘটে; ঢেঁকিতেও সেইরূপ পরিদোলকের প্রথম কম্পে যদি বার সেকেণ্ড সময় লাগে, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ—প্রতি কম্পেও সেই বার সেকেণ্ড সময় লাগিবে। তরুণীও সেইরূপ সাবধানে পা ফেলিয়া বার সেকেণ্ড পর পর ঢেঁকি ফেলিতে পারেন। এই যে বার সেকেণ্ড কাল, যে কালে এক পূর্ণ কম্প সমাপ্ত হয়, উহার নাম দেওয়া যাউক কম্পনকাল। কম্পনকাল যত অধিক হইবে, সেকেণ্ডে কম্প-সংখ্যা তত কম হইবে। সেকেণ্ডে যত বার কম্প ঘটে, সেই সংখ্যাকে কম্পন-দ্রুতি বলিব। সেকেণ্ডে কম্প-সংখ্যা যদি দশ বার হয়, তাহা হইলে এক কম্পের কাল সেকেণ্ডের দশমাংশ; আর কম্পসংখ্যা যদি শত বার হয়, তবে কম্পকাল সেকেণ্ডের শতাংশ। কম্পদ্রুতির সহিত কম্পকালের এই সম্বন্ধ। একটা যে হারে বাড়ে, অন্যটা সেই হারে কমে।

উপায় কি

পরিদোলকের কম্পকাল বাড়াইবার বা কমাইবার জন্য একগাছা দড়িতে ইট ঝুলাইয়া পরিদোলক তৈয়ার করিয়াছি; দড়িগাছটা লম্বা কর, কম্পকাল বাড়িবে, কম্পদ্রুতি কমিবে; দড়ি খাট কর, কম্পকাল কমিবে, কম্পদ্রুতি

বাড়িবে। অতএব দড়িগাছটার দৈর্ঘ্যের সহিত কম্পকালের ও কম্পদ্রুতির সম্পর্ক। কিরূপ সম্পর্ক ?

দড়ি চারিগুণ লম্বা কর, কম্পকাল দ্বিগুণ হইবে। নয়গুণ লম্বা কর, কম্পকাল তিনগুণ হইবে ; ষোলগুণ কর, চারিগুণ হইবে। আর ২ × ২ = ৪, ৩ × ৩ = ৯, ৪ × ৪ = ১৬ ; কম্পকাল যতগুণ বাড়াইতে চাও, দড়ির দৈর্ঘ্য তাহার বর্গানুসারে বাড়াইতে হইবে।

কোন পরিদোলক বার সেকেণ্ডে একবার দোলে, আমি উহাকে এক-শ বিশ সেকেণ্ডে অর্থাৎ দুই মিনিটে এক বার দোলাইতে চাই। অর্থাৎ কম্পকাল দশগুণ করিতে চাহি। দড়িগাছটা ১০ × ১০ অর্থাৎ এক-শ গুণ দীর্ঘ করিতে হইবে।

পরিদোলক খাট হইলেই দ্রুত দোলে, আর লম্বা হইলেই মন্দ দোলে, এই তাৎপর্য্য।

ইষ্টকখণ্ডের বদলে যদি প্রস্তরখণ্ড বা ধাতুখণ্ড ঝুলাই, কম্পকালের কিছু ইতরবিশেষ হয় কি ? কিছুই না। তাজ্জব ব্যাপার !

কিন্তু স্থানভেদে ইতরবিশেষ ঘটে। কলিকাতায় যে পেণ্ডুলম যে সময়ে দোলে, লণ্ডনে সেই পেণ্ডুলম তার চেয়ে কিঞ্চিৎ শীঘ্র দোলে ; আবার উঁচু পর্ব্বতের উপর বা ব্যোমযানের উপর কিঞ্চিৎ বিলম্বে দোলে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এজন্য দায়ী। লণ্ডনে মাধ্যাকর্ষণ একটু বেশী, পর্ব্বতের উপর একটু কম। তাহার সহিত এই ইতরবিশেষের সম্পর্ক।

পরিদোলক একবার দোলাইয়া দিলে, লাখ বার দুলিতে থাকে। ঘড়ির পেণ্ডুলম তাহার পেণ্ডুলম-জন্ম ব্যাপিয়াই দুলিতেছে। প্রতি বার কম্পে যদি কিঞ্চিৎ সময়ের তারতম্য হয়, লাখ বার কম্পে আর সেই তারতম্যটা আর কিঞ্চিৎ থাকে না, সময়ের অনেকটা তফাৎ হইয়া পড়ে। কাজেই একটি পরিদোলককে কলিকাতায় ও লণ্ডনে দোলাইয়া উভয় স্থানে মাধ্যাকর্ষণের যে কিঞ্চিৎ তারতম্য, তাহা ধরা চলে। স্থানভেদে মাধ্যাকর্ষণের বা ভারের তারতম্য ধরিবার এমন সুন্দর উপায় আর নাই।

মাধ্যাকর্ষণ স্থানভেদ বিচার করে, কিন্তু দ্রব্যভেদ বিচার করে না। এক সের লোহা ও এক সের পাথর, উভয়ের বস্তুও সমান, ওজনও সমান। ইহা আগে বলিয়াছি। পরিদোলকে লোহাই ঝুলাও, আর পাথরই ঝুলাও, মাধ্যাকর্ষণের ভেদ না থাকায় কম্পকালের ভেদ হয় না। নিউটন এই

পরিদোলক দ্বারাই সপ্রমাণ করিয়াছিলেন, মাধ্যাকর্ষণ দ্রব্যবিচার করে না। এক সের সোনারও যে ওজন, এক সের লোহারও সেই ওজন।

গ্যালিলিওর নাম পূর্ব্বে কত বার করিয়াছি, তিনি নিউটনের পূর্ব্বগামী। তিনি পরিদোলকের কম্প-ঘটিত একটি অদ্ভুত নিয়ম আবিষ্কার করেন। তাহা এই—কম্পের পরিসর যাহাই হউক, উহার কম্পকালের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। পরিদোলক স্বস্থান ছাড়িয়া ডাহিনে যত দূর পর্য্যন্ত যায়, সেই দূরত্বকে উহার পরিসর বলিয়াছি। ঐ পরিসর এক ইঞ্চি, দুই ইঞ্চি, দশ ইঞ্চি, যাহাই হউক, কম্পকালের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। দশ গজ লম্বা দড়িতে ইট ঝুলাইয়া উহাকে স্বস্থান হইতে এক ইঞ্চি ভ্রষ্ট করিয়া দোলাইয়া দাও, তাহাতে যত ক্ষণে যত বার দুলিবে, দশ ইঞ্চি ভ্রষ্ট করিয়া দোলাইয়া দাও, তাহাতেও তত ক্ষণে তত বার দুলিবে। কম্পকাল পরিসরের অপেক্ষা করে না।

একেবারেই যে করে না, এমন নহে। এক ইঞ্চি বা দশ ইঞ্চি দশ গজের তুলনায় সামান্য, কিন্তু দুই হাত, পাঁচ হাত, দশ গজের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর নহে। কম্পটা এক ইঞ্চি, দশ ইঞ্চির পরিবর্ত্তে দুই হাত, পাঁচ হাত ভ্রষ্ট করিয়া দোলাইয়া দিলে, কম্পকালের কিছু প্রভেদ বুঝা যায়, কিন্তু সেও কিঞ্চিৎ মাত্র। ইঞ্চিতে হাতে যত তফাৎ, কম্পকালের তেমন তফাৎ ঘটে না।

কম্পকালের এই পরিসর-নিরপেক্ষতাতে একটা বড় উপকার হইয়াছে। পরিদোলককে স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দোলাইয়া দিলে উহা পুনঃ পুনঃ দুলিতে থাকে, কিন্তু এই আন্দোলনের একটা বিঘ্ন আছে। প্রধান বিঘ্ন বায়ু। পরিদোলককে বায়ু ঠেলিয়া যাইতে হয়; পরিদোলকের যানশক্তির কিঞ্চিৎ বায়ুতে সঞ্চারিত হয়; পরিদোলকের যানশক্তি প্রত্যেক কম্পেই একটু একটু কমিতে থাকে। যে ঝোঁক লইয়া উহা স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হয়, আর যে ঝোঁকে উহা স্বস্থানে ফিরিয়া আসে, যানশক্তির ক্রমিক অপচয়ে সেই ঝোঁকের পরিমাণ ক্রমে কমে। ঝোঁক যত কমে, কাজেই স্বস্থান হইতে ছাড়িয়া যাইবার ক্ষমতাও তত কমে; কম্পের পরিসরটা ক্রমশঃ কমিয়া যায়। বায়ু বা অপর বিঘ্ন না থাকিলে এরূপ ঘটিত না; একবার দোলাইয়া দিলে পরিদোলক চিরকালটা সমান পরিসর বাহাল রাখিয়া পুনঃ পুনঃ দুলিতে থাকিত। কিন্তু ঐ সকল বিঘ্নের ফলে চিরকাল দুলিতে পারে না। ক্রমেই

শক্তির অপচয় ও ব্যত্যয় ঘটে, ক্রমেই ঝোঁকের মাত্রা কমে ও পরিসর কমে, শেষে পরিসর এত কম হয় যে, দুলিতেছে কি না, তাহা বুঝাই কঠিন হয়। মনে হয়, আর দুলিতেছে না—স্বস্থানেই স্থির থাকে।

বায়ুহীন স্থান নাই, বিঘ্নহীন স্থান নাই, কাজেই পরিদোলকের পরিসর ক্রমেই কমিতে থাকে। ঐ সঙ্গে যদি কম্পকাল ব্যতিক্রম হইত, তাহা হইলে আর পরিদোলক সময় মাপার কাজে লাগিত না। কিন্তু পরিসর যাহাই হউক না, কম্পকালের ইতরবিশেষ হয় না, যদি কিছু হয়, তাহাও নগণ্য। কাজেই একবার কম্পে যে সময়, শত বার কম্পে ঠিক তাহার শতগুণ সময়, লক্ষ কম্পে তাহার লক্ষগুণ সময় ধরিতে কোনও বাধা থাকে না।

এই গুণেই পরিদোলক এত আদরের জিনিস হইয়াছে। উহাতেই আমাদের সময় মাপিবার যন্ত্র তৈয়ার হইতেছে। ক্লক ঘড়ির পেণ্ডুলম কেবলই দুলিতেছে, কিন্তু যতই দুলুক, প্রত্যেক কম্পে সেই ঠিক এক সময়। এক কম্পে যদি এক সেকেণ্ড হয়, ষাটি কম্পে ঠিক ষাটি সেকেণ্ড বা এক মিনিট, আর ষাটিগুণ ষাটি বা ছত্রিশ শত কম্পে ষাটি মিনিট বা এক ঘণ্টা। আর চব্বিশগুণ ছত্রিশ শ অর্থাৎ ৮৬৪০০ কম্পে এক দিন।

এই দিনের অর্থ কি? আজ সূর্য্যদেব মধ্যাহ্নে মাথার উপর আসেন, কাল আবার সূর্য্যদেব মধ্যাহ্নে মাথার উপর আসেন, মধ্যাহ্ন হইতে মধ্যাহ্ন ব্যবধানের নাম দিন। বলা সহজ, কিন্তু এই ব্যবধানটুকু নির্দ্ধারণ করা তত সহজ নহে। কেন না, মাথার উপর ত গগনমণ্ডলের অনেকটা জায়গা, তার মধ্যে একটা বিন্দু কল্পনা করিয়া লইতে হইবে, সূর্য্যদেবের সেই বিন্দুতে আসা যায়। অথচ সূর্য্যদেবের বৃহৎ শরীরটা ত একবারে এক বিন্দুতে আসিবে না। তাহার মণ্ডলাকার বিম্বের কেন্দ্রবিন্দুটি যখন সেই নভঃস্থ বিন্দুতে—যাহার নাম স্বস্তিকবিন্দু, সেই বিন্দুতে আসিবে, তখনই হইবে মধ্যাহ্ন। আবার সূর্য্যদেব ত মাথার উপর আসিতেই চান না। প্রায় সারা বৎসর ধরিয়া দক্ষিণ চাপিয়াই থাকেন, কেবল আষাঢ় মাসে মাথার উপরে আসেন, সেও আমাদের দেশে; আরও উত্তরে বা বিলাতে কখনও মাথার উপরে আসেন না। কাজেই স্বস্তিকে আগমন যদি না ঘটিল, তবে আকাশমণ্ডলে একটা রেখা কল্পনা করিয়া লইতে হয়, যাহা আকাশের উত্তর ধ্রুববিন্দু হইতে আসিয়া স্বস্তিকবিন্দু ভেদ করিয়া দক্ষিণ ধ্রুববিন্দুগামী হইয়াছে। সূর্য্যদেব অর্থাৎ তাঁহার চক্রের কেন্দ্রবিন্দু যখন সেই রেখায়

আসেন, তখনই হইবে মধ্যাহ্ন। ইহাতেও রক্ষা নাই। কেন না, সূর্য্যদেব সকল দিন সমান বেগে চলেন না ; গ্রীষ্মকালে মন্দগতিতে চলেন, শীতকালে দ্রুতগতিতে চলেন। এই কারণে ও তদ্বিধ অন্য কারণে বৈশাখে মধ্যাহ্ন হইতে পর-মধ্যাহ্নের যে ব্যবধান, আশ্বিনে মধ্যাহ্ন হইতে পর-মধ্যাহ্নের সে ব্যবধান হয়। কাজেই বৈশাখের দিনমান আশ্বিনের দিনমানের সমান নহে। সূর্য্যদেবের এই চপলতার জন্য জ্যোতিষীদিগকে একটা কৃত্রিম সূর্য্যদেবের কল্পনা করিতে হইয়াছে ; তিনি সারা বৎসর ধরিয়া সমান বেগে চলেন, তাঁহার বৈশাখ আশ্বিন ভেদ নাই ; আমাদের প্রত্যক্ষগোচর সূর্য্যের কখনও একটু আগে, কখনও একটু পশ্চাতে থাকেন। কিন্তু সারা বৎসর পরে সেই কল্পিত সূর্য্য আসিয়া প্রত্যক্ষ সূর্য্যের নাগাইল ধরেন। এই কল্পিত সূর্য্যের কল্পিত মধ্যাহ্ন হইতে পরবর্ত্তী কল্পিত মধ্যাহ্নের যে ব্যবধান, বৈজ্ঞানিকের নিকট তাহাই এক দিন। সেই দিনের চব্বিশ ভাগের এক ভাগের নাম ঘণ্টা, ঘণ্টার ষাটি ভাগের এক ভাগের নাম মিনিট ও মিনিটের ষাটি এক ভাগের নাম সেকেণ্ড।

বৈজ্ঞানিক তাঁহার ঘটিকাযন্ত্রের পরিদোলকটিকে এরূপ দৈর্ঘ্য দিয়া থাকেন, যাহাতে তাহার একবার কম্পে সেই সেকেণ্ডের ঠিক দুই সেকেণ্ড অতিবাহিত হয়। সেই দৈর্ঘ্য দিয়া পরিদোলক দুলাইয়া দেন ; পরিদোলকে সোনা ঝুলিল, কি লোহা ঝুলিল, তাহা দেখিতে হয় না ; উহার পরিসর কমিল, কি বাড়িল, দেখিতে হয় না। দৈর্ঘ্যটা যদি ঠিক থাকে, তবে প্রত্যেক কম্পে সেই দুই সেকেণ্ডই লাগিবে ও ত্রিশ কম্পে এক মিনিট লাগিবে, ইত্যাদি।

বায়ুর বিঘ্ন ঠেলিয়া পরিদোলককে দুলিতে হয়, তাহাতে কম্পকালের ব্যতিক্রমের জন্য ভাবিতে হয় না, কিন্তু প্রতি কম্পে কিঞ্চিৎ শক্তির অপচয় ঘটে। শক্তি একেবারে ফুরাইয়া গেলে পরিদোলক অচল হইবার সম্ভব। সেই জন্য মাঝে মাঝে শক্তি মজুদ করিয়া দিতে হয়। পরিদোলকে শক্তি মজুদ করিবার জন্য যে প্রক্রিয়া, তাহার নাম ঘড়িতে দম দেওয়া।

দৈর্ঘ্যটা ঠিক থাকিলেই ঘড়ি ঠিক সময় রাখিয়া চলে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের দুর্ভাগ্যক্রমে দৈর্ঘ্য ঠিক থাকে না। গ্রীষ্মের গরমে পরিদোলকের দৈর্ঘ্য একটু বাড়ে, শীতের ঠাণ্ডায় একটু কমে, কাজেই কম্পকালের কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ হয়। এক কম্পে ইতরবিশেষ যৎকিঞ্চিৎ, কিন্তু সপ্তাহব্যাপী বহু

কম্পে আর যৎকিঞ্চিৎ থাকে না। ঘড়ি গ্রীষ্মকালে "শ্লো" চলে, আর শীতে "ফাষ্ট" হয়। এই জন্য কত অদ্ভুত কৌশলে উহার দৈর্ঘ্য ঠিক রাখার ব্যবস্থা করিতে হয়। সে সকল উত্থাপন করিব না, ইহাতেই পুঁথি বাড়িয়া গেল।

পরিদোলক তৈয়ার করিতে হইলে যে একগাছি দীর্ঘ রজ্জুতে একটা ভারী জিনিস ঝুলাইতেই হইবে, এমন নহে। যে-কোন জিনিসকে তাহার যে-কোন কিছু ধরিয়া দোলাইয়া দিলে উহা পরিদোলকের মত দুলিবে। তখন উহার গতি কম্পগতি হইবে, অর্থাৎ সহজবোধ্য সুনিয়ত কম্পগতি হইবে, ঢেঁকির মত জটিল হইবে না। উহার নির্দ্দিষ্ট কম্পকাল থাকিবে। দড়ির পরিদোলকের কেবল দৈর্ঘ্যটা জানিলেই উহার কম্পকাল অক্লেশে জানিয়া বলা চলে। এ ক্ষেত্রে তত অক্লেশে গণা চলিবে না, কিন্তু উহার আকার ও আয়তনের সঙ্গে কম্পকালের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক থাকিবে। সেই আকার-আয়তন বজায় রাখিলে কম্পকালের ব্যতিক্রম ঘটিবে না। ইচ্ছা করিলে একটা হাতীকেও একটা পরিদোলকে পরিণত করা চলে। উহার শুণ্ডাগ্র বা দন্তাগ্র ধরিয়া দোলাইতে পারিলে উহার নির্দ্দিষ্ট কম্পকাল থাকিবে। তবে শুণ্ডাগ্র ধরিলে যে কাল হইবে, দন্তাগ্র ধরিলে সে কাল হইবে না।

জোয়ার-ভাঁটা

জ্যোতিষীর হাতে একটা পরিদোলক আছে, উহা হাতী অপেক্ষাও বৃহৎ। ভাগীরথীর স্রোতে ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিলেন; ভাগীরথী যে সাগরে গিয়া আত্মহারা হইয়াছেন, সেই মহাসাগরই এই পরিদোলক। মহাসাগরের বক্ষ দিনে দুই বার ফাঁপিয়া উঠে। সাগরের বুক ফাঁপিয়া উঠিলে একটা জলের স্রোত ভাগীরথীর মুখে প্রবেশ করে ও কলিকাতা ছাড়িয়া উত্তরে কিছু দূর পর্য্যন্ত দিনে দুই বার সেই স্রোত ঠেলিয়া চলে। তখন হয় জোয়ার। আবার সাগরের বুক নামিয়া গেলে সেই জলস্রোত ভাগীরথীর মুখে বাহির হইয়া যায়, তখন হয় ভাঁটা। গঙ্গায় আসিয়া হয় জলের স্রোত: কিন্তু সাগরবক্ষে উহা স্রোত নহে, উহা কম্প। মহাসাগরের দিনে দুই বার হৃৎকম্প হয়। স্রোত হইল জলের ছুট, আর কম্পন হইল জলের উঠা নামা ছট্‌ফটানি। সাগরবক্ষে স্রোত হয় না, সেখানে জল

দুই বার উঠে, দুই বার নামে। এই স্থলে দুই বার উঠা দুই বার নামা ধরিয়া এক পূর্ণ কম্প।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় দেখিলাম, কলিকাতার গঙ্গার জোয়ার-ভাঁটার সময়নির্ণয়ে লেখা আছে, জোয়ার আরম্ভের সময় দশমীর দিন বেলা ৬টা ৮ মিনিট। একাদশীর দিন কিন্তু বেলা ৬টা ৫৬ মিনিট। এই সময়নির্দ্দেশ ষোল আনা ঠিক না হইলেও মোটামুটি ঠিক। ইহাতে এক পূর্ণ কম্পের কাল হয়—এক দিনের চেয়ে কিছু বেশী—২৪ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট। অর্থাৎ এক চান্দ্র দিনের বা এক তিথির গড়ে যে পরিমাণ, বারিধির এই কম্পকালের সেই পরিমাণ। বারিধিরূপ পরিদোলক সৌর দিনের সম্পর্ক রাখেন না, চান্দ্র দিনের হিসাব করেন। জোয়ারের সহিত চন্দ্রের এই সম্পর্ক আমাদের প্রাচীনদের জানা ছিল। কবি কালিদাস লিখিয়া গিয়াছেন,—"চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।" পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় চাঁদ উঠে, পরদিন প্রতিপদে দণ্ড দুই রাত্রে চাঁদ উঠে। আর আজ যখন জোয়ার আসে, কাল তাহার ৪৮ মিনিট অর্থাৎ দুই দণ্ড পরে জোয়ার আসে। ইহাই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই সম্পর্ক আবিষ্কৃত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তথ্যাবিষ্কারের ইহা উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু এত বড় সূর্য্যকে ছাড়িয়া চন্দ্রের সহিত সাগরের এই প্রীতি-উচ্ছ্বাসের মূলে কি আছে, ইহার উত্তর দেন সেই নিউটন। উত্তরটা বুঝিবার যোগ্য।

ভূমণ্ডল বৃহৎ বর্ত্তুল পিণ্ড, উহার ব্যাসার্দ্ধ প্রায় ৪০০০ মাইল। চন্দ্রও বৃহৎ বর্ত্তুল পিণ্ড, পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট হইলেও বৃহৎ, উহার দূরত্ব প্রায় ৬০ × ৪০০০ মাইল। পৃথিবীর পিঠ জলের আবরণে আবৃত; ষোল আনা নহে, প্রায় বারো আনা জলে আবৃত। পৃথিবীর কেন্দ্র চন্দ্র হইতে যত দূরে, পৃথিবীর পিঠ অর্থাৎ পৃষ্ঠস্থ জলাবরণ তার চেয়ে কিছু কম দূরে। কেন্দ্রের দূরত্ব যদি হয় ৬০, জলাবরণের অর্থাৎ সমুদ্রের দূরত্ব তাহা হইলে ৫৯। সমুদ্র চাঁদের কিছু কাছে আছে, কাজেই সমুদ্রে চাঁদের আকর্ষণ কিছু বেশী। আবার পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে যেখানে দূরত্ব ৬১, সেখানে সমুদ্রের প্রতি আকর্ষণ কিছু কম।

ভূমণ্ডলটা কঠিন পিণ্ড, সংহত জমাট পদার্থ, উহার এক জায়গায় টান পড়িলে সেই টানে অন্য স্থানও সরিয়া আসে। কঠিনের এক স্থান এক

বেগে, অন্য স্থান অন্য বেগে চলিতে পারে না। কিন্তু তরল পদার্থ সংহত নহে, উহার একাংশে এক বেগ, অন্য অংশে অন্য বেগ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। ফলে এই দাঁড়ায়, ভূপিণ্ড চন্দ্রের প্রতি যে বেগে চলিতে যায়, এ পিঠের জল তার চেয়ে বেশী বেগে চাঁদের দিকে চলিতে যায়; ফলে জলটা চাঁদের দিকে ফাঁপিয়া উঠে। আর ভূপিণ্ড যে বেগে চাঁদের দিকে চলিতে যায়, ও-পিঠের জল তার চেয়ে কম বেগে চলিতে যায় বা পিছাইয়া পড়ে, সেখানেই কতকটা জলের রাশি স্তূপাকৃতি হয়। পৃথিবীর যে পিঠ চাঁদের সম্মুখে ও যে পিঠ তাহার বিপরীত, উভয় দিকেই জল ফাঁপিয়া উঠে ও জোয়ার ঘটে। আশপাশের জল সরিয়া আসিয়া ঐ দুই পিঠে স্তূপাকার হয়, তাই দুই পাশে জলের কমতি ঘটিয়া ভাঁটা ঘটে।

এখন বঙ্গসাগর যখন চাঁদের সম্মুখে, তখন বঙ্গসাগরে জোয়ার ও তাহার ও-পিঠে অর্দ্ধ পৃথিবীর ব্যবধানেও জোয়ার। কিন্তু পৃথিবী ত বসিয়া থাকেন না; তিনি ২৪ ঘণ্টায় নিজদেহের এক বার আবর্ত্তন করেন। তাই যখন বঙ্গসাগর চাঁদের সম্মুখ ত্যাগ করিয়া বিপরীত দিকে যায়, তখনও আবার বঙ্গসাগরে জোয়ার। পরদিন আবার বঙ্গসাগর চাঁদের সম্মুখে আসিলে আবার জোয়ার। এইরূপে দিনে রাত্রে দুই বার জোয়ার। আর দুই বার জোয়ার হইলে দুই বার ভাঁটা।

পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় এক বার দেহ উল্টাইয়া আসেন। বঙ্গসাগরও চব্বিশ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া চাঁদের সম্মুখে আসেন, কিন্তু চাঁদকে ঠিক সেখানে সম্মুখে দেখিতে পান না। চাঁদ বসিয়া থাকেন না, তাঁহাকে আবার সাতাইশ দিন কয়েক ঘণ্টায় পৃথিবীকে এক পাক ঘুরিয়া আসিতে হয়। বঙ্গসাগর, দিনে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় এক পাক ঘুরিয়া আসিতে আসিতে চাঁদ খানিকটা আপন পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন, কাজেই চাঁদের নাগাল ধরিতে আরও খানিকটা সময় যায়,—দণ্ড দুই সময় যায়। পরদিন দণ্ড দুই পরে আবার বঙ্গসাগর চাঁদের সম্মুখে আসিলে আবার জোয়ার।

এখন চাঁদের সহিত জোয়ারের সম্পর্ক বুঝা গেল, এবং কেন চান্দ্র দিনের সহিত সাগরের কম্পকালের ঐক্য, তাহা বুঝা গেল।

এখন কথা এই, সূর্য্যের আকর্ষণ ত চন্দ্রের আকর্ষণ চেয়ে অনেক বেশী। সূর্য্য বহু দূরে থাকিলেও উহা এত প্রকাণ্ড বস্তু যে, চন্দ্রের আকর্ষণ চেয়ে

সূর্য্যের আকর্ষণ অনেক বেশী। তবে সূর্য্যের সহিত জোয়ারের সম্পর্ক দেখা যায় না কেন ?

ইহারও উত্তর পাওয়া যায়। আকর্ষণের ফল জোয়ার নহে, ভূকেন্দ্র ও ভূপৃষ্ঠে আকর্ষণের ভেদই জোয়ারের কারণ। উভয় স্থলে আকর্ষণ সমান হইলে জোয়ার ঘটিবে না। ভূকেন্দ্র হইতে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব ১ ধরিলে চন্দ্রের দূরত্ব হয় ৬০। ৬০এর নিকট ১ একবারে ফেলিবার নহে,—নগণ্য নহে। কিন্তু ভূকেন্দ্র হইতে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব ১ ধরিলে সূর্য্যের দূরত্ব হয় প্রায় ২৩০০০, ২৩০০০এর তুলনায় ১ নগণ্য। কাজেই সূর্য্যের আকর্ষণ অতি প্রবল আকর্ষণ হইলেও উহার পরিমাণ সমুদ্রেও যত, ভূকেন্দ্রেও প্রায় তত ; কাজেই সূর্য্যের জোয়ারও নগণ্য।

নগণ্য বটে, কিন্তু একেবারে শূন্য নহে। ফলে সূর্য্যের দরুনও সমুদ্রবক্ষের স্ফীতি কিঞ্চিৎ ঘটে ; এবং উহার কম্পের কাল এক সৌর দিন বা চব্বিশ ঘণ্টা।

চন্দ্রের নিমিত্ত যে জোয়ার হয়, সূর্য্যের জোয়ার তাহাতে মিলিত হয়। ফলে উভয়ে মিলিয়া কম্পটাকে একটু জটিল করে। একটা বৃহৎ পরিসরযুক্ত কম্পে একটা ক্ষুদ্র পরিসরযুক্ত কম্প চাপিয়া বৃহৎ কম্পটার সরলতা নষ্ট করিয়া উহাকে জটিল করিয়া তোলে। পরিদোলকের কম্প সরল, আর ঢেঁকির কম্প জটিল।

সেইরূপ সূর্য্যের জোয়ার চাঁদের জোয়ারকে একটু জটিল করিয়া দেয়। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা যেমন জোয়ার নির্ণয়ের সহজ উপায় দিয়াছেন, বস্তুতঃ নিয়ম তত সহজ নহে। কম্পের সহিত কম্পযোগে যে জটিল কম্পের উৎপত্তি হয়, পঞ্জিকা সেই জটিলতাটুকু ধরেন নাই। কেবল চাঁদের জন্য কম্পের স্থূল হিসাবটাই দিয়াছেন।

কম্পের সহিত কম্প যুক্ত হইলে কম্পের জটিলতা বৃদ্ধি হয় ; এই কথাটা মনে রাখিতে হইবে, পরে কাজে লাগিবে।

জোয়ার ভাঁটা সম্বন্ধে আর একটা প্রশ্ন তুলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। প্রশ্ন এই ; ঘড়ির পরিদোলককে বায়ুর বিঘ্ন ঠেলিয়া চলিতে হয়, কাজেই উহার শক্তির ক্ষয় ঘটে ; তজ্জন্য মাঝে মাঝে দম দিয়া শক্তি সঞ্চার করিতে হয়। মহাসাগররূপী বৃহৎ পরিদোলককে এরূপ কোন বিঘ্ন ঠেলিতে হয় কি না ?

বিঘ্ন নাই কোথায়? এ জগৎ তেমন জগৎই নহে। মহাসাগরেরও আন্দোলনে বিঘ্ন আছে।

ভূপিণ্ড এক দিনে এক পাক ঘুরিয়া থাকে; চন্দ্র কিন্তু ২৭ দিনে এক পাক ঘুরিয়া আসেন। চন্দ্র যদি আরও দ্রুত চলিয়া এক দিনে পৃথিবীর চারি দিকে এক পাক ঘুরিয়া আসিতেন, তাহার ফল কি হইত? বঙ্গসাগর চাঁদের সম্মুখে থাকিলে উহা চিরকাল চাঁদের সম্মুখেই থাকিত। কিন্তু তাহা ত হয় না। পৃথিবী তাড়াতাড়ি এক পাক ঘুরিয়া আসেন, আর চাঁদ এক দিনে এক চক্রের ২৭ ভাগের এক ভাগ মাত্র চলিবেন। কাজেই চাঁদকে পিছনে থাকিতে হয়। ভূপৃষ্ঠ চাঁদের সম্মুখ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, আবার পরদিনে চাঁদের সম্মুখে আসে—দণ্ড দুই পরে আসে; কেন না, সেই সময়ে চাঁদ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। যাক, চাঁদ পিছনে পড়েন, কিন্তু নিজে সম্মুখে সমুদ্রের জলকে কাঁপাইয়া রাখেন। পৃথিবী বেগে আবর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু চাঁদ তাহার পিঠের আবরণ জলরাশিকে নিজের দিকে টানিয়া ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। ঐ জল ত পৃথিবীরই আবরণ, পৃথিবীরই পরিচ্ছদ, তারল্যবশেই উহার ঐরূপ সঞ্চরণ সম্ভব। তারল্য না থাকিলে উহাকে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইত, চাঁদের দিকে হেলিয়া থাকা চলিত না। ইহার ফল হয় এই যে, জলরূপী পরিচ্ছদকে টানিয়া থাকায় পৃথিবীর আবর্ত্তনে বাধা পড়ে। আমি দৌড়িয়া যাইব, কেহ আমার জামা ধরিয়া টানিয়া ধরিলে যেরূপ ব্যাপার হয়, কতকটা সেইরূপ ঘটে। পৃথিবী বলে, আমি বেগে ঘুরিব ও আমার পিঠের জলকে লইয়াই ঘুরিব। চাঁদ বলেন, জলের রাশি আমার সম্মুখে স্তূপাকার হইয়া থাকিবে। কাজেই পৃথিবীর আবর্ত্তনে বিঘ্ন জল, জলের জোয়ারের বিঘ্ন পৃথিবীর আবর্ত্তন। একখানা চাকা বেগে ঘুরিতেছে, সেই চাকার পরিধিতে একখানা কাঠ চাপিয়া ধরিলে যেমন হয়, কতকটা সেইরূপ। কাঠে চাকার পরিধিতে ঘর্ষণ ঘটে, চাকার শক্তিক্ষয় ঘটে, উহার যানশক্তি ক্রমে তাপে পরিণত হয়; চাকার পরিধি ও কাঠখানা গরম হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়। পৃথিবীরূপ চাকা বেগে ঘূর্ণ্যমান, চন্দ্রাভিমুখ জলের স্তূপ তাহার উপর ঘর্ষণশীল। ফলে পৃথিবীর আবর্ত্তনের শক্তিক্ষয় ও সেই শক্তির তাপে পরিণতি। শক্তির সৃষ্টিও নাই, ধ্বংসও নাই, এই তথ্যে যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে এটুকু মানিতে হইবে। অতি অল্প মাত্রায় হইলেও পৃথিবীর আবর্ত্তনে যে যানশক্তি সঞ্চিত, তাহা

ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া তাপে পরিণত হইতেছে। অবশ্য যন্ত্র দিয়া এই তাপের পরিমাণ ধরিবার আশা নাই; তবে যানশক্তির ক্রমশঃ ক্ষয় এইরূপ অবশ্যম্ভাবী।

পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগ একটু একটু কমিতেছে; দুই দশ, কি দুই শত দশ শত বৎসরে বেগের হ্রাস ধরা না পড়িতে পারে, কিন্তু দু লাখ দশ লাখ বৎসরে উহার পরিমাণ আর নগণ্য থাকিবে না। ফলে লাখখানেক বৎসর আগে পৃথিবী আরও বেগে আবর্ত্তন করিত, তখন দিন ছিল চব্বিশ ঘণ্টার ছোট। লাখখানেক বৎসর পরে পৃথিবী আরও কম বেগে আবর্ত্তন করিবে। তখন দিন হইবে চব্বিশ ঘণ্টার অধিক। এই ক্রমিক তাপক্ষয়ের শেষ পরিণতিতে বহু লক্ষ বৎসরে এমন দিন আসিতে পারে, তখন পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগ এখনকার সাতাইশ ভাগের এক ভাগ হইবে। অর্থাৎ এখনকার প্রায় এক মাসে এক দিনরাত্রি ঘটিবে! সংবৎসরে তেরটা মাত্র অহোরাত্র ঘটিবে!

সাতাইশ দিনে যখন পৃথিবী ঘুরিবে, বলা বাহুল্য, চন্দ্র তখন পৃথিবীর এক পিঠেরই সম্মুখে থাকিবেন। পৃথিবী ঘুরিবেন এক চক্র সাতাইশ দিনে, চন্দ্রও ঘুরিবেন এক চক্র সাতাইশ দিনে। ফলে চন্দ্র ও পৃথিবী মুখোমুখি করিয়া ঘুরিবেন। বঙ্গসাগর যদি চাঁদের সম্মুখে থাকে, তাহা হইলে উহা বরাবরই চাঁদের সম্মুখে থাকিবে। জলস্তূপ আর বঙ্গসাগর হইতে সরিয়া অন্যত্র যাইবে না। জোয়ার ভাঁটার পুনরাবৃত্তি বন্ধ হইবে। পৃথিবীর আর শক্তিক্ষয়ও ঘটিবে না। অতএব অপেক্ষা কর, যদি জোয়ার ভাঁটার পরিদোলকের গতি লোপ দেখিতে চাও, তবে অপেক্ষা কর সেই সময়ের জন্য, যখন পৃথিবী সাতাইশ দিনে আপন দেহ আবর্ত্তন করিবেন।

না, অত দিন অপেক্ষা করিতে হইবে না। ইহার ফলভোগী কেবল পৃথিবী নহেন, চন্দ্রও ইহার ফলভোগী। চন্দ্রেরও শক্তিক্ষয় ঘটিবে, তাঁহার যানশক্তি কমিবে, তাঁহার পৃথিবী হইতে দূরত্ব আরও বাড়িবে।

তরঙ্গ

ক হইতে ম পর্য্যন্ত অক্ষরগুলি পর পর সাজান আছে।

অ .... আ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম

ই .... উ

প্রত্যেকটি অক্ষরের কম্পগতি কল্পনা কর। কাঁপিবার সময় স্বস্থান ছাড়িয়া ৫ সেকেণ্ডে উপরে উঠিয়া অ-আ রেখা স্পর্শ করে, আবার ৫ সেকেণ্ডে নামিয়া স্বস্থানে আইসে আর ৫ সেকেণ্ডে নিম্নে ই-উ রেখা স্পর্শ করে ও আবার ৫ সেকেণ্ডে উঠিয়া স্বস্থানে পৌঁছে। এইরূপে ২০ সেকেণ্ডে উহার এক বার কম্পন সম্পাত হয়। তার পর দ্বিতীয় কম্প। ক-এর কম্পনারম্ভের এক সেকেণ্ড পরে খ, ২ সেকেণ্ড পরে গ, ৩ সেকেণ্ড পরে ঘ, এইরূপ যথাক্রমে অক্ষরগুলির কম্পন আরম্ভ হইল। প্রত্যেকেরই কম্পন একবিধ, ৫ সেকেণ্ডে স্বস্থান হইতে অ-আ রেখা, ৫ সেকেণ্ডে অ-আ রেখা হইতে স্বস্থান, ৫ সেকেণ্ডে স্বস্থান হইতে ই-উ রেখা ও ৫ সেকেণ্ডে ই-উ রেখা হইতে স্বস্থান। ক'র ৫ সেকেণ্ড পরে চ, ১০ সেকেণ্ড পরে ট, ১৫ সেকেণ্ড পরে ত, ২০ সেকেণ্ড পরে প কাঁপিতে আরম্ভ করিবে। প-এর যখন প্রথম কম্পের আরম্ভ, তার ৫ সেকেণ্ড পূর্ব্বে ত'র কম্প আরম্ভ হইয়াছে। অতএব ত তখন অ-আ রেখায় (ত স্থান) কিন্তু থ দ ধ ন ইহারা তখনও অ-আ

ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন

(১) ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম

খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ

ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ

ক খ

(২) ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম

ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ

রেখাতে উপস্থিত হইতে পারে নাই। ক্রমানুসারে অ-আ রেখার একটু একটু নীচে আছে। ট-এর কম্প আরও ৫ সেকেণ্ড আগে আরম্ভ হইয়াছে; উহা অ-আ রেখা ছাড়িয়া আবার স্বস্থানে ফিরিয়াছে; কিন্তু ঠ ড ঢ ণ এখনও স্বস্থানে ফিরিতে পারে নাই। ক্রমানুসারে এক একটু উপরেই আছে। চ-এর কম্প আরও ৫ সেকেণ্ড পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে, সে আবার স্বস্থান ছাড়িয়া নীচে ই-উ রেখায়; কিন্তু ছ জ ঝ ঞ এখনও ই-উ পর্য্যন্ত নামিতে

পারে নাই, ক্রমানুসারে ই-উ রেখার একটু উপরেই আছে। ক-এর কম্পারম্ভ আরও ৫ সেকেণ্ড পূর্ব্বে; সে ই-উ রেখা ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে ও দ্বিতীয় কম্পারম্ভের উদ্যোগ করিতেছে। খ, গ, ঘ, ঙ তখনও ফিরিতে পারে নাই; ক্রমানুসারে স্বস্থানের একটু নীচেই আছে।

২০ সেকেণ্ড পূর্ব্বে ক হইতে প পর্য্যন্ত সকলেই এক সরল রেখায় সারি বাঁধিয়া অবস্থিত ছিল। যদি সকলের কম্প একসঙ্গে আরম্ভ হইত, তাহা হইলেও উহারা সকলেই অন্য এক সরল রেখায় সারি বাঁধিয়া থাকিত, কিন্তু একসঙ্গে সকলের কম্প আরম্ভ না হওয়ায় ফলে উহারা আর এক সরল রেখায় অবস্থিত নাই; একটা বক্র রেখায় অবস্থিত। এই বক্র রেখাটিকে আমরা একটি ঊর্ম্মি বা ঢেউ বলিতে পারি। ঊর্ম্মিটার প্রথমার্দ্ধ ক-প সরল রেখার নীচে, দ্বিতীয়ার্দ্ধ ঐ সরল রেখার উপরে; চ-এর অবস্থান নিম্নতম, ঐ অবস্থায় ত-এর অবস্থান ঊর্দ্ধতম। ত স্থানটিকে ঢেউটির মাথা ও চ স্থানকে ঢেউর কোল বলা যাইতে পারে।

ক'র কম্পারম্ভের ২০ সেকেণ্ড পরে প'র কম্পারম্ভ। তখন অপরগুলির অবস্থানে ঐ ঢেউটি উৎপন্ন হইয়াছে। তখনও ফ, ব, ভ প্রভৃতির কম্পন আরম্ভ হয় নাই। আর এক সেকেণ্ড পরে ফ-এর, দুই সেকেণ্ড পরে ব-এর কম্প আরম্ভ হইবে। তখন অন্যান্য অক্ষরগুলি কোথায় দেখা যাউক। ব-এর কম্পের যখন আরম্ভ, ফ তখন একটু উপরে, প আরও উপরে, এইরূপে যথাক্রমে অবস্থিত। ব-এর ৫ সেকেণ্ড পূর্ব্বে দ-এর কম্প আরম্ভ, অতএব দ তখন অ-আ রেখায়। ত তখন অ-আ রেখা হইতে নামিয়া আসিয়াছে। ড-এর কম্পারম্ভ ব-এর দশ সেকেণ্ড পূর্ব্বে, অতএব ড তখন স্বস্থানে, ঢ ণ তখনও স্বস্থানে পৌছিতে পারে নাই। জ-এর কম্পারম্ভ আরও ৫ সেকেণ্ড পূর্ব্বে, সে তখন নামিয়া ই-উ রেখায়। ঝ ঞ ট ঠ তখনও ই-উ পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে নাই। গ-এর কম্পারম্ভ আরও ৫ সেকেণ্ড পূর্ব্বে, সে তখন ই-উ ছাড়িয়া স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দ্বিতীয় কম্পের উদ্যোগ করিয়াছে। ঘ, ঙ, চ, ছ তখনও স্বস্থানে পৌছিতে পারে নাই। খ ও ক দ্বিতীয় কম্প আরম্ভ করিয়া স্বস্থান ছাড়িয়া ক্রমানুসারে এক একটু ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। এখন ক হইতে ব পর্য্যন্ত অক্ষরগুলি যে বক্র রেখায় অবস্থিত, তাহা চিত্রে দেখা যাইতেছে।

বলা বাহুল্য, এবার ঢেউটির মাথা আর ত'এ নাই, এবার মাথা দ'য়ে। আর ঢেউটির কোল চ'য়ে নাই, কোল এখন জ'য়ে। ঢেউটির মাথা ও কোল উভয় স্থানই দুই সেকেণ্ড মধ্যে একটু সরিয়া আসিয়াছে। সমস্ত ঢেউটাই যেন একটু ডানি দিকে সরিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, ঢেউয়ের মাথা এইরূপে ক্রমেই অগ্রসর হইবে। উহার পিছনে ঢেউয়ের কোলটিও ক্রমে অগ্রসর হইবে।

অক্ষরগুলির একসঙ্গে কম্পন আরম্ভ হইলে এইরূপ উর্ম্মির সৃষ্টি হইত না। একসঙ্গে কম্পন আরম্ভ না হইয়া পর পর আরম্ভ হইলে উর্ম্মির বা ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঐ উর্ম্মি এক স্থানে স্থির থাকে না ; উহা ক্রমেই অগ্রসর হয়। উর্ম্মির মাথা থাকে, তার পিছনে কোল থাকে, উর্ম্মির মাথা ধীরে ধীরে সরিয়া যায়, কোলও তার পিছনে পিছনে অগ্রসর হয়। এইরূপ গতির নাম **তরঙ্গগতি**।

জলের মধ্যে একটি কণিকা কাঁপিতে লাগিলে, সেই কম্পন পর পর কণিকায় সংক্রান্ত হইয়া এইরূপ উর্ম্মির সৃষ্টি করে। উর্ম্মির মাথা জলপৃষ্ঠ ছাড়িয়া উপরে উঠে ; কোল নীচে থাকে। কণিকাগুলি স্বস্থানে উঠানামা করে, উহারা অগ্রসর হয় না ; কেবল ছট্‌ফট্ করে মাত্র ; ছোটে না। সেই ছট্‌ফটানির ফলে ঢেউ জন্মে, উর্ম্মির উপর উর্ম্মি জন্মে। প্রথম ঢেউটি জন্মিয়া অগ্রবর্ত্তী হয়, তাহার পিছনে দ্বিতীয় ঢেউ চলে, তাহার পিছনে তৃতীয় ঢেউ চলে। এইরূপে উর্ম্মির পর উর্ম্মি সারি দিয়া, কাতার দিয়া চলিতে থাকে। এইরূপ গতির নাম তরঙ্গগতি ; ইহা কোন জড় পদার্থের গতি নহে, ইহা উর্ম্মির গতি। উর্ম্মি কোন জড় পদার্থ নহে, উহা জড় পদার্থের একটা অবস্থান-ভেদ মাত্র, একটা মূর্ত্তি মাত্র ; ঐ উর্ম্মির গতির নাম তরঙ্গগতি।

জলাশয়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে এইরূপ তরঙ্গগতি উৎপন্ন হয় ; শস্যক্ষেত্রে হাওয়া দিলে শস্যের শীর্ষগুলি হাওয়াতে উঠানামা করে ও তাহাতে ঢেউ খেলিয়া যায়। তন্ত্রীতে আঙ্গুলের ঘা দিলে পার্শ্বস্থ বায়ুতে এইরূপ ঢেউ খেলিতে আরম্ভ করে।

শব্দতরঙ্গ

একটা তারে ঘা দিলে তারটা পুনঃ পুনঃ কাঁপিতে থাকে। তারের প্রত্যেক কম্পে বায়ুতে একটি করিয়া উর্ম্মি উৎপাদন করে। প্রত্যেক কম্পে

তার এক বার আগে আসে, এক বার পিছু হটে। আগে আসিবার সময় সম্মুখের বায়ুকে ঠেলিয়া দেয়, বায়ুস্তর সেই চাপে একটু সঙ্কুচিত হয়; আবার তারের পিছু হটিবার সময় সেই চাপ আল্‌গা হয়; বায়ুস্তর তখন প্রসারিত হয়, চাপটা স্তর হইতে স্তরে সংক্রান্ত হয়, আর ঢেউয়ের পর ঢেউ চলিতে থাকে। বায়ুস্তরে তরঙ্গগতি উৎপন্ন হয়। ঢেউগুলি বায়ুস্তর আশ্রয় করিয়া যে বেগে অগ্রসর হইতে থাকে, সে বেগ নিতান্ত সামান্য নহে। মাপিয়া দেখা গিয়াছে, উহা সেকেণ্ডে প্রায় ১১০০ ফুট। বায়ুর উষ্ণতা অধিক হইলে বেগেরও পরিমাণ কিঞ্চিৎ বাড়ে। তবে মোটামুটি ১১০০ ফুট ধরা যাইতে পারে।

একটা তারে ঘা দিলে উহা কাঁপিতে থাকে; সেকেণ্ডে কয় বার কাঁপিবে, তাহা সহসা বলা যায় না। পেণ্ডুলমের কম্পসংখ্যা উহার দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে; তারের কম্পসংখ্যাও দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। লম্বা তারের চেয়ে খাটো তার সেকেণ্ডে কাঁপে বেশী। আবার পেণ্ডুলমের কম্পসংখ্যার সহিত মাধ্যাকর্ষণের সম্পর্ক আছে। তারের কম্পসংখ্যার সহিত উহাতে যে টান দেওয়া যায়, সে টানের সম্পর্ক আছে। টান বেশী হইলে সেকেণ্ডে কম্পসংখ্যাও বাড়ে। কাজেই দীর্ঘতাভেদে ও টানের মাত্রাভেদে সেকেণ্ডে কোন তার দশ বারও কাঁপিতে পারে, কোন তার দশ হাজার বারও কাঁপিতে পারে। প্রত্যেক কম্পে কিন্তু পার্শ্বস্থ বায়ুরাশিতে একটি উর্ম্মি জন্মে। সেকেণ্ডে দশ বার কাঁপিলে সেকেণ্ডে দশটি উর্ম্মি জন্মে, দশ হাজার বার কাঁপিলে দশ হাজার উর্ম্মি জন্মে। উর্ম্মিগুলি এক স্থানে বসিয়া থাকে না। বায়ুকে আশ্রয় করিয়া উর্ম্মির পর উর্ম্মি সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট বেগে সারি বাঁধিয়া চলিতে থাকে। বায়ুস্তরের সঙ্কোচের পর প্রসারণ, তার পর আবার সঙ্কোচ, আবার প্রসারণ, এইরূপে উর্ম্মিমালার সৃষ্টি হয়। কোন উর্ম্মি বড়, কোনটা ছোট, সকলেই কিন্তু সেই সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট বেগে অগ্রবর্ত্তী হয়। এক মাইল রাস্তা যাইতে পাঁচ সেকেণ্ডও লাগে না।

মনে কর, তার সেকেণ্ডে দশ বার কাঁপিতেছে; সেকেণ্ডে দশটা উর্ম্মি উৎপন্ন হইল। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় কম্প যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় উর্ম্মির সৃষ্টি করে। প্রথম উর্ম্মি চলিল; তার পিছনে দ্বিতীয় চলিল; তার পিছনে তৃতীয় চলিল; এইরূপে এক সেকেণ্ড মধ্যে দশটি উর্ম্মির সারি চলিল। একাদশ উর্ম্মি তার হইতে উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই প্রথম উর্ম্মি তার ছাড়িয়া

১১০০ ফুট দূরে চলিয়া গিয়াছে। তার পশ্চাতে তারের নিকট পর্য্যন্ত আরও নয়টি উর্ম্মি সারি বাঁধিয়া রহিয়াছে। ১১০০ ফুটের ভিতর দশটি উর্ম্মি; প্রত্যেক উর্ম্মির দৈর্ঘ্য কাজেই ১১০ ফুট; খুব বৃহৎ ঢেউ সন্দেহ নাই।

আবার মনে কর, তার সেকেণ্ডে ১০০ বার কাঁপিতেছে, এবারও প্রত্যেক কম্পে এক এক উর্ম্মির সৃষ্টি হয়। এক সেকেণ্ড মধ্যে ১০০ উর্ম্মির সৃষ্টি হয়। প্রথম উর্ম্মি এক সেকেণ্ড মধ্যে তার ছাড়িয়া ১১০০ ফুট চলিয়া গিয়াছে, তার পশ্চাতে ৯৯টি উর্ম্মি সারি বাঁধিয়া যথাক্রমে থাকে। ১১০০ ফুট পথের মধ্যে ১০০টি উর্ম্মি; কাজেই এবার প্রত্যেক উর্ম্মির দৈর্ঘ্য ১১ ফুট মাত্র।

প্রতি সেকেণ্ডে তার যত বার কাঁপে, ততগুলি উর্ম্মি উৎপন্ন হয়। আর উর্ম্মির সংখ্যা যত অধিক, উহার দৈর্ঘ্য তত অল্প। তার সেকেণ্ডে দশ বার কাঁপিলে উর্ম্মির দৈর্ঘ্য ১১০ ফুট, ১০০ বার কাঁপিলে দৈর্ঘ্য ১১ ফুট, ১০০০ বার কাঁপিলে এক ফুটের কিঞ্চিৎ অধিক, ১০০০০ বার কাঁপিলে এক ইঞ্চির কিঞ্চিৎ অধিক।

বায়ুতে উর্ম্মি বর্ত্তমান বলিলে কি বুঝিব? বুঝিব এই যে, এক স্থানে বায়ুস্তরটা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত, সেখানে চাপের মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক। তার পশ্চাতে আর এক স্থানে বায়ুস্তর কিঞ্চিৎ প্রসারিত, সেখানে চাপের মাত্রা কিঞ্চিৎ অল্প। আবার আর একটু পশ্চাতে বায়ুস্তর আবার কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ও সেখানে চাপ অধিক। এইরূপ ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত বায়ুস্তর বায়ু-রাশিতে বর্ত্তমান। কিন্তু বায়ু অদৃশ্য পদার্থ; উহা দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর নহে। চাপের যে কিঞ্চিৎ অল্পাধিক্য হয়, তাহাও সহজে বোধগম্য হয় না। তবে এই উর্ম্মির অস্তিত্ব জানিব কিরূপে? ১৮৮৩ সালের আগষ্ট মাসে যবদ্বীপের নিকট ক্রাকাটোয়া নামক আগ্নেয় গিরির ভীষণ অগ্ন্যুদ্গার হইয়াছিল, ২৮শে আগষ্ট তারিখে দ্বীপটার একাংশ ভীষণ আঘাতে একবারে উৎক্ষিপ্ত ও লুপ্ত হয়। তাহাতে বায়ুস্তরে যে ভীষণ আঘাত লাগে, সেই আঘাতের ফলে সঙ্কোচ প্রসারণের উৎপত্তি ঘটিয়া বায়ুরাশিতে প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড উর্ম্মির সৃষ্টি করে। সেই উর্ম্মি যবদ্বীপ হইতে বাহির হইয়া সমস্ত ভূমণ্ডল বেষ্টন করিয়া আসে। সেই উর্ম্মি সঞ্চারণের ফলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বায়ুরাশির চাপ পর্য্যায়ক্রমে এক বার বৃদ্ধি, এক বার হ্রাস পাইয়াছিল। পৃথিবীর যাবতীয় বায়ুমান যন্ত্রে সেই চাপের হ্রাস বৃদ্ধি ধরা পড়িয়াছিল। অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্প হইয়াছে যবদ্বীপের নিকটে, ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় তাহার সংবাদ

পর্য্যন্ত জানে না ; অথচ সেখানকার বায়ুমান যন্ত্রে পারদপৃষ্ঠ আন্দোলিত হইতে থাকিল। কিছু দিন পরে প্রকাশ পাইল, সেই আন্দোলন ক্রাকাটোয়ার অগ্ন্যুৎপাতের ফল।

ক্রাকাটোয়ার ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে বায়ুতে যে ভীমাকার প্রচণ্ড উর্ম্মির উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার ফলে চাপের হ্রাস বৃদ্ধি বায়ুমান যন্ত্রে ধরা পড়িয়াছিল, কিন্তু তানপুরার তারে আঘাত ক্রাকাটোয়ার অগ্ন্যুৎপাতের সহিত তুলনীয় নহে। তদুৎপন্ন উর্ম্মিতে বায়ুরাশিতে চাপের যে কিঞ্চিৎ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে, তাহা বায়ুমানে ধরিবার আশা নাই ; আর বায়ুও দর্শনেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। বজ্রপাতের সময় বায়ুতে যে প্রচণ্ড আঘাত পড়ে, তাহার উর্ম্মির আঘাতে ঘরের শাসির কাঁচ কাঁপিয়া উঠে। তানপুরার তারের আঘাতে উৎপন্ন উর্ম্মিতে সে আশাও করা যায় না। তবে এই উর্ম্মির কম্পনগুলি কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে?

তার সেকেণ্ডে দশ বারও কাঁপিতে পারে ; শত বারও কাঁপিতে পারে। দশ বার কম্পনে সেকেণ্ডে দশ উর্ম্মি জন্মে ও বায়ুমধ্যে চালিত হইয়া কর্ণপটহে আঘাত করে। কিন্তু তাহাতে আমাদের চেতনার সঞ্চার হয় না। কিন্তু সেকেণ্ডে শত বার কম্পনে শত উর্ম্মির সৃষ্টি করিলে, সেকেণ্ডে শত বার কর্ণপটহে আঘাত করে, তখন উহা চেতনার বিষয় হইয়া একটা অনুভূতির জ্ঞান জন্মায়, ঐ জ্ঞানের নাম শব্দজ্ঞান। এই শব্দজ্ঞান কেন জন্মায় বলিতে পারি না, কিরূপে জন্মায়, তাহা কতকটা বলিতে পারা যায়।

সেকেণ্ডে কতগুলি উর্ম্মির আঘাত কানে পড়িলে শব্দজ্ঞান জন্মায়, বলা কঠিন। সকল মানুষের ইন্দ্রিয়ক্ষমতা সমান নহে। মোটামুটি বলা যায়, সেকেণ্ডে উর্ম্মির সংখ্যা ত্রিশের অধিক হইলে শব্দজ্ঞান জন্মে। তার নীচে কাহারও কাহারও জন্মিতে পারে, অনেকেরই জন্মে না। আবার উর্ম্মির সংখ্যা সেকেণ্ডে হাজার ত্রিশের অধিক হইলে আর শব্দজ্ঞান জন্মে না। শ্রবণেন্দ্রিয় এখানে বাহ্য বিষয়ের সংবাদ লইতে অসমর্থ হয়।

মোটামুটি সেকেণ্ডে ত্রিশ হইতে ত্রিশ হাজার পর্য্যন্ত উর্ম্মি কানে আঘাত দিলে শব্দজ্ঞান জন্মে। সেই শব্দজ্ঞানের আবার ইতরবিশেষ আছে।

শব্দজ্ঞান

শব্দজ্ঞান একটা জ্ঞান। শ্রবণেন্দ্রিয় একটা অনুভবকে অন্তরিন্দ্রিয় মনের সমীপস্থ করিলে মন উহাকে গ্রহণ করিয়া বুদ্ধির সমীপে পৌঁছাইয়া দেয়,

বুদ্ধি তখন উহা দ্বারা হর্ষ ক্লেশ অনুভব করে ও মনের সাহায্যে উহাকে স্বকর্ম্মে নিযুক্ত করে। ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূতি বুদ্ধির সমীপে আনীত হইলে উহা চেতনার বিষয় হয়, তখন উহাকে বলি জ্ঞান। ঊর্ম্মির আঘাতের ফলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের আনীত যে জ্ঞান, তাহা শব্দজ্ঞান; উহা চেতনার গোচর; জড় জগতে উহার স্থান নাই।

জড় জগতে আছে ঊর্ম্মি, ঊর্ম্মির অন্তর্গত বায়ুস্তরের সঙ্কোচ, প্রসার; উহা দর্শন স্পর্শের প্রায় অগোচর। এই শব্দজ্ঞানের আবার নানা ভেদ আছে। কোন শব্দ মধুর, কোনটা কর্কশ। যাহা চেতনাকে হর্ষ দেয়, তাহা মধুর; যাহা চেতনাকে ক্লেশ দেয়, তাহা কর্কশ। মধুর শব্দের বিন্যাসে সঙ্গীতের উৎপত্তি। মধুর শব্দের সঙ্গীতশাস্ত্রের আখ্যা সুর। যে শব্দ বেসুরা, তাহা ক্লেশকর বা কর্কশ; তাহা গণ্ডগোল বা কোলাহল মাত্র। সুরের আবার ভেদ আছে। কোন সুর উচ্চ বা দূরশ্রাবী, যেমন শঙ্খশব্দ; কোনটা মৃদু বা নিকট হইতে শোনা যায়, যেমন কণ্ঠশব্দ। কিন্তু এই লক্ষণটা সুরের প্রধান লক্ষণ নহে; ইহা ধরিয়া সুর চিনিয়া লওয়া যায় না; সুর চিনিতে হইলে, আমরা বলি—এই সুরটা চড়া, ঐ সুরটা নরম বা ঐটা তার, ঐটা উদার। পুরুষের কণ্ঠস্বর কোমল উদার, নারীর স্বর তীব্র, তার। বয়স্কের অপেক্ষা বালকের স্বর তীব্র। শাঁখের শব্দ কোমল, গম্ভীর; ট্রামগাড়ী-চালকের বাঁশির শব্দ তীব্র, কর্ণভেদী।

ফলে তীব্র-কোমল ভেদেই স্বরের স্বরূপ নির্ণীত হয়। এই ভেদটাকেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রেরণায় চেতনা স্বরের প্রধান ভেদ বলিয়া জানে। স্বরগ্রামে এই ভেদ ধরিয়াই ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যমাদি ক্রমে সা রি গা মা ক্রমে সুরের পর্য্যায় নির্ণীত হয়। গ্রামের মধ্যে যাহা সব চেয়ে কোমল, তাহাই সা, তার উপর রি, তার উপরে গা ইত্যাদি। কোন স্বর দূর হইতে শোনা যায় বা নিকট হইতে শোনা যায়, সঙ্গীতজ্ঞ তাহার বড় খবর লন না। কিন্তু কোন্‌টা কোমল, কোন্‌টা তীব্র, তাহার যথাযথ জ্ঞানই সঙ্গীত-কলার প্রাণ। তীব্র কোমল নানা স্বর পর পর নানা বিধানে বিন্যাস করিয়া সঙ্গীতকলাবিৎ নানা অপরূপ সঙ্গীতের সৃষ্টি করেন, চেতনা তাহাতে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়। কেন হয়, কে জানে?

সঙ্গীতরসজ্ঞ ঊর্ম্মিতত্ত্বের কোন ধারই ধারেন না; তিনি মধুর সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপভোগ করেন। কিন্তু পদার্থবিদের উপভোগ নিয়ত থাকিলে

চলে না। তাঁহাকে তথ্য নির্ণয় করিতে হয়। চেতনার নিকট সুরের এই যে কোমলে তারে ভেদ, বাহ্য জগতে বায়ুমধ্যে উর্ম্মিমধ্যে তাহার আনুষঙ্গিক ভেদ কিরূপ ?

তারকে কাঁপাইয়া উর্ম্মির সৃষ্টি হয়। সেকেণ্ডে যত কম্পন, সেকেণ্ডে তত উর্ম্মি; অদৃশ্য উর্ম্মিগুলি গণিতে না পারিলেও কম্পনসংখ্যা যন্ত্রযোগে গণিতে পারা যায়। পদার্থবিৎ গণিয়া দেখিয়াছেন, কম্পনসংখ্যা যত বাড়ে, আনুষঙ্গিক সুরও তত তীব্র বা তীয়র হয়। সেকেণ্ডে দুই-শ, চারি-শ, পাঁচ-শ কম্পে সুর গম্ভীর কোমল, দুই হাজার পাঁচ হাজার কম্পনে সুর তীব্র। কম্পনসংখ্যা যতই বাড়িবে, সুর ততই তীব্র হইবে।

সা-এর অপেক্ষা রি তীব্র; তন্ত্রীটা খাট করিলেই কম্পনসংখ্যা বাড়ে ও স্বরের তীব্রতাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। ষড়্‌জ ক্রমে চড়িতে চড়িতে ঋষভে পরিণত হয়। যাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় শিক্ষিত, তিনি তারের পানে না চাহিয়া বলিয়া দিবেন, ঋষভ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে কি না! কতটুকু চড়িলে ষড়্‌জ গিয়া ঋষভে দাঁড়ায়, তাহা সঙ্গীতবেত্তার শ্রবণাগ্রে। পদার্থবিৎকে তারের দৈর্ঘ্য মাপিয়া বা কম্পন মাপিয়া বলিতে হইবে, ষড়্‌জ ঋষভে পরিণত হইবার সময় আসিয়াছে কি না?

স্বরের প্রধান লক্ষণ যে, তীব্র-কোমল-ভেদ, যাহা লইয়া স্বরের সুরত্ব, তাহার সহিত আহত তন্ত্রীর কম্পনসংখ্যার সম্পর্ক। অতএব প্রতি সেকেণ্ডে শ্রবণেন্দ্রিয়ের আনীত উর্ম্মিসংখ্যার সম্পর্ক। আর কিছুরও সম্পর্ক নাই। তবে শব্দের দূরশ্রাবিতার সহিত সম্পর্ক কিসের ? আমি যখন বন্ধুর কানে কানে কথা বলি, তখনই বা উর্ম্মিগুলি কি লক্ষণবিশিষ্ট হয়, আর যখন গলা ছাড়িয়া সভাস্থলে বক্তৃতা করি, তখনই বা বায়ুমধ্যে উর্ম্মিগুলি কিরূপ হয় ? উত্তর সহজ। কামানের গর্জ্জন দূরশ্রাবী; মেঘগর্জ্জন, বজ্রগর্জ্জন দূরশ্রাবী; উর্ম্মিগুলা এত জোরে আসিয়া ধাক্কা দেয় যে, ঘরের জানালা কপাট পর্য্যন্ত কম্পান্বিত হয়। তন্ত্রীকে বহু দূর টানিয়া ছাড়িয়া দিলে উহার শব্দ দূর পর্য্যন্ত যায় ও অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত শব্দ টিকিয়া থাকে। মৃদু অঙ্গুলির তাড়নায় যে মৃদু শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা অল্পক্ষণস্থায়ী, অল্প দূরেও শুনা যায় না। কম্পের পরিসরের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তন্ত্রীকে স্বস্থান হইতে চ্যুত করিয়া যত দূরে লইয়া যাইবে, কম্পনের পরিসর ততই অধিক হইবে। স্বস্থানে ফিরিবার সময় যত বেগের সহিত ঝোঁকের সহিত ফিরিবে,

ততই উহা শক্তিসম্পন্ন হইবে। কম্পশীল দ্রব্য শক্তিসম্পন্ন। যাহাতে শক্তি যত নিহিত থাকে, তাহার সেই শক্তিক্ষয়ে তত অধিক সময় যায়। সেই শক্তি বহু দূর পর্য্যন্ত চালিত হইলেও উহার ফল দেখায়। কম্পনের এই পরিসরের আধিক্যে, কম্পমান তন্ত্রীতে নিহিত যানশক্তির আধিক্যে এই দূরশ্রাবিতা বৃদ্ধি পায়।

আগেও বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, এই দূরশ্রাবিতা স্বরের প্রধান লক্ষণ নহে। আলোকের যেমন বর্ণ ধরিয়া চেনা যায়—এই আলো লাল, উহা নীল; শব্দ সেইরূপ সুর ধরিয়া চেনা যায়—ইহা কোমল, ইহা তীব্র। একই নীলালোকের ঔজ্জ্বল্যভেদ থাকিতে পারে, একই সুরের দূরশ্রাবিতার ভেদ থাকিতে পারে।

এই দূরশ্রাবিতা যে লক্ষণ, তাহা তুচ্ছ লক্ষণ; স্বরের প্রধান লক্ষণ সুর; যাহার সহিত সম্পর্ক কম্পদ্রুতির। তদ্ব্যতীত আর একটা লক্ষণ আছে, সঙ্গীতশাস্ত্র তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে না। উহাকে ধ্বনি বা আওয়াজ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই তৃতীয় লক্ষণের আলোচনার পূর্ব্বে এক বার স্বরোৎপাদক বাদ্যযন্ত্রসমূহের আলোচনা আবশ্যক।

বাদ্যযন্ত্র

যাহার কম্পে বায়ুরাশিতে তরঙ্গগতির সৃষ্টি হয়, তাহার প্রকৃতিভেদে বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণীভেদ হয়। স্থূলতঃ চারিটা শ্রেণী—

১। বীণাযন্ত্র—এখানে তন্ত্রীর বা তারের কম্পে বায়ুতে তরঙ্গোৎপত্তি। উদাহরণ—তানপুরা, একতারা, সেতার প্রভৃতি।

২। বেণুযন্ত্র—এখানে যন্ত্রের বিবরগত বায়ুর কম্পে বাহিরের বায়ুতে তরঙ্গোৎপত্তি। উদাহরণ—ভগবানের মুরলী ও পাঞ্চজন্য হইতে অর্গান, হারমোনিয়াম, ক্লারিওনেট ও শিশুজনপ্রিয় কর্ণবিদারক বাঁশী পর্য্যন্ত। বিবরবদ্ধ বায়ুর কম্প উত্তেজনার জন্য বিবর-মুখে কোথাও রীড়ের ব্যবস্থা, কোথাও প্রবেশদ্বারের বায়ুসংঘর্ষের ব্যবস্থা থাকে। কোথাও বা বাদকের ওষ্ঠের চর্ম্ম রীড়ের কাজ করে।

৩। পটহ যন্ত্র—সূক্ষ্ম চর্ম্মের কম্পে বায়ুতে তরঙ্গের উৎপত্তি; দৃষ্টান্ত—ঢাক ঢোল মৃদঙ্গাদি।

৪। কাংস্য যন্ত্র—তাড়িত ধাতুফলকের কম্পে বায়ুতে তরঙ্গের উৎপত্তি ; দৃষ্টান্ত,—কাঁসর, ঘণ্টা, ঘড়ি, করতাল।

বীণাযন্ত্রে তার যত দীর্ঘ হয়, স্বর তত তীব্র হয়। সেতারের তন্ত্রীর পর্দ্দায় পর্দ্দায় আঙ্গুল দিয়া তারকে ইচ্ছামত বড় ছোট করিয়া কোমল, তীব্র স্বর উৎপন্ন করা হয়। তারে টান বাড়াইলে স্বর তীব্র হয়। ভারী ওজন ঝুলাইয়া টান বাড়ান চলে, বা বেহালাতে কান মোচড়াইয়া টান বাড়ান চলে। তারের সরু মোটা ভেদেও স্বরের ভেদ হয়। সরু তারে তীব্র স্বর, মোটায় কোমল। তারের দ্রব্যভেদেও স্বরভেদ হয়। তন্ত্রীযন্ত্রের সরু তার অধিক পরিমাণে বায়ুকে আহত করিতে পারে না, সেই জন্য যন্ত্রমধ্যে একটা বিবরে বায়ু আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া সেই বায়ুতে আঘাত সঞ্চারণের ব্যবস্থা থাকে। আবদ্ধ বায়ুর আঘাতে বাহিরের অনেকটা বায়ুতে আঘাত পায়। তানপূরা বেহালা প্রভৃতির কাঠের খোলের এই তাৎপর্য্য। পটহযন্ত্রেও এইরূপ ব্যবস্থা থাকে। ঢাক ঢোলের পেটের ভিতর বায়ুরাশি সঞ্চিত থাকে।

বেণুযন্ত্রে বিবরের আকৃতি ও আয়তনভেদে স্বরের ভেদ হয়। স্থূলতঃ বাঁশী যত দীর্ঘ হয়, স্বর তত কোমল। যত খাট হয়, স্বর তত তীব্র। বাঁশের বাঁশীতে ও ক্লারিওনেটে রন্ধ্রসমূহ অঙ্গুলিবদ্ধ করিয়া বিবরের দীর্ঘতা কমান বাড়ান হয়। ভগবান্ মুরলীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বায়ুনির্গমের ব্যবস্থা করিয়া গোপীদের প্রাণ আকর্ষণ করিতেন।

পটহ যন্ত্রের ও কাংস্যযন্ত্রের স্থূল নিয়ম এই যে, কম্পমান পটহ বা ফলক যত খাট ও ছোট হইবে, স্বরের তীব্রতা ততই বাড়িবে।

এই সকল কম্পমান দ্রব্যের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। একটা তারে আঘাত করিলে সমস্ত তারটা কাঁপিতে থাকে ; অথবা উহা আপনাকে দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লইয়া প্রত্যেক খণ্ড স্বতন্ত্রভাবে কাঁপিতে থাকে। দীর্ঘ ভাগটা কাঁপিলে যে স্বর জন্মে, তাহার কোন ভগ্নাংশ কাঁপিলে অবশ্য তদপেক্ষা তীব্র স্বর জন্মিবে। সময় সময় এমন ঘটে যে, সেই তারের নিজস্ব কোমল স্বর না বাজিয়া তারের ভগ্নাংশের তীব্র স্বরটাই বাহির হয়। কেবল যে তারে এইরূপ ঘটে, এমন নহে। বেণুযন্ত্রে, পটহযন্ত্রে, কাংস্যযন্ত্রে, সর্ব্বত্র এই ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায়। দীর্ঘ বাঁশী বাজাইতে চেষ্টা করিতেছি, উহার স্বাভাবিক কোমল স্বরের বদলে একটা উচ্চ তীব্র স্বর

বাহির হইল। বুঝিতে হইবে, আবদ্ধ বায়ুরাশি আপনাকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লইয়াছে ও তাহার প্রত্যেক খণ্ড স্বতন্ত্রভাবে কাঁপিতেছে।

ইহার ফল এই যে, বীণাই বল, আর বেণুই বল, আর পটহই বল, উহাদের নিজস্ব বিশুদ্ধ সুরটি পাওয়া ভার। তাড়নার পর কম্পন আরম্ভ হয়। সমস্তটা কাঁপে, সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নাংশ খণ্ডগুলিও কাঁপে। স্বাভাবিক কোমল সুরের সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় উচ্চতর তীব্রতর সুর বাহির হয়। যাঁহাদের সাধা কান, তাঁহারা অনেক সময় ঐ তীব্রতর আনুষঙ্গিক সুরগুলি অবধান করিলেই শুনিতে পান। সাধা না থাকিলে, কিরূপে যন্ত্রযোগে উহাদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে, তাহা মনীষী হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ দেখাইয়াছেন। এই হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজের নাম আগে বলিয়াছি। ইনিই উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত যে সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ব অর্থাৎ শক্তিতত্ত্ব, সেই শক্তিতত্ত্বের প্রথম ব্যাখ্যানকর্ত্তা। তিনি ছিলেন ডাক্তার, ডাক্তারি ছাড়িয়া তিনি শারীরবিদ্যার অধ্যাপনা ধরেন; শারীরবিদ্যার অধ্যাপনা ছাড়িয়া পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপনা ধরেন। তিনি যখন তনুত্যাগ করেন, তখন শারীরবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও গণিতবিদ্যা—এই ত্রিমূর্ত্তি-ধারিণী সরস্বতী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠেন। হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ স্বর-বিশ্লেষণের উপায় বাহির করিয়া দেখান যে, সাধারণ যন্ত্রোদ্গত সুর প্রায় বিশুদ্ধ সুর হয় না। স্বাভাবিক কোমল সুরের সহকারে তীব্রতর কতিপয় সুর বাহির হয়। আপন সুরের সহকারে এই উপরের সুরগুলি থাকায়, সুরে সুরে জড়িত হইয়া শব্দজ্ঞানে একটা বিশিষ্টতা দেয়। উহারই নাম দিয়াছি স্বরের আওয়াজ বা ধ্বনি।

স্বরের প্রধান লক্ষণ যে তীব্রতা, তাহা কম্পনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। কিন্তু দুইটা সুর সমান তীব্র হইলেও উহার ধ্বনির ভেদ থাকে। এই ধ্বনিভেদকে সঙ্গীতশাস্ত্র উপেক্ষা করিতে পারে না। কেন না, ইহার ফলে আনন্দের ভেদ হয়। একই সুর যন্ত্রভেদে বিবিধ ধ্বনিতে ধ্বনিত হয়। এই ধ্বনিভেদের রহস্যভেদ হেল্‌ম্‌হোলৎজের হাতে হইল। যন্ত্রের আপন সুরের সহিত তীব্রতর সুর জড়িত ও মিলিত হইয়া উহার ধ্বনি বা আওয়াজ বদলাইয়া দেয়। খাঁটি সুর বিশুদ্ধ সুর; উহারা উচ্চতর কতিপয় সুরের সহিত মিলিত হইয়া কখন জমকাল হয়, ভরকাল হয়, কখন মিঠা হয়, মোলায়েম হয়, কখনও বা আবার নাকি সুরে পরিণত হয়। বিশুদ্ধ সুরে কোন্ কোন্ সুর মিলিত হইয়া কিরূপ আওয়াজ হয়,

হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ তাহা শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান। আবার বিশ্লেষণে যে যে সুরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইল, সেই সেই সুর ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র হইতে এক-সঙ্গে নির্গত ও মিলিত করিয়া আবার সেই সেই আওয়াজ সৃষ্টি করেন।

একটা উদাহরণ দিয়া এই কথাটা স্পষ্ট করা যাউক। নরকণ্ঠে বেণু যন্ত্রের স্বর বাহির হইতে পারে "এ" অথবা "ও"। যাত্রার জুড়ী আধ ঘণ্টা ধরিয়া কখনও কেবলই "এ" ভাঁজেন, কখনও কেবলই "ও" ভাঁজেন। "এ" অবশ্য "ও" হইতে ভিন্ন ; ভিন্ন না হইলে ভিন্নরূপ শুনায় কেন ? এই ভেদ কোন্ লক্ষণের ভেদ ? ইহা সুরের তীব্রতা ভেদ নহে। নরকণ্ঠের "এ" ও নারীকণ্ঠের "এ"তে তীব্রতা ভেদ থাকিতে পারে ; সেইরূপ উভয় কণ্ঠের উভয় "ও"তে তীব্রতা ভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু "এ" এবং "ও" এই উভয়ে ভেদ সে-ভেদ নহে। আবার এই ভেদ দূরশ্রাবিতা জন্য ভেদ নহে। একই "এ" আমি তোমার কানে কানে বলিতে পারি, পাশের লোকে শুনিবে না, অথবা উচ্চৈঃস্বরে "এ" ডাকিয়া অর্দ্ধ ক্রোশ কম্পিত করিতে পারি। তবে এই ভেদ কোন্ লক্ষণে ভেদ ? ইহা ধ্বনিভেদ, আওয়াজের ভেদ। হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ দেখাইলেন, "এ" স্বরে মূল সুরের সহিত যে যে উপরের সুর মিলিত ও জড়িত আছে, "ও" স্বরে মূলের সহিত সেই সেই উপরের সুর মিলিত ও জড়িত নাই। "এ" স্বরেই বা কোন্ কোন্ সুর আছে, আর "ও" সুরেই বা কোন্ কোন্ সুর আছে, তাহা হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ স্বর-বিশ্লেষণ দ্বারা আবিষ্কার করিলেন। আবার যন্ত্রযোগে সেই সেই সুর একত্র মিলিত করিয়া "এ" স্বর এবং "ও" স্বরের উৎপাদন করিলেন। সপ্রমাণ হইল—অ ই উ এ ও প্রভৃতি বর্ণপরিচয়ের চিরপরিচিত স্বরগুলির ধ্বনিভেদ বিভিন্ন সুরের সমবায়ের ভেদে উৎপন্ন।

মুখ ব্যাদান করিয়া ঐ সকল স্বরের নির্গম সাধিত হয়। ব্যাদিত মুখের অন্তর্গত মূল কোটর এই স্থলে বেণুযন্ত্রের কাজ করে। বুকের ভিতর ফুসফুস হইতে বায়ু নির্গত হয়। কণ্ঠনালী দিয়া বেগে বাহির হইবার সময় নালীর মাংসপেশী কম্পিত হইয়া কোটরস্থ বায়ুর কম্প উত্তেজিত করে। মুখকোটরের আকৃতি ও আয়তনভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্বর নির্গত হয়। কোটরগত বায়ুর নিজের একটা সুর থাকে, আর উহা খণ্ডশঃ বিভক্ত হইয়া উপরের সুর কতিপয়ের সৃষ্টি করে। সকল সুরে মিলিত হইয়া নূতন নূতন আওয়াজের উৎপাদন করে।

অর্গানের পাইপে অথবা বীণার তারেও সেইরূপ ঘটে। পাইপের আবদ্ধ বায়ু বা বীণার তার যখন সমস্তটা কাঁপে, তখন উহার মূল স্বর বাহির হয়। কিন্তু এই কম্পের সহিত অন্য কম্প থাকে। পাইপের কোটরবদ্ধ বায়ু অথবা বীণাতন্ত্রী আপনাকে কতিপয় খণ্ডে বিভক্ত করে। প্রত্যেক ভগ্নাংশ স্বতন্ত্রভাবে কাঁপিয়া উপরের স্বরগুলির সৃষ্টি করে। তন্ত্রী দুই তিন চারি পাঁচ সমান টুকরায় বিভক্ত হয়। প্রত্যেক টুকরা স্বতন্ত্র ভাবে কাঁপে। কম্পনসংখ্যা দুই তিন চারি পাঁচ গুণ হয়। স্বরও কম্পন-সংখ্যানুসারে তীব্র হইতে তীব্রতর হয়। মূল স্বরের সহিত এই তীব্র স্বরগুলি জড়িত ও মিলিত হইয়া আওয়াজ বদলায়। সেই আওয়াজে সঙ্গীতরসজ্ঞের রসবোধের তারতম্য হয়।

স্বরে স্বরে সম্মিলন সাধন সঙ্গীতশাস্ত্রের একটা কায়দা। ইউরোপের সঙ্গীতশাস্ত্র এই কায়দার প্রচুর ব্যবহার করে; পাশ্চাত্য সঙ্গীতশাস্ত্র এই কায়দার বলে বাহবা লন। দুইটা স্বরের সম্মিলনের ফল কখনও প্রীতিকর, কখনও বা অপ্রীতিকর হয়। উভয়ত্র কম্পনসংখ্যা সমান হইলে দুই স্বর বেমালুম মিশিয়া যায়। একের কম্পনসংখ্যা অপরের দুই তিন চারি পাঁচ গুণ হইলেও মিশিয়া আওয়াজ বদলায়, তাহাও প্রায় প্রীতিকর। উভয়ত্র কম্পনসংখ্যার অনুপাত যদি $\frac{২}{৩}$, $\frac{৪}{৫}$, $\frac{৫}{৬}$, এইরূপ হয়, তাহা হইলেও ফল প্রীতিকর হয়। কিন্তু অনুপাত $\frac{৮}{৯}$, $\frac{১৫}{১৬}$, $\frac{১৭}{১৮}$, এইরূপ হইলে তখন আর প্রীতিকর হয় না। তখন স্বরে স্বরে মিলিয়া যে স্বর জন্মে, তাহা কানে বাজে, তাহা কর্কশ হয়। এই কর্কশতা সঙ্গীতের বিরোধী। কর্কশতার বাহুল্যেই গণ্ডগোল ও কোলাহল। এই কর্কশতার পরিহার সঙ্গীতের গোড়ার কথা। বাদ্যযন্ত্রে মূল স্বরের সহিত যে সকল উপরের স্বর বাহির হয়, তাহাদের পরস্পর সম্মিলনে যাহাতে এই কর্কশতা না জন্মায়, তাহারই উদ্ভাবনাতেই বাদ্যযন্ত্রে কারিগরি।

পদার্থবিৎ অবশ্য রসবোধের ধার ধারেন না। তাঁহার দৃষ্টি কম্পের প্রতি ও উর্ম্মির প্রতি। সঙ্গীতরসজ্ঞ দেখেন, স্বরে স্বরে মিলিয়া ফল প্রীতিকর হইল কি না; পদার্থবিৎ দেখেন, কম্পে কম্পে মিলিত হইয়া তারের মূল কম্পের সহিত তাহার ভগ্নাংশের কম্প জড়িত হইয়া কম্পটার কি পরিবর্ত্তন হইল? কম্পে কম্পে মিলিয়া কম্পের পরিণাম কি হয়, তাহা পূর্ব্বে দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান গিয়াছে। পেণ্ডুলমের কম্প সরল কম্প;

উহার পূর্ব্বার্দ্ধ অপরার্দ্ধের অনুরূপ, উহার প্রথম পাদ দ্বিতীয় পাদের অনুরূপ। কিন্তু ঢেঁকির কম্প জটিল কম্প। উহার পূর্ব্বার্দ্ধ অপরার্দ্ধের অনুরূপ নহে; উহার পাদবিভাগ ত চলেই না। চাঁদের জোয়ারে সমুদ্রের কম্প সরল কম্প; সূর্য্যের জোয়ারে সমুদ্রের কম্পও সরল কম্প। কিন্তু উভয় কম্পের মিলনে যে জটিল কম্প হয়, তাহার মত অসরল কম্প আর নাই। কেবল চাঁদের জন্য কম্পটুকু থাকিলে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার সময়নির্দ্দেশই গ্রহণ করিতাম। কিন্তু উভয় কম্পের সমবায়ে যে জটিল কম্প হয়, তাহা অত সরল তালিকায় নির্দ্দিষ্ট হইবে না। সঙ্গীত-রসপিপাসু যখন দেখেন, স্বরের আওয়াজের ব্যতিক্রম, পদার্থবিৎ তখন দেখেন, কম্পের সরলতা নষ্ট হইয়া জটিলতার বৃদ্ধি। কে অধিক সৌভাগ্যশালী পুরুষ, পাঠক মহাশয় বিবেচনা করিবেন।

বাদ্যযন্ত্র আহত হইলে উহা আপনাকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লয় ও প্রতি খণ্ডের স্বতন্ত্র কম্পে বিভিন্ন সুর জন্মে। এই ভগ্নাংশগুলির কম্পসংখ্যার অনুপাত যত ক্ষণ ২/৩, ৪/৫, ৫/৬, এইরূপ থাকে, তত ক্ষণ স্বর-সম্মিলনে ফল প্রীতিকর থাকে; কিন্তু তাহা ছাড়িয়া ৮/৯, ১৭/১৮, ২৩/২৫, এইরূপ ঘটিলেই বিপত্তি! তখন মাধুর্য্য স্থলে কর্কশতা আসে। একটা টেবিলে যখন একটা ঠোকা দিই, তখন টেবিলের বৃহৎ কাষ্ঠ তাহার বৃহৎ অবয়বকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করিয়া খণ্ডে খণ্ডে কাঁপিতে থাকে। ঐ সকল খণ্ডের মধ্যে না আছে কোন মিল, না আছে কোন সামঞ্জস্য, উহাদের কম্পন-সমবায়ে উৎপন্ন জটিল কম্পনের ফল যে শব্দ, তাহার নাম ঠক্কর বা ঠোকর। উহা সঙ্গীতশাস্ত্রের অগ্রাহ্য, উহা কর্কশ, শ্রুতিকটু; উহা সুর নহে, উহা বেসুর; উহা স্বর নহে, উহা ব্যঞ্জন। উহা "আ" নহে, "ই" নহে, "এ ও" নহে, উহা "ঠক্"।

কঠিন পদার্থে কঠিন পদার্থে বা কঠিনে তরলে সংঘট্টের ফলে এই জটিল কম্প বা আলোড়ন বা বিঘট্টন হইয়া ফলে যে শব্দ হয়, তাহাই কর্কশ শব্দ। উহার ফল বর্ণপরিচয়ের লিপিতে স্বরবর্ণের তালিকায় নিবদ্ধ নাই। ব্যঞ্জনের তালিকায় উহাদিগকে পাওয়া যাইবে। টেবিলের আঘাতে হইল "ঠক্," আর কেতাবখানা মাটিতে পড়িলে হইল "ধপ," হাতের তালিতে হইল "চট্," জলের আঘাতে হইল "ছপ্"। ঐরূপে কণ্ঠ হইতে বায়ুপ্রবাহ মুখকোটর দিয়া নির্গমের সময় যদি জিহ্বা গিয়া কোথাও আঘাত করিয়া বায়ুপ্রবাহকে ক্ষণেকের জন্য আটকাইয়া দেয়, সেই আঘাতের ফলে কখনও বা "ক,"

কখনও "চ," কখনও "ত," কখনও "ট," জিহ্বামূলের আঘাতে "ক," তালুর আঘাতে "চ," জিহ্বাগ্রে দন্তে প্রতিহত হইলে "ত," উভয় ওষ্ঠের আঘাতে "প"। বায়ুপ্রবাহকে একেবারে না আটকাইলে স্থানভেদ "য," "র," "ল," "শ," "ষ" ইত্যাদি।

সৌভাগ্যক্রমে এই সকল কর্কশ শব্দ ক্ষণস্থায়ী। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তাহারা নির্ব্বাণ পায়; শেষ পর্য্যন্ত যে স্বরটা থাকিয়া যায়, তাহা "স্বর"। "কে" এই শব্দের "ক"টুকু ক্ষণিক মাত্র, কিন্তু উহার "এ"টুকু দীর্ঘকালব্যাপী। এমন কি, "এ"টার আশ্রয় লইয়াই "ক"টার অস্তিত্ব। বাগ্‌যন্ত্রের যেরূপ ব্যবহার, অন্য যন্ত্রেও সেইরূপ। ঘড়িতে হাতুড়ির ঘা দিলে "ঘ ঙ" বাহির হয়, তাহার "ঘ"টা প্রায় আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া যায়, পরে যে সানুনাসিক "অং" বহু ক্ষণ ধরিয়া চলে, ইহাকে সঙ্গীতশাস্ত্র নিতান্ত অনাদরে অগ্রাহ্য করিবে না। কাংস্যফলকে আঘাতের সময় উহার বহু ভগ্নাংশে যে এলোমেলো কম্পগুলি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই আঘাতের পরক্ষণে নিবৃত্ত হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত যে কয়টা তিষ্ঠিয়া গিয়াছে, তাহাদের কম্প-সংখ্যার অনুপাত তেমন এলোমেলো নহে। ত্রেতাযুগে রামাভিষেকে মদবিহ্বলা তরুণীর কক্ষচ্যুত হেমঘট সোপানশ্রেণী অবতরণ কালে কঠোর ভূমিতে আঘাতের পর আঘাতে ঠঠং ঠঠং ঠং, ঠঠঠং ঠঠং শব্দ করিয়া শেষে "ছ" শব্দে জল স্পর্শ করিয়াছিল। উহার শ্রুতিকটু ঠকার-সমূহের অব্যবহিত অনুস্বরগুলা যে নিতান্তই শ্রুতিকটু, তাহা কোন রসবেত্তাই বলিতে পারিবেন না।

প্রত্যক্ষ, না অনুমান

শব্দজ্ঞান যে কম্পগতির আনুষঙ্গিক ফল, তাহার সবিস্তার আলোচনা হইল। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই তথ্যটা প্রত্যক্ষলব্ধ, না অনুমানলব্ধ? এক হিসাবে ইহাকে প্রত্যক্ষলব্ধই বলা চলিতে পারে। অঙ্গুলিতাড়নায় তারের কম্প, করতলতাড়নায় পটহের কম্প প্রায় প্রত্যক্ষগোচর। ঐ কম্প চোখেই দেখা যায়, স্পর্শেও বুঝা যায়। তারের উপর কাগজের টুকরা রাখিলে উহা কাঁপিতে থাকে; চামড়ার উপর বালি ছড়াইয়া দিলে, বালি কাঁপিতে কাঁপিতে স্থানে স্থানে গিয়া স্তূপীকৃত হয়। কাজেই কম্পের ফলে যে শব্দোৎপত্তি, তাহা প্রত্যক্ষলব্ধ সত্য। টেলিফোন ও ফোনোগ্রাফ যন্ত্রে

একখানি পটহকে কম্পিত করাইয়াই শব্দ উৎপাদিত হইয়া থাকে। তারের কম্প বা চর্ম্মের কম্প দেখা যায়, কিন্তু অদৃশ্য বায়ুর কম্প, উহার সঙ্কোচ প্রসার ত দেখা যায় না। বায়ুতেও যে কম্পগতি তরঙ্গাকারে সঞ্চালিত হইতেছে, ইহা ত প্রত্যক্ষগোচর হয় না। অর্গান যন্ত্রের পাইপের মধ্যে আবদ্ধ বায়ু যে কম্পিত হয়, তাহাও এক রকমে দেখান চলে, একটা বাতি জ্বালাইয়া সেই বায়ুমধ্যে নামাইলে উহার শিখার কম্পনে বায়ুর কম্পন সপ্রমাণ করে। কিন্তু বাহিরের বায়ুসাগরের স্থির বাতে যে উর্ম্মির পর উর্ম্মি চলিতেছে ও সেই উর্ম্মিমালা কর্ণে আহত হইলে শব্দজ্ঞান জন্মিতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখান কঠিন। উহাকে কতকটা অনুমানলব্ধ সত্য বলিতে হইবে। এরূপ অদৃশ্য ঘটনার স্থলে অনুমান দ্বারা কারণ নির্ণয় অবশ্য সাহসের কাজ। বায়ুমধ্যে যে উর্ম্মিরাজি চলিতেছে, এই অনুমানও সাহসের কাজ। এ দেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা কতকটা এই সাহসিক অনুমানের আশ্রয় লইয়াছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে যেমন সারি বাঁধিয়া ঢেউ উঠে, সেইরূপ সারি বাঁধিয়া কোন আহত দ্রব্য হইতে ঢেউ আসিয়া শ্রবণে আঘাত করিলে শব্দানুভব হয়। সেই ঢেউগুলি কোন্ পদার্থের আশ্রয়ে সঞ্চালিত হয়? এখানে অনুমান যে, উহা বায়ুর আশ্রয়ে আসে। বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারা কোন স্থানকে বায়ুশূন্য করিলে আর সেই প্রদেশ দিয়া ঢেউ আসিতে পারে না। ঐ অনুমানের পক্ষে এই প্রমাণই যথেষ্ট অনুকূল।

আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতদের অনুমান ছিল অন্যরূপ। তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন, আকাশ নামক একটা সূক্ষ্ম পদার্থ বিশ্বজগৎ ব্যাপিয়া আছে, উহা বায়ু নহে। কিন্তু উহা বায়ুর ভিতরেও আছে। সেই আকাশের আশ্রয়ে ঢেউগুলি আসিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ে খবর দেয়। তাঁহাদের অনুমানটা অবশ্য ঠিক নহে। বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যেই তাহা ধরা পড়ে। কিন্তু তাই বলিয়া এই অনুমানকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া উপহাস করা উচিত নহে। যখন কোন প্রদেশকে যন্ত্র দ্বারা বায়ুশূন্য করিবার কৌশল আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন শব্দজনক উর্ম্মিগুলি বায়ুপথে যায়, কি আকাশপথে যায়, তাহা নির্ণয়ের উপায় ছিল না। আকাশ নামক কাল্পনিক অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থের অনুমান অবৈজ্ঞানিক নহে। কেন না, পরে আমরা দেখিব, একালের বৈজ্ঞানিকদিগকেও এক শ্রেণীর তরঙ্গগতির সঞ্চালন বুঝাইবার

জন্য সেই বিশ্বব্যাপী সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়, প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থের কল্পনা বা অনুমান করিতে হইয়াছে। আজি কালি আমরা সেই পদার্থকেই সেই পুরাতন আকাশ নামে অভিহিত করি। কিছু দিন পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও তাপকে একরূপ ভারহীন সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া অনুমান করিতেন। তাঁহাদের সেই অনুমানও যেমন অবৈজ্ঞানিক ছিল না, প্রাচীন পণ্ডিতদের শব্দতরঙ্গবাহী আকাশের অনুমানও সেইরূপ অবৈজ্ঞানিক নহে।

তবে অনুমান মাত্রেরই ভিত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণের অপেক্ষা শিথিল। যত দিন কোন একটা অনুমানের অসঙ্গতি বাহির না হয়, তত দিন সেই অনুমানটা গ্রাহ্য হয় ; পরে সঙ্গততর অনুমান পাইলেই পূর্ব্বের অনুমান ত্যাগ করিতে হয়। বিজ্ঞানশাস্ত্রের ইতিহাসে ইহার ভূরি পরিচয় আছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়েই তাহার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

ফলে তন্ত্রী পটহাদির কম্পগতিই যে বায়ুমধ্য দিয়া সঞ্চারিত হয়, তাহা এক রকম প্রত্যক্ষলব্ধ সত্য বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। তবে সেই কম্পগতি বায়ুমধ্য দিয়া যাইবার সময় তরঙ্গগতির আকার গ্রহণ করে, অর্থাৎ ঊর্ম্মি উৎপাদন করে। ইহাকে অনুমান বলিলেও চলিতে পারে। এই অনুমানের সমর্থনে আর কোনও অনুকূল প্রমাণ আছে কি না, দেখা আবশ্যক।

ঊর্ম্মির স্বরূপ আলোচনাতে আমরা দেখিয়াছি, উহার একটা বিশিষ্টতা আছে, অন্য কোনরূপ গতিতে তাহা পাওয়া যায় না। ঊর্ম্মির একটা স্থানকে আমরা ঊর্ম্মির মাথা, আর একটা স্থানকে ঊর্ম্মির কোল ধরিয়াছি। এই উভয় স্থানের সম্পর্ক পরস্পর বিপরীত। কতকগুলি অক্ষর সাজাইয়া উহাদের কম্পনে কিরূপে ঊর্ম্মি উৎপন্ন হয়, তাহা দেখান গিয়াছে। যেখানে ঊর্ম্মির মাথা, সেখানে অক্ষরটি ঊর্দ্ধে উঠিয়া "অ-আ" রেখা স্পর্শ করিয়াছে, আর যেখানে ঊর্ম্মির কোল, সেখানে নিম্নে নামিয়া "ই-উ" রেখা স্পর্শ করিয়াছে। মাথার গতি ঊর্দ্ধে, কোলের গতি নিম্নে ; মাথায় যদি গতি হয় দক্ষিণে, কোলে গতি হইবে বামে। মাথায় যদি বায়ুস্তর সঙ্কুচিত হয়, কোলে বায়ুস্তর প্রসারিত হইবে। মাথায় যদি বায়ুস্তরের চাপ বৃদ্ধি ঘটে, কোলে বায়ুস্তরের চাপের হ্রাস ঘটিবে। ঊর্ম্মির এইটি বিশিষ্ট লক্ষণ। একটা মাথা হইতে পরের মাথা পর্য্যন্ত যে দূরত্ব, তাহাই ঊর্ম্মির দৈর্ঘ্য। মাথা হইতে কোলের দূরত্ব তাহার অর্দ্ধেক ; এইটুকু স্মরণ রাখিতে হইবে।

পুষ্করিণীর জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে সেই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া উর্ম্মির পর উর্ম্মি সঞ্চারিত হইতে থাকে। প্রত্যেক উর্ম্মির মাথা আছে, আর কোলও আছে; উর্ম্মির পর উর্ম্মি, তার পর উর্ম্মি; মাথার পর কোল; কোলের পর মাথা। এইরূপ ব্যবস্থা। পুষ্করিণীর আর এক স্থানে আর একটি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে সেই স্থানকেও কেন্দ্রগত করিয়া আর এক সারি উর্ম্মির উৎপত্তি হইবে। এই সারিতেও মাথার পর কোল, কোলের পর মাথা, এইরূপ ব্যবস্থা থাকিবে।

দুইটা কেন্দ্র হইতে দুইটা উর্ম্মির সারি চলিতে আরম্ভ করিবে। এখন এরূপ ঘটিতে পারে যে, কোন একটা স্থানে যে সময় প্রথম সারির উর্ম্মির মাথা উপস্থিত, ঠিক সেই সময়ে দ্বিতীয় সারি উর্ম্মির কোল উপস্থিত। ইহার ফলে মাথার উপর কোল পতিত হইয়া উভয়ে কাটাকাটি হইবে। মাথার গতি উর্দ্ধ-মুখে; কোলের গতি অধোমুখে। এক সময়ে মাথায় কোলে মিলিত হওয়ায় গতি না উর্দ্ধমুখে, না অধোমুখে ঘটিবে। মাথার উপর কোল আর কোলের উপর মাথা পড়িলে এই ফল ভিন্ন অন্য ফলের সম্ভাবনা নাই। উর্ম্মির সহিত উর্ম্মি মিলিত হইয়া উভয়েরই অন্তর্দ্ধান অবশ্যম্ভাবী। জলাশয়ে দুই স্থানে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া এইরূপ উর্ম্মিতে উর্ম্মিতে কাটাকাটি সহজেই প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। পাঠক যদি না দেখিয়া থাকেন, পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

বায়ুরাশিতে দুই স্থান হইতে দুইটা তন্ত্রী বা দুইটা পটহ হইতে উর্ম্মি চলিবার সম্ভব, এইরূপ কথা অসম্ভব নহে। এখানেও এক সারির মাথায় অন্য সারির কোল পড়িলে উভয়েরই অন্তর্দ্ধান অবশ্যম্ভাবী। উর্ম্মিগুলি কানে আসিয়া আঘাত দিলে পরে তবে শব্দজ্ঞান জন্মে। এখন এরূপ যদি বন্দোবস্ত করা যায়, দুই স্থান হইতে বায়ুরাশি আশ্রয় করিয়া দুই সারি উর্ম্মি আসিয়া যুগপৎ কানে পৌছিতেছে; প্রথম সারির মাথা আসিবার সময় দ্বিতীয় সারির কোল আসিয়া পৌছিল; আর প্রথম সারির কোল আসিবার সময়েই দ্বিতীয় সারির মাথা আসিয়া পৌছিল, তাহা হইলে মাথায় কোলে কাটাকাটি হইয়া যাইবে, কানে কোন ধাক্কাই লাগিবে না। শব্দে শব্দে সম্মিলন হইয়া একেবারে নিঃশব্দতা দাঁড়াইবে।

শব্দে শব্দে মিলিত হইয়া উভয় শব্দের লোপ, ইহা শুনিতে হেঁয়ালির মত লাগে, কিন্তু বস্তুতঃই ইহা পরীক্ষার দ্বারা দেখান চলে; ইহা অলীক প্রলাপবাক্য নহে।

তানপুরার খোলের উপর তুইটা সমান দীর্ঘ ও সমান স্থূল একই ধাতুতে নির্ম্মিত তার সমান টানে আঁটিলে উভয়েরই কম্পনসংখ্যা ঠিক সমান হইবে, উভয় তারেই একই স্থুর নির্গত হইবে। তুইটি এক স্থুরে বাঁধা হইবে। এই একই স্থুরে বাঁধা তুইটি তার একসঙ্গে আহত হইলে উভয়ের স্থুর বেমালুম মিলিয়া যাইবে। একটা তারের টান ঈষৎ আল্‌গা করিয়া দিলে উহার স্থুরটা কিঞ্চিৎ নামিয়া যাইবে, তখন তার তুইটা কিঞ্চিৎ বেস্থুরা হইবে। এখন তুইটা তারে ঘা দিলে দেখা যাইবে যে, তুই স্থুর মিশিয়া যেন একটু বিচিত্রগোছ হইয়াছে। এখন বোঁ বোঁ বোঁ, এইরূপ ক্রমে স্বরটা উঠানামা করিতেছে। যত ক্ষণ তার তুটি এক স্থুরে বাঁধা ছিল, তত ক্ষণ এই কেবল এক বোঁ ছিল ; এখন বোঁ বোঁ বোঁ, এইরূপ ক্রমান্বয়ে স্বরের উত্থান-পতন ঘটিতেছে। অর্থাৎ স্বর যেন থামিয়া থামিয়া রহিয়া রহিয়া বাহির হইতেছে। শব্দ, তাহার পর শব্দাভাব, তার তুইটির কোনটিরই কম্পন থামে নাই ; তাহারা বরাবর সমান ভাবেই কাঁপিতেছে ; কিন্তু শব্দের এই উত্থান-পতন, থাকিয়া থাকিয়া শব্দের এই অন্তর্দ্ধান কেন ঘটিল ? ইহার উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া গিয়াছে। যখন বায়ুতরঙ্গে এক ঊর্ম্মির মাথায় অন্য ঊর্ম্মির কোল পড়ে, তখন ঊর্ম্মিতে ঊর্ম্মিতে কাটাকাটি হয়। মাথায় মাথা বা কোলে কোল পড়িলে ঊর্ম্মির প্রবলতা ঘটে ; কিন্তু মাথায় কোলে একত্র সম্মিলনে প্রবলতার পরিবর্ত্তে তুর্ব্বলতা, এমন কি—অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত ঘটে।

এ ক্ষেত্রে পর্য্যায়ক্রমে প্রবলতা ও তুর্ব্বলতা ঘটিতেছে, তাহারই ফল বোঁ বোঁ বোঁ।

আর একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। মনে কর, একটা তারের কম্পন-সংখ্যা সেকেণ্ডে ১০০, উহাতে এক সেকেণ্ডে এক শত ঊর্ম্মি উৎপন্ন হয়। ঊর্ম্মি তারের নিকট উৎপন্ন হইয়া সেকেণ্ডের মধ্যে ১১০০ ফুট দূরে যাইবে ও তাহার পশ্চাতে আরও একটা ঊর্ম্মি সারি বাঁধিয়া থাকিবে। ১১০০ ফুট পথে ১০০ ঊর্ম্মি দাঁড়াইলে প্রত্যেক ঊর্ম্মির দৈর্ঘ্য হয় ১১ ফুট। দ্বিতীয় তারটার টান একটু বেশী হওয়ায় মনে কর, উহার কম্পন-সংখ্যা সেকেণ্ডে ১১০। এখানে ১১০০ ফুট পথে ১১০টি ঊর্ম্মি দাঁড়াইবে, প্রত্যেক ঊর্ম্মির দৈর্ঘ্য হইবে ১০ ফুট।

১১ ফুট ঢেউগুলির ১০টি ঢেউ যে সময়ে কানে লাগিবে, ১০ ফুট ঢেউগুলির ১১টি ঢেউ সেই সময়ে কানে লাগিবে। অথবা ১১ ফুট ঢেউগুলির

৫ ঢেউ যে সময়ে কানে পৌঁছিবে, ১০ ফুট ঢেউগুলির ৫॥ ঢেউ সেই সময়ে কানে পৌঁছিবে। মনে কর, উভয় তারের ঢেউএর মাথা একই সময়ে কানে পৌঁছিল। দুইয়েরই মাথা একসঙ্গে পৌঁছায় কানে প্রবল ধাক্কা লাগিল ; পরেই শব্দটাও প্রবল হইল। আর একটু মধ্যেই প্রথম তার হইতে ৫ ঢেউ আসিয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় তার হইতে ৫॥ ঢেউ আসিয়াছে, অর্থাৎ আধ ঢেউ বেশী আসিয়াছে। একের (১) মাথা কোল (২) মাথা কোল (৩) মাথা কোল (৪) মাথা কোল (৫) মাথা কোল পর্য্যন্ত আসিয়া কানে পৌঁছিয়াছে। অন্যের (১) মাথা কোল (২) মাথা কোল (৩) মাথা কোল (৪) মাথা কোল (৫) মাথা কোল (৬) মাথা পর্য্যন্ত কানে পৌঁছিয়াছে। অর্থাৎ যে সময়ে প্রথম তারের প্রথম ঊর্ম্মির কোল পৌঁছিল, ঠিক সেই সময়ে দ্বিতীয় তারেব ষষ্ঠ ঊর্ম্মির মাথা পৌঁছিল। মাথায় কোলে কাটাকাটিতে উভয়েরই অন্তর্দ্ধান, শব্দেরও লোপপ্রাপ্তি। আবার সেই সময় পরে মাথায় মাথায় যোগ হইয়া শব্দের প্রবলতা। কাজেই বোঁ বোঁ বোঁ।

তরঙ্গগতির এইটি বিশিষ্ট লক্ষণ, ঊর্ম্মিতে ঊর্ম্মিতে যোগ হইয়া উভয় ঊর্ম্মিরই বিলোপ ঘটিতে পারে। জলাশয়ে ঢেউ তুলিয়া ইহা দেখান যাইতে পারে। একটা স্থান আছে, সেখানে নদীমুখে দুই দিক্ হইতে জোয়ার-ভাঁটা আসে। এক দিক্ হইতে যখন জোয়ার আসে, অন্য দিক্ হইতে ঠিক সেই সময় ভাঁটা আসে। ফলে সেই নদীতে জোয়ারও হয় না, ভাঁটাও হয় না। এইরূপে গতিতে গতিতে সম্মিলনে গতি লোপের এক তরঙ্গগতি ভিন্ন অন্য কোথাও সম্ভাবনা নাই। শব্দে শব্দে নিঃশব্দতার উৎপত্তি প্রত্যক্ষ বিষয়। কাজেই এ স্থলেও এই তরঙ্গগতিরই আশ্রয় লইতে হয়। যেখানেই দেখা যাইবে, ভাবে ভাবে অভাব উৎপত্তি হইয়াছে, সেইখানেই এইরূপ ব্যাখ্যার আশ্রয় লইতে হইবে।

দার্শনিক পণ্ডিতেরা কথাটা শুনিয়া হয়ত শিহরিবেন ; কিন্তু ভাবে ভাবে অভাব উৎপন্ন হউক আর নাই হউক, শব্দে শব্দে মিলিয়া নিঃশব্দের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ বিষয় ; আর আলোকে আলোকে মিলিয়া আঁধারের উৎপত্তিও প্রত্যক্ষ বিষয়। কাজেই শব্দের উৎপত্তি বুঝাইতে যেমন তরঙ্গ-গতির আশ্রয় হইতে হয়, আলোকের উৎপত্তি বুঝাইতেও তেমনই তরঙ্গগতির আশ্রয় লইতে হয়।

আলোক

শব্দরহস্য আলোচনা করা গেল। এইবার আলোক-রহস্যের আলোচনা করা যাউক। কিন্তু আলোকে আলোকে আঁধারের উৎপত্তি বুঝিবার আগে আলোকের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথাগুলির আলোচনা আবশ্যক। শ্রবণসহায় যাহা তাহা শব্দ, দর্শনসহায় যাহা তাহার নাম আলোক। দর্শনেন্দ্রিয়-গোচর পদার্থ হইতে আলোক চক্ষে পড়িলে দর্শনেন্দ্রিয় তাহা মনের সমক্ষে লইয়া যায়; মন তাহা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধির সমীপস্থ করিলে উহা দৃষ্টিগোচর হয়। দৃষ্টিগোচর যাবতীয় পদার্থের কেহ স্বয়ম্প্রভ, যথা—সূর্য্য, নক্ষত্র, দীপশিখা, জোনাকি পোকা। উহারা নিজের আলোকে দেখা দেয়। অবশিষ্ট নিষ্প্রভ। তাহারা পরের আলোকে প্রভান্বিত হইয়া দেখা দেয়। আলোকের ঔজ্জ্বল্যভেদ বা দীপ্তিভেদ আছে। সূর্য্যের আলোর মত উজ্জ্বল বা দীপ্তিমান্ আলো আর কিছুই নাই। আলোকের আবার বর্ণভেদ আছে। যেমন রক্ত, নীল, পীত। সূর্য্যের আলো শুভ্র, দীপের আলো পীত, বাজি পোড়াইয়া রক্ত, হরিৎ আলো জন্মান হয়। দীপশিখায় তুঁতের গুঁড়া দিলে সবুজ আলো হয়। এই বর্ণভেদ আলোকের প্রধান লক্ষণ; বর্ণ দেখিয়া আলোক চিনিতে হয়। শব্দের যেমন সুরভেদ, আলোর তেমনই বর্ণভেদ।

যাহার ভিতর দিয়া আলোক অবাধে চলিয়া যায়, তাহা স্বচ্ছ; যেমন কাচ, অভ্র, হীরক, জল, বায়ু। যাহার ভিতর আলো যায় না, তাহা অনচ্ছ; কাঠ, পাথর, ধাতু। অনচ্ছ পদার্থে ছিদ্র থাকিলে সেই ছিদ্রদ্বার দিয়া আলোক চলিতে পারে। উদয়ের পর বা অস্তগমনের পূর্ব্বে সূর্য্যের আলো জানালার ফুটা দিয়া প্রবেশ করিয়া সম্মুখের দেওয়ালে পড়ে। আলোকের পথে বায়ুরাশিতে ভাসমান ধূলিকণাসকল আলোকিত হইয়া আলো ঠিক সরল পথে চলে, তাহা দেখাইয়া দেয়। আলো সরল পথে চলে—পাশ কাটাইয়া যায় না বলিয়া অনচ্ছ পদার্থের পশ্চাতে উহার ছায়া পড়ে। আলোকের অভাবই ছায়া। প্রদীপ ও চক্ষের মাঝে হাত ধরিলে হাতের ছায়া চক্ষের উপর পড়ে। অনচ্ছ হাত ভেদ করিয়া ছায়া আসে না, হাতের পাশ দিয়া বক্র পথেও চোখে আসে না। কাজেই আলো আটকাইয়া যায়, প্রদীপ তখন দেখা যায় না। ঐরূপে ছোট হাতখানির আড়াল দিয়া প্রকাণ্ড সূর্য্যবিম্বের সমস্তটা কিংবা খানিকটা আমরা আচ্ছাদিত করিতে

পারি। অমাবস্যার দিনে চাঁদ, সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া সূর্য্যের সমস্তটা ঢাকিলে, সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ হয়, খানিকটা ঢাকিলে আংশিক গ্রাস হয়। পূর্ণিমার রাত্রিতে পৃথিবী, সূর্য্য ও চাঁদের মাঝে পড়িলে পৃথিবীর ছায়া চাঁদে পড়ে। চাঁদ স্বয়ং নিষ্প্রভ, উহা সূর্য্যের আলোকেই জ্যোতিষ্মান্। কাজেই পৃথিবীর ছায়ায় প্রবেশ করিলে চাঁদ অদৃশ্য হয় ও চাঁদের পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণ ঘটে।

হাতের ব্যবধানে সূর্য্যের বা প্রদীপের আলোক অক্লেশে চোখ হইতে আটকান যায়, কিন্তু কোন বাদ্যযন্ত্রের শব্দ হাতের আড়ালে কান হইতে আটকান যায় না। শব্দ হাতের পাশ কাটিয়া বক্র পথে কানে প্রবেশ করে, আলোক তাহা করে না। আলোকের ও শব্দের গমনপথের এই পার্থক্য পরে বিবেচ্য।

আলোক এইরূপ সরল পথে চলে বলিয়া আমরা আলোকের পথকে রেখারূপে কল্পনা করিতে পারি। এক সরল রেখা ধরিয়া যে আলোক চলে, তাহাকে কিরণ বলা যাইবে। জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ হইতে চতুর্দ্দিকে আলোকের কিরণ ধাবিত হয়। কতকগুলি কিরণের গোছা চক্ষে প্রবেশ করিলে, আমরা সেই জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ দেখিতে পাই।

কোথায় দেখি? দূরে দেখি সন্দেহ নাই, কিন্তু কত দূরে দেখি, বলা কঠিন। দর্শন দ্বারা দূরত্বের নির্ণয় হয় বটে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে হয় না। দুই দশ রশির মধ্যে কোন্ গাছটা দূরে, কোন্‌টা নিকটে, আমরা দেখিয়া বলি, কিন্তু দুই চারি ক্রোশ দূরের জিনিসের মধ্যে কোন্‌টা কাছে, কোন্‌টা দূরে, তাহা বলা চলে না।

আরও অধিক দূরে স্থিত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের দূরত্ব সম্বন্ধে কে কত দূরে, দর্শনেন্দ্রিয় তাহার কোন তথ্যই নির্দ্দেশ করে না।

দূরত্ব বলা চলে না, তবে কে কোন্ দিকে আছে, তাহা বলা চলে। প্রাতে সূর্য্যকে দেখি পূর্ব্বে, মধ্যাহ্নে ঊর্দ্ধে, বৈকালে পশ্চিমে। রাত্রিতে খগোলে যে কয়েক হাজার নক্ষত্র দেখা যায়, উহাদের দূরত্ব সমান নহে; দৃষ্টি সেই দূরত্ব বিচারে অক্ষম। মনে হয়, সকল নক্ষত্রই এক অর্দ্ধবর্ত্তুলাকার নীল পটে চিত্রিত আছে। তবে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন নক্ষত্র দেখা যায় বলিয়া সেই পটে তাহাদের অবস্থানভেদ নির্ণীত হয়।

আলোকরেখা বা কিরণ যে পথে আসিয়া চক্ষুতে প্রবেশ করে, আমরা সেই পথের কোন-না-কোন স্থানে জ্যোতিষ্মান্ পদার্থের অবস্থান নির্ণয় করি। কিরণগুলি চক্ষুতে প্রবেশের সময় যে পথে চলে, সেই পথের কোন্‌খানে দেখি, এই কথাটা স্মরণ রাখিতে হইবে।

আলোককিরণ সরল রেখায় চলে, কিন্তু মসৃণ পদার্থের পৃষ্ঠে পড়িয়া উহার পথ বাঁকিয়া যায়। কাচের পিঠ, জলের পিঠ, পালিশ-করা ধাতুর পিঠ, মসৃণ পিঠের উদাহরণ। ঐ পিঠে পড়িয়া আলোকের পথ ঘুরিয়া যায়; কিন্তু পতনের সময় সেই পিঠ হইতে কিরণপথ যতটুকু হেলিয়া থাকে, ফিরিবার সময় ঠিক ততটুকুই হেলিয়া থাকে।

পূর্ব্ব দিকে নবোদিত সূর্য্যের কিরণ সরল পথে নামিয়া আসিয়া জলাশয়ের পিঠে পড়িল। কিরণ জলপৃষ্ঠ স্পর্শের সময়ে হেলিয়া নামিয়াছে। জলপৃষ্ঠে পড়িয়া উহার রাস্তা পশ্চিমমুখে ফিরিল। তবে নামিবার সময় যতটুকু হেলিয়াছিল, উঠিবার সময় ঠিক ততটুকু হেলিয়া উঠিল। আমি জলাশয়ের পশ্চিম পারে দাঁড়াইয়া আছি। সূর্য্যকিরণ জলপৃষ্ঠ হইতে হেলিয়া উঠিয়া সরল পথে চলিয়া আমার চোখে পড়িল। আমার চোখে পড়িবার সময় কিরণ জলের পিঠ হইতে আসিতেছে। যে দিক্ হইতে আলো আসে, আমি মনে করি, জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ সেই দিকে আছে। এখানেও আমি মনে করি, সূর্য্য জলের পিঠের নীচে ও-ধারে রহিয়াছে; আলোক যেন সেইখান হইতে বরাবর সরল পথে আসিয়া আমার চোখে পড়িতেছে। বাস্তবিক সূর্য্য আছে আকাশে, উর্দ্ধে, উহার কিরণের পথ এইরূপে ঘুরিয়া যাওয়ায় আমি মনে করি, সূর্য্য আছেন জলের নিম্নে। জলের নিম্নে যে সূর্য্যের অবয়ব দেখা যায়, তাহার নাম দিই সূর্য্যের প্রতিবিম্ব। আর কিরণের রাস্তা যে এইরূপে ঘুরিয়া যায়, এই ঘটনার নাম দিই আলোকের প্রতিফলন।

দর্পণপৃষ্ঠে আলোককিরণ প্রতিফলিত হইয়া মুখ ঘুরাইয়া চোখে পড়িলে বোধ হয়, দর্পণের পিঠের ও-ধারে জিনিসটা আছে, সেইটা প্রকৃতপক্ষে জিনিসের প্রতিবিম্ব। আরসীতে মুখ দেখার এই রহস্য।

যাহার পিঠ মসৃণ নহে—বন্ধুর, তাহার পিঠে আলোক পড়িলে, সেই আলোকও প্রতিফলিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়, কিন্তু এবার কোন এক পথে ফিরে না। ভিন্ন ভিন্ন কিরণ ভিন্ন ভিন্ন পথে ফিরিয়া যায়, পূর্ব্বে—পশ্চিমে,

উত্তরে, দক্ষিণে, ঊর্দ্ধে ছট্‌কাইয়া পড়ে। জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ হইতে কিরণ যেমন চারি দিকে বা দশ দিকে ছট্‌কাইয়া বাহির হয়, অনচ্ছ পদার্থের বন্ধুর পৃষ্ঠে পড়িয়াও সেইরূপ চারি দিকে ছট্‌কাইয়া পড়ে। কোন্ পদার্থ স্বয়ম্প্রভ, কোন্ পদার্থ নিষ্প্রভ, চক্ষু তাহা সহসা বিনা বিচারে স্থির করিতে পারে না। ঐ দিক্ হইতে আলোক আসিতেছে দেখিলে, সেই দিকে পদার্থ আছে ঠিক করিয়া লয়। স্বয়ম্প্রভ পদার্থ যেমন চারি দিকেই আলো ছড়ায়, নিষ্প্রভ অনচ্ছ পদার্থের বন্ধুর পিঠ, পরের ধার-করা আলোর কিরণগুলিকে তেমনই চারি দিকে ছড়ায়। চক্ষু উহাকেও দীপ্তিমান্ মনে করে ও সেইরূপ দেখে। নিষ্প্রভ অনচ্ছ পদার্থের উপর কিন্তু মসৃণ হইলে উহা চারি দিকে আলো ছড়ায় না, ধার-করা আলোকে কেবল একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে ছড়ায়। চক্ষু তখন সেই নিষ্প্রভ পদার্থকে না দেখিয়া তাহার পশ্চাতে অন্য পদার্থ দেখে।

বিরল পদার্থ হইতে নিবিড় পদার্থে প্রবেশকালেও কিরণের পথ ফিরিয়া যায়। বিরল বায়ু হইতে ঈষৎ হেলিয়া আলোকের কিরণ নিবিড়তর জলে প্রবেশ করিল ; প্রবেশ করিয়া মুখটা একটু ফিরাইয়া লয়। জলের পিঠের দিকে যতটা হেলিয়াছিল, এখন তার চেয়ে কিছু বেশী হেলিয়া চলিতে আরম্ভ করে। জলের ভিতর হইতে আলোক বাহির হইয়া বায়ুতে প্রবেশ করিবার সময় উল্টা বিধি। জলের ভিতর থাকিতে সেই পিঠের দিকে যতটা হেলিয়াছিল, জলের বাহিরে আসিয়া আর ততটা হেলিয়া থাকে না ; কতকটা পিঠ ঘেঁসিয়া চলে। সেই আলো চোখে পড়িলে মনে হয়, উহা পিঠের নীচে অথচ নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে আসিতেছে। বস্তুতঃ উহা হয়ত গভীর স্থান হইতে আসিয়াছে ; কিন্তু পিঠের দিকে হেলিয়া যাওয়াতে বোধ হয়, উহা তত গভীর স্থান হইতে আসে নাই ; প্রকৃত স্থান চেয়ে উচ্চতর স্থান হইতে আসিয়াছে। বাটিতে জল রাখিলে তাই মনে হয়, বাটির তলাটা উঠিয়া পড়িয়াছে। চৌবাচ্চার জলের বাহিরে দাঁড়াইলে বোধ হয়, চৌবাচ্চার তলাটা যেন উঠিয়া পড়িয়াছে। একটা কলম হেলাইয়া ধরিয়া জলে অর্দ্ধমগ্ন করিলে, মগ্ন ভাগের প্রত্যেক অংশই একটু যেন উচ্চে উঠে, বোধ হয় কলমটা যেন বাঁকিয়া গিয়াছে।

মনে কর, চৌবাচ্চার জল দুই হাত গভীর ও সেই গভীর জলে অর্থাৎ পিঠ হইতে দুই হাত নীচে একটি টাকা আছে। জলের উপর টাকাটির প্রায় ঊর্দ্ধে যদি চোখ রাখি, তাহা হইলে কিরণগুলি প্রায় লম্বভাবে আসিয়া চোখে

প্রবেশ করে। কিন্তু ঠিক উর্দ্ধে চোখ না রাখিয়া একটু পাশে সরিয়া দাঁড়াইলে কিরণগুলিকে লম্বভাবে না আসিয়া জলের পিঠের দিকে একটু হেলিয়া আসিতে হয়। ভিতরে যতটা পিঠ ঘেঁসিয়া থাকে, বাহিরে বায়ুমার্গে আসিয়া আরও অধিক ঘেঁসিতে হয়, তার পর চোখে পড়ে। তখন মনে হয়, টাকাটিও পিঠ ঘেঁসিয়া আছে, দুই হাত নীচে নাই, হয়ত দেড় হাত নীচে আছে। চোখ যদি আরও পাশে আরও দূরে সরাইয়া লই, তাহা হইলে কিরণকে আরও জলের গা ঘেঁসিয়া আসিতে হইবে। টাকাটি আরও উচ্চে আছে মনে হইবে। যত চোখ সরাইবে, টাকাটি ততই যেন উচ্চে উঠিবে, মনে হইবে এক হাত, আধ হাত, সিকি হাত নীচে আছে। আর একটু দূরে গেলে টাকাটি আর নজরেই পড়িবে না। এখন কিরণগুলি বাহিরে আসিয়া একেবারে জলের পিঠ অত্যন্ত ঘেঁসিয়া প্রায় জলের পিঠ স্পর্শ করিয়াই চলিতেছে, চোখ জলের পিঠ ছাড়িয়া একটু উচ্চে আছে, কাজেই কিরণগুলি জলের বাহিরে আসিয়া আর চোখে পড়িবার অবকাশই পাইতেছে না। যে সকল কিরণ জলের ভিতরেই এইরূপ অল্প হেলিয়া থাকে, তাহারা বাহিরে আসিয়া একেবারে জলের পিঠ ছুঁইয়া চলে, চোখে প্রবেশ করে না। যে সকল কিরণ জলের ভিতর আরও অল্প হেলিয়া থাকে, তাহারা জলের বাহিরে আসিতেই পায় না; ভিতরেই প্রতিফলিত হয়। জলের ভিতরে যথাস্থানে চোখ রাখিলে বোধ হইবে, যেন ঐ প্রতিফলিত কিরণ জলের উপর হইতে আসিতেছে, অর্থাৎ দর্পণে যেমন ও-পিঠে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, এখানেও সেইরূপ জলমগ্ন চক্ষু জলের পিঠের উপর টাকার প্রতিবিম্ব দেখে। টাকাও আছে জলে, চোখও আছে জলে, কিন্তু এমন জায়গায় আছে যে, জলের কিরণ জলপৃষ্ঠে প্রতিহত ও প্রতিফলিত হইয়া আবার জলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া চোখে পৌঁছিল। চোখ দেখিল, জলের উপর বায়ুর মধ্যে টাকার প্রতিবিম্ব।

মরুভূমিতে তপ্ত উষ্ণ ভূমির উপর বায়ুর স্তর তপ্ত, উষ্ণ ও প্রসারিত হইয়া বিরল হয়, তার উপরের স্তর শীতল ও নিবিড় থাকে। দূরের গাছপালা হইতে আলোকের কিরণ হেলিয়া নামিতে নামিতে উপরের নিবিড় বায়ুস্তর হইতে নীচের বিরল বায়ুস্তরে নামিতে নামিতে আর নামিতে পারে না, সেইখানে প্রতিহত ও প্রতিফলিত হইয়া উপরমুখে হেলিয়া চলে ও দূরে দর্শক থাকিলে তাহার চোখে পড়ে। ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রতিফলিত কিরণ

আসিয়া দর্শকের চোখে পড়িলে দর্শক মনে করে, ভূপৃষ্ঠের নীচে হইতে সেই কিরণ আসিতেছে। ভূপৃষ্ঠের নীচে সেই দূরস্থ গাছপালার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। ভূপৃষ্ঠে সংলগ্ন উত্তপ্ত বিরল বায়ুস্তর দর্পণের মত ব্যবহার করে, অথবা জলাশয়ের জলপৃষ্ঠের মত ব্যবহার করে। ভূমির নিম্নে গাছপালার প্রতিবিম্ব দূর হইতে দেখিলে দর্শকের স্বতঃই মনে হয়, এখানে বুঝি জলাশয়ই আছে। কিন্তু জল নাই সেখানে এক ফোঁটা, আছে কেবল তপ্ত বালি, আর তপ্ত পাষাণ ; জলাশয় প্রতারণা মাত্র ; উহার নাম মরীচিকা।

খগোলে জ্যোতিষ্কগণের আলো, পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিয়া যে বায়ু আছে, সেই বায়ু ভেদ করিয়া তবে আমাদের চোখে পড়ে। নীচের বায়ুস্তর উপরের বায়ুর চাপে নিবিড়, উপরের বায়ুস্তরের উপর চাপও কম, কাজেই উহা অপেক্ষাকৃত বিরল। যত উর্দ্ধে যাওয়া যায়, বায়ু ততই বিরল হয়। খুব উঁচু পর্ব্বতের উপর বায়ু এত বিরল যে, নিশ্বাস লইতে কষ্ট হয়। নক্ষত্রাদির আলো পৃথিবীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে উপরের বিরল বায়ু ভেদ করিয়া ক্রমশঃ নিবিড় বায়ুস্তরে প্রবেশ করে। কাজেই বায়ু হইতে জলে প্রবেশের সময় কিরণের পথ যেমন একটু পরাক্ পতিত হয়, এখানেও কতকটা সেইরূপ ঘটে। ঠিক মাথার উপরে স্বস্তিকবিন্দুতে যে নক্ষত্র আছে, তাহার আলো লম্বভাবে উর্দ্ধাধোভাবে বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আসে, সে কিরণগুলি হেলিয়া না থাকায় তাহাদের মুখ ঘুরে না। কিন্তু স্বস্তিকের আশে পাশে নীচে, বিশেষতঃ দিগ্বলয়ের কিঞ্চিদূর্দ্ধে যে-সকল নক্ষত্র আছে, তাহাদের কিরণগুলিকে অত্যন্ত হেলিয়া আসিতে হয়, তাহাদের পথ কাজেই অনেকটা তির্য্যগ্‌গামী হয়। ফলে যে নক্ষত্র খগোলপটে যেখানে আছে, আমরা ঠিক সেইখানে দেখিতে পাই না, তদপেক্ষা একটু উর্দ্ধে অবস্থিত দেখি। জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে এজন্য বড় সাবধানে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়।

দূরে কোন দ্রব্য আছে। তাহার প্রত্যেক বিন্দু হইতে আলোকের কিরণ সরলরেখা ক্রমে ছুটিয়া আসিতেছে। কতিপয় কিরণের গুচ্ছ আমার চোখে প্রবেশ করিল। কতক চোখের ডানি পাশে, কতক বাম পাশে পড়িল। সেগুলি আমার কোনও কাজে লাগিল না। যেগুলি চোখে পড়িল, দৃষ্টিজ্ঞানের জন্য সেইগুলিই যথেষ্ট। সেই কিরণগুলি যে দিক্ হইতে আসিতেছে, সেই দিকেই আমি সেই দ্রব্যটি অবস্থিত দেখিলাম। ঐ কিরণের পথে অর্থাৎ সেই দ্রব্য আর চোখের মাঝখানে যদি একখানি কাচের

পরকলা রাখা যায়, যাহার এক পিঠ সমতল, আর এক পিঠ কুব্জ (অর্থাৎ লোহার কড়াইয়ের বাহিরের পিঠের মত) অথবা দুই পিঠ কুব্জ, তাহা হইলে ফলে এই দাঁড়ায় যে, আলোকের রেখাগুলির পথ সেই কাচের পরকলায় প্রবেশ করিয়া একটু একটু বাঁকিয়া যায়। যে মুখে আসিতেছিল, সে মুখ ছাড়িয়া একটু অন্য মুখে চলিতে থাকে ও পরকলার বাহিরে আসিয়া সেই অন্য মুখে চলিয়া চোখে প্রবেশ করে। যে কিরণগুলি চোখে প্রবেশ করিতেছিল, সেগুলিও এইরূপ বাঁকিয়া যায় ; যেগুলি চোখের ডাহিনে বামে পড়িতেছিল, সেগুলিও বাঁকিয়া যায়। কোন্ মুখে বাঁকিয়া যায় ? চোখের দিকে ? যে সকল কিরণ চোখের ডাহিনে বামে পড়িতেছিল, তাহাদের কতকগুলি মুখ ফিরাইয়া এখন চোখে প্রবেশ করে। এই মুখ ফিরানর ফলে বোধ হয়, কিরণগুলি আরও দূর হইতে আসিতেছে। বস্তুতঃ যে দ্রব্য হইতে আসিতেছে, এখন মনে হয়, সেই দ্রব্যের আরও পিছনে, আরও দূরে, কোন জায়গা হইতে আসিতেছে। অর্থাৎ সেই দ্রব্যই যে স্থানে অবস্থিত, আমাদের মনে হয়, উহা তাহার পিছনে, দূরে এক জায়গায় সরিয়া গিয়াছে। দূরে সরিয়া যায় এবং আকারেও বৃহত্তর দেখায়। কাচের পরকলা না থাকিলে উহা যত বড় দেখাইত, তাহার চেয়েও বড় দেখায়। এইরূপ কাচের পরকলার ক্ষমতাই এই যে, উহা ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখায়, বুড়া মানুষের চোখের চশমা এইরূপ পরকলা। সেই পরকলা লইয়া পরীক্ষা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। এইরূপ পরকলা ছোট জিনিসকে বড় দেখানর জন্য ব্যবহার করা চলে।

পরকলার গুণে দ্রব্যটা যেন পিছনে হঠিয়া যায়। বস্তুত আমরা দ্রব্যটা না দেখায় তাহার একটা দূরস্থ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই।

দ্রব্যটা হইতে পরকলার দূরত্ব বাড়াইলে প্রতিবিম্ব আরও দূরে হঠে ; খুব তাড়াতাড়ি হঠিয়া যায়। আরও খানিকটা দূরে লইয়া গেলে প্রতিবিম্বটা এত দূরে সরিয়া যায় যে, তখন উহা আর দৃষ্টির বিষয় থাকে না।

বুড়া মানুষের চশমাতে ইহার পরীক্ষা চলিবে। একখানা বহি খুলিয়া উহার সামনে চশমা ধরিলে অক্ষরগুলিকে বড় দেখায়। বহি একটু দূরে লইয়া গেলে অক্ষর এত দূরে পড়ে ও এত বড় হয় যে, আর স্পষ্ট দেখাই যায় না।

আরও একটু দূরে লইলে তখন একটু অন্যরূপ ব্যাপার ঘটে। কিরণগুলি তখন এতটা মুখ ফিরাইয়াছে যে, চশমার এ পারে আসিয়া অর্থাৎ যে পারে

চোখ আছে, সেই পারে আসিয়া মিলিত হয়। দ্রব্যটার প্রত্যেক বিন্দু হইতে যে কিরণগুলি বাহির হইয়াছিল, তাহারা চশমা পার হইয়া এ-পারে আসিয়া আবার একটা বিন্দুতে একত্র হয়। প্রত্যেক বিন্দুর পক্ষে এইরূপ ঘটায় চশমার এ-পারে বায়ুমধ্যে চশমারই যেন একটা ছবি, একটা প্রতিকৃতি উৎপন্ন হয়। যেখানে কিরণগুলি এইরূপে একত্র মিলিয়াছে, সেইখানে একখানা কাগজ ধরিলে দেখা যাইবে, কাগজের গায়ে যেন একটা ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। চশমার এক ধারে থাকিল সেই দীপ্তিমান্ দ্রব্য, যেমন একটা দীপশিখা, অন্য ধারে থাকিল কাগজের গায়ে সেই শিখার একটা প্রতিকৃতি। এই ছবি চশমা হইতে দূরেও হইতে পারে, আবার নিকটেও হইতে পারে। দূরে হইলে ছবিটা বড় হয়, নিকটে হইলে ছবিটা ছোট হয়; যে দ্রব্যের ছবি, সে দ্রব্য চেয়ে ছোট হয়। সূর্য্য খুব দূরে আছে; বুড়া মানুষের চশমা সূর্য্যের আলোতে ধরিয়া, চশমার এ-পারে সূর্য্যের সেই ছবি অনায়াসে দেখান যাইতে পারে। যেন চশমাটা সূর্য্যের এক এক গোছা কিরণকে ধরিয়া তাহার মুখ ফিরাইয়া ও-পারে কেন্দ্রীভূত করিয়াছে। তাই একটা ছোট, কিন্তু উজ্জ্বল সূর্য্যের ছবি এ-পারে তৈয়ার হইয়াছে। এই ছবির দীপ্তি এত প্রখর যে, সেখানে কাগজ রাখিলে পুড়িয়া যাইতে পারে, দিয়াশলাই জ্বালান যাইতে পারে।

ফটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরার মুখে ঐরূপ একখানা পরকলা থাকে। পরকলার সামনে যিনি দাঁড়াইয়া আছেন, পরকলার এ-পারে তাঁহার একটি ছোট ছবি পড়ে।

কতকগুলি রূপাঘটিত যৌগিক পদার্থ আছে; তাহা আলোক পাইলে বিশ্লিষ্ট ও বিবর্ণ হইয়া যায়। কাচের গায়ে তেমনই পদার্থের প্রলেপ দিয়া ক্যামেরার বাক্সে পরকলার এ-ধারে যথাস্থানে ধরিলে সেই কাচের উপর ছবি পড়ে ও প্রলেপটা বিবর্ণ হইয়া গিয়া ছবিটার স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যায়।

এইরূপ কাচের পরকলার গুণ কি, বুঝা গেল। কোন দ্রব্যের নিকটে ধরিলে বোধ হয়, দ্রব্যটা কিছু হঠিয়া গিয়াছে ও আকারে বৃহত্তর হইয়াছে। আর পরকলা দ্রব্যটা হইতে অধিক দূরে ধরিলে, প্রতিবিম্ব পিছু হঠিতে হঠিতে শেষে অদৃশ্য হয়, কিন্তু এ-ধারে একটা ছবি পড়ে। পরকলা যত অধিক দূরে থাকে, ছবিটা ততই পরকলার কাছে যায় ও ছোট হয়।

পরকলার এই গুণে দূরবীন ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈয়ার হইয়াছে। ঐ দুই যন্ত্র তৈয়ার করিতে দুইখানি করিয়া পরকলা আবশ্যক। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে একখানি বড় ও একখানি ছোট পরকলা থাকে। ছোটখানি একটি পিঁপীড়ার সামনে ধরিলে, ঐ পিঁপীড়ার একটা ছবি পরকলার এ-ধারে পড়ে। এই ছবিটা পরকলা হইতে দূরে থাকে ও খুব বড় ছবি হয়। এই বড় ছবির সামনে ও নিকটে আর একখানি বড় পরকলা ধরিলে, সেই বড় ছবিটাই যেন আরও দূরে হঠিয়া যায় ও আরও বড় হয়। কাজেই চোখে একটা বৃহৎ পিঁপীড়া দেখা যায়। যে সকল দ্রব্য সহজে চক্ষুর অগোচর, তাহাকে বড় করিয়া দেখাইবার জন্য এই অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রেও দুইখানি পরকলা থাকে। ইহার বড় পরকলাখানি সূর্য্যের সম্মুখে ধরিলে, পরকলার এ-ধারে সূর্য্যের একটা ছোট ছবি পড়ে। আর একখানা ছোট পরকলা সেই ছোট ছবি ও চোখের মাঝে ধরিলে, ছোট ছবিটা পিছনে হঠিয়া গিয়া বড় দেখায়।

পরকলার এক পিঠ অথবা উভয় পিঠ কুব্জ হইলে সেই পরকলাতে আলোকের কিরণগুলি যাহা বাহির হইয়া ছট্‌কাইয়া পড়িতেছিল, তাহাদিগকে একত্র আনিবার চেষ্টা করে। তাহার ফলে কি হয়, বলা গেল। পরকলার এক পিঠ বা উভয় পিঠ যদি কুব্জ না হইয়া ন্যুব্জ হয়, অর্থাৎ কটাহের ভিতরের পিঠের মত হয়, তাহার ফল হয় উল্টা। উহাতে কিরণগুলিকে আরও ছট্‌কাইয়া দেয়। যে সকল কিরণ দূরের জিনিস হইতে আসিতেছিল, তাহারা আরও ছট্‌কাইয়া পড়ায় মনে হয়, নিকট হইতে আসিতেছে। জিনিসটাকে যেন টানিয়া নিকটে আনে। মনে হয়, জিনিসটা কাছে আসিয়াছে ও ছোট হইয়াছে। এ-কালের অনেক যুবক ভাগ্যদোষে দূরের জিনিস ভাল করিয়া দেখিতে পান না; তাঁহাদিগকে চশমার জন্য এইরূপ পরকলা ব্যবহার করিতে হয়।

কাচের পরকলার পরিবর্ত্তে কাচের কলম, ঝাড়ে যেমন কলম ঝুলে, সেইরূপ তিন পাশ ও তিন শির যে কলমে আছে, সেইরূপ কাচের কলম লইয়া তাহাতে সূর্য্যের আলোক ফেলাইলে ঐ আলোকের কিরণগুলিও মুখ ফিরাইয়া এ-পাশ দিয়া বাহির হয়। কিন্তু বাহির হইবার সময় একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটে। সূর্য্যের আলোক শুভ্র, কিন্তু কলমের ভিতর প্রবেশ করিয়া বাহিরে আসিলে উহা আর শুভ্র থাকে না। উহা নানা

বর্ণের হয়। ঝাড়ের কলমে সূর্য্যের আলো পড়িয়া ঐরূপ বর্ণের বিকাশ সকলেই দেখাইয়াছেন, কিন্তু এই ব্যাপারের তাৎপর্য্য একটি লোকের পূর্ব্বে কেহই বুঝিতে পারেন নাই। সেই লোকটি আর কেহই নহেন—নিউটন। একখানা থালে একটা সরু ফুটা করিয়া, সেই ফুটার ভিতর দিয়া সূর্য্যের শুভ্র আলোক অর্থাৎ রৌদ্র আনিয়া, সেই আলোকের পথে কলম ধরিয়া নিউটন দেখিলেন যে, কলম পার হইয়া আলোকের কিরণগুলি ভিন্ন পথে মুখ ঘুরাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু সেই আলোক আর শুভ্র নাই। উহা ভাঙ্গিয়া নানা বর্ণের আলোক হইয়াছে। কত বর্ণের ? প্রায় অসংখ্য বর্ণের, এত বর্ণ যে, অভিধানে তাহাদের সকলের নাম নাই; যেগুলির নাম আছে, তাহার মধ্যে রক্ত, অরুণ, পীত, হরিৎ, আশমান, নীল ও শিম্বী। "বেগুনী" শব্দটা অভব্য শুনায়, বার্ত্তাকু করিলেও উন্নতি হয় না; কাজেই বেগুনী রংএর শিম্বীর বা শীমের বর্ণকে শিম্বী বর্ণ বলিলাম। আমাদের মত লোক চোখ থাকিতে অন্ধ; নিউটনের চোখই চোখ; তিনি দেখিলেন আর বুঝিলেন, শুভ্রবর্ণের আলোর মধ্যেই এই নানা বর্ণের আলো বর্ত্তমান ছিল। উহারা যত ক্ষণ একমুখে চলিয়া একযোগে চোখে প্রবেশ করিতেছিল, তখন শুভ্র বর্ণের জ্ঞান জন্মিতেছিল। কিন্তু কলমে প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোক ভিন্ন ভিন্ন মুখে বাহির হয়, উহারা আর একত্র হয় না। একত্র আসিবার অবসর পায় না বলিয়াই পরস্পর পৃথক্ থাকে ও তখন আপন আপন বর্ণ লইয়া দেখা দেয়। এক ধারে থাকে রক্ত, অন্য ধারে থাকে শিম্বী, মাঝে থাকে অন্যান্য বর্ণ। রক্তের পরে ও-পাশে অরুণ, তার পাশে পীত, এইরূপ।

নিউটনের এই আবিষ্কারটাকে অনুমানলব্ধ সত্য বলা চলে না, ইহা এক রকম প্রত্যক্ষলব্ধ সত্য। অপরে চোখ থাকিতেও কানা, তাই প্রত্যক্ষ বিষয়ও দেখিতে পান নাই; নিউটন চক্ষুষ্মান্ ছিলেন বলিয়াই দেখিয়াছিলেন।

কোন বিষয়কে ইন্দ্রিয় দ্বারা অবহিত হইয়া প্রত্যক্ষগোচর করার নামই অবেক্ষণ। পাঁচটা জিনিস একসঙ্গে অবেক্ষণ করিলে গোলমালে গণ্ডগোল ঘটে বলিয়া কৌশলক্রমে সেই গণ্ডগোল দূর করিয়া অবেক্ষণের নাম পরীক্ষণ। নিউটন এখানে কেবল অবেক্ষণ করেন নাই, পরীক্ষণও করিয়াছিলেন। খুব সরু ছিদ্রের ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলো আনিয়াছিলেন। ছিদ্রটা মোটা হইলে অবেক্ষণে দোষ ঘটে, একটা গণ্ডগোল ঘটে, মোটা ছিদ্র দিয়া যে

বিস্তর কিরণ আসে, সেই কিরণের গোছাটাও মোটা হয়। রক্তবর্ণ আলোর পাশ দিয়া অরুণবর্ণের আলো চলে। কিরণের মোটা গুচ্ছ লইলে, কতকগুলি অরুণ কিরণ, কতিপয় রক্ত কিরণের সহিত মিলিয়া যায় ; তাহাতে যে বর্ণের জ্ঞান হয়, তাহা না রক্ত, না অরুণ। সরু ছিদ্র দিয়া কিরণের সরু গোছা আনিলে উহারা ঐরূপ গায়ে গায়ে পড়িয়া মিলিতে অবসর পায় না ; রক্ত হইতে অরুণকে পৃথক্ করিয়া দেখা যায়। ছিদ্র যতই সরু হইবে, ততই বিশুদ্ধ রক্ত ও বিশুদ্ধ অরুণ ও বিশুদ্ধ পীত দেখা যাইবে।

সূর্য্যের আলো শুভ্র, উহাতে রক্ত হইতে শিম্বী পর্য্যন্ত নানা বর্ণের আলোক আছে। সকলে মিলিয়া শুভ্র বর্ণের আলোকের জ্ঞান জন্মায়। কিন্তু ঐ সূর্য্যের শুভ্র আলো রঙিন শাসির কাচের ভিতর প্রবেশ করিলে উহা আর শুভ্র থাকে না। যে আলো কাচ হইতে বাহির হইয়া আসে, তাহা রঙিল। উহার অর্থ এই যে, সূর্য্যের শুভ্র আলো কাচে প্রবেশ করে ; তাহার অন্তর্গত কতকগুলি বর্ণের আলো, ঐ কাচে অপহরণ করে বা গ্রাস করে ; যেগুলি কাচের গ্রাস এড়াইয়া বাহির হইয়া আসে, তাহারা মিলিয়া আর শুভ্র দেখায় না, রঙিল দেখায়। তাহারা মিলিয়া যে বর্ণের জ্ঞান জন্মায়, কাচও সেই বর্ণের দেখায়। লাল কাচের অর্থ এই যে, উহা শুভ্র সূর্য্যালোকের আর-সকলকে হরণ করে, কেবল রক্তবর্ণের আলোক-কিরণগুলিকে আটকায় না, যাইতে দেয়। কেবল যে রক্তবর্ণের আলোকই যাইতে দেয়, এমন না হইতে পারে, রক্তের সঙ্গে অন্য রঙের আলোকও কিছু কিছু যাইতে দেয়। তবে রক্তের ভাগ বেশী বলিয়া মোটের উপর রাঙা দেখায়। এইরূপে নীল কাচ সকল বর্ণের আলোক হরণ করে ; যেগুলিকে যাইতে দেয়, তাহার মধ্যে নীলের ভাগ বেশী। এইরূপে রঙিল কাচের মত স্বচ্ছ কঠিন পদার্থ রঙিল দেখায়। তরল ও অনিল পদার্থও রঙিল আছে। জলে তুঁতে দ্রব করিলে নীল জল ও আল্‌তা দ্রব করিলে লাল জল হয়। অনিলের মধ্যে ক্লোরীন হরিদ্রাভ ও আয়োডিন শিম্বীবর্ণ। ইহাদেরও রঙিল দেখানর কারণ ঐরূপ। উহারা সূর্য্যের শুভ্র আলোকের মধ্যে কতকগুলি রং চুরি করিয়াছে। যাহারা বাহিরে আসিয়াছে, তাহাদের একযোগে ঐ রং।

যে সকল জিনিস স্বচ্ছ নহে অথচ রঙিল, যেমন রঙিল কাপড়, রঙিল কাগজ, নীল বড়ি ইত্যাদি, ইহাদেরও বর্ণের ঐ রহস্য। নীল রঙের

কাগজের উপর শুভ্র সূর্য্যালোক পড়িতেছে। সেই সূর্য্যালোকের কতকগুলি রং কাগজ চুরি করিয়া লইতেছে; অবশিষ্ট যাহারা কাগজের পিঠ হইতে ছট্‌কাইয়া আসিয়া চোখে পড়িতেছে, তাহাদের মধ্যে নীলের ভাগই অধিক।

সূর্য্যের শুভ্র আলোক সরু ছিদ্র দিয়া আনিয়া কাচের কলমে বিশ্লেষণ করিলে রক্ত অরুণ পীত হইতে শিম্বী পর্য্যন্ত যে সকল বর্ণ দেখা যায়, তাহাদিগকে বিশুদ্ধ বর্ণ বলা যাইতে পারে। শুভ্র সূর্য্যালোকে ঐ সকল নানাবিধ বিশুদ্ধ বর্ণের আলোক রহিয়াছে। উহাদের সংখ্যা যত, নাম তত নাই; কাজেই গোটা ছয় সাত নাম দিয়াই নিরস্ত থাকিতে হয়। বস্তুতঃ বিশুদ্ধ রক্ত ও বিশুদ্ধ অরুণের মাঝে আরও নানা বর্ণ আছে, তাহা রক্ত ও অরুণের মাঝামাঝি; কিন্তু মাঝামাঝি হইলেও বিশুদ্ধ বর্ণ।

কিন্তু কঠিন তরল অনিল পদার্থ স্বচ্ছই হউক আর অনচ্ছই হউক, উহাদের যে রং দেখা যায়, তাহা প্রায় বিশুদ্ধ হয় না। যে রংকে নীল বোধ হইতেছে, উহাতে বিশুদ্ধ নীলের সঙ্গে অন্যান্য বিশুদ্ধ রংও হয়ত কিছু কিছু আছে। তবে নীলের ভাগ বেশী। কোন্ কোন্ বিশুদ্ধ বর্ণ আছে, তাহা বিশ্লেষণ ব্যতীত জানা যায় না। রঙিল কাচের মধ্য দিয়া যে রঙিল আলো আসিতেছে, তাহাকেও সরু ছিদ্র দিয়া আনিয়া কাচের কলমে প্রবেশ করাইলে তবে বুঝা যাইবে—উহার মধ্যে কোন্ কোন্ বিশুদ্ধ বর্ণের আলো আছে।

পাটল, কপিশ, ধূমল প্রভৃতি বর্ণ বিশুদ্ধ বর্ণ নহে। ঐ ঐ বর্ণের আলো বিশ্লেষণ করিলে উহার কোন্‌টিতে কোন্ কোন্ বিশুদ্ধ বর্ণের আলো আছে, তাহা বুঝা যায়। বিশ্লেষণের প্রণালী ঐ পূর্ব্ববিধ।

রঙিল জিনিস কেন রঙিল দেখায়, তাহা বুঝা গেল। উহারা বর্ণ চুরি করিয়া শুভ্রকে রঙিল করিয়া দেয়। শ্বেত বর্ণ ও কৃষ্ণ বর্ণ সম্বন্ধে আর একটু বলা আবশ্যক। নির্ম্মল জল, নির্ম্মল বায়ু, ইহাদের বর্ণই নাই। উহারা সাদাও নহে; কালোও নহে; রঙিলও নহে। উহাদের ভিতর দিয়া সূর্য্যের শুভ্র আলোকের সকলেই বিনা আপত্তিতে চলিয়া যায়। ফলে আমরা উহাদিগকে দেখিতেই পাই না; উহাদের পশ্চাতে ওদিকে যে জিনিস আছে, তাহাই দেখি; অবিকৃত ভাবে দেখি। যাহাকে সাদা কাচ বলা যায়, তাহা সাদা নহে, বর্ণহীন কাচ। তবে সাদা কাগজ, সাদা কাপড়ের বর্ণ সাদা বা শুভ্র। উহাদের গায়ে সূর্য্যের শুভ্র আলোক পড়ে, পড়িয়া আবার

ছট্‌কাইয়া বিক্ষিপ্ত হয়; উহারা কোন রং চুরি করে না। শুভ্র আলোকেই ছড়াইয়া দেয়। সেই শুভ্র আলোর সাহায্যে উহাদিগকে সাদা দেখায়। কৃষ্ণবর্ণ কয়লার ব্যবহার উল্টা। নামের মাহাত্ম্যে বোধ হয়, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ শৈশবে ননী চুরি করিতেন, কৈশোরে গোপীদের বসনের সহিত মন চুরি করিতেন। কয়লা শুভ্র আলোকের অন্তর্গত সকল বর্ণের আলোকই চুরি করে, কোন বর্ণের প্রতি উহার পক্ষপাত বা তাচ্ছিল্য নাই; সকলকেই চুরি করে; কাজেই চোখ আর কাহাকেও পায় না। কৃষ্ণবর্ণ সকল বর্ণের অভাব, সকল আলোকের অভাব, উহা অন্ধকার, অমাবস্যার অন্ধকার। ফলে কয়লা আমরা দেখি না। আমরা কয়লার আশ-পাশের সকল জিনিস দেখিয়া থাকি। যেখানটা দেখিতে পাই না বা আঁধারে দেখি, সেইখানটাই কয়লা!

সূর্য্যের আলোক শুভ্র। আলোকের পথের সম্মুখে মেঘের টুকরা পড়িলে, সেই আলোক বর্ণনির্ব্বিশেষে মেঘ কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়া আসিলে মেঘখানা শুভ্র বা সাদা দেখায়। আর মেঘ যখন সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, তখন সূর্য্যের আলোক মেঘের স্তর ভেদ করিয়া আসে না, মেঘের উপরের পিঠ হইতেই বিক্ষিপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে ছড়াইয়া পড়ে; ভূতলবাসীর চোখে পড়ে না; তখন মেঘকে ঘন কৃষ্ণ দেখায়। আর প্রাতে বা সায়ংকালে সূর্য্যের শুভ্র আলো গভীর বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আসিবার সময় উহার কোন কোন বর্ণ—শিস্নী বর্ণ নীলবর্ণ বায়ুস্তরের ভাসমান ধূলিকণা কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। যাহা আসিয়া চোখে পড়ে, তাহা মোটের উপর অরুণ বা রক্তারুণ দেখায়। আবার কখনও কখনও মেঘের কোণে বারিবিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাচের কলমে প্রবেশ করিলে যেমন বিশ্লিষ্ট হয়, তেমনই বিশ্লিষ্ট হইয়া ইন্দ্রধনুর বা পরিবেশের উৎপাদন করে।

স্বয়ম্প্রভ দ্রব্যের মধ্যে সূর্য্যের আলোক শুভ্র। সেই আলোক বিক্ষিপ্ত করিয়া নিষ্প্রভ দ্রব্যসকল সাদা, কতক চুরি করিয়া রঙিল ও সমস্ত চুরি করিয়া কাল দেখায়। কিন্তু স্বয়ম্প্রভ অথচ রঙিল, এমন দ্রব্যও আছে। দীপশিখার আলো পীতবর্ণ। উহাকে কাচের কলমে বিশ্লেষণ করিলে, বিশুদ্ধ পীত পাওয়া যায়, তার সঙ্গে অন্য রং কিছু থাকিতে পারে, তাহা পরিমাণে উল্লেখযোগ্য নহে। সোডিয়ম নামে যে ধাতু আছে, যে ধাতু সামুদ্রিক লবণে বর্ত্তমান ও লবণের সহকারে যাহা আমাদের উদরস্থ হয়, সেই ধাতুর

বাষ্প যখন গরম হইয়া দীপ্তি দিতে থাকে, তখন ঐ বিশুদ্ধ পীতবর্ণের আলো দেয়। বায়ুতে সর্ব্বদাই নানাজাতীয় ধূলিকণা থাকে, তাহার মধ্যে উক্ত লবণসম্পর্কী দ্রব্য থাকায়, দীপশিখাও সেই কারণে পীত দেখায়।

দীপ্তিমান্ সোডিয়ম বাষ্প যেমন পীতবর্ণের আলো দেয়, দীপ্তিমান্ পটাশিয়াম বাষ্প তেমনই শিম্বীর আভাযুক্ত আলো দেয়। বারুদে সোরা থাকে, সোরাতে এই ধাতু আছে। সোরা-সংযোগে দহনের সময় ঐ রং আসে। চুনের মধ্যে যে ধাতু আছে, উহা বাষ্পাবস্থায় রাঙা আলো দেয়। তাম্র বাষ্পাবস্থায় সবুজ আলো দেয়। এইরূপ বিবিধ ধাতু দ্রব্য উত্তপ্ত অবস্থায় বিবিধ বর্ণের আলো দিয়া থাকে। এই সকল বর্ণ প্রায় অবিশুদ্ধ বর্ণ; বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, কোন্ ধাতুর আলোতে কি কি বিশুদ্ধ বণ আছে। এমন কি, যৌগিক পদার্থের মধ্যে ধাতু লুকাইয়া আছে; এত কম মাত্রায় আছে যে, রসায়নবিৎ নানা চেষ্টায় স্থির করিতে পারিতেছেন না—কি ধাতু আছে। ঐ পদার্থ দীপ-শিখাকে প্রদীপ্ত করিয়া কাচের কলমে বিশ্লেষণে, কি কি রংএর আলোক পাওয়া গেল, তাহা দেখিয়া বলা যাইতে পারে, ইহা অমুক ধাতুর আলো, অতএব ঐ ধাতু আছে। ঐরূপে প্রত্যেক ধাতুরই, কেবল ধাতু কেন, প্রত্যেক মূল পদার্থেরই বাঁধা আলো আছে। সেই আলোতে কোন্ কোন্ বর্ণ বিদ্যমান, তাহা বিশ্লেষণে জানা আছে। এবং আলোকে বিশ্লেষণ করিয়া অবলীলাক্রমে উহা কোন্ মূল পদার্থের আলোক, তাহা বলা যাইতে পারে। এইরূপে কেবল আলো পরীক্ষা করিয়া মূল পদার্থ অব্যর্থ সন্ধানে চেনা যায়। এমন কি, আলোক বিশ্লেষণ করিতে করিতে সহসা এমন একটা বর্ণের অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহা কোন পরিচিত মূল পদার্থ নহে; তখন এতাবৎকাল-অজানা একটা মূল পদার্থের আবিষ্কার হইয়া পড়ে। এইরূপে অনেকগুলি মূল পদার্থের বস্তুতই আবিষ্কার হইয়াছে। সেই পদার্থগুলি পৃথিবীতে সুলভ নহে; রাসায়নিকেরা এত জিনিস লইয়া নাড়াচাড়া করেন, উহারা দুর্লভ বলিয়া রাসায়নিকদের চোখে কখনও পড়ে নাই। আলোক বিশ্লেষণ করিতে গিয়া সহসা তাহাদের অস্তিত্ব বাহির হইয়া পড়ে। বিজ্ঞান যে কেবল আনন্দ, তাহা নহে; বিজ্ঞান মানুষের প্রধান বল। ইন্দ্রিয় যাহাদের কোন সংবাদ দেয় না, বিজ্ঞান তাহাদিগকে খুঁজিয়া আনিয়া ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে ধরে। জ্ঞানের পরিধি এইরূপে প্রসার প্রাপ্ত হয়। এক শত বৎসর আগে মানুষের জ্ঞানের পরিধি

যেখানে ছিল, আজ যে তাহা ছাড়িয়া কত দূরে গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন।

যাক, ইহার মধ্যে এই কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক মূল পদার্থের একটা নির্দ্দিষ্ট রকমের আলো দিবার ক্ষমতা আছে। একের আলোর সহিত অন্যের আলোর মিল নাই। প্রত্যেকের আলো উহার নিজস্ব সম্পত্তি বা নিদর্শন।

সূর্য্যের শুভ্র আলোকে শত সহস্র বিশুদ্ধ বর্ণের আলো আছে; সকলের নাম দিতে পারা যায় নাই; কিন্তু ঐ সকল মূল পদার্থের আলোকে শত সহস্র বর্ণের আলোক নাই; কোনটায় অল্প, কোনটায় অধিক বর্ণের আলোক আছে। সোডিয়মের আলোকে একটা (প্রকৃত পক্ষে দুইটা) বর্ণ; উদযানে গোটা চারি পাঁচ; লোহাতে চারি পাঁচ শত বর্ণ, বিশ্লেষ দ্বারা বেশ ধরা যায়। কিন্তু চারি পাঁচটাই হউক আর চারি পাঁচ শ-ই হউক, উহা নিজস্ব। একের বর্ণে অন্যের বর্ণে মিল নাই।

কোন ধাতু পদার্থ (বা মূল পদার্থ) যখন প্রভূত তাপ পাইয়া বাষ্প বা অনিল অবস্থা পাইয়া উষ্ণ দীপ্ত ও প্রভান্বিত হয়, তখন উহা স্বয়ম্প্রভ হয় ও আপনার নিজস্ব আলোক বিতরণ করিতে থাকে; চারি দিকে মুক্তহস্তে ছড়াইতে থাকে। কিন্তু যাঁহার এইরূপ মুক্তহস্তে দানশীলতা, তাঁহারই আবার চুরিবিদ্যা আছে। সোডিয়ম পীতবর্ণের আলো দেয়, কিন্তু সোডিয়ম-শিখার ভিতর দিয়া উজ্জ্বলতর শুভ্রবর্ণের আলোক লইয়া গেলে, সেই সোডিয়ম শুভ্রবর্ণের আলোকের মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ চুরি করেন। কোন্ আলো চুরি করেন? নিজে যে বর্ণের আলো বিতরণ করেন, ঠিক সেই বর্ণের আলোকই চুরি করেন। উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণের আলোকে কাচের কলমে বিশ্লেষণ করিলে তাহাতে রক্ত হইতে শিম্বী পর্য্যন্ত শত সহস্র বিশুদ্ধ বর্ণের আলোক দেখা যায়। কিন্তু সেই শুভ্র আলোকই যদি দীপ্ত সোডিয়মশিখার ভিতর প্রবেশের পর তাহাকে বিশ্লেষণ করা যায়, তখন দেখা যায়, শুভ্র-বর্ণের অন্তর্গত শত সহস্র বর্ণের সকল বর্ণ ই আছে, কেবল সেই পীত বর্ণটি নাই, যে পীত বর্ণ সোডিয়ম নিজে অকাতরে দিয়া থাকেন। এখানে সেই পীতালোক সোডিয়ম কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। কাজেই শত সহস্র বর্ণের সকল বর্ণ ই আছে, কেবল সেই পীত বর্ণটি নাই। তাহার স্থানে অন্ধকার, সেখানটা কৃষ্ণবর্ণ।

বুনসেন এবং কির্কক নামক দুই জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক প্রায় সত্তর বৎসর আগে সোডিয়মের এই চুরি বিদ্যা ধরেন ও প্রথমটা চমকিয়া উঠেন। পরে দেখেন, এই প্রবৃত্তি সোডিয়মের কেন, মূল পদার্থ মাত্রেরই আছে। যিনি যে আলো দিয়া থাকেন, যে আলো তাঁহার নিজস্ব, শুভ্র আলো হইতে তিনি ঠিক সেই আলোটি চুরি করিয়া থাকেন। নিজের নির্দ্দিষ্ট আলোটিতেই তাঁহার লোভ। অন্য বর্ণের আলোতে দৃক্‌পাত মাত্র নাই।

অনিলাবস্থ সোডিয়মের এই পীতালোক অপহরণের ক্ষমতা বাহির হইবা মাত্র বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী জয়ধ্বনি দিয়া উঠিলেন। জয়ধ্বনির বিশেষ একটু কারণ আছে।

সূর্য্যের শুভ্র আলোকের শুভ্রত্বে একটু বিশেষত্ব আছে। একখানা চুন উত্তাপে অত্যন্ত উষ্ণ করিলে উহা হইতে ধপধপে শুভ্র আলোক বাহির হইতে থাকে। সূর্য্যের আলোকের সঙ্গে এই আলোকের একটু সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে, চোখে তাহা ধরা যায় না; কিন্তু কাচের কলমে বিশ্লেষণে তাহা ধরা যায়। সূর্য্যের শুভ্র আলোকেও রক্ত হইতে শিম্বী পর্য্যন্ত শত সহস্র বর্ণের আলোক আছে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে গোটাকতক বর্ণের আলোক নাই। যেখানে যেখানে যে যে বর্ণ নাই, সেই সেই স্থানে সেই সেই বর্ণের আলোকের পরিবর্ত্তে আঁধার দেখা যায়। সূর্য্যের আলোকে পীতবর্ণের আলোক আছে, কিন্তু পীতেরই আবার সহস্র প্রকার ভেদ, সকল পীতের পৃথক্ নাম দেওয়া গেল না। সোডিয়ম হইতে যে পীত আলোক বাহির হয়, সূর্য্যের আলোকে তাহার অভাব দেখা যায়। কাচের কলমে সূর্য্যালোক বিশ্লেষণ করিলে, যে পথে সেই পীত আলোক দেখিবার কথা ছিল, সেখানে আঁধার দেখা যায়। এইরূপ আরও অনেকগুলি বর্ণের আলোকের অভাব দেখা যায়। বিশ্লিষ্ট সূর্য্যালোক সাদা কাগজের উপর ফেলিলে রক্ত হইতে শিম্বী পর্য্যন্ত শত সহস্র বর্ণের আলোক সারি বাঁধিয়া গায়ে গায়ে স্পর্শ করিয়া সেই কাগজে পতিত দেখা যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে ফাঁক—আলোকের পরিবর্ত্তে আঁধার। কিন্তু গরম চুন হইতে যে শুভ্র আলোক আসে, তাহাতে সে রকম ফাঁক কুত্রাপি দেখা যায় না; উহাতে কোথাও আঁধার থাকে না; সূর্য্যের আলোকে যে এই অভাব আছে, তাহা বৈজ্ঞানিকেরা সকলেই জানিতেন, কিন্তু এই অভাবের তাৎপর্য্য কেহই বুঝিতে পারেন নাই। সূর্য্যের মধ্যে ঐ ঐ বর্ণের আলোকগুলি কে

চুরি করিল? বুনসেন ও কির্ককের আবিষ্কারে উহার উত্তর মিলিল। শুভ্র সূর্য্যালোক আসিবার সময় পথে কোথাও অনিলাবস্থ সোডিয়মের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। সোডিয়ম তাহার নির্দ্দিষ্ট পীত বর্ণ চুরি করিয়াছে; তাহাতেই সূর্য্যালোকে ঐ পীত বর্ণের অভাব। এইরূপে অন্যান্য মূল পদার্থের ভিতর প্রবেশ করায় তাহারাও আপন আপন নির্দ্দিষ্ট বর্ণ অপহরণ করিয়া লইয়াছে। তাই সূর্য্যালোকে এতগুলি বর্ণের অভাব। এখন সেই সকল মূল পদার্থ আছে কোথায়? সূর্য্যালোক ত শূন্যপথে বহু যোজন পথ অতিক্রম করিয়া পৃথিবীতে আসে। পৃথিবীর বায়ু ভেদ করিয়া আসিতে হয় বটে, কিন্তু পৃথিবীর বায়ুতে ঐ সকল পদার্থ ত নাই। তবে সূর্য্যালোকের পথে সোডিয়ম ধাতু অনিলাবস্থায় কোথায় থাকিল? অনুমান কঠিন নহে। সূর্য্য একটা বৃহৎ জ্যোতির্ম্ময় পিণ্ড। আয়তনে পৃথিবীর বার লক্ষ গুণ। পৃথিবীর পিণ্ডকে আবরণ করিয়া যেমন বায়ুর আচ্ছাদন আছে, সূর্য্যের পিণ্ডকে আবরণ করিয়াও সেইরূপ আচ্ছাদন রহিয়াছে। এবং সূর্য্যের যে ভীষণ উষ্ণতা, তাহাতে সেই বায়ুমধ্যে সোডিয়ম কেন, লোহা পর্য্যন্ত অনিলাবস্থাতে থাকিবে, তাহাতে আর বিস্ময় কি? বস্তুতঃ উত্তপ্ত বাষ্পাবস্থায় লৌহ হইতে যে কয় বর্ণের আলোক বাহির হয়, সূর্য্যালোকে সেই বর্ণগুলির অভাব। কাজেই সূর্য্যমণ্ডলের বায়ুতে লোহা পর্য্যন্ত বাষ্প বা অনিলাবস্থায় বিদ্যমান আছে। সূর্য্যালোকে কোন্ কোন্ বর্ণের অভাব, এবং সেই বর্ণ কোন্ কোন্ মূল পদার্থের নিজস্ব, তাহা পরীক্ষাগারের টেবিলে বসিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া, এখন অক্লেশে বলা যাইতে পারে, সূর্য্যে সোডিয়ম আছে, লৌহ আছে, উদযান আছে—ইত্যাদি।

সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় পিণ্ড হইতে অবশ্য সকল বর্ণেরই আলোক আসিতেছে; গরম চুন হইতে যে যে বর্ণ আসে, সবই আসিতেছে; কিন্তু সেই উত্তপ্ত পিণ্ড আচ্ছাদন করিয়া তদপেক্ষা শীতল বায়ুর আস্তরণ আছে। সেই বায়ুতে যে সকল অনিল ও বাষ্প বিদ্যমান, তাহারা আপন আপন বর্ণের আলোক আসিতে দেয় না, আটকাইয়া ফেলে; কাজেই আমরা পৃথিবীবাসী যে সূর্য্যালোক পাই, তাহা সেই অপহরণের অবশেষ মাত্র। তবু যাহা পাই, তাহাই কি কম? যাহা পাই, তাহার তুলনায় যাহা পাই না, তাহার পরিমাণ এত সামান্য যে, চোখের কাছে সূর্য্যালোক শুভ্রই থাকে; উহার শুভ্রতায় কলঙ্ক স্পর্শ হয় না।

সূর্য্যের বায়ুতে কি কি জিনিস আছে, কি কি নাই, তাহা এইরূপে বলা চলে। অবশ্য সূর্য্যপিণ্ড কোন্ পদার্থে নির্ম্মিত, তাহা নিরূপণের উপায় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সূর্য্যের বায়ুতে পার্থিব পদার্থ ভিন্ন অন্য পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণ বড় মিলে নাই। লকিয়ার বহু দিন হইল, একটা জিনিসের অস্তিত্ব ধরিয়াছিলেন, সে জিনিসটা তখন পৃথিবীতে পাওয়া যাইত না। সূর্য্যের যাবনিক নাম হেলি। লকিয়ারের আবিষ্কৃত পদার্থ পৃথিবীতে পরিমিত ছিল না, সূর্য্যের ছিল বলিয়া লকিয়ার উহার নাম দিয়াছিলেন হেলিয়ম। সম্প্রতি কয় বৎসর হইল, সার্ উইলিয়ম রামজে নামক ইংরেজ একটা আকর হইতে নির্গত বায়ু পরীক্ষা করিতে করিতে উহাতে হেলিয়ম বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন। এই হেলিয়মকেও অবশ্য এখন পার্থিব পদার্থ বলিতে হইবে। হেলিয়মের সম্বন্ধে আরও কথা পরে উঠিবে।

আকাশে যে সকল নক্ষত্র টিপি টিপি করিয়া জ্বলে, উহারাও সূর্য্যের মত বৃহৎ স্বয়ম্প্রভ পিণ্ড। গোটাকতকের দূরত্বের আন্দাজ হইয়াছে; দূরত্ব, সূর্য্যের দূরত্বের তুলনায় অনেক বেশী; ফলে উহাদের অনেকে সূর্য্যের চেয়েও বৃহৎ ও জ্যোতিষ্মান্। সূর্য্যের সমান দূরে থাকিলে সূর্য্যের চেয়েও বৃহৎ ও জ্যোতিষ্মান্ দেখাইত। তবে এত দূরে আছে যে, আমরা অতি ক্ষীণ আলো পাইয়া থাকি। ঐ ক্ষীণ আলোকের কিরণের বড় বড় গোছা কাচের পরকলা দিয়া সমাহৃত করিয়া উজ্জ্বলতর করা যাইতে পারে ও উহাকে কাচের কলম দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া কোন্ নক্ষত্রের আলোকে কোন্ কোন্ বর্ণের আলোক আছে বা নাই, স্থির করা যাইতে পারে। দেখা গিয়াছে, নক্ষত্রের আলো সূর্য্যের আলোকেরই মত। রক্ত হইতে শিম্বী পর্য্যন্ত সকল বর্ণই আছে। তবে সূর্য্যের আলোকে যেমন কোন কোন বর্ণের অভাব, উহাদের আলোকেও তেমনই কোন কোন বর্ণের অভাব। এবং এই অভাব দেখিয়া কোন্ নক্ষত্রের বায়ুমণ্ডলে কোন্ কোন্ মূল পদার্থ বর্ত্তমান আছে, তাহাও স্থির করা চলে। দেখা গিয়াছে, উদযান আর সোডিয়ম প্রায় সকল নক্ষত্রেই বিদ্যমান; অন্যান্য মূল পদার্থ কোনটায় হয়ত আছে, কোনটায় নাই।

বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর জয়ধ্বনির কারণ এখন বুঝা গেল। বুনসেন ও কির্কফ পরীক্ষাগারের টেবিলে দীপশিখা জ্বালিয়া যে তথ্য নিরূপণ করিলেন, তাহার ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথায় কি আছে, তাহা জানা গেল।

আলোকের স্বরূপ

এখন আলোকের স্বরূপ বিচারের সময় আসিয়াছে। স্বরূপ বিচারের একটা পন্থা আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। কয়লা সকল বর্ণের আলোক চুরি করে। রঙিল জিনিস বর্ণবিশেষের আলোক চুরি করে। যে আলোকটা চুরি যায়, তাহার পরিণতি কি হয়? তাহা লোপ পায় কি? যে জিনিস আলোক হরণ করে, তাহা সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়। যে যত হরণ করে, সে তত গরম হয়। একটা তামার বাক্সে জল পুরিয়া বাক্সের পিঠে ভুষা মাখাইয়া রোদে ধরিয়া মিনিট দশেক রাখিলে, জলটা কয়েক ডিগ্রী গরম হইয়া উঠে। ভুষা কয়লা মাত্র, উহা সূর্য্যের আলোক সমস্তই চুরি করে। দশ মিনিটে প্রাপ্ত আলোকে কয় সের জল কয় ডিগ্রী গরম হইল দেখিয়া কতটা তাপের সৃষ্টি হইল, তাহা আন্দাজ করা যায়। তাপের স্বরূপ বিচারে স্থির করা গিয়াছে, উহা শক্তির প্রকারভেদ। এ স্থলে দেখা যাইতেছে, খানিকটা আলোকের অপহরণের ও অন্তর্দ্ধানের ফল খানিকটা তাপের সৃষ্টি; উহাতে আলোককেও শক্তির প্রকারভেদ বলিতে হয়। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, শক্তি নষ্ট হয় না, উহা কেবল রূপান্তর পরিগ্রহ করে। এখানেও আমরা মনে করিতে পারি, আলোক শক্তির একরকম মূর্ত্তি; উহা কয়লা কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া অন্য মূর্ত্তিতে অর্থাৎ তাপে পরিণত হইল।

এইখানে বলা আবশ্যক, যে জিনিস আলোক হরণ করিতে পারে না, উহা গরমও হয় না। কালো জিনিস সকল বর্ণকেই হরণ করে, আর সাদা জিনিস সকল বর্ণকেই ছড়াইয়া দেয়।

সূর্য্যের রোদে সাদা কাপড়ের চেয়ে কালো কাপড় অধিক গরম হয়। গ্রীষ্মকালে সাদা কাপড়ের এবং শীতকালে কালো কাপড়ের আদরের মূল এইখানে।

আলোক একটা জ্ঞান মাত্র, আলোককে শক্তি না বলিয়া যাহার আলোকে জ্ঞান জন্মায়, তাঁহাকেই শক্তি বলা উচিত। তবে এত সাবধান হইয়া ভাষার ব্যবহার বড় কঠিন।

শক্তি না হয় হইল, কিন্তু কাহার শক্তি? শক্তি কোন একটা জড় পদার্থ আশ্রয় করিয়া থাকিবে। আলোকের শক্তি কাহার আশ্রয়ে আছে?

নিউটন অনুমান করিতেন, জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ হইতে একরূপ অতি সূক্ষ্ম কণিকা বেগে বহির্গত হয়। সেই কণিকাগুলি এত সূক্ষ্ম যে, চোখে প্রবেশ করিলে, চোখের বিশেষ হানি হয় না, তবে আলোকের জ্ঞান হয়। আর হানি হয় না-ই বা কিরূপে বলি? আলো খুব তীব্র হইলে হানি হয় বৈ কি? সূর্য্যের দিকে কে চাহিতে পারে? এই সূক্ষ্ম কণিকাগুলি স্থিতিস্থাপক; তাই পদার্থের পৃষ্ঠে পড়িয়া রবরের বলের মতন ছট্‌কাইয়া পড়ে, ইহাই আলোকের প্রতিফলন ব্যাপার। কণাগুলি এত সূক্ষ্ম যে, জলের মত বা কাচের মত স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর অবলীলাক্রমে প্রবেশ করে; এমন কি, প্রবেশকালে এক পাশে একটু ঝোঁক বাড়িয়াই যায় বলিয়া সেই পাশে গতির মুখ ফিরাইয়া লয়।

বিভিন্ন বর্ণের আলোকের কণা বিভিন্ন জাতীয় জলে বা কাচে প্রবেশ করিলে উহাদের ঝোঁক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বৃদ্ধি পায়, তাই জলে বা কাচে প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলো ভিন্ন ভিন্ন পথে চলে; তাহার ফল আলোক-বিশ্লেষণ।

নিউটনের এই অনুমানে আলোকের ব্যবহার অনেক দূর পর্য্যন্ত বেশ বুঝা যায়। অতএব উহা বিজ্ঞানবিদের অনুমান নহে। এত অসংখ্য আলোককণিকা ছুটিয়া আসিয়া পদার্থে পতিত হইতেছে, অথচ উহাদের ওজনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না বলিয়া আপত্তি চলে না; কেন না, সকল জিনিসেরই ওজন থাকিতেই হইবে, এমন কি কথা আছে?

আলোকের কণিকাগুলি বেগে ছুটিতেছে, সেই বেগের পরিমাণ মাপিবার কোন উপায় আছে কি? বেগ যতই অধিক হউক, অধিক দূর হইতে আসিতে একটু সময় লাগিবেই। কত সময়ে কত দূর আসে, কোনরূপে ঘড়ি ধরিয়া মাপিতে পারিলে আলোকের বেগ বাহির হইতে পারে।

পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, উহা গ্রহ; সেইরূপ বৃহস্পতি আরও দূরে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, বৃহস্পতিও গ্রহ। উভয় গ্রহ আপন আপন পথে আপনার নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। বৃহস্পতি এক চক্র ঘুরিয়া আসিতে পৃথিবী প্রায় বার চক্র ঘুরিয়া আসে। ইহার ফল এই যে, বৎসরের মধ্যে পৃথিবী একবার সূর্য্য ও বৃহস্পতির মাঝে আসে, তখন বৃহস্পতি খুব উজ্জ্বল দেখায়। আর ছয় মাস পরে পৃথিবী সূর্য্যের ও-ধারে চলিয়া যায়। সূর্য্য উভয়ের মাঝে পড়ে। বৃহস্পতি তখন পৃথিবী হইতে

কম উজ্জ্বল দেখায়। অর্থাৎ বৎসরের মধ্যে বৃহস্পতি পৃথিবীর একবার কাছে আসে, একবার দূরে যায়। এখন বৃহস্পতিতে কোন ঘটনা ঘটিলে বৃহস্পতি হইতে আলো আসিয়া সেই সংবাদ দেয়। অতটা দূর হইতে বার্ত্তা আনিবার একমাত্র দূত আলোক। এখন পৃথিবীর যেমন উপগ্রহ আছে—চাঁদ, বৃহস্পতিরও তেমনই কয়েকটা উপগ্রহ আছে। গ্যালিলিও প্রথমে দূরবীন দিয়া উহাদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। তাহারা বৃহস্পতির উপগ্রহ; বৃহস্পতিকেই প্রদক্ষিণ করিতেছে। যখন বৃহস্পতির ও-পিঠে অর্থাৎ আড়ালে পড়ে, তখন বৃহস্পতি তাহাদিগকে ঢাকিয়া ফেলে; তখন ঐ উপগ্রহের গ্রহণ হয়। পৃথিবী হইতে ঐ গ্রহণ—বৃহস্পতির চাঁদের গ্রহণ দেখা যায়। আলোক-দূতে সেই গ্রহণের খবর আনে। পৃথিবী যখন বৃহস্পতির কাছে থাকে, তখন সেই গ্রহণের খবর শীঘ্রই আসে। আর পৃথিবী যখন অর্দ্ধ বৎসর পরে বহু দূরে যায়, তখন গ্রহণের খবর আসিতেও কিছু বিলম্ব ঘটে। জ্যোতিষীরা ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়াছেন, প্রায় ষোল মিনিট বিলম্ব ঘটে। পৃথিবীর ভ্রমণ-পথটা প্রায় গোলাকার, উহার ব্যাস আঠার কোটি মাইলের কিছু বেশী। পৃথিবী আজি সেই ব্যাসের এ-প্রান্তে থাকিলে ছয় মাস পরে ও-প্রান্তে যায়, কাজেই তখন দূরত্বও বাড়িয়া যায় আঠার কোটি মাইল। আঠার কোটি মাইল দূরত্ব বাড়ায়, আলোকের খবর দিতে বিলম্ব হয় ষোল মিনিট। আঠার কোটি মাইল চলিতে যদি লাগে ষোল মিনিট, তাহা হইলে এক সেকেণ্ডে এক লাখ সাতাশী হাজার মাইল লাগিবে। হিসাবে এই দাঁড়ায়। অতএব আলোকের বেগ সেকেণ্ডে এক লাখ সাতাশী হাজার মাইল, অর্থাৎ মোটা হিসাব প্রায় লক্ষ ক্রোশ।

সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ—ব্যাপার সহজ নয়। এত বড় ভূমণ্ডল, ইহার বেড়টা পঁচিশ হাজার মাইল মাত্র। আলো সোজা রাস্তায় চলে। যদি উহাকে পৃথিবী ঘুরিতে হইত, তাহা হইলে এক সেকেণ্ডে পৃথিবীকে সাড়ে সাত পাক ঘুরিয়া আসিতে পারিত।

বিশ্বাস করা দায়, কিন্তু হিসাবের আঁককে বিশ্বাস না করিলেও চলে না।

ফিজো নামে ফরাসী বৈজ্ঞানিক অত জ্যোতিষের কাণ্ড ছাড়িয়া দিয়া, খোলা মাঠে আলো আসিতে কত সময় লাগে, মাপিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। একখানা দাঁতাল চাকা, ঘড়ির কলে যেমন পিতলের চাকা থাকে, সেইরূপ একখানি দাঁতাল চাকা একটা উজ্জ্বল দীপের নিকট রাখা হইল। দীপের

আলোক দুই দাঁতের মাঝ দিয়া বাহির হইয়া দূরে খোলা মাঠে একখানা আরশিতে পড়িল ও সেখানে প্রতিফলিত হইয়া যে পথে গিয়াছিল, ঠিক সেই পথেই ফিরিয়া আবার দুই দাঁতের ফাঁকে উপস্থিত হইল। দাঁতের পিছনে চোখ রাখিলে আলো চোখে পড়িবে ও দূরস্থ আরশিতে দীপশিখার প্রতিবিম্ব দেখা যাইবে। কেন না, মনে হইবে—আলোটা সেই দূর হইতেই আসিতেছে। এখন এই আলো চাকা হইতে আরশি ও আরশি হইতে চাকা পর্য্যন্ত যাতায়াতে অতি অল্প একটু সময় লয়। সেই সময়টুকুর মধ্যে যদি চাকাখানিকে এরূপ বেগে ঘুরাইয়া দেওয়া হয় যে, যেখানে ছিল দাঁতের মাঝের ফাঁক, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল; পরবর্ত্তী দাঁত তাহা হইলে কি হইবে? আলো ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া আরশিতে গেল, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—আর ফাঁক নাই; তার স্থান আছে দাঁতের আড়াল। অবশ্য এবার আর চোখে আলো পড়িল না, প্রতিবিম্বও দেখা গেল না। যাতায়াতের রাস্তাটার দূরত্ব জানা আছে; আর চাকার বেগও জানা আছে অর্থাৎ ফাঁকের জায়গায় দাঁত আসিতে কতটুকু সময় লাগিয়াছে, তাহাও জানা আছে। কাজেই আলো কত সময়ে কতটুকু পথ অতিক্রম করিল, তাহাও পাওয়া গেল। বৃহস্পতির চাঁদের গ্রহণ দেখিয়া আলোকের যে বেগ হিসাবে পাওয়া গিয়াছিল, ইহাতেও সেই সেকেণ্ডে এক লাখ সাতাশী হাজার মাইলই পাওয়া যায়। অতএব জ্যোতিষীর হিসাবে সংশয়ের আর কারণ থাকে না।

ইহা খোলা মাঠের কয়েক মাইলের কথা। ফিজোর কিছু দিন পরে ফুকো ঘরের ভিতর আলোক যাতায়াতের সময় মাপিয়াও ঠিক সেই একই উত্তর পাইয়াছিলেন।

ফুকো কিন্তু আরও একটি উত্তর পাইলেন। তিনি দেখিলেন, জলের মধ্যে আলোকের বেগ কমিয়া যায়। নিউটন নিবিড় পদার্থে প্রবেশকালে আলোকের মুখ ফিরানোর কারণ অনুমান করিতে গিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, জলের ভিতরে আলোককণিকার ঝোঁক বাড়ে, অতএব বেগ বাড়ে। উহা নিউটনের অনুমান। ঐরূপ অনুমান ব্যতীত আলোককণিকার মুখ-পরিবর্ত্তন বুঝা যায় না। কিন্তু ফুকো প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখিলেন, জলের ভিতর আলোকের বেগ কমে, বাড়ে না।

এই এক আঘাতে নিউটনের অনুমান চূর্ণ হইয়া গেল। আগে বলিয়াছি, নিউটনের অনুমান অসঙ্গত বা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ছিল না; কিন্তু যেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুমানের বিরোধী হয়, সেখানে সে অনুমান দাঁড়ায় না।

ফুকোর উত্তরের পূর্ব্ব হইতেই নিউটনের অনুমানের ভিত্তিমূল শিথিল হইতেছিল। আলোকে আলোকে যোগ হইয়া স্থলবিশেষে আঁধার হয়। ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা। ইহা নিউটনের অজ্ঞাত ছিল না। আলোককণিকার আঘাতেই যদি আলোক উৎপন্ন হয়, তবে আলোকে আলোকে আঁধার কিরূপে হইবে, ইহা বুঝান কিছু কঠিন। নিউটন ইহার ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যাখ্যাটা জবড়জং হইয়াছিল। আলোকে আলোকে আঁধার, আর শব্দে শব্দে নিঃশব্দতা ব্যাপার একই শ্রেণীর। শব্দের বেলায় যে ব্যাখ্যা, আলোকের বেলাতেও ঠিক সেই ব্যাখ্যাই সঙ্গত। যাঁহারা এই ব্যাখ্যা দিতেছিলেন, তাঁহারাই নিউটনের আনুমানিক সিদ্ধান্তের মূলে আঘাত করিতেছিলেন। ভিত্তিমূল শিথিল হইয়াছিল, ফুকো অট্টালিকা চূর্ণ করিয়া দিলেন।

সেই ব্যাখ্যা কি? তরঙ্গগতির উহা বিশিষ্ট লক্ষণ। একটা উর্ম্মির মাথায় অন্য উর্ম্মির কোল পড়িলে মাথা কোল উভয়ই বিলুপ্ত হইয়া একটা ঢেউ অন্য ঢেউকে কাটিয়া লুপ্ত করে। জলের ঢেউ বা জোয়ারের ঢেউতে এই ব্যাপার; আবার বায়ুর ঢেউতেও এই ব্যাপার। তবে আলোকের বেলায় অন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন কি? মনে করিলেই হইল, আলোক কোন পদার্থের ঢেউ মাত্র।

তন্ত্রী কাঁপিলে তাহার কম্পন পার্শ্বস্থ বায়ুরাশিতে সংক্রান্ত হইয়া বায়ুতে ঢেউয়ের পর ঢেউ উৎপন্ন করে। বায়ুতে সেই ঢেউগুলি নির্দ্দিষ্ট বেগে চলিয়া যায়, সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট বেগে চলিয়া যায়; বায়ুকে আশ্রয় করিয়া ঢেউগুলি পর পর চলে, বায়ু নিজে চলে না; স্বস্থানে কাঁপে মাত্র। মনে করিলেই হইল, জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের অণুগুলি বা পরমাণুগুলি কাঁপিতেছে, আর সেই কম্পনে চতুঃপার্শ্বস্থ কোন পদার্থের মধ্যে ঢেউ জন্মিতেছে; সেই ঢেউগুলি আসিয়া চোখে ধাক্কা দিলে আলোকের জ্ঞান জন্মিতেছে। বায়ুর ঢেউ কানে ধাক্কা দিলে শব্দজ্ঞান জন্মে; আর সেই পদার্থের ঢেউ চোখে আঘাত করিলে আলোকজ্ঞান জন্মায়।

এইরূপ অনুমানে কোন বাধা নাই। বিশেষ যখন দেখা যাইতেছে, শব্দের ঢেউ ও আলোকের ঢেউ অনেক বিষয়ে সদৃশধর্ম্মবিশিষ্ট। শব্দের ঢেউ প্রতিহত হইয়া, ফিরিয়া আসিলে প্রতিধ্বনি জন্মে, আলোকের ঢেউ কোন পদার্থের গায়ে প্রতিহত হইয়া প্রতিফলিত হয়। প্রতিধ্বনির ফলে উত্তরে ঢাক বাজাইলে মনে হয় দক্ষিণে বাজিতেছে; প্রতিফলনের ফলে আরশির উত্তরে প্রদীপ থাকিলে দক্ষিণে তাহার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। নিবিড় পদার্থের মধ্যে গিয়া আলোকের পথ ঘুরিয়া যায়, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, শব্দের পথও ঘুরিয়া যায়। শব্দের ঢেউ কম্পসংখ্যাভেদে ছোট বড় হয়; ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের ঢেউ কানে লাগিলে, ভিন্ন ভিন্ন স্বরজ্ঞান জন্মে। সেইরূপ মনে করা যাইতে পারে, আলোকের ঢেউ কম্পসংখ্যাভেদে ছোট বড় আছে; ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের ঢেউ চোখে লাগিলে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলো দেখা যাইবে। এইরূপে আলোকের ঢেউয়ের সঙ্গে শব্দের ঢেউয়ের নানা বিষয়ে সাদৃশ্য কল্পনা চলিবে। সব চেয়ে মিল ঐ উর্ম্মিতে উর্ম্মিতে যোগের ফলে। শব্দে শব্দে নিঃশব্দতা যেমন প্রত্যক্ষ ঘটনা, আলোকে আলোকে অন্ধকারও তেমনই প্রত্যক্ষ ঘটনা। কাজেই উভয়েই যে উর্ম্মিগত ব্যাপার, তাহা মনে করাই সঙ্গত।

পাঠক মহাশয়ের অবশ্য এখনও সংশয় আছে। আলোকে আলোকে অন্ধকার, এ আবার কি? ইহা ত কখনও প্রত্যক্ষ করা যায় নাই? প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে বৈ কি? ইয়ং নামক ইংরেজ ও ফ্রেনেল নামক ফরাসী বৈজ্ঞানিক প্রায় একই সময়, উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভেই, আলোক সম্বন্ধে এই উর্ম্মিতত্ত্বের পুনরালোচনা আরম্ভ করেন। পুনরালোচনা বলিলাম, কেন না, ইংরেজ নিউটনের সময়েই ফরাসী হাইগেন্স নামক মনীষী ছিলেন, তিনিও আলোক ব্যাখ্যার জন্য উর্ম্মিতত্ত্বেরই অবতারণা করিয়াছিলেন। হাইগেন্স বড় কম ব্যক্তি ছিলেন না; তবে নিউটনের নামের তীব্র দীপ্তিতে তাঁহার নামের দীপ্তি শতাধিক বৎসর ডুবিয়া ছিল। এমন কি, হাইগেন্সের স্বদেশী মহারথ বৈজ্ঞানিকগণ, নিউটনের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া হাইগেন্সের মতকে অগ্রাহ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক, আবার সেই মতের পুনরালোচনা করিলেন। ইয়ং ও ফ্রেনেল উভয়েই পরীক্ষা দ্বারা দেখাইলেন, আলোকে আলোকে অন্ধকার হয়। ইয়ংএর উদ্ভাবিত পরীক্ষাপ্রণালী বুঝান সহজ হইবে। সূর্য্যরশ্মি কাচের পরকলা বা একটা কিছুতে কেন্দ্রীভূত করা

হইল। দুইখানি আরশি সেই কেন্দ্রে সমাহৃত কিরণচয়ের সম্মুখে রাখা হইল। কিরণগুলি প্রথম আরশিতে প্রতিহত ও প্রতিফলিত হইয়া সম্মুখের একখানা কাগজে পড়িল, আবার দ্বিতীয় আরশিতে প্রতিহত ও প্রতিফলিত হইয়া সেই কাগজে পড়িল। দেখা গেল, কাগজের উপর আলো-আঁধার, আলো-আঁধার, আলো-আঁধার রেখা পড়িয়াছে। যেখানে দুইখানা আরশি হইতে দুই সারি ঢেউ আসিয়া কাগজের একই স্থানে মিলিত হইতেছে, যেখানে উর্ম্মিমালাদ্বয়ে মাথায় মাথায়, কোলে কোলে মিলন, সেখানে উজ্জ্বল আলোক, যেখানে মাথায় কোলে বা কোলে মাথায় মিলন, সেখানে আলোকে আলোকে আঁধার ; ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা।

অনেক পরিচিত ঘটনা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষগোচর হয়, আমরা তাহার তাৎপর্য্য বুঝি না। জলের উপর এক ফোঁটা তেল ফেলিলে তেল ফোঁটা একবারে জলের উপর বিছাইয়া পড়ে ; ক্রমে বিস্তৃত হয় ও অতি সূক্ষ্ম আস্তরণ বা পর্দ্দার মত হইয়া জলের পিঠে ভাসে। তখন সেই তেলে কত হরেকরকম বর্ণের বিকাশ দেখা যায়। ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। যিনি চোখ থাকিতেও দেখেন নাই, তিনি এক গামলা জলে এক ফোঁটা তেল ফেলিয়া এখনই দেখিতে পারেন। রৌদ্রে ধরিলে বর্ণবিকাশ আরও উজ্জ্বল হইবে। সাবানের ফেনার বুদ্‌বুদের গায়ে বর্ণবিকাশও পরিচিত ব্যাপার। এখানেও ঐ ব্যাখ্যা। সূর্য্যের শুভ্র আলোক তেলের পর্দ্দার উপর পড়ে, কতকটা আলো তেলের পিঠ হইতে প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসে ; কতকটা আলো তেলের ভিতর প্রবেশ করে ; কেন না, তেল স্বচ্ছ। তেলে প্রবেশ করে, কিন্তু জলের পিঠ হইতে আবার প্রতিহত ও প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসে। ঐ তেলের পর্দ্দার বেধ অতি সূক্ষ্ম, আলোর ঢেউগুলিও অত্যন্ত ছোট। এত ছোট যে, ঐ পর্দ্দাটুকু পার হইয়া ফিরিয়া আসিতেই উহার একটু সময় লাগে। ফলে একটা ঢেউ তেলের এ-পিঠ হইতে ফিরিল, আর একটা ঢেউ ও-পিঠ হইতে ফিরিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় ঢেউ, ঐ তেলের ভিতর যাতায়াতে একটু পিছাইয়া পড়িল, কাজেই প্রথম ঢেউয়ের মাথা পশ্চাদগামী দ্বিতীয় ঢেউয়ের কোলে মিলিত হইয়া গেল। ফলে উভয়েরই লোপ! আলোতে আলোতে আঁধার।

মাথা হইতে কোলের ব্যবধান উর্ম্মির অর্দ্ধেক। তেলের পর্দ্দার বেধটুকু যদি এমন হয় যে, প্রথম ঢেউটির তুলনায় পশ্চাদগামী দ্বিতীয় ঢেউ, আধ ঢেউ

প্রমাণ পিছু পড়িয়াছে, তাহা হইলে একের মাথায় অন্যের কোল ও একের কোলে অন্যের মাথা পড়িয়াছে। ফলে উভয় ঢেউ লোপ পাইয়াছে। সূর্য্যের শুভ্রালোকে নানা বর্ণের আলোক-ঢেউ ; সকল বর্ণের ঢেউ সমান দীর্ঘ নহে। লাল আলোর ঢেউগুলি উহারই মধ্যে বড় বড়, অরুণের তার চেয়ে ছোট, পীতের আরও ছোট, শিম্বীর সব চেয়ে ছোট। কাজেই সকল বর্ণের ঢেউ একসঙ্গে লোপ পাওয়া সম্ভব ঘটে না। আলো যদি শুভ্র না হইয়া একরঙা হইত, তাহা হইলে তাহার ঢেউগুলির একেবারে লোপ সম্ভব হইত। নানা রঙে নানা ঢেউ আছে, তার মধ্যে একটা রঙের ঢেউ লোপ পায়। হয়ত পীতবর্ণের ঢেউ লোপ পাইল। অন্য বর্ণের ঢেউগুলি লোপ পাইল না। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া চোখে পড়িল। চোখ যে আলো দেখিবে, তাহা শুভ্র হইবে না, তাহা রঙিল হইবে। কেন না, শুভ্র আলোক হইতে পীত আলো বাদ দিলে যে রঙ থাকে, তাহা শুভ্র নহে, তাহা বরং নীলের কাছাকাছি। কাজেই এখন তেলের পর্দ্দাটা নীল রঙের বোধ হইবে।

তেলের পর্দ্দা যতই বিছাইয়া পড়ে, ততই উহার স্থূলতা কমে, ততই বিভিন্ন বর্ণের ঢেউ কাটাকাটি করিয়া লোপ পায়, ততই বিচিত্র বর্ণের বিকাশ হয়।

ঢেউয়ে ঢেউয়ে এইরূপ কাটাকাটি হইয়া উভয়েরই লোপে শুভ্র আলোক রঙিল হইয়া যায়, ইহা একরূপ সুপরিচিত ঘটনা। বিস্তর পরিচিত উদাহরণ আছে। মশা, মাছি, ফড়িং প্রভৃতির পালকে অনেক সময় বিচিত্র বর্ণের বিকাশ দেখা যায়। ঝিনুকের গায়ে কত রকম রঙ দেখা যায়। এই সকল স্থলে বর্ণবৈচিত্র্য ঐ উর্ম্মিতে উর্ম্মিতে কাটাকাটির ফল। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার অবসর নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা গেল, আলোকে আলোকে আঁধার হয়, তাহা অপরিচিত ঘটনা নহে, উহা অহর্নিশ প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে। শুভ্র আলোকের অন্তর্গত কোন একটা বর্ণ আঁধারে পরিণত হইলে বাকী যাহা থাকে, তাহা রঙিল দেখায়। তাই পূর্ণ অন্ধকার না হইয়া রঙিল আলো দেখা যায়।

আলোকে আলোকে সম্মিলনে পূর্ণ অন্ধকারই যে বিশেষ অপরিচিত ঘটনা, তাহাই বা কিরূপে বলি ? বরং ইহার চেয়ে পরিচিত ঘটনাই আর নাই। ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, অন্ধকার মাত্রই, ছায়া মাত্রই এই আলোকে আলোকে সম্মিলনের ফল। কিরূপে, দেখা যাউক।

শব্দের ঢেউ আছে স্বীকার করিয়াও যাঁহারা আলোকের ঢেউ সম্বন্ধে আপত্তি করিতেন, তাঁহাদের একটা সংশয় ছিল। একটা প্রদীপ হাতের আড়ালে ঢাকা পড়ে। প্রদীপ কেন, ঐ প্রকাণ্ড সূর্য্য, চোখের সামনে হাতখানা রাখিলেই ঢাকা পড়ে। ইহার অর্থ এই যে, আলো সোজা পথে চলে, পাশ কাটিয়া যায় না। শব্দ কিন্তু হাতের আড়ালে ঢাকা যায় না। সম্মুখে সেতার বাজিতেছে; হাতের আড়ালে, এমন কি, বৃহৎ প্রাচীরের আড়ালে সেই শব্দকে কানের অগোচর করা অসাধ্য। শব্দের ঢেউগুলি প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া ঘুরিয়া কানে আসে। শব্দ সোজা পথে চলে না; উহা অক্লেশে পাশ কাটিয়া চলে। ঘরের বাহিরে প্রদীপের আলো দরজা দিয়া আসিয়া ঘরের কিয়দংশ আলোকিত করে, বাকী অংশ আঁধারে থাকে। কিন্তু বাহিরে বাজনা বাজিলে ঘরের ভিতরে সকল স্থান হইতেই শুনা যায়। আলোকের ছায়া পড়ে, শব্দের ছায়া পড়ে না।

ঢেউয়ের ক্ষমতাই হইতেছে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়া। উহা এক দিকে না গিয়া চারি দিকেই যাইতে চায়, কাজেই শব্দের ব্যবহার বুঝা যায়, কিন্তু আলোকের ব্যবহারে সংশয় জন্মে।

কিন্তু এই সংশয় অমূলক। ইয়ং এবং ফ্রেনেল নূতন করিয়া উর্ম্মিতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করিলে হিসাবে দেখা গেল, শব্দের ব্যবহারে ও আলোকের ব্যবহারে তফাৎ নাই। বহু স্থান হইতে আলোকের ঢেউ আসিলে উর্ম্মিতে উর্ম্মিতে কাটাকাটির সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়। খুব ছোট ছিদ্র দিয়া আলোক আনিয়া দেখা গিয়াছে, আলোক যে সরল পথেই চলে, তাহা নহে; পাশ কাটিয়া আশে পাশেও কিছু দূর পর্য্যন্ত আলো দেখা যায়। ছিদ্র যত সরু করা যায়, ততই সেই ছিদ্রকে আড়াল দিয়া ঢাকা কঠিন হইয়া পড়ে। সেই সরু ছিদ্র দিয়া যে ঢেউগুলি আসে, তাহারা যেমন সম্মুখে অগ্রসর হয়, তেমনই ডাহিনে বামে, উপরে নীচেও অগ্রসর হয়। আড়াল দিয়া তাহাদের রোধ করা চলে না। একটা সরু ছিদ্রের বদলে বহু সরু ছিদ্র থাকিলে, অথবা একটা বৃহৎ ছিদ্র থাকিলে, এত স্থান হইতে এত ঢেউ আসে যে, তখন উর্ম্মিতে উর্ম্মিতে কাটাকাটিরই ধুম পড়িয়া যায়। তখন কেবল সম্মুখভাগের উর্ম্মিগুলিই কোন রকমে কায়ক্লেশে পরিত্রাণ পায়, কিন্তু আশে পাশে, ডাহিনে বামে, উপরে নীচে যত ঢেউ, সব কাটাকাটিতে লোপ পায়। ব্যাপারটা মোটামুটি ভিন্ন সূক্ষ্মভাবে বুঝাইবার এ স্থলে উপায় নাই। বস্তুতঃ

খড়ি পাতিয়া হিসাব করিলে দেখা যাইবে, বড় ছিদ্রের বা বড় ছিদ্রের অনর্থই এই। আলোকের ঢেউ এত ছোট ও আমাদের দরজা জানালা প্রভৃতির ছিদ্র তাহার তুলনায় এত বড় যে, এই কাটাকাটির ধুমে সম্মুখটা ব্যতীত পাশ দিয়া ঢেউগুলির অস্তিত্ব থাকে না। জানালার সম্মুখটায় খুব উজ্জ্বল আলোক আছে, কিন্তু তৎপার্শ্বেই ছায়া বা আঁধার। আলোকের ঢেউগুলি যদি খুব বড় হইত, অথবা জানালার ছিদ্র খুব ছোট হইত, তাহা হইলে কেবল সম্মুখে কেন, সর্ব্বত্রই আলোকের ঢেউ খেলিত। জানালার বাহিরে প্রদীপ থাকিলে ঘরের কোণটুকু পর্য্যন্ত আঁধার হইত না।

শব্দের ঢেউগুলি বৃহৎ; আগে বলিয়াছি, কম্পসংখ্যা ত্রিশের কম হইলে অনেকেরই কানে শব্দজ্ঞান হয় না। ঐ কম্পে সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট মধ্যে ত্রিশটা ঢেউ জন্মায়, এক এক ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য হইল প্রায় ৩৭ ফুট। আবার বলিয়াছি, কম্পসংখ্যা ত্রিশ হাজারের বড় বেশী হইলে, আর শব্দ কর্ণগোচর হয় না। ঐ কম্পে সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট মধ্যে ৩০০০০ ঢেউ জন্মিলে, এক ফুটের মধ্যে ২৭টা ঢেউ থাকে, প্রত্যেক ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য আধ ইঞ্চির কিছু কম হয়। তবেই দেখা গেল, শব্দের ঢেউয়ের মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, তাহাও আধ ইঞ্চির কাছাকাছি। যাহা খুব বড়, তাহার এক এক ঢেউ ৩৭ ফুট বা বার গজের অধিক লম্বা। আলোকের ঢেউ উহাদের তুলনায় নগণ্য; সমুদ্রের কল্লোলের তুলনায় যেমন জলাশয়ের হিল্লোল, তাহা অপেক্ষাও নগণ্য। আলোকের ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য মাপা গিয়াছে। বিস্ময়ের কারণ নাই।

জলের পিঠে তেলের পর্দ্দার বা সাবানের বুদ্‌বুদের স্থূলত্ব কোনরূপে মাপিতে পারিলেই যে ঢেউগুলি ঐ পর্দ্দায় ঠেকিয়া লোপ পায়, তাহাদের দৈর্ঘ্য পাওয়া যাইবে। যদি বল, অত সূক্ষ্ম তেলের আবরণের স্থূলত্বই বা মাপব কিরূপে? তেলের যে ফোঁটাটা ফেলিয়াছি, তাহার আয়তন মাপা কিছু অসাধ্য নহে। এখন সেই আয়তনের তেল জলের উপর কতটা জায়গায় বিস্তৃত হইয়াছে, মাপিলেই হিসাবের অঙ্কে তেলের স্থূলত্ব ধরা পড়িবে। অবশ্য এইরূপেই যে আলোর ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য নিরূপিত হইয়াছে, তাহা নহে। সূক্ষ্মভাবে ঢেউগুলি মাপিবার জন্য নানা সূক্ষ্ম কৌশলের উদ্ভাবনা হইয়াছে। অন্ততঃ মোটামুটি একটা ফল পাওয়া যে সহজেই চলিতে পারে, তাহা সহজে বুঝাইবার জন্য ও কথা বলিলাম। আলোকের

ঢেউ সূক্ষ্ম মাপে দেখা গিয়াছে, রক্তবর্ণের আলোর ঢেউ, যাহা সব চেয়ে লম্বা, তাহা এক ইঞ্চির মধ্যে সাঁইত্রিশ হাজার ও শিম্বীবর্ণের আলোর ঢেউ, যাহা সব চেয়ে ছোট, তাহা এক ইঞ্চির মধ্যে আরও বেশী স্থান পায়। তবেই দেখ, শব্দের ক্ষুদ্রতম ঢেউগুলির তুলনায় আলোকের ঢেউ কত ছোট। কাজেই আলোকের নিকট যে সকল ছিদ্র অতি বৃহৎ, শব্দের কাছে সে সকল ছিদ্র ক্ষুদ্র; কাজেই আলোকের ঢেউ কাটাকাটির যত সুযোগ, শব্দের ঢেউয়ের বেলা তেমন সুযোগ নাই। তাহাতেই আলোকের ছায়া পড়ে, শব্দের ছায়া পড়ে না।

শব্দের ছায়া যে একেবারে পড়ে না, এমন নহে। বৃহৎ দ্বার হইলেই পড়ে। কলিকাতার বড় বড় গলির মোড় দিয়া বিবাহের বাজনা বাজিয়া গেলে, গলির অধিবাসীরা শব্দের আকস্মিক বিপুলতা বেশ বুঝিতে পারেন। জমকাল শব্দ পরক্ষণেই সহসা যেন থামিয়া যায়। কাজেই আলোকে আলোকে অন্ধকার অসাধারণ ঘটনা নহে, উহার মত সাধারণ ঘটনা আর নাই। যেখানে ছায়া, যেখানে আঁধার, সেখানেই এই ঘটনা। আলোকের ঢেউগুলি খুব বড় বড় হইলে আমরা অমাবস্যা রাত্রিতেও সূর্য্যালোক পাইতাম। ইহার কল্পনা অযৌক্তিক নহে।

আকাশ

শব্দের ঢেউ ত বায়ু আশ্রয় করিয়া চলে; বায়ু ছাড়া অন্যান্য অনিল, তরল, কঠিন পদার্থকেও আশ্রয় করিয়া চলে। আলোকের ঢেউ কোন্ পদার্থের আশ্রয়ে চলে? সূর্য্য, পৃথিবী হইতে নয় কোটি মাইলের অধিক দূরে আছেন। নক্ষত্রগুলি আরও দূরে। আলোকের যে এত প্রচণ্ড বেগ, সেকেণ্ডে প্রায় দুই লক্ষ মাইল, ঐ প্রচণ্ড বেগ সত্ত্বেও সূর্য্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছিতে আট মিনিট সময় লাগে। অধিকাংশ নক্ষত্রের দূরত্ব আমরা জানি না। যে কয়টির দূরত্ব স্থূলতঃ মাপিয়া দেখা হইয়াছে, তাহা কল্পনা করিলে লোমহর্ষ হয়! তন্মধ্যে যেটি সব চেয়ে কাছে, সেটি হইতে আলোক আসিতে সাড়ে চারি বৎসর লাগে। যে আলো সেকেণ্ডে প্রায় দুই লক্ষ মাইল বেগে চলে, সেই আলো সাড়ে চারি বৎসরে আসে। এই লোমহর্ষকর পথে এমন কি জিনিস আছে, যাহার আশ্রয়ে আলোকের এই ঢেউগুলি এই প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হয়?

এই যে ভীষণ পথ, ইহাকে আমরা ত শূন্য বলিয়াই থাকি। আলোক শূন্যপথে চলে, অর্থাৎ যে পথে চলে, সে পথে কিছুই নাই। অথচ এখন দেখিতেছি, সেই পথে ঢেউ চলিতেছে, ঢেউ অবশ্য কোন পদার্থকে আশ্রয় করিয়াই ত চলিবে। আলোক যে শক্তির রূপান্তর মাত্র, তাহাও পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। সূর্য্য হইতে আলোক বাহির হইয়া কিয়দংশ পৃথিবীতে পড়িতেছে। ইহার অর্থ এই যে, সূর্য্য যে শক্তির রাশি বিতরণ ও বিকিরণ করিতেছেন, তাহার কিয়দংশ আমরা পাইতেছি। এই শক্তি বহন করিতেছে কে! একটা পদার্থ কল্পনা করিতে হইবে। নিউটন সূক্ষ্ম কণিকার কল্পনা করিয়াছিলেন। ঐ কণিকাগুলি ঐ বেগে সূর্য্য হইতে ছুটিয়া আসিতেছে, ইহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু সে অনুমান ত টিকিল না! এখন উপায়?

এখন বৈজ্ঞানিককে কল্পনা করিতে হয় যে, যাহাকে আমরা শূন্য বলিতেছি, তাহা শূন্য নহে। সেই শূন্য ব্যাপিয়া এমন একটা পদার্থ আছে, যাহা এই আলোকের ঢেউ বহন ও সঞ্চালন করিতে পারে। যাহার আশ্রয়ে এই শক্তিরাশি উর্ম্মির পর উর্ম্মির আকার ধরিয়া চারি দিকে বিকীর্ণ হইতেছে! একটা পদার্থের অস্তিত্ব অনুমান করিতেই হইবে।

আমাদের প্রাচীন দার্শনিকেরা বিশ্বব্যাপী আকাশ বা ব্যোম নামক একটা পদার্থ কল্পনা করিয়াছিলেন। শব্দের ঢেউগুলি ঐ আকাশ বাহিয়া চলে। অনুমান অসঙ্গত বা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ছিল না। কিন্তু সে অনুমান শেষে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ প্রতিপন্ন হইল। বায়ুহীন স্থানে আকাশ আছে, অথচ সে আকাশ দিয়া শব্দ চলে না। আলোকের ঢেউ বুঝাইতেও বিশ্বব্যাপী—বিশ্বব্যাপী না হউক, অন্ততঃ যত দূরের নক্ষত্র আমরা চর্ম্মচক্ষে বা দূরবীনের সাহায্যে দেখিতে পাইতেছি, বিশ্বজগতের অন্ততঃ ততদূরব্যাপী একটা পদার্থের কল্পনা আবশ্যক, এবং সেই পদার্থকে সেই পুরাতন "আকাশ" নামে অভিহিত করিতেও হানি নাই। তবে বুঝিতে হইবে, এই আকাশ শব্দের ঢেউ বহন করে না, উহা আলোকের উর্ম্মি বহন করে।

এই আকাশ-পদার্থ অবশ্য অনুমানলব্ধ। এই অনুমান যদি কখনও প্রত্যক্ষ ঘটনায় বিরোধী প্রতিপন্ন হয়, তখন উহাকে নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করিতেই হইবে। কিন্তু যতক্ষণ তাহা না হইতেছে, বৈজ্ঞানিক উহাকে ছাড়িবেন না। নহিলে আলোকের গতিবিধি ব্যবহার বুঝা যায় না। উহাতে নানাবিধ অদ্ভুত অসাধারণ ধর্ম্ম আরোপ করিতে হয়। বৈজ্ঞানিকের

তাহাতে কিছু মাত্র আপত্তি নাই। কেন না, জগতে এটা সম্ভব, ওটা অসম্ভব, ইহা বলিবার অধিকার কাহারও নাই। যতই অসাধারণ হউক, উহা অঙ্গীকার করিতে বৈজ্ঞানিক কিছু মাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ করেন না। এক কালে নিউটনের অনুমিত সূক্ষ্ম কণিকা, যাহার ওজন নাই অথচ যাহা মহাবেগে চলে, তাহা বৈজ্ঞানিক মানিয়া লইতেন। উহা এখন প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হওয়ায় ঐ অনুমান ত্যাগ করিয়া এই আকাশ-পদার্থের আশ্রয় লইয়াছেন।

এই অনুমানলব্ধ আকাশ-পদার্থটা বস্তুতঃই কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ। ইহা মহাশূন্য ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। অনিলে, তরলে, কঠিনে, সর্ব্বত্রই "ওতপ্রোত" ভাবে বর্ত্তমান। অন্ততঃ স্বচ্ছ পদার্থ মাত্রেই, যাহার ভিতর দিয়া আলোক অক্লেশে সঞ্চরণ করে, তাহাদের সকলের অভ্যন্তরেই বর্ত্তমান। বায়ু জল কাচ হীরার ত কথাই নাই। সোনা রূপা তামার ভিতরেও আছে ; কেন না, সোনা রূপার সূক্ষ্ম পাতের মধ্য দিয়া আলোক না চলিতে পারে, এমন নহে। মনে করা যাইতে পারে যে, অণু ও পরমাণুসকলের মধ্যে যে ফাঁক আছে, সেই ফাঁকের মধ্যে এই আকাশ আছে, তবে অণু-পরমাণুর মধ্যেও আছে কি না, তাহা বলা কঠিন। তবে অণু-পরমাণুগুলি এই আকাশে হয়ত কোনরূপ বিকার উৎপাদন করে ; নতুবা নিবিড় পদার্থের মধ্যে গিয়া আলোকের গতির মুখ ফিরিয়া যাইবে কেন ! আকাশ ত বিশ্বব্যাপী হইল। কিন্তু উহা অনিল, তরল, কঠিন, এই তিন অবস্থার মধ্যে কোন অবস্থাতেই নাই। যে সকল জিনিসের স্থিতিস্থাপকতা খুব বেশী, ঊর্ম্মির বেগ তাহার ভিতরেই বেশী হয়। অনিলের চেয়ে তরলের, তরলের চেয়ে কঠিনের স্থিতিস্থাপকতা অধিক, তাই শব্দের ঢেউ অনিল অপেক্ষা তরলে, তরল অপেক্ষা কঠিনে অধিক বেগে চলে, ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা। আকাশ-পদার্থে ঢেউগুলি অতি ভীমবেগে চলে, ইহাতে ইহার স্থিতিস্থাপকতা যে অত্যন্ত অধিক, তাহাই অনুমান হয়। কাজেই আকাশকে বরং কঠিন পদার্থের সদৃশ মনে করা চলে, উহা তরল বা অনিল পদার্থ মনে করা চলে না। আকাশকে কঠিন পদার্থ মনে করিবার আরও একটি হেতু আছে, সেটি সহজে বুঝাইতে পারিব না বলিয়া এখানে তুলিলাম না। সেই হেতু দৃষ্টে পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা উহাকে অনেক বিষয়ে কঠিন পদার্থের সদৃশই ধরিয়াছেন। অথচ এই মহাকঠিন নিরেট পদার্থ ভেদ করিয়া গ্রহ উপগ্রহ হইতে জল বায়ু পর্য্যন্ত অবাধে চলিয়া যাইতেছে ; কোনরূপ বাধার প্রমাণ

এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, ইহাই বিস্ময়কর। বিস্ময়কর—কেন না, কাঠ পাথর লোহা ভেদ করিয়া চলা যায় না ; অথচ উহাদের চেয়েও কঠিন আকাশ ভেদ করিয়া সকলেই চলিতেছে। বিস্ময়কর হইলেও উহা মানিতে হইবে ; কেন না, বৈজ্ঞানিক অনুমানে সকলই সম্ভব। যেটুকু দরকার, সেইটুকুই অনুমান করিতে হইবে। লোহার জাল জলের মধ্য দিয়া ঠেলিয়া চালাইলে জল ঐ জালের ফাঁক দিয়া গলিয়া যায় ; কিন্তু লোহার পাত ঐরূপে ঠেলিলে জল সমেত ঠেলিয়া চলে। হয়ত সাধারণ জড় পদার্থ আকাশমধ্যে চলিবার সময় আকাশকে ঠেলিয়া চলে না ; আকাশ উহার অণুসমূহের মধ্যে ফাঁক দিয়া গলিয়া যায়। কঠিন পদার্থের অণুসমূহের মধ্যেও ব্যবধান আমাদের চর্ম্মচক্ষুর অগোচর হইলেও উহা আকাশের মত বিশ্বব্যাপী পদার্থের নিকট অগ্রাহ্য নহে, কাজেই নিরেট লোহাও আকাশের নিকট লোহার জালের মত। বস্তুতঃ জড় পদার্থ আকাশকে ঠেলিয়া সঙ্গে লইয়া চলে অথবা জালের মত উহাকে ফেলিয়া দিয়া চলে, তাহার প্রমাণ সংগ্রহের অনেক চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু শেষ উত্তর আজিও মেলে নাই। বস্তুতঃ এই কিম্ভূতকিমাকার আনুমানিক পদার্থকে জড় পদার্থ বলিব কি না, তাহা লইয়া ঘোর তর্ক চলিতে পারে। খুব সম্ভব ইহার ওজন নাই। অন্ততঃ ওজন আছে মনে করিবার কোন হেতু পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ওজন না থাকিলেও জড়ত্ব থাকিতে পারে। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এক দ্রব্যের ওজন অন্য দ্রব্যের অবস্থিতি ও দূরত্বসাপেক্ষ। পার্থিব দ্রব্যের ওজন পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে দূরত্বসাপেক্ষ। দূরত্ববৃদ্ধিতে ওজন কমিয়া যায়। কাজেই ওজনবর্জ্জিত জড় পদার্থের কল্পনা কিছু অসাধ্য নহে। কিন্তু জড় পদার্থের যে ধর্ম্মটাকে বস্তু আখ্যা দেওয়া গিয়াছে ও যাহাকে জড়ের জড়ত্ব বলা গিয়াছে, আকাশের সেই বস্তু বা জড়ত্ব আছে কি না, তাহা লইয়াও তর্ক উঠিতে পারে। ফ্রেনেলের নাম পূর্ব্বে করিয়াছি, তিনি আকাশ-মধ্যে উর্ম্মির উৎপত্তি বুঝাইতে আপন অসামান্য ধীশক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে, আকাশের বস্তু আছে, অর্থাৎ গণিতের ভাষায় অন্যান্য জড় পদার্থ যেমন গতিশীল হইলে উহার গতির বেগকে বস্তুর মাত্রা দিয়া গুণ করিলে উহার ঝোঁক পাওয়া যায় ও ঝোঁকের মাত্রাকে বেগের মাত্রা দিয়া আবার গুণ করিয়া তাহার অর্দ্ধেক লইলে তাহার ব্যক্ত শক্তির পরিমাণ পাওয়া যায়, সেইরূপে আকাশের বস্তু আছে

মনে করিয়া ও উহার কণিকাগুলিকে গতিবিশিষ্ট মনে করিয়া উহার ঝোঁক ও উহার অন্তর্নিহিত ব্যক্ত শক্তির পরিমাণ নির্ণীত হইতে পারে। সেই ব্যক্ত শক্তিই আবার জড় পদার্থে সংক্রান্ত হইলে জড় পদার্থে তাপের উৎপত্তি হয়। ইহা বেশ সঙ্গত অনুমান। কিন্তু ইদানীন্তন কালে ক্লার্ক নামক অন্যতর মনীষী দেখাইয়াছেন, আকাশ-পদার্থের বস্তুর মাত্রা স্বীকার না করিয়াও অন্য কোন একটা ধর্ম্মের আরোপ দ্বারা উহার ব্যক্ত শক্তির পরিমাণ চলিতে পারে। তাহাই যদি হয়, তবে যে বস্তু-ধর্ম্মকে আমরা জড়ের জড়ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, আকাশ-পদার্থের সেই জড়ত্ব স্বীকারও নিতান্ত আবশ্যক নহে। তবে যাঁহারা বলেন, যাহা শক্তির বহনে সমর্থ ও যাহার দেশব্যাপকতা আছে, তাহাকেই আমরা জড় পদার্থ বলিব ; উহাতে বস্তু থাক আর নাই থাক। তাহা হইলে আকাশকে জড় পদার্থ বলা না চলিবে, এমন নহে। অর্থাৎ জড় পদার্থের প্রচলিত পারিভাষিক অর্থটাকে পরিবর্ত্তন করিয়া উহার আরও ব্যাপক অর্থ দিলে আকাশকে জড় পদার্থ বলা যাইতে পারে। অবশ্য এইরূপে শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া যে-কোন অজড়কে আমরা জড়ের পর্য্যায়ে ফেলিতে পারি। উহা লইয়া তর্কে প্রবৃত্ত হইলে কেবল বাগ্‌বিতণ্ডা ও অনর্থক কথা-কাটাকাটি জন্মে মাত্র। কাজেই জোর করিয়া জড় শব্দটিকে খুব ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিয়া আকাশকে জড় পদার্থ মনে করিতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু উহা কিম্ভূতকিমাকার জড় পদার্থ, অন্য পরিচিত জড়ের সহিত উহার নানা লক্ষণে বৈসাদৃশ্য আছে, তাহা মানিতেই হইবে। আকাশ জড়, কিন্তু কিম্ভূতকিমাকার জড়।

অদৃশ্য আলোক

কম্পমান তন্ত্রী বা পটহ হইতে যেমন ঊর্ম্মিমালা নির্গত হইয়া পার্শ্বস্থ বায়ুরাশি আশ্রয় করিয়া কানে আঘাত করে, তাহার ফল শব্দজ্ঞান। সেইরূপ অনিল, তরল, কঠিনের কম্পমান অণু হইতে ঊর্ম্মিমালা নির্গত হইয়া আকাশ নামক কিম্ভূতকিমাকার জড় পদার্থে ঊর্ম্মিমালার উৎপাদন করে ও তাহা চোখে আঘাত করিলে ফল হয় আলোকের জ্ঞান। শব্দের ঊর্ম্মি বায়ুমধ্যে সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট বেগে চলে, আলোকের ঊর্ম্মি আকাশমধ্যে ১৮৭০০০ মাইল বেগে চলে। শব্দের ঢেউগুলি ছোট বড় আছে। খুব বড় ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য ৩৭ ফুট। আলোকেরও ছোট বড় ঢেউ আছে। বড়

ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য $\frac{২৭১}{১০০০০০০০}$ ইঞ্চি। সেকেণ্ডে কত ঢেউ চোখে আঘাত করিলে আলোকের জ্ঞান হয়, একটা হিসাব করা যাক। দীপশিখার পীতবর্ণের আলোকের ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য $\frac{২৩২}{১০০০০০০০}$ ইঞ্চি। এক সেকেণ্ডে যত ঢেউ জন্মে, উহারা সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইলে ১৮৭০০০ মাইল জায়গা হয়। ঐ স্থানমধ্যে প্রায় ৪৪০০০ ঢেউ দাঁড়াইবে। কি ভীষণ! দীপশিখা হইতে আলোকের ঢেউ সেকেণ্ডে ৪৪০০০ বার আসিয়া চোখে ধাক্কা দিতেছে, যাহার ফলে পীতবর্ণের জ্ঞান। ঐরূপ ৩৪ হাজারের কিছু কম ধাক্কায় রক্তবর্ণের ও তাহারই কিছু বেশী ধাক্কায় শিম্বীবর্ণের জ্ঞান হয়। বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু আলোককে ঊর্ম্মিপ্রবাহ বলিয়া মানিয়া লইলে, উহা না মানিলে উপায় নাই।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, অদৃশ্য আলোক আছে কি না। শ্রবণাগোচর শব্দের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তন্ত্রীর কম্পসংখ্যা সেকেণ্ডে ত্রিশের কম বা ত্রিশ হাজারের অধিক হইলে বায়ুতে ঊর্ম্মি জন্মে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই ঊর্ম্মির আঘাতে শ্রবণেন্দ্রিয়ে শব্দজ্ঞান জন্মে না। উহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতীত। যাহা শোনা যায় না, তাহাকে শব্দ বলা চলে না; কাজেই শ্রবণের অগোচর শব্দ প্রলাপোক্তি। উহা বন্ধ্যাপুত্রের মত নিরর্থক শব্দ; তবে বায়ুর মধ্যে ঊর্ম্মি আছে—যাহা শব্দজ্ঞান জন্মায় না, ইহা সত্য কথা। সেইরূপ যাহা দেখা যায় না, তাহাকে আলোক বলিতে পারি না, কাজেই অদৃশ্য আলোক বন্ধ্যাপুত্রের মত প্রলাপবাক্য। তবে আকাশের মধ্যে এত ছোট বা এত বড় ঊর্ম্মি আছে কি না, যাহা অন্যান্য ঊর্ম্মির মতই বেগে ছুটিয়া থাকে, কিন্তু চক্ষুতে আঘাত করিলে আলোকের জ্ঞান জন্মায় না? এই প্রশ্ন নিরর্থক নহে। বস্তুতই এইরূপ আকাশোর্ম্মি রহিয়াছে। সূর্য্যালোকের আকাশে ছোট-বড় নানা ঢেউ, কেহ বা রক্তবর্ণের, কেহ বা নীলবর্ণের, কেহ বা শিম্বীবর্ণের আলোক-জ্ঞান জন্মায়। সেইরূপ উহাদের সঙ্গে সঙ্গে আরও ছোট এবং আরও বড় ঢেউ থাকে—যাহারা কোন বর্ণেরই জ্ঞান জন্মায় না, ঐ সকল ঢেউ দর্শনেন্দ্রিয়ের অবিষয়, কিন্তু অন্যরূপে উহাদিগকে প্রত্যক্ষ ফল দিতে দেখা যায়। কয়লাতে বা অন্য দ্রব্যে পতিত হইলে ইহাদের শক্তি তাপে পরিণত হয়। এমন কি, যে সকল ঊর্ম্মি রক্তবর্ণপ্রদ ঊর্ম্মির চেয়ে বড়, তাহারা দৃষ্টির সহায় নহে, কিন্তু তাহাদের তাপজনকতা বরং অধিক। আবার যে সব ঊর্ম্মি শিম্বীবর্ণপ্রদ ঊর্ম্মির চেয়ে ছোট, তাহারাও দৃষ্টির সহায় নহে,

কিন্তু তাহাদেরও তাপজনন-ক্ষমতা আছে, তবে অপেক্ষাকৃত অল্প। তাপজনন-ক্ষমতা অল্প বটে, কিন্তু আর একটি ক্ষমতা উহাদের বেশী। রূপাঘটিত যৌগিক পদার্থ আলোকেব শক্তিতে বিশ্লিষ্ট হয় ও বিকৃত হয়, আলোকের এই শক্তি আছে বলিয়াই ফটোগ্রাফী বা আলোকচিত্র; রূপাঘটিত পদার্থকে বিকৃত করিবার ক্ষমতা বরং ঐ ছোট ছোট উর্ম্মিগুলিরই বেশী। কাজেই ফটোগ্রাফের পক্ষে উহাদের উপযোগিতাই অধিক। সূর্য্যের আলোকের কিরণগুচ্ছ কাচের কলমে বিশ্লিষ্ট করিলে রক্ত আলোকের উর্ম্মির পাশ দিয়া তার চেয়ে বড় বড় উর্ম্মি যায়। চোখের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক নাই, কিন্তু তাপমান যন্ত্রে তাহাদের তাপজনকতা প্রকাশ পায়। আবার শিম্বী আলোকের উর্ম্মির পাশ দিয়া আরও ছোট ছোট উর্ম্মি চলে, তাহারাও দর্শনসহায় নহে, কিন্তু রূপাঘটিত পদার্থের বিকার উৎপাদনে তাহারা ধরা পড়ে।

আলোকের উর্ম্মির চেয়েও ছোট এবং বড় উর্ম্মি আকাশে চলে। উর্ম্মি কত ছোট হইতে পারে ও কত বড় হইতে পারে, তাহার সীমানির্দ্দেশ দুরূহ। সূর্য্যের আলোক, তপ্ত চুনের শুভ্র আলোক, বৈদ্যুতিক আলোক. বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, সর্ব্বত্রই এইরূপ দৃষ্টির অসহায় ছোট-বড় উর্ম্মি, দৃষ্টির সহায় ছোট-বড় উর্ম্মির সঙ্গে থাকে। উহাদের অস্তিত্বে সন্দেহ নাই, তবে উহাদের ক্ষুদ্রত্বের বা বৃহত্ত্বের সীমানির্দ্দেশ এখনও হয় নাই। আমরা এখনও বলিতে পারি না যে, আকাশের উর্ম্মি ইহার চেয়ে ছোট আর নাই বা ইহার চেয়ে বড় আর নাই। পরের অধ্যায়ে দেখা যাইবে, আকাশের মধ্যে দুই দশ ইঞ্চি হইতে দুই পাঁচ গজ দীর্ঘ উর্ম্মি অক্লেশে উৎপাদন করা চলে।

একটা লৌহপিণ্ড তাপযোগে ক্রমশঃ উষ্ণ হয়। উষ্ণ হয়, কিন্তু আলোক দেয় না। উষ্ণতার বৃদ্ধিসহকারে শেষে আলোক দিতে আরম্ভ করে। প্রথমটা গবম হইয়া রাঙা হয়, আরও গরম হইলে রাঙা আলো পীতাভ, এবং আরও অধিক উষ্ণ হইলে শেষ পর্য্যন্ত ধপ্‌ধপে শুভ্র দেখায়। কেবল লৌহপিণ্ড কেন? ইহাই সাধারণ নিয়ম।

উষ্ণ দ্রব্য মাত্রই চারি দিকের আকাশে উর্ম্মির সৃষ্টি করে। ঐ উর্ম্মিসকল সারি ধরিয়া সেকেণ্ডে ১৮৭০০০ মাইল বেগে আকাশ বাহিয়া ধাবিত হয়। কোন জড় পদার্থে পতিত হইলে কতক সেই পদার্থের পৃষ্ঠ হইতে প্রতিহত

হইয়া প্রতিফলিত বা বিক্ষিপ্ত হয়, কতক উহার মধ্যে প্রবেশ করে। প্রবেশ করিয়া হয় উহাকে ভেদ করিয়া ও-ধারে বাহির হইয়া যায়, নতুবা ঐ জড় পদার্থে আটকান পড়ে। যেগুলি আটকান পড়ে, তাহাদের শক্তি তাপে পরিণত হয়, সেই জড় পদার্থটাও উত্তপ্ত ও উষ্ণ হইয়া উঠে। উষ্ণ দ্রব্য হইতে এইরূপে উর্ম্মি ক্রমাগতই বাহির হইতে থাকে, প্রত্যেক উর্ম্মির সহিত কিঞ্চিৎ শক্তি বাহির হইয়া যায়, উষ্ণ দ্রব্যের তাপও এই জন্য কমিতে থাকে। যে-কোন গরম জিনিস সম্পূর্ণ বায়ুহীন দেশে থাকিলেও ক্রমশঃ শীতল হয়; উহার কারণই এই। উহার শক্তি ক্রমাগত বাহির হইয়া যাইতেছে, কাজেই উহার তাপের ক্ষয় দেখা যায়।

এখন একবার গোড়ার দিকে হটিয়া যাইতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি, তাপকে কোন পদার্থে আবদ্ধ করিয়া রাখা চলে না; উহাকে আট্‌কাইয়া রাখা দায়। গরম জিনিসকে গরম রাখা কঠিন। উহা কেবলই ঠাণ্ডা হইবার চেষ্টা করিতেছে। তাপ কেবলই উহা হইতে বাহির হইয়া পলাইতেছে। তাপের নির্গমের প্রকারভেদ আছে। ধাতু পদার্থের একটা দিক্ তপ্ত করিলে অন্য দিক্ ক্রমে তপ্ত হয়। এখানে তাপ সেই ধাতুর গা বাহিয়া উষ্ণ স্থান হইতে শীতল স্থানে চলে। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া গিয়াছে **তাপের পরিচালন**। কঠিন, তরল, অনিল, যাবতীয় পদার্থেরই তাপ পরিচালনের ক্ষমতা আছে; কাহারও কম, কাহারও বেশী; ধাতু পদার্থের খুব বেশী। কাঠ, কাগজ, রেশম, পশম, জল, বায়ুর তদপেক্ষা কম। জল বায়ুর তাপপরিচালন-ক্ষমতা অল্প বটে, কিন্তু উহারা আবার অন্য উপায়ে তাপ সঞ্চালন করে। অন্য দ্রব্যের তাপ লইয়া জল ও বায়ু নিজে উষ্ণ হয়। উষ্ণ হয়, আর হাল্‌কা হয়, আর উপরে উঠে। সেই তাপ নিজের কাঁধে চাপাইয়া উপরে উঠে। তাহার স্থানে শীতল জল বা শীতল বায়ু আসে; সেও আবার তাপ গ্রহণ করিয়া উষ্ণ হয় ও হাল্‌কা হয় ও উপরে উঠে। তরল ও অনিল পদার্থ পরিচালনের ক্ষমতার অল্পতা সত্ত্বেও এইরূপে তাপ গ্রহণ করিয়া সরিয়া যায়, তজ্জন্য যে সকল উষ্ণ দ্রব্য তরল পদার্থে বা অনিলে মগ্ন থাকে, তাহারা শীঘ্র শীতল হইয়া পড়ে। তাপক্ষয়ের এই দ্বিবিধ উপায়ের সবিস্তার বিবরণ আগে দিয়াছি। কিন্তু আর একটা উপায় আছে, তাহা পূর্ব্বে কেবল উল্লেখ করিয়া রাখিয়াছি মাত্র। সম্পূর্ণ শূন্য দেশের মধ্য দিয়াও তাপ সঞ্চালিত হইতে দেখা যায়। বায়ু-

নিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারা কোন পাত্রের অভ্যন্তর বায়ুশূন্য করা গেল। এই শূন্য প্রদেশে গরম জিনিস রাখিলে উহাও ক্রমশঃ শীতল হয়। উহার তাপ বাহির হইয়া যায়। কোন্ পদার্থকে আশ্রয় করিয়া বাহির হয়? এখানে পরিচালনের দ্বারা ঠাণ্ডা হইবার চেষ্টা করিতেছে। তাপ কেবলই উহা হইতে বাহির হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কোন তরল বা অনিলও পার্শ্বে নাই যে, তাহার আশ্রয়ে তাপ নির্গত হইবে। অথচ তাপ নির্গত হয়। এই শূন্য প্রদেশে কিছুই নাই—গোটাকতক বায়ুর অণু অবশিষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারা আর কতটুকু তাপ লইয়া যাইবে। ওখানে আছে কেবল আকাশ; ঐ আকাশের আশ্রয়েই অবশ্য তাপ বাহির হয়। আকাশে উর্ম্মি উৎপাদন করিয়া বাহির হয়। তপ্ত দ্রব্যে যে তাপ আছে, উহা তাপ, উষ্ণতা উহার লক্ষণ, উহা শক্তির মূর্ত্তিভেদ। মনে করিয়া লইতে হয়, উষ্ণ পদার্থের অণুগুলি কম্পনশীল। প্রত্যেক অণু সেকেণ্ডে কোটি কোটি বার কাঁপিতেছে। প্রত্যেক কম্পে পার্শ্ববর্ত্তী আকাশে একটি করিয়া উর্ম্মি জন্মিতেছে; এক সেকেণ্ডে বহু কোটি উর্ম্মি জন্মিতেছে, সেই উর্ম্মিগুলি আকাশকে আশ্রয় করিয়া মহাবেগে, সেকেণ্ডে ১৮৭০০০ মাইল বেগে ধাবিত হইতেছে। প্রত্যেক উর্ম্মি তপ্ত জড় পদার্থের কিঞ্চিৎ শক্তি বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। এইরূপে প্রত্যেক সেকেণ্ডে বহু কোটি উর্ম্মির সহিত খানিকটা শক্তি বাহির হইয়া যাইতেছে। শক্তি যখন তপ্ত দ্রব্যে নিহিত ছিল, তখন উহার লক্ষণ ছিল উষ্ণতা, তপ্ত দ্রব্য মাত্রই উষ্ণ। প্রত্যেক অণু কম্পমান, কাজেই উহা শক্তিমান্‌ও বটে। এই শক্তি আকাশে সঞ্চারিত হয়। আকাশ জড় পদার্থ নহে, অন্ততঃ পরিচিত অন্যান্য জড় পদার্থের সহিত উহার বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। আকাশের অণু পরমাণু কল্পনার প্রয়োজন নাই। আকাশ দিয়া কেবল উর্ম্মি চলে মাত্র। প্রত্যেক উর্ম্মি খানিকটা করিয়া শক্তি লইয়া যায়। ঐ শক্তি কিন্তু তাপ নহে। তাপের প্রধান লক্ষণই উষ্ণতা। তপ্ত দ্রব্য উষ্ণ; উহার তাপও শক্তি। কিন্তু আকাশবাহিত উর্ম্মিতে যে শক্তি আছে, সে শক্তি তাপ নহে; উহার লক্ষণ উষ্ণতা নহে। তপ্ত দ্রব্য উষ্ণ; কিন্তু যে আকাশ বাহিয়া উর্ম্মি চলিতেছে, সেই আকাশ উষ্ণ হয় না। আকাশের উষ্ণতার কোন প্রমাণ নাই। তবে সেই উর্ম্মিসমূহ আকাশ কর্ত্তৃক বাহিত ও সঞ্চালিত হইয়া যখন অন্য কোন জড় পদার্থে—কঠিন, তরল বা অনিল পদার্থে পতিত হয়, তখন সেই পদার্থের অণুগুলি সেই আকাশোর্ম্মিগুলির

শক্তি চুরি করে, হরণ করে। সেই আকাশোর্ম্মিসমূহে নিহিত শক্তি গ্রহণ করিয়া আপন অণুগুলিকে কাঁপাইতে থাকে। অণুগুলি কাঁপিতে আরম্ভ করিলে এই জড় পদার্থই তখন উষ্ণ হয়। উভয়ের শক্তি তখন তাপে পরিণত হয় ; কেন না, তাপের লক্ষণ উষ্ণতা।

আর একবার আবৃত্তি করা যাউক। এই সকল সূক্ষ্ম কথা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি ব্যতীত স্পষ্ট হয় না। উষ্ণ দ্রব্যের অণুসকল স্পন্দনশীল, কম্পমান অণুতে নিহিত শক্তির নাম তাপ, উহার লক্ষণ উষ্ণতা। কম্পনশীল তন্ত্রী বা পটহ যেমন বায়ুতে উর্ম্মির সৃষ্টি করে, কম্পমান অণুসকল তেমনই আকাশে উর্ম্মির উৎপাদন করে। কিন্তু আকাশ উষ্ণ হয় না। আকাশ শক্তি বহন করে বটে ; উর্ম্মি দ্বারা শক্তি বহন করে, কিন্তু উহা স্বয়ং উষ্ণ হয় না। কাজেই আকাশের উর্ম্মিতে যে শক্তি নিহিত, তাহাকে তাপ বলা চলে না। উহা শক্তির অন্যবিধ রূপ। শক্তির নানা রূপ, উষ্ণ দ্রব্যের তাপ একটা রূপ। আকাশবাহিত উর্ম্মিচালিত শক্তি অন্য একটা রূপ। এই উর্ম্মি মহাবেগে আকাশ বাহিয়া চলে। অন্য যতক্ষণ কোন জড় দ্রব্য সম্মুখে না পড়ে, ততক্ষণ কেবল চলে আর চলে, জড় দ্রব্য সম্মুখে পড়িলে তাহার পৃষ্ঠে লাগিয়া প্রতিহত বা প্রতিফলিত হইতে পারে। প্রতিহত হইলে আর সেই জড় দ্রব্য সেই শক্তি হরণ করিবার অবসর পায় না। কিন্তু যদি প্রতিহত না হয়, উর্ম্মিগুলি জড় দ্রব্যের অভ্যন্তরে, অর্থাৎ উহার অভ্যন্তরস্থ আকাশে প্রবেশ করে, তখন জড় দ্রব্যের অণুগুলি সেই আকাশোর্ম্মিবাহিত শক্তি হরণ করিবার সুবিধা পায়। প্রত্যেক অণু কিঞ্চিৎ শক্তি চুরি করে বা হরণ করে। কয়লার মত জিনিস সমুদায় শক্তিটাই হরণ করে। কাচের মত বা জলের মত জিনিস কতকটা করে। শক্তি হরণ করিয়া অণুগুলি কাঁপিতে থাকে, অণু কম্পিত হইলেই তখন সেই জড় দ্রব্য উষ্ণ হয়, আর তখন আবার বলা হয়, সেই উর্ম্মিচালিত শক্তি পুনশ্চ তাপে পরিণত হইয়াছে। শক্তি ছিল একটা দ্রব্যে তাপরূপে। সেই শক্তি সেই দ্রব্য ত্যাগ করিয়া আকাশে সংক্রান্ত হইল, তখন উহা আর তাপ রহিল না, তার পর আবার কয়লার মত জড় দ্রব্যে পতিত হইয়া আবার তাপে পরিণত হইল। বৈজ্ঞানিক বলেন, শক্তির ধ্বংস হয় না, নাশ হয় না, উহা কেবল পরিবর্ত্তন করে মাত্র।

এখন দেখা গেল, তাপ ক্ষয়ের তিনটা উপায় আছে। পরিচালক জড় পদার্থের মধ্য দিয়া তাপ পরিচালিত হয়; তাপ তাপরূপেই উষ্ণ স্থান হইতে অনুষ্ণ স্থানে চলে। তরল ও অনিল পদার্থের প্রবাহ বা স্রোত জন্মাইয়া তাপ সেই স্রোতের সঙ্গে চলে, কেহ কেহ এই ঘটনার নাম দিয়াছেন **পরিবাহ**। স্রোত আর ঢেউ এক নহে, ইহা যেন স্মরণ থাকে। তাপ ক্ষয়ের তৃতীয় উপায় আকাশে ঊর্ম্মি উৎপাদন। তার পর শক্তি আকাশ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া ও মহাবেগে ধাবিত হইয়া অন্য জড় পদার্থে আবার তাপে পরিণত হয়।

আকাশপথে যে ঊর্ম্মি চলে, তাহার সকলেরই বেগ সমান, কিন্তু সকলে সমান দীর্ঘ নহে। কম্পসংখ্যা অনুসারে কোন ঊর্ম্মি ছোট, কোন ঊর্ম্মি বড়। যেগুলি উহারই মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড়, সেগুলি চোখে পড়িলে আলোকজ্ঞান জন্মায় না, যেগুলি আবার খুব ছোট, সেগুলিও চোখে পড়িলে আলোকজ্ঞান জন্মায় না। মাঝারি ঊর্ম্মিগুলি চোখে পড়িয়া আলোকজ্ঞান জন্মায়, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোকের জ্ঞান জন্মায়। কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ হরিৎ ইত্যাদি। রক্ত, পীত, হরিৎ ইত্যাদি সকল বর্ণের উৎপাদক ঊর্ম্মি এক-সঙ্গে চোখে পড়িলে শুভ্র বর্ণের জ্ঞান জন্মায়। রক্ত হইতে শিম্বী পর্য্যন্ত সকল ঊর্ম্মি একসঙ্গে পড়িলে শুভ্র বর্ণের জ্ঞান জন্মায়। কতিপয় বর্ণের অভাব ও অবশিষ্ট বর্ণের সদ্ভাব হইলে পাটল, কপিশ, ধূমল প্রভৃতি নানা অবিশুদ্ধ বর্ণের জ্ঞান জন্মায়।

আকাশের সকল ঊর্ম্মি আলোকের জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। যেমন বায়ুচালিত সকল ঊর্ম্মি শব্দজ্ঞান জন্মায় না, সেইরূপ। তবে জড় দ্রব্যে পতিত ও তৎকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া তাপের উৎপাদন সকলেই করিতে পারে। এই জন্য আলোক জননের ক্ষমতা না থাকিলেও ঐ সকল দর্শনের অসহায় ঊর্ম্মির অস্তিত্ব আমরা ধরিতে পারি। আবার রৌপ্যজ যৌগিক পদার্থে বিকারোৎপাদনের শক্তিও অল্পবিস্তর মাত্রায় থাকাতে ঐ সকল ঊর্ম্মির অস্তিত্ব তদ্দ্বারাও ধরিতে পারা যায়।

লোহার পিণ্ড তপ্ত করিলে ক্রমে উষ্ণ হয়। উষ্ণ হয়, কিন্তু দৃষ্টিগোচর হয় না। আঁধার ঘরে তপ্ত লোহা দেখা যায় না, অথচ উহার অণুসকল কম্পনশীল ও সেই কম্পমান অণু পার্শ্বের আকাশে অবিরত ঊর্ম্মির সৃষ্টি করিতেছে। সেই ঊর্ম্মি আমাদের চোখেও পড়িতেছে, অথচ দর্শনজ্ঞান

জন্মাইতেছে না। গায়ের চর্ম্মে পড়িতেছে, পড়িয়া তাপের উৎপাদন করিয়া উষ্ণতা জন্মাইতেছে; তাই আমরা আঁধার ঘরে তপ্ত লোহা চোখে না দেখিলেও আমাদের ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে কতকটা টের পাই। উষ্ণতা বৃদ্ধি সহকারে তখন আরও নূতন নূতন, আরও ছোট ছোট উর্ম্মি উৎপাদন করিতে থাকে, সেই নূতন ছোট ঊর্ম্মিগুলি চোখে পড়িয়া আলোকজ্ঞান জন্মাইতে থাকে। তখন তপ্ত লোহা রাঙা দেখায়। আরও উষ্ণতা বৃদ্ধির সহিত আরও ছোট ছোট উর্ম্মি, যাহাতে পীত হরিৎ নীল বর্ণের জ্ঞান জন্মায়, সেই সকল উর্ম্মির সৃষ্টি করিতে থাকে। তখন লোহা আর রাঙা থাকে না। উহা অরুণাভ পীতাভ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ধপধপে সাদা হইয়া জ্বলিতে থাকে। তখন রক্ত হইতে শিম্বী পর্য্যন্ত সকল বর্ণের উৎপাদক উর্ম্মিই বাহির হইতেছে বুঝিতে হইবে। আরও উষ্ণতা বাড়িলে আরও ছোট ছোট উর্ম্মি বাহির হইতে থাকে, কিন্তু ইহারা আলোকজ্ঞান জন্মায় না, কাজেই রঙ সেই শুভ্র থাকে।

সোনা রূপা লোহা উষ্ণতা বৃদ্ধির সহিত ছোট ছোট আকাশোর্ম্মির সৃষ্টি করিয়া ক্রমে দৃষ্টিগোচর হয়; যতক্ষণ দৃষ্টিগোচর ছিল না, তখনও উর্ম্মি সৃষ্টি করিতেছিল, কিন্তু আলোক দেয় নাই, নিষ্প্রভ, দীপ্তিহীন ছিল। যখন রাঙা আলো, পীত আলোর উর্ম্মি উৎপাদন করিতে থাকে, তখন দীপ্তিমান্ হয়—স্বয়ম্প্রভ হয়। তখন হয়ত উহার আর কাঠিন্য নাই। উষ্ণতা বৃদ্ধিতে কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত হইয়াছে। সেই তরল পদার্থের অণুগুলিও থরথর কাঁপিতেছে, ছট্‌ফট্ করিয়া কাঁপিতেছে, আর আকাশে উর্ম্মির সৃষ্টি করিতেছে। সেই সকল চোখে পড়িয়া আলোকজ্ঞান জন্মাইতেছে। তখন সোনা রূপা দীপ্তিমান্ হইয়া টলটল ঢলঢল করিতেছে।

জড় পদার্থের গঠন-প্রণালী

বহু পূর্ব্বে আমরা জড় পদার্থের গঠন-প্রণালী বুঝাইতেছিলাম। অনিলের তরলের গঠন-প্রণালী বুঝাইয়া কঠিনে আসিয়া থামিতে হইয়াছিল। সহসা গঠন-প্রণালীর আলোচনা ত্যাগ করিয়া কম্পগতির আলোচনায় ঝম্প দিয়াছিলাম। কম্পগতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া নানা কথা আসিয়াছে। জোয়ার-ভাঁটা আসিয়াছে, শব্দ আসিয়াছে, আলোক আসিয়াছে। আলোকের আলোচনা করিতে গিয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার জড় পদার্থের সন্ধান

পাইয়াছি, তাহার নাম দিয়াছি আকাশ। আকাশে উর্ম্মি চালনা করে। সেই উর্ম্মি আলোকের জ্ঞান জন্মায়। আলোকে আলোকে আঁধার হয়, এই প্রত্যক্ষ ঘটনা বুঝিতে গিয়া উর্ম্মির কল্পনা করিতে হইয়াছে। আবার উর্ম্মির আশ্রয় কল্পনা করিতে গিয়া কিম্ভূতকিমাকার আকাশের কল্পনা করিতে হইয়াছে। আকাশে উর্ম্মি জন্মিবে কিরূপে ? কম্পগতি ভিন্ন অন্য গতিতে উর্ম্মি জন্মাইতে পারে না; কাজেই মনে করিতে হইয়াছে, উষ্ণ দ্রব্যের অণুসকল কম্পনশীল। উষ্ণ দ্রব্য অত্যুষ্ণ হইলেই যখন দীপ্ত হয়, যখন আলো দেয়, যখন দৃষ্টিগোচর হয়, আর সেই আলোর যখন উর্ম্মির সহিত এমন সম্বন্ধ, আর কম্পগতি ভিন্ন অন্য গতি উৎপাদনে অশক্ত, তখন উষ্ণ দ্রব্যের অণুগুলিকে কম্পনশীল স্বীকার করিতে হইয়াছে। কেবলই বুদ্ধির খেলা। এক অনুমান হইতে অন্য অনুমানে ঝাঁপ দিতে হইয়াছে। প্রত্যক্ষ ঘটনা বুঝাইবার জন্য একটা অনুমানের আশ্রয়; সেই অনুমান বজায় করিতে অন্য অনুমানের আশ্রয়। এইরূপে ক্রমে গিয়া আমরা এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছি যে, দীপ্তিমান্ই হউক আর অদীপ্তই হউক, স্বয়ম্প্রভ হউক আর নিষ্প্রভই হউক, উষ্ণ দ্রব্য মাত্রেরই অণুসকল কম্পনশীল। আর সেই কম্পন-সংখ্যা বড় সামান্য নহে। সেকেণ্ডে কোটি কোটি বার কম্পন ব্যতীত ঐ সকল ক্ষুদ্র উর্ম্মির ঐ মহাবেগে সঞ্চলন বুঝা যায় না। তন্ত্রী বা পটহের শরীর কম্পিত হইলে শব্দ শুনা যায়, ঐ স্থলে কম্পগতি একরকম প্রত্যক্ষ ঘটনা। কিন্তু জড় পদার্থের অণুগুলিই প্রত্যক্ষগোচর নহে, উহারা নিজেই অনুমানের বিষয়। উহাদের কম্পগতিও প্রত্যক্ষ বিষয় হইতে পারে না; সেই কম্পনও অনুমানের বিষয়। অনুমানলব্ধ অণুসমূহে কম্পনগতি অনুমান করিয়া আমরা আলোকতত্ত্ব বুঝিয়াছি। নিউটনের অনুমান আলোকের সকল তত্ত্ব বুঝাইতে পারে নাই। কঠিন, তরল, অনিল, সকল পদার্থই উষ্ণ ও উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সকল পদার্থই প্রদীপ্ত, স্বয়ম্প্রভ হয়। অতএব সকলেরই অণু কম্পনশীল মনে করিতে হইবে। অণু কম্পনশীল, না পরমাণু কম্পনশীল ? মনে রাখিতে হইবে, অণু আর পরমাণু এক নহে। রাসায়নিক পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার বিরোধে গেলে চলিবে না। গোটাকতক পরমাণু একত্র করিয়া অণু হয়। একটা অণুর মধ্যে দু-দশটা পরমাণু থাকিতে পারে। দু-দশটা কেন, জৈব পদার্থের এক এক অণুর মধ্যে বিশ পঞ্চাশ হইতে দুই চারি শত পরমাণু থাকাও অসম্ভব নহে। কাজেই অণু আর পরমাণু

এক নহে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, তপ্ত দ্রব্যের অণু কাঁপে, না পরমাণু কাঁপে? ইহার সূক্ষ্ম উত্তর দেওয়া কঠিন। হয়ত অণু পরমাণু দুই-ই কাঁপে। কঠিন, তরল, অনিল, সকল পদার্থই অণুর সমষ্টি, প্রত্যেক অণু কতিপয় পরমাণুর সমষ্টি। অণু কাঁপিতেছে, কি পরমাণু কাঁপিতেছে, নিশ্চয় বলা কঠিন। তবে অনিল পদার্থে কতকটা স্পষ্ট উত্তর দেওয়া চলে।

নুন বা সামুদ্রিক লবণ যৌগিক পদার্থ। উহাতে সোডিয়ম ধাতু ক্লোরিনে মিলিত হইয়া আছে। প্রত্যেক অণুতে সোডিয়মের এক পরমাণু, ক্লোরিনের এক পরমাণু আছে, এইরূপ অনুমান করা হয়। আর সাজিমাটি কিম্বা সোডা আর একটি যৌগিক পদার্থ; উহাতেও সোডিয়ম ধাতু আছে, কয়লা ও অম্লানের সহিত মিলিত হইয়া আছে। প্রত্যেক অণুতে সোডিয়মের পরমাণু আছে। নুন আর সাজিমাটি উভয়েরই সাধারণ উপাদান সোডিয়ম ধাতু। উভয় দ্রব্যই কঠিন পদার্থ; উভয় দ্রব্যেরই কঠিনাবস্থায় দানা বাঁধিবার ক্ষমতা আছে; উভয় দ্রব্যই জলে দ্রব হয়; উত্তাপে তরল হয়; আর দীপশিখায় ধরিলে বাষ্পীভূত বা অনিলাবস্থ হয়। কিন্তু দীপশিখাতে নুনই ধর, আর সাজিমাটিই ধর, দীপশিখা সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল পীতবর্ণের আলো দিতে থাকে। এই পীতবর্ণের আলোক সোডিয়ম ধাতুর নিজস্ব আলোক। উহার সহিত নুনের ক্লোরিনের সম্পর্ক নাই বা সাজিমাটির অন্তর্গত কয়লা বা অম্লানের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু নুন বা সাজিমাটি উভয় দ্রব্যই দীপশিখাকে পীতাভ করে। এই আলোক সোডিয়মের আলোক। বুঝিতে হইবে, সোডিয়মের পরমাণুগুলি স্বাধীন ভাবে নিজস্ব আলোক দিতেছে; ক্লোরিনের আলোকও তার সঙ্গে থাকিতে পারে; কিন্তু উহা উজ্জ্বলতায় পরাস্ত হইয়াছে। এখানে একরকম বাধ্য হইয়া মনে করিতে হয়, অণুগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পরমাণু পৃথক্ হইয়া বাহিরে আসিয়া নিজস্ব আলোক বিকীর্ণ করিতেছে, অণুগুলি না ভাঙ্গিয়া থাকিলেও পরমাণু যে স্বতন্ত্র ভাবে আলোক দিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। নুনের অণুর সহিত সাজিমাটির অণুর মিল নাই। কাজেই নুনের আলোর সহিত সাজিমাটির আলোর সাদৃশ্য সম্ভবে না। কিন্তু সোডিয়মের পরমাণু উভয় পদার্থেই আছে। আর উভয় স্থলেই সোডিয়ম পরমাণু স্বাধীন ভাবে কাঁপিতেছে ও আকাশে ঊর্মি উৎপাদন করিতেছে বলিয়াই উভয়েই একই পীতবর্ণের আলো দেখা যাইতেছে।

এখানে একটা স্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল। দীপশিখার উষ্ণতায় নুন আর সাজিমাটি উভয়েই অনিলাবস্থায় রহিয়াছে। অনিলাবস্থাতে অণুগুলি স্বতন্ত্র ভাবে স্বাধীন ভাবে ছুটিয়া বেড়ায় ও ছুটিতে ছুটিতে ঠোকাঠুকি করে। যত উষ্ণ হয়, ততই বেগে ছুটে ও ততই ঝোঁকের সহিত ঠোকাঠুকি করে। এই ঠোকাঠুকির ফলে অণুতে অণুতে ধাক্কা লাগিয়া হয়ত অণুগুলি ভাঙ্গিয়া যায়। বস্তুতই উষ্ণতা বৃদ্ধিতে যৌগিক পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটে। অত্যধিক উষ্ণ হইলে জলের বাষ্পও বিশ্লিষ্ট হইয়া উদান অম্লান পৃথক্ হইয়া যায়। রাসায়নিক বিশ্লেষণের অর্থ অণুগুলির ধ্বংস। অণু ভাঙ্গিয়া পরমাণু পৃথক্ হইলেই রাসায়নিক বিশ্লেষণ বুঝিতে হইবে। উষ্ণতা বৃদ্ধিতে যৌগিক পদার্থের অণুগুলি ভাঙ্গিয়া যায়। পরমাণু স্বাধীন স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। স্বাধীন হইয়া স্বাধীন ভাবে কাঁপিতে থাকে। তখন উহার স্বাধীন কম্পের ফলে উহার নিজস্ব আলোক নির্গত হইতে থাকে।

মূল পদার্থ মাত্রেরই নিজস্ব আলো আছে আগে বলিয়াছি। ঐ নিজস্ব আলোক দেখিয়া উহাদিগকে চেনা যায়। প্রত্যেক মূল পদার্থ আলো দিবার সময় নিজস্ব আলো দেয়। আর চুার করিবার সময় সেই নিজস্ব আলো চুরি করে। এই নিজস্ব আলো চুরি করে বলিয়াই সূর্য্যে নক্ষত্রে কোন্ মূল পদার্থ আছে, আমরা ঘরে বসিয়া বলিতে পারি। অসঙ্কোচে বলিতেছি, সূর্য্যমণ্ডলে উদান আছে, সোডিয়ম আছে, লোহা আছে। তবেই প্রত্যেক মূল পদার্থ নিজস্ব আলো দেয়। কোন্ অবস্থায় দেয়? কঠিন অবস্থায় কি? না। তরল অবস্থায় কি? না। কেন না, তপ্ত দীপ্ত স্বর্ণখণ্ড ও তপ্ত দীপ্ত রৌপ্যখণ্ড বা তপ্ত দীপ্ত লৌহখণ্ড, কঠিনই হউক আর তরলই হউক, একই রঙের আলো দেয়। সেই আলোক কাচের কলমে বিশ্লেষণ করিলে তাহাতে শত সহস্র বর্ণের আলোক দেখা যায়; কিন্তু স্বর্ণে, রৌপ্যে, লৌহে কোন প্রভেদ দেখা যায় না। কিন্তু সেই সোনা, সেই রূপা, সেই লোহা যখন তড়িৎস্ফুলিঙ্গের ভীষণ উষ্ণতায় অনিলাবস্থ হইয়া পড়ে, তখন উহা আপন আপন আলোকে দীপ্তি পায়। তখন উহাদের আলো কাচের কলমে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সোনার আলো আর রূপার আলো আর লোহার আলো স্বতন্ত্র। এখন আর শত সহস্র বর্ণের আলো দিতেছে না; এখন কতিপয় বর্ণের আলো দিতেছে। সেই বর্ণগুলি চিনিয়া রাখা চলে। উহা উহাদের নিজস্ব বর্ণ; এই নিজস্ব বর্ণ দেখিয়া তড়িৎস্ফুলিঙ্গে লোহা

আছে, কি সোনা আছে, কি রূপা আছে, তাহা অক্লেশে বলা যাইতে পারে।

এখানে সাহসের সহিত বলা যাইতে পারে, এই আলো অণুর আলো নহে, উহা পরমাণুর আলো। পরমাণুগুলি স্বাধীনভাবে কাঁপিতেছে, উহাদের নির্দ্দিষ্ট কম্পসংখ্যা আছে। লোহার পরমাণুর কম্পসংখ্যা সোনার পরমাণুর কম্পসংখ্যার সমান নহে। আবার উদযানের পরমাণুর কম্পসংখ্যা সোডিযমের পরমাণুর কম্পসংখ্যার সমান নহে। কাজেই উদযানের পরমাণু আকাশে যে বর্ণের উর্ম্মি উৎপন্ন করে, সোডিয়মের পরমাণু আকাশে সেই সেই বর্ণের উর্ম্মি উৎপাদন করে না। বর্ণ দেখিয়া পরমাণুর স্বরূপ চিনিতে পারি।

এখন বলা যাইতে পারে, কঠিনে ও তরলে হয়ত অণুগুলিই কাঁপে। উহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট কম্পসংখ্যা নাই। সকল রকমের অণুই সকল রকমে কাঁপে। রক্ত, পীত, নীল, সকল বর্ণের উর্ম্মিরই সৃষ্টি করে। কিন্তু অনিল পদার্থে অণু কাঁপে না, পরমাণু কাঁপে। অন্ততঃ অনিল পদার্থ যখন উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, যখন উহাদের অণুগুলি ভাঙ্গিয়া পরমাণুতে পরিণত হয়, তখন পরমাণুগুলিই স্বতন্ত্র ভাবে কাঁপিতে থাকে। প্রত্যেক পরমাণুর কম্পবিধি, কম্পসংখ্যা স্বতন্ত্র। তাহাই সকল বর্ণের আলো না দিয়া কতিপয় বর্ণের, নিজস্ব বর্ণের আলো দিতে থাকে।

স্বাধীন ভাবে কম্পনের মর্ম্মই এই। শব্দোৎপাদক কম্পেও আমরা তাহাই দেখিয়াছি। টেবিলে ঠক্ করিয়া ঘা দিলে "ঠক্" শব্দ হয়। আঘাতের অধীনে টেবিলের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ভাবে এলোমেলো ভাবে কাঁপিতে আরম্ভ করে। নানা সংখ্যার নানা কম্প উৎপন্ন হইয়া নানা ধরণের উর্ম্মির সৃষ্টি করে। উহাদের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নাই, সকলে একযোগে একটা শ্রুতিকটু কর্কশ শব্দের সৃষ্টি করে মাত্র। কিন্তু তন্ত্রীযন্ত্রের তারে ঘা দিলে উহা আপন সুরে মধুর ভাবে বাজিতে থাকে। উহার নির্দ্দিষ্ট কম্পসংখ্যা আছে। সেই কম্পসংখ্যার অনুযায়ী উর্ম্মিমালা উৎপন্ন হইয়া কানে ধাক্কা দেয়। ইহাতে শ্রুতিমধুর স্বরের উপলব্ধি হয়। প্রত্যেক তারের নিজস্ব কম্পসংখ্যা ও নিজস্ব সুর। লম্বা তারে কোমল সুর, খাট তারে তীব্র সুর। তার স্বাধীনভাবে আপনার দৈর্ঘ্য, আপনার টানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাঁপিতে থাকে ও নিজস্ব উর্ম্মির ও নিজস্ব সুরের সৃষ্টি করে। কিন্তু টেবিলের তেমন নিজস্ব শব্দ নাই। ছোট টেবিলে আঘাতেও

ঠক্, বড় টেবিলেও ঠক্। ছোট ঘড়ি পিটিলেও ঢং, বড় ঘড়ি পিটিলেও ঢং। কিন্তু তন্ত্রীর বেলায় তাহা নহে।

পরমাণু স্বতন্ত্র, উহা অণুর মধ্যে আবদ্ধ নহে। যতক্ষণ উহা অণুর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ উহাকে সেই অণুর অধীন হইয়া চলিতে হয়, উহার সহায় অন্যান্য পরমাণুর অধীন হইয়া চলিতে হয়। কিন্তু একবার স্বাধীনতা পাইয়া অণু হইতে বাহির হইয়া আসিলে উহারা স্বাধীনভাবে কাঁপিতে থাকে ও নিজস্ব কম্পের, নিজস্ব উর্ম্মির, নিজস্ব বর্ণের সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রত্যেক পরমাণুর যদি নিজস্ব নির্দ্দিষ্ট কম্পসংখ্যাই থাকে, যদি নিজস্ব উর্ম্মি উৎপাদনেরই ক্ষমতা থাকে, তবে উহাদের একরঙা আলো হয় না কেন? নির্দ্দিষ্ট কম্পসংখ্যায় যে নির্দ্দিষ্ট আকারের উর্ম্মি সৃষ্টি করে, উহাতে নির্দ্দিষ্ট বিশুদ্ধ বর্ণই উৎপাদন করিবে। কিন্তু পরমাণুরা ত একরঙা আলো দেয় না। দুই চারিটা মূল পদার্থ আছে বটে, যাহাদের আলো একরঙা; যথা—থালিয়ম্, ইণ্ডিয়ম্, সোডিয়ম্। কিন্তু অধিকাংশ মূল পদার্থই একাধিক রঙের আলো দেয়। সোডিয়মের পীতবর্ণের আলোই বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়। কিন্তু উহা ঠিক একবর্ণের আলো নহে। উহাতে অন্ততঃ দুইটা ঈষৎ বিভিন্ন পীত বর্ণ আছে; একটার উর্ম্মি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ বড়, অন্যের উর্ম্মি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ছোট। অন্যান্য মূল পদার্থ পাঁচ, সাত, এমন কি, দু-শ চারি-শ নির্দ্দিষ্ট বর্ণের আলো দেয়। লৌহের পরমাণু যে আলো দেয়, বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে, তাহাতে কয়েক শত নির্দ্দিষ্ট বর্ণের আলো আছে। ইহার উত্তর কি? ইহার উত্তরও শব্দকম্পেই পাওয়া যায়। আগে দেখিয়াছি, তন্ত্রী বা পটহ কম্পিত হইয়া শ্রুতিমধুর স্বর দেয় বটে, কিন্তু কোন স্বরই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে। হেল্ম্হোল্ৎজ শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন—একটা মূল স্বরের সঙ্গে সঙ্গে গোটাকতক উপরের চড়া স্বরও থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কম্পমান তার বা কম্পমান পটহ সশরীরে স্বাধীনভাবে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় কাঁপে বটে, কিন্তু সেই মূল ও প্রধান কম্পের সঙ্গে আরও গোটাকতক কম্প থাকে। উহা সশরীরে কাঁপে, সমস্ত শরীরটাকে দোলায়, আর শরীরটাকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া আরও কতিপয় কম্পের উৎপাদন করে। কাজেই মূল স্বরের সঙ্গে অন্য কয়টা স্বরও থাকে। পরমাণুর কম্পনপ্রণালীও কতকটা এইরূপে বুঝা যাইতে পারে। প্রত্যেকের মূল ও প্রধান কম্পের সহিত আরও

কয়েকটা অপ্রধান কম্প থাকিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক কম্পেরই সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট, এক এক প্রকার কম্পে এক এক বর্ণের উৎপত্তি। কাজেই পরমাণুর কম্পের এই জটিলতায় একাধিক বর্ণের উৎপত্তি।

তন্ত্রীর বেলায় বা পটহের বেলায় গণিতজ্ঞ পণ্ডিতেরা গণিয়া বলিতে পারেন, মূল কম্পের সহিত কোন্ কোন্ উপরের কম্প থাকিবে। তন্ত্রীর আকার, আয়তন, উহার টান সমস্তই জ্ঞানগোচর। আর পরমাণুর আকার, আয়তন, সমস্ত অজ্ঞান-তিমিরে। উহার বেলায় ঐরূপ গণিয়া বলা চলে না। তবে মোটামুটি এক রকমের ব্যাখ্যা দেওয়া চলে মাত্র। এই কম্পনের কথাটা নূতন কথা। জড় পদার্থের গঠনপ্রণালী আলোচনার সময় আমরা এ কথা পাই নাই। তখন দেখিয়াছিলাম, অনিল পদার্থের অণুগুলি ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, বেগে ছুটিয়া বেড়ায় ও পরস্পর ঠোকাঠুকি করে। তরল পদার্থের অণুগুলিও ছুটিয়া বেড়ায় বটে, কিন্তু উহাদিগকে ভিড় ঠেলিয়া ছুটিতে হয়, কেবলই ঠক্কর খাইতে হয়, তাইতে বেগে অগ্রসর হওয়া চলে না। কঠিনের অণুসকল ছুটিবার বড় অবসর পায় না; উহারা স্বস্থানে আবদ্ধ থাকে। স্বস্থানে দল বাঁধিয়া শৃঙ্খলামত দাঁড়ায় বলিয়া ইহার দানা বাঁধিবার প্রকৃতি। কিন্তু এইখানে একটা গোলে পড়া গিয়াছিল। কঠিন পদার্থও তাপযোগে উষ্ণ হয়; আর তাপ শক্তি। উহার অণুগুলি যদি নিশ্চল হয়, তবে সেই শক্তির ব্যাপারটা কিরূপে বুঝিব। তরলের ও অনিলের অণু বেগে ছুটে; উহাদের ঝোঁক আছে, কাজেই শক্তিও আছে। তাপই সেই শক্তি। কিন্তু কঠিনের অণু যদি নিশ্চল হয়, তবে সেই শক্তি কি ভাবে থাকিল? লৌহপিণ্ডে তাপ দিলাম, উহা উষ্ণ ছিল উষ্ণতর হইল; কিন্তু এখনও তারল্য পায় নাই। শক্তিটা কোথায় কিরূপে নিহিত হইল?

এখন দেখিতেছি, উষ্ণ দ্রব্য মাত্রেরই অণুসমূহ কম্পনশীল। অণুগুলি ছোটে না, কিন্তু ছট্‌ফট্ করে। এই ছট্‌ফটানিও ত একটা গতি। আর গতিশীল পদার্থই শক্তিমান্। প্রত্যেক অণু কাঁপিতেছে, আর যেমন-তেমন কাঁপুনি নহে, সেকেণ্ডে কোটি কোটি বার কাঁপুনি; কাজেই প্রত্যেক অণুর একটু শক্তি আছে। তাপযোগে উষ্ণতা বৃদ্ধির সহিত কম্পের উপর আরও কম্প বাড়ে। অণুতে নিহিত শক্তিও বৃদ্ধি পায়।

ছট্‌ফটানি চাঞ্চল্য ক্রমেই বাড়ে, শেষে পাশের অণুগুলিকে ঠেলিয়া চলিতে আরম্ভ করে। তখন কঠিন পদার্থ তরল হয়। তরলের অণুগুলি

পাশের সহচরদিগের ভিড় ঠেলিয়া চলে, ধাক্কা দিতে দিতে ও ধাক্কা খাইতে খাইতে চলে; কিন্তু কেবলই চলে, তাহা নহে, কাঁপিতে কাঁপিতে চলে। তরল পদার্থের অণুরও কম্পগতি আছে। নহিলে দ্রব সুবর্ণ দীপ্ত হইয়া টলটল ঢলঢল করিবে কেন? গরম জল দীপ্তি পায় না বটে, কিন্তু গরম জল আকাশে ঊর্ম্মি উৎপাদন করে, সেই ঊর্ম্মি আলোক জন্মায় না, তবে অন্যত্র গিয়া তাপ জন্মায়। কাজেই তরল পদার্থের অণুগুলি ভিড় ঠেলিয়া ধাক্কা দিতে দিতে কাঁপিতে কাঁপিতে চলে, স্বস্থান ছাড়িয়া চলে; কঠিনের অণুর মত স্বস্থানে থাকিয়া ছট্‌ফট্‌ করে না, ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ছুটিবার চেষ্টা করে, কিন্তু ভিড়ের গতিকে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না। কেবলই ধাক্কা খাইয়া এদিক্ ওদিক্ সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায়। পৃষ্ঠদেশের কাছে আসিবা মাত্র ফাঁকা জায়গা পাইয়া অমনই বাহিরে ছুট দেয়। তখন উহা বাষ্প হয়। বাষ্পের অণু ছুটাছুটি করে; বেগে ছুটিতে থাকে; কিন্তু কাঁপিতে কাঁপিতেই ছুটিতে থাকে। এবার ফাঁকা জায়গা যথেষ্ট; কাজেই মাঝে মাঝে ঠোকাঠুকি হইলেও অনেকটা অগ্রসর হইতে অবকাশ পায়। এদিকে ওদিকে চারি দিকে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটে। তরল পদার্থের পিঠের কাছে আসিলে হয়ত পাকড়া পড়িয়া আবার ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। নতুবা ফাঁকা জায়গাতেই ছুটিয়া বেড়ায়। ফাঁকা জায়গা কম হইয়া থাকিলে অণুগুলিকেও বাধ্য হইয়া পরস্পর কাছে আসিতে হয়, আয়তন হ্রাসের সঙ্গে হয়ত শেষে এমন অবস্থা হয়, তখন আবার ভিড় উপস্থিত হয়, বাষ্প তখন তরল হয়। তখন আবার পরস্পরকে ঠেলিয়া খাতির করিয়া চলিতে হয়। কিন্তু উষ্ণতার আধিক্যে বাষ্পের আর তরলতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। তখন এত বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, আর ভিড়ের মধ্যে ধরা দেয় না। যতই চাপিয়া ভিড়ে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা কর, সে ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসে। তখন আর উহা বাষ্প নাই, উহা অনিল হইয়াছে। অনিলের অণুগুলিও বেগে ছুটিতেছে, কাঁপিতে কাঁপিতে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে বেগে ছুটিতেছে; মাঝে মাঝে ঠোকাঠুকি হইতেছে। যত বেগ, ততই ঠোকাঠুকির আঘাত প্রবল, শেষে উষ্ণতা বৃদ্ধি সহকারে এমন ঘটে যে, অণুতে অণুতে ঠোকাঠুকিতে অণু ভাঙ্গিতে লাগে। পরমাণুগুলি ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। তখন যৌগিক পদার্থ বিশ্লিষ্ট হইয়া উহার মূল উপাদান বাহির হইয়া যায়। পরমাণুগুলি বাহির হয় আর

কাঁপিতে কাঁপিতে ছোটে। কিন্তু কাঁপিবার সময় সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত কাঁপে। উহার ছট্‌ফটানি নিজের ছট্‌ফটানি ; পরের খাতিরে নহে। তখন উহার কম্পসংখ্যাও নির্দ্দিষ্ট। কাহারও বা কম্প একবিধ, কাহারও বা বহুবিধ। কিন্তু কোন কম্পই অন্য জাতীয় পরমাণুর অধীন নহে। এই অবস্থায় অনিল উজ্জ্বল বর্ণে জ্বলিতে থাকে ; আপন আপন বর্ণে দীপ্তিমান্‌ হয়। চারি দিকের আকাশ তরঙ্গাকুল হয়। উর্ম্মির মালা সারি সারি আকাশ বাহিয়া আগেও চলিতেছিল, এখনও চলে ; আগে তাহাদের মধ্যে কোন সঙ্গতি ছিল না, যখন নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের উর্ম্মিমালা চলিতে থাকে, দূরে দর্শক তাহার ফলে বিচিত্র বর্ণের বিকাশ দেখেন। বর্ণ দেখিয়া ধরিয়া ফেলেন, কোন্‌ পরমাণু কাঁপিতেছে ? উদযান, না অম্লযান, না সোডিয়ম, না লৌহ ? অণুগুলি বেগে ছুটিতে ছুটিতে ধাক্কা খাইয়া ভাঙ্গিয়া পরমাণু ছাড়িয়া দেয়। পরমাণু পরস্পর আঘাতে ভাঙ্গে কি ? রাসায়নিক পণ্ডিত এইখানে জোরের সহিত বলেন, পরমাণু আর ভাঙ্গে না। উহা অবিভাজ্য। উহার আর ভগ্নাংশ হয় না। উহাকে ভাঙ্গিতে পারে, এমন শক্তি নাই। যত শক্তি দেও, উহা বহন করিবে, কিন্তু ভাঙ্গিবে না। পরমাণুর ভগ্নাংশ সম্ভব হইলে রাসায়নিক সম্মিলনের এমন বাঁধাবাঁধি থাকিত না। অম্লযানের পরমাণু যেখানেই দেখি, উহার ওজন উদযানের পরমাণুর ষোল গুণ। কয়লার পরমাণু উদয়ানের পরমাণুর বার গুণ। অম্লযানের পরমাণু ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ড হইলে সর্ব্বদা ষোল গুণ হইত না। দুই খণ্ড হইলে এক এক খণ্ড আট গুণ হইত। চারি খণ্ড হইলে এক এক খণ্ড চারি গুণ হইত। কিন্তু ঐ সকল ভগ্নাংশের অস্তিত্ব কই, রাসায়নিকেরা কোথাও দেখেন নাই।

রাসায়নিকেরা দেখেন নাই : কিন্তু বেঞ্জামিন ব্রডি বলিতেন, সার্‌ নর্ম্মান লকিয়ার বলিতেন, আমরা যেন পরমাণুর ভগ্নাংশের প্রমাণ পাইয়াছি। সূর্য্যমণ্ডলের ভীষণ উষ্ণতায়, তাড়িত স্ফুলিঙ্গের ভীষণ উষ্ণতায় কোন কোন পরমাণু ভাঙ্গিয়া উহার ভগ্ন খণ্ডের অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছি, আলোক বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ পাইয়াছি। কিন্তু সে প্রমাণে রাসায়নিক পণ্ডিতেরা ঘাড় পাতেন নাই। শেষে এত দিনে এমন এক প্রমাণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, রাসায়নিক পণ্ডিতকেও ঘাড় পাতিয়া মানিতে হইয়াছে, পরমাণুও বুঝি ভাঙ্গে ; দ্বিখণ্ড, চতুর্খণ্ড নহে, ভাঙ্গিয়া সহস্রখণ্ড হয়। কিন্তু এ বৃহৎ কাহিনী ; ইহা পরে বলিব। এখন সময় আসে নাই।

গণা ও মাপা

গণা আর মাপা, এই দুইটা সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার। গোয়ালঘরের গরু কত আছে, ঠিক করিতে হইলে গণিতে হয়; গণার অন্য নাম সংখ্যা করা। কিন্তু গামলায় কতটা জল আছে, তাহা মাপিতে হয়; তাহার নামান্তর পরিমাণ করা। আমরা বলি—পনরটা গরু; আর পনর সের জল। সাড়ে পনরটা গরু বলিলে লোকে হাসিবে; কিন্তু সাড়ে পনর সের জল বলিলে লোকে হাসিবে না। অতএব দুইয়ে তফাৎ আছে। কোথায় তফাৎ?

গরুকে দুই ভাগ করা হিন্দুর কাজ নহে; অন্যে করিলেও যে দুই খণ্ড পাওয়া যায়, তাহার গোত্ব থাকে না। একটা আস্ত গরুর শিং লেজ ও চারিখানা পা থাকা দরকার; দুই ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগে শিং লেজ ও পাগুলি বাহাল রাখা চলে না; কাজেই দুই ভাগ করা চলে না; কাজেও চলে না; কল্পনাতেও চলে না। কিন্তু এক গামলা জলকে অক্লেশে দুই ভাগ করা চলিতে পারে; এবং প্রত্যেক ভাগেরই জলত্ব ষোল আনা বজায় থাকে।

যে সকল জিনিসকে খণ্ডিত করিলে উহা আর সে জিনিসই থাকে না, তাহা মাপিতে হয় না, গণিতে হয়। যেমন গরু, আলমারি, বহি, ইট। কিন্তু গরুর দুধ, আলমারির কাঠ, বহির কাগজ ও ইটের মাটি, যত ভাগই কর না কেন, উহাদের দুগ্ধত্ব, কাষ্ঠত্ব ইত্যাদি নষ্ট হয় না। উহাদের বেলা না গণিয়া মাপাই বিধি।

ভাবিলে বুঝা যাইবে, গণা কর্ম্মটা সহজ; উহাতে ভুল-ভ্রান্তির বড় আশঙ্কা থাকে না। গোয়ালের গরু তেরটা কি চৌদ্দটা, অক্লেশে ঠিক হইবে, উহার মাঝামাঝি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু গরুর দুধ তের সের ও চৌদ্দ সেরের মাঝামাঝি সহস্র রকম হইতে পারে। তাহার অর্থ এই যে, দুধ যত অল্পই লওয়া যাক না কেন, উহা দুধই। কিন্তু গরুর শিং কি লেজ, কি খুর, ইহা গরু নহে। এই মাঝামাঝি সহজ পরিমাণের সম্ভাবনা থাকাতেই মাপ কর্ম্মটা কঠিন।

মাপিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে গণিবারই চেষ্টা প্রথমে করিতে হয়। একটা বাটি আনিয়া বলি, এই বাটির এক বাটি দুধের নাম এক সের দুধ। তার পর গামলার দুধ এক বাটি এক বাটি করিয়া তুলিয়া এক, দুই,

তিন ক্রমে তের বাটি পর্য্যন্ত তুলিলে তের সের হইল ; এ পর্য্যন্ত বেশ গণা চলিল। কিন্তু তের বাটি তুলিয়া দেখা গেল যে, আরও খানিকটা গামলায় রহিয়াছে, তাহাতে বাটি পূর্ণ হয় না. উহা এক বাটি নহে। সেইটুকুকে মাপিতে হইলে আর একটা ছোট বাটি আনিতে হয় ও সেই ছোট বাটির এক বাটি দুধকে বলা হয এক ছটাক। তার পর বাকী দুধটুকুতে ছোট বাটি ডুবাইয়া আবার এক, দুই, তিন ছটাক ক্রমে গণিতে হয়। দেখা গেল, নয় ছটাক পর্য্যন্ত তুলিয়া একটুকু অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে আর সে ছোট বাটিও পুরে না। তখন আরও ছোট বাটি আনিয়া তাহার কাঁচ্চা নাম দিয়া দেখা যায়, তিন কাঁচ্চা হইয়া যেটুকু থাকে, সেটুকু আবার এক কাঁচ্চার কম। কি বিপদ্! সেটুকু মাপিতে হইলে আবার আরও ছোট বাটির দরকার হইবে। আবার ছোট বাটি এখন কোথা পাওয়া যায়। তখন গৃহস্থও বিরক্ত, আর গোয়ালাও বিরক্ত। উভয়েই বলে, আর ঐ দুধটুকু লইয়া ঝগড়া করিতে পারি না। গোয়ালা বলে—বাবু, ওটুকুর তুমি দাম দিও না, উহা আমি দান করিলাম। অতএব উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে স্থির হইল, দুধের পরিমাণ তের সের নয় ছটাক তিন কাঁচ্চা। উভয় পক্ষে মিটমাট হইয়া গেল, ভাল কথা, কিন্তু দুধটার ত সূক্ষ্ম মাপ হইল না।

সূক্ষ্ম মাপ হইবার উপায়ও দেখি না। আরও ছোট বাটি আনিয়া না হয় কাঁচ্চারও ভগ্নাংশ গণা হইল, কিন্তু তাহাতেও যে একটু দুধ অবশিষ্ট থাকিবে না, কে বলিল! যত ছোট বাটিই লও না কেন, দুধ ত তার চেয়ে কম হইতে পারে ; তখন আবার আরও ছোট বাটির সন্ধান করিতে হইবে। কাজেই এক সময়ে না এক সময়ে বিরক্ত হইয়া বাকীটুকুকে ত্যাগ করিতে হইবে। মাপ কর্ম্মটা কিন্তু সমাপ্ত হইবে না। তাহা হইলে কোন্ জিনিস গণা চলে, আর কোন্ জিনিস না গণিয়া মাপিতে হয়? যাহার ভগ্নাংশ হয় না, তাহা গণিতে হয়, আর যাহার ভগ্নাংশ পাওয়া যায়, তাহা মাপিতে হয়। কিন্তু গণা ও মাপা, দুই কর্ম্মে এই তফাৎ যে, সাবধানে গণিলে ভুলের সম্ভাবনা থাকে না। আর যতই সাবধানে মাপ, শেষ পর্য্যন্ত একটু ভুলের সম্ভাবনা থাকেই। ইহার কারণ এই যে, মাপকাঠি যতই ছোট কর, মাপের জিনিস তার চেয়েও ছোট হইতে পারে। গরু অবিভাজ্য, তাই গণা চলে ; অবিভাজ্য এই হিসাবে যে, ভাগ করিলে গরুত্ব থাকে না ; আর দুধ বিভাজ্য ; যত ছোট ভাগ কর, উহা দুধই থাকে।

এখন একটা গোলের দৃষ্টান্ত লইব। বাজারে ধান কিনিব। ধান গণা উচিত, না মাপা উচিত? বলা বাহুল্য, ধান অবিভাজ্য; অর্থাৎ একটি ধানকে ভাঙিলে যে খণ্ড পাওয়া যাইবে, উহাকে ধান বলা চলে না। অতএব ধান গণাই উচিত। এবং যদি সাবধানে গণা যায়, তাহা হইলে কাহার সাধ্য ক্রেতাকে ঠকায়।

কিন্তু আমরা ত ধান গণিয়া লই না। উহা আমরা ওজন করিয়া লই বা মাপিয়া লই। মণ হিসাবে ওজন করি, অথবা আড়ি ধরিয়া মাপ করি। ফলে বিক্রেতা ক্রেতাকে সাধ্যমত ঠকাইয়া দিতে ক্রটি করে না। ক্রেতা উপায় থাকিতে ঠকে কেন? গণিলে ঠকিতে হইত না বটে, কিন্তু ধানের মত ক্ষুদ্র দ্রব্য, একটি একটি করিয়া গণিতে বসিলে মাসের খোরাক সংগ্রহ করিতে পরমায়ু ফুরাইত। ধানকে চাউলে ও চাউলকে ভাতে পরিণত করিয়া উদরস্থ করিবার অবসর ঘটিত না। কাজেই ঠকিবার সম্ভাবনা, ভুলের আশঙ্কা থাকিতেও আমরা ধান মাপিতে বসি, এবং পঞ্চাশ মণ পনর সের সাত ছটাক পর্য্যন্ত মাপিয়া যে কয়টা অবশিষ্ট থাকে, উহা অগ্রাহ্য করি। জোর করিয়া মনকে বুঝাই, ধান যেন জলের মত বা দুধের মত বিভাজ্য পদার্থ; যেন উহা ভাগ করিতে গিয়া খণ্ড পাওয়া যাইবে না। অথচ যে কয়টা ধান বাকী থাকিল, তাহা স্বচ্ছন্দে গণা চলিত।

দাঁড়াইল এই। জলের মত বা দুধের মত জিনিস গণা চলে না, কিন্তু ধানের মত জিনিস গণা চলে ও গণা উচিত। তবে ধান অতি ক্ষুদ্র ও গোটাকতক ধানের মূল্য অগ্রাহ্য বলিয়া আমরা উহা না গণিয়া মাপিয়াই থাকি। গোটাকতক ধানকে আমরা অবহেলা করিয়া গণিতে চাহি না।

এখন সংশয় দাঁড়ায়—আচ্ছা, ধান যেমন অবহেলা করিয়াই হউক বা পরিশ্রমের ভয়েই হউক, আমরা গণি না, সেইরূপ জলও হয়ত সেইরূপ কোন কারণে আমরা গণিতে চাহি না, মাপিয়া থাকি।

জড় পদার্থের গঠন সম্বন্ধে যে সকল অনুমানের কথা বলা গিয়াছে, তাহা যদি সমূলক হয়, তাহা হইলে সেই সংশয়ই ত প্রকৃত হইয়া দাঁড়ায়। অনুমান করা গিয়াছে, জলের অণুগুলি খুব ছোট; এত ছোট যে, চোখেরও অগোচর। কিন্তু ঐ অণু অবিভাজ্য। এই হিসাবে অবিভাজ্য যে, ঐ অণু ভাঙিলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহার আর জলত্ব থাকে না। গরুর ভগ্নাংশে যেমন গরুত্ব নাই, ধানের ভগ্নাংশে যেমন ধানত্ব নাই, জলের অণুর

ভগ্নাংশে তেমন জলত্ব নাই। সেই অণুগুলি যদি দর্শনগোচর হইত, তাহা হইলে এক গামলায় কতগুলি জলের অণু আছে, তাহা আমরা নিশ্চয় গণিয়া বলিতে পারিতাম ও সাবধানে গণিলে ভুলের সম্ভাবনা থাকিত না।

ফলে দর্শনগোচর হইলেও জলের অণু এত ছোট যে, এক ফোঁটা জলের অণু গণিতে পরমায়ু ফুরাইত! সেইরূপ দুধের অণু গণিয়া দুধ কিনিতে হইলে গোয়ালা জব্দ হইত বটে, কিন্তু দুধের পিপাসা ইহ জন্মে মিটিত না। কাজেই যেমন ধান গণনাযোগ্য হইলেও আমরা গণি না, জলের অণু গণনাযোগ্য হইলেও তেমনই গণি না। না গণিয়া মাপিয়া থাকি। অণু যদি অবিভাজ্য না হইত, তাহা হইলে অবশ্য গণিবার উপায়ই থাকিত না।

পদার্থবিদের অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কঠিন, তরল, মরুৎ, সকল পদার্থই গণনাযোগ্য বটে; তবে অণুগুলি খুব ছোট বলিয়া গণনার মেহনত পোষায় না এবং সম্প্রতি ইন্দ্রিয়গোচর নহে বলিয়া গণিবার উপায়ও নাই। গণি, আর নাই গণি, একালের পণ্ডিতদের অনুমানে জল জলের মত জিনিস আদৌ নহে, উহা ধানের মত জিনিস। সিদ্ধান্তটা কিরূপ?

আমাদের মত সাধারণ লোক, যাহারা উদর পূরণেই সন্তুষ্ট, তাহারা এক মণ ধানে কতগুলি ধান আছে, তাহার হিসাব জন্য আদৌ ব্যস্ত নহে। কিন্তু আর এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, তাঁহাদের এইরূপ অগ্রাহ্য বিষয়েও অন্ততঃ একটা মোটামুটি হিসাব করিতে না পাইলে কিছুতেই মনের তৃপ্তি হয় না। এক মণ ধানে কয় লক্ষ কয় হাজার কয় শ কয়টা ধান আছে, এত দূর সূক্ষ্ম হিসাব না হইলেও এত লক্ষ এত হাজার, অথবা অন্ততঃ এত লক্ষ ধান আছে জানিতে পারিলেও তাঁহাদের মনটা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। এই শ্রেণীর লোকের ধাতুই স্বতন্ত্র। আমরা তাঁহাদিগকে পাগল বলিব; কিন্তু আমাদের পরে যারা ধরাতলে ভূমিষ্ঠ হইবে, তাহারা হয়ত বলিবে, তাঁহারাই মানবকুলের শিরোমণি।

ঐরূপ মানবকুলের শিরোমণি এক জন অশীতি শরৎ অতিক্রম করিয়া অদ্যাপি ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছেন, অথবা ভূপৃষ্ঠকে গৌরবান্বিত করিতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার নাম লোকে জানিত সার্ উইলিয়ম টমসন। এখন দেশের রাজা খাতির করিয়া নাম দিয়াছেন লর্ড কেলবিন। ভবিষ্যতের মানববংশপরম্পরা যাঁহার স্মৃতির সম্যক্ সম্মানে অক্ষমতা স্বীকার করিবে, রাজা কি না তাঁহার নাম বদলাইয়া খাতির করিতে চাহেন! হা হতোঽস্মি!

এই লর্ড কেলবিন এক ফোঁটা জলে কতগুলি অণু আছে, তাহা গণিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। নতুবা তাঁহার মনে তৃপ্তি হয় না। অণু ত আনুমানিক পদার্থ; তথাপি তিনি নানা রকমে মাথা ঘামাইয়া তাহা গণিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও মোটা হিসাবও দিয়াছেন। অনুমানটা মূলে যদি সমূলক হয়, তবে সেই হিসাবে বিশেষ অবিশ্বাসের হেতু নাই।

অণুগুলি অবিভাজ্য, অর্থাৎ জলের অণুকে ভাঙিলে উহাতে জলত্ব থাকে না। কিন্তু রসায়নবেত্তা পণ্ডিতের অনুমানে উহা হইতে গোটাকতক পরমাণু বাহির হয়। তিনি অনুমান করেন, গোটাকতক এক জাতীয় বা ভিন্ন জাতীয় পরমাণু জোট বাঁধিয়া যে ছোট বড় দল হয়, সেই এক একটা দল এক একটা অণু। এক জাতীয় পরমাণুর জোটে মৌলিক পদার্থের অণু, আর বিভিন্ন জাতীয় পরমাণুর জোটে যৌগিক পদার্থের অণু। অবশ্য পরমাণুগুলির কোনরূপ একটা বন্ধন আছে, যাহাতে তাহারা সহজে জোট ছাড়িতে চাহে না; শক্তি প্রয়োগে উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। স্থলবিশেষে বন্ধন দৃঢ় বন্ধন; তখন প্রচুর শক্তি ব্যতীত বাঁধন ছেঁড়ে না; স্থলবিশেষে শিথিল বন্ধন; তখন সামান্য কারণেই বাঁধন ছিঁড়িয়া যায় ও যৌগিক পদার্থ বিশ্লিষ্ট হয়। এই বন্ধনটা কিরূপ, তাহার স্পষ্ট ছবি রাসায়নিক পণ্ডিত মনে আঁকিতে পারেন না। তবে অম্লযানের পরমাণু উদযানের দুইটা। অঙ্গারের পরমাণু উদযানের চারিটা পরমাণুর সহিত জোট বাঁধে দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন বন্ধনক্ষমতা অনুমান করেন ও রূপকের ভাষায় বলেন, উদযানের পরমাণু একভুজ, অম্লযানের পরমাণু দ্বিভুজ, অঙ্গারের চতুর্ভুজ ইত্যাদি। যেন পরমাণুগুলি পরস্পর হাত বাড়াইয়া জড়াজড়ি করিয়া পরস্পরকে ধরিয়া আছে।

এক একটা অণুতে গোটাকতক মাত্র পরমাণু দল বাঁধিয়া থাকে; উহাদের সংখ্যা বহু স্থলেই অনুমান করিতে হয়। কাজেই এক ফোঁটা জলে কতগুলি অণু আছে, তাহার মোটা হিসাব পাইলে উহাতে কতগুলি উদযানের পরমাণু ও কতগুলি অম্লযানের পরমাণু আছে, তাহার হিসাবের জন্য বড় ভাবিতে হয় না।

তার পর কথা আছে, পরমাণুগুলি বিভাজ্য কি না? পরমাণুর আবার ভগ্নাংশ আছে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর এখন নহে।

তড়িৎ

তড়িৎঘটিত ব্যাপার বুঝান দায়। আমরা স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা তাপের উষ্ণতা, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দের সুর, আর দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা আলোকের দীপ্তি প্রত্যয়গোচর করিয়া থাকি। কিন্তু তড়িতের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষগোচর করিবার জন্য পৃথক্ ইন্দ্রিয় নাই। তড়িতেব ক্রিয়া-ফলে যখন আলোক বা উষ্ণতা বা শব্দ জন্মে, তখন আমরা তাহার খবর পাই ; কিন্তু তড়িতের সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার ঘটে না। এই হেতু দেড় শত বৎসর আগে আমরা তড়িতের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতাম না। শত বৎসর পূর্ব্বে জ্ঞানের সীমা বেশী অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু আজি আর তাহা বলা চলে না। তাড়িত শক্তির উপলব্ধির জন্য স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় না থাকিলেও উহার মত পরিচিত শক্তি আজকাল বোধ করি আর নাই। তাড়িত শক্তি আজ মনুষ্যের অনুগত বশংবদ ভৃত্য। আর কোন শক্তির উপর ততটা প্রভুত্ব নাই। চিরপরিচিত তাপের ও আলোকের অপেক্ষাও আমাদের তড়িতের সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

বৈজ্ঞানিকেরা তাড়িত শক্তিকে খেলার সামগ্রী করিয়াছেন, কিন্তু সাধারণ পাঠকের নিকট উহার স্বভাব এখনও সমস্যাপূর্ণ রহিয়াছে। সাধারণ পাঠক কেবল ইন্দ্রিয় সহায়ে অবেক্ষণ মাত্র করিয়া থাকেন। তাই শব্দের, আলোকের, তাপের ক্রিয়াকলাপের সহিত অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। কিন্তু তাড়িত শক্তি তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গোচর নহে। উহাকে কৌশলক্রমে অন্য শক্তিতে পরিণত করিয়া ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়। এই সকল কৌশল উদ্ভাবনের নাম পরীক্ষা। কাজেই বিনা পরীক্ষায় তাড়িত শক্তির ক্রিয়া-কলাপ সাধারণ পাঠককে বুঝান কঠিন। যাহার সহিত পরিচয় নাই, তাহাকে কেবল কল্পনার সম্মুখে রাখিয়া বুঝাইবার চেষ্টা কিছুতেই সফল হইতে পারে না। অথচ তাড়িতের কথা না বলিলে আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রধান কথাই বলা হইল না। কাজেই কেবলমাত্র স্থূল কথাগুলির অবতারণ করিয়া তাড়িত তত্ত্বের যথাসম্ভব আলোচনা করা যাইবে।

রবারের চিরুনি চুলে ঘষিলে উহা একটা নূতন ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। উহা চুলকে টানিতে থাকে। ছোট ছোট হাল্‌কা কাগজের বা শোলার টুকরা টানিতে থাকে। উহার যে ক্ষমতা পূর্ব্বে ছিল না, চুলে ঘষায় সেই ক্ষমতা

উহাতে আসে। একটা কিছু আগে উহাতে ছিল না, এখন তাহা আবির্ভূত হইয়াছে। এই একটা কিছুর নাম দেওয়া হয় তাড়িত ধর্ম্ম। এই নবার্জ্জিত তাড়িত ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা একটা পদার্থ কল্পনা করেন, তাহার নাম দেন তড়িৎ। তড়িৎ নামা কোন পদার্থ সহসা আবির্ভূত হইয়াছে, উহারই আবির্ভাবে চিরুনি লঘু দ্রব্য আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে। অবশ্য এই পদার্থটা বৈজ্ঞানিকের অনুমান মাত্র।

রেশমী রুমালে কাচ ঘষিলে বা পশমী ফ্লানেলে গালা ঘষিলে, ঐ কাচ আর গালাও ঐরূপ লঘু দ্রব্য আকর্ষণের ক্ষমতা উপার্জ্জন করে। কাজেই বলিতে হয়, ঐ স্থলে ঐ তাড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে। কাচেও আবির্ভাব হইয়াছে, গালাতেও আবির্ভাব হইয়াছে।

কাচে আবির্ভূত তাড়িতের সহিত গালায় আবির্ভূত তাড়িতের একটা মস্ত প্রভেদ দেখা যায়। উভয়ই লঘু বস্তুর আকর্ষণক্ষম, কিন্তু উভয়ে একটা বিষম প্রভেদ। কাচে কাগজের টুকরা আকর্ষণ করিতেছে, এমন অবস্থায় যদি সেই গালাকে নিকটে আনা যায়, তাহা হইলে আকর্ষণ কমিয়া যায়, আবার গালায় কাগজের টুকরা আকর্ষণ করিতেছে, এমন অবস্থায় কাচকে নিকটে আনিলেও আকর্ষণ কমিয়া যায়। কাচের তাড়িতের সহিত গালার তাড়িতের যেন বিরোধ; কাচও কাগজ টানিতে চায়, গালাও টানিতে চায়, কিন্তু কাচ ও গালা উভয়ে একত্র উপস্থিত থাকিলে পরস্পরের বিরোধে আকর্ষণই ঘটে না। এই বিরোধের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে কাচের প্রতি গালার ব্যবহার কিরূপ, পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

রেশমে ঘষিলে কাচে তড়িৎ আসে; পশমে ঘষিলে গালায় তড়িৎ আসে। ঐ কাচ আর ঐ গালা কিন্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তড়িৎ আমরা চোখে দেখিতে পাই না; মনে করি, তড়িতের আবির্ভাব হেতু কাচ গালাকে ও গালা কাচকে আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে। এই আকর্ষণ-ক্ষমতা কাহার? কাচের, না গালার, না তড়িতের? কাচের ও গালার ত পরস্পর এরূপ আকর্ষণের প্রকৃতি ছিল না; তড়িতের আবির্ভাবেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব বলিতে হইবে যে, কাচের তড়িৎ গালার তড়িৎকে আকর্ষণ করে। তাহার ফলে কাচ গালার কাছে ও গালা কাচের কাছে যাইতে চায়। অথবা বলিতে পার, এই নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তিতে নব

ধর্ম্মাক্রান্ত কাচ নব ধর্ম্মাক্রান্ত গালাকে আকর্ষণ করে। এরূপ বলিলেও দোষ নাই। ইহা লইয়া কথা কাটাকাটিতে ফল নাই।

বলা যাইতে পারে, তড়িৎ তড়িৎকে আকর্ষণ করে। তাহার ফলে যে যে দ্রব্যে তড়িতের আবির্ভাব হয়, সেই সেই দ্রব্য পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইবার চেষ্টা করে।

দুই টুকরা কাচে রেশম ঘষিলে উহারাও কি আকর্ষণ করিতে থাকে? না। এখানে আকর্ষণ না ঘটিয়া বিকর্ষণ ঘটে। একখানা কাচ অন্য কাচ হইতে দূরে যাইতে চাহে। এখানে তড়িতে তড়িতে আকর্ষণ নাই; তৎপরিবর্ত্তে বিকর্ষণ। আবার দুই টুকরা গালা পশমে ঘর্ষণের পর পরস্পরকে আকর্ষণ না করিয়া বিকর্ষণ করে। এখানেও তড়িতে তড়িতে বিকর্ষণ।

কাচের প্রতি কাচের যে ব্যবহার, কাচের প্রতি গালার ব্যবহার তাহার বিপরীত; আবার গালার প্রতি গালার যে ব্যবহার, কাচের প্রতি গালার ব্যবহারও তাহার বিপরীত। এই ব্যবহার তড়িতের আবির্ভাবজাত। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, কাচের তড়িৎ আর গালার তড়িৎ ঠিক এক রকমের তড়িৎ নহে। উভয়ের ব্যবহার পরস্পর বিপরীত।

উভয়ের স্বভাবের ও ব্যবহারের এই বৈপরীত্য দেখিয়া দুই রকমের তড়িতের অনুমান করিতে হয়। কাচের তড়িৎ এক রকম; গালার তড়িৎ অন্য রকম। আর উভয়ের সম্বন্ধ বিপরীত।

কিরূপ বিপরীত। এ যেখানে টান দেয়, ও সেখানে ঠেলা দেয়। এ যেখানে উত্তরে টানে, ও সেখানে দক্ষিণে ঠেলে।

উত্তরে যাওয়ার সঙ্গে দক্ষিণে যাওয়ার যেরূপ সম্বন্ধ, একের সহিত অন্যের সেইরূপ সম্বন্ধ। যাঁহারা গণিত শাস্ত্রের আলোচনা করেন, তাঁহারা বলেন, ধনরাশির সহিত ঋণরাশির সেইরূপ সম্বন্ধ।

আয় অপেক্ষা ব্যয় কম হইলে হিসাবে যাহা মজুত থাকে, তাহার নাম ধনরাশি। উহা লাভের অঙ্ক। আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইলে হিসাবে যাহা থাকে, তাহা ফাজিল; তাহার নাম ঋণরাশি, উহা ক্ষতির অঙ্ক। একদিন দশ টাকা মজুত, পরদিন দশ টাকা ফাজিল হইলে, মোটের উপর লাভও থাকে না, ক্ষতিও হয় না। আর একদিন দশ টাকা মজুত, পরদিন সাত টাকা ফাজিল হইলে, মোটের উপর তিন টাকা মাত্র মজুত থাকে। পরের কাছে যাহা পাওনা, সেইটাই ধন; আর পরের কাছে যাহা দেনা,

তাহাই ঋণ। দেনা পাওনা সমান হইলে, ধন আর ঋণ সমান হয়, ফলে ধনও থাকে না, ঋণও থাকে না। ঋণ চেয়ে ধন বেশী হইলে, কিছু ধন অবশিষ্ট থাকে, আর ধন চেয়ে ঋণ বেশী হইলে, মোটের উপর ঋণই থাকে। কাজেই ধনের সহিত ঋণের বিপরীত সম্বন্ধ ; এ উহাকে নষ্ট করে।

কাল দশ ক্রোশ দক্ষিণে গিয়া আজ যদি দশ ক্রোশ উত্তরে আসি, তাহা হইলে যথাস্থানে পৌছিব, যাতায়াতের পরিশ্রমই সার হইবে ; যাওয়া না যাওয়া সমানই হইবে। দশ ক্রোশ দক্ষিণে গিয়া সাত ক্রোশ উত্তরে আসার ফলে তিন ক্রোশ দক্ষিণে যাওয়া সমান। কাজেই গণিত শাস্ত্রের ধনরাশির সহিত ঋণরাশির যে সম্বন্ধ, উত্তরে যাওয়ার সহিত দক্ষিণে যাওয়ার সেই সম্বন্ধ।

কাচের তড়িতের সহিত গালার তড়িতেরও সেইরূপ বিপরীত সম্বন্ধ। কাচের তড়িৎ স্বজাতীয় কাচের তড়িৎকে যদি দক্ষিণে ঠেলে, তবে বিজাতীয় গালার তড়িৎকে উত্তরে টানিবে। আবার গালার তড়িৎ গালার তড়িৎকে দক্ষিণে ঠেলিলে কাচের তড়িৎকে উত্তরে টানিবে। আবার কাচের তড়িৎ কাগজ টানে ; গালার তড়িৎও কাগজ টানে, কিন্তু উভয়ে একত্র অবস্থিত হইলে পরস্পরের ক্রিয়া নাশ করে। কাজেই গণিতজ্ঞের কাছে কাচের তড়িতের সঙ্গে গালার তড়িতের সম্পর্ক ধনরাশির সহিত ঋণরাশির সম্পর্কের সমান।

এই ব্যবহারভেদ দেখিয়া রেশমে ঘষিলে কাচে যে তড়িতের আবির্ভাব অনুমিত হয়, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে ধনতড়িৎ, আর পশমে ঘষিলে গালায় যে তড়িতের আবির্ভাব অনুমিত হয়, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে ঋণতড়িৎ। নাম দুইটা উল্টা পাল্টা করিলে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। পরে দেখা যাইবে, উল্টা পাল্টা করিলেই বরং ভাল হইবে। কিন্তু ঐ নামই পণ্ডিতেরা দিয়া ফেলিয়াছেন, আর নাম বদলান চলে না।

তড়িতের আবির্ভাব অনুমান মাত্র, উহার ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষগোচর বটে, কিন্তু যাহার আবির্ভাবে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ প্রত্যক্ষগোচর হয়, তাহা সম্পূর্ণ আনুমানিক বা কাল্পনিক পদার্থ। কিন্তু এই কল্পনা ব্যাপারে পণ্ডিতে পণ্ডিতে একটু মতভেদ আছে। তাহার উল্লেখের দরকার।

এক জন পণ্ডিত বলেন, বাস্তবিকই দুই রকমের তড়িৎ আছে, তাহাদের ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ। আর একজন বলেন, না, দুই রকমের তড়িৎ

কল্পনার দরকা`' নাই. এক রকমেরই তড়িৎ আছে ; তাহার বৃদ্ধি হইলে আমরা বলি ধনতড়িতের আবির্ভাব ; আর হ্রাস হইলে বলি ঋণতড়িতের আবির্ভাব।

যেমন একই টাকা পরের বাক্স হইতে নিজের বাক্সে আসিলে হয় ধন, আর নিজের বাক্স হইতে পরের বাক্সে গেলে হয় ঋণ, সেইরূপ একই তড়িৎ কাচে আসিলে উহাকে বলা যায় ধনতড়িৎ, আর গালা হইতে বাহির হইয়া গেলে বলা যায় ঋণতড়িৎ।

দুই দলের পণ্ডিত দুই রকম অনুমান করেন। কোন্‌টা গ্রহণ করিব ? যেটা ইচ্ছা, সেইটা গ্রহণ করা যাইতে পারে। কেন না, তড়িৎ পদার্থটাই অনুমান মাত্র, উহার ফলই প্রত্যক্ষগোচর। আর উভয় অনুমানে যদি একই ফল পাওয়া যায়, তবে উভয়ের মধ্যে যেটা ইচ্ছা, সেইটা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ধনের বৃদ্ধিতে যে ফল, ঋণের হ্রাসে সেই ফল, আবার ধনের হ্রাসে যে ফল, ঋণের বৃদ্ধিতেও সেই ফল। যেখানে আমরা ফল লইয়া কারবার করি, মূলের খোঁজ-খবরই রাখি না, সেখানে অকারণ গণ্ডগোলে কোন দরকারই নাই।

যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি মনে করুন, তড়িৎ দ্বিবিধ ; ধনতড়িৎ আর ঋণতড়িৎ। আর যাঁহার ইচ্ছা হয়, মনে করুন, তড়িৎ একবিধ, উহার বৃদ্ধি ধনতড়িৎ, ক্ষয় ঋণতড়িৎ, অথবা উহার আবির্ভাব ধনতড়িৎ, তিরোভাব ঋণতড়িৎ। গালায় ঋণতড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে বলিলে যে ফল, গালা হইতে খানিকটা ধনতড়িতের তিরোভাব হইয়াছে বলিলেও ঠিক সেই ফল।

যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, বলিতে পারেন, ঋণতড়িৎই তড়িৎ, অর্থাৎ পশমে ঘষিলে গালায় যে তড়িতের আবির্ভাব হয়, তাহাই তড়িৎ ; রেশমে কাচ ঘষিলে কাচে কোন তড়িতের আবির্ভাব হয় না, কাচ হইতে ঋণতড়িৎ বাহির হইয়া যায়, ফলে কাচে ধনতড়িতের আবির্ভাব অনুমান করি। পরে দেখা যাইবে, আজি কালি এই অনুমানটাই অনেকে সঙ্গত মনে করিতেছেন।

আমরা সম্প্রতি এই কথা-কাটাকাটি ছাড়িয়া দিয়া ধনতড়িৎ ও ঋণতড়িৎ উভয় শব্দই যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবহার করিব। তবে মনে করিতে হইবে, ধনতড়িতের আবির্ভাব ও ঋণতড়িতের তিরোভাব সমানই কথা ; আর

ধনতড়িতের দক্ষিণে গমন আর ঋণতড়িতের উত্তরে গমন, উভয়েরই সমান ফল ও সমান অর্থ। তামা হইতে দস্তায় ধনতড়িৎ চলিল বলিলে যে ফল, দস্তা হইতে তামায় ঋণতড়িৎ চলিল বলিলেও সেই ফল।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কাচের ধনতড়িৎ আসে কোথা হইতে? রেশমে ঘষিবার সময়ে উহার সৃষ্টি হয়, না অন্য কোন স্থান হইতে উহা স্থানান্তরিত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া চলে, এমন নহে। প্রকৃতই দেখা যায়, কাচে রেশমে ঘর্ষণের ফলে কাচে যেমন ধনতড়িতের আবির্ভাব হয়, রেশমেও সঙ্গে সঙ্গে ঋণতড়িতের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ কাচ আর ঐ রেশম উভয়কে একত্র আনিলে উহাদের লঘু বস্তু আকর্ষণের ক্ষমতা লোপ পায়। কাচের ধনতড়িতের মাত্রা রেশমের ঋণতড়িতের মাত্রায় ঠিক সমান দেখা যায়। ঠিক সমান না হইলে আকর্ষণের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে লোপ পাইত না—একটু-না-একটু থাকিয়া যাইত। দেনা-পাওনা দুই সমান হইলে দুইই সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়। সমান না হইলে হয় কিছু দেনা, কিংবা কিছু পাওনা দাঁড়ায়। এখানে আকর্ষণের সম্পূর্ণ লোপাপত্তি দেখিয়া বুঝিতে হইবে, কাচে ধনতড়িতের পরিমাণ রেশমে আবির্ভূত ঋণতড়িতের পরিমাণের ঠিক সমান।

রেশমে ঋণতড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে বলিলে যে ফল, ধনতড়িৎ রেশম হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে বলিলেও সেই ফল। অতএব এ স্থলে আমরা বলিতে পারি, খানিকটা ধনতড়িৎ রেশমের ভিতর হইতে বাহির হইয়া কাচে প্রবেশ করিয়াছে, অথবা খানিকটা ঋণতড়িৎ কাচ হইতে বাহির হইয়া রেশমে গিয়াছে। অর্থাৎ তড়িতের সৃষ্টি হয় নাই, তড়িৎ কেবল একটা দ্রব্য হইতে অন্য দ্রব্যে স্থানান্তরিত হইয়াছে মাত্র।

যাঁহারা দ্বিবিধ তড়িতের অস্তিত্ব অনুমান করেন, তাঁহারা বলিবেন, উভয় তড়িৎ সমান ভাগে মিশ্রিত অবস্থায় ছিল, কাজেই ঘর্ষণের পূর্ব্বে কাহারও অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় নাই। ঘর্ষণের ফলে উহারা বিশ্লিষ্ট হইয়া ধনটা গিয়াছে কাচে, আর ঋণটা গিয়াছে রেশমে, যতটা ধন কাচে গিয়াছে, ততটা ঋণ রেশমে গিয়াছে। ফলে কেবল ভাষার মার-প্যাঁচ। ও গোল না তোলাই ভাল। আসল কথাটা এই, কোন দ্রব্যে খানিকটা ধনতড়িতের আবির্ভাব দেখিলেই বুঝিতে হইবে, অন্য কোন দ্রব্যে ঠিক ততটা ধনতড়িতের তিরোভাব হইয়াছে, অথবা (ভিন্ন ভাষায়) ঠিক ততটা

ঋণতড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে। এই "ঠিক ততটা" কথাটাই মূল্যবান্। কেন না, যেখানেই তড়িতের আবির্ভাব দেখা গিয়াছে, ঐ "ঠিক ততটার" ব্যতিক্রম কোথাও দেখা যায় নাই। গালায় পশম ঘষিলে গালাতে যতটা ঋণতড়িতের আবির্ভাব হয়, পশমেও ঠিক ততটা ধনতড়িতের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে।

গালা আর পশম, কাচ আর রেশম কেবল উদাহরণ স্বরূপে লওয়া গিয়াছে মাত্র। ফলতঃ যে-কোন দুইটা দ্রব্য পরস্পর ঘর্ষণ করিলেই একটায় ধনতড়িতের আর অন্যটায় ঠিক ততটা ঋণতড়িতের আবির্ভাব দেখা যায়। দুইটা দ্রব্য বিভিন্ন প্রকৃতির হওয়া আবশ্যক ; কাচে কাচে বা গালায় গালায় ঘর্ষণে তড়িতের আবির্ভাব হয় না।

কাচ, গালা, গন্ধক, রবার প্রভৃতি দ্রব্যে পশম, রেশম, বিড়ালের চামড়া, বাঘের চামড়া প্রভৃতি যে-কোন দ্রব্য ঘষিলেই একটাতে ধনতড়িতের, একটায় ঋণতড়িতের আবির্ভাব দেখান খুব সহজ। কোন্ জিনিসটায় ধনের আর কোন্টায় ঋণের আবির্ভাব হইবে, তাহা অবশ্য পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়া লইতে হইবে। তড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে কি না, জানিবার সহজ উপায় একই ; এক টুকরা শোলাকে রেশমী সুতায় ঝুলাইয়া রাখ, উহার কাছে লইয়া গেলে যদি আকর্ষণ দেখা যায়, তবেই বুঝিব, তড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে। ধনের আবির্ভাব হইয়াছে, কি ঋণের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা কেবল আকর্ষণ দেখিলে বুঝা যাইবে না। সেখানে তুলনা আবশ্যক হইবে। রেশমে-ঘষা কাচের অথবা পশমে-ঘষা গালার সহিত মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, ধনতড়িতের, না ঋণতড়িতের বিকাশ হইয়াছে।

তবে সকল দ্রব্যে তড়িতের আবির্ভাব বুঝা সহজ নহে। ধাতু দ্রব্যে অন্য দ্রব্য ঘর্ষণ করিলে উহাতেও তড়িতের আবির্ভাব হয়, কিন্তু উহা সকল সময়ে টের পাওয়া যায় না। ধাতু দ্রব্য তড়িৎকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না। কাচ, গালা, রেশম, পশম প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য ধাতুনির্ম্মিত নহে, তাহারা আবির্ভূত তড়িৎকে আটকাইয়া রাখে। যে প্রদেশটাতে ঘর্ষণ হয়, তড়িৎটাও যেন সেই প্রদেশেই আবদ্ধ থাকে, অন্যত্র সরিয়া যায় না। আর ধাতু দ্রব্যের এক জায়গায় ঘষিলে সেই তড়িৎ তৎক্ষণাৎ অন্যত্র সরিয়া যায়, খুঁজিয়া তাহার সন্ধান পাওয়া দায়। ধাতু মাত্রেরই এই দোষ।

কোন দ্রব্য তড়িৎকে ধরিয়া রাখে, কোন দ্রব্য রাখে না, এই জন্য দ্রব্য মাত্রকে দুই থাকে ফেলা হয়। ধাতু দ্রব্যকে বলা হয় তড়িতের পরিচালক; তড়িৎ উহার ভিতর দিয়া অবাধে সঞ্চলন করে, উহা তড়িৎকে আটকায় না। আর কাচ, গালা, রবার, রেশম, পশম, গন্ধকের মত জিনিস অপরিচালক, উহারা তড়িৎকে পলাইতে দেয় না। আটকাইয়া রাখে।

মনুষ্যদেহ পরিচালক, মাটিও পরিচালক। ধাতু দ্রব্য হাতে ধরা থাকিলে, উহাতে আবির্ভূত তড়িৎ তৎক্ষণাৎ মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া ভূমিতে সঞ্চালিত হয়। বসুন্ধরায় প্রবেশ করিলে তখন আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কাজেই ধাতু দ্রব্যে তড়িতের আবির্ভাব দেখিতে হইলে উহাকে হাতে ধরিলে চলিবে না; কোন অপরিচালক দ্রব্যের সাহায্যে ধরিতে হইবে। রেশমের সুতায় ঝুলাও, অথবা কাচের হাতল বা গালার হাতল দিয়া ধর। টেবিলের উপর রাখা চলে না; কেন না, কাঠ পরিচালক, তবে টেবিলের পায়া যদি কাচের হয়, তবে চলিতে পারে। আবার সেই কাচের পায়াতে যদি ময়লা থাকে, কিংবা জল থাকে, তবে তাহারই আশ্রয়ে তড়িৎ পলাইয়া যাইবে। কেন না, ময়লা বা জল পরিচালক। বায়ু অপরিচালক, বাষ্পও অপরিচালক, কিন্তু বায়ুতে জলীয় বাষ্পের ভাগ অধিক থাকিলে, বাষ্প কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হইয়া তরল জলে পরিণত হইয়া কাচের গায়ে লগ্ন থাকিতে পারে; তড়িৎ পরিচালনার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

এই সকল কারণে ধাতু দ্রব্যে তড়িতের বিকাশ দেখাইতে হইলে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। কাচ গালা রবারের মত দ্রব্যের বেলায় তত হাঙ্গামার দরকার নাই। একখানা কাচের একদেশে তড়িৎ অবস্থান করিতে পারে; কিন্তু একটা পিতলের জিনিসের একদেশে অবস্থান করিবে না। কাচের খুঁটির উপর একটা পিতলের জিনিস বসাইয়া উহার কোন একদেশে তড়িতের আবির্ভাব করিবা মাত্র সেই তড়িৎটা উহার সর্ব্বদেশে ক্ষণমাত্রে ছড়াইয়া পড়ে। চারি দিকে বায়ু অপরিচালক; আধারস্বরূপ যে কাচের খুঁটি, তাহাও অপরিচালক, কাজেই পিতল ছাড়িয়া পলাইতে পারে না বটে, কিন্তু পিতলের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

"সর্ব্বত্র" বলিলে ঠিক হয় না। পিতলের যদি একটা বাটি লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, ঐ বাটির পিঠের সর্ব্বত্র তড়িৎ রহিয়াছে; কিন্তু

উহার পেটে তড়িৎ নাই। ফাঁপা বতুল লইলে সমস্ত তড়িৎটা পিঠের উপর ছড়াইয়া থাকে, ভিতরে এক কণিকাও থাকে না।

জলের উপর দুই ফোঁটা তেল ঢালিলে তেলটা যেমন জলের পিঠের উপরই ছড়াইয়া পড়ে, জলের ভিতরে কিছুতেই প্রবেশ করিতে চায় না; তড়িৎ—ধনই হউক আর ঋণই হউক, কিছুতেই ধাতু দ্রব্যের পিঠ ছাড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহে না।

পিঠের উপরেই থাকে; তাহাতেও আবার একটু বিশেষত্ব আছে; পিঠের যে স্থানটা উঁচু বা কুব্জাকৃতি, সেইখানটাতেই অধিক মাত্রায় থাকে, আর যে স্থানটা নীচু, খাল, গভীর, সেখানটায় হয় থাকে না বা খুব অল্প মাত্রায় থাকে।

পিতলের বতুলের পিঠ কুব্জ বটে; কিন্তু উহার কুব্জতা সর্ব্বত্র সমান, তাই বতুলের পিঠে সর্ব্বত্র সমান ভাবে ছড়াইয়া পড়ে; কিন্তু ঐ পিঠের উপর আবার উঁচু নীচু থাকিলে তখনই খানিকটা তড়িৎ নীচু স্থানটা হইতে সরিয়া গিয়া উঁচু ঢিপিটার উপর জমা হইবে।

পৃথিবী একটা বৃহৎ বতুল। উহার ব্যাস প্রায় আট হাজার মাইল। অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে চারি হাজার মাইল দূরে উহার পিঠ। পৃথিবী বতুলাকার বটে, কিন্তু উহার পিঠ বন্ধুর, উঁচু-নীচু। যেখানে পাহাড় পর্ব্বত, সেইখানটা উঁচু; হিমালয় পর্ব্বতেরই এক একটা চূড়া বাঙ্গালার জমি ছাড়িয়া চারি পাঁচ মাইল উঁচু। আবার পৃথিবীর পিঠে স্থানে স্থানে গভীর খাল; যেখানে খাল, সেইখানে জল দাঁড়াইয়া সমুদ্র হইয়াছে। বাঙ্গালার জমির দক্ষিণেই পৃথিবীর পিঠ হঠাৎ নামিয়া গিয়াছে। তাই সেখানে জল দাঁড়াইয়া বঙ্গসাগরের ও তাহার দক্ষিণে ভারতমহাসাগরের সৃষ্টি করিয়াছে। সমুদ্রের গভীরতা স্থানে স্থানে পাঁচ ছয় মাইলের অধিক। তাহা হইলে দেখা গেল যে, পৃথিবীরূপ কঠিন বৃহৎ বতুলের পিঠ কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু। আর জল উঁচু জায়গা ছাড়িয়া নীচু জায়গায় দাঁড়াইয়াছে ও সমুদ্রের উৎপত্তি করিয়াছে।

জলের স্বভাবই এই। হিমালয়ের উপরে বর্ষাকালে কত বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টির জল কিন্তু হিমালয়ের পিঠে দাঁড়ায় না। হিমালয় হইতে নামিয়া ভারতবর্ষ ধুইয়া গঙ্গাব্রহ্মপুত্ররূপে সেই সাগরের জলে গিয়া মেশে।

জলের স্বভাব এইরূপ, তড়িতের স্বভাব যেন তাহার উল্টা। বিধাতা এককালে পৃথিবী গড়িয়া তাহার পিঠে প্রচুর জল ঢালিয়াছিলেন, সমস্ত জলটা

পাহাড় পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া নিম্নে সাগরগর্ভে জমায়েত হইয়াছে। জল না ঢালিয়া যদি তড়িৎ ঢালিতেন, তাহা হইলে উল্টা ফল হইত। তড়িৎটা সমুদ্রের নিম্নভূমি ত্যাগ করিয়া পাহাড় পর্ব্বতে পড়িত ; আর পাহাড় পর্ব্বতের আবার যে জায়গাটা যত উঁচু, আর যত কুজো, আর যত ছুঁচলো, সেইখানে তত অধিক পরিমাণে জমিত।

সমুদ্র দূরে যাক, বাঙ্গালার এমন বিস্তীর্ণ মাঠ ছাড়িয়া অধিকাংশ তড়িৎ হিমালয়ে পড়িত ও হিমালয়ের আবার ধবলগিরি ও কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গের উপরই প্রচুর তড়িৎ মজুত হইত।

তড়িতের ব্যবহারটা বুঝিবার জন্য এই উপন্যাস। বস্তুতঃ তড়িতের সহিত জলের কোন মিল নাই। জল ইন্দ্রিয়গোচর তরল পদার্থ ; তড়িৎ কোন জড় পদার্থ কি না, তাহাই জানি না ; কোন বস্তু কি না, তাহাও সহসা বলিতে পারি না ; উহা একটা আনুমানিক পদার্থ মাত্র। বৈজ্ঞানিকেরা উহার অস্তিত্ব কল্পনা করেন বা অনুমান করেন ; লঘু দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ দেখিয়া অনুমান করেন ; আর যেখানে দেখেন, আকর্ষণের মাত্রা অধিক, সেখানে অনুমান করেন, তড়িতেরও মাত্রা অধিক। ব্যাপারটা নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা। তড়িৎ কাল্পনিক ; কিন্তু উহার ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষগোচর।

ফলে এই অনুমানলব্ধ তড়িৎনামা পদার্থ—লঘু পদার্থের প্রতি আকর্ষণ দেখিয়া যাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়, তাহা ধাতু দ্রব্যে আবির্ভূত হইলে উহার পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়ে, আর পিঠের উপর আবার যে স্থানটা যত কুজো, যত ছুঁচলো থাকে, সেই স্থানটা তত পছন্দ করে। ইহার ফলে এই হয় যে, তড়িতের প্রত্যক্ষ ফল যে আকর্ষণ, সেই আকর্ষণ সেই ধাতু দ্রব্যের ভিতরে একেবারে লোপ পায়।

ফাঁপা পিতলের বর্তুলকে তড়িন্ময় করিলে উহার ভিতরে আকর্ষণের চিহ্ন মাত্র পাওয়া যায় না : অথচ বর্তুলের বাহিরে সেই আকর্ষণ পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করে।

কিছু দিন আগে ইংরেজের দেশে মাইকেল ফারাডে নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন এক কালে বহি-বাঁধা দপ্তরী ; শেষে তিনি হইয়াছিলেন এক জন জগন্মান্য বৈজ্ঞানিক। আধুনিক তড়িদ্বিজ্ঞানের সমুদয় ভিত্তিটার তিনি একাকী প্রতিষ্ঠা করেন বলিলেও চলে। তাঁহার পূর্ব্বে তড়িৎঘটিত নানা কথা নানা লোকে আবিষ্কার করিয়াছিল। কিন্তু সে

সকল খাপছাড়া হইয়া ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ছিল মাত্র। পূর্ব্বগামীরা কতক ইটের সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন মাত্র। মাইকেল ফারাডে আরও পাকা শক্ত ইটের সংগ্রহ করেন ; স্বহস্তে মশলা তৈয়ার করিয়া ইটের উপর ইট গাঁথেন ও স্বহস্তে তড়িদ্বিজ্ঞানরূপ বিশাল অট্টালিকার নক্‌সা তৈয়ার করিয়া ভিত্তি গাঁথেন। পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা সেই দৃঢ় ভিত্তির উপর অট্টালিকা তুলিতেছেন মাত্র। যে ইংরেজের মধ্যে নিউটনের জন্ম, সেই ইংরেজের মধ্যেই ফারাডের জন্ম। ইংরেজ জাতিটা বড় ভাগ্যবান্।

সেই ফারাডে এক বৃহৎ খাঁচা তৈয়ার করিয়া তাহাকে টিনে মুড়িয়াছিলেন ও টিনে-মোড়া খাঁচাকে অপরিচালক আধারের উপর রাখিয়া উহাকে তড়িন্ময় করিয়াছিলেন। প্রচুর তড়িতের আবির্ভাবে সেই খাঁচার বাহিরে দাঁড়ান দুঃসাধ্য হইয়াছিল। ফারাডে নিজে সেই খাঁচার ভিতর প্রবেশ করিয়া তড়িতের কোন চিহ্নই টের পান নাই। তড়িতের আকর্ষণ ধরিবার জন্য নানা সূক্ষ্ম যন্ত্র লইয়াও আকর্ষণের কোন চিহ্ন পান নাই। কিরূপে পাইবেন ? তড়িৎটা খাঁচার পিঠে, অর্থাৎ বাহিরের গাত্রে এরূপ ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, ভিতরে তাহার আকর্ষণের একেবারে লোপ।

কতটা তড়িৎ কত দূরে থাকিলে কি মাত্রায় আকর্ষণ করিবে, তাহা হিসাব করিয়া বলা চলে।

এক জন ফরাসী পণ্ডিত ফারাডের বহু পূর্ব্বে সেই হিসাবের উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন। তড়িৎ যত দূরে থাকে, উহার আকর্ষণক্ষমতা তত কমে। দ্বিগুণ দূরে গেলে আকর্ষণ চারি ভাগের এক ভাগ হয়। নিয়মটা এইরূপ। হিসাবের নিয়মটা একবার বাহির হইলে, তখন গণিতজ্ঞ পণ্ডিতের হাতে পড়ে। গণিত শাস্ত্রের অব্যর্থ গণনায় বলা চলে, এখানে এতটা, ওখানে এতটা, সেখানে এতটা তড়িৎ যদি থাকে, তবে ঐখানে আকর্ষণের মাত্রা কত হইবে ?

ধাতু দ্রব্যের পিঠে তড়িৎ ছড়াইয়া থাকিলেও গণিতের হিসাবে উহার আকর্ষণ বাহিরেই বা কত, ভিতরেই বা কত, তাহা বলা চলে। গণিতজ্ঞ হিসাব করিয়া দেখাইয়া দেন যে, ধাতু দ্রব্যের পিঠে তড়িৎ এমন ভাবে ছড়াইয়া পড়ে যে, বাহিরে আকর্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু ভিতরে আকর্ষণ থাকেই না।

ভিতরে আকর্ষণ একেবারে লোপ পায় কিরূপে, বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। মনে কর, ফারাডে খাঁচার ভিতর দণ্ডায়মান এবং তিনি নিজেই

লঘু দ্রব্য। আচ্ছা, তিনি নিজে লঘু না হউন, তাঁহার রুমালখানা লঘু বটে। এখন সেই রুমালের উপর তড়িতের আকর্ষণ আছে কি না? তড়িৎ আছে খাঁচার সমস্ত পিঠে, রুমাল আছে খাঁচার ভিতরে। কাজেই তড়িৎ রহিল রুমালের ডাহিনে বামে, উপরে নীচে, সম্মুখে পশ্চাতে, সর্ব্বত্র। কেহ টানে ডাহিনে, কেহ বামে, কেহ সম্মুখে, কেহ পিছনে। চারি দিকের টানের ফলে সকল টানই কাটাকাটি হইয়া যায়। রুমালের উপর আর কোন টানই পড়ে না।

তড়িৎ যে ধাতু দ্রব্যের ভিতরে না থাকিয়া পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়ে ও পিঠের উপরেও আবার যেখানটা বেশী কুব্জ দেখে, সেইখানটায় স্তূপীভূত হয়, ইহারই ফলে ভিতরের আকর্ষণ একেবারে লোপ পায়। গণিতজ্ঞেরা ইহা হিসাব করিয়া দেখাইতে পারেন। তড়িতের যদি ঐরূপ প্রকৃতি না থাকিত, তাহা হইলে ধাতু দ্রব্যের অভ্যন্তরে আকর্ষণটা একেবারে লোপ পাইত না। কিছু না কিছু থাকিয়া যাইত।

ধাতু দ্রব্যেই অর্থাৎ পরিচালক দ্রব্যেই তড়িতের ঐরূপ ছড়াইয়া পড়িবার প্রকৃতি ও কুব্জ স্থানে স্তূপীভূত হইবার প্রকৃতি। অপরিচালক দ্রব্যে সে প্রকৃতি নাই। অপরিচালক দ্রব্যের তড়িৎ ভিতরেও থাকিতে পারে, বাহিরেও থাকিতে পারে। পিঠের উপরে ও আবার কুজো স্থানে স্তূপীভূত হইবার তেমন প্রকৃতি দেখা যায় না। ফলে অপরিচালক দ্রব্যে, কাচের বা গালার বা গন্ধকের কোন ফাঁপা জিনিসে তড়িৎ সঞ্চালন করিলে, উহার ভিতরেও যে আকর্ষণ লোপ পাইবে, তেমন কথা নাই। লোপ না পাইবারই কথা। পরিচালক ও অপরিচালকে এই একটা মৌলিক প্রভেদ।

অপরিচালকের যেখানে যতটা ইচ্ছা তড়িৎ রাখা চলে, ওখানে আমার কর্ত্তৃত্ব চলে। কিন্তু পরিচালকের উপর আমার কর্ত্তৃত্ব নাই। উহার কোন একখানে খানিকটা তড়িৎ প্রয়োগ মাত্র উহা নিজের স্বভাবানুসারে পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়ে ও এমন ভাবে ছড়াইয়া পড়ে, এমন ভাবে নিম্ন স্থান ত্যাগ করিয়া উচ্চ স্থানে উঠিয়া বসে যে, ভিতরে উহার আকর্ষণ টের পাওয়া যায় না। পরিচালকে তড়িতের ব্যবহার আর অপরিচালকে তড়িতের ব্যবহারে এই মৌলিক প্রভেদ। একটায় আমার কর্ত্তৃত্ব নাই, অন্যটা আমার ইচ্ছাধীন। যেন জল আর বালি। উঠানের উপর যেখানে যত ইচ্ছা আমি বালির স্তূপ রাখিতে পারি। কোথাও দশ হাত উঁচু, কোথাও দুই

হাত উঁচু, কোথাও বা কিছুই থাকিল না। কিন্তু জলের বেলায় আমার কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। উঠানের এক জায়গায় জলের ঢিপি বা স্তূপ গাঁথা আমার সাধ্য নহে। জল আপনার স্বভাবানুসারে উঠানে ছড়াইয়া পড়িবে। পরিচালক দ্রব্যের পিঠে তড়িৎ যেমন আপন স্বভাবানুসারে ছড়াইয়া পড়ে, জলও তেমনই উঠানের উপর আপন স্বভাবানুসারে ছড়াইয়া পড়ে। তবে তড়িতের স্বভাব হইতেছে ঢিপির উপর চড়া, আর জলের স্বভাব হইতেছে খালের ভিতর নামা। এই তফাৎ। পরিচালক পদার্থে তড়িতের এই স্বভাবদোষেই তড়িৎকে আটকান কঠিন। একটা পিতলের দ্রব্যে খানিকটা তড়িৎ সঞ্চিত আছে; আর একটা পিতলের দ্রব্য উহাতে স্পর্শ করিবা মাত্র কতকটা তড়িৎ তৎক্ষণাৎ এই দ্বিতীয় দ্রব্যে সঞ্চালিত হইবে ও উহার পিঠের উপর আপন স্বভাবানুযায়ী স্থান করিয়া লইবে।

পৃথিবীটা নিজে এক প্রকাণ্ড পরিচালক। পিতলের দ্রব্যটায় কিছু তড়িৎ সঞ্চিত করিয়া উহাকে ভূমি স্পর্শ করাইবা মাত্র সেই তড়িৎটা তৎক্ষণাৎ পৃথিবীতে চলিয়া যায় ও প্রকাণ্ড পৃথিবীর প্রকাণ্ড পিঠে ছড়াইয়া পড়ায় উহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়াই যায় না। ফলে তড়িৎটা নষ্ট হয় নাই বুঝিতে হইবে। উহা ছিল পিতলের বাটির পিঠে, এখন আছে ভূমণ্ডলের পিঠে। দুইটা পিতলের বাটি, একটায় কিছু তড়িৎ আছে, অন্যটায় কিছু নাই, অথবা দুইটাতেই কিছু কিছু আছে। দুইটা বাটি পরস্পর স্পর্শ ঘটিবা মাত্র সমুদয় তড়িৎটা দুইটার মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া যায়। উহারা বেশ পরামর্শ করিয়া সমস্ত তড়িৎটা উভয়ে বাঁটিয়া লয়। মোটের উপর যেটা বড়, সেটার ভাগেই বেশী পড়ে, যেটা ছোট, সেটার ভাগে কম পড়ে।

পৃথিবীর সঙ্গে বণ্টনের ব্যবস্থা হইলে পৃথিবীর ভাগে সিংহের ভাগ পড়ে। পৃথিবী এত বড় যে, প্রায় সমস্তটাই টানিয়া লয়; অন্য দ্রব্যের ভাগে যেটুকু থাকে, তাহা আর সূক্ষ্মতম যন্ত্রেও ধরা পড়ে না। কোন ধাতু দ্রব্যে সঞ্চিত তড়িৎ যদি একবারে খেদাইতে চাও, তাহার উপায় এই। উহাকে ভূমি স্পর্শ করাও। এ পর্য্যন্ত তড়িতের ব্যবহার এক রকম বুঝা গেল। দুইটা দ্রব্যের পরস্পর ঘর্ষণে দুই দ্রব্যেই তড়িতের আবির্ভাব ঘটে। একটায় যতটা ধনতড়িৎ, অন্যটায় ঠিক ততটা ঋণতড়িৎ আবির্ভূত হয়। লঘু দ্রব্যের আকর্ষণে উভয়ের অস্তিত্ব ধরা পড়ে; অথবা লঘু দ্রব্যের

আকর্ষণ হইতেছে দেখিয়াই আমরা তড়িতের আবির্ভাব অনুমান করি এবং আকর্ষণের মাত্রা দেখিয়া তড়িতেরও মাত্রা অনুমান করি। প্রবল আকর্ষণ দেখিলে মনে করি, অনেকটা তড়িৎ, ক্ষীণ আকর্ষণে মনে করি, অল্প তড়িৎ। দূরে গেলে সেই আকর্ষণের মাত্রা কমিতে দেখা যায়; দ্বিগুণ দূরে গেলে চারি ভাগ, তিনগুণ দূরে গেলে নয় ভাগ, এই নিয়মে কমিতে দেখা যায়। কাজেই কত দূরে থাকিয়া কতটা আকর্ষণ করিতেছে, তাহাই দেখিয়া তড়িতের মাত্রার অনুমান চলে।

এই তড়িৎকে ধাতু দ্রব্যের একদেশে আটকান চলে না। ধাতু দ্রব্যের ভিতরে ত উহা থাকেই না; পিঠের উপরও উচ্চ স্থান পছন্দ করিয়া লয়। এমন ভাবে ধাতু দ্রব্যের উপরে ছড়াইয়া পড়ে যে, ভিতরে মোটের উপর আকর্ষণ থাকে না, বাহিরে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। দুইটা ধাতু দ্রব্য পরস্পর সংলগ্ন থাকিলে একটার তড়িতের কিয়দংশ অন্যটায় যায়; দুইটার মধ্যে বাঁটাবাঁটি হইয়া যায়; বড়টার ভাগে বেশী পড়ে। অপরিচালক দ্রব্যে তড়িতের এরূপ প্রকৃতি নাই। উহার যে-কোন স্থানে যতটা ইচ্ছা, তড়িৎ সঞ্চিত রাখা চলে। ফলে উহার ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র তড়িতের আকর্ষণ-ফল দেখা যায়। এক স্থানে সঞ্চিত তড়িৎ অন্যত্র যাইতে চাহে না। কাজেই অপরিচালকে তড়িৎ ধরিয়া রাখা সহজ। পরিচালকে তড়িৎ সঞ্চিত রাখিতে হইলে উহাকে অপরিচালক আধারে রাখিতে হইবে; নতুবা পৃথিবীতে সঞ্চালিত হইলে পৃথিবীর ভাগেই সমস্তটা যাইবে; কিছুই অবশেষ থাকিবে না।

এ পর্য্যন্ত বেশ। এখন একটা নূতন কথার অবতারণা আবশ্যক। মনে কর, একটা রেশমে-ঘষা কাচে খানিকটা তড়িৎ সঞ্চিত আছে। বলা বাহুল্য, সেই তড়িৎটা ধনতড়িৎ। অবশ্য উহা অপরিচালক আধারের উপর অবস্থিত, নতুবা পলাইয়া যাইত। উহার সম্মুখে হাতখানেক দূরে পিতলের একটা গোলা রাখিলাম; উহাকেও অপরিচালক আধারে রাখা গেল। বলা বাহুল্য, ঐ গোলায় কণিকামাত্র তড়িৎ ছিল না; ধনও না, ঋণও না। কিন্তু ঐ ধনতড়িতের সম্মুখে রাখিবা মাত্র ঐ গোলার পিঠে তড়িতের আবির্ভাব হইবে। যে পিঠটা কাচে সঞ্চিত ধনতড়িতের সম্মুখে ও নিকটে, সেই পিঠে হইবে ঋণতড়িতের আবির্ভাব, আর যে পিঠ দূরে, সেই পিঠে হইবে ধনতড়িতের আবির্ভাব। খানিকটা ধনতড়িৎকে কে যেন

ঠেলিয়া পিতলের গোলার ও-পিঠে—দূরের পিঠে সঞ্চারিত করিয়াছে। এ-পিঠে তাই ঠিক ততটা ধনতড়িতের অভাব হইয়াছে, অর্থাৎ ঋণতড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, ধনতড়িতের অভাব আর ঋণতড়িতের আবির্ভাব একই কথা। কে এরূপ ঠেলা দিল? অবশ্য ঐ কাচে সঞ্চিত ধনতড়িতেরই এই কর্ম্ম। ঐ কাচের সহিত পিতলের গোলার কোন যোগ নাই। মাঝে বায়ুর ব্যবধান; সেই বায়ু অপরিচালক। অথচ সেই বায়ুরাশির ব্যবধান ভেদ করিয়া কাচের ধনতড়িৎ খানিকটা ধনতড়িৎকে দূরে ঠেলিয়া গোলার এ-ধার হইতে ও-ধার লইয়া গিয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে, গোলার এ-পিঠে ঋণতড়িৎ, ও-পিঠে ধনতড়িৎ। যতটা ঋণ, ঠিক ততটা ধন। এখন যদি গোলাটা ছুঁইয়া ফেলি, অমনই উহার ধনতড়িৎটা আমার দেহমধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়া পৃথিবীর পিঠে ছড়াইয়া পড়িবে। গোলায় থাকিবে কেবল খানিকটা ঋণতড়িৎ।

গোলাটায় প্রথমে কণিকামাত্র তড়িৎ ছিল না। ধনতড়িতের সম্মুখে রাখিবা মাত্র এক পিঠে ঋণ, অন্য পিঠে ধনতড়িতের বিকাশ হইল। উভয়ের মাত্রা কিন্তু সমান। যতটা ঋণ, ততটা ধন, মোটের উপর ফল শূন্য। পূর্ব্বেও ছিল শূন্য, এখনও শূন্য। কিন্তু ভূমিস্পর্শের পর আর শূন্য নাই। তখন খানিকটা ঋণতড়িৎ মাত্র অবশিষ্ট। ধনতড়িৎ খানিকটা যখন বাহির হইয়া গিয়াছে, তখন ঋণতড়িৎ থাকিবে বৈ আর কি? হাতে যেখানে এক কড়ি সম্বল নাই, তখন খয়রাৎ করিতে হইলে ঋণ উপার্জ্জন ভিন্ন উপায় কি? গোলার সম্বল ছিল মোটের উপর শূন্য; বাহিরে গেল ধন, হাতে থাকিল ঋণ।

কোন ধাতু দ্রব্যে ঋণতড়িৎ সঞ্চয়ের এই সহজ উপায়। ধনতড়িৎ সঞ্চয়ের উপায় ঠিক তাহার উল্টা। এ ক্ষেত্রে সেই ধাতু দ্রব্যকে ঋণতড়িতের সম্মুখে স্থাপিত করিতে হইবে। পশমে-ঘষা গালার সম্মুখে অপরিচালক আধারের উপর রাখিতে হইবে। গালায় এবার আছে ঋণতড়িৎ। সেই ঋণতড়িৎ বায়ুর ব্যবধান সত্ত্বেও গোলার এ-পিঠ হইতে খানিকটা ঋণতড়িৎকে ঠেলিয়া ও-পিঠে লইয়া যাইবে। এ-পিঠে খানিকটা ঋণতড়িতের অভাব অর্থাৎ ঠিক ততটা ধনতড়িতের আবির্ভাব হইবে। এখন ভূমিস্পর্শ মাত্রে ঋণতড়িৎটা পৃথিবীতে চলিয়া যাইবে। গোলায় থাকিবে কেবল ধন ঋণ-মোচনের ফল ধনবৃদ্ধি। পিতলের গোলায় ধনতড়িৎ সঞ্চিত হইল।

ধাতু দ্রব্যে ধনতড়িৎ বা ঋণতড়িৎ এইরূপে সহজে সঞ্চিত করা চলে। তড়িৎ সঞ্চয়ের এই উপায় নানা কাজে লাগান চলে। ঘর্ষণ দ্বারা অপরিচালক দ্রব্যে তড়িৎ সঞ্চয়ে সুবিধা আছে। কিন্তু ধাতু দ্রব্যে ঘর্ষণে সুবিধা হয় না। ঘর্ষণ করিতে গেলেই হস্তস্পর্শের আশঙ্কা থাকে, আর হস্তস্পর্শ মাত্রেই ভূমিতলে অন্তর্দ্ধানের আশঙ্কা। কিন্তু এই নূতন উপায়ে যে-কোন ধাতু-দ্রব্যে যে-কোন তড়িৎ সঞ্চয় করা যায়। অপরিচালক আধারের উপর রেশমে-ঘষা কাচের বা পশমে-ঘষা গালার সম্মুখে রাখিয়া স্পর্শ করিলেই দেখা যাইবে, হয় ঋণ কিংবা ধনতড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে। স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা ধনতড়িৎ পলাইয়া ঋণ রাখিয়া গিয়াছে, অথবা ঋণ অপসৃত হইয়া ধন রাখিয়া গিয়াছে। এখন যাহা সঞ্চিত আছে, তাহা আর সহজে পলাইবে না। এখন দশ দণ্ড কাল ছুঁইয়া থাকিলেও পলাইবে না। তবে যাহার বলে আছে, সেই রেশম-ঘষা কাচ অথবা পশম-ঘষা গালা যদি অপসৃত করি, তখন আর উহাকে রাখা চলিবে না। ছুঁইবা মাত্র অন্তর্দ্ধান করিবে।

ইহাতে তড়িতের ব্যবহারে একটু রহস্য পাওয়া গেল। ধনতড়িৎ দূরে থাকিয়াও ধনতড়িৎকে ঠেলিয়া আরও দূরে প্রেরণ করিতে চায়, আর ঋণতড়িৎকে টানিয়া কাছে রাখিতে চায়। ঋণতড়িৎ সেইরূপ ঋণতড়িৎকে দূরে ঠেলিতে চায় ও ধনতড়িৎকে কাছে রাখিতে চায়। উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধই এইরূপ।

উভয়ের এই স্বভাব। এই স্বভাবের ফলই ধনে ধনে বিকর্ষণ, ঋণে ঋণে বিকর্ষণ, আর ধনে ঋণে আকর্ষণ। এই স্বভাবের ফলে যে সকল কাণ্ড ঘটে, তাহার আর দুই একটা উদাহরণ দিব।

মনে কর, একটা টিনের বাক্স অপরিচালক টেবিলের উপর আছে। একটা পয়সায় ধনতড়িৎ সঞ্চয় করিয়া রেশমী সুতা দিয়া বাক্সের ভিতর ঝুলাইয়া দিলাম। পয়সায় যতটুকু ধনতড়িৎ আছে, ঠিক ততটুকু ধনতড়িৎ বাক্সের বাহিরের পিঠে আবির্ভূত হইবে, আর ঠিক ততটুকু ঋণতড়িৎ উহার ভিতরের পিঠে আবির্ভূত হইবে। অর্থাৎ পয়সায় সঞ্চিত ধনতড়িৎ আপন সমান মাত্রার ধনতড়িৎকে বাক্সের ভিতর হইতে ঠেলিয়া বাহিরের পিঠে চালাইয়া দিবে। বাক্সের ভিতরে হইবে ধনের অভাব বা ঋণের সঞ্চার, আর বাহিরে হইবে ধনের সঞ্চার। এখন ঐ বাক্স ছুঁইবা মাত্র, বাহিরের ধনটা ভূগামী হইবে। বাহিরে কিছুই থাকিবে না। কেবল ভিতরের পিঠে

থাকিবে ঋণতড়িৎ। পয়সার ধন যেন তাহাকে টানিয়া রাখিয়াছে। এখন পয়সাটি বাহির করিয়া দূরে সরাও—বাক্সের ভিতর-পিঠের ঋণতড়িৎ অমনই বাহির হইয়া বাহিরের পিঠে আসিবে। বাক্সটা পরিচালক পদার্থ। তড়িৎ উহার ভিতরে থাকিতে চাহে না, বাহিরের পিঠেই থাকিতে চাহে। তবে ভিতরে পয়সাটি ছিল ও ঐ পয়সাতে ধনতড়িৎ ছিল। সেই ধনতড়িতের খাতিরে উহা বাক্সের ভিতর-পিঠে আটকান ছিল। পয়সা অপসৃত হইবা মাত্র উহা নিজের স্বভাববশে বাহিরে চলিয়া আসিল।

আর একটা উদাহরণ। একখানা পিতলের থালায় ধনতড়িৎ সঞ্চিত করিয়া অপরিচালক আধারে রাখ। উহার সম্মুখে আর একখানি থালা আর একটা অপরিচালক আধারে রাখ। দ্বিতীয় থালায় কণিকামাত্র তড়িৎ ছিল না; কিন্তু প্রথম থালার সম্মুখে রাখিবা মাত্র উহার এ-পিঠে ঋণ আর ও-পিঠে ধনতড়িতের আবির্ভাব হইবে। সম্মুখের পিঠে ঋণ ও পশ্চাতের পিঠে ধনের আবির্ভাব হইবে। ছুঁইবা মাত্র ধনটা ভূগামী হইবে। থাকিবে কেবল এ-পিঠে ঋণতড়িৎ।

এখন কি দেখিতেছি? দুইখানা থালা সামনাসামনি অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে অপরিচালক বায়ুর ব্যবধান। একের পিঠে আছে খানিকটা ধনতড়িৎ, অন্যের পিঠে আছে খানিকটা ঋণতড়িৎ। এ-থালার ধনতড়িৎ ও-থালার ঋণতড়িৎকে সম্মুখে আটকাইয়া রাখিয়া অবস্থিত আছে। ঐ ঋণতড়িৎ যতক্ষণ ইচ্ছা আটকান থাকিবে; ছুঁইলেও পলাইবে না।

মাঝে আছে বায়ুর ব্যবধান। বায়ুর ব্যবধান না থাকিয়া কাচের বা গন্ধকের বা অন্য পরিচালক পদার্থের ব্যবধান থাকিলেও ঐরূপই ঘটিত। এ-থালার ধনতড়িৎ বায়ুর ব্যবধান সত্ত্বেও ও-থালার ঋণতড়িৎকে আটকাইয়া রাখে। কেবল যে আটকাইয়া রাখে, তাহা নহে; রীতিমত সবলে আকর্ষণ করে। ফলে এ-থালা ও-থালার নিকটে যাইতে চায়। এই আকর্ষণের বল নিতান্ত সামান্য নহে। উহা মাপিয়া দেখান চলে।

একটা নিক্তির এক পাল্লায় রেশমের সুতা দিয়া একখানি পিতলের রেকাবি ঝুলাও, উহাতে ধনতড়িৎ মজুত আছে। অন্য পাল্লায় বাটখারা দিয়া নিক্তির দাঁড়ি সমান দেখিয়া লও; রেকাবির ওজন বাটখারার ওজনের সমান। এখন ঐ রেকাবির নীচে আর একখানি রেকাবি ধর। ধরিবা মাত্র উহাতে ঋণতড়িতের আবির্ভাব হইবে। উপরের রেকাবির নীচের পিঠে

আছে ধন, আর নীচের রেকাবির উপরের পিঠে আছে ঋণ। মাঝে বায়ুর ব্যবধান। বায়ুর ব্যবধান সত্ত্বেও নীচের রেকাবি উপরের রেকাবিকে সবলে নিম্নমুখে টানিবে। ফলে নিক্তির দাঁড়ি অসমান হইবে। আবার বাটখারা চড়াইয়া দাঁড়ি সমান করা হইলে বুঝা যাইবে, উভয় রেকাবির আকর্ষণবল কতটা ওজনের সমান।

মধ্যে বায়ুর ব্যবধান থাকিলে ঐরূপ আকর্ষণের জোর ধরিতে ও মাপিতে পারা যায়। কাচের ব্যবধান থাকিলে অবশ্য ঐরূপে মাপা চলে না। একখানা কাচের দুই পিঠে টিন মুড়িয়া এক পিঠের টিনে ধনতড়িৎ সঞ্চয় করিলে অন্য পিঠে ভূমিস্পর্শ মাত্রেই ঋণতড়িতের আবির্ভাব হয়। কাচের এ-পিঠে থাকে ধন, ও-পিঠে থাকে ঋণ। এ-পিঠের টিন ও-পিঠের টিনকে আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু এখানে ত আর বায়ুর ব্যবধান নাই, কঠিন কাচের ব্যবধান। কাজেই কাচ ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। তবে এ-পিঠে ধন ও-পিঠে ঋণ সামনাসামনি আটকান থাকে মাত্র।

একটা বোতলের বাহিরে ও ভিতরে টিনের পাত বসাইয়া ভিতরে ধনতড়িৎ সঞ্চিত করিলে বাহিরে ঋণতড়িতের ও ভিতরে ঋণতড়িৎ সঞ্চিত করিলে বাহিরে ধনতড়িতের আবির্ভাব হয়। অবশ্য আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাহিরের পিঠের ভূমিস্পর্শ আবশ্যক।

ঐরূপ বোতলে তড়িৎ সঞ্চয় করিয়া রাখা খুব সুবিধা। এক পিঠের টিনে ধনতড়িৎ, অন্য পিঠের টিনে ঋণতড়িৎকে আটকাইয়া রাখে। মাঝের কাচের ব্যবধান সত্ত্বেও আটকাইয়া রাখে। এই রকম বোতলের নাম লীডেন জার। লীডেন জারের মালা সাজাইয়া প্রচুর তড়িৎ সঞ্চয় করিয়া রাখা চলে। আর উদাহরণ আবশ্যক নহে। পরিচালক ধাতু দ্রব্যে তড়িৎ সঞ্চয়ের উপায় বলা গেল। ধাতু দ্রব্যকে অন্য দ্রব্যে সঞ্চিত তড়িতের সম্মুখে রাখিয়া ভূমিস্পর্শ করাইলেই উহাতে তড়িতের আবির্ভাব হইবে। সম্মুখে ধনতড়িৎ থাকিলে ঋণতড়িতের, আব ঋণতড়িৎ থাকিলে ধনতড়িতের আবির্ভাব হইবে। এবং যত ক্ষণ সম্মুখের সেই তড়িৎ উপস্থিত থাকিবে, তত ক্ষণ এই নবাবির্ভূত তড়িৎ আটকান বা আবদ্ধ থাকিবে। সেই সম্মুখের তড়িৎ অপসৃত হইলে অবশ্য আর আবদ্ধ রাখা চলিবে না। তখন অপরিচালক আধারে না রাখিলে অন্তর্দ্ধানের সম্ভাবনা। কিন্তু ওখানে ধনতড়িৎ সম্মুখে থাকিলে এখানে ঋণ, আর ওখানে ঋণতড়িৎ সম্মুখে থাকিলে

এখানে ধন আবদ্ধ থাকিবে। মাঝে বায়ুর ব্যবধানই থাক আর কাচের ব্যবধানই থাক। ধনের ইচ্ছা ঋণের কাছে যাই, ঋণেরও ইচ্ছা ধনের কাছে যাই। কিন্তু মাঝের অপরিচালক ব্যবধান ভেদ করিয়া যাইতে পাবে না। কেবল সামনাসামনি পরস্পরকে চোখের উপর রাখিয়া বাঁধিয়া রাখে মাত্র। কাচের বোতলের দুই পিঠে টিন মুড়িয়া এক পিঠে ধন ও অন্য পিঠে ঋণতড়িৎ সঞ্চয় রাখার খুব সুবিধা ; তাই এই তড়িৎ সঞ্চয়ের জন্য ঐরূপ কাচের বোতল বা বোতলের মালা সাজান থাকে। ঐ বোতলের ইংরেজী নাম লীডেন জার। এখন এই লীডেন জার অবলম্বনে কয়েকটা নূতন কথার অবতারণা হইবে।

তড়িৎপ্রবাহ

লীডেন জারের এক পিঠে ধন, অন্য পিঠে ঋণতড়িৎ সঞ্চিত আছে। এমন সময়ে যদি একগাছা সুতা জলে ভিজাইয়া দুই পিঠ ঐ সুতাদ্বারা ছুঁইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে একটা নূতন ঘটনা ঘটে। এ-পিঠের ধনতড়িৎ সুতার ভিতর দিয়া ও-পিঠে যায়। ও-পিঠে ঋণতড়িৎ ছিল ; অর্থাৎ ধনতড়িতের অভাব ছিল। এখন এ-পিঠের ধনতড়িৎ ও-পিঠে যাওয়ায় সেই অভাব পূর্ণ হয়, তখন আর ধনতড়িতের অভাব থাকে না, অর্থাৎ ঋণতড়িৎ লুপ্ত হয়। ইহার শেষ ফল এ-পিঠের ও-পিঠের দুই পিঠের তড়িতের লোপ। উঠানের এক ধারে মাটি খুঁড়িয়া সেই মাটি উঠানের অন্যত্র ফেলিলে এক জায়গায় মাটির আধিক্যে একটা ঢিপি, অন্য জায়গায় মাটির অল্পতাবশে একটা গর্ত্ত হয়। সুতা দিয়া লীডেন জারের দুই পিঠ সংলগ্ন করিবার পূর্ব্বে এক পিঠে তড়িতের আধিক্য আর অন্য পিঠে তড়িতের অল্পতা ছিল, আবার সেই ঢিপির মাটি তুলিয়া গর্ত্তে ফেলিলে যেমন উঠানের বন্ধুরতা দূর হয়, ঢিপিরও লোপ হয়, গর্ত্তেরও লোপ হয়, সুতা-সংযোগে এ-ধারের তড়িৎ ও-ধারে যাওয়ায় সেইরূপ দুই ধারের তড়িতেরই লোপ ; এ-ধারে তড়িতের আধিক্য (ধনতড়িৎ) আর ওধারে তড়িতের অল্পতা (ঋণতড়িৎ) দুই লোপ পায়। সুতাগাছটা লম্বা আর সরু হইলে ধনতড়িতের এ-পিঠ হইতে ও-পিঠ যাইতে একটু সময় লাগে। সে সময় এত অল্প যে, মাপা কঠিন ; তবে মাপিবার জন্য সূক্ষ্ম কৌশল উদ্ভাবন করিলে সময় মাপা যায় না, এমন নহে ; শুকনা সুতা অপরিচালক, ভিজা সুতা

পরিচালক, তবে উহার পরিচালনক্ষমতা খুব অল্প, সেই জন্যই একটু সময় লাগে। পরিচালকতা বেশী হইলে ঘটনাটা অন্যরূপ হইত। কোন পরিচালক দ্রব্য আশ্রয় করিয়া তড়িতের এইরূপ সঞ্চলন ব্যাপারকে তড়িৎ-প্রবাহ বলে। আগে বলিয়াছি, ধনতড়িৎ ঋণতড়িতের কাছে যাইতে চায়—উহার স্বভাবই এই। লীডেন জারের এ-পিঠের ধনতড়িতের চেষ্টা ও-পিঠে ঋণতড়িতের কাছে যাইবার জন্য। মাঝে অপরিচালক কাচের ব্যবধান থাকাতেই যাইতে পারিতেছিল না। এখন পরিচালক সুতার আশ্রয় পাইবা মাত্র উহা ঋণতড়িতের কাছে গিয়া সেখানকার তড়িতের অভাব পূরণ করিল। ফলে সুতার ভিতরে তড়িতের স্রোত বা প্রবাহ জন্মিল। জল যেমন উঁচু জায়গা হইতে নীচু জায়গায় চলিলে উহাতে প্রবাহ বা স্রোত জন্মে, সেইরূপ তড়িৎ এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় গেলে তড়িতের প্রবাহ জন্মে। এই তড়িৎপ্রবাহের কতকগুলি অদ্ভুত গুণ আছে। তড়িৎ পদার্থটা আনুমানিক ; উহা প্রত্যক্ষগোচর নহে। উহার প্রবাহও প্রত্যক্ষ-গোচরও নহে। কিন্তু তড়িৎপ্রবাহের আনুষঙ্গিক ফলগুলি প্রত্যক্ষগোচর। সেই ফল দেখিয়া আমরা তড়িৎপ্রবাহের অস্তিত্ব অনুমান করি। সেই ফল কি, তাহা বলিতেছি।

প্রথম ফল এই যে, প্রবাহ চলিবার সময় সুতাগাছটি একটু গরম হয় ; উহাতে কিঞ্চিৎ উত্তাপ জন্মে। দ্বিতীয় ফল এই যে, ঐ সুতার নিকটে একটা চুম্বকের কাঁটা থাকিলে সেই কাঁটাতে একটা ধাক্কা লাগে। তৃতীয় ফল এই যে, ঐ সুতার মাঝখানটা কাঁচি দিয়া কাটিয়া অম্লাক্ত জলে সুতার দুই প্রান্ত ডুবাইলে সেই জলটা বিশ্লিষ্ট হইয়া এক প্রান্তে উদযান, অন্য প্রান্তে অম্লযান মরুতের আবির্ভাব হয়।

তড়িৎপ্রবাহের ফল এই তিনটি। প্রথম, উহা উত্তাপ জন্মায় ; দ্বিতীয়, উহা চুম্বকের কাঁটাতে ধাক্কা দেয় ; তৃতীয়, উহা জলকে বিশ্লিষ্ট করে। তড়িৎপ্রবাহের এই তিন ফল ; স্থির তড়িতের এরূপ কোন গুণ নাই। ধনতড়িৎ বা ঋণতড়িৎ যতক্ষণ লীডেন জারের পিঠে স্থির ভাবে অবস্থিত ছিল, ততক্ষণ উহাদের ওরূপ গুণের কোন নিদর্শন ছিল না। পরিচালক পদার্থের ভিতর চলিবার সময় ঐ তিন গুণের বিকাশ দেখা যায়। আবার প্রবাহ থামিয়া গেলে আর কোন চিহ্ন থাকে না।

লীডেন জারের দুই পিঠের তড়িৎ ভিজা সুতা দ্বারা সংলগ্ন করিলে তড়িৎপ্রবাহ জন্মে। লীডেন জারেরই প্রয়োজন কি? কোন দুইটা ধাতু দ্রব্যে তড়িৎ সঞ্চিত করিয়া উহাদিগকে ঐরূপ ভিজা সুতা দিয়া সংলগ্ন করিলে একটার কিয়দংশ তড়িৎ অন্যটায় যায়। দুইটা দ্রব্য সমস্ত তড়িৎ বণ্টন করিয়া লয়। বণ্টনকালে এটার খানিকটা তড়িৎ—সমস্তটা নহে, ওটায় যায়—সুতা বাহিয়া যায়। সুতায় তখন তড়িৎপ্রবাহ জন্মে; এবং সেই তড়িৎপ্রবাহের ঐ তিন গুণ।

তবে এরূপ ক্ষেত্রে তড়িৎপ্রবাহ ক্ষণস্থায়ী; তড়িতের পরিমাণও খুব বেশী নহে। ঐ প্রবাহ এত অল্প ক্ষণ থাকে ও সেই অল্প ক্ষণে প্রবাহিত তড়িতের পরিমাণও এত অল্প যে, তাহাতে যে উত্তাপ জন্মে, সে উত্তাপ অনুভব করাই কঠিন। তাহাতে জলের যে বিশ্লেষণ ঘটে, সে বিশ্লেষণের প্রমাণ পাওয়াই কঠিন। প্রচুর উত্তাপ জন্মাইতে হইলে বা প্রচুর পরিমাণ জল বিশ্লেষণ দেখাইতে হইলে অথবা চুম্বকের কাঁটাকে ধাক্কা দিয়া অধিক ক্ষণ স্থানভ্রষ্ট অবস্থায় রাখিতে হইলে এমন প্রবাহ উৎপাদন করিতে হইবে, যাহা বহুক্ষণস্থায়ী হয়, এবং যাহাতে প্রচুর পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত হয়। লীডেন জারের মালা সাজাইয়াও সে পরিমাণ তড়িৎ পাওয়া যায় না। এইরূপ স্থায়ী তড়িৎপ্রবাহ উৎপাদনের জন্য অন্যরূপ বন্দোবস্ত আছে। সে কথা পরে বলিব।

লীডেন জারের দুই পিঠে ভিজা সুতা সংলগ্ন করিলে, সুতার মধ্যে অল্পক্ষণস্থায়ী প্রবাহ জন্মে। ধনতড়িৎ এ-পিঠ হইতে ও-পিঠে যায়; অথবা ঋণতড়িৎ ও-পিঠ হইতে এ-পিঠে আসে বলিলেও সেই ফল। কেন না, ধনতড়িতের দক্ষিণে যাওয়া ও ঋণতড়িতের উত্তরে যাওয়ার একই অর্থ। একই অর্থ—কেন না, ফলে সমান। আর প্রত্যক্ষের অগোচর তড়িৎ পদার্থের আমরা কেবল ফলটাই দেখি। সে যাক—ভিজা সুতার মধ্যে প্রবাহ জন্মে, তাহা চুম্বকের ধাক্কায় বা উত্তাপের আবির্ভাবে বুঝা যায়। ভিজা সুতা পরিচালক বলিয়াই উহার মধ্য দিয়া তড়িৎ চলে বা তড়িতের প্রবাহ চলে। তামার তারের পরিচালকতা আরও বেশী। তামার তার দিয়া দুই পিঠ যোগ করিলে উহাতে প্রবাহ হয় কি না?

ইহার উত্তর যে, প্রবাহ হয় বটে, কিন্তু সে প্রবাহটা একটা অদ্ভুত গোছের। মনে কর, লীডেন জারের অর্থাৎ ভিতরে বাহিরে টিনে মোড়া

বোতলের ভিতর-পিঠে ধন আর বাহির-পিঠে ঋণতড়িৎ আছে। ভিজা সুতায় দুই পিঠ যোগ করিলে ভিতরের ধনতড়িৎ সুতা বাহিয়া বাহিরে আসিবে। কাজেই ধনতড়িতের প্রবাহ হইবে ভিতর হইতে বাহিরে, আর তাহার ফল হইবে, ভিতর বাহির উভয়ত্র তড়িতের লোপাপত্তি। ভিজা সুতার বদলে তামার তার দিয়া যোগ করিলে প্রবাহ হয়, কিন্তু সে অদ্ভুত প্রবাহ। ধনতড়িৎ প্রথমটায় ভিতর হইতে বাহিরে আসে, কিন্তু আসিয়াই থামে না। আবার উল্টামুখে চলিয়া বাহির হইতে ভিতরে যায়। আবার ভিতর হইতে বাহির, আবার বাহির হইতে ভিতর। এইরূপে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে থাকে। ভিজা সুতার বেলায় ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়াই থামিয়া যায়। কিন্তু তামার তারের বেলায় বাহিরে যায়, আবার ফিরিয়া আসে, আবার যায়, আবার আসে, এইরূপে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে থাকে। দুই দশ বার নহে; দুই লাখ দশ লাখ বার গতায়াত করিয়া শেষ পর্য্যন্ত থামিয়া যায়। যখন থামে, তখন আর বাহিরে ভিতরে কোথাও আর কোন তড়িতের চিহ্ন পাওয়া যায় না। কিন্তু থামিবার পূর্ব্বে লাখ বার গতায়াত করিয়া তবে থামে। এই গতায়াতে সময় লাগে কতটুকু! নিমেষ মধ্যে এই গতায়াত সমাপ্ত হইয়া যায়। চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে তড়িতের বহু সহস্র বা বহু লক্ষ বার গতায়াত সমাপ্ত হয়। তামার তার আনিবার পূর্ব্বে এক পিঠে ছিল ধনতড়িৎ, অন্য পিঠে ছিল ঋণতড়িৎ। আর তামার তার আনিয়া দুই পিঠে যোগ করিয়া চোখের পলক না ফেলিতেই দুই পিঠের তড়িতের তিরোভাব হইয়াছে, ইহা দেখান সহজ। কিন্তু সেই পলকের মধ্যে যে ধনতড়িৎ লাখ বার তারের মধ্যে দিয়া একবার এদিক্, একবার ওদিক্ যাতায়াত করিল, ইহা শুনিতে হেঁয়ালির মত লাগে; বিশ্বাস করাই কঠিন; প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখানই কঠিন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ দুঃসাধ্য বলিয়া এত কাল এই ব্যাপার বৈজ্ঞানিকদের অজ্ঞাত ছিল। তামার তার দিয়া তড়িতের প্রবাহ চলে, তাহা বৈজ্ঞানিকেরা বহু কাল হইতে জানেন; কিন্তু সেই তড়িতের প্রবাহের যে এত গুণ, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অতি অল্প দিন হইল পাওয়া গিয়াছে। সার্ অলিবার লজ ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়াছেন; তাহার পরে আরও অনেকে দেখাইয়াছেন। লর্ড কেলবিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, ঐরূপ গতায়াতই হওয়া উচিত। কিন্তু তখন

কেহ প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। এখন লজের ও তাঁহার অনুবর্ত্তীদের প্রদর্শিত প্রমাণে আর ঐ ঘটনায় অবিশ্বাসের উপায় নাই।

ভিজা সুতার পরিচালকতা খুব অল্প; আর তামার বা পিতলের তারের খুব অধিক। এই হেতু উভয়ের ব্যবহারে এই পার্থক্য। ভিজা সুতা দিয়া তড়িৎপ্রবাহ হুস করিয়া এ-পিঠ হইতে ও-পিঠে যায় ও হুস করিয়া গিয়াই থামে। কিন্তু তামার তার দিয়া হুস—আ—হুস হুস—আ হুস করিয়া যাতায়াত করিয়া তার পর থামে, আর ব্যাপারটা নিমেষের মধ্যে সম্পন্ন হইয়া যায়।

এইরূপ পুনঃ পুনঃ যাতায়াতকে ঠিক প্রবাহ না বলিয়া আন্দোলন বলাই উচিত। প্রবাহ একমুখে গতি, আর আন্দোলন এ-মুখে, ও-মুখে গতি বা গতায়াত। যেমন পেণ্ডুলাম। পেণ্ডুলামকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা আন্দোলিত হয়, নামে উঠে—নামে উঠে—এ-ধার ও-ধার—এ-ধার ও-ধার গতায়াত করিতে থাকে। তামার তারে তড়িতের আন্দোলন কতকটা সেইরূপ, উহাও এ-ধার ও-ধার—এ-ধার ও-ধার করিয়া চলে। প্রভেদ এই, পেণ্ডুলামকে একবার দোলাইয়া দিলে, উহা বহু ক্ষণ দুলিতে থাকে, বহু ক্ষণ দুলিয়া তবে থামে। আর লীডেন জারের তড়িৎকে দোলাইয়া দিলে, উহা তারের ভিতর ক্ষণেকের মধ্যে শত-সহস্র বার দুলিয়া ক্ষণেকের মধ্যেই থামিয়া যায়। পেণ্ডুলাম থামিতেই চায় না—শেষ পর্য্যন্ত থামে বটে, কিন্তু বহু বিলম্বে; দুলিবার সময় বাতাস ঠেলিয়া দুলিতে হয়, তথাপি বিলম্বে থামে। বাতাস ঠেলিতে না হইলে আরও বিলম্বে থামিত। জলের মধ্যে পেণ্ডুলাম দুলাইলে জল ঠেলিয়া দুলিতে হইলে আরও শীঘ্র থামিত। গুড়ের মধ্যে দুলাইলে, গুড় ঠেলিয়া দুলিতে হইলে আরও শীঘ্র থামিত। আর কাদার মধ্যে দুলাইয়া দিলে, দুলিতেই পারিত না। প্রথম আন্দোলনেই কাদা ঠেলিয়া আসিতে আসিতে উহার গতিশক্তি ফুরাইত। আর ঘুরিয়া ও-মুখে ফিরিতে পারিত না। তড়িৎ তারের ভিতরেও দুলিতে থাকে; হয়ত কিছু ঠেলিয়া চলিতে হয় বলিয়া শীঘ্র থামিয়া যায়। অবশ্য কোন একটা বাধা ঠেলিতে হয়, নতুবা অত শীঘ্র থামিবে কেন। তামা উত্তম পরিচালক বটে; কিন্তু তাই বলিয়া তড়িতের সঞ্চালনে যে একবারে বাধা দেয় না, এমন নহে; তড়িৎকে আটকাইতে পারে না এই পর্য্যন্ত; কিন্তু সঞ্চালনে একটু সময় লাগায়। ঐ বাধা ঠেলিয়া চলিতে হয় বলিয়া তড়িতের

আন্দোলন শীঘ্র থামিয়া যায়। তামার পরিচালকতা যদি আরও অধিক হইত, যদি বাধা একেবারেই না থাকিত, তাহা হইলে বুঝি আন্দোলন থামিত না। ভিজা সুতার পরিচালকতা তামার তারের চেয়ে অনেক কম ; উহাতে বাধা দেয় আরও বেশী। তামার তারে তড়িতের আন্দোলন যেন গুড়ের ভিতর পেণ্ডুলামের আন্দোলন। আর ভিজা সুতার ভিতর তড়িতের গতি যেন কাদা ঠেলিয়া পেণ্ডুলামের গতি। ইহাতে একবার যাইতেই গতিশক্তিটা সমস্ত নষ্ট হইয়া যাওয়াতে আর ফেরা ঘটে না—গমন ঘটে, কিন্তু আগমন হয় না। প্রবাহ মাত্র হয়, আন্দোলন হয় না।

সুপরিচালক ধাতু দ্রব্যের তারের ভিতর বা দণ্ডের ভিতর লীডেন জারের তড়িৎ চলিতে হইলেই এরূপ আন্দোলন জন্মে। এই আন্দোলনের সম্প্রতি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেন, এই আন্দোলনের সাহায্য লইয়া আকাশপথে দূরে খবর পাঠান সম্ভবপর। মার্কনি সাহেব আজকাল আকাশপথে যে খবর পাইতেছেন, সে এই আন্দোলনের সাহায্যে। ইহার কথা আবার উঠিবে।

লীডেন জারের দুই পিঠ ভিজা সুতায় যোগ করিলে তড়িতের প্রবাহ জন্মে ; আর তামার তার দিয়া যোগ করিলে তড়িতের আন্দোলন জন্মে। উভয়ই ক্ষণস্থায়ী। প্রবাহও ক্ষণস্থায়ী, আন্দোলনও ক্ষণস্থায়ী। প্রবাহই বল, আর আন্দোলনই বল, মধ্যস্থ দ্রব্যের পরিচালকতাই উহার উৎপাদনের হেতু। তামার তার ভাল পরিচালক, তাই উহাতে আন্দোলন জন্মে ; সুতা মন্দ পরিচালক, তাই উহাতে প্রবাহ জন্মে। কিন্তু কোন সম্পূর্ণ অপরিচালক দ্রব্য—যেমন গালার ছড়ি দিয়া যোগ করিলে প্রবাহও হইত না, আন্দোলনও হইত না। ধনতড়িৎ ও ঋণতড়িৎ আপন আপন স্থানেই স্থির ভাবে বসিয়া থাকিত। অপরিচালক দ্রব্য ভেদ করিয়া যাইতে পারিত না। লীডেন জার ত কাচের বোতল, বোতলের দুই পিঠ টিন, আর সেই টিনের গায়ে তড়িৎ। কাচ অপরিচালক বলিয়াই এ-পিঠের তড়িৎ ও-পিঠে যায় না। বায়ু অপরিচালক, তাই বায়ুপথেও ভিতর হইতে বাহিরে আসে না।

কিন্তু এই বায়ু সময়বিশেষে পরিচালকত্ব প্রাপ্ত হয়। আগে বলিয়াছি, ধাতু দ্রব্যে তড়িৎ সঞ্চয় করিলে উহার পিঠের যেখানটা কুঁজো বা ছুঁচল, তড়িৎ সেইখানে গিয়া জমা হয়। সূচ্যগ্র স্থান দেখিলেই তড়িৎ সেখানে এত জমে যে, তাহার নিকটবর্ত্তী বায়ু তখন সেই তড়িৎ গ্রহণ করিতে আরম্ভ

করে ; গ্রহণ করে, আর সে স্থান হইতে তাড়িত হইয়া দূরে অপসৃত হয়। বায়ু তড়িৎ কাঁধে লইয়া সূচীর মাথা হইতে প্রবাহিত হইতে থাকে। কাজেই বায়ুর পরিচালকত্ব যে কখনও থাকে না, তাহা বলা চলে না।

লীডেন জারের ভিতর বাহির দুই পিঠে দুইটা তার সংলগ্ন করিয়া তার দুইটার মুখ কাছাকাছি আনিলে একটা নূতন ব্যাপার দেখা যায়। দুই তারের মুখের মধ্যে বায়ুর অল্প ব্যবধান থাকিলে সহসা আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হয়। এ-তারের মুখ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গটা লম্ফ দিয়া ও-তারের মুখে যায়। আর তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, লীডেন জারের উভয় পিঠের তড়িতের অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছে। এখানে কি বুঝিব? এই বুঝিব যে, ভিতর-পিঠের ধনতড়িৎ প্রথম তার বাহিয়া উহার মুখে আসিয়া লম্ফ দিয়া বায়ুর ব্যবধানটুকু পার হইয়া দ্বিতীয় তারের মুখে প্রবেশ করিয়াছে ও দ্বিতীয় তার বাহিয়া বাহিরের পিঠে ঋণতড়িতের লোপ করিয়াছে। ধনতড়িতের স্বভাবই ঋণতড়িতের নিকটে যাওয়া ও উহার সহিত মিলিত হওয়া। বায়ুর ব্যবধান সেই গতির অন্তরায়। কিন্তু এ স্থলে বায়ুর সামান্য ব্যবধানটুকু আর অন্তরায় হইতে পারে নাই। তড়িৎ সেই ব্যবধান ভেদ করিয়া এ-তার হইতে ও-তারে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। অপরিচালক বায়ু এ স্থলে ক্ষণেকের জন্য পরিচালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

তড়িৎ সাধারণতঃ বায়ুর ব্যবধান লঙ্ঘন করিতে পারে না ; তবে ঐ ব্যবধান যদি খুব সামান্য হয়, তবে লঙ্ঘন করে ; বায়ু তখন পরিচালকত্ব প্রাপ্ত হয়। ছোট একটা লীডেন জারে এই ব্যবধানটুকুও সামান্য। এক ইঞ্চির সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র ; তাহার অধিক ব্যবধান লঙ্ঘন করিতে পারে না। কিন্তু অনেকগুলি লীডেন জার সারবন্দি করিয়া বিশেষরূপে সাজাইয়া উহার মালা গাঁথিয়া দেখা গিয়াছে, সারির মধ্যে প্রথম জারের ভিতরের পিঠের তড়িৎ দুই ইঞ্চি তিন ইঞ্চি বায়ুর ব্যবধান লঙ্ঘন করিয়া লম্ফ দিয়া শেষের জারের বাহিরের পিঠে উপস্থিত হইতে পারে। কাজেই অবস্থাবিশেষে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গটা দুই তিন ইঞ্চি, এমন কি, বিশ ত্রিশ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইতে পারে।

তড়িৎ সঞ্চয়ের জন্য বড় বড় যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ঐ সকল যন্ত্রযোগে দশ বিশ ইঞ্চি লম্বা তড়িৎস্ফুলিঙ্গ অনায়াসে পাওয়া যায়।

দশ বিশ ইঞ্চিতেই বা থামি কেন। বিদ্যুৎ ও বজ্র তড়িৎস্ফুলিঙ্গ বই আর কিছু নহে। মেঘে তড়িৎ সঞ্চিত কিরূপে হয় বলা কঠিন। সে বিষয়ে

মতভেদ আছে। বসন্তকালে ও গ্রীষ্মকালে বৈকালের মেঘ হঠাৎ দেখা দেয়; ঐ মেঘ তড়িতে একরকম ভরা থাকে। একখানা মেঘ হইতে অন্য মেঘে তড়িৎ ঝম্প দিয়া যাইবার সময় যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়, তাহারই নাম বিদ্যুৎ। আর মেঘ হইতে ভূতলে ঝম্প দিবার সময় যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়, তাহাই বজ্র। এই সকল স্থলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, দশ বিশ ইঞ্চি কেন, দুই এক মাইল বায়ুর ব্যবধান ভেদ করিয়া মেঘে স্তূপীকৃত তড়িৎ ভূতলে প্রবেশ করিতেছে।

লীডেন জারের এ-পিঠ হইতে ও-পিঠে ঝম্প দিবার সময় স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে পটাপট্ শব্দ হয়। আর মেঘ হইতে মেঘে বা মেঘ হইতে ভূমিতে ঝম্পের সময় গভীর গর্জ্জন হয়। মেঘের গর্জ্জন ও বজ্রধ্বনি সর্ব্বজন-পরিচিত। বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আগুনের স্ফুলিঙ্গ চলিবা মাত্র বায়ুস্তর সহসা উত্তপ্ত ও প্রসারিত হয়। বায়ুর আকস্মিক প্রসারে পাশের বায়ুতে ধাক্কা লাগে। সেই ধাক্কার ফলে যে কম্পন বা আন্দোলন, তাহার ফলে এই শব্দ।

ঐ স্ফুলিঙ্গকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বলিব, না তড়িৎস্ফুলিঙ্গ বলিব। তড়িৎ পদার্থ চক্ষুর গোচর নহে, কিন্তু অগ্নি চক্ষুর গোচর। আমরা যাহা দেখি, তাহা খানিকটা আলো। বায়ু সহসা উত্তপ্ত হইয়া প্রদীপ্ত হওয়ায় ঐ আলো। কাজেই যাহাকে স্ফুলিঙ্গ বলিতেছি, তাহা তড়িৎ নহে, তাহা উত্তাপ ও আলোক। কিন্তু ঐ উত্তাপ ও আলোক তড়িৎ সঞ্চালনের ফল। বায়ুপথে তড়িৎ সঞ্চালনের সমকালে সেই পথের বায়ু তপ্ত হয় ও দীপ্ত হয়; তাহার ধাক্কায় বায়ুরাশি কাঁপিয়া উঠিয়া শব্দ হয়; পথের মাঝে গাছপালা পড়িলে জ্বলিয়া যায়, ঘর-বাড়ী পড়িলে ভাঙ্গিয়া যায়, আর কোন হতভাগ্য জীব পড়িলে তাহার জীবনটাও দেহ হইতে ছিন্ন হয়। বৃহৎ তড়িৎস্ফুলিঙ্গের এমনই প্রতাপ।

তড়িৎস্ফুলিঙ্গের যে স্ফুলিঙ্গত্ব, উহা উত্তাপের ও আলোকের ফল। উহা প্রত্যক্ষগোচর। ঐ উত্তাপ ও আলোক আবার তড়িৎপ্রবাহের ফল, বায়ু-মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চলিয়াছে বলিয়াই উত্তাপাদির আবির্ভাব। সেই তড়িৎপ্রবাহ প্রত্যক্ষগোচর নহে, উহা অনুমান মাত্র।

লীডেন জারে যে তড়িৎস্ফুলিঙ্গ দেখা যায়, উহা তড়িৎ সঞ্চলনের ফল বটে; বায়ুর আকস্মিক পরিচালকতা-প্রাপ্তিই এই সঞ্চলনের হেতু বটে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠে, ইহা তড়িতের প্রবাহ, না আন্দোলন? ভিজা সুতা ধরিয়া তড়িতের প্রবাহ বহে, কিন্তু তামার তারে প্রবাহ না বহিয়া তড়িতের আন্দোলন ঘটে। বায়ুস্তর ভিন্ন করিয়া তড়িৎ লম্ফ দিয়া যাইবার সময় প্রবাহ জন্মায় না, আন্দোলন জন্মায়। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, উহা প্রবাহ নহে, আন্দোলনই বটে। তড়িৎ এখানেও ক্ষণেকের মধ্যে—নিমেষের মধ্যে যাতায়াত করে; লম্ফ দিয়া একবার ও-তারে যায়, একবার এ-তারে আসে। এই আন্দোলনেরই ফল ঐ উত্তাপ আর আলোক।

তাপের স্বরূপ আলোচনাকালে আমরা দেখিয়াছি যে, তাপ শক্তির রূপান্তর মাত্র। শক্তি আপনা হইতে সৃষ্ট হয় না; উহা এক রূপ হইতে অন্য রূপ গ্রহণ করে। তড়িৎস্ফুলিঙ্গে যখন একটা তাপ জন্মিতেছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, শক্তির কোন-না-কোন রূপ তাপে পরিণত হইয়াছে মাত্র। লাঁডেন জারের পিঠে যে তড়িৎ সঞ্চিত ছিল, সেই তড়িৎ স্থির হইয়া থাকিলেও উহাতে খানিকটা শক্তি নিহিত ছিল। তড়িন্নিহিত সেই শক্তিই এখন তাপে পরিণত হইয়াছে। তড়িতের স্বরূপ কি, তাহা আমরা জানি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, উহা শক্তিমান্ পদার্থ। কোন দ্রব্যের গায়ে যখন স্থিরভাবে আছে, তখনও উহাতে খানিকটা শক্তি বিদ্যমান আছে। আবার তড়িৎ যখন ঝম্প দিয়া বায়ুপথে আন্দোলিত হয়, তখন সেই শক্তি তাপে পরিণত হয়। বায়ুকে তপ্ত ও প্রদীপ্ত করিয়া তোলে। তড়িতের শক্তি সম্বন্ধে আরও কথা পরে উঠিবে।

তড়িতের স্বরূপ কি, তাহা আমরা এখনও কিছুই জানিলাম না। তড়িৎই আনুমানিক পদার্থ; উহার স্বরূপ কি, সে বিষয়ে অনুমান কিছু করি নাই। স্বরূপ যাহাই হউক, উহার গুণ, উহার ধর্ম্ম, উহার ফলাফল আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। কাজেই অবেক্ষণের ও পরীক্ষণের বিষয় হয়। তড়িৎ যাহাই হউক, উহা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে সমর্থ, ইহাতে সংশয় নাই। আবার তড়িতের স্বরূপ যাহাই হউক, উহা যে শক্তিমান্, তাহাতেও সন্দেহ নাই। শক্তির নানা মূর্ত্তি; তন্মধ্যে এই একটা মূর্ত্তি। তড়িতে যে শক্তি নিহিত, তাহাকে আমরা তড়িৎশক্তি নাম দিব। তড়িৎ বায়ুপথে আন্দোলিত হইবার সময় এই তাড়িত শক্তি তাপে পরিণত হয়। তপ্ত বায়ুর কম্পনফলে পাশের বায়ুতে ঢেউ উঠিয়া শব্দ ও আকাশে

ঢেউ উঠিয়া আলোক উৎপন্ন হয়। শক্তির বিবিধ রূপ গ্রহণের ইহা উত্তম উদাহরণ।

তড়িৎ সঞ্চলনের দুইটি প্রকারভেদ বর্ণিত হইল। এক তড়িতের আন্দোলন। তড়িতের আন্দোলনে কিরূপে দূরে আকাশপথে খবর পাঠান হয়, সে কথা পরে উঠিবে। তড়িৎপ্রবাহ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বক্তব্য। তড়িৎপ্রবাহের তিন গুণের কথা বলিয়াছি, উহা তাপ জন্মায়, চুম্বকে ধাক্কা দেয়, আর জলকে বিশ্লিষ্ট করে। লীডেন জারের তড়িতের পরিমাণ এত সামান্য যে, এই তিন ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ প্রদর্শনে সুবিধা হয় না। তড়িৎপ্রবাহের এই তিন আনুষঙ্গিক ফল ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে প্রচুর পরিমাণে তড়িৎ উৎপাদনের ও বহু ক্ষণ ধরিয়া প্রবাহ চালনার ব্যবস্থা চাই। লীডেন জারে তাহা হয় না, ঘর্ষণজ তড়িতেই তাহা হয় না। সৌভাগ্যক্রমে ঘর্ষণ ব্যতীত অন্য উপায়ে আমরা প্রচুর পরিমাণে তড়িতের উৎপাদন করিয়া যত ক্ষণ ইচ্ছা—নিমেষব্যাপী নহে—ঘটিকাব্যাপী বা দিবসব্যাপী তড়িৎ-প্রবাহের উৎপাদন করিতে পারি।

ব্যবস্থা খুব সহজ। একটা ভাঁড়ে গন্ধকদ্রাবক মিশাইয়া খানিকটা জল ঢাল। একখানা তামা আর একখানা দস্তা ঐ অম্ল জলে অর্দ্ধমগ্ন করিয়া ডুবাও। দেখিবে, তামায় কিঞ্চিৎ ধনতড়িতের আর দস্তায় কিঞ্চিৎ ঋণতড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে। এখানে ঘর্ষণাদি নাই; ঐ অম্লাক্ত জলে দুইটা ধাতু ডুবান মাত্র দুইখানায় বিভিন্ন তড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে। এখন একটা তামার তার লইয়া তামার সহিত দস্তার যোগ করিয়া দিবা মাত্র তামার ধনতড়িৎ সেই তার আশ্রয় করিয়া দস্তার ঋণতড়িতের অভিমুখ চলিতে থাকিবে। তারের মধ্যে রীতিমত তড়িতের প্রবাহ ছুটিবে।

এই প্রবাহ কিন্তু ক্ষণস্থায়ী নহে। এই প্রবাহ বহু ক্ষণ ধরিয়া চলে। তাম্রখণ্ড হইতে ধনতড়িৎ যেমন বাহির হয়, সঙ্গে সঙ্গে আবার ধনতড়িৎ কোথা হইতে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াই তার বাহিয়া ছুটিতে থাকে। রাশি রাশি তড়িৎ ক্রমাগত কোথা হইতে ঐ তাম্রখণ্ডে উৎপন্ন হইয়া ক্রমাগত তার বাহিয়া ছুটিতে থাকে, আর তড়িতের প্রবাহ রক্ষা করে। তার বাহিয়া তড়িৎপ্রবাহ ক্রমাগত চলে, আর ভাঁড়ের মধ্যে দস্তার ক্ষয় হয়। দস্তা ক্ষয় পাইয়া গন্ধকদ্রাবকের সহিত সম্মিলনে একটা লাবণিক পদার্থ উৎপন্ন করে ও তাহা সেই অম্লাক্ত জলে মিশে। এদিকে তারে

তড়িৎপ্রবাহ চলিতে থাকে। ওদিকে দস্তা ক্রমশঃ ক্ষয় পায়। যত ক্ষণ দস্তার অবশেষ থাকে, তত ক্ষণ প্রবাহ চলে। সমস্ত দস্তাটা ক্ষয় পাইলে তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ হয়।

ভাঁড়ের বাহিরে তামার তার বাহিয়া তামা হইতে দস্তার অভিমুখে ধনতড়িতের প্রবাহ চলে। ভাঁড়ের ভিতরে প্রবাহ চলে কি না? চলে বৈ কি। ভাঁড়ের ভিতরে যে গন্ধকদ্রাবকমিশ্রিত জল থাকে, সেই জল বাহিয়া তড়িতের প্রবাহ চলে। কোন্ মুখে চলে? ভাঁড়ের বাহিরে ধনতড়িতের প্রবাহ তামা হইতে দস্তার অভিমুখে চলে, কিন্তু ভাঁড়ের ভিতরে দস্তা হইতে তামার অভিমুখে চলে।

এই তড়িতের প্রবাহ যতক্ষণ ইচ্ছা রাখিতে পারা যায়, ইহা ক্ষণস্থায়ী নহে। তামাতে ধনতড়িৎ উৎপন্ন হইয়া দস্তার অভিমুখে চলিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে নূতন তড়িৎ উৎপন্ন হইয়া আবার চলিতেছে, তড়িতের স্রোত বহাল রাখিতে হইলে এইরূপে নিরন্তর তড়িতের উৎপাদন আবশ্যক। লীডেন জারে যে কিঞ্চিৎ তড়িৎ সঞ্চিত থাকে, সেইটুকু বাহির হইয়া গেলেই প্রবাহ থামিয়া যায়, কাজেই উহার প্রবাহ ক্ষণস্থায়ী। আর এই তড়িদ্ভাণ্ডে যেন তড়িতের প্রস্রবণ রহিয়াছে। উহা যেন ফুরায় না। কোথা হইতে এত তড়িতের উৎপাদন হয়, তাহার অনুসন্ধান পরে করিব।

এই প্রবাহ স্থায়ী প্রবাহ। এই হেতু তড়িৎপ্রবাহের গুণসকল ইহাতে পরীক্ষা করা সহজ। প্রথম গুণ এই যে, যে তামার তার বাহিয়া প্রবাহ চলে, সেই তারটা ক্রমেই গরম হয়; তার যত সরু হয়, ততই গরম হয়। এত গরম হয় যে, শেষ পর্য্যন্ত হয়ত প্রদীপ্ত হইয়া আলো দিতে আরম্ভ করে। তামার তারের বদলে অন্য ধাতুর তার হইলেও ঐরূপ তাপের উৎপত্তি হয়। প্লাটিনমের সরু তার অতি শীঘ্র তপ্ত ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। কয়লার তার তৈয়ার করিলে উহা আরও তপ্ত হইয়া শুভ্র আলোকে দীপ্তিমান্ হয়। তড়িৎপ্রবাহের এই ক্ষমতা আছে বলিয়া উহার সাহায্যে আমরা আঁধার ঘরে আলো জ্বালিতে পারি। তাড়িত প্রদীপ—বিজলী বাতি আজকাল সহরের লোকের ঘরে ঘরে। প্লাটিনমের অথবা কয়লার বা অন্য কোন পদার্থের সরু তারের ভিতর তাড়িত প্রবাহ চালাইলে উহাই প্রদীপ্ত হইয়া আলোক দিতে থাকে। তাহাই বিজলী বাতি। কয়লার তারে আলো দেয় খুব বেশী, কিন্তু উহার একটা দোষ আছে। কয়লা দাহ্য

পদার্থ। তপ্ত হইলে উহা পুড়িতে আরম্ভ করে, বায়ুর অম্লযানের সহিত যুক্ত হইয়া শীঘ্র ক্ষয় পায়। সেই জন্য কয়লার তারে বিজলী বাতি তৈয়ার করিতে হইলে ঐ তারকে কাচের পাত্রের ভিতর আবদ্ধ করিয়া ঐ পাত্রের বায়ু নিষ্কাশন করিয়া লইতে হয়। বায়ুহীন স্থানে কয়লা দীপ্ত হইয়া আলো দেয়—কিন্তু পোড়ে না।

প্রশ্ন উঠে, বিজলী বাতিতে এই যে প্রচুর তাপ জন্মিতেছে, উহার মূল কোথায়? তাপ ত শক্তি। এত শক্তি কোথা হইতে আসিতেছে? ইহার উত্তর পূর্ব্বে দিয়াছি। তড়িৎ শক্তিমান্ পদার্থ। তড়িতে নিহিত শক্তিই তাপে রূপান্তরিত হইতেছে। তড়িৎ যখন স্থির থাকে, তখন উহার শক্তি গুপ্তভাবে থাকে। তড়িতের প্রবাহে সেই গুপ্ত শক্তি ব্যক্ত অবস্থায় আসিয়া তাপে পরিণত হয়। কিন্তু এই উত্তর চরম উত্তর হইল না। তড়িতের শক্তিই বা কোথা হইতে আসিল? তামা আর দস্তা গন্ধকদ্রাবকে ডুবাইয়াছিলাম; ডুবাইবার পূর্ব্বে তড়িৎও ছিল না, তড়িৎশক্তিও ছিল না। ডুবানোর পর তার দিয়া তামা ও দস্তা যোগ করিবা মাত্র রাশি রাশি তড়িৎ জন্মিতে লাগিল; এবং সেই রাশি রাশি তড়িতে নিহিত রাশি রাশি শক্তি তারের ভিতর তাপে পরিণত হইতে লাগিল। তড়িৎ সৃষ্টি হইতেছে। তার সঙ্গে শক্তিও তবে সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু শক্তির সৃষ্টি ত ঘটে না। শক্তি আপনা হইতে জন্মিতে পারে না। এখানে শক্তি আসিল কোথা হইতে?

ইহার উত্তর, ঐ ভাঁড়ের ভিতর অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে। ভাঁড়ের ভিতরে গন্ধকদ্রাবক আছে আর তামা আর দস্তা আছে। ঐ দস্তার সঙ্গে গন্ধকদ্রাবকের রাসায়নিক সম্বন্ধ আছে। একটা মাটির বাটিতে খানিকটা গন্ধকদ্রাবক লইয়া উহাতে দস্তা ফেলিলেই দেখা যায়, দস্তা গন্ধকদ্রাবকে মিলিত হইতেছে। গন্ধকদ্রাবকে উদযান আছে; আর উদযানের সঙ্গে গন্ধক ও অম্লযান আছে। দ্রাবক মাত্রেই ও অম্ল পদার্থ মাত্রেই উদযান থাকে, আগে বলিয়াছি। দস্তার ন্যায় ধাতুপদার্থ ঐ উদযানকে তাড়াইয়া দেয়। উদযানকে অপসারিত করিয়া অবশিষ্ট গন্ধকও অম্লযানের সহিত মিলিত হয়। মিলিত হইলে একটা লাবণিক পদার্থ উৎপন্ন হয়; কাজেই গন্ধকদ্রাবকে দস্তা ফেলিলে উদযান বাহির হইয়া যায়। উদযান তৈয়ার করিবার সহজ উপায়ই এই। উদযানকে সরাইয়া দিয়া দস্তা তাহার স্থানে যায়। দস্তা গন্ধক ও অম্লযানের সহিত মিলিত হয়। এই মিলনের ফলে প্রচুর তাপ

জন্মে। গন্ধকদ্রাবকের সন্নিধানে দস্তার রাসায়নিক শক্তি গুপ্ত অবস্থায় নিহিত থাকে। সেই রাসায়নিক শক্তি তাপে পরিণত হয়।

এ স্থলে তড়িদ্ভাণ্ডে ও গন্ধকদ্রাবকে দস্তা ডুবান আছে। এখানেও দস্তা ক্রমে ক্ষয় হইয়া দ্রাবকের উদযানকে সরাইয়া দিয়া গন্ধক ও অম্লযানে মিলিত হইতেছে। কিন্তু যতটা তাপ জন্মান উচিত, ততটা তাপ জন্মিতেছে না। ঘর্ম্মমান যন্ত্রে পরীক্ষা করিলেই বুঝা যাইবে, গন্ধকদ্রাবকের সহিত দস্তার সম্মিলনে অন্যত্র যে তাপ জন্মে, তড়িদ্ভাণ্ডে সে তাপ জন্মিতেছে না। তাপের বদলে অন্যরূপ শক্তি উৎপন্ন হইতেছে—তাপের বদলে তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হইতেছে। সেই তাড়িত শক্তি আবার প্রবাহ-সঞ্চালনকালে তাপে পরিণত হইতেছে।

তড়িৎপ্রবাহের একটা কাজ তাপ জন্মান, আর একটা কাজ জলকে বিশ্লিষ্ট করা। জল কেন, ক্ষার পদার্থ, অম্ল পদার্থ ও লাবণিক পদার্থ মাত্রই জলে দ্রব অবস্থায় থাকিলে তাড়িতপ্রবাহবলে বিশ্লিষ্ট হয়। তুঁতে লাবণিক পদার্থ, তড়িদ্ভাণ্ডের তাম্রখণ্ডে একটা তার আর দস্তাখণ্ডে একটা তার যোগ করিয়া দুই তারের মুখ তুঁতের জলে ডুবাইলে দেখা যায়, তুঁতের জল আশ্রয় করিয়া তড়িৎপ্রবাহ চলিতেছে। ধাতুদ্রব্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ যেমন চলে, তুঁতের জলের মধ্য দিয়াও তেমনই চলে। তুঁতে যৌগিক পদার্থ, উহাতে তামা আছে, গন্ধক আছে আর অম্লযান আছে। তড়িৎপ্রবাহ তুঁতেকে বিশ্লিষ্ট করে। তামা পৃথক্ হইয়া যায় এক দিকে; গন্ধক আর অম্লযান একযোগে পৃথক্ হইয়া যায় অন্য দিকে। যে তারটা দস্তাখণ্ডে যুক্ত আছে, তাহার গায়ে তামা জমিতে থাকে। আর যে তারটা তাম্রখণ্ডে যুক্ত আছে, তাহার গায়ে গন্ধক আর অম্লযান জমিতে থাকে। ঐ গন্ধক আবার জলের খানিকটা উদযান টানিয়া লয়। গন্ধক, অম্লযান ও উদযান একযোগে গন্ধকদ্রাবক প্রস্তুত হইয়া তারের নিকট জমিতে থাকে। এইরূপে যত ক্ষণ তড়িৎপ্রবাহ চলে, তত ক্ষণ একটা তারের মুখে তামা আর একটা তারের মুখে গন্ধকদ্রাবক জমিতে থাকে। ফলে তুঁতেটা ক্রমশঃ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। তুঁতে যৌগিক পদার্থ, উহার মধ্যে তামা আছে। তুঁতেকে বিশ্লেষণ করিয়া সেই তামাকে বাহির করিয়া লওয়া সহজ কথা নহে। এই কাজের জন্য শক্তির ব্যয় আবশ্যক। তড়িতের যদি শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে

এইরূপে যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষণ করা চলিত না। তড়িৎপ্রবাহের শক্তি তুঁতেকে বিশ্লেষণ করে।

উদাহরণ স্বরূপ তুঁতের কথা বলিলাম। নানাবিধ যৌগিক পদার্থকে এইরূপে তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা বিশ্লেষণ করা চলে। যে সকল যৌগিক লাবণিক পদার্থে সোনা রূপা আছে, তার মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ চালাইলে সোনা রূপা পৃথক্ হইয়া পড়ে। স্বর্ণকারেরা আজকাল সোনার রূপার গিল্‌টি করিবার জন্য তড়িৎপ্রবাহ ব্যবহার করে।

তড়িৎপ্রবাহ তাপ জন্মায়, আর যৌগিক পদার্থের বিশ্লেষণ করে। তদ্ভিন্ন ইহার তৃতীয় কাজ চুম্বককে ধাক্কা দেওয়া। এক হিসাবে এই গুণটা সব চেয়ে প্রধান। ইহার আলোচনার পূর্ব্বে চুম্বক জিনিসটা কি, তাহার আলোচনা আবশ্যক।

চুম্বক

এ দেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা জানিতেন, লোহা স্থলবিশেষে লোহা টানিবার ক্ষমতা রাখে। যে লোহার ঐরূপ ক্ষমতা আছে, তাহাকে অয়স্কান্ত মণি বলা হইত। খনির মধ্যে ঐরূপ লোহা পাওয়া যায়। উহা লোহা আর ইস্পাত আকর্ষণ করে। লোহা মোটামুটি তিন রকমের; পেটাই লোহাতে এ দেশের কামারে কাজ করে; উহা কোমল ও ঘাতসহ; পিটিলে ভাঙ্গে না। ঢালাই লোহা অত্যন্ত দৃঢ় ও ভঙ্গপ্রবণ; বিলাতি লোহার অধিকাংশ ঢালাই। উহা তপ্ত করিলে সহজে তরল হয়, তখন ঢালিয়া ছাঁচে ফেলিয়া নানাবিধ দ্রব্য গঠন হয়। আর এক রকমের লোহার নাম ইস্পাত। ইস্পাতের প্রধান গুণ কঠোরতা ও স্থিতিস্থাপকতা।

এই তিন রকমের লোহার কোনটাই খাঁটি লোহা নহে। লোহার সঙ্গে অন্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে; তার মধ্যে কয়লা প্রধান। পেটাই লোহাতে কয়লার ভাগ খুব বেশী, আর ইস্পাতে মাঝামাঝি।

খনিতে যে চুম্বক পাওয়া যায়, তাহা যৌগিক পদার্থ। লোহা অম্লযানে যুক্ত হইয়া উহার সৃষ্টি করে।

কোমল লোহা আর দৃঢ় ইস্পাত, উভয়ই খনিজ চুম্বকের ঘর্ষণে চুম্বক-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ লোহা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। কোমল লোহার ঐচুম্বকত্ব স্থায়ী হয় না, কিন্তু ইস্পাতের চুম্বকত্ব স্থায়ী হয়। ছোট ছোট

ছুঁচ ঐরূপে চুম্বকে ঘষিয়া স্থায়ী চুম্বক তৈয়ার করা চলে। ইস্পাতের কাঁটা বা ইস্পাতের ছড়িকে চুম্বকে লম্বালম্বি ঘষিলে ঐ কাঁটা বা ছড়িও স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়।

ঐরূপ কাঁটা বা ছড়ি সুতা দিয়া ঝুলাইলে দেখা যায়, উহার এক প্রান্ত উত্তর মুখে অন্য প্রান্ত দক্ষিণ মুখে থাকিতে চায়। অন্য মুখে রাখিলেও ঘুরিয়া উত্তর দক্ষিণে ফিরিয়া আসে। চুম্বকের কাঁটার এই গুণ থাকায় উহা বহুকাল হইতে দিক্‌দর্শন-শলাকারূপে নাবিকগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। জমি জরিপের সময় ঐরূপ কাঁটা দিক্ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। উহাকে কোম্পাস্ কাঁটা বলে।

কোম্পাসের কাঁটা চুম্বক, উহার এক প্রান্ত উত্তর দিক্, অন্য প্রান্ত দক্ষিণ দিক্ অভিমুখ করিয়া স্থির থাকিতে চায়।

ঐ উত্তরমুখী প্রান্তের সহিত দক্ষিণমুখী প্রান্তের বিপরীত সম্বন্ধ। তাহা বুঝাই যাইতেছে। এ-প্রান্ত চলে উত্তর মুখে; ও-প্রান্ত চলে দক্ষিণ মুখে। আবার দুইটা কাঁটা পরস্পর নিকটে রাখিলে দেখা যায়, ইহার উত্তরমুখ-প্রান্ত উহার উত্তরমুখপ্রান্তকে দূরে ঠেলে, ইহার দক্ষিণমুখপ্রান্ত উহার দক্ষিণমুখপ্রান্তকে দূরে ঠেলে। কিন্তু ইহার উত্তরমুখপ্রান্ত উহার দক্ষিণমুখ-প্রান্তকে দূরে না ঠেলিয়া নিকটে টানে। ঐরূপ কাঁটা ইস্পাতের আর একটা কাঁটায় ঘষিলে ঐ ইস্পাতের কাঁটাও চুম্বকত্ব পায়; উহারও এক মুখ উত্তরে, অন্য মুখ দক্ষিণে তাকাইয়া থাকিতে চায়। কোমল পেটাই লোহার কাঁটাতে ঘষিলেও উহা চুম্বকত্ব পায়; কিন্তু ইস্পাতের মত লোহার চুম্বকত্ব স্থায়ী হয় না।

ঘর্ষণেরও প্রয়োজন নাই। একটা ইস্পাতের চুম্বকের সমীপে একখানা লৌহ রাখিলেই উহা অস্থায়িভাবে চুম্বকধর্ম্ম অর্জ্জন করে। যত ক্ষণ ঐরূপে সমীপে থাকে, তত ক্ষণের জন্য অর্জ্জন করে। উহারও এক ধার দক্ষিণবর্ত্তী, অন্য ধার উত্তরবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করে। তখন সম্মুখস্থ ইস্পাতের চুম্বক উহার এক ধারকে টানে, অন্য ধারকে ঠেলে; কেন না, দুই ধারের ধর্ম্ম বিপরীত। যে ধারটা নিকটে সেই ধারকে টানে, যে ধার দূরে সেই ধারকে ঠেলে। নিকটের টান কিছু বেশী, দূরের ঠেল কিছু অল্প, কাজেই লোহাটা মোটের উপর ইস্পাতের দিকে আকৃষ্ট হয়।

চুম্বক যে লোহাকে আকর্ষণ করে, তাহার তাৎপর্য্যই এই। চুম্বকের সম্মুখে আসিয়া লোহা অস্থায়িভাবে চুম্বকত্ব পায়। তখন উহার এক ধারে টান ও অন্য ধারে ঠেল পড়ে ও মোটের উপর উহা আকৃষ্ট হয়।

একটা চুম্বকের কাঁটা দ্বিখণ্ডে বা শত খণ্ডে ভাঙিলেও দেখা যায় যে, উহার প্রত্যেক খণ্ডে চুম্বকত্ব বর্ত্তমান আছে। প্রত্যেক ভগ্ন খণ্ডের এক মুখ উত্তরবর্ত্তী ও অন্য মুখ দক্ষিণবর্ত্তী হইতে চায়। ইহাতে স্বতঃই অনুমান হয় যে, চুম্বকের প্রত্যেক কণিকাই বুঝি চুম্বক; সেই কণিকা যত ছোটই হউক না, উহা একটি ক্ষুদ্র চুম্বক।

চুম্বকের এই অদ্ভুত স্বভাব। অতি বড় চুম্বক ও অতি ছোট কণিকা-প্রমাণ চুম্বক, উভয়েরই এই অদ্ভুত স্বভাব যে, উহার এক প্রান্ত উত্তরবর্ত্তী ও অন্য প্রান্ত দক্ষিণবর্ত্তী হইবে। জোর করিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে দাঁড়াইয়া দিলেও উহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে দাঁড়াইবে না। ছাড়িয়া দিবা মাত্র ঘুরিয়া উত্তর-দক্ষিণে দাঁড়াইবে। এরকম অদ্ভুত স্বভাব আর কোন জিনিসের দেখা যায় না। লোহা বা ইস্পাত যত ক্ষণ চুম্বকত্ব না পায়, তত ক্ষণ উহার এই স্বভাব থাকে না। কিন্তু চুম্বকত্ব পাইবা মাত্র কোথা হইতে কিরূপে এই অদ্ভুত স্বভাব আসিয়া পড়ে।

এইরূপে একটা দিক্ লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইবার প্রকৃতি আর কোন জিনিসের দেখা যায় না, তবে স্থলবিশেষে নানা দ্রব্যকে ঐরূপ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে দেখা যায়।

যেমন লাটিম খেলা। লাটিম যত ক্ষণ বেগে ঘুরে, তত ক্ষণ উহার মাঝের কাঁটা খাড়া হইয়া ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া থাকে। যত ক্ষণ বেগে ঘুরে, তত ক্ষণ দাঁড়ায়। বেগ কমিলে তখন ঢলিয়া ভূতলশায়ী হয়।

একটা পয়সাকে উহার কিনারার উপর ভর দিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া রাখা চলে না। পয়সাকে ঘুরাইয়া দিলে উহা গাড়ীর চাকার মত ঘুরিতে ঘুরিতে খাড়া দাঁড়াইয়া চলে। ঘূর্ণনবেগ থামিবা মাত্র ভূতলশায়ী হয়।

এ-কালের দ্বিচক্র গাড়ী—বাই-সাইকেল ঐরূপ জিনিস। চাকা যত ক্ষণ বেগে ঘুরে, তত ক্ষণ উহা খাড়া থাকিবে, থামিলেই ভূতলশয়ন অনিবার্য্য।

অধিক কি, এই ভূমণ্ডলটাই একটা প্রকাণ্ড লাটিম। উহা আপন অক্ষরেখার চারি দিকে বেগে ঘুরিতেছে; প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় এক পাক আবর্ত্তন করিতেছে। ঐরূপ ঘুরিতেছে বলিয়াই উহার অক্ষরেখা নিরন্তর

খগোলে ধ্রুবনক্ষত্রের অভিমুখে চাহিয়া আছে। চুম্বকের ঐরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট দিক্ লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইবার প্রবৃত্তি দেখিয়া সহজেই অনুমান হয়, উহার কণিকাগুলিও ঐরূপ বেগে ঘূর্ণ্যমান। সেই কণিকাগুলি অতি ক্ষুদ্র ও চক্ষুর অগোচর, উহাদের ঘূর্ণিও অগোচর; কিন্তু প্রত্যেক কণিকা যত ছোট হউক না কেন, উহা যখন একটা দিকে গোঁ ধরিয়া থাকিতে চায়, তখন উহা আপন ক্ষুদ্র অক্ষরেখার চারি দিকে বেগে ঘুরিতেছে, ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে।

বেগে ঘূর্ণ্যমান দ্রব্য মাত্রেরই এই জেদ বা গোঁ দেখা যায়। উহা গাড়ীর চাকাই হউক, আর কুমারের চাকাই হউক, আর ভগবানের করাবর্ত্তিত সুদর্শন চক্রই হউক। উহা ধাবিত হইবার সময়ও আপনার গোঁ ছাড়ে না। একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া চলিতে থাকে। সেই গোঁ ছাড়ান কঠিন, আর সেই গোঁর সম্মুখে দাঁড়াইলে বিপদ্।

নদীর স্রোতে মাঝে মাঝে জলের ঘূর্ণি বা ভ্রমি থাকে, উহার ঐরূপ গোঁ। কোন খড়, পাতা, কাঠ ভাসিতে ভাসিতে ঐ ঘূর্ণিতে পড়িলে ঘূর্ণি উহাকে সাত পাক খাওয়াইয়া ডুবাইয়া দেয়। বড় বড নদীর বড় বড় ঘূর্ণিতে নৌকা পড়িলে নৌকাও সাত পাক খাইয়া ডুবিবার আশঙ্কা থাকে। বাতাসের মত লঘু দ্রব্যের ঘূর্ণিও ভয়ানক। ঘূর্ণি বাত্যা যে দেশের উপর দিয়া যায়, সে দেশে আপনার ভ্রমণের চিহ্ন রাখিয়া যায়। গাছপালা সমূলে উৎপাটিত হয়, দালান ঘরের ছাদ উপড়াইয়া যায়, রাস্তার জিনিস গাছের মাথায় উঠে, একতলার জিনিস তেতলার ছাতে চড়ে। যে জিনিসটা জলের ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে, জল তাহাকে সাত পাক খাওয়ায় ও পরে অধোমুখে টানিয়া ডুবাইয়া দেয়। যে জিনিসটা বাতাসের ঘূর্ণিতে পড়ে, বাতাস তাহাকে ঘুরাইয়া দেয় ও পরে উর্দ্ধমুখে টানিয়া তোলে।

বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন, চুম্বকের অদৃশ্য কণিকাগুলি বেগে ঘুরিতেছে। প্রত্যেক কণিকা ঐরূপ ঘুরিতেছে বলিয়া গোটা চুম্বকটারই এই গোঁ। চুম্বকের কাঁটার উত্তর মুখে দাঁড়াইবার জেদ। জোর করিয়া সরাইয়া দিলেও উহা ঘুরিয়া আপন জেদে উত্তরমুখ হইবে। শুধু তাহাই নহে। চুম্বকের কাঁটার আশে পাশে চারি দিকে আকাশ নামক পদার্থ আছে। আলোকতত্ত্ব বুঝাইবার সময় আমরা দেখিয়াছি, ঐরূপ একটা প্রত্যক্ষের অগোচর বিশ্বব্যাপী পদার্থ কল্পনা না করিলে আলোকতত্ত্ব বুঝা যায় না।

যে স্থানকে আমরা শূন্য স্থান বলি, সেখানেও ঐ আকাশ বিদ্যমান। চুম্বকের আশে পাশে চারি দিকে, এমন কি, অভ্যন্তরেও ঐ আকাশ আছে। চুম্বকের কণিকাগুলির ঘূর্ণনে ঐ আকাশেও ঘূর্ণি উৎপন্ন হয়। চুম্বকের বাহিরে ও চারি পাশে অদৃশ্য আকাশে অদৃশ্য ঘূর্ণি উৎপন্ন হয়। ঐ ঘূর্ণির মধ্যে লোহা আনিবা মাত্র লোহার কণিকাগুলিও সাত পাক খাইতে আরম্ভ করে। উহাও চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। আকাশের ঘূর্ণি লোহার কণিকায় ঘূর্ণি জন্মাইয়া উহাদিগকে আপনার গোঁ যে দিকে, সেই দিকে টান দেয়। নদীর স্রোতের ঘূর্ণি যেমন কাঠকে কোলের দিকে টানিয়া ডুবাইয়া দেয়, তেমনই ঐ আকাশের ঘূর্ণি লোহার কণিকাগুলিতে ঘূর্ণি উৎপাদন করিয়া গোটা লোহাটাকেই যে দিকে উহার গোঁ, সেই দিকে টানিয়া ঠেসিয়া ধরে। তাহারই ফলে ঐ লোহা চুম্বকের অভিমুখে আকৃষ্ট হয়।

চুম্বকের পাশে আকাশ, অর্থাৎ যে আকাশমধ্যে চুম্বক নিমগ্ন আছে, সেই আকাশ ঘূর্ণিতে পরিপূর্ণ। সেই জন্য সেই ঘূর্ণিতে পড়িবা মাত্র লোহাতে টান পড়ে ও উহার চুম্বকত্বপ্রাপ্তি ঘটে। এইরূপ অনুমান দ্বারা চুম্বক কর্ত্তৃক লৌহের আকর্ষণের একটা হেতু নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে।

আপত্তি হইতে পারে—চুম্বক লোহাকেই আকর্ষণ করে, অন্য অন্য জিনিসকে আকর্ষণ করে না কেন ? চুম্বকের পার্শ্ববর্ত্তী আকাশে ঘূর্ণিই যদি লৌহের ও লৌহজ পদার্থের চুম্বকত্বপ্রাপ্তির কারণ হয়, তবে সেই আকাশে সোনা রূপা কাঠ কাগজ থাকিলে তাহাতে ঘূর্ণি জন্মে না কেন, তাহাতে টান পড়ে না কেন ; তাহার চুম্বকত্বপ্রাপ্তি ঘটে না কেন ?

ইহার উত্তর মাইকেল ফারাডে দিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে দেখান, চুম্বকত্বপ্রাপ্তি কেবল লোহার ও লৌহজ দ্রব্যেরই "একচেটিয়া" ধর্ম্ম নহে। নিকেল ও কোবাল্ট নামে দুই ধাতু আছে, উহারও চুম্বকসন্নিধানে চুম্বকত্ব-প্রাপ্তি সহজেই দেখান চলে ; তবে লোহার চেয়ে অনেক কম—লোহার সহিত উহাদের মাত্রাগত প্রভেদ। ফারাডে দেখান, লোহা নিকেল কোবাল্ট কেন, যাবতীয় পদার্থই চুম্বকের সন্নিধানে চুম্বকত্ব পায়। প্রভেদ কেবল মাত্রাগত। সোনা রূপা কাঠ কাগজও চুম্বকত্ববর্জ্জিত নহে। তবে উহাদের বেলায় মাত্রা এত সামান্য যে, বিশেষ আয়োজন ব্যতীত, ঘূর্ণির খুব বেশী জোর ব্যতীত উহা টের পাওয়া যায় না। ফারাডে প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখাইয়া গিয়াছেন, কঠিন তরল মারুত, যাবতীয় পদার্থই চুম্বক সন্নিধানে ঘূর্ণিপূর্ণ

আকাশে আনীত হইলে অল্পবিস্তর টান পায়, কোথাও বা ঠেল পায়। একবারে টান পায় না বা ঠেল পায় না, এমন জিনিস কিছুই নাই। লোহার কণিকাগুলি আকাশের ঘূর্ণিতে যত সহজে ধরা দেয়, অন্য জিনিসের কণিকা তত সহজে ধরা দেয় না। অবশ্য লোহার সহিত ঐ সকল দ্রব্যের কণিকার কোন প্রভেদ আছে। কিন্তু সেই প্রভেদ কেবল মাত্রাগত প্রভেদ। পৃথিবী নিজেই একটা বৃহৎ চুম্বক। পৃথিবী এই চুম্বকত্ব কোথা হইতে কিরূপে পাইল, তাহা বলা কঠিন। কেহ মনে করেন, উহার গর্ভে কোথাও বড় বড় জোরাল লোহার চুম্বক আছে। কেহ বা মনে করেন, আস্ত পৃথিবীটাই চুম্বক। যাহাই হউক, উহার পার্শ্ববর্ত্তী আকাশে ঘূর্ণি থাকায় লৌহখণ্ড বা ইস্পাতখণ্ড সেই ঘূর্ণিতে পড়িয়া চুম্বকত্ব পায় ও চুম্বকত্ব পাইয়া পৃথিবীরূপ চুম্বকের গোঁ যে দিকে, সেই দিকে হেলিয়া দাঁড়ায়।

তড়িৎপ্রবাহের চুম্বকত্ব

ওয়ার্ষ্টেড নামক পণ্ডিত আবিষ্কার করেন, ধাতু দ্রব্যে পরিচালিত তড়িৎ-প্রবাহেরও চুম্বকের কাঁটাকে ধাক্কা দিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে চাপিয়া ধরিবার প্রবৃত্তি আছে। চুম্বকের কাঁটার জেদ উত্তর দক্ষিণে দাঁড়াইবার জন্য। কিন্তু উহার পাশে যদি উত্তর দক্ষিণে লম্বা করিয়া একগাছি তামার তার ধরা যায়, আর সেই তারে একটা তড়িদ্ভাণ্ড হইতে তড়িৎপ্রবাহ চালান যায়, তখন সেই কাঁটা ধাক্কা খাইয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমের দিকে হেলিয়া দাঁড়ায়। তড়িৎপ্রবাহ যখন ছিল না, তখন কাঁটার জেদ ছিল উত্তর-দক্ষিণে দাঁড়াইবার; তড়িৎ-প্রবাহ চলিবা মাত্র উহার জেদ দাঁড়ায় অন্য মুখে দাঁড়াইবার জন্য। বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণে লম্বা হইয়া দাঁড়াইবার জন্য, অথবা ঈশান হইতে নৈর্ঋতে লম্বা হইয়া দাঁড়াইবার জন্য। যত ক্ষণ তড়িৎপ্রবাহ চলে, তত ক্ষণ ঐ নূতন স্থলে দাঁড়াইবার জেদ থাকে।

ইস্পাতের চুম্বকের কাছে লোহা ধরিলে, ঐ লোহায় যেমন চুম্বকত্বের আবির্ভাব হয়, তড়িৎপ্রবাহের সন্নিধানে লোহা ধরিলে উহাতেও চুম্বকত্বের আবির্ভাব দেখা যায়।

ইহাতে কি বুঝিতে হইবে? ইস্পাতের চুম্বক যেমন পার্শ্ববর্ত্তী আকাশে ঘূর্ণি জন্মায়, তড়িৎপ্রবাহ ধাতুদ্রব্য দিয়া মাত্র বাহির হইবার সময়ও তেমনই পার্শ্বস্থ আকাশে ঐরূপ ঘূর্ণি জন্মাইয়া থাকে। উভয়েরই ফল সমান।

তড়িৎপ্রবাহের চৌম্বক ধর্ম্ম

তড়িৎপ্রবাহের এই ধর্ম্ম থাকায় আমরা উহাকে একটা কাজে লাগাই। কলিকাতায় তড়িদ্ভাণ্ড রাখিয়া, তদুৎপন্ন তড়িৎ তারযোগে দিল্লীতে পাঠান চলে, দিল্লী হইতে সেই প্রবাহ হয় তারপথে অথবা ভূমিপথে আবার কলিকাতার তড়িদ্ভাণ্ডে ফিরিয়া আসে। দিল্লীতে তারের পাশে একটা চুম্বকের কাঁটা রাখিলে, ঐ তারের প্রবাহিত তড়িৎপ্রবাহ ঐ কাঁটাকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া দিবে। ঐ তার দিয়া তড়িৎপ্রবাহ পুনঃ পুনঃ চালাইতে ও থামাইতে থাকিলে কাঁটাতেও পুনঃ পুনঃ ধাক্কা লাগিয়া কাঁটার চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে। এখন কলিকাতার লোকে আর দিল্লীর লোকে আগে হইতে একটা পরামর্শ আঁটিয়া রাখিতে পারে। কাঁটায় একবার ঠেলা পড়িলে হইবে ক, দুই বার পড়িলে হইবে খ, তিন বারে হইবে শ। এইরূপে সঙ্কেত দ্বারা উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা চালান চলিবে। এইরূপে তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া, তদ্দ্বারা দূরের চুম্বকের কাঁটায় নাড়া দিয়া সঙ্কেত দ্বারা সংবাদ প্রেরণের নাম তারে খবর দেওয়া বা টেলিগ্রাম। দূরে খবর দেওয়া কেন, এই উপায়ে আমরা চঞ্চল কাঁটার আঘাতে দূরে ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাজাইতে পারি, পিস্তল ছুঁড়িতে পারি বা আগুন জ্বালিতে পারি।

ও সকল কাজের কথা। বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির গুপ্ত তত্ত্বসমূহ আবিষ্কার করেন, আর কাজের লোকে সেই আবিষ্কৃত তত্ত্বের সহায়তায় নিজের সুবিধা করে ও পরের সুবিধা করিয়া নিজে পয়সা উপার্জ্জন করে। উহা বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। অতএব ও সকল কাজের কথার অধিক আলোচনা এখানে অনাবশ্যক।

একটা তারকে যদি আংটির মত চক্রাকারে জড়াইয়া উহাতে তাড়িত প্রবাহ চালান যায়, তাহা হইলে উহা প্রকৃতই চুম্বকের মত কাজ করে। উহার সম্মুখে একটা চুম্বকের কাঁটা রাখিলে, সেই কাঁটাকে টানিয়া আপনার কেন্দ্রবর্ত্তী করিতে চাহে। কাঁটাটা যেন ঐ তড়িৎপ্রবাহ কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়া আবর্ত্তমধ্যে পড়িয়া আবর্ত্তের টানে তারের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়। এই আকর্ষণটা পরস্পরের প্রতি। আকর্ষণ মাত্রই পরস্পরের প্রতি। পৃথিবী যেমন চন্দ্রকে আকর্ষণ করে, চন্দ্রও তেমনই পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। পৃথিবী যেমন নারিকেলকে টানে, নারিকেলও তেমনই পৃথিবীকে টানে। তারের

তাড়িত প্রবাহ যেমন চুম্বকের কাঁটাকে টানে, চুম্বকের কাঁটাও সেইরূপ তাড়িত প্রবাহ সমেত তারকে টানে। কাঁটাটা যদি চাপিয়া ধরা যায়, আর তারটা স্বাধীন ভাবে বিচরণক্ষম হয়, তাহা হইলে তারটাই কাঁটার অভিমুখে গিয়া কাঁটাকে আপনার কেন্দ্রে স্থাপন করিতে চাহে।

ফলে একটা চুম্বক যেমন আর একটা চুম্বককে আকর্ষণ করে, ঐ তড়িৎ-প্রবাহও তেমনই চুম্বককে ও চুম্বক তড়িৎপ্রবাহকে আকর্ষণ করে। ইহা ত হইবেই। চুম্বকের যে ধর্ম্ম, তড়িৎপ্রবাহেরও সেই ধর্ম্ম। একটা চুম্বক যেমন পার্শ্বস্থ আকাশে আবর্ত্ত উৎপাদন করে, ঐ তড়িৎপ্রবাহও তেমনই আবর্ত্ত উৎপাদন করে। চুম্বকের ক্ষুদ্র কণিকাগুলিও ছোট চুম্বক, হয়ত উহার প্রত্যেক অণুটাই এক একটি ছোট চুম্বক। এই জন্য আম্পেয়ার নামক পণ্ডিত মনে করিয়াছেন যে, চুম্বকের লোহার প্রত্যেক অণুকে বেষ্টন করিয়া তড়িৎপ্রবাহ বহিতেছে। প্রত্যেক অণুকে বেষ্টন করিয়া যেন একটা তড়িৎ-প্রবাহের ছোট আংটি পরান আছে। ঐরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। দুইটা তারের আংটি পরস্পর সমান্তরাল ভাবে রাখিয়া ঐ তারে তড়িৎপ্রবাহ চালাইলেও ঐরূপ ঘটনা দেখা যায়। দুইটা প্রবাহ যেন দুইটা চুম্বক। তড়িৎপ্রবাহ দুই তারে একমুখে চলিলে এ-তারটা ও-তারকে আকর্ষণ করে। উভয়ের আকর্ষণে পরস্পর সন্নিকর্ষে আসিবার চেষ্টা করে। তড়িৎ-প্রবাহ দুই তারে একমুখে না চলিয়া ভিন্নমুখে চলিলে পরস্পর আকর্ষণের পরিবর্ত্তে বিকর্ষণ ঘটে; পরস্পর দূরে যাইবার চেষ্টা করে। একটা চুম্বকের কাঁটার উত্তর মুখ যেমন অন্য কাঁটার উত্তর মুখকে ঠেলিয়া দূরে পাঠাইবার চেষ্টা করে, সেইরূপ।

একটা তারের তড়িৎপ্রবাহ অন্য তারের তড়িৎপ্রবাহকে এইরূপে টানিয়া আনে বা ঠেলিয়া দেয়। তড়িৎপ্রবাহের এই ক্ষমতাকেও কাজের লোকে কাজে লাগাইয়াছে। এই আকর্ষণের ও বিকর্ষণের সাহায্য লইয়াই আজকাল তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা তড়িৎপ্রবাহ টানিয়া বা ঠেলিয়া পাখা টানা হইতে গাড়ী চালান পর্য্যন্ত সাধ্য হইয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় ট্রামগাড়ী তড়িৎপ্রবাহের বলে চলিতেছে; ভদ্রলোকের বাড়ীতে উহারই বলে পাখা টানা হইতেছে। ইহার মূল এইখানে। এ সকল কাজের লোকের কাজের কথা। ইহার আলোচনায় অধিক সময় দিব না।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটা আসল কথা আছে। একটা তারের তড়িৎ-প্রবাহ অন্য তারের তড়িৎপ্রবাহকে টানে; তার সমেত টানে; আবার একটা চুম্বকও তার সমেত তড়িৎপ্রবাহকে টানে। কখনও টানে, কখনও বা ঠেলে। টানুকই আর ঠেলুকই, উহার ফলে গতি উৎপন্ন হয়। যাহা ছিল স্থির, তাহা হয় অস্থির। যাহা ছিল নিশ্চল, তাহা হয় গতিশীল। গতি উৎপাদনের ফল শক্তি উৎপাদন। তামার তার গতিশীল হইলেই উহা খানিকটা ব্যক্ত শক্তি উপার্জ্জন করে। ঐ শক্তি অবশ্য সৃষ্ট হইতে পারে না। শক্তির সৃষ্টি নাই, বিনাশও নাই। বুঝিতে হইবে, গুপ্ত শক্তি রূপান্তরিত হইয়া ব্যক্ত শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। কোন্ শক্তির পরিণামে এই ব্যক্ত শক্তির উৎপত্তি? খুঁজিলেই সন্ধান মিলিবে। দেখা যাইবে, যে তারে তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালিত হইতেছে, সে তারটা যতটা গরম হওয়া উচিত ছিল, ততটা গরম হয় নাই। পরিচালক ধাতু দ্রব্যে তড়িৎপ্রবাহ চলিতে থাকিলে উহা গরম হয়। উহাতে খানিকটা তাপ জন্মে। এ ক্ষেত্রে দেখা যাইবে, তাপের পরিমাণটা কমিয়া গিয়াছে। তাপের পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎপ্রবাহের মাত্রাও কমিয়া গিয়াছে। আচ্ছা, যে সময়ে যতটা তড়িৎ প্রবাহিত হইতেছিল, এখন সে সময়ে ততটা তড়িৎ প্রবাহিত হইতেছে না। মনে করা যাইতে পারে, আগে কেবল ধনতড়িতেরই প্রবাহ তার দিয়া যাইতেছিল, এখন খানিকটা ঋণতড়িতের প্রবাহও উৎপন্ন হইয়া ধনতড়িতের প্রবাহকে কমাইয়া দিয়াছে। অথবা ঋণতড়িতের প্রবাহ চলিতেছিল; এখন খানিকটা ধনতড়িতের প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া উহাকে কমাইয়া দিয়াছে।

চুম্বকের কাছেই হউক, আর তড়িৎপ্রবাহের কাছেই হউক, অন্য একটা তড়িৎপ্রবাহ রাখিলে—জোর করিয়া চাপিয়া স্থির ভাবে রাখিলে, ঐ তড়িৎপ্রবাহের শক্তি কেবলই তাপে পরিণত হয়। তাড়িত ভাণ্ডের মধ্যে দস্তার সহিত গন্ধকদ্রাবকের যোগে যে শক্তির উৎপত্তি হইতেছিল, তাহার সমস্তটাই তারের মধ্যে তাপে পরিণত হয়। কিন্তু ঐ তড়িৎপ্রবাহকে চাপিয়া না ধরিলে উহা তার সমেত গতিশীল হইবে। খানিকটা ব্যক্ত শক্তি উপার্জ্জন করিবে। সঙ্গে সঙ্গে উহাতে তাপের উৎপত্তি কমিয়া যাইবে, তড়িৎপ্রবাহও ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। ধনতড়িতের প্রবাহ থাকিলে ঋণ-তড়িতের প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া, আর ঋণতড়িতের প্রবাহ থাকিলে ধনতড়িতের প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া আদি প্রবাহকে ক্ষীণ করিয়া দিবে।

তারটা যত দ্রুত গতি অর্জ্জন করিবে, উহার তড়িৎপ্রবাহ ততই ক্ষীণ হইবে। এই ক্ষীণ হওয়ার অর্থ উল্টা প্রবাহের উৎপত্তি।

তাই একটা তারকে একটা চুম্বকের কাছে ঘুরাইয়া উহাতে ঋণতড়িতের বা ধনতড়িতের প্রবাহ ইচ্ছামত উৎপন্ন করা চলে। যত দ্রুত ঘুরাইবে, ঐ উৎপাদিত তাড়িত প্রবাহ ততই বলবান্ হইবে। আদি প্রবাহকে ইহা ক্রমেই ক্ষীণ করিবে। এমন কি, আদি প্রবাহ অপেক্ষা এই নূতন প্রবাহকে বলবত্তর করা যাইতে পারে; আদি প্রবাহ অতি ক্ষীণ, এমন কি, নগণ্য হইলেও এই নূতন উল্টা প্রবাহ উহা অপেক্ষা বলবত্তর করা চলে। সে ক্ষেত্রে অবশ্য তড়িদ্ভাণ্ডে উৎপাদিত শক্তিতে কুলায় না। বাহির হইতে শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়; কুলি খাটাইয়াই প্রয়োগ কর বা কয়লা পোড়াইয়া এঞ্জিনযোগেই প্রয়োগ কর। এ কালে ডাইনামো নামক এক বৃহৎ যন্ত্রে এঞ্জিনযোগে বড় বড় তারের আংটি চুম্বকের নিকট বা অন্য ক্ষীণ তড়িৎ-প্রবাহের নিকট ঘুরাইয়া ঐ আংটিতে প্রচুর প্রবাহ জন্মান হইতেছে। এক একটা ডাইনামোতে যেরূপ প্রবল প্রবাহ জন্মে, তাড়িত ভাণ্ডারের সাহায্যে তত প্রবল প্রবাহ উৎপাদন অসম্ভব। এই সকল প্রবল তাড়িত প্রবাহ যোগেই সহরের রাস্তায় ট্রামগাড়ী চালান ও লোকের বাড়ীতে পাখা টানা হইতে বিজলী বাতি জ্বালা পর্য্যন্ত কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা

ভূমিকা

পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা একটি গৃহস্থবংশের ইতিবৃত্ত। সেই পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ, তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন বা ভাবী বংশধর ব্যতীত অন্যের চিত্তাকর্ষণের কোন বিষয় এই গ্রন্থে সম্ভবতঃ নাই। সাধারণের নিমিত্তও এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং ইহার প্রকাশক সাধারণের সমালোচনার সর্ব্বতোভাবে বহির্ভূত।

যে বংশের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, সেই বংশের স্থাপয়িতা সবিতা রায় রাজা মানসিংহের সময়ে পশ্চিম হইতে আসিয়া এই দেশে বাস করেন। এই তিন শত মাত্র বৎসরের প্রাচীনতাও বাঙ্গালা দেশের জমিদারবংশমধ্যে বিরল। এই প্রাচীনতার জন্য, উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে উৎপত্তির জন্য ও সদাচার ও লোকহিতৈষার জন্য এই বংশের স্থানীয় সমাজে প্রচুর প্রতিষ্ঠা আছে। পুণ্ডরীককুলোৎপন্ন জমিদারেরা তিন শত বৎসর কাল স্থানীয় সমাজের নেতৃস্বরূপে নানা হিতকর কার্য্য করিয়া জনসাধারণের সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছেন। এই কারণে এই ইতিবৃত্ত রক্ষার যোগ্য বোধ হইতে পারে।

শুনিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য দেশে অতি ক্ষুদ্র গ্রামেরও ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়; ক্ষুদ্র গৃহস্থ পরিবারও আপনার ইতিবৃত্ত সযত্নে রক্ষা করিয়া স্পর্দ্ধা বোধ করে। বাঙ্গালাদেশে সে রীতি নাই। পুণ্ডরীকবংশ হইতে স্থানীয় সমাজ নানাবিধ উপকার পাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু স্থানীয় সমাজ সেই বংশের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ; এমন কি, এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সবিতা রায়ের নাম পর্য্যন্ত দুই চারি জন লোক ভিন্ন জানে না। সবিতা রায় ও রাজা নীলকণ্ঠ রায়ের মধ্যবর্ত্তী কয়েক পুরুষের নাম কোন ব্যক্তিই বলিতে পারে না। এমন কি, সবিতা রায়ের বর্ত্তমান বংশধরগণও নীলকণ্ঠ রায়ের পূর্ব্বতন কালের বৃত্তান্ত ও তদানীন্তন স্বকীয় পূর্ব্বপুরুষগণের নাম পর্য্যন্তও সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গিয়াছেন। পুণ্ডরীকবংশের সম্পত্তি কি সূত্রে গৌতমগোত্রীয়গণের হস্তে যায়, তাহারও কেহ সদুত্তর দিতে পারে না। সৌভাগ্যক্রমে পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকার একখানি তেরেটের পুঁথি অর্দ্ধচ্ছিন্ন অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। সে বৎসর ভূমিকম্পের পর পরিত্যক্ত জঞ্জালরাশির মধ্যে আর একখানি তুলোট কাগজে লেখা পুঁথি পাওয়া যায়। এই দুইখানি পুঁথির পাঠ উদ্ধারের পর পঞ্জিকা প্রকাশযোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তি-

পঞ্জিকা গ্রন্থখানি প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বংশীবদন নামক ব্রাহ্মণের রচিত। সে সময়ে সন্তোষ রায় ও তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ জীবিত ছিলেন। তৎপরবর্ত্তী কালের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে কিছু কষ্ট পাইতে হইয়াছে। অনুসন্ধানে দুইটি মোকদ্দমার দুইখানি বিভিন্ন ফয়শালা পাইয়াছিলাম; একখানি পারসীতে লেখা; আর একখানি মূল কাগজের বাঙ্গালায় তর্জ্জমা। এই দুইখানি ও অন্য নানাবিধ কাগজপত্র অবলম্বন করিয়া পঞ্জিকার পরবর্ত্তী শত বৎসরের বৃত্তান্ত সঙ্কলন করা গেল। এইরূপে তিন শত বৎসরের ধারাবাহিক বিবরণ সংগৃহীত ও পরিশিষ্টমধ্যে সঙ্কলিত হইল। মূলের অনুবাদ ও পরিশিষ্টের সমগ্র ভাগ প্রকাশকের লিখিত।

পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকার প্রকাশক পুণ্ডরীককুলের সহিত চারি পুরুষ ব্যাপিয়া অচ্ছেদ্য আত্মীয় সম্পর্কে আবদ্ধ; এই পঞ্জিকা প্রকাশ করিয়া আমি আমার একটা প্রধান কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলাম মাত্র।

কলিকাতা
১৩০৭ সাল, ভাদ্র।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

পরিশিষ্ট

১। পুণ্ডরীক বংশ ও জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ

ফতেসিংহ রাজবংশ পুণ্ডরীক গোত্রে উৎপন্ন। পুণ্ডরীকবংশীয়েরা আপনাদিগকে পুণ্ডরীক-গোত্র, পুণ্ডরীক-অঘমর্ষণ-অসিতদেবল-প্রবর, যজুর্ব্বেদান্তর্গত মাধ্যন্দিনশাখাধ্যায়ী জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করেন। জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণেরা কণৌজিয়া বা কান্যকুব্জ শ্রেণীর অন্যতম শাখা বলিয়া পরিচিত। ফতেসিংহ বংশের আদিপুরুষ সবিতা রায় দীক্ষিত উপাধিধারী ছিলেন। বাঙ্গালায় আসিবার পূর্ব্বে সবিতা রায়ের নিবাস কোথায় ছিল জানা যায় না। পুণ্ডরীক বংশকে আশ্রয় করিয়া কয়েক ঘর জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ ফতেসিংহ-মধ্যে বাস করিয়াছেন। জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত করিতে বাধ্য হইলাম।

> From the accounts of Abu Rihan and Ibn Batuta, it is evident that the province of Jajhoti corresponded with the modern district of Bundelkhand * * * Bundelkhand in its widest extent is said to have comprised all the country to the south of the Jumna and Ganges, from the Betwa river on the west to the temple of Vindhyavasini Devi on the east, including the districts of Chanderi, Sagar and Bilhari near the sources of the Narbada on the south. But these are also the limits of the ancient country of the Jajhotiya Brahmans, which according to Buchanan's information, extended from the Jumna on the north to the Narbada on the south, and from Urcha on the Betwa river on the west to the Bundela Nala on the east. The last is said to be a small stream which falls into the Ganges near Benares and within two stages of Mirzapur. During the last twenty-five years I have traversed this tract of country repeatedly in all directions and I have found the Jajhotiya Brahmans distributed over the whole province, but not a single family to the north of the Jumna or to the west of the Betwa. * * * The Brahmans derive the name of Jajhotiya fron *Yajur-hota* an observer of the Yajur-veda, but as the name is applied to the Baniyas or grain-dealers, as well as to the Brahmans, I think it almost certain that it must be

a mere geographical designation derived from the name of the country Jajhoti. This opinion is confirmed by other well known names of the Brahmanical tribes, as *Kanojiya* from Kanoj, *Gaur* from Gaur, *Sarwariya* or *Sarjupariya* from Sarjupar, *Dravira* from Dravira in the Dekhan, *Maithila* from Mithila etc. These examples are sufficient to show the prevalence of geographical names amongst the divisions of the Brahmanical tribes and as each division is found most numerously in the province from which it derives its name, I conclude with some certainty that the country in which the Jajhotiya Brahmans preponderate must be the actual province cf Jajhoti. (A CUNNINGHAM : *Ancient Geography of India*, i. 481-483.)

তাৎপর্য্য :—আবু রিহাণাদির বর্ণনা অনুসারে বোধ হয়, জঝোতি প্রদেশ বর্ত্তমান বুঁদেলখণ্ড। আসল বুঁদেলখণ্ডের সীমা উত্তরে গঙ্গা ও যমুনা, পশ্চিমে বেটোয়া নদী, পূর্ব্বে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির, দক্ষিণে চন্দেরী, সাগর ও নর্ম্মদার উৎপত্তিস্থান বিলহারী জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সীমার মধ্যে জঝোতিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রাচীন দেশ বর্ত্তমান। বুকানানের মতে জঝোতিয়ার বাসভূমি উত্তরে যমুনা হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদা এবং পশ্চিমে বেটোয়া তীরস্থ উর্চা হইতে পূর্ব্বে বুঁদেলা নালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বুঁদেলা নালা মির্জাপুর হইতে দুই চটি মাত্র দূরে কাশীর নিকটে গঙ্গায় পড়িতেছে; গত পঁচিশ বৎসর মধ্যে আমি এই সমগ্র প্রদেশে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়াছি; দেখিয়াছি, এই সমগ্র প্রদেশে জঝোতিয়া ব্রাহ্মণ বাস করে; কিন্তু যমুনার উত্তরে বা বেটোয়ার পশ্চিমে এক ঘরও জঝোতিয়া দেখি নাই। * * * জঝোতিয়াগণের মতে জঝোতিয়া নাম যজুর্হোতা শব্দের অপভ্রংশ; কিন্তু জঝোতিয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত জঝোতিয়া বণিকেরও অস্তিত্ব দেখিয়া আমার বিশ্বাস, জঝোতিয়া নাম 'জঝোতি' দেশের নাম হইতে উৎপন্ন। এইরূপ অন্যান্য স্থলেও দেখা যায়। কণৌজিয়া কণোজ হইতে, গৌড়ীয়া গৌড় হইতে, সরৌরিয়া সরযূপার হইতে, দ্রাবিড়ী দাক্ষিণাত্য দ্রাবিড় হইতে ও মৈথিলী মিথিলা হইতে উৎপন্ন। এই সকল উদাহরণে বোধ হয়, ব্রাহ্মণগণের শ্রেণীবিভাগ ভৌগোলিক নামানুসারেই হইয়াছে; অপিচ যে প্রদেশের নামে যে শ্রেণী, সেই প্রদেশেই সেই শ্রেণীর আধিক্য দেখা যায়। আমার সিদ্ধান্ত এই, যে প্রদেশে জঝোতিয়া ব্রাহ্মণের বাস, সেই প্রদেশের নাম জঝোতি।

সার্ হেন্‌রি ইলিয়ট তাঁহার *Memoirs of the Races of the North-Western Provinces of India* গ্রন্থে জিঝোতিয়াদিগের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। উক্ত গ্রন্থের বীম্‌স

সাহেবের প্রকাশিত ১৮৬৯ সালের সংস্করণে প্রথম ভাগে ১৪৯ পৃষ্ঠে সংলগ্ন যে মানচিত্র আছে, তাহাতে সরোয়ারিয়া, জিঝোতিয়া, কণৌজিয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অবস্থান প্রদর্শিত হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের উত্তরে বুঁদেলখণ্ডের দক্ষিণাংশে জিঝোতিয়াগণের অবস্থান নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

উইলিয়ম কুক তাঁহার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসিগণের বিবরণ বিষয়ক গ্রন্থের (*Tribes and Castes of the N. W. Provinces and Oudh*) তৃতীয় খণ্ডে জিঝোতিয়াগণের নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ দিয়াছেন :—

> *Jhijhotiya*, Jajahutiya—A branch of the Kanoujiya Brahmans who take that name from the country Jejakasukti, which is mentioned in the Madanpur inscription. Of this General Cunningham writes :—
>
> The first point deserving of notice in these two short but precious records is the name of the country, Jejakasukti, which is clearly the Jajahuti of Abu Rihan. The meaning of the word is doubtful, but it was certainly the name of the country, as it is coupled with *desa*. I may add, also, that there are considerable numbers of Jajahutiya Brahmans and Jajahutiya Baniyas in the old country of the Chandels of Bundelkhand. I would identify Jajahuti with the district of Sandrabatis of Ptolemy, which contained four towns, named Tamasis, Empalathra, Kuro povina and Nandubandgar.
>
> * * * *
>
> The *Jami-ut-tawarikh* of Rashid-ud-din quoting from Abu Rihan al Biruni, mentions the kingdom of Jajhoti as containing the cities of Gwalior and Kalinjar and that its capital was at Khajuraho. The popular and incorrect explanation is that they are really Yajurhota Brahmans, because, in making burnt offerings they follow the rules of the Yajurveda.
>
> 2. According to a list procured at Mirzapur their gotras are Awasthi, Bhareriya Tivari, Arjuriya Kot, Gautamiya of Ladhpur, Patariya of Kannaura, Pathak of Kalyanpur, Gangele of Matayaya, Richhatiya of Pipari, Bajpei of Binware, Dikshit of Panna, Kariya Misra, Sandele Misra. The above fifteen gotras intermarry on equal terms. Below these are five, which are lower and give daughters to the higher fifteen, but are not given by

them in return. These are Sirsa, Soti, Sonakiya, Ranaiya, Bhonreli Dube. This list has little resemblance to that given by Mr. Sherring (*Hindu Castes*, i. 56).

কুক সাহেবের উক্তির মর্ম্ম এই :—

জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ কণৌজিয়ার শাখা। মদনপুর-লিপিতে যে যেজাকভুক্তি নামক দেশের উল্লেখ আছে, কনিংহাম সাহেব বলেন, এই দেশ ও আবু রিহাণের উল্লিখিত জঝোতি প্রদেশ অভিন্ন। তাঁহার অনুমানের ভিত্তি এই যে, চন্দেল জাতির প্রাচীন অবস্থানভূমি বুঁদেলখণ্ডে জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ ও জিঝোতিয়া বণিক্ অত্যাপি বাস করে। গ্রীক ভূগোলবিৎ টলেমির উল্লিখিত Sandrabatis প্রদেশও এই স্থান বলিয়া কনিংহামের ধারণা। আল বিরুণি বলিয়াছেন, গোয়ালিয়র ও কালঞ্জর নগর জঝোতি প্রদেশের অন্তর্গত। কুক সাহেব মির্জাপুর হইতে জিঝোতিয়াগণের পঞ্চদশ গোত্রের নাম সংগ্রহ করিয়াছেন এবং বলেন, তদ্ভিন্ন আরও নিম্নবর্ত্তী পাঁচ গোত্র আছে, ইহারা উচ্চতর গোত্রে কন্যা দান করে, কিন্তু তাহাদের কন্যা গ্রহণ করিতে পারে না।

১৮৭১ সালের সেনসস হইতে জিঝোতিয়াগণের সংখ্যা নির্দ্দেশ কুক সাহেবের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইল :—

সাহারাণপুর	...	...	১
আগরা	...	...	১
ইটা	...	...	১
বেরিলি	...	...	৪
কাণপুর	...	...	৭৭
বান্দা	...	...	৭৩৪
হামিরপুর	...	...	৯৪৯৭
ঝাঁসি	...	...	২০৫১৯
জালৌন	...	...	১১১৪০
ললিতপুর	...	...	১৬২৫৮
গাজিপুর	...	...	১৩২
গোরখপুর	...	...	৩১৮৪
ফয়জাবাদ	...	...	৭৪

ফতেসিংহমধ্যে যে কয়েক ঘর জিঝোতিয়া আছেন, তাঁহাদের উপাধি দীক্ষিত, ত্রিবেদী (তেওয়ারি), চতুর্ব্বেদী (চৌবে), দ্বিবেদী (দুবে),

বাজপেয়ী, উপাধ্যায় ও মিশ্র। জমিদারী বা লাখেরাজ ভূসম্পত্তি ও কৃষি হইতে ইঁহাদের জীবিকা চলে. যাজনকার্য্য সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। কণৌজিয়া ও মৈথিলী ব্রাহ্মণ হইতে ইঁহারা পুরোহিত গ্রহণ করেন। উপনয়ন ও বিবাহ ব্যতীত প্রায় সকল বিষয়েই ইঁহারা বঙ্গদেশপ্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা ও বঙ্গদেশপ্রচলিত আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষা ও পরিচ্ছদে এখন সকলেই বাঙ্গালি; বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে আচারানুষ্ঠান ভিন্ন কোন বিষয়েই পশ্চিম দেশের চিহ্ন পাওয়া যায় না।

২। সবিতা রায়

ফতেসিংহ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা সবিতা রায় সম্বন্ধে কিংবদন্তী যাহা এখনও প্রচলিত আছে, তাহা এইরূপ।

আকবর সাহের সময়ে এই প্রদেশ এক জন হাড়ি রাজার অধীন ছিল। হাড়ি রাজার নাম ফতেসিংহ; তদনুসারে প্রদেশের নাম ফতেসিংহ। হাড়ি রাজার রাজধানী ফতেপুর গ্রাম কান্দির দক্ষিণ পশ্চিমে তিন ক্রোশ মধ্যে। হাড়ি রাজা বাদশাহের বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। রাজা মানসিংহ এই পথে যাইবার সময় হাড়ি রাজাকে দমন করেন। মানসিংহের সেনাধ্যক্ষ অথবা বকশী সবিতা রায় হাড়ি রাজাকে পরাস্ত করেন; ফতেপুর হইতে অনতিদূরে যেখানে হাড়ি-বংশের ধ্বংস হয়, সে স্থানকে অদ্যাপি মুণ্ডমালা বলে। সবিতা রায় পুরস্কারস্বরূপ ফতেসিংহ পরগণা ও পলাশী পরগণা লাভ করেন।

পুণ্ডরীককুলের প্রাচীন পুরোহিতবংশীয় ৺ হরিশ্চন্দ্র দুবের বাটীতে একখানি পুঁথির পাতায় সবিতা রায়ের বংশাবলী লিখিত আছে; তাহাতে সবিতা রায়ের পিতার নাম বসন্ত রায় লিখিত আছে। পুত্রপৌত্রাদির নাম পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকায় লিখিত নামের সহিত অভিন্ন।

পঞ্জিকামতে সবিতা রায়ের পরিচয় এইরূপ :—সবিতা, দুই পুত্র ও চারি পৌত্র সঙ্গে লইয়া মানসিংহের সহিত বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। "কোচাড়, কোচবিহার ও খরগপুর" যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া তিনি মানসিংহের প্রীতি উৎপাদন করেন। মানসিংহ তাঁহাকে দিল্লী লইয়া গিয়া বাদশাহের প্রদত্ত ভূমি ভোগের সনন্দ দেওয়ান। পরে "কায়স্থ রাজা," "শূর সয়িদ" ও "হড়িডপ"গণকে পরাস্ত করিয়া সবিতা রায় ফত্তেসিংহের অধিকার লাভ

করেন। বাদশাহের অনুগ্রহে তাঁহার ভূসম্পত্তি আরও বিস্তার লাভ করে। পরে পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র রাখিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাঘডাঙ্গা গ্রামে রামসাগর পুষ্করিণী হইতে এক খণ্ড প্রস্তর কয়েক বৎসর হইল বাহির হইয়াছিল। প্রস্তরে বাঙ্গালা অক্ষরে কয়েকটা কথা অঙ্কিত আছে। তন্মধ্যে এই কয়েকটা শব্দ পড়িতে পারা যায়। তারিখের অঙ্কটা কিছু অস্পষ্ট।

নমো নারায়ণায়। শুভমস্তু। গগন রায়। রায়সেন রায়। জয়রাম রায়। উত্তম রায়। * * * * সন ১০০৯।

পঞ্জিকামতে সবিতার পুত্র ধারিক ও অজয়ী। ধারিকের পুত্র গঙ্গন। তৎপুত্র রায়সেন। অজয়ীর পুত্র উমা, কমলা ও কস্তুরী। উমার পুত্র জয়রাম, উত্তম ও ভীম। সবিতা, দুই পুত্র ও চারি পৌত্র লইয়া বাঙ্গালায় আসেন।

শিলালিপির তারিখ যদি প্রকৃতই ১০০৯ হয়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ ঐ সময়ের পূর্ব্বে সবিতা ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু হইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ ভীমরায়ের তখনও জন্ম হয় নাই।

৩। ফত্তেসিংহ

মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ কান্দি সবডিবিশন ; ইহার পূর্ব্বসীমা ভাগীরথী, দক্ষিণে বর্দ্ধমান জেলা, পশ্চিমে বীরভূম জেলা। মহকুমার হেড কোয়াটার্স কান্দি উত্তরবাহিণী ময়ূরাক্ষী নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। কান্দি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম; সবডিবিশনাল অফিসার ব্যতীত দুই জন মুন্‌সেফ, স্কুল, ডাক্তারখানা প্রভৃতির অবস্থানে উন্নতিশীল। কান্দি মিউনিসিপালিটির পাঁচটি ওয়ার্ড ; কান্দি, জেমো, বাঘডাঙ্গা, রসোড়া ও ছাত্তিনাকান্দি। মিউনিসিপালিটির এলাকায় লোকসংখ্যা দশ হাজারের কিছু অধিক।

জেমো ও কান্দি একত্র করিয়া গ্রামকে জেমোকান্দি বলাও রীতি আছে। জেমোকান্দি হইতে ভাগীরথী প্রায় চারি ক্রোশ পূর্ব্বে। মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বিলের ব্যবধান।

কান্দি-সবডিবিশনের মধ্যে কান্দি ও ভরতপুর থানার প্রায় সমগ্র ভাগ, এবং বড়োঁয়া, গোকর্ণ ও খড়গ্রাম থানার কিয়দংশ লইয়া ফতেসিংহ পরগণা।

ফতেসিংহ পরগণার বিস্তৃতি পূর্ব্বে আরও অধিক ছিল। কয়েকটি বড় বড় টুকরা ফতেসিংহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ পরগণার সৃষ্টি করিয়াছে। গোপীনাথপুর, রাধাবল্লভপুর, কান্তনগর, মুনিয়াডিহি প্রভৃতি ফতেসিংহ হইতে খারিজ হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। ফতেসিংহের উত্তরবর্ত্তী মহলন্দী পরগণার অধিকাংশ গোকর্ণ ও খড়গ্রাম থানাভুক্ত।

আইন-ই-আকবরিতে সরকার শরীফাবাদ মধ্যে ফতেসিংহের ও মহলন্দীর উল্লেখ আছে। ফতেসিংহের রাজস্ব ২০৯৬৪৬০ দাম ও মহলন্দীর রাজস্ব ১৮৩১৮৯০ দাম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। চল্লিশ দাম এক টাকার সমান।

রেনেলের আটলাসে ফতেসিংহ পৃথক্‌রূপে চিহ্নিত আছে। উত্তরে রাজসাহী রাজ্য, পূর্ব্বে ভাগীরথীর পরপারে নদীয়া রাজ্য, দক্ষিণে বর্দ্ধমান ও পশ্চিমে বীরভূম, এই চারি প্রকাণ্ড জমিদারীর মধ্যে ক্ষুদ্রায়তন ফতেসিংহের জমিদারী তৎকালে অবস্থিত ছিল। ফতেসিংহের তাৎকালিক সীমা পূর্ব্বে ভাগীরথী; উত্তরে ময়ূরাক্ষীসংযুক্ত দ্বারকা, পশ্চিমে ময়ূরাক্ষী; দক্ষিণ সীমানা পার হইয়া কিছু দূর গেলে অজয় নদী। চতুঃসীমায় বেশী পরিবর্ত্তন হয় নাই।

ফতেসিংহ নাম সম্বন্ধে স্থানীয় জনশ্রুতি যে, ফতেসিংহ নামক হাড়ি রাজা হইতে পরগণার নামের উৎপত্তি। এই ফতেসিংহকে পরাস্ত করিয়া সবিতা রায় জমিদারী লইয়াছিলেন।

হণ্টার সাহেব তাঁহার *Annals of Rural Bengal* গ্রন্থের প্রথম ভাগের পরিশিষ্টে বীরভূম সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে উল্লেখ দেখা যায়, বীরসিংহ ও ফতেসিংহ দুই ভ্রাতা পশ্চিম হইতে আসিয়া এই প্রদেশে রাজ্য স্থাপন করেন; তাঁহাদের নামানুসারে বীরভূমি ও ফতেসিংহ নাম উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্লকমান সাহেব তাঁহার বাঙ্গালার ভৌগোলিক বিবরণ মধ্যে অনুমান করিয়াছেন যে, বাঙ্গালার পাঠান অধিপতি ফতে শাহ ও বরবাক শাহ হইতে ফতেসিং ও বরবাক সিং, এই দুই সন্নিহিত পরগণার নাম উৎপন্ন হইয়াছে।

ফতেসিংহের ভূমির অধিকাংশ বর্ষার সময় জলমগ্ন হয়। দ্বারকা ও ময়ূরাক্ষী উভয় নদী ছোটনাগপুরের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া বীরভূমি হইতে ফতেসিংহে প্রবেশ করিয়াছে ও ফতেসিংহকে বর্ষাকালে ভাসাইয়া গঙ্গায় পতিত হইতেছে। ময়ূরাক্ষী দ্বারকার সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণ মুখে প্রায় কাটোয়ার নিকট পর্য্যন্ত গিয়া গঙ্গায় মিশিয়াছে। ভাগীরথীর

ঠিক পশ্চিম তীরবর্ত্তী ভূমিটা উচ্চ; এই ভূমিতে শুঙ্গায়ী, জগন্নাথপুর, রাঙ্গামাটি, যত্নপুর প্রভৃতি গ্রাম। এই উচ্চ ভূমি ও পশ্চিম রাঢ়ের উচ্চ ভূমির মধ্যে দ্বারকা ও ময়ূরাক্ষীর জল পতিত হইয়া বর্ষার সময় সমস্ত প্রদেশটাকে প্লাবিত করিয়া দেয়। সমগ্র প্রদেশটা বিল ও খালে পরিপূর্ণ। আরও পূর্ব্বকালে এই নিম্ন ভূমির বিস্তার আরও অধিক ছিল। দ্বারকা ও ময়ূরাক্ষীর আনীত মৃত্তিকায় বৎসর বৎসর পুরিয়া উঠিতেছে। চাঁদ সদাগরের নৌকা উত্তরবর্ত্তী পাটনের বিল বাহিয়া নবদুর্গা গোলাহাটের পাশ দিয়া গিয়াছিল, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। সে সময়ে এই নিম্ন ভূমি আরও নিম্ন ও আরও বিস্তীর্ণ ছিল সন্দেহ নাই।

ফতেসিংহ পরগণার উত্তরপ্রান্তবর্ত্তী গোকর্ণ থানার অন্তর্গত রাঙ্গামাটি গ্রাম সম্প্রতি প্রত্নবিৎ পণ্ডিতদিগের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

রাঙ্গামাটি গ্রাম কান্দি হইতে উত্তর-পূর্ব্বে সাত ক্রোশ দূরে বহরমপুরের কিছু দক্ষিণে গঙ্গার পশ্চিম তীরে উচ্চ রক্তবর্ণ ভূমির উপর অবস্থিত। এই রক্তবর্ণ মৃত্তিকা বীরভূমির লাল মাটির পূর্ব্বসীমান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালার ডেলটা বা ব-দ্বীপের পশ্চিম সীমায় এই লাল মাটি। ছোটনাগপুরের পাহাড়মধ্যে বিদ্যমান লোহার স্পর্শে মৃত্তিকার বর্ণ এইরূপ; দ্বারকা প্রভৃতি রাঢ়ের নদীর জলও এই কারণে রক্তবর্ণ। রাঙ্গামাটি গ্রামে প্রাচীন কালে সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল, এইরূপ স্থানীয় জনশ্রুতি। প্রাচীন অট্টালিকাদির অবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। রাজবাড়ী, রাক্ষসীডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান প্রাচীন স্মৃতির পরিচায়ক। জনশ্রুতি—লঙ্কার বিভীষণ আসিয়া স্থবর্ণ বৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদবধি ভূমির বর্ণ লাল। কৃষকেরা মাঝে মাঝে প্রাচীন মুদ্রাদি পাইয়া থাকে। রাঙ্গামাটির প্রাচীন তত্ত্ব লেয়ার্ড, বেবারিজ প্রভৃতি ইংরাজেরা সংগ্রহ করিয়াছেন। হণ্টারের *Statistical Accounts*-এর অন্তর্গত মুর্শিদাবাদের বিবরণমধ্যে তৎকালসংগৃহীত সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে। মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট জজ ঐতিহাসিক বেবারিজ সাহেবের অনুমান মতে রাঙ্গামাটি প্রাচীন কর্ণস্থবর্ণ রাজ্যের রাজধানী। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হুয়েং চাং এই রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে রত্নাবলীপ্রণেতা হর্ষবর্দ্ধন আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ ছিলেন। তিনি কর্ণস্থবর্ণের অধিপতি শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। নরেন্দ্র গুপ্ত বাণভট্টপ্রণীত হর্ষচরিতে গৌড়েশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই

গৌড়েশ্বর বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। ইনি হর্ষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ডের কথা ও তাহার প্রতিশোধার্থ হর্ষবর্দ্ধনের গৌড়দেশ আক্রমণের কাহিনী হর্ষচরিতে বিবৃত হইয়াছে। হুয়েং চাংএর সময়ে কর্ণসুবর্ণ মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের যথেষ্ট প্রচার ছিল। রাক্ষসীডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান বৌদ্ধ মঠের ভগ্নাবশেষ বলিয়া পুরাবিদেরা অনুমান করেন।

হুয়েং চাং কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে লোচোমোচি নামক স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। লোচোমোচি প্রাকৃত লত্তমত্তি শব্দের অপভ্রংশ। প্রাকৃত লত্তমত্তি সংস্কৃত রক্তমৃত্তি হইতে উৎপন্ন। রক্তমৃত্তি বাঙ্গালায় রাঙ্গামাটি।

হুয়েং চাংএর সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্মে পরিণত হইতেছিল। উত্তররাঢ় প্রদেশে জেমোকান্দির উত্তরে পশ্চিমে ও দক্ষিণে কয়েক ক্রোশের মধ্যে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ পীঠস্থানের অবস্থিতি। আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্রই এই সময় বৌদ্ধ মঠ সকল শৈব বা শাক্ত মঠে পরিণত হইতেছিল; বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি সকল হিন্দু দেবমূর্ত্তির নাম গ্রহণ করিতেছিল। সম্ভবতঃ পাল রাজাদের অন্তিম সময়ে বৌদ্ধ উপাসনা বিকার লাভ করিয়া ধর্ম্ম-পূজাদিতে পরিণত হইতেছিল। ফতেসিংহ প্রদেশে ধর্ম্মপূজা অদ্যাপি বিস্তৃতভাবে প্রচারিত আছে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই বৈশাখী পূর্ণিমায়, ক্বচিৎ বা জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হয়। নিম্ন শ্রেণীর লোকে পরম উৎসাহে ধর্ম্মপূজায় যোগ দেয়। ধর্ম্মের উপাসনায় যে সকল অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্ত অনার্য্য ও বীভৎস। ডাক্তার ওয়াডেল কর্ত্তৃক বর্ণিত তিব্বত মধ্যে ও সিকিম মধ্যে প্রচলিত লামাধর্ম্মের বিবিধ অনুষ্ঠানের সহিত এই অঞ্চলের ধর্ম্মপূজার প্রচলিত অনুষ্ঠান সকলের সাদৃশ্য বিস্ময়জনক।

পাঠান অধিকারকালে এই প্রদেশের দুর্গতি ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। সেই সময়ে বিস্তর লোক মুসলমানধর্ম্ম আশ্রয় করে। ফতেসিংহে অনেক গ্রাম অদ্যাপি মুসলমানপ্রধান এবং অনেকগুলি ধনবান্ সম্ভ্রান্ত ও সদাচার মুসলমান গৃহস্থের বাস। মুসলমানেরা সর্ব্বত্রই হিন্দুর সহিত সদ্ভাবে বাস করেন।

চৈতন্যদেব ও তাঁহার পরবর্ত্তী কালে ফতেসিংহ অঞ্চলে বৈষ্ণব মতের প্রচুর প্রতিষ্ঠা ঘটে। মালিহাটি গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধরেরা বাস করেন। এই বংশের রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের সঙ্কলনকর্ত্তা।

পদকল্পতরুর সংগ্রাহক গোকুলানন্দ সেন ও কৃষ্ণকান্ত মজুমদার টেঁয়াগ্রামের অধিবাসী।

ফতেসিংহ উত্তররাঢ়ী কায়স্থসমাজের কেন্দ্রস্থল। কোন্ সময়ে কি উপলক্ষ্যে উত্তররাঢ়ী কায়স্থেরা এ দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। সম্ভবতঃ পাঠান রাজত্বকালে কোন একটা রাষ্ট্রবিপ্লব উপলক্ষ্যে তাঁহাদের এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা হয়। কান্দি, জেমো, রসোড়া, পাঁচথুপী, যজান প্রভৃতি উত্তররাঢ়ী কায়স্থসমাজের প্রধান স্থানগুলি ফতেসিংহের অন্তর্গত। কান্দি সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবুর বাসস্থান। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের বংশধরগণ পাইকপাড়ায় প্রবাসী হইলেও তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া কান্দির প্রতিষ্ঠা। কান্দি রাজবংশে মহানুভাব উদারচরিত রাজা প্রতাপচন্দ্রের ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের ও কুমার গিরিশচন্দ্রের নাম ফতেসিংহের অধিবাসিগণ কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সহিত চিরকাল স্মরণ করিবে।

বাঙ্গালা দেশে মোগল অধিকার স্থাপনার সমকালে পুণ্ডরীকবংশধর সবিতা রায় ফতেসিংহের জমিদারী প্রাপ্ত হন। পুণ্ডরীক বংশের আশ্রয়ে জিঝোতিয়া, কণৌজিয়া ও ভূমিহার প্রভৃতি পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণ অনেকে ফতেসিংহে বাস করিয়াছেন। ফতেসিংহের জমিদারেরা প্রজাবৎসল ও দানশীল বলিয়া বিখ্যাত। অনেকে নূতন গ্রাম স্থাপন ও জলাশয় প্রতিষ্ঠাদি করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গ্রাম ও জলাশয় স্থাপয়িতাদের নামানুসারে অদ্যাপি বিখ্যাত।

৪। মানসিংহ

"ক্ষিতিপতিতিলক মানসিংহ দিল্লীশ্বরকর্ত্তৃক বঙ্গের দুষ্ট নৃপতিগণের বিজয়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য প্রতাপবান্ সবিতা রায়, দুই পুত্র ও চারি পৌত্রের সহিত বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন।"

নিম্নোক্ত বিবরণ ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বাঙ্গালার ইতিহাস (১১৪-১২১ পৃ.) ও ব্লকমানের সম্পাদিত আইন-ই-আকবরি প্রথম ভাগ মধ্যে প্রদত্ত মানসিংহের বিবরণ হইতে সঙ্কলিত হইল।

রাজা মানসিংহ দিল্লীশ্বর আকবর কর্ত্তৃক বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া ১৫৮৯ খ্রীঃ অব্দে, হিজিরা ৯৯৭ অব্দে পাটনায় উপস্থিত হয়েন। বিহারে অবস্থান করিয়া তিনি গিধোরের জমিদার পূরণ মল্ল ও খরগপুরের জমিদার সংগ্রাম সিংহ সহায়কে দমন করেন। এই বৎসরকেই সবিতা রায়ের বাঙ্গালা আগমনের কাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। পঞ্জিকামতে সবিতা রায় খরগপুরের যুদ্ধে খ্যাতি লাভ করেন। তাহা হইলে পুণ্ডরীক-বংশীয়গণের বাঙ্গালায় বাস ঠিক তিন শত দশ বৎসর হইল।

পর-বৎসর মানসিংহ ঝারখণ্ড অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী তিন বৎসর কাল উড়িষ্যাবাসী পাঠানগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। পাঠানেরা প্রথমে কতলু খাঁর অধীন ও তাঁহার মৃত্যুর পর সলেমান ও ওসমানের অধীন হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল। এই সময়ে মানসিংহ রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৫৯৪ সালে মানসিংহ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছিলেন।

এই সময়ে কোচবিহারপতি রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহকে ভগিনী সম্প্রদান করিয়া দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন। তাঁহার আত্মীয় জন ও সামন্তবর্গ এই জন্য বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার উদ্যোগ করিলে মানসিংহ ১৫৯৬ খ্রীঃ অব্দে হিজাজ খাঁকে সেনা সহ কোচবিহার প্রেরণ করেন। হেজাজ খাঁ রাজাকে মুক্ত করিয়া স্বপদে স্থাপন করিয়া আসেন। সবিতা রায় সম্ভবতঃ এই সময়েই কোচবিহারে যুদ্ধার্থ উপস্থিত ছিলেন।

১৫৯৮ অব্দে মানসিংহ বাদশাহের আজ্ঞাক্রমে বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাপথে যুদ্ধার্থ শাহজাদা সেলিমের সহিত যোগ দেন। মানসিংহের অনুপস্থিতি সুযোগে পাঠানেরা পুনরায় বাঙ্গালার কিয়দংশ অধিকার করিল।

মানসিংহ পুনরায় বাঙ্গালায় ফিরিতে বাধ্য হইলেন ও শেরপুর আতাইয়ের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যুদ্ধে পাঠানদলপতি ওসমানকে পরাস্ত ও দূরীভূত করিলেন। শেরপুর আতাই ফতেসিংহ পরগণার সংলগ্ন; বর্ত্তমান কালে খড়গ্রাম থানার সামিল ও জেমোকান্দির উত্তরে পাঁচ ক্রোশ মধ্যে অবস্থিত। সবিতা রায় সম্ভবতঃ এই সময়েই ফতেসিংহের হাড়ি রাজাকে পরাস্ত করিয়া ফতেসিংহ পরগণা পুরস্কার লাভ করেন।

এই যুদ্ধের পর মানসিংহ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে সাতহাজারী মনসবদার-পদে উন্নীত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে

বাদশাহের পুত্র পৌত্র ভিন্ন কোন হিন্দু বা মুসলমান এই উন্নত পদ প্রাপ্ত হন নাই। সম্ভবতঃ সবিতা রায় এই সময়েই মানসিংহের সহিত বাদশাহের সমীপে গমন করিয়া ফারমান লইয়া আসিয়াছিলেন। চারি বৎসর পরে ১৬০৪ খ্রীঃ অব্দে বাদশাহের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া রাজধানীতে গমন করেন। সেখানে সেলিমের বিপক্ষে তাঁহার ষড়্‌যন্ত্র ব্যর্থ হয়। পর-বৎসরে সেলিম (জাঁহাগীর) সাম্রাজ্য লাভের পর মানসিংহকে পুনরায় বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন। এবার মানসিংহ আট মাস মাত্র বাঙ্গালায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই সময়েই তাঁহার বর্দ্ধমানে ভবানন্দ মজুমদারের সহিত সাক্ষাৎ ও বল্লভপুরে ভবানন্দ-ভবনে অন্নদামঙ্গল-বর্ণিত আতিথ্য গ্রহণ ঘটে। ফিরিবার সময় মানসিংহ রাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া লইয়া যান। ভবানন্দ মজুমদার জাঁহাগীর বাদশাহের নিকট হইতে মানসিংহের অনুগ্রহে যে সনন্দ পান, তাহার তারিখ হিজিরা ১০১৫, খ্রীঃ ১৬০৬ [ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত, ৭৮-৮০ ও ২২০]। নবদ্বীপ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এই সময় হইতেই ধরা যাইতে পারে।

বীরভূম প্রদেশে নগর বা রাজনগরে পাঠান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাও এই সময়ে ঘটিয়াছিল। দুশ্চরিত্রা রাণীর সহায়তায় তাৎকালিক হিন্দু রাজাকে হত্যা করিয়া জোনেদ খাঁ পাঠান নগর রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৬০০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পুত্র নগরের প্রথম পাঠান ভূপতি হইয়াছিলেন। [Hunter : *Annals of Rural Bengal*, vol. I.]

৫। কোচাড়, কোচবিহার, খরগপুর

কোচাড় শব্দে কোন্ প্রদেশ বুঝাইতেছে, ঠিক বুঝা গেল না।

কোচবিহার—১৫৯৫ খ্রীঃ অব্দে কোচবিহারাধিপতি রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মহারাজা মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও তাঁহাকে ভগিনী সম্প্রদান করিয়া মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁহার আত্মীয়বর্গ ও প্রজাগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহী হয়। লক্ষ্মীনারায়ণের সাহায্যার্থ মানসিংহ হেজাজ খাঁকে প্রেরণ করেন। মোগল সেনা কোচবিহার জয় ও বিদ্রোহ দমন করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসে। সবিতা রায় বোধ হয় এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।

খরগপুর—বিহার প্রদেশে। হণ্টার সাহেব *Imperial Gazetteer*এ খরগপুর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়াছেন।

খরগপুর—জেলা মুঙ্গের—পরগণা—আয়তন ১৯০ বর্গ মাইল।

১৫৭৪—৭৫ অব্দে বাঙ্গালার শেষ পাঠান রাজা দায়ুদ খাঁর সহিত দিল্লীশ্বরের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের সময় দায়ুদ খাঁ বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যা আশ্রয় করেন। বঙ্গবিজয়ের পর মোগলসেনামধ্যে রাজবিদ্রোহ ঘটে। সেই সময় হাজিপুর ও খরগপুরের হিন্দু জমিদারেরা বেহারের মধ্যে সবিশেষ পরাক্রান্ত ছিলেন। খরগপুরের রাজা সংগ্রাম সহায় প্রথমে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, পরে বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দেন। বাদশাহের সেনাপতি শাহবাজ খাঁ তাঁহাকে পরাস্ত করেন। [এই শাহবাজ খাঁ রাজা টোড়রমলের সহিত বাঙ্গালার বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং রাজা টোড়রমলের পর ও মানসিংহের পূর্ব্বে কিছু দিন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।] আকবরের মৃত্যুর পর সংগ্রাম আবার বিদ্রোহী হয়েন। বেহারের শাসনকর্ত্তা জাঁহাগীর কুলি খাঁর হস্তে ১৬০৬ সালে তিনি পরাস্ত ও নিহত হন। [নূরজেহানের প্রথম স্বামী সের আফগানের হস্তে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা কুতবউদ্দীনের মৃত্যু ঘটিলে ইনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কুতবউদ্দীন রাজা মানসিংহের পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা।] সংগ্রামের পুত্র মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দিল্লীশ্বরের অনুগত হইয়াছিলেন। ১৮৩৯ সালে খরগপুর জমীদারী সদর খাজনার দায়ে বিক্রীত হইয়া সংগ্রামের বংশধরগণের হস্তচ্যুত হয়। নিজ খরগপুর দারভাঙ্গার মহারাজ খরিদ করিয়াছেন; অন্যান্য সম্পত্তি পূর্ণিয়ার রাজা বিদ্যানন্দ সিংহ ক্রয় করেন।

ব্লকমান সাহেব তৎপ্রকাশিত আইন-ই-আকবরির প্রথম খণ্ডে রাজা মানসিংহের বিবরণমধ্যে লিখিয়াছেন,—মানসিংহ প্রথম বার বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হওয়ার পরেই বেহারে অবস্থিতিকালে পূরণ মল্ল ও রাজা সংগ্রামকে দমন করিয়া তাঁহাদের কর গ্রহণ করেন। সবিতা রায় সম্ভবতঃ এই সময়ে মানসিংহের সহিত উপস্থিত ছিলেন।

রাজা সংগ্রাম সিংহ সহায়ের বিবরণ ব্লকমান অন্যত্রও দিয়াছেন।

খাজা আলাউদ্দীনের পুত্র শামসুদ্দীন সম্রাটের আজ্ঞায় বিহার ও বাঙ্গালায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। মোগল সৈনিকগণের মধ্যে বিদ্রোহ

উপস্থিত হইলে বিদ্রোহের নায়ক মাশুমি কাবুলি ও আরাব বাহাদুরের হস্তে শামসুদ্দীন বন্দী হইয়াছিলেন। সেখান হইতে পলাইয়া তিনি খরগপুরের রাজা সংগ্রামের আশ্রয় লয়েন। পরবর্ত্তী কালে শাহবাজ খাঁর সহিত সংগ্রামের যুদ্ধ হয়। জাঁহাগীরের রাজত্বগ্রহণের বৎসর তিনি পুনশ্চ বিদ্রোহী হইলে বিহারের শাসনকর্ত্তা জাঁহাগীর কুলি খাঁ তাঁহাকে পরাস্ত ও নিহত করেন। তাঁহার পুত্র মুসলমান হইয়া রাজা রোজ আফজুন নাম গ্রহণ করেন। জাঁহাগীর ও শাহজাহান উভয়েই তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তৎপুত্র রাজা বিহরুজ্ ঔরংজেবের রাজত্বকালে খ্যাতি লাভ করেন। (Blochmann : *Ain-i-Akbari*, i. p. 446.)

৬। কায়স্থ রাজা, সয়িদ, হড্ডিপ

"কায়স্থাবনিপালশূরসয়িদান্ যুদ্ধে তথা হড্ডিপান্।"—পুঃ কীঃ পঃ, ১।১০

এই কায়স্থ রাজা কে, তাহা জানিবার উপায় নাই। ফতেসিংহ উত্তররাঢ়ী কায়স্থসমাজের কেন্দ্রস্থল। কোন উত্তররাঢ়ী কায়স্থ রাজাকে বুঝাইতেছে কি?

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য "বঙ্গজ কায়স্থ" ছিলেন। সবিতা রায় তাঁহার সহিত যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন কি?

"সয়িদ" অনুবাদে সৈয়দ করা গিয়াছে। পাঠান-প্রভুত্বসময়ে এই প্রদেশের বহু লোক মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করে। ফতেসিংহ ও মহলন্দী পরগণায় অনেক গ্রাম মুসলমানপ্রধান। অনেক গ্রামে হিন্দুর বসতি নাই বলিলেই হয়। মুসলমান আয়মাদার, মজকুরিদারের সংখ্যা অদ্যাপি বিস্তর। ভরতপুর থানার মধ্যে সালার, তালিবপুর ও সীজগ্রাম প্রভৃতি স্থানে ধনাঢ্য মুসলমান জমিদারের বাস।

ফতেসিংহে একখানি গ্রামের নাম সৈয়দ কুলট।

হাড়ি রাজার স্মৃতি এই প্রদেশে এখনও বর্ত্তমান আছে। কিংবদন্তী মতে হাড়ি রাজার নাম ফতেসিংহ। তাঁহার রাজধানী ফতেপুর গ্রাম; কান্দি হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণে গন্মুটিয়া যাইবার পথে, ময়ূরাক্ষী নদীর অদূরে। ফতেপুরের পার্শ্ববর্ত্তী মুণ্ডমালা নামক স্থানে হাড়িবংশের ধ্বংস হয়, এইরূপ জনপ্রসিদ্ধি। হাড়ি রাজার ধ্বংসের পর সবিতা রায় ফতেসিংহ লাভ করেন।

ফতেসিংহ ব্যতীত পলাশী পরগণা সবিতার বংশধরগণের অধিকারে বহু দিন পর্য্যন্ত ছিল। জনশ্রুতি আছে যে, এই পরগণার এলাকায় একটা হাঙ্গামা ঘটে। রাজদণ্ডের ভয়ে ফতেসিংহের জমিদার ঐ পরগণার স্বামিত্ব অস্বীকার করেন, এবং নদীয়ার রাজার কর্ম্মচারী নিজ প্রভুর স্বামিত্ব উল্লেখ করায় পলাশী পরগণা নদীয়া রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। সম্ভবতঃ কপিলেশ্বর শিবের মন্দির সহ শক্তিপুরাদি গ্রামও ঐ সময়ে নদীয়ার অধিকারভুক্ত হয়। পলাশী পরগণা সম্বন্ধে ঐরূপ একটা কিংবদন্তীর উল্লেখ ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতেও দেখা যায়।

৭। কপিলেশ্বর

জেমোকান্দি হইতে অগ্নিকোণে প্রায় ছয় ক্রোশ ব্যবধানে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে শক্তিপুর গ্রাম। শক্তিপুরের সন্নিহিত গ্রাম গৌরীপুর, মহতা প্রভৃতি। গঙ্গার অপর পারে বেলডাঙ্গা, দাদপুর, রমণা প্রভৃতি গ্রাম। শক্তিপুরের পূর্ব্বে ভাগীরথী ও পশ্চিমে দ্বারকা নদী। দ্বারকা এখানে দক্ষিণ-বাহিনী; দ্বারকার এই অংশকে বাবলা বলে। দ্বারকা হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত একটা নালা আছে, ঐ নালাকে ডাকরা বলে। ডাকরা বর্ষাকালে জলপূর্ণ হয়। ঐ নালার দক্ষিণে শক্তিপুর গ্রাম ও উত্তরে ৺কপিলেশ্বরের মন্দির।

৺কপিলেশ্বর ফতেসিংহের রাজা সবিতা রায়ের প্রপৌত্র জয়রাম রায়ের স্থাপিত। পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকার বিবরণ দেখিলে এ বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। ৺কপিলেশ্বরের মন্দিরের, তৎসংলগ্ন বাগানের, দেবসেবার বন্দোবস্তের এবং মেলার বিস্তৃত বিবরণ পঞ্জিকায় বর্ণিত হইয়াছে। শক্তিপুর গ্রাম ও কপিলেশ্বর মন্দির এক্ষণে ফতেসিংহের অধিকারভুক্ত নাই। সম্ভবতঃ পলাশী পরগণার সহিত উহা ফতেসিংহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নবদ্বীপাধিপতির অধিকারভুক্ত হয়।

কপিলেশ্বর দেবের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে শক্তিপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সাহার সঙ্কলিত বিবরণের মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল।

৺কপিলেশ্বর মন্দির শক্তিপুরের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত। শক্তিপুর পূর্ব্বে পলাশী পরগণার অন্তর্গত ও কৃষ্ণনগরাধিপের অধিকারভুক্ত ছিল, এক্ষণে পলাশী হইতে খারিজ হইয়াছে; নাম "পরগণা পলাশীর খারিজা।" শক্তিপুরের উত্তরাংশ ৺কপিলেশ্বরের সম্পত্তি খেরাজি দেবোত্তর; এই অংশের

নাম শিবপুর। এক্ষণে শিবপুর অর্থাৎ শক্তিপুরের দেবোত্তর অংশ নদীয়ারাজের অধিকারে আছে; কিন্তু শক্তিপুর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জমিদারের হস্তগত হইয়াছিল। বর্ত্তমান মালিক কাশীমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর। শক্তিপুর মুর্শিদাবাদ কালেক্টরির ৪৫৫ নম্বর ও শিবপুর ১০৭৬ নম্বর তৌজিভুক্ত।

কপিলেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দিরের পূর্ব্বে প্রায় এক রশি দূরে ভাগীরথী; বর্ষাকালে গঙ্গার জল মন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্বে সংলগ্ন হয়। মন্দিরের বাহিরে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে দ্বারকা বা বাবলা নদী। উভয় নদী একটি নালা দ্বারা সংযুক্ত; ঐ নালার নাম ডাকরা; ডাকরা দিয়া বর্ষাকালে নৌকা যাতায়াত করে। ডাকরার দক্ষিণে শক্তিপুর গ্রাম, উত্তরে কপিলেশ্বরের মন্দির ও তৎসংলগ্ন ভূমি।

কপিলেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির ইষ্টকনির্ম্মিত ও দক্ষিণদ্বারী; দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ হাত, প্রস্থ ১৮ হাত, উচ্চতা প্রায় ৪০ হাত। মহতাগ্রামবাসী ৺জগন্মোহন মহতা মহাশয় বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করান। মন্দিরের সম্মুখে একখানি প্রস্তরফলকে খোদিত আছে।

ভক্তিহীন শ্রীজগন্মোহন মহাতা।

সন ১২৪১ সাল।

জনশ্রুতি আছে, পূর্ব্বে প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির ছিল, উহা গঙ্গাগর্ভস্থ হইয়াছে। সেই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ প্রস্তরখণ্ড স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত আছে।

মন্দিরের পশ্চিমে কিছু দূরে ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানাবলি আছে; কিন্তু সে সোপানে কোথায় নামিতে হইত, বলা যায় না।

বর্ত্তমান মন্দিরের পশ্চাতে উত্তরে একটি কাঁঠাল গাছ ও দক্ষিণপশ্চিম দিকে সাতটি আমগাছ ও চারিটি বেলগাছ আছে। আরও দক্ষিণপশ্চিমে আন্দাজ চারি রশি দূরে একটি আমবাগান আছে; ঐ আমবাগানও দেবসম্পত্তি।

মন্দিরের নিকটে দক্ষিণপূর্ব্বে ৺চন্দ্রশেখর শিবের মন্দির। এই মন্দির প্রায় ১০ হাত দীর্ঘ, ১০ হাত প্রস্থ ও ২০ হাত উচ্চ। বাঘডাঙ্গার রাণী শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবীর পিতামহ ৺শম্ভুনাথ বাবু এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শিবস্থাপনা করেন। পুরাতন মূর্ত্তি ভগ্ন হইলে রাণী মহাশয়া নূতন লিঙ্গের

স্থাপনা করিয়াছেন। ৺চন্দ্রশেখরের সেবার্থ ফতেসিংহমধ্যে নিষ্কর ভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে। দক্ষিণে একখানা ভগ্ন ইষ্টকগৃহে মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির নির্ম্মাণ দ্বারা বৎসর বৎসর শিবোত্তর সম্পত্তির ব্যয়ে শ্যামাপূজা হইয়া থাকে।

শিবোত্তর সম্পত্তি শিবপুর হইতেই দেবসেবা নির্ব্বাহিত হয়। তদ্ভিন্ন ফতেসিংহের (জেমো ও বাঘডাঙ্গার) প্রদত্ত পৃথক্ নিষ্কর ভূমি হইতেও দেবসেবার সাহায্য হয়। বর্ত্তমান সেবাইত কৃষ্ণনগরাধিপ। দর্শকগণের প্রণামী হইতেও সামান্য আয় আছে।

শিবচতুর্দ্দশীর দিন শিবের অভিষেক ও সমারোহের সহিত পূজা হয়। প্রথমে কৃষ্ণনগরের মহারাজের, পরে জেমো বাঘডাঙ্গার ও তৎপরে শক্তিপুরের জমিদারের পূজা হয়। ঐ দিন প্রায় দশ হাজার লোকের সমাগম হইয়া থাকে। আগন্তুকগণের মধ্যে অনেক সন্ন্যাসী থাকেন।

ঐ দিন হইতে একমাসব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলার অবস্থা পূর্ব্বের অপেক্ষা মন্দ। কপিলেশ্বরের বাগানে ও শক্তিপুরের অধিকারের মধ্যে মেলার স্থান। জমিদারের ও পুলিশের পক্ষ হইতে মেলার তত্ত্বাবধান হয়।

কয়েক বৎসর হইতে মেলা উপলক্ষ্যে কালীপূজা ও যাত্রাগান প্রভৃতি হইতেছে। চতুর্দ্দশীর দিন চিড়ামহোৎসব ও পরদিন অন্নমহোৎসব উপলক্ষ্যে বৈষ্ণব ও দরিদ্রগণকে ভোজন করান হয়।

৮। পাহাড় খাঁ

পাহাড় খাঁ উত্তররায়ের কার্য্যদক্ষতায় প্রীত হইয়া তাহার উত্তমরায় নাম দিয়াছিলেন। এই পাহাড় খাঁ সম্ভবতঃ ব্লকমান সাহেবের উল্লিখিত পাহাড় খাঁ বেলুচ।

> Pahar Khan, the Baluch—He served in the 21st year [of Akbar's reign] against Danda, son of Surjan Hada, and *afterwards in Bengal.* In 989 [Hejira], the 26th year [of Akbar's reign], he was tuyuldar of Ghazipur and hunted down Mashum Khan Farankhudi, after the latter had plundered Muhammadabad. In the 28th year, he served in Gujrat.

* * *

Dr. Wilton Oldham, C. S. states in his 'Memoir of the Ghazeepoor District' that Faujdar Pahar Khan is still remembered in Ghazipur and that his tank and tomb are still objects of interest. (Blochmann : *Ain-i-Akbari*, i. p. 526.)

তাৎপর্য্য—পাহাড় খাঁ আকবরের রাজত্বের একবিংশ বৎসরে সুর্জনহাদার বিরুদ্ধে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি বঙ্গদেশে নিযুক্ত হয়েন। হিজিরা ৯৮৯ সালে আকবরের রাজত্বের ষড়্বিংশ বৎসরে গাজিপুরে থাকিয়া মোগল বিদ্রোহী মাশুম খাঁ ফরনখুদীকে দমন করেন। পরে তিনি গুজরাট যান। ওল্ডহাম সাহেব বলেন, গাজিপুরের লোকে এখনও ফৌজদার পাহাড় খাঁর পুষ্করিণী ও সমাধি দেখাইয়া দেয়।

ব্লকমান রাজা টোড়রমল্লের বিবরণমধ্যে লিখিয়াছেন যে, টোড়রমল্ল যখন মোগল বিদ্রোহদমনে নিযুক্ত হইয়া মুঙ্গের দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে বিদ্রোহী আরাব বাহাদুর পাটনা আক্রমণ করেন। পাহাড় খাঁ তখন পাটনায় বাদশাহের রাজকোষ রক্ষা করিতেছিলেন। মাশুমি কাবুলি তখন দক্ষিণ-বিহারে বিদ্রোহিদলের নায়কতা করিতেছিলেন।

৯। সভাসিংহের বিদ্রোহ

ফতেসিংহের রাজবংশীয় জয়রামের বংশধর জগৎ, কালু প্রভৃতি সভাসিংহের বিদ্রোহে যোগ দেন। তাহার ফলে তাঁহারা সম্পত্তিচ্যুত হইয়াছিলেন। ফতেসিংহের বিদ্রোহ তাৎকালিক বাঙ্গালার ইতিহাসে একটি প্রধান ঘটনা। ঔরংজেব বাদশাহের সময়ে এই বিদ্রোহ ঘটে; বাঙ্গালার দক্ষিণপশ্চিম অংশ কিছু দিন ধরিয়া বিদ্রোহীদের অধিকৃত হইয়াছিল। বিদ্রোহ দমনের জন্য বাদশাহ অবশেষে আপন পৌত্র আজিম-উস্-শানকে বঙ্গদেশে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই বিদ্রোহ উপলক্ষ্যে ইংরাজেরা প্রথম ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে নিম্নোক্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত চেতোবরদার জমিদার সভাসিংহ উড়িষ্যার পাঠান দলপতি রহিম খাঁর সহিত যোগ দিয়া ১৬৯৫ খ্রীঃ অব্দে বর্দ্ধমান আক্রমণ করেন। বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম যুদ্ধে নিহত ও তাঁহার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। বর্দ্ধমানরাজের পুত্র জগৎ রায় রাজধানী ঢাকায় পলায়ন করেন। নবাব

ইব্রাহিম খাঁর অনুমতিক্রমে যশোহরের ফৌজদার নূরআল্যা বিদ্রোহ দমনে নির্গত হইয়া হুগলিতে উপস্থিত হইলেন। বিদ্রোহীরা হুগলি অবরোধ করিলে ফৌজদার গোপনে পলায়ন করিলেন ও বিদ্রোহীরা হুগলি অধিকার করিল।

বিদ্রোহীদের আক্রমণভয়ে চুঁচুড়ার ওলন্দাজেরা, ফরাসডাঙ্গার ফরাসীরা ও সুতানুটি গ্রামে ইংরাজেরা নবাবের অনুমতি লইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন ও আপন অধিকারমধ্যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। এই উপলক্ষ্যে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম নির্ম্মিত হইল। ওলন্দাজেরা রণতরী ও কামান সাহায্যে হুগলি পুনরধিকার করিলে বিদ্রোহীরা সপ্তগ্রাম আশ্রয় করিল।

সভাসিংহ রহিম খাঁকে নদীয়া ও মকৃশুদাবাদ (আধুনিক মুর্শিদাবাদ) বিজয়ের জন্য প্রেরণ করিয়া স্বয়ং সপ্তগ্রাম হইতে বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। বর্দ্ধমানরাজকন্যা ধর্ম্মরক্ষার্থ সভাসিংহকে হত্যা করিয়া আপন বক্ষে ছুরিকা বসাইয়া আত্মহত্যা করিলেন।

সভাসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা হিম্মতসিংহ বিদ্রোহীদের নায়ক হইয়া লুঠপাঠ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মেদিনীপুর হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ বিদ্রোহীদের আয়ত্ত হইল।

রহিম খাঁ মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে আসিয়া নগরের পাঠান জমিদার নিয়ামত খাঁকে* বিদ্রোহে যোগ দিতে আহ্বান করিল। নগরের রাজা অসম্মত হইলে রহিম নগর আক্রমণ করিলেন। এইখানে রহিমের সহিত নগরের রাজার দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘটে। নিয়ামতের ভ্রাতুষ্পুত্র তহবীর খাঁ রহিমের অনুচরগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলে নিয়ামত অশ্বপৃষ্ঠে রহিমকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার তরবারির আঘাতে রহিম অশ্বচ্যুত হইয়া ভূশায়ী হইলেন। নিয়ামত ছুরিকা দ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহারে উদ্যোগী হইয়াছেন, এমন সময়ে রহিমের অনুচরেরা তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

তৎপরে মকৃশুদাবাদে নবাবসেনাকে পরাস্ত করিয়া বিদ্রোহীরা নগর লুণ্ঠন করিল। ১৬৯৭ খ্রীঃ অব্দে বিদ্রোহীরা রাজমহল ও মালদহ অধিকার করিয়া মালদহে ওলন্দাজ ও ইংরেজদের কুঠি লুণ্ঠন করিল।

* এই গল্পটি কোথায় পাইয়াছি, স্মরণ হইতেছে না। নিয়ামত খাঁ নগরের জমিদার, কি অন্য কোন স্থানের জমিদার, সন্দেহ বোধ হইতেছে।

বাদশাহ বাঙ্গালার নবাবের অক্ষমতায় অসন্তুষ্ট হইয়া আপন পৌত্র সুলতান আজিম-উস্-শানকে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

আজিম-উস-শানের আসিবার পূর্ব্বে নবাব ইব্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত খাঁ বহু অশ্বারোহী, পদাতি, কামান ও রণতরী লইয়া ভগবান্‌গোলার নিকট অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিলেন। যে সকল জমিদার ও জায়গীরদার বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে জবরদস্তের শরণ লইল। জবরদস্ত ক্রমশঃ বঙ্গদেশ হইতে রহিমকে তাড়িত করিলেন।

ইতিমধ্যে সুলতান আজিম-উস্-শান অযোধ্যা, কাশী ও বিহারের জমিদারগণের সাহায্য সহ বহু সৈনিক লইয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আগমনে জবরদস্ত খাঁ ও তাঁহার পদচ্যুত পিতা ইব্রাহিম যুদ্ধে নিরস্ত হইলেন। আজিম-উস্-শানের বর্দ্ধমানে অবস্থিতিকালে রহিম পুনরায় নদীয়া ও হুগলি প্রদেশ লুঠ করিতে লাগিল।

আজিম-উস্-শানের সহিত যুদ্ধে রহিম খাঁ নিহত হইলে বিদ্রোহ প্রশান্ত হয় (১৬৯৮)। এই সময়ে ইংরাজেরা আজিম-উস্-শানের অনুমতিক্রমে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারী লাভ করেন।

১০। পুণ্ডরীক-বংশের ইতিহাস

পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকায় সবিতা রায় হইতে উদয়চন্দ্র পর্য্যন্ত পুণ্ডরীক-বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। বাঘডাঙ্গা রাজবাটীর পুরোহিত ৺ হরিশ্চন্দ্র দুবের পুঁথিমধ্যে টিপ্পনীতে লেখা আছে, সবিতার পিতার নাম বসন্ত। ঐ টিপ্পনীতে সবিতার দুই ভ্রাতার নামেরও উল্লেখ আছে, কমলা ও অজৈ। এই দুই নাম কত দূর প্রামাণিক, বলা যায় না। সবিতা দুই পুত্র ও চারি পৌত্রের সহিত রাজা মানসিংহের সহিত বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহের বঙ্গাগমনের কাল খ্রীঃ ১৫৯০। বঙ্গে প্রবেশের পূর্ব্বে মানসিংহ খরগপুরের জমিদার রাজা সংগ্রাম সিংহ সহায়কে দমন করেন। তৎপরে বঙ্গদেশে আসিয়া কয়েক বৎসর ধরিয়া উড়িষ্যাবাসী পাঠানগণের দমনে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়ে কোচবিহাররাজ লক্ষ্মীনারায়ণ দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করেন। সবিতা রায় খরগপুরে ও কোচবিহারে ও "কুচোড়া" মহলে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া মানসিংহের সন্তোষ উৎপাদন করেন। ১৬০০ খ্রীঃ অব্দে

ফতেসিংহের উত্তরবর্ত্তী শেরপুর আতাইয়ের যুদ্ধে পাঠানেরা পরাজিত হয়। সম্ভবতঃ এই সময়ে রাজ্যধরপুর ও ফতেপুরের হাড়ি রাজাকে পরাজিত করিয়া সবিতা রায় মানসিংহের প্রসাদে ফতেসিংহের জমিদারি লাভ করেন। এই যুদ্ধের পর রাজা মানসিংহ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাতহাজারী মনসবদারের শ্লাঘনীয় পদ লাভ করেন। সবিতা রায়ও সম্ভবতঃ সেই সময়ে ফতেসিংহের সনন্দ লইয়া আসিয়াছিলেন।

ফতেসিংহ ব্যতীত অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী স্থানও সবিতা রায়ের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে পলাশী পরগণাও অন্যতম।

সবিতা রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধারিক, কনিষ্ঠ পুত্র অজয়ী। ধারিকের পুত্র গঙ্গন ; অজয়ীর তিন পুত্র—উমা, কমলা ও কস্তূরী। ইঁহারা সকলেই সবিতা রায়ের সহিত বঙ্গে আসেন ও যুদ্ধে সবিতাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সুতরাং সবিতা রায় সে সময়ে বয়োবৃদ্ধ ছিলেন, সন্দেহ নাই।

সবিতা রায় আপন সম্পত্তি বংশধরগণের মধ্যে সমান অংশে ভাগ করিয়া দেন ; তাঁহারা একান্নভুক্ত থাকিয়া কিছু দিন সম্পত্তি ভোগ করিয়াছিলেন।

সবিতা রায়ের মৃত্যুকাল নির্দ্দেশ করা কঠিন। রামসাগর পুষ্করিণীতে প্রাপ্ত প্রস্তরে গঙ্গন ও তৎপুত্র রায়সেনের নাম আছে ; উমা রায়ের পুত্র জয়রাম ও উত্তরের নাম আছে। কিন্তু সবিতার বা তাঁহাদের পুত্রদের নাম নাই। শিলালিপির তারিখ ১০০৯ সাল প্রকৃত হইলে অনুমান হইতে পারে, তৎপূর্ব্বে সবিতা ও তাঁহার পুত্রদের মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজী ১৬০০ সাল ফতেসিংহ অধিকারের সময় ধরিলে, এই অনুমানের যাথার্থ্যে সন্দেহ হয়।

গঙ্গনের পুত্র রায়সেন। উমার পুত্র জয়রাম, উত্তর বা উত্তম ও ভীম। ইঁহারা সকলেই যুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। উত্তম রায় রাজকর্ম্মচারী পাহাড় খাঁর নিকট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

জয়রাম ভাগীরথীতীরে শক্তিপুর গ্রামে কপিলেশ্বর শিব স্থাপনা করেন ও তাঁহার মন্দিরাদি স্থাপনা করিয়া আড়ম্বরে সেবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। কপিলেশ্বরের বিবরণ সপ্তম পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

জয়রামের ন্যায় অন্যান্য পুণ্ডরীকবংশধরও নানা স্থানে শিবমন্দির স্থাপনা করিয়া শিবভক্তির প্রাচুর্য্য দেখাইয়াছেন।

রায়সেনের পুত্র দেবী রায়। জয়রামের পুত্র মদন ও কল্যাণ। উত্তমের পাঁচ পুত্র—কামদেব, বলরাম, রাম, প্রসাদ ও হরিশ্চন্দ্র। ভীম রায়ের পুত্র যত্নন্দন বা সন্তোষ। কমলা রায়ের পুত্র কংস ও গৌরী; কস্তূরীর পুত্র মণিয়ারি রায়।

উত্তমের কনিষ্ঠ পুত্র হরিশ্চন্দ্র কিছু দুর্দ্দান্ত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি দস্যুতাপরাধে বন্দীকৃত হইয়া তাৎকালিক রাজধানী ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়; সম্ভবতঃ তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

এত দিন পর্য্যন্ত সবিতার বংশধরেরা সকলে একান্নভুক্ত ছিলেন; হরিশ্চন্দ্রের দণ্ড লাভের পর তাঁহারা পৃথক্ হইলেন।

রায়সেন নিজ পুত্র দেবী রায়ের সহিত ময়ূরাক্ষীর পশ্চিম তীরে মাধুনিয়া গ্রামে বাস করিলেন; তাঁহাদের বংশধরেরা অদ্যাপি মাধুনিয়াবাসী। জয়রাম পুত্রদ্বয় সহ মাধুনিয়ার উত্তরবর্ত্তী কল্যাণপুরে বাস করিলেন; তাঁহার বংশধরেরাও এখন পর্য্যন্ত সেই স্থানে বাস করিতেছেন। উত্তম রায় পুত্রগণ সহ আন্দুলিয়া গ্রামে থাকিলেন। আন্দুলিয়া গ্রাম জেমোর পূর্ব্বে আধ ক্রোশ ব্যবধানে। এই গ্রাম চারি দিকে পরিখাবেষ্টিত। আন্দুলিয়ার গড়ের ও রাজবাটীর চিহ্ন এখনও কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে। ভীমরায় পুত্র সন্তোষকে লইয়া জেমোতে বাস করিলেন।

কমলা রায়ের পুত্র কংস ভাগীরথীতীরে শুঙ্গায়ী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। কংসের পুত্র মুকুট। কংসের ভ্রাতা গৌরী পুত্রহীন। সম্ভবতঃ মুকুটেরও পুত্রাদি হয় নাই। শুঙ্গায়ী গ্রামে কংস রায়ের বংশের কেহ বর্ত্তমান নাই; তাঁহার বাসস্থানেরও কোন নিদর্শন নাই।

কস্তূরী রায় বা তৎপুত্র মণিয়ারি রায় কোথায় বাস করিলেন, কোন উল্লেখ দেখা যায় না। মণিয়ারি রায়ের পুত্র পুরুষোত্তম, তৎপুত্র হরানন্দ। তাঁহার পুত্রপৌত্রাদির নাম জানা যায় না। সম্ভবতঃ এই বংশে কেহ সম্পত্তির অধিকার পায় নাই।

জয়রামের সময় হইতেই ইঁহাদের পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠায় ও গ্রাম স্থাপনে প্রবৃত্তি দেখা যায়। জয়রামের নামানুসারী জয়রামপুর গ্রাম বর্ত্তমান আছে। জয়রাম, উত্তম ও ভীম, তিন ভ্রাতারই বংশধরগণের নামানুযায়ী গ্রাম চতুষ্পার্শ্বে বর্ত্তমান।

ভীম রায় বার লক্ষ শিবপূজা করিয়াছিলেন, পঞ্জিকাকার সদর্পে উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপুত্র সন্তোষ তাহার দ্বিগুণসংখ্যক শিবপূজা করেন। ভীম রায় দশ হাজার ব্রাহ্মণ খাওয়ান ; সন্তোষ তাহার দিগুণ খাওয়ান ; ইত্যাদি।

দেবী রায়ের পুত্র উদয়চন্দ্র। দেবী রায় সন্তোষের সাহায্যে উত্তরবর্ত্তী মহলন্দী পরগণার কিয়দংশ অধিকার করিয়া পুত্রের নামানুসারে উদয়চন্দ্রপুর গ্রাম স্থাপন করেন। পুণ্ডরীককুলকীৰ্ত্তিপঞ্জিকার রচনার সময় উদয়চন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন, তখনও তাঁহার পুত্রাদি জন্মে নাই।

কল্যাণপুরবাসী জয়রামের দুই পুত্র—মদন ও কল্যাণ। মদনের পুত্র মাণিকচন্দ্র ও গোকুলচন্দ্র। গোকুলচন্দ্রের পুত্র ঘনশ্যাম, মহাদেব ও ভগবতীচরণ। ঘনশ্যামের দাতা বলিয়া খ্যাতি ছিল। নাখেরাজের তায়দাদ মধ্যে ঘনশ্যাম রায়ের নাম দেখা যায়।

ঘনশ্যামের পুত্র জগৎ, কালু, বেণী ও কৃষ্ণরাম। ইঁহারা অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ছিলেন। ইঁহাদের সময়ে সভাসিংহের বিদ্রোহ ঘটে। সভাসিংহ স্বয়ং মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত আসেন নাই। তাঁহার অপমৃত্যুর পর তদীয় দলপতি রহিম শাহ মুর্শিদাবাদ লুঠ করিতে আসেন। জগৎ প্রভৃতি তাঁহার দলে যোগ দিয়া লুঠপাঠ আরম্ভ করিয়াছিলেন। রাজদ্রোহে যোগ দেওয়ার ফলে তাঁহারা সম্পত্তি হইতে ভ্রষ্ট হয়েন।

সভাসিংহের বিদ্রোহের কাল ইংরেজী ১৬৯৫। পর-বৎসর বিদ্রোহীরা মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে। তদবধি দুই বৎসর কাল বিদ্রোহীরা বাঙ্গালার দক্ষিণপশ্চিমাংশ দখলে রাখিয়াছিল। ১৬৯৮ সুলতান আজিম-উস্-শান দিল্লী হইতে ঔরংজেব বাদশাহ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিদ্রোহ দমন করেন। সবিতা রায়ের জমিদারী প্রাপ্তির প্রায় শত বৎসর পরেই এই ঘটনা। পুণ্ডরীক-কুলকীৰ্ত্তিপঞ্জিকায় জগৎ কালু প্রভৃতির পুত্রাদির নাম নাই। সম্ভবতঃ এই পঞ্জিকা এই বিদ্রোহ ঘটনার কয়েক বৎসর পরেই লিখিত।

জয়রামের দ্বিতীয় পুত্র কল্যাণের পাঁচ পুত্র,—চাঁদ, অভিরাম, গন্ধর্ব্ব, অর্জ্জুন, প্রতাপ। ইঁহাদেরও সন্তানাদির নাম নাই।

উত্তমের বংশে কামদেব, প্রসাদ ও হরিশ্চন্দ্রের পুত্রাদির উল্লেখ নাই। বলরামের পুত্র কেশব, নরসিংহ ও রূপ। কেশবের পুত্র তারাচন্দ্রের নাম ৺হরিশ্চন্দ্র দুবের পুঁথিতে উল্লিখিত হইয়াছে। রাম রায়ের পুত্র বিক্রম ও পর্ব্বত।

ভীমের পুত্র সন্তোষ রায়ের নাম সবিতার বংশে বিখ্যাত। সন্তোষ অনেক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। ১২০৮ সালের নাখেরাজের তায়দাদ মধ্যে সন্তোষের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত দেখা যায়। সন্তোষের নাম ও স্মৃতি ফতেসিংহ মধ্যে অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই।

সন্তোষের তিন পত্নী ছিল। জ্যেষ্ঠ পত্নীর স্বামিসমক্ষে মৃত্যু হয়। সন্তোষের ছয় পুত্র,—রঘুনাথ, বনমালী, গোপাল, মনোহর, রাজারাম, ভবানন্দ। ইঁহাদের প্রত্যেকের নামানুসারে গ্রাম বিদ্যমান আছে।

ইঁহারা সকলেই খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। সন্তোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ রায় দিল্লী হইতে সম্পত্তির ফরমান আনিয়া পিতার আনন্দবর্দ্ধন করেন। পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকার এই উক্তি দেখিয়া মনে হয়, সবিতার বংশীয়েরা সকলেই এই সময়ে সম্পত্তিচ্যুত হইয়াছিলেন। জয়রামবংশীয় জগৎ রায় প্রভৃতির রাজদ্রোহে যোগ দেওয়াই এই অধিকার-চ্যুতির কারণ। সম্পত্তি এইরূপে বাজেয়াপ্ত হইলে রঘুনাথ রায় দিল্লী গিয়া উহার পুনরুদ্ধার করিয়া আনেন।

রঘুনাথ রায় পঞ্চকূটের রাজাকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে এক খণ্ড হীরক উপঢৌকন স্বরূপ আনেন। পঞ্চকূট বা পাঁচেট বাঁকুড়ার অন্তর্গত। পঞ্চকূটের সহিত ফতেসিংহের বিবাদের অন্য কোন জনশ্রুতি বর্ত্তমান নাই।

সন্তোষের ছয় পুত্র; ইঁহাদের মধ্যে পাঁচ জনকে পঞ্জিকাকার "পাঁচ বাবু" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোন্ পাঁচ জন, তাহা লিখেন নাই। পাঁচ বাবুর খ্যাতি ফতেসিংহে বিখ্যাত। সবিতা ও তাঁহার পুত্রপৌত্রাদির নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ফতেসিংহের জমিদার পাঁচ বাবুর খ্যাতি সকলেই জানে। সবিতার বংশধরেরা সকলেই পাঁচ বাবুর গোষ্ঠী বলিয়া পরিচিত।

রঘুনাথের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ও রামেশ্বর; বনমালীর পুত্র বিশ্বেশ্বর ও ইন্দ্রমণি; গোপালের পুত্র জীত রায়; মনোহরের পুত্র রত্নেশ্বর।

এই রত্নেশ্বরের সহিত পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকার বিবরণ শেষ হইয়াছে। পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। তখনও সন্তোষ ও তাঁহার পুত্রেরা জীবিত ছিলেন। সন্তোষের পৌত্রদের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ হইতে রত্নেশ্বর পর্য্যন্ত তখন বয়স্ক হইয়াছেন। সন্তোষের পিতা ভীম রায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন, সন্তোষ

অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভেও জীবিত ছিলেন, সুতরাং তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন, অনুমান হয়।

এইখানে পঞ্জিকার বিবরণ শেষ। তৎপরবর্ত্তী ইতিহাসের জন্য অন্য উপাদানের সাহায্য লইতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে রাজা নীলকণ্ঠ রায়ের মৃত্যুর পরবর্ত্তী সময়ের দুইখানি প্রাচীন ফয়শালা পাওয়া গিয়াছে; তাহা হইতে পঞ্জিকার পরবর্ত্তী শত বৎসরের ইতিহাস সঙ্কলিত করিতে পারা যায়।

সন্তোষের পৌত্র ও মনোহরের পুত্র রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বরের পুত্রের নাম আনন্দচন্দ্র রায়। ইনি মুর্শিদ কুলি খাঁ ওরফে জাফর খাঁ নবাবের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। বাদশাহ ফরোখ শের আনন্দচন্দ্রের সময়ে মুর্শিদ কুলি খাঁর প্রতি ফতেসিংহ সংক্রান্ত যে সকল আদেশপত্র দিয়াছিলেন, তাহার দুই একখানা এখনও বর্ত্তমান আছে।

মুর্শিদ কুলি খাঁ সুলতান আজিম-উস্-শানের পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা। ইনি সুলতানের সহিত বিবাদ করিয়া ঢাকা হইতে রাজধানী উঠাইয়া আনিয়া মুর্শিদাবাদ নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। মুর্শিদ কুলি খাঁর সময় দেওয়ানী ও নাজিমী পদ একত্র হইয়া শাসনকর্ত্তার ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তিনি বাঙ্গালার সমুদয় জমিদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া পুনরায় নূতন করিয়া বন্দোবস্ত করেন।

ফতেসিংহের ষোল আনা আনন্দচন্দ্র রায়ের হস্তে আসিয়াছিল। কিরূপে ষোল আনা অংশ তাঁহার হস্তে আইসে, বলা কঠিন। অন্যতর ফয়শালায় উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে জয়রামের বংশে ছয় আনা, উত্তরের বংশে পাঁচ আনা ও ভীমের বংশে পাঁচ আনা সম্পত্তি ছিল। উত্তরের বংশ সম্ভবতঃ লোপ পাওয়ায় সেই পাঁচ আনা ভীমের বংশধরেরা পাইয়াছিলেন। জয়রামের বংশধরগণ সভাসিংহের বিদ্রোহে যোগ দিয়া সম্পত্তিচ্যুত হয়েন। এই বিদ্রোহের পর সম্ভবতঃ সমস্ত সম্পত্তিই বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। সন্তোষের পুত্র রঘুনাথ দিল্লী গিয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিয়া আনেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ কর্ত্তৃক বাঙ্গালার জমিদারগণের সহিত নূতন বন্দোবস্ত হয়। সেই সময়ে রত্নেশ্বরের পুত্র আনন্দচন্দ্রের হস্তে এক লক্ষ আট হাজার টাকা রাজস্ব বন্দোবস্তে ষোল আনা ফতেসিংহ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা ১১২৪ সালে আনন্দচন্দ্রের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয়। তিনি পত্নী, মাতা ও পিতামহী রাখিয়া পরলোকে যান। তাঁহার সময়ে সবিতা রায়ের বিশাল বংশতরু প্রায় উচ্ছিন্ন হইয়াছে। ধারিকের বংশধর উদয়চন্দ্রের পুত্র কিষণরাম, কিষণরামের পুত্র বৈদ্যনাথ; এই বৈদ্যনাথ আনন্দচন্দ্রের মৃত্যুর সময় বর্ত্তমান ছিলেন। বৈদ্যনাথের এক ভ্রাতা দীননাথের নাম ফয়শালায় পাওয়া যায়। তাঁহার বিধবা পত্নী আনন্দচন্দ্রের মৃত্যুর সময় বর্ত্তমান ছিলেন। উদয়চন্দ্রের দুই ভাই ছিল, এবং সেই ভাইয়ের বংশীয়েরাও মাধুনিয়ায় বাস করিতেন। জয়রামের বংশে জগৎ, কালু প্রভৃতির তখন মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাদের বংশীয় নয়নসুখ রায় ও নারায়ণ রায়ের তখন অল্প বয়স। নয়নসুখের ও নারায়ণের পিতা সম্ভবতঃ জগৎ রায়। মহাদেবের বংশীয়েরা কল্যাণপুরে বাস করিতেছিলেন। উত্তর রায়ের বংশে তখন কেহই ছিল না। সন্তোষ রায়ের ছয় পুত্রের মধ্যে এক বনমালী রায়ের দৌহিত্রের উল্লেখ পরবর্ত্তী কালে পাওয়া যায়। এই দৌহিত্রের নাম মঙ্গল পাঁড়ে।

যাহাই হউক, আনন্দচন্দ্রের মৃত্যুর সময় ধারিকের বংশধর বৈদ্যনাথ ব্যতীত সবিতার বংশে আর কোন সমর্থ পুরুষ সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ছিল না। গৌতমগোত্রীয় পরশুরাম চৌধুরীর পুত্র সূর্য্যমণি চৌধুরী বৈদ্যনাথের ভগিনী রাজেশ্বরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইনি আনন্দচন্দ্রের মুন্সী ও প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। আনন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর এক বৎসর কাল তিনি আনন্দচন্দ্রের বিধবা পত্নীর পক্ষ হইতে সম্পত্তি রক্ষা করিয়া রাজস্বাদি প্রদান করিতেন। ১১২৬ সালে ইঁহার মতিবিপর্য্যয় ঘটিল। সেই বৎসর তিনি নবাবদরবারে তদ্বির করিয়া স্বয়ং সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিলেন।

এই ঘটনা হইতে ফতেসিংহের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভ। সূর্য্যমণি বাঘডাঙ্গা বংশের স্থাপনকর্ত্তা। সূর্য্যমণি চৌধুরী সম্পত্তি অধিকার করিয়া সমুদয় অস্থাবর সম্পত্তি ও দলীলাদি হস্তগত করিলেন। সবিতা রায়ের বংশীয় বৈদ্যনাথ তাঁহার ভগিনীপতির এই কার্য্যে আপত্তি করেন নাই; সম্ভবতঃ তাঁহার আপত্তি করিবার শক্তিও ছিল না। এ সময়েও বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ।

কয়েক বৎসর পরে সূর্য্যমণির জমিদারী মধ্যে অন্য কোন জমিদারের প্রেরিত রাজস্ব দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়। সূর্য্যমণি চৌধুরী দস্যুদিগকে ধরিয়া

দিতে পারেন নাই। নবাব সেই জন্য তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। কারাগারেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

পলাশী পরগণা ফতেসিংহ হইতে খারিজ হওয়া সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি আছে, সম্ভবতঃ তাহার মূল এই। পলাশী পরগণা অতঃপর নদীয়া রাজ্যভুক্ত হয়।

সূর্য্যমণি চৌধুরীর মৃত্যুকালে তাঁহার শিশু পুত্র হরিপ্রসাদ বর্ত্তমান। হরিপ্রসাদ বৈদ্যনাথের ভাগিনেয়। সূর্য্যমণি বৈদ্যনাথের হস্তে হরিপ্রসাদকে সমর্পণ করিয়া যান। মৃত্যুকালে তিনি বৈদ্যনাথকে বলেন, হরিপ্রসাদ তোমার ভাগিনেয়, এবং সেই জন্য সবিতা রায়েরও বংশধর। হরিপ্রসাদকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম ; হরিপ্রসাদের যেন অন্নকষ্ট না হয়।

বৈদ্যনাথের তখনও পুত্র হয় নাই। তিনি হরিপ্রসাদের প্রতিপালক স্বরূপে সূর্য্যমণির শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিলেন ; পরে যত্ন করিয়া হরিপ্রসাদের নামে সম্পত্তি ফিরাইয়া আনিয়া স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

১১৫১ সাল পর্য্যন্ত হরিপ্রসাদ জীবিত ছিলেন। সূর্য্যমণির মৃত্যুর পর হইতে ১১৫১ সাল পর্য্যন্ত বৈদ্যনাথও তাঁহার পক্ষে সম্পত্তির রক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। সূর্য্যমণির মৃত্যুকালীন অনুরোধ তিনি হরিপ্রসাদের জীবৎকালে বিস্মৃত হয়েন নাই।

১১৩৮ সালে বনমালী রায়ের দৌহিত্র মঙ্গল পাঁড়ে (বিকল পাঁড়ে ?) কয়েক মাসের জন্য ফতেসিংহ হস্তগত করিয়াছিলেন। বৈদ্যনাথের চেষ্টায় সম্পত্তি পুনরায় হরিপ্রসাদের হয়।

১১৪৮ সালে বিখ্যাত বর্গীর হাঙ্গামা আরম্ভ। এই সময়ে বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ মহাবৎ জঙ্গ। রঘুজী ভোঁসলে কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভাস্কর পণ্ডিত বাঙ্গালায় প্রবেশ করিলেন। পশ্চিমবঙ্গ ভাগীরথীতীর পর্য্যন্ত অরাজক হইল। ১১৪৯ সালের বর্ষার পূর্ব্বেই মরাঠারা ভাগীরথীর ওপারে পলাশী ও দাদপুর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল। ফতেসিংহের অধিবাসীরা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পলাইল। বর্ষার পর আলিবর্দ্দি ভাস্করকে বাঙ্গালা দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু বৎসর শেষ না হইতেই রঘুজী স্বয়ং বীরভূমের পথে এবং পুনা হইতে বালাজী পেশোয়া বেহারের পথে বাঙ্গালা আক্রমণ করিলেন। বালাজী নবাবের অর্থে বশীভূত হইয়া রঘুজীকে বাঙ্গালা ত্যাগে বাধ্য করিলেন। পর-বৎসর ভাস্কর পণ্ডিত আবার আসিলেন। এবার নিরুপায় আলিবর্দ্দি তাঁহাকে কাটোয়ার নিকটে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন

শিবিরমধ্যে হত্যা করিলেন। আলিবর্দ্দির প্রিয় পাঠান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ এই হত্যাকাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন।

বর্গীর যুদ্ধে ও অন্যান্য কার্য্যে সাহায্য জন্য এই মুস্তাফা খাঁ নবাবের অত্যন্ত প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। মুস্তাফা খাঁর সাহায্যে ফতেসিংহের নয়নসুখ রায় ও নারায়ণ রায় কিছু দিনের জন্য ফতেসিংহ পরগণা হস্তগত করিতে সমর্থ হইলেন। ইঁহারা জগৎ রায়ের বংশধর; আনন্দচন্দ্রের জীবৎকালে ইঁহারা নাবালক অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের সৌভাগ্য অধিক দিন থাকিল না। মুস্তাফা খাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত আবদারও বাড়িতে লাগিল। শেষে নবাব তাঁহাকে অত্যন্ত সন্দেহ করিতে লাগিলেন। ১১৫১ সালে মুস্তাফা প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহী হইয়া রাজমহল লুঠ করিলেন ও পরে বেহারে গিয়া যুদ্ধে নিহত হইলেন।

নয়নসুখও সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া রাজস্ব বাকী ফেলিতে লাগিলেন। তিনি রাজবিদ্রোহী জগৎ রায়ের বংশধর, এ কথাও রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তখন বৈদ্যনাথের যত্নে হরিপ্রসাদ রায় তাঁহার হস্ত হইতে সম্পত্তি পুনরধিকার করিলেন।

কিন্তু হরিপ্রসাদ আর সম্পত্তি ভোগে অবসর পাইলেন না। কয়েক দিন মধ্যেই তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

মুস্তাফা খাঁর আহ্বানে বর্গীরা আবার আসিয়াছিল। হরিপ্রসাদের মাতা ও পত্নী পার্ব্বতী এই সময়ে বর্গীর ভয়ে পলাইয়া গঙ্গার ওপারে বাস করিতে-ছিলেন। মৃত্যুকালে হরিপ্রসাদের বয়স ২২।২৩ বৎসর, পার্ব্বতীর বয়স ১৬।১৭ মাত্র ছিল।

বৈদ্যনাথের পুত্র নীলকণ্ঠের ইহার পূর্ব্বেই জন্ম হইয়াছিল। পুত্রের জন্মের পরও তিনি ভাগিনেয়কে পরিত্যাগ করেন নাই। হরিপ্রসাদের মৃত্যুর পর নবাবের মুৎসুদ্দী রায়রায়াঁ চায়েন রায়ের সহায়তায় তিনি পুত্র নীলকণ্ঠকে সম্পত্তির অধিকারী করিলেন। ১:২৬ হইতে ১১৫১ সাল পর্য্যন্ত ফতেসিংহ পুণ্ডরীকবংশধরগণের হস্ত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গৌতমগোত্রীয়ের হস্তে পড়িয়াছিল। ১১৫১ সালে পুনরায় পুণ্ডরীকগোত্রজ নীলকণ্ঠের হস্তে আসিল।

নীলকণ্ঠ বাকী রাজস্ব ও নজরাণা প্রভৃতি পরিশোধ করিয়া ফতেসিংহ অধিকার করিলেন। নীলকণ্ঠের এক ভ্রাতার নাম পরে উল্লিখিত দেখা

যায়। তাঁহার এই ভ্রাতা জগন্নাথের পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ নীলকণ্ঠের মৃত্যুর পর সম্পত্তির দাবি করিয়া নালিশ করিয়াছিলেন। নীলকণ্ঠের জীবদ্দশায় তাঁহার ভ্রাতা সম্পত্তিতে অধিকার পান নাই।

নীলকণ্ঠ হরিপ্রসাদের বিধবা পত্নী পার্ব্বতীকে সম্মান সহকারে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া উভয়ের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হয় নাই।

নবাব সিরাজদ্দৌলার সময়ে নীলকণ্ঠ বাদশাহকে নজর দিয়া রাজা উপাধি পাইলেন। রাজা উপাধির সনন্দ জেমোর রাজবাটীতে বর্ত্তমান আছে।

নীলকণ্ঠ রায়ের সম্পত্তি অধিকারের পরেও নয়নসুখ রায় সম্পত্তি দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রায়রায়াঁ চায়েন রায়ের সাহায্যে নীলকণ্ঠ নয়নসুখ ও নারায়ণ উভয় ভ্রাতাকেই কারাবদ্ধ করেন। নারায়ণের সেই অবস্থাতেই মৃত্যু হয়। নয়নসুখ আলিবর্দ্দি খাঁর নিকট পুনরায় অভিযোগ আনেন; সেই সময়ে নবাব বর্গী লইয়া বিব্রত। অভিযোগে কোন ফল হয় নাই।

নয়নসুখ নবাব মীর কাসিমের সময় আর একবার সম্পত্তি পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে-বারও নবাবের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাধায় কোন ফল হয় নাই।

হরিপ্রসাদ রায়ের পত্নী পার্ব্বতী এত দিন নীলকণ্ঠের প্রদত্ত বৃত্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। ১১৭২ সালে তিনি আপন স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। এই সময়ে বাঙ্গালার ইতিহাসে বিপ্লব ঘটিয়াছে; মীর কাসিমের পরাভবের পর ইংরাজেরা ১৮৬৫ সালে দেওয়ানী পাইয়াছেন। পার্ব্বতী কাশীমবাজারের বিখ্যাত কান্ত বাবুর সাহায্যে নীলকণ্ঠের হস্ত হইতে সম্পত্তি কাড়িয়া লইলেন। রাজা নীলকণ্ঠ রায় মুর্শিদাবাদে কারাবদ্ধ হইয়া থাকিলেন। ১১৭৫ পর্য্যন্ত রাণী পার্ব্বতী সমগ্র সম্পত্তি দখল করেন।

১১৭৪ সালের আষাঢ় মাসে রাণী পার্ব্বতী বাঘডাঙ্গায় আসিলেন। সঙ্গে তাঁহার দত্তক পুত্র ও তাঁহার ভ্রাতা ত্রিলোচন রায়ের ঔরস পুত্র কালীশঙ্কর উপস্থিত ছিলেন। কর্ম্মচারিগণ উভয়কে নজরাদি দিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিল। সেই বৎসর ফাল্গুন মাসে কালীশঙ্করের সমারোহ সহকারে যজ্ঞোপবীত হইল। জ্ঞাতিগোষ্ঠীভুক্ত বিশ্বনাথ চৌধুরী নান্দীশ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন। ১১৭৯ সালে মণ্ডলপুরের রামসুন্দর রায়ের ভগিনী রাজমণি দেবীর সহিত কালীশঙ্করের বিবাহ হইল।

১১৭৫ সালে নীলকণ্ঠ কারামুক্ত হইয়া কলিকাতায় উকীল পাঠাইলেন। সেখানে লর্ড ক্লাইবের নিকট অভিযোগ করিয়া মুর্শিদাবাদের কর্ম্মচারীর নামে এক পরোয়ানা আনিলেন। মুর্শিদাবাদের কর্ম্মচারী কোন বিচার করিলেন না। তৎপরে নীলকণ্ঠ মুর্শিদাবাদে পুনরায় অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই অভিযোগের ফলে ফতেসিংহের জমিদারী দুই সমান অংশে বিভক্ত হইয়া রাজা নীলকণ্ঠ ও রাণী পার্ব্বতীকে অর্পিত হয়। প্রথিতনামা কান্দির দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও কাশীমবাজারের কান্ত বাবু এই উপলক্ষ্যে ফতেসিংহের কিয়দংশ উভয় পক্ষের নিকট মধ্যস্থতার বেতনস্বরূপ গ্রহণ করেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অংশ রাধাবল্লভপুর ও কান্ত বাবুর অংশ কান্তনগর আখ্যা পাইয়া পৃথক্ পরগণা বলিয়া গণ্য হইল।

১১৭৬ সালে বাঙ্গালার বিখ্যাত মন্বন্তর। এই সময় হইতে ফতেসিংহ জমিদারী দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া জেমো ও বাঘডাঙ্গা দুই খণ্ডের সৃষ্টি করিল। জেমো বাঘডাঙ্গার জমিদারী বিভাগ এইরূপে সম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু জেমো বাঘডাঙ্গার বিবাদ মিটিতে আরও বহু বৎসর লাগিয়াছিল।

এই ঘটনার পর নয়নসুখ রায় সম্পত্তি পাইবার জন্য আর একবার চেষ্টা করিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন। হেষ্টিংস চেৎসিংহের দমনে বারাণসী যাত্রা করায় সে-বারও কোন ফল হইল না।

রাজা নীলকণ্ঠ রায় ১১৫১ হইতে ১১৭২ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে সম্পত্তি অধিকার করেন। ১১৭২ হইতে ১১৭৫ পর্য্যন্ত রাণী পার্ব্বতীর অধিকার। নীলকণ্ঠ রায় তখন কারাবদ্ধ। ১১৭৬ সালের পর ফতেসিংহ পরগণা দ্বিখণ্ডিত হইয়া অর্দ্ধেক অংশ নীলকণ্ঠের ও অর্দ্ধেক রাণী পার্ব্বতীর অধিকারভুক্ত হয়। রাজা নীলকণ্ঠ জেমোর বাটীতে ও রাণী পার্ব্বতী বাঘডাঙ্গার বাটীতে বাস করিতেন। তদবধি জেমো ও বাঘডাঙ্গা পৃথক্ হইয়া রহিয়াছে। পরবর্ত্তী তিন পুরুষ ধরিয়া জেমোর বাটী ও বাঘডাঙ্গার বাটীর পরস্পর রেষারেষি ও বিবাদ চলিয়াছিল। ইহার ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা নিয়ত ঘটনার মধ্যে ছিল।

রাজা নীলকণ্ঠ ও রাণী পার্ব্বতীর নাম ফতেসিংহের লোকে অদ্যাপি বিস্মৃত হয় নাই। উভয়েই মুক্তহস্তে ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন। রাজা নীলকণ্ঠ জেমোর বাটীতে জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা ও গণেশাদি পঞ্চ দেবতার ধাতুময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন ; রাণী পার্ব্বতী বাঘডাঙ্গার বাটীতে সিংহবাহিনীর

ধাতুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ঐ সকল বিগ্রহের যথাবিধানে সেবা চলিয়া আসিতেছে। রাজা নীলকণ্ঠ আপন আত্মীয় স্বজনগণের নামে নানা স্থানে অনেকগুলি শিবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সেবার জন্য ভূমি দান করিয়া যান। ঐ সকল শিবালয়ের অধিকাংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান।

দেবতাব্রাহ্মণের সেবায় যশোলাভ করিয়া রাজা নীলকণ্ঠ ১১৯৭ সালের ১লা চৈত্র তারিখে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র শিতিকণ্ঠ রায় পত্নী তারা দেবীকে রাখিয়া তৎপূর্ব্বেই লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে নীলকণ্ঠ লক্ষ্মীনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণ নামক দুইটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের বয়স তখন তের বৎসর ও রুদ্রনারায়ণের বয়স দশ বৎসর মাত্র। মৃত্যুকালে তিনি সীতারাম ত্রিবেদী ও গদাধর ত্রিবেদী নামক দুই জন আত্মীয়কে পুত্রগণের ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া যান।

এই সীতারাম ত্রিবেদী ও গদাধর ত্রিবেদী তৎকালে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। গর্গগোত্রোদ্ভব সীতারাম ত্রিবেদীর পিতার নাম রূপচন্দ্র ত্রিবেদী। সীতারাম ত্রিবেদী প্রথমে রাজা নীলকণ্ঠের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই কন্যার মৃত্যু হইলে তিনি গদাধর ত্রিবেদীর ভগিনীকে বিবাহ করেন। সীতরাম বাবু অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও ক্ষমতাবান্ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। আপন ক্ষমতায় তিনি যথেষ্ট ভূসম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সীতারামের বুদ্ধিশক্তি সর্ব্বদা সরল পথে চালিত হইত না। এই জন্য তাঁহার শত্রুরও অভাব ছিল না। প্রসিদ্ধি আছে, রাজা নীলকণ্ঠ একবার কোন গুরুতর অভিযোগে মুর্শিদাবাদে বিচারার্থ আবদ্ধ হয়েন। বিচারে তাঁহার গুরুতর দণ্ডের সম্ভাবনা ছিল; তখন সীতারাম তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষে ছিলেন। নীলকণ্ঠ সীতারামের শরণাগত হইলে সীতারাম রাতারাতি কৌশলক্রমে আদালতের রেকর্ডগৃহে প্রবেশ লাভ করিয়া নথী বদলাইয়া আসেন ও নীলকণ্ঠ রায় দণ্ড হইতে অব্যাহতি পান। সীতারামের ক্ষমতার ও বুদ্ধিমত্তার সম্বন্ধে এইরূপ নানা গল্প শুনা যায়। গদাধর ত্রিবেদীর নিবাস জেমো হইতে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে টেঁয়া গ্রাম। তাঁহার পিতা বন্ধুলগোত্রজ দয়ারাম, পিতামহ হৃদয়রাম, প্রপিতামহ মনোহর-রাম। মনোহররাম অথবা হৃদয়রাম প্রথম বাঙ্গালা দেশে আসেন। গদাধর দিনাজপুরে ব্যবসায় দ্বারা ও মহাজনী কারবার দ্বারা অর্থ সঞ্চয় ও ভূসম্পত্তি

অর্জ্জন করিয়াছিলেন। জেমোর রাজবাটীর কর্ম্মাধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হইয়া তিনি জেমোতে প্রায় বাস করিতেন।

বাঘডাঙ্গার রাণী পার্ব্বতী তাঁহার ভ্রাতা ত্রিলোচন রায়ের পুত্র কালী-শঙ্করকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী হরিপ্রসাদ রায় মৃত্যুকালে দত্তক গ্রহণের অনুমতিপত্র দিয়া গিয়াছিলেন, এইরূপ প্রচার ছিল। রাজা নীলকণ্ঠ এই দত্তক গ্রহণে আপত্তি করিয়া আদালতে ১১৯৬ সালে নালিশ উপস্থিত করেন। এই দত্তক অসিদ্ধ হইলে রাণী পার্ব্বতীর মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি রাজা নীলকণ্ঠের বা তাঁহার ওয়ারিশের অধিকারে আসিবার সম্ভাবনা ছিল। মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বেই নীলকণ্ঠের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর নাবালক লক্ষ্মীনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণের পক্ষ হইতে গদাধর ও সীতারাম মোকদ্দমা চালান। বিচারে কালীশঙ্করের দত্তকত্ব সিদ্ধ হয়। সেই মোকদ্দমার যে সম্পূর্ণ ফয়শালা বর্ত্তমান আছে, তাহা হইতেই পুণ্ডরীক-কুলকীর্ত্তিপঞ্জিকার পরবর্ত্তী কালের ফতেসিংহের ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। এই সময়েই অর্থাৎ রাজা নীলকণ্ঠের মৃত্যুর পর ফতেসিংহের সম্পত্তি লইয়া আরও দুইটি মোকদ্দমা উপস্থিত হয়।

পুণ্ডরীকগোত্রজ নয়নসুখ রায়ের পুত্র মাণিকচন্দ্র রায় ও নারায়ণ রায়ের পুত্র শম্ভুনাথ রায় জয়রাম রায়ের উত্তরাধিকারী বলিয়া সমগ্র ফতেসিংহের জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। এই মোকদ্দমায় রাণী পার্ব্বতী, রুদ্রনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ প্রতিবাদী ছিলেন। নীলকণ্ঠের ভ্রাতা জগন্নাথের পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ রায় নীলকণ্ঠের অংশ অর্থাৎ জেমোর অংশের দাবী করিয়া দ্বিতীয় মোকদ্দমা স্থাপন করিয়াছিলেন। সীতারাম ও গদাধরও নাবালকগণের অভিভাবক স্বরূপে এই মোকদ্দায় প্রতিবাদী ছিলেন। উভয় মোকদ্দমাই ডিসমিস হইয়া যায়।

অল্প দিন পরে ১ ০২ সাল মধ্যে রুদ্রনারায়ণের মৃত্যু হওয়ায় লক্ষ্মীনারায়ণ একাকী জেমোর সম্পত্তির অধিকারী হন। লক্ষ্মীনারায়ণ দাদপুর রমণা-নিবাসী সাঙ্কৃতিগোত্রীয় ক্ষীরধর রায়ের ঔরস পুত্র ছিলেন; দত্তক গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার নাম ছিল নন্দকুমার।

লক্ষ্মীনারায়ণের সমকালে বাঘডাঙ্গার কালীশঙ্কর রায়ের পুত্র পরমানন্দ রায় বর্ত্তমান ছিলেন। ১২০১ সালে পরমানন্দ রায়ের জন্ম হয়। পরমানন্দ রায় পবন বাবু নামে অদ্যাপি প্রসিদ্ধ। পবন বাবু অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত লোক

ছিলেন। পবন বাবুর ভয়ে ঐ অঞ্চলের লোক সর্ব্বদা ত্রস্ত থাকিত। তিনি সশরীরে দস্যুদলের নেতা হইয়া ডাকাতি করিতে বহির্গত হইতেন। এইরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া সমস্ত সম্পত্তি নশীপুরের রাজা উদমন্ত সিংহের নিকট ঋণদায়ে আবদ্ধ রাখিয়া পবন বাবু ১২২৭ সালের আষাঢ় মাসে অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

জেমোর রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ অতি নিরীহপ্রকৃতি লোক ছিলেন। পবন বাবুর ভয়ে তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। মিষ্টালাপ ও স্বজন প্রতিপালনের জন্য তাঁহার খ্যাতি বৃদ্ধি হইয়াছিল। আপনার গ্রামের দরিদ্র প্রজাগণের ঘরে ঘরে গিয়া তিনি সংবাদ লইতেন। রাস্তার বাহির হইলে ছোট ছোট ছেলের দল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিত; তিনি তাহাদের সহিত পরিহাস আমোদ করিতেন। ১২০৯ সালের ৫ই কার্ত্তিক তাঁহার কালীনারায়ণ নামে এক পুত্র ও ১২১৫ সালের ৫ই পৌষ তারিখে দয়াময়ী নামে এক কন্যা জন্মে।

উল্লিখিত গদাধর ত্রিবেদী চারি ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। অপর তিন ভ্রাতার নাম বৈদ্যনাথ, বিশ্বনাথ ও রামনারায়ণ। গদাধর ত্রিবেদীর পত্নী অম্বিকা দেবীর গর্ভে সন্তানাদি হয় নাই। বৈদ্যনাথের পত্নী ত্রিপুরা দেবীর দুই পুত্র; নবকিশোর, জন্মকাল ১১৯৮; ও বলভদ্র, জন্মকাল ১২০৫। বিশ্বনাথেরও পুত্র ছিল না। রামনারায়ণের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে রাজকিশোর ও নন্দকিশোর নামক দুই পুত্র ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে আরও কতিপয় পুত্র কন্যা জন্মে। গদাধর ত্রিবেদী নবকিশোরের পুত্র বলভদ্রকে পুত্রবৎ গ্রহণ করেন ও আপন উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট করিয়া যান। গদাধরের উপার্জ্জিত সম্পত্তি তাঁহারা চারি ভ্রাতা একান্নবর্ত্তী থাকিয়া সমান অংশে বিভাগ করিয়া লন।

গদাধরের পুত্ররূপে স্বীকৃত বলভদ্র ত্রিবেদীর সহিত রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ আপন কন্যা দয়াময়ীর বিবাহ দেন। শ্বশুরপ্রদত্ত ভূসম্পত্তি ও বাটী পাইয়া বলভদ্র টেঁয়া হইতে জেমোতে আসিয়া বাস করেন। এইরূপে জেমো "নূতনবাটীর" স্থাপনা হয়।

লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র কালীনারায়ণ অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার শরীরে অসামান্য শক্তি ছিল। ভগিনীপতি বলভদ্রের সহিত তাঁহার অতিশয় সৌহার্দ্দ ছিল। বলভদ্রও শারীরিক শক্তিতে নিতান্ত ন্যূন ছিলেন না।

উভয়ের বিক্রম সম্বন্ধে অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। পত্নী জগদম্বা দেবী ও শিশুপুত্র মহীন্দ্রনারায়ণকে রাখিয়া কালীনারায়ণ চব্বিশ বৎসর বয়সে পিতামাতার সমক্ষে লোকান্তরিত হন।

১৩০৩ সালে আষাঢ় মাসে সীতারাম ত্রিবেদীর পুত্র হরচন্দ্রের জন্ম হয়। ছয় দিন পরে সূতিকাগৃহে হরচন্দ্রের মাতার মৃত্যু হয়। ১২০৭ সালে সীতারাম ত্রিবেদী ডিহি মস্তফাপুর খরিদ করেন ও তাহার সাত আনা আত্মীয় গদাধরকে বিক্রয় করিয়া নয় আনা অংশ নিজে রাখেন। ১২১৩ সালের কার্ত্তিক মাসের পূর্ব্বে কোন সময়ে গদাধরের ভ্রাতা বৈদ্যনাথের মৃত্যু হয়। বিশ্বনাথের সম্ভবতঃ ইহার পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। ১২১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সীতারাম ত্রিবেদী শত্রুকর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে প্রাণত্যাগ করেন। এই ব্যাপারে তাঁহার পরমাত্মীয়গণের মধ্যে কেহ কেহ লিপ্ত ছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। তখন তাঁহার পুত্র হরচন্দ্রের বয়স দশ বৎসর মাত্র। হরচন্দ্রের পিতৃশত্রুগণ তাঁহার কর্ম্মাধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়া নাবালকের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমেই তাঁহারা মাতুল গদাধরের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা করেন। গদাধরকে মস্তফাপুর হইতে বেদখল করা হয়। গদাধর নালিশ করিয়া আপনার স্বত্ব সাব্যস্ত করেন।

হরচন্দ্র ফকীর বাবু নামে খ্যাত। জেমোর অন্তর্গত ফকীরচক পল্লী, ফকীর বাবুর পুষ্করিণী, ফকীর বাবুর বাগান তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান। ফকীর বাবু বয়োবৃদ্ধির সহিত নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নানা দোষ ঘটিল। সময়ে সময়ে পাগলের মত ব্যবহার করিতেন। কিছু দিন পবন বাবুর দেওয়ান হইয়াছিলেন। একবার কল্পতরু সাজিয়াছিলেন। এই সময়ে পাঁচথুপীনিবাসী ভুবনেশ্বর ঘোষ মল্লিক চতুরতা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য খ্যাত ছিলেন। সীতারামবাবু মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন, আমার একখানা দাঁত থাকিল, সে এই ভুবন মল্লিক। ভুবন মল্লিক রাজা লক্ষ্মী-নারায়ণের দেওয়ানী করিতেন। তাঁহার বুদ্ধির বলে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ পবন বাবুর দৌরাত্ম্য হইতে আত্মরক্ষা করিতেন। ভুবনেশ্বর মল্লিক ফকীর বাবুর সম্পত্তি রক্ষণের ভার লইয়া তাঁহাকে জালবদ্ধ করিয়া ফেলেন। ১২১৭ সালে নিরুপায় হরচন্দ্র মাতুল গদাধরের আশ্রয়প্রার্থী হয়েন। ১২১৯ সালে ভুবনেশ্বর মল্লিকের হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্য হরচন্দ্রকে নিতান্ত কাতর দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বৎসর বৈশাখ মাসে তাঁহার

সম্পত্তি মস্তফাপুর মহাদেবনগর ও সদাশিবপুর ৯৩৩৯৬৶৮ জমায় ১২২৫ সাল পর্য্যন্ত মেয়াদে কাশীনাথ বাজপেয়ীকে ইজারা বিলি হয়। সেই বৈশাখ মাসেই ফকীর বাবু গদাধর ত্রিবেদীকে আপনার মোক্তার ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। ১২১৯ সালের মাঘ মাসে গদাধর ত্রিবেদীর মৃত্যু হয়। ফকীর বাবুর রক্ষার আর কোন উপায় থাকিল না। মাতুলের শাসন হইতে অব্যাহতি পাইয়া তিনি সম্পত্তি উড়াইতে লাগিলেন। ১২২৪ সালের পূর্ব্বেই মস্তফাপুরের কিয়দংশ বিক্রয় করিলেন। ১২২৭ সালের ২২শে ভাদ্র তারিখে ফকীর বাবু অনুচর সহ নৌকাযোগে জলবিহারে বহির্গত হইলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে নৌকা হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল, এবং ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার অপমৃত্যুকে দৈব ঘটনা বলিয়া রাষ্ট্র করিল। সেই রাত্রিতে তাঁহার বাড়ীঘর লুণ্ঠিত হইল। তাঁহার অসহায়া পত্নী ব্রহ্মময়ী পিত্রালয়ে আশ্রয় লইলেন। সীতারাম ত্রিবেদীর অর্জ্জিত স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি পরহস্তগত হইল। তাঁহার বাস্তুভিটার চিহ্ন পর্য্যন্ত অল্প দিন হইল লোপ পাইয়াছে।

ব্রহ্মময়ী দেবী আপন ভগিনী ভগবতী দেবীর অন্যতম পুত্র রাধিকাসুন্দরকে পুত্রার্থে গ্রহণ করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। রাধিকাসুন্দরের বংশীয়েরা সীতারামের নাম রক্ষা করিতেছেন।

১২৩৯ সালের ১৩ই চৈত্র তারিখে নৌকাযোগে কাশী যাইবার পথে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পৌত্র মহীন্দ্রনারায়ণের বয়স তখন সাত বৎসর মাত্র। বয়োবৃদ্ধি সহকারে মহীন্দ্রনারায়ণ তেজস্বী ও উদারপ্রকৃতি পুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সংযম ও মিতব্যয়িতা অভ্যাস করিতে পারেন নাই। তিনি সপরিবারে শ্রীক্ষেত্রে যান। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। ১২৫৩ সালের চৈত্র মাসে তাঁহার পিতামহী রামমণি দেবীর মৃত্যু হয়। ১২৫৪ সালের ২০শে বৈশাখ বাইশ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইতেই তিনি পরলোক গমন করিলেন। মাতা জগদম্বা ও পত্নী বিমলাসুন্দরী ও বামাসুন্দরী বর্ত্তমান থাকিলেন।

১২৪৬ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ বলভদ্র ত্রিবেদীর মৃত্যু হয়। তাঁহার তিন পুত্র—কৃষ্ণসুন্দর, ব্রজসুন্দর ও ভুবনসুন্দর, এবং এক কন্যা তিনকড়ি। কনিষ্ঠ পুত্রের ও কন্যার অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র মাতুলানী জগদম্বা দেবীর পুত্রশোক নিবারণের জন্য রহিলেন।

১২৫১ সালের ২রা চৈত্র তারিখে স্বর্গীয় মহীন্দ্রনারায়ণের পত্নীদ্বয় শ্বশ্রূ জগদম্বা দেবীর নির্ব্বাচনমতে জগন্নাথপুরনিবাসী রামধন রায়ের পুত্র ঠাকুরদাসকে দত্তক গ্রহণ করেন। দত্তক গ্রহণান্তর পুত্রের নাম হইল নরেন্দ্রনারায়ণ। পুত্রের দেহসৌষ্ঠবে জগদম্বা দেবী মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। উত্তরকালে নির্ব্বাচিত পুত্রের চরিত্রসৌন্দর্য্যে জন-সমাজ মুগ্ধ হইয়াছিল। নরেন্দ্রনারায়ণ পুণ্ডরীকবংশের উজ্জ্বলতম প্রদীপ।

কুবুদ্ধি লোকের প্ররোচনায় বালিকা বিমলাসুন্দরী কয়েক বৎসর পরে দত্তক গ্রহণের অনুমতিপত্র ও গৃহীত দত্তককে অস্বীকার করিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। ১২৬৪ সালের ৮ ফাল্গুন উভয় পক্ষের সম্মতিতে মোকদ্দমা মিটিয়া গেল। বিমলাসুন্দরী পিত্রালয় হইতে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়া পুত্রের মাতৃত্ব পদবীতে আপনার স্থান গ্রহণ করিলেন। পরবর্ত্তী কালে মাতৃপক্ষে স্নেহ ও পুত্রপক্ষে ভক্তির অণুমাত্র ব্যতিক্রম দেখিতে না পাইয়া লোকে চমৎকৃত হইল। সম্পত্তি কিছু দিন কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন থাকিল। নাবালক কলিকাতায় ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটুটে পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তত্ত্বাবধানে কিছু দিন অবস্থিতি করিলেন।

বাঘডাঙ্গার রাজা মহানন্দ রায় নানাগুণসম্পন্ন লোক ছিলেন। পবন বাবুর মৃত্যুর পর তৎপত্নী মহানন্দকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঘডাঙ্গার সমুদয় সম্পত্তি তখন নশীপুররাজের নিকট ঋণদায়ে আবদ্ধ ছিল। নশীপুররাজ সমস্ত সম্পত্তি দখল করিয়াছিলেন। রাজা মহানন্দ রায় পরহস্তগত সম্পত্তির নামে মাত্র অধিকারী হইলেন। তাঁহার স্থিরবুদ্ধির কৌশলে সমস্ত সম্পত্তি ওয়াশীলাত সমেত ফিরিয়া আসিল। জেমোর বাটীর দত্তকবিষয়ক বিবাদের মীমাংসার পর তিনি নরেন্দ্রনারায়ণের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া জেমো বাঘডাঙ্গার চিরন্তন বিবাদে চিরশান্তি স্থাপন করিলেন। মিষ্টভাষিতা ও অমায়িকতা গুণে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া ও মিতব্যয়িতা গুণে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত রাখিয়া রাজা মহানন্দ রায় ১২৭০ সালের ২রা আশ্বিন স্বর্গারোহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবী তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা সহ বর্ত্তমান রহিলেন।

চরিত্রমাহাত্ম্যে কৃষ্ণসুন্দর ও ব্রজসুন্দর ত্রিবেদী তৎকালে সকলের মাননীয় ছিলেন। ইতর ভদ্র সকলকেই তাঁহারা চরিত্রবলে আকৃষ্ট করিয়া-ছিলেন। জেমোর নূতন বাটী তাঁহাদের জীবদ্দশায় আনন্দকুটীরে পরিণত

হইয়াছিল। কৃষ্ণসুন্দর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর রোহিণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই যশস্বিনী মহিলার গর্ভে মিত্র ও বরুণের তুল্য দুই পুত্র কিছু দিনের জন্য চরণসঞ্চারে ধরাপৃষ্ঠ পবিত্র করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রজসুন্দরের একমাত্র কন্যা। ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় তাঁহার সমগ্র স্নেহ অধিকার করিয়া পুত্রের স্থান পূর্ণ করিয়াছিল।

এই স্থানেই পুণ্ডরীককুলের ইতিহাসে সমাপ্তি দেওয়া যাইতে পারে। পরবর্ত্তী কালের সকল ঘটনাই অত্যন্ত আধুনিক ও স্থানীয় অল্প লোকেরই অপরিজ্ঞাত; তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক। পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকার প্রকাশকেরও সেই সেই ঘটনা যথোচিত বর্ণনার ক্ষমতা নাই। কেন না, ইহা আমার আত্মকাহিনী। আপনার কথা লিখিতে স্বভাবতই সঙ্কোচ বোধ হইতেছে। দুই চারি কথায় পরিশিষ্টের এই অংশ শেষ করিব।

পিতামহ ব্রজসুন্দর ত্রিবেদী কাব্যামোদী লোক ছিলেন। মাধবসুলোচনা নামে একখানি গদ্যপদ্যময় নাটক ও স্বর্ণসিন্দূরসিংহ বা গৌরলাল সিংহ নামে একখানি প্রহসন বাঙ্গালায় রচনা করিয়াছিলেন। পৌরাণিক শাস্ত্র আলোচনায় তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। বহু ব্যয়ে সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত মহাপুরাণ উপপুরাণাদির হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। স্বয়ং নিয়মিতরূপে পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃগণকে শুনাইতেন।

১২৬৭ সালের ফাল্গুন মাসে পিতামহদ্বয় সপরিবারে নৌকাযোগে তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন। মাতুলানী জগদম্বা দেবী তাঁহার পুত্রবধূদ্বয় ও আত্মীয় স্বজন সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের অনুগমন করেন। পথের অনিয়মে পিতামহ কৃষ্ণসুন্দর দুরারোগ্য ব্যাধিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। ১২৬৮ সালের পৌষে তাঁহারা বাড়ী ফিরিলেন। চৈত্রের ২রা তারিখে ৩৫ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহাত্যয় ঘটিল। দয়াময়ী দেবী পুত্রশোকে অন্ধ হইলেন। মধ্যম পিতামহ ব্রজসুন্দর সংসারে প্রায় বীতস্পৃহ হইয়া শাস্ত্রালোচনায় ও ধর্ম্মচর্চ্চায় কথঞ্চিৎ ছয় বৎসর অতিবাহন করিয়া ১২৭৪ সালের ফাল্গুন মাসে ২৩শে তারিখে বৃদ্ধ অন্ধ জননীর সম্মুখে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগমন করিলেন।

কিছু পূর্ব্বে লালগোলার শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় রাও সাহেবের সহিত স্বর্গীয় রাজা মহানন্দ রায়ের তৃতীয়া কন্যার বিবাহ মহাসমারোহে সম্পাদিত হয়।

আমাদের পরিবার মধ্যে পিতৃব্যকে পিতৃসম্বোধনে আহ্বানের রীতি আছে। নরেন্দ্রনারায়ণ, গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দরকে লোকে তিন সহোদরস্বরূপে জানিত। আমিও জন্মাবধি তিন বাবা জানিতাম। নরেন্দ্রনারায়ণ জ্যেষ্ঠতাত, বড় বাবা ; পিতা বাবা ; খুল্লতাত ছোট বাবা।

বৎসর দুই পরে জেমোর রাজবাটীতে পাঠশালা স্থাপিত হয়। ছাত্রেরা এখানে বিনা বেতনে পড়িতে পায়। বৎসর বৎসর পাঠশালার পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে উৎসব হইত। হার্ডিঞ্জ সাহেবের সময়ে স্থাপিত কান্দি মডেল স্কুলের গবর্ণমেণ্টদত্ত সাহায্য ব্যতীত অবশিষ্ট ব্যয়ের ও তত্ত্বাবধানের ভার বড় বাবার হস্তে পড়িয়াছিল। দুই স্কুলের একত্র পরীক্ষা গ্রহণ ও একত্র পুরস্কার বিতরণ হইত। মডেল স্কুল এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। কিন্তু জেমো পাঠশালা উহার প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে নরেন্দ্রনারায়ণ স্কুল নামে পরিচিত হইয়া তাঁহার উইলে নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তির আয় হইতে অদ্যাপি তৎপুত্রগণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

১২৭৭ সালে ফাল্গুন মাসে রাজবাটীতে বিবাহোৎসব। জ্যেষ্ঠ কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁহার ভগিনীদ্বয়ের বিবাহ।

১২৭৯ সালের ১১ই ভাদ্র রাণী জগদম্বা দেবী স্বর্গারোহণ করেন। সমারোহে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

এই সময়ে রাজবাটীতে হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণের প্রথম বন্দোবস্ত হয়। ছোট বাবা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বিবিধ চিকিৎসার পর ডাক্তার স্যালজারের চিকিৎসায় পীড়া কতকটা উপশম হওয়ায় ছোট বাবার হোমিওপ্যাথিতে প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। তদবধি প্রত্যহ শতাধিক রোগীকে ঔষধ বিতরণ তাঁহার করুণাকোমল পরদুঃখকাতর জীবনের প্রধান অবলম্বন হইল। পরকে আপনার করিবার ক্ষমতা তেমন আর কেহ দেখিবে না। তাঁহার অন্তঃকরণ বালকের ন্যায় সরল ও কোমল ছিল। তাঁহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রতিভা চন্দ্রমার ন্যায় পূত রশ্মি বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিক্ সুধাসিক্ত করিত। সেই নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের রশ্মিরাশিতে যে একবার অবগাহন করিয়াছে, আজীবন সে তাহা ভুলিবে না।

সংস্কৃত শ্লোক রচনায় ছোট বাবার অসামান্য পটুতা ছিল। দ্রুতগতিতে মধুর পদ বিন্যাস করিয়া বিবিধ ছন্দে শ্লোক রচনা করিতেন। স্বাস্থ্যাভাবে স্কুল পরিত্যাগে বাধ্য হওয়ার পরেও সংস্কৃত শিক্ষায় পরীক্ষার্থীর ন্যায় আগ্রহ ছিল।

শেক্‌স্‌পীয়ারের Pericles Prince of Trye অবলম্বন করিয়া একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস সংস্কৃত শ্লোকে ছন্দোবদ্ধ করেন।

১২৮৩ সালে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাকেঞ্জি (উত্তরকালে লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সার্ আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি) সাহেবের তীব্র অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া, বাবার ও বড় বাবার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা উৎকট পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়। কান্দি দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিশৃঙ্খলার জন্য প্রতিবাদে ম্যাজিষ্ট্রেট অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়া উঠেন। উভয় পক্ষ হইতে উত্তর প্রত্যুত্তরে গরম গরম চিঠি চলিতে লাগিল। ম্যাকেঞ্জি সাহেব বাবাকে শাস্তির ভয় দেখাইলেন। শেষ পর্য্যন্ত ডিস্‌পেন্সারির বিশৃঙ্খলা প্রতিপন্ন হইল। ম্যাকেঞ্জি সাহেব তখন একেবারে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। স্বয়ং ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়া রাজবাটীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন ও জেমো পাঠশালার পরিদর্শন-পুস্তকে লিখিয়া গেলেন, "বাবু নরেন্দ্রনারায়ণকে স্থানীয় লোকে রাজা বলিয়া থাকে ; তিনি সর্ব্বতোভাবে রাজোপাধির যোগ্য।" কিন্তু উপাধিলালসা "বাবু নরেন্দ্র-নারায়ণের" অনম্য মেরুদণ্ডকে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সমীপে অবনত করিতে কখনও সমর্থ হয় নাই। উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় তিনি তাঁহার উন্নত মস্তক কখনও অবনত করেন নাই। অথচ স্বাভাবিক সৌজন্য ও বিনয়-গুণের আধার হইয়া তিনি সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধার আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তেজস্বিতায় তিনি সকলের ভীতির আস্পদ ছিলেন ; কোমলতায় তিনি সকলের আশ্রয়স্থল ছিলেন। কঠোর ও কোমল গুণের যুগপৎ সমাবেশে তাঁহার মহিমান্বিত চরিত্র সকলের বিস্ময়কর ছিল। সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে তিনি উৎসাহের সহিত নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন ; তাঁহার নেতৃত্ব ব্যতীত স্থানীয় সমাজে কোন সদনুষ্ঠানই সম্পন্ন হইত না। স্থানীয় সমাজের নেতার পদবীতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি চরিত্রবলে সমাজ শাসন করিতেন। তিনি বর্ত্তমান থাকিতে ইতর ভদ্র বিবাদ মীমাংসার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক বোধ করিত না। দুষ্কৃতকারী কোথায় তাঁহার কর্ণগোচর হইবে, এই আশঙ্কায় অতি সঙ্গোপনে দুষ্ক্রিয়া সাধনে বাধ্য হইত। তাঁহার চরিত্রবল নীরবে অপরকে সংযত পথে রাখিতে সমর্থ হইত। বিপৎকালে ইতর ভদ্র সকলেই তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিত। সকলেই জানিত, আপৎকালে তাঁহার আশ্রয়গ্রহণ নিষ্ফল হইবে না। সাহায্যপ্রার্থীকে বা

ভিক্ষাপ্রার্থীকে কখন তিনি বিমুখ করেন নাই। তাঁহার সৌজন্যের ও মিষ্ট বাক্যের অসামান্য বশীকরণশক্তি ছিল। অপরিচিতপূর্ব্ব ব্যক্তি একবার তাঁহার স্পর্শে আসিলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বশীভূত হইয়া যাইত। তাঁহার প্রতিশ্রুতির কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। নীচ কর্ম্মে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার পরিবারমধ্যে ও স্বজনগণমধ্যে তাঁহার আদেশ সম্রাটের আজ্ঞার ন্যায় লঙ্ঘনাতীত ছিল। সেই আদেশ প্রদানের জন্য তাঁহাকে ও আদেশ পালনের জন্য অপরকে কখনও পরিতপ্ত হইতে হয় নাই।

কান্দির মহকুমা কিছু দিন পূর্ব্বে উঠিয়া যাওয়ায় সাধারণের যথেষ্ট অসুবিধা হইতেছিল। ম্যাকেঞ্জি সাহেব মহকুমার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় প্রতিশ্রুত হইয়া সার্ আশলি ইডেনের সেক্রেটরি হইয়া গেলেন। ইডেন সাহেব বহরমপুর আসিলে তাঁহার নিকট ডেপুটেশন গেল। কান্দির মহকুমা ফিরিয়া আসিল।

১২৮৪ সাল ২৫ মাঘ শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব্বরাত্রিতে পিতামহী রোহিণী দেবী দেহত্যাগ করিলেন।

১২৮৫ সাল ২২শে ও ২৩শে বৈশাখ রাজবাটীতে ও আমাদের বাটীতে পুত্রকন্যাগণের বিবাহ। রাজবাটীতে দুই পুত্র ও দুই কন্যার, আমাদের বাটীতে এক পুত্র ও তিন কন্যার বিবাহ। ২৫শে বৈশাখ বৃদ্ধা প্রপিতামহী দয়াময়ী দেবী রোরুদ্যমান বরকন্যার গৃহপ্রবেশের সহকারে ঐহিক ধাম ত্যাগ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন।

বাবা একখানি বাঙ্গালা উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। উপন্যাসের নাম দিয়াছিলেন বঙ্গবালা। কয়েক ছত্র পয়ারে উহার ভূমিকা লিখিয়াছিলেন; তাহার প্রথম কয় ছত্র উদ্ধৃত হইল।

বাঙ্গালীর রণবাদ্য বাজে না বাজে না।
বঙ্গদেশে নাহি হয় সমরঘোষণা॥
রণক্ষেত্রে বীরমদে মত্ত হতজ্ঞান।
হয় নাই বহু দিন বাঙ্গালী সন্তান॥
এবে বঙ্গ জনস্থান নিস্তব্ধ নীরব।
কোন দিকে নাহি আর কোন কলরব॥

রাজনীতি আলোচনা—দুরূহ ভাবনা।
রাজ্যরক্ষা হেতু চিন্তা, সাম্রাজ্য বাসনা॥
এ সকল কষ্টকর কার্য্যে বাঙ্গালীরে।
প্রবৃত্ত হইতে আর না হয় সংসারে॥

এই উক্তি তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বাহির হইয়াছিল। স্বদেশের কথা কহিবার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বরের বিকৃতি ও লোমহর্ষ ঘটিত। স্বভাব-প্রদত্ত মেঘমন্দ্র স্বরে উদ্দীপনার ভাষায় তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রটির মনে স্বদেশভক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্য কতই না প্রয়াস পাইতেন। গণিতে, বিজ্ঞানে, বিশেষতঃ সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে তাঁহার স্বাভাবিক আনুরক্তি ছিল। ইংরাজী না জানিয়াও জ্যোতিষশাস্ত্রে গভীর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অসাধারণ ধীশক্তি যথোচিত ফলোৎপাদনে অবকাশ পায় নাই। সর্ব্ববিধ শারীরিক ও মানসিক শক্তির তিনি উপাসনা করিতেন। এই শক্তি যে আধারে অবস্থিত দেখিতেন, তাহার কোন দোষ সহজে তাঁহার চোখে পড়িত না। সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্রতা ও কপটতা ও সঙ্কীর্ণতা ভয়ে তাঁহা হইতে বহু দূরে থাকিত। অসামান্য নির্ভীকতা ও সহিষ্ণুতা তাঁহার বন্ধুগণের নিকট কখন কখন গোঁয়াড়মি বলিয়া প্রতিভাত হইত। সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে তিনি নরেন্দ্রনারায়ণের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। পারমার্থিক বিষয়ে তিনি নির্গুণব্রহ্মবাদী ছিলেন। ঈশ্বরের তুষ্টি বা রুষ্টির সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিতেন না। কোনরূপ কুসংস্কার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। আচার বিষয়ে শাস্ত্রীয় নিয়ম যথাসাধ্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ও ব্রতোপবাসাদি কৃচ্ছ্র সাধনায় এদিকে অত্যন্ত মনোযোগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় আচারবিরোধী নব্য শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কখনও নিন্দা করিতেন না। তাঁহাদের কর্ম্মপরতা ও উদ্যম ও স্বদেশানুরাগ তাঁহার প্রীতি আকর্ষণ করিত। তিনি কস্মিন্ কালে কাহারও নিন্দা করেন নাই। তাঁহার কেহ শত্রু ছিল না।

১২৮৭ সালে গ্রামের ভদ্রলোকদিগকে লইয়া অভিনেতৃসম্প্রদায় গঠিত হয়। ব্যয়বিধান করিয়া সাজসরঞ্জাম আনান হইল। দ্রৌপদীনিগ্রহ (অভিনয়ের জন্য বাবার রচিত ক্ষুদ্র নাটক) ও বেণীসংহারের অভিনয় হয়। ১২৮৮ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে নবনির্ম্মিত রঙ্গমঞ্চে অশ্রুমতী ও কৃষ্ণ-কুমারীর অভিনয় হইল। বাবা অভিমন্যুবধ অবলম্বন করিয়া একখানি

নাটক লিখিয়া শেষ করিয়াছিলেন। তাহার অভিনয় আর ঘটিল না। ১৮ই আষাঢ় বেলা এক প্রহর সময়ে জেমোকান্দির গ্রাম্য সমাজে আনন্দাভিনয়ে সহসা যবনিকাপাত ঘটিল।

তৎপরে দশ বৎসর কাল জেমোর রাজবাটীতে আর কোন উৎসবঘটনা ঘটে নাই। সাধারণের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান এই ক্ষুদ্র গ্রাম্য সমাজে নিত্যানুষ্ঠানের মধ্যে ছিল। অতঃপর দশ বৎসর কাল কোন দেশহিতকর বা লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমাজনেতা দেব নরেন্দ্রনারায়ণের হস্ত-পরিচালনা কেহ দেখিতে পায় নাই। এই দশ বৎসর মধ্যে লিপিযোগ্য ঘটনা অধিক কিছু নাই। একবার ১২৯১ সালের ৬ই কার্ত্তিক, আর একবার ১২৯৮ সালের ৬ই ভাদ্র, আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশিবর্গের সম্মিলিত অশ্রুপ্রবাহ পুণ্ডরীককুলের বৃহৎ পরিবারের শোকোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি করিয়াছিল মাত্র।

পিতৃপুরুষগণের তপঃসঞ্চিত পুঞ্জীভূত পুণ্যরাশি, বজ্রাদপি কঠোর ও কুসুমাদপি কোমল, হিমাচলের ন্যায় উন্নত ও মহোদধির ন্যায় গভীর, মানব-হৃদয়ের সমগ্র সদ্বৃত্তিসমূহের সমষ্টীকৃত সমবায়, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, এক হইয়াও মূর্ত্তিত্রয় পরিগ্রহ করিয়া, লোকশিক্ষার জন্য ধরাধামে বিচরণ করিতেছিলেন। কাল পূর্ণ হইলে তিন মূর্ত্তি একে একে অন্তর্হিত হইল।

অতঃপর পুত্রশোকার্ত্তা দেবী বিমলাসুন্দরী ও বামাসুন্দরী সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীবাসিনী হইলেন। ১৩০০ সালের ১২ই চৈত্র বিমলাসুন্দরী তথায় অমৃতপদ লাভ করিলেন। বামাসুন্দরী পুত্রশোকের দুর্ব্বহ ভারে অতীতের সমগ্র আনন্দস্মৃতি প্রোথিত করিয়া বিশ্বনাথের চরণোপান্তে চিরশান্তির প্রতীক্ষায় দিন যাপন করিতেছেন।

ভাগ্যচক্রের বিবর্ত্তনে বাঘডাঙ্গার সম্পত্তি ফতেসিংহের অর্দ্ধাংশ হরিপ্রসাদের বংশধরগণের হস্ত হইতে হস্তান্তর আশ্রয় করিয়াছে। মুর্শিদাবাদের মাননীয় প্রজাপালক উদারচরিত নবাব বাহাদুর সেই অর্দ্ধাংশের অধিকারী হইয়াছেন। স্বর্গীয় রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ ও যোগীন্দ্রনারায়ণকে সেই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সাক্ষী হইতে হয় নাই। পূজনীয়া শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবী ভাগ্যলক্ষ্মীকর্ত্তৃক বঞ্চিতা হইয়া বার্দ্ধক্যে পুত্রশোকভার বহনের জন্য জীবিতা আছেন।

'নানা কথা'র পরিশিষ্ট

ব্রাহ্মণ কি পৃষ্ঠ ?

যে-কোন ইংরাজী পুস্তক খুলিলেই প্রায় দেখা যায়, ব্রাহ্মণ হইতে এ দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ শব্দের ইংরাজী priest ; ব্রাহ্মণজাতি = sacerdotal caste ; ভারতবর্ষ priest-ridden দেশ ; এ দেশে ব্রাহ্মণেরই হাতে সমস্ত ক্ষমতা—ব্রাহ্মণ ভূসুর, ভূদেব,—মনুষ্যমধ্যে দেবতা। অন্যান্য জাতি ব্রাহ্মণের পদানত, ব্রাহ্মণ স্বার্থের জন্য দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে।

এ দেশে যাঁহারা ঐতিহাসিক বা সামাজিক পুস্তক, প্রবন্ধ প্রভৃতি লেখেন, তাঁহাদের মধ্যেও এইরূপ বাক্য সকলের প্রতিধ্বনি অহরহ শুনা যায়। ব্রাহ্মণের হাতে স্বর্গের চাবি ছিল ; ব্রাহ্মণ সেই চাবি না খুলিলে অন্যের স্বর্গদ্বার দিয়া প্রবেশাধিকার নাই। ব্রাহ্মণের এই বিষম অত্যাচারই এ দেশের অবনতির প্রধান কারণ।

ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে এইরূপ যে অপবাদ দেওয়া যায়, তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু এই অপবাদের সারবত্তা সকল সময়ে বুঝিতে পারা যায় না। এই অপবাদ সমূলক কি না, তাহার মীমাংসার জন্য 'ভারতী'র পাঠকসমাজ ও বঙ্গের সুধীসমাজের নিকট উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য, প্রশ্নটি বড় গুরুতর ; ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহার চেয়ে গুরুতর প্রশ্ন অতি অল্প আছে। প্রশ্নের গৌরব বিবেচনায় সুধীসমাজ প্রশ্নকর্ত্তার বিনীত আবেদনে কর্ণপাত করিলে অনুগৃহীত হইব।

কিন্তু তৎপূর্ব্বে খট্‌কা কোথায়, বলা আবশ্যক। ব্রাহ্মণের আধিপত্য এ দেশে বহু সহস্র বৎসর হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও আছে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। এবং শ্রেণীবিশেষের এইরূপ একাধিপত্যের ফল ভাল না হইবারই কথা। একাধিপত্য উভয়ের পক্ষেই অনিষ্টজনক, যিনি প্রভুত্ব করেন ও যাঁহার উপর প্রভুত্ব চালিত হয়, উভয়ের পক্ষেই অনিষ্টজনক। ইংরাজী demoralisation শব্দের ঠিক বাঙ্গালা প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাইতেছি না, কিন্তু শ্রেণীবিশেষের চিরস্থায়ী আধিপত্য এই demoralisation আনয়ন করে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কিন্তু অনিষ্ট হইয়াছে, এক কথা ; ও কিরূপে অনিষ্ট হইয়াছে, অন্য কথা। ব্রাহ্মণ হইতে দেশের অনিষ্ট হইয়াছে স্বীকার করিলেও, কিরূপে সেই অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, তাহা লইয়া বিতণ্ডা চলিতে পারে। বিচারের ফল এক জিনিস, বিচারের প্রণালী অন্য জিনিস। যে প্রকৃত চোর, সে দণ্ড পাইল, বিচারের ফল ঠিক হইল। কিন্তু যদি পুলিসের গড়া সাক্ষীর উপর নির্ভর করিয়া তাহার দণ্ডবিধান হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিচার-প্রণালীতে দোষ থাকিয়া যায়।

ব্রাহ্মণ হইতে দেশের অনিষ্ট হইয়া থাকে হউক ; তজ্জন্য ব্রাহ্মণের তিরস্কার আবশ্যক হয় হউক ; কর্ম্মফল হইতে যখন মুক্তির আশা নাই, তখন ব্রাহ্মণ নিজ দুষ্কৃতের ফলভাগী হইবেন, তাহাতেও দুঃখ নিষ্ফল। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ব্রাহ্মণের হাতে ধর্ম্মের চাবি ছিল কি না বা আছে কি না ? এই দেশ priest-ridden দেশ কি না ? ব্রাহ্মণ শব্দে "পৃষ্ট্" বুঝায় কি না ?

মীমাংসার পূর্ব্বে প্রশ্নের অর্থটা পরিষ্কার করিয়া বুঝা আবশ্যক। ইংরাজী priest শব্দের অভিধানসম্মত অর্থ পুরোহিত। ব্রাহ্মণজাতিকে priestly class বলা হয় ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতি পুরোহিতের জাতি।

Priest শব্দের এই অথ স্বীকার করিয়া লইলাম। ব্রাহ্মণ বস্তুতই পৌরোহিত্যব্যবসায়ী। ব্রাহ্মণেরই পৌরোহিত্যে অধিকার আছে, অন্যের বোধ করি নাই। পৌরোহিত্য ও যাজন যদি একই অর্থে প্রযুক্ত ধরা যায়, ব্রাহ্মণেরই যাজনে অধিকার। কাজেই ব্রাহ্মণজাতি priestly class বলা অসঙ্গত নহে।

কিন্তু একটা কথা আছে। ব্রাহ্মণ মাত্রের পৌরোহিত্যে বা যাজনে অধিকার থাকিতে পারে ; কিন্তু ব্রাহ্মণ মাত্রই যাজক নহে, পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ী নহে। যাজনে অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু সেই অধিকার প্রয়োগে সকলে শাস্ত্রানুসারে বাধ্য কি না, জানি না, শাস্ত্রজ্ঞেরা বলিতে পারেন।

ফলে কিন্তু ব্রাহ্মণ মাত্রই পৌরোহিত্যব্যবসায়ী নহেন। এ-কালে ত নহেন ; সেকালেও ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ব্রাহ্মণ পরশুরাম ক্ষত্রিয় রাজার পৌরোহিত্য করিতেন না, ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করিয়া বেড়াইতেন। দ্রোণাচার্য্য পৌরোহিত্য না করিয়া ক্ষত্রিয় শিশুদিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিতেন ও নিজে লড়াই করিতেন। চাণক্য পণ্ডিতের শ্রাদ্ধে ভোজনে বোধ করি

আপত্তি ছিল না ; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তিনি মন্ত্রিত্ব করিতেন। নাটক-কর্ত্তাদের আসনে বিদূষকের পদ ব্রাহ্মণসন্তানের একচেটিয়া ছিল। এ-কালে ব্রাহ্মণের ছেলে জজিয়তি হইতে জুতা বিক্রয় পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন ; যাজন অনেকেই করেন না ; বোধ করি, সংখ্যা ধরিলে অধিকাংশই করেন না। অতএব ব্রাহ্মণেরই পৌরোহিত্যে অধিকার থাকিলেও ব্রাহ্মণ মাত্রই পুরোহিত নহেন। পুরোহিত মাত্রে ব্রাহ্মণ ; কিন্তু ব্রাহ্মণ মাত্রে পুরোহিত নহেন। এ দেশে priestly class ব্রাহ্মণ হইতে গৃহীত ; কিন্তু ব্রাহ্মণজাতি priestly class নহে।

পুরোহিত হইতে দেশের যদি অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ব্রাহ্মণের একাংশ হইতে হইয়াছে ; সমগ্র ব্রাহ্মণজাতি হইতে হয় নাই। যে তিরস্কার পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রাপ্য, তাহা সমগ্র ব্রাহ্মণজাতির প্রাপ্য নহে।

খ্রীষ্টানদের দেশে যে-কোন ব্যক্তির পৌরোহিত্যে বোধ করি অধিকার আছে। যে-কোন ব্যক্তির আছে বলা চলে না ; অবশ্য পৌরোহিত্যের জন্য কিছু না কিছু উপযোগিতা,—qualification আবশ্যক, তবে সেই উপযোগিতা জন্মগত বা জাতিগত না হইতে পারে। এ দেশে জাতিটা অর্থাৎ কোন বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে জন্মটা সেই উপযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম না হইলে অন্য গুণ থাকিলেও পৌরোহিত্যে অধিকার থাকে না।

কিন্তু ব্রাহ্মণ মাত্রই পুরোহিত ও যাজক নহেন ; এরূপ স্থলে ব্রাহ্মণ-জাতিকে পুরোহিতের জাতি বলা ঠিক সঙ্গত কি না ? এবং পুরোহিত জাতির যে দোষ, তাহা ব্রাহ্মণজাতির উপর ফেলা সঙ্গত কি না ?

তার পর আর একটা কথা। Priest শব্দের অর্থে পুরোহিত ও যাজক শব্দ ব্যবহার করা সঙ্গত কি না ? Priest বলিলে কি বুঝায়, আগে দেখা উচিত।

খ্রীষ্টানদের দেশে যে-কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই priest হইতে পারে না। সে যত বড় ধার্ম্মিক হউক, আর পণ্ডিত হউক, আর শাস্ত্রজ্ঞ হউক, ইচ্ছা করিলেই priest হয় না। ঐ কাজে নিযুক্ত হইতে হইলে একটা সনন্দ আবশ্যক। এবং নিয়োগের সনন্দ যে-সে ব্যক্তি দিতে পারেন না। যেমন যে-কোন ব্যক্তি ইচ্ছা মাত্রেই জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট বা কনষ্টেবল হয় না, সেইরূপ যে-কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই পৃষ্ট্ হয় না। সমাজসম্মত একজন নিয়োগকর্ত্তা থাকেন ; তিনি যাহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন, তিনিই পৃষ্ট্ হন

বা পুরোহিত হন। যে দিন হইতে নিযুক্ত হন, সেই দিন হইতে তিনি পৃষ্ট্। যে দিন তিনি নিজে কাজে ইস্তফা দেন বা পদচ্যুত হন, সেই দিন হইতে তিনি আর পৃষ্ট্ নহেন।

রোমান ক্যাথলিকদের দেশে পৃষ্ট্ নিয়োগের কর্ত্তা পোপ স্বয়ং, ইংরাজদের দেশে রাজা স্বয়ং; অন্যান্য দেশে সমাজসম্মত অন্যান্য কর্ত্তা আছেন। পোপের নিয়োগে বা রাজার নিয়োগে কেহ পৌরোহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে সাধারণকে তাহার পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। যিনি যে চার্চের অন্তর্ভুক্ত, তিনি সেই চার্চের অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক নিযুক্ত পুরোহিতের শাসন মানিতে বাধ্য; নতুবা তিনি সে চার্চের অঙ্গীভূত নহেন। যেমন রাজনিযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটকে মানিব না বলিলে চলে না, তেমনই যথাবিধানে নিযুক্ত পুরোহিতকে মানিব না বলিলে চলে না। সাধারণের পুরোহিত নির্ব্বাচনে কোনরূপ স্বাধীনতা নাই।

আমাদের দেশে পুরোহিত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যে হইতে পারে না; কিন্তু যে-কোন ব্রাহ্মণ যখন ইচ্ছা পৌরোহিত্য অবলম্বন করিতে পারে। কাহারও সনন্দ আবশ্যক হয় না। যদি সনন্দের দরকার হয়, সে যজমানের। যজমান যাহাকে ইচ্ছা, পুরোহিতস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। পণ্ডিতকেও পারেন, মূর্খকেও পারেন; ঋষিতুল্য লোককেও পারেন, গুলিখোরকেও পারেন; এ বিষয়ে যজমানের স্বাধীনতা অব্যাহত। তিনি কাহারও বাধ্য নহেন। তবে সাধারণতঃ পৌরোহিত্য বংশগত হইয়া থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা। এ দেশে সকল ব্যবসায়ই বংশগত হইবার ব্যবস্থা। এ দেশে দেওয়ানের ছেলে দেওয়ান হয়, সরকারের ছেলে সরকার হইবার অধিকার রাখে; একই বাড়ীতে সাত পুরুষ ধরিয়া কাজ করিতেছে, এরূপ পাচক, খানসামা, দরজী, ছুতার পর্য্যন্ত বিরল নহে। বাপের কাজ বেটাকে দেওয়াই এ দেশের গৃহস্থ লোকের ইচ্ছা; তবে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। গুরুর ছেলে গুরু, পুরোহিতের ছেলে পুরোহিত, নাপিতের ছেলে নাপিত, দরজীর ছেলে দরজী হইতেও পারেন, না হইতেও পারেন; সে গৃহস্থের ইচ্ছা। অনেক স্থলেই হইয়া থাকেন; কোথাও বা হন না।

তাহা হইলে খ্রীষ্টানী পৃষ্ট্ ও হিন্দু পুরোহিতের এইখানে অনেকটা বিভেদ। যে-কোন ব্রাহ্মণসন্তান যখন ইচ্ছা যাজনবৃত্তি গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে পারেন—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, অন্যকর্ত্তৃক নিয়োগের বা সনন্দের

প্রয়োজন হয় না। কোন সমাজসম্মত প্রভুশক্তির নিকট বাহাল বরতরফের আবশ্যকতা নাই। পুরোহিত স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন মনুষ্য; যাহাকে ইচ্ছা, তিনি যজমান স্বীকার করিতে পারেন, নাও পারেন। যজমানও এ স্থলে সম্পূর্ণ স্বাধীন; যাহাকে ইচ্ছা, পুরোহিত গ্রহণ করিতে পারেন; কেহ তাঁহাকে এ বিষয়ে বাধ্য করেন না। ইচ্ছামত পুরোহিত নির্ব্বাচন করিলে তিনি সমাজভ্রষ্ট হয়েন না। খ্রীষ্টান গৃষ্টের এই স্বাতন্ত্র্য নাই। ইংলিশ চর্চ্চের অন্তর্ভুক্ত কোন গৃহস্থ রাজনিযুক্ত পুরোহিতের শাসন স্বীকার না করিলে তিনি ইংলিশ চর্চ্চ পরিত্যাগে বাধ্য হন। এ দেশে সেরূপ চর্চ্চও নাই, সেরূপ বাধ্যবাধকতাও নাই।

তার পর পুরোহিতের কর্ত্তব্য লইয়া কি বিভেদ আছে, দেখা যাইতে পারে। পুরোহিতের একটা কাজ প্রতিনিধিত্ব। তিনি উপাস্য ও উপাসকের মধ্যস্থ; উপাসকের প্রতিনিধিস্বরূপে তিনি উপাসকের পূজা উপাস্যের প্রতি অর্পণ করেন; এবং উপাস্যের তরফ হইতে উপাসককে পূজার প্রতিদান অর্পণ করেন বা অর্পণ করিবার ভরসা দেন। এই অর্থে তাঁহার হস্তে স্বর্গের দ্বারের চাবি থাকে: তিনি যজমানকে উপাস্যের সম্মুখে উপস্থিত করেন, তিনি তাঁহার পরিচয় দিয়া দেন; তাঁহার হাত দিয়াই উপাস্য উপাসকের মধ্যে সমুদয় কারবার চলে। তিনি যেন ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীল; তাঁহার হস্তেই এটর্নির পাউয়ার আছে। তিনি ভিন্ন অন্যের হাত দিয়া উপাস্য উপাসকের মধ্যে কোন কারবার চলিবার যো নাই; চালাইলেও চলিবে না। কোর্টের স্বীকৃত উকীল ব্যতীত অন্যের হস্ত দ্বারায় যেমন নালিশ রুজু হয় না, সেইরূপ উপাস্যের স্বীকৃত পুরোহিতের হাত ভিন্ন অন্যের হাতে আবেদন গৃহীত হয় না।

ফলে পুরোহিত প্রতিনিধি, তাঁহার প্রতিনিধিত্ব দুই রকমের। এক শ্রেণীর পুরোহিত সমাজের প্রতিনিধি, আর এক শ্রেণীর পুরোহিত ব্যক্তির প্রতিনিধি। প্রাচীন ইহুদীরা জীহোবা দেবের উপাসক ছিল। জীহোবা ভিন্ন অন্য দেবতাকে তাহারা পূজা করিতে পাইত না, অন্যকে পূজা করিলে জীহোবা অত্যন্ত রাগ করিতেন ও শাস্তি দিতেন; ইহুদী জাতি জীহোবার আপনার লোক ছিল। জীহোবার মন্দিরের পাণ্ডারা সমগ্র ইহুদী জাতির প্রতিনিধি-স্বরূপে জীহোবার উপাসনা করিত। পৌরোহিত্য বংশবিশেষে আবদ্ধ ছিল। এক সময়ে রাজা স্বয়ং ইহুদী জাতির প্রতিনিধিস্বরূপে পুরোহিত ছিলেন।

গ্রীষ্টান সমাজেও পুরোহিতের সমাজপ্রতিনিধিত্ব স্পষ্ট দেখা যায়। পোপ স্বয়ং ক্যাথলিক সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপে উপাসকমণ্ডলী ও উপাস্য দেবতার মধ্যস্থতা করেন। সমগ্র যাজক সম্প্রদায় পোপের অধীন ও পোপের নিযুক্ত। পোপের সনন্দ যাঁহার নাই, তিনি যাজক নহেন। প্রকৃতপক্ষেই স্বর্গের চাবি পোপের হস্তে। পোপ যে যজমানকে দরজা খুলিয়া দিলেন, তিনি প্রবেশে অধিকার পাইলেন ; পোপ যাহার প্রতি বিরূপ, তাহার প্রবেশ-পথ রুদ্ধ। ক্যাথলিক সমাজের কোন ব্যক্তির ধর্ম্মজীবন স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নহে। চর্চ্চের বাঙ্গালায় সঙ্ঘ শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্যাথলিক সমাজে প্রত্যেক গ্রীষ্টানের ব্যক্তিগত জীবন সঙ্ঘের জীবনের অঙ্গীভূত। সঙ্ঘ ছাড়িয়া কোনও ব্যক্তি গ্রীষ্টান হইতে পারেন না। সঙ্ঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন ব্যক্তি গ্রীষ্টান হইতে পারেন না ; অন্ততঃ ক্যাথলিক সমাজের গ্রীষ্টান হইতে পারেন না। গ্রীষ্টান উপাসক স্বাধীনভাবে ঘরের ভিতর ঈশ্বরের স্তুতি উপাসনা করিতেও হয়ত পারেন ; কিন্তু সে স্তুতি উপাসনার বিশেষ মূল্য আছে বোধ হয় না।

ক্যাথলিক সমাজ ভিন্ন অন্যান্য গ্রীষ্টীয় সমাজেও এইরূপ সঙ্ঘের গৌরব স্পষ্ট দেখা যায়। সঙ্ঘ ছাড়িয়া যেন ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নাই। সঙ্ঘের নির্দ্দিষ্ট পুরোহিত ভিন্ন অপরে গ্রীষ্টের মিনিষ্টার হইতে পারেন না। তাঁহার হাত দিয়া উপাসনা উপাস্যের নিকট পৌঁছিবে, তিনিই দেবতার স্বীকৃত ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীল, অন্যের হাত দিয়া নালিশ রুজু হইবে না।

ইংরাজ সমাজে রাজা স্বয়ং সঙ্ঘের অধ্যক্ষ। রাজা স্বয়ং যাজকতা করেন না ; কিন্তু তিনিই যাজকমণ্ডলীর নিয়োগে কর্ত্তা ও অধ্যক্ষ। সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপে তিনি এই শক্তি চালনা করেন। সমাজ হয়ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাকে এই অধ্যক্ষতা প্রদান করিয়াছে। কিন্তু এখন আর সমাজের অর্থাৎ সঙ্ঘের কোন ব্যক্তির ধর্ম্মবিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নাই। রাজার নিয়োগে নির্দ্দিষ্ট যাজকেরা সমাজের পক্ষ হইতে সাধারণের কল্যাণজন্য ঈশ্বরের উপাসনা করে ও আবার ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য বিবিধ অনুষ্ঠানে সেই রাজনিযুক্ত সমাজসম্মত সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় পুরোহিতকেই আহ্বান করিতে হয়। রাজনিযুক্ত পুরোহিতেরা রাজ্যের মঙ্গলার্থ ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেন, দেশে দৈবোৎপাত উপস্থিত হইলে ঈশ্বরের প্রসাদনের জন্য দেশের হইয়া স্তবস্তুতি করেন ; যুদ্ধবিগ্রহের সময় শত্রুনিপাতের জন্য ঈশ্বরের সাহায্য

প্রার্থনা করেন। আবার ব্যক্তিবিশেষের জাতকর্ম্মে, নামকরণে, বিবাহে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সেই রাজনিযুক্ত সমাজসম্মত প্রতিনিধিকে ডাকিতে হয়। যেহেতু তিনিই খ্রীষ্টের মিনিষ্টার, অপরের সে অধিকার নাই।

ফলে খ্রীষ্টান সমাজে পুরোহিত মুখ্যতঃ সমাজেরও প্রতিনিধি, এবং গৌণতঃ ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধি। আগে তিনি সমাজের প্রতিনিধি, পরে তিনি ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিনিধি; কেন না, সমাজ ছাড়িয়া ব্যক্তির ধর্ম্মবিষয়ক স্বাতন্ত্র্য নাই। প্রত্যেক খ্রীষ্টান খ্রীষ্টীয় সঙ্ঘের অঙ্গ মাত্র।

ইংরেজ সমাজ ভাঙ্গিয়া যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ননকন্‌ফর্মিষ্ট সমাজ উৎপন্ন হইয়াছে, যাহারা রাজার অধ্যক্ষতা স্বীকার করে না এবং রাজনিযুক্ত পুরোহিতের শাসন মানে না, তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য অনেকটা আছে বটে, কিন্তু তথাপি তাহারাও আপন আপন ক্ষুদ্র চর্চ্চ বা উপসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাকে সেই সেই উপসঙ্ঘের অঙ্গস্বরূপে নির্দ্দেশ করিতে যেন ব্যাকুল। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শাসনপ্রণালীর যেন মূল ভিত্তিই এই, সঙ্ঘ হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তির অস্তিত্ব নাই। কাজেই যিনি সঙ্ঘেরও পুরোহিত, তিনিই ব্যক্তিরও পুরোহিত। তিনি সাধারণের হইয়া উপাসনা করেন, আবার তিনি ব্যক্তির হইয়া উপাস্যের প্রসাদন করেন। তিনিই খ্রীষ্টের নিরূপিত মিনিষ্টার।

ইউকেরিষ্ট-ঘটিত অনুষ্ঠানে খ্রীষ্টীয় সমাজের এই মৌলিক ভাবটা স্পষ্ট দেখা যায়। পুরোহিত মদ ও রুটি যথাবিধানে উৎসর্গ করিয়া দেন। এই উৎসর্গের পর সেই মদ ও রুটি যীশু খ্রীষ্টের রক্তমাংসে পরিণত হয়। তৎপরে সমবেত উপাসকগণ সেই রক্তমাংস বাঁটিয়া লন। এই অনুষ্ঠান খ্রীষ্টের সহিত সঙ্ঘের সম্মিলন ও একাত্মতা ব্যঞ্জন করে। খ্রীষ্টান সঙ্ঘ খ্রীষ্টের দেহ হইতে অভিন্ন। খ্রীষ্টের রক্ত ও খ্রীষ্টের মাংস সঙ্ঘের অস্থিমজ্জায় মিলিত আছে। খ্রীষ্ট ছাড়া সঙ্ঘ নাই, সঙ্ঘ ছাড়া খ্রীষ্ট নাই। এই পানভোজন অনুষ্ঠানের দ্বারা মাঝে মাঝে সেই একাত্মতা স্মরণ করাইয়া দিতে হয়। অথবা এই অনুষ্ঠানের দ্বারাই উভয়ের সম্মিলন সাধিত হয়, উভয়ের একাত্মতা সাধিত হয়। এই অনুষ্ঠান খ্রীষ্টীয় সমাজের সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠান, ইহার নিগূঢ় অর্থ ও তাৎপর্য্য লইয়া সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ রক্তপাত যথেষ্ট হইয়াছে, ইতিহাসে তাহা লিপিবদ্ধ আছে। খ্রীষ্টানগণের কল্পনা এই অনুষ্ঠানে বিবিধ নিগূঢ় তাৎপর্য্য অর্পণ করিয়া ইহাকে পরম গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

আমাদের দেশে বৌদ্ধগণ বুদ্ধের সহিত সঙ্ঘের কতকটা এইরূপ একাত্মতা স্বীকার করিতেন, খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠানের অনুরূপ কোন অনুষ্ঠান বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল কি না জানি না। ইহুদীদের মধ্যে ওরূপ অনুষ্ঠান কিছু ছিল কি? হয়ত খ্রীষ্টানেরা বৌদ্ধগণের নিকটই ঐরূপ অনুষ্ঠান পাইয়াছিলেন। এ-কালের তান্ত্রিকগণের মদ্যমাংসাদি পঞ্চ মকার সাহায্যে সাধনার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক আছে কি না, ঐতিহাসিকেরা বিচার করিবেন।

ফলে খ্রীষ্টীয় সমাজের এই অনুষ্ঠানে পুরোহিতের প্রাধান্য নির্ব্বিবাদে স্বীকৃত। সমাজসম্মত অর্থাৎ সঙ্ঘসম্মত পুরোহিত ভিন্ন অন্যের দ্বারা এই অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইতে পারে না। সেই পুরোহিত স্বয়ং সঙ্ঘের প্রতিনিধি-স্বরূপে খ্রীষ্ট ও সঙ্ঘের মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া উভয়ের একাত্মতা সম্পাদন করেন। সেই পুরোহিতের মধ্যস্থতা ভিন্ন সঙ্ঘের, সুতরাং সঙ্ঘান্তর্গত কোন ব্যক্তির খ্রীষ্টানত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সেই পুরোহিতের হস্তে ইউকেরিষ্টের মহাপ্রসাদ লাভ না করেন, তিনি সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত নহেন, তিনি খ্রীষ্টান নহেন।

দেখা গেল, প্রাচীন ইহুদী সমাজে রাজা অথবা নির্দ্দিষ্ট পুরোহিতেরাই সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপে জীহোবার পৌরোহিত্য করিতেন। অপরের পৌরোহিত্যে অধিকার ছিল না। ইহুদী ভিত্তি হইতে উৎপন্ন খ্রীষ্টীয় সমাজে পুরোহিতের সেই সমাজপ্রতিভূত্ব বর্ত্তমান। পুরোহিত সমাজের প্রতিনিধি, সমাজসম্মত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মধ্যস্থ, কাজেই তদ্দ্বারা ব্যক্তিগত উপাসনা উপাস্যের সিংহাসনসমীপে প্রেরিত হওয়া আবশ্যক।

এ দেশের ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য কিরূপ দেখা যাউক। এ দেশে যখন হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজা আধিপত্য করিতেন, তখন রাজার নির্দ্দিষ্ট পুরোহিত থাকিত। তিনি রাজার ও রাজ্যের কল্যাণ সাধনার্থ বিবিধ অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করিতেন। রাজার আপৎ শান্তির জন্য, রোগবিমুক্তির জন্য, অভ্যুদয়ের জন্য, সন্তানলাভের জন্য তাঁহাকে যাগ যজ্ঞ, শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতে হইত। তদ্ভিন্ন রাজ্যের অমঙ্গলনাশের জন্য, অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টির জন্য, মারীভয় নিবারণের জন্য, শত্রুসংহারের জন্য তাঁহাকে বিবিধ অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে হইত। রাজা স্বয়ং রাজ্যের প্রতিনিধি, তাঁহার মঙ্গলে রাজ্যের মঙ্গল ও অমঙ্গলে অমঙ্গল। সেই জন্য রাজপুরোহিত সমাজেরও হিতান্বেষী

সমাজসম্মত পুরোহিত ছিলেন, স্বীকার করা যাইতে পারে। সমুদয় আথর্ব্বণিক অনুষ্ঠানে পারদর্শিতা দেখিয়া পুরোহিত নিযুক্ত হইত।

তদ্ভিন্ন রাজা যখন নিজ স্বর্গকামনায় বা কল্যাণকামনায় যাগাদি সম্পন্ন করিতেন, তখন কর্ম্মকাণ্ডে পারদর্শী ব্রাহ্মণের সাহায্য আবশ্যক হইত। এ-কালে যেমন সামান্য লোকের দুর্গোৎসব করিবার জন্য ব্রাহ্মণের সাহায্য আবশ্যক করে, তখনও সেইরূপ যাগাদি অনুষ্ঠানের সময় অনুষ্ঠানাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্য আবশ্যক হইত। অধ্বর্য্যু, হোতা, উপহোতা প্রভৃতির কাজ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের দ্বারাই সম্পাদিত হইত; কেন না, ব্রাহ্মণেরাই ঐ সকল বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে অভিজ্ঞ ছিলেন।

কিন্তু এই সকল ঋত্বিক্ প্রভৃতিকে পুরোহিত নাম দেওয়া চলে না। বস্তুতঃও সেকালে তাঁহাদিগকে পুরোহিত বলিত না। পুরোহিতের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, প্রত্যেক রাজসংসারে নির্দ্দিষ্ট পুরোহিত নিযুক্ত ছিল, কিন্তু যাগাদি সম্পাদনের সময় দেশ বিদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আহ্বান করা হইত। যজমান তাঁহাদিগকে অনুষ্ঠানবিশেষে সাহায্য করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন; অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার পর তাঁহাদের আর যজমানের সহিত কোন সম্পর্ক থাকিত না। তাঁহাদিগকে যদি পুরোহিত বলিতে হয়, তাহা হইলে দুর্গোৎসবে যে মুচি ঢাক বাজায়, তাহাকেও পুরোহিত বলা অসঙ্গত হয় না। এই সকল কর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পৃষ্ট্ বলা হয়, তাঁহাদের পৃষ্ট্ নাম সঙ্গত কি না জানি না; কিন্তু তাঁহারা পুরোহিত ছিলেন না, ইহা নিশ্চয়; তবে যিনি পুরোহিত, তিনি হয়ত কোন এক ঋত্বিকের কার্য্যভার গ্রহণ করিতেন, সে স্বতন্ত্র কথা।

সে যাহাই হউক, এ-কালে দেশে হিন্দু রাজাও নাই, রাজপুরোহিতও নাই। হিন্দু সমাজে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন, সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপে দেবার্চ্চনা করেন বা সমাজের কল্যাণকামনার জন্য নিযুক্ত আছেন বা দায়ী আছেন, এরূপ কোন পুরোহিত বা পুরোহিতসম্প্রদায় অন্ততঃ এ-কালে অস্তিত্বহীন।

বড় বড় দেবস্থানের বা তীর্থস্থানের পাণ্ডাদিগকে সমাজের প্রতিনিধি বলিতে পারি না। দূর দেশ হইতে তীর্থযাত্রীরা এই সকল দেবতার নিকট ব্যক্তিগত কল্যাণকামনায় উপস্থিত হয় এবং পাণ্ডাদিগের হাত দিয়া যখন পূজা দেয়, তখন পাণ্ডাদের অর্থাগমটাও মন্দ হয় না; কিন্তু এই পাণ্ডাদের

সমাজপ্রতিভূত্ব নাই। ইঁহারা সমাজসম্মত, সমাজ হইতে নিযুক্ত পুরোহিত নহেন। যে-কোন হিন্দু কোন পাণ্ডার মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতিরেকে বিশ্বেশ্বর-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বিশ্বেশ্বরকে গঙ্গাজল ও বিল্বপত্র অর্পণ করিয়া আসিতে পারেন, কাহারও তাহাতে বাধা দিবার অধিকার নাই। স্থানবিশেষে হয়ত কোন পাণ্ডা বা মোহন্ত দেবতাদিগকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন এবং অর্চ্চনার্থীদিগকে প্রবেশাধিকার দেন না, সেটা নিতান্তই গায়ের জোর মাত্র। অথবা সে স্থলে দেবতা পাণ্ডার নিজস্ব দেবতা, হিন্দু সমাজের দেবতা নহেন। যেমন আমার বাড়ীর ঠাকুরকে পূজা করিতে অন্যের অধিকার নাই, এও কতকটা সেইরূপ। আর এক কথা, মন্দিরসংসৃষ্ট পাণ্ডার পদবী সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ সমাজে নিকৃষ্ট স্থানে। আর যেখানে মন্দিরের প্রভুত্ব মোহান্তের হাতে, সেখানে মোহান্তকেও পুরোহিত বলা যায় না। মোহান্ত ব্রাহ্মণ নহেন, তিনি সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসী যাজক হইতে পারেন না।

কাজেই বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপে দেবতার আরাধনা করেন, এরূপ পুরোহিত অস্তিত্বহীন। তবে ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন, এরূপ পুরোহিতের অসদ্ভাব নাই।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে গৃহস্থ মাত্রেরই নিরূপিত ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছেন। জাতকর্ম্ম হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সমুদয় অনুষ্ঠানে তাঁহাকে ডাকিতে হয়, অথবা ডাকিবার প্রথা আছে।

ডাকিবার প্রথা আছে, কেন না, এই সকল অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার জন্য অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন এবং গৃহস্থ মাত্রেরই অভিজ্ঞতা নাই। কিন্তু যিনি অভিজ্ঞ, তিনি পুরোহিত ডাকিতে বাধ্য কি? শাস্ত্রে এরূপ বিধান আছে কি যে, পুরোহিতের সাহায্য ব্যতীত কৃতী যজমান স্বয়ং কর্ম্ম সম্পাদন করিলে তাহার সে কর্ম্ম পণ্ড হইবে?

জাতকর্ম্ম হইতে, অথবা আরও একটু আগে গিয়া গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সমুদয় অনুষ্ঠানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের আবশ্যকতা; কেন না, ঐ সকল অনুষ্ঠান অধিকাংশই শ্রৌত আচার, বৈদিক মন্ত্র সহকারে ঐ সকল অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণের অর্থাৎ হিন্দু সমাজের উচ্চতর স্তরের প্রত্যেক ব্যক্তিরই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে, বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পূর্ণ মাত্রায় অধিকার আছে। যে-কোন গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, স্বয়ং কোনও পুরোহিতের, কোন ব্রাহ্মণের

সাহায্য ব্যতীত ঐ সকল ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীণ অনুষ্ঠানের অধিকারী। অবশ্য যে সকল স্থলে কার্য্য একাকী সাধ্য নহে, সেখানে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ডাকিতে হয়; কিন্তু তিনি পুরোহিতস্বরূপে আসেন না, তিনি ঠিকা কাজে ব্রতী হয়েন মাত্র। যে-কোন গৃহস্থ, তিনি যদি দ্বিজাতিভুক্ত হন, তবে তিনি পুরোহিত না ডাকিয়া স্বয়ং যে-কোন শ্রৌত অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে পারেন। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য নিরঙ্কুশ।

সেকালের যাগযজ্ঞের স্থান এ-কালে ব্রতপূজাদিতে গ্রহণ করিয়াছে। যাগযজ্ঞে যেমন অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্য আবশ্যক হইত, এ-কালেও সেইরূপ নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম ব্রতপূজাদির অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্য আবশ্যক হয়। আবশ্যক হয়; কিন্তু কোথায়? যেখানে ব্রতী স্বয়ং দ্বিজাতি হইয়াও কর্ম্মে অনভিজ্ঞ। ব্রতী স্বয়ং ব্রতপূজাদিতে অভিজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণ ডাকিতেই হইবে, এইরূপ শাস্ত্রের ব্যবস্থা আছে কি? আমার বাটীর দুর্গোৎসবে আমি স্বয়ং পূজক হইলে পুরোহিতের বা মধ্যস্থের প্রয়োজন কোথায়? অবশ্য আমার দ্বিজত্ব থাকা আবশ্যক।

আর যদিই বা ব্রাহ্মণের সাহায্য আবশ্যক হয়, এ সকলই ত নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে, এই সকল ব্রতপূজাদির করণে লাভ আছে; কিন্তু অকরণে প্রত্যবায় নাই। ব্রতপূজা করিতে পারিলে, আমার ঐহিক বা পারত্রিক লাভ হইতে পারে; কিন্তু যদি আমি অসমর্থ হই, তাহা হইলে আমার লাভ না থাকিতে পারে, কিন্তু ক্ষতি কিছুই নাই, আমার স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ থাকে না, আমার হিন্দুয়ানিও যায় না, আমার সমাজচ্যুতিও ঘটে না। বস্তুতই হিন্দু সমাজের মধ্যে অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্রই অর্থসাপেক্ষ ব্রতপূজাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অধিকাংশ লোকে এ সকল ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠানে অক্ষম হইয়াও হিন্দুত্বচ্যুত বা স্বর্গপ্রবেশে অনধিকারী হয় নাই।

তার পর গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম। নিত্যকর্ম্মের অননুষ্ঠান দোষাবহ, অথবা প্রত্যবায়জনক। নিত্যকর্ম্ম অর্থাৎ সন্ধ্যোপাসনা, হোম, বলিকর্ম্ম, শ্রাদ্ধ, তর্পণাদি। তাহার উপর শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, ইষ্টদেবতা পূজা প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মস্বরূপে অনেক হিন্দু গৃহস্থ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই সকল অনুষ্ঠানসাধনে পুরোহিতের সম্পর্ক অনাবশ্যক। ইহা মধ্যবর্ত্তী দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না; এবং যে গৃহস্থ এই সকল কর্ম্ম

স্বয়ং সম্পাদন করেন, তিনি পুরোহিতরূপ কাণ্ডারীকে নৌকার কড়ি না দিয়াও ডঙ্কা বাজাইয়া স্বর্গে যাইবার অধিকার রাখেন।

তবেই কি নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানে, কি নৈমিত্তিক ব্রত পূজাদির আচরণে, কি শ্রৌত সংস্কারসাধনে দ্বিজ গৃহস্থ পুরোহিত ব্রাহ্মণের মধ্যস্থতা ব্যতীতও সমগ্র জীবনটা কাটাইয়া যাইতে পারেন। তাহাতে তাঁহার কোন প্রত্যবায় হয় না। তবে যে তিনি স্থলবিশেষে কর্ম্মপটু ব্রাহ্মণ আহ্বান করেন, সে কেবল আপনার অভিজ্ঞতা অভাবে, অথবা কোথায় কর্ম্মের অঙ্গহানি বা অসম্পূর্ণতা ঘটিবে, এই আশঙ্কায়, অথবা যেখানে একাধিক ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক, সেই সকল অনুষ্ঠানবিশেষের সম্পাদনে। কাজেই পুরোহিতের হাতে স্বর্গের চাবি আছে, এ কথা বলা চলে না।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে, এ সকলই ত দ্বিজাতির পক্ষে ব্যবস্থা, শূদ্রের পক্ষে কি হইবে? শূদ্রের ত কোন ধর্ম্মাচরণে অধিকার নাই, শূদ্রের ত ব্রাহ্মণের মধ্যস্থতা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। শূদ্রের পক্ষে ত ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন স্বর্গদ্বার রুদ্ধ। এবং বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অধিকাংশই শূদ্রশ্রেণীভুক্ত। দ্বিজাতিগণ যেন স্বাধীনভাবে ধর্ম্মাচরণে অধিকারী, কিন্তু এই বৃহৎ শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণের আনুকূল্য ব্যতীত ধর্ম্মাচরণে অনধিকারী ও কাজেই তাহারা ব্রাহ্মণের অর্থাৎ পুরোহিতের পদানত। ইহা কি ভয়ানক অত্যাচার নহে? শূদ্রের এই পরাধীনতার কৈফিয়ত কি আছে?

কিন্তু তাই কি? শূদ্র কি প্রকৃতই ধর্ম্মাচরণে অনধিকারী? শাস্ত্রবেত্তারা উত্তর দিবেন। লেখক শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ; লেখকের যেরূপ বিশ্বাস, এখানে তাহাই লিখিত হইতেছে মাত্র।

শূদ্রের বেদপাঠে, বেদ উচ্চারণে, বৈদিক অনুষ্ঠানে অধিকার নাই। বৈদিক যাগযজ্ঞে শূদ্রের অধিকার নাই। কিন্তু তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ, পৌরাণিক ব্রত পূজাদিতে শূদ্রের অধিকার অব্যাহত। শূদ্র শিবপূজা করিতে পারে, শক্তিপূজা করিতে পারে, ইষ্টদেবতার পূজা করিতে পারে। পুরোহিতের দ্বারা করাইতে হয় না। তজ্জন্য ঐহিক বা পারত্রিক যে ফললাভ সম্ভব, তাহা শূদ্রের হস্তগত হইতে বাধা আছে কি?

কেবল বৈদিক অনুষ্ঠানেই শূদ্রের অধিকার না থাকিয়া যদি অপর সমুদয় অনুষ্ঠানে অধিকার পূর্ণমাত্রায় থাকে, তাহা হইলে শূদ্রের স্বর্গপ্রবেশ নিষেধ হইল কি? এরূপ ব্যবস্থা কোথাও আছে কি, বৈদিক অনুষ্ঠানের অকরণে

স্বর্গবাস ঘটিতে পারে না? বৈদিক অনুষ্ঠানে শূদ্রের অধিকার নাই, অপিচ বৈদিক অনুষ্ঠান শূদ্রের পক্ষে আবশ্যকও নহে। জীবনে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ না কবিয়াও সে তাহার স্বধর্ম্ম পালন করিতে পারে, এবং স্বধর্ম্ম পালনের সমগ্র ফল হইতে সে বঞ্চিত হইবে না।

এক হিসাবে দেখিতে গেলে বলা যাইতে পারে, ব্রাহ্মণ-প্রণীত শাস্ত্র শূদ্রের প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাত দেখাইয়াছে। দ্বিজাতির জন্য কঠোর অনুষ্ঠান, কঠোর তপস্যা, যাগযজ্ঞ, নানাবিধ সংস্কারাদি বিহিত হইয়াছে। সেই সকল শ্রমসাধ্য, ব্যয়সাধ্য, কঠোর অনুষ্ঠান শূদ্রের পক্ষে আদৌ আবশ্যক নহে। শূদ্রের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। শূদ্র সেই সহজ পন্থায় চলিলেই তাহার স্বধর্ম্মপালন হইবে; এবং কোন যমদূত তাহাকে নরকে টানিতে পারিবে না।

এই হিসাবে দেখিলে বলিতে হয়, ব্রাহ্মণ আপনার জন্য কঠোর বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু শূদ্রের জন্য সহজ পথ ব্যবস্থা করিয়া বরং উদারতা দেখাইয়াছেন। এইরূপ ব্যবস্থা কোথাও আছে কি যে, ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য ব্যতীত শূদ্রের স্বধর্ম্মপালন চলিবে না? তবে শূদ্র ব্রাহ্মণকে সম্মান করিতে বাধ্য, সে স্বতন্ত্র কথা।

যত দূর দেখা গেল, তাহাতে বোধ হয়, খ্রীষ্টানদের পুরোহিতে ও আমাদের পুরোহিতে আকাশ পাতাল বিভেদ। খ্রীষ্টান পুরোহিতের একটি সমাজকর্ত্তৃক স্বীকৃত নির্দ্দিষ্ট পদবী আছে; এ দেশে পুরোহিতের সেরূপ সমাজসম্মত কোন পদ নাই। ব্রাহ্মণগণ সমাজের সম্মতিক্রমে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ মাত্রই পুরোহিত নহেন। অন্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যাজক ব্রাহ্মণের অধিক সামাজিক সম্মান নাই, বরং শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যাজক ব্যবসায়ী পুরোহিত ব্রাহ্মণের সম্মান অল্প। খ্রীষ্টানদের দেশে পুরোহিত বা প্রীষ্ট্, কোন সমাজসম্মত প্রভুশক্তি কর্ত্তৃক স্বপদে নিয়োজিত হয়; যে ব্যক্তি একের পুরোহিত, সে অন্যেরও নিকট পুরোহিত। আমাদের দেশে সেরূপ প্রভুশক্তি কোথাও নাই। হিন্দু সমাজে পোপ নাই, চর্চ্চের অধ্যক্ষ নাই; সকলেই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। কাজেই পুরোহিত সমাজ হইতে বা কোন প্রভুশক্তি হইতে নিযুক্ত হয় না। যে আমার পুরোহিত, সে অন্যের পুরোহিত নহে। অন্য দেশে যেমন clergy ও lay দুই সম্প্রদায় সমাজে বর্ত্তমান, আমাদের দেশে সেরূপ দুই সম্প্রদায় নাই। ব্রাহ্মণ মাত্রেই

layman ; clergyman নহে। আবার এ দেশে যে-কোন ব্রাহ্মণ যে-কোন ব্যক্তিকে যখন ইচ্ছা যজমানস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন, আবার যে-কোন যজমান যে-কোন ব্রাহ্মণকে যখন ইচ্ছা পুরোহিতস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন। কোন বাধ্যবাধকতা নাই; কোন স্বাধীনতার সঙ্কোচ নাই। খ্রীষ্টানদের দেশে পুরোহিতের সমাজপ্রতিনিধিত্ব আছে, এ দেশের পুরোহিত কোন সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন না। তিনি কেবল আপনার যজমানেরই প্রতিনিধি, সেই যজমান এক ব্যক্তি হইতে পারে, এক গৃহস্থ পরিবার হইতে পারে; কিম্বা বহু পরিবার হইতে পারে। গ্রাম্য দেবতার পূজক ব্রাহ্মণেরা গ্রামের পক্ষ হইতে পূজা করেন। সেখানে সমাজও ক্ষুদ্র, প্রতিনিধিত্বও সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ।

খ্রীষ্টানদের দেশে গৃহস্থ মাত্রই এই সকল পুরোহিতের মধ্যস্থতা দ্বারা উপাস্যের সম্মুখীন হয়েন। দেবতার নিকট তাঁহাদের পূজা পৌঁছাইয়া দিবার এইরূপ মধ্যস্থের একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশে যে-কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্ব্বিশেষে পুরোহিতের সাহায্য ব্যতিরেকেও স্বধর্ম্মপালন করিয়া চিরজীবন কাটাইতে পারেন। নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম অনুষ্ঠানে ইচ্ছা করিলে ব্রাহ্মণ আহ্বানের কার্য্যতঃ প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু অকরণে কোন প্রত্যবায় নাই। অন্যত্র পাপপুণ্য বণ্টন পোপের হস্তে। পোপ যাহাকে পাপী বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, কেহ তাহাকে মুক্তি দিতে পারে না; পোপ যাহাকে পুণ্যের ছাড় দিবেন, বৈতরণীপারে কেহ আর তাহাকে আটকাইবে না। এ দেশে কোন ব্রাহ্মণের, কোন পুরোহিতের সাধ্য নাই যে, আমাকে এইরূপ ছাড় দিতে সাহস করেন। কোন পোপ আমার ধর্ম্মজীবনের নিয়ন্তা নহেন। মনুষ্য মাত্রই সম্পূর্ণ স্বাধীন ব্যক্তি এবং স্বকর্ম্মের ফলভাগী। কর্ম্মফল হইতে কেহ তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে না।

একটা কথা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। খ্রীষ্টানদের salvation নামে উদ্ধারের উপায় আছে। এই salvationএর তর্জ্জমায় অনেকে মুক্তি শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। Salvation অর্থে পাপ হইতে মুক্তিলাভ মাত্র; তাহার ফল স্বর্গলাভ। যে ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টকে শরণ লইয়াছে, যথাবিধানে শরণ লইয়াছে, সে-ই এই স্বর্গপ্রাপ্তির অধিকারী। খ্রীষ্টান ভিন্ন অন্য বিধর্ম্মীর salvation ত একেবারেই অসম্ভব।

হিন্দু শাস্ত্রে মুক্তি শব্দের অর্থ অন্যরূপ। মুক্তির নানা অর্থ হিন্দু শাস্ত্রেও চলিত আছে সত্য; কিন্তু এখানে কোন অবিচার নাই।

প্রথম দার্শনিকগণের মুক্তি। এই মুক্তির অর্থ স্বর্গপ্রাপ্তি বা পাপমোচন মাত্র নহে। মুক্তিতে পাপপুণ্য কিছুই থাকে না; স্বর্গে বাস বা বৈকুণ্ঠে বাস মুক্তি নহে, উহা বন্ধনের নামান্তর, এই মুক্তির উপায় জ্ঞানলাভ। যিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনিই মুক্ত। সেই জ্ঞান কিরূপ, তাহা লইয়া বিবিধ দর্শনে মতভেদ আছে; কিন্তু এ কথা কোথাও নাই যে, ব্রাহ্মণেই মুক্তির অধিকারী, অন্যে নহে। ব্রাহ্মণ হইলেই জ্ঞানী হয় না; শূদ্র হইলেই অজ্ঞানী হয় না। তবে জ্ঞানলাভ সহজ কথা নহে। অনেক তপস্যা, অনেক চেষ্টার ফলে জ্ঞানলাভ হয়। সেই পথ কাহারও পক্ষে সুগম নহে।

ভক্তেরা ও পৌরাণিকেরা মুক্তি শব্দ অন্য অর্থে ব্যবহার করেন। সামীপ্য, সালোক্যাদি নানাবিধ মুক্তির প্রসঙ্গ তাঁহাদের নিকট শোনা যায়। এই সকল মুক্তি কতকটা স্বর্গবাস বা বৈকুণ্ঠে বাস বা শিবলোকে বাসের মত। যাঁহারা চিনি হইতে চাহেন না, চিনি খেতে ভালবাসেন, তাঁহারা এইরূপ মুক্তির প্রার্থী। এই মুক্তির মুখ্য সাধন জ্ঞান নহে, ভক্তি। এই ভক্তির পথ কঠোর পথ নহে, অপেক্ষাকৃত সহজ পথ। যাঁহারা অত্যন্ত ভক্ত, তাঁহারা বলেন, একবার তাঁহাকে ভক্তিভরে ডাকিলেই মুক্তিলাভ হয়; যে ডাকিবে, তাহারই হইবে। ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার হইবে না; এমন কি, ভক্তিযুক্ত চণ্ডাল এখানে ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের অপেক্ষা মুক্তির পথে অনেকটা অধিক অগ্রবর্ত্তী। এই মুক্তি সহজে প্রাপ্য ও সকলেরই প্রাপ্য। তবে সকলে ডাকিতে জানে না, সে আপন দোষ।

মুক্তির আরও সহজ উপায় স্থলবিশেষে নির্দ্দিষ্ট আছে। তীর্থবিশেষে মরিতে পারিলেই স্বর্গবাস, বিষ্ণুলোকে বাস, শিবলোকে বাস ঘটে। তা সে যেমন পাপীই হউক না। এখানেও বর্ণ বিচার নাই। কাশীধামে মরিলে একেবারে খাঁটি মুক্তি। এখানেও বর্ণ বিচারের অভাব।

ফলে মুক্তির অর্থ যাহাই হউক, স্বর্গপ্রাপ্তিই হউক, সালোক্য সাযুজ্যই হউক, আর নির্ব্বাণমোক্ষ, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ইত্যাদিই হউক এবং মুক্তির সাধন যাহাই হউক, সকলেরই দ্বার অবারিত। ব্রাহ্মণ শূদ্রের বর্ণ-বিচার নাই, পুরোহিতের হাতে চাবি নাই; যথাযথ উপায় অবলম্বন করিলে সকলেই যথাসময়ে মুক্তিলাভ করিবে।

আর কেবল হিন্দু কেন, হিন্দু সমাজের বহির্ভূত ম্লেচ্ছ বা বিধর্ম্মী যে স্বর্গলাভে বা মুক্তিলাভে অনধিকারী, এরূপ কথা স্পষ্টভাবে কোথাও আছে কি? হইতে পারে, অনাচার হেতু, তত্ত্বজ্ঞানের অভাব হেতু তাহাদের পক্ষে স্বর্গদ্বারে বা মুক্তিতে পৌছান কার্য্যতঃ অসম্ভব। কিন্তু তাহারা কস্মিন্ কালে কোন ক্রমে স্বর্গে পৌছিবে না বা মুক্ত হইবে না, এরূপ নির্দ্দেশ কোথাও আছে কি?

এখন জিজ্ঞাস্য এই—

১। ব্রাহ্মণজাতিকে পুরোহিতের জাতি বলা সঙ্গত কি না; ব্রাহ্মণের অনুবাদে priest শব্দ ব্যবহার করা সঙ্গত কি না? Priestএর যাবতীয় অপরাধ ব্রাহ্মণের স্কন্ধে অর্পণ করা সঙ্গত কি না?

২। ব্রাহ্মণের হাতে ধর্ম্মের চাবি রহিয়াছে, এইরূপ নির্দ্দেশ যুক্তিযুক্ত কি না?

৩। ভারতবর্ষকে priest-ridden country বলা সঙ্গত কি না?

৪। এই priestএর অত্যাচারে ভারতবাসী হিন্দুরা ধর্ম্মগত স্বাধীনতাতে বঞ্চিত, এইরূপ নির্দ্দেশ সঙ্গত কি না?

৫। ব্রাহ্মণের অত্যাচারকে ভারতবর্ষের অবনতির মূল কারণরূপে নির্দ্দেশ সঙ্গত কি না?

এই কয়টি প্রশ্ন লইয়া বিনীতভাবে ভারতীয় পাঠকসমাজের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। যদি সুধী ও শাস্ত্রজ্ঞ পাঠকগণ এই প্রশ্ন আলোচনাযোগ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে এই অকিঞ্চন প্রশ্নকর্ত্তা কৃতার্থ হইবেক। বলা বাহুল্য, এই প্রশ্নের আলোচনা ভারতী পত্রে সমাদরে প্রকাশিত হইবে, এ বিষয়ে মাননীয়া ভারতী-সম্পাদিকার আশ্বাস পাইয়াছি। ('ভারতী,' চৈত্র ১৩০৮)